BanglaBook.org

প্রিয় গল্প

BanglaBook.org

বুদ্ধদেব গুহ

BanglaBook.org
BanglaBook.org
BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রিয় গল্প

বুদ্ধদেব গুহ

BanglaBook.org

সাহিত্যম্ ❑ ১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

www.BanglaBook.org

PRIYA GALPA
By Buddhadev Guha

Published by SAHITYAM
18B, Shyama Charan Dey Street,
Calcutta - 700 073
Price Rs. 100.00

ISBN 81-7267-068-0

প্রথম প্রকাশ ঃ
বইমেলা ১৪০৩
জানুয়ারী ১৯৯৭

মুদ্রণ সংখ্যা ৩৩০০

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
বইমেলা ১৪০৫
জানুয়ারী ১৯৯৯

মুদ্রণ সংখ্যা ৩৩০০

প্রকাশক □
নির্মল কুমার সাহা
সাহিত্যম্
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রাপ্তিস্থান □
নির্মল বুক এজেন্সী
৮৯, মহাত্মা গান্ধি রোড
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

নির্মল পুস্তকালয়
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

লেজার টাইপসেটিং □
কম্পো-অ্যাক্ট
সিজি-৮০, সল্টলেক সিটি
কলকাতা-৭০০ ০৯১

মুদ্রাকর □
লোকনাথ বাইন্ডিং এ্যান্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৪বি, কলেজ রো
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ □
বুদ্ধদেব গুহ

মূল্য ঃ ১০০.০০

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উৎসর্গ

মুক্তি ও হীরক মুখোপাধ্যায়কে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাহিত্যম প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই ❑

১। বাবলি
২। বাংরিপোসির দুরাত্তির
৩। বাসনাকুসুম
৪। জগমগি
৫। ছায়ারা দীর্ঘ হলো
৬। মাণ্ডুর রূপমতী
৭। ছৌ
৮। বইমেলাতে

বুদ্ধদেব গুহ'র জলরঙে আঁকা ছবির অ্যালবাম

অন্যান্য প্রকাশকের প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে কয়েকটি বই ❑

BanglaBook.org

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

মাধুকরী, কোয়েলের কাছে, একটু উষ্ণতার জন্যে, সবিনয় নিবেদন, খেলা যখন, হলুদ বসন্ত, ঋজুদা সমগ্র এবং "বনজ্যোৎস্নায় সবুজ অন্ধকারে" (আত্মজৈবনিক)

দে'জ পাবলিশিং

ঋভু (আত্মজীবনী), কোজাগর, চানঘরে গান, পঞ্চপ্রদীপ, চবুতরা, মহড়া, আদল বদল, পরদেশিয়া এবং অভিলাষ

মিত্র ঘোষ প্রাঃ লিঃ

সারেং মিঞা, যুযুধান, শালভুংরী, নগ্ননির্জন এবং বাতিঘর

www.BanglaBook.org

ভূমিকা

গত চল্লিশ বছরে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার সাধারণ এবং শারদীয় সংখ্যাতে যে সব গল্প লিখেছি তাদের মধ্যে থেকে "প্রিয়" গল্পগুলি নির্বাচন করা এক অতি দুরূহ কাজ। তাছাড়া, মায়ের কাছে যেমন সব সন্তানই সমান, লেখকের কাছেও তাঁর সব লেখাই হয়ত সমান। তাঁর লেখার প্রকৃত বিচারক তাঁর পাঠক পাঠিকারাই। তিনি নিজে নন। তাই "প্রিয় গল্প" নামটির হয়ত কোনো যাথার্থ্য নেই। আমার কী প্রিয় সেটা অবান্তর, পাঠক-পাঠিকাদের কোন কোন গল্প প্রিয় সেটাই একমাত্র প্রণিধানযোগ্য।

একজন লেখককে জানার, তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন করার একমাত্র উপায় তাঁর সব লেখা সময় ও সুযোগ করে নিয়ে মনোযোগের সঙ্গে পড়া। মনোযোগী পাঠক-পাঠিকার হাতেই থাকে প্রত্যেক লেখকের জীয়নকাঠি। এবং মরণকাঠিও। তাঁরাই লেখকের প্রকৃত বিচারক। মিডিয়ার বিচারটা প্রকৃত বিচার নয়। পাঠক-পাঠিকাদের প্রশংসা এবং নিন্দাই আসল।

আমি অন্ততঃ তাই মনে করি।

এই গল্পগুলির মধ্যে কাঁচা হাতের লেখা অনেকই গল্প আছে। কিন্তু তাদের প্রতি আমার দুর্বলতাও আছে। অবশ্য হাত যে এখনও পেকেছে এমন দাবী আমার নেই।

লক্ষ্য করেছি যে, যাটের দশকের গোড়া থেকে আশীর দশকের গোড়া পর্যন্ত প্রেমই আমার অধিকাংশ গল্পের উপজীব্য বিষয় ছিল। তার পর থেকে প্রায় প্রত্যেকটি গল্পের বিষয়ই ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক দায়বদ্ধতার দিকে ঝুঁকেছে। প্রত্যেক লেখকের দেখার চোখ, বলার কথা, তাঁর অভিজ্ঞতা এবং মানসিকতা, বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বদলে যেতে বাধ্য। সেই বদল যতখানি আমার ছোটগল্পগুলিতে লক্ষিত হয়েছে ঠিক ততখানি হয়ত উপন্যাসে হয়নি। যদিও একেবারেই হয়নি, তা বলা বোধহয় উচিত হবে না।

প্রদীপ সাহা বহু যত্নে ও ব্যয়ে এই সংকলনটি সাজিয়েছেন। বিচিত্র পটভূমি এবং আমার জীবনের বিচিত্রতর অভিজ্ঞতানির্ভর ছোটগল্পগুলির এই সংকলনটি প্রিয়জনকে উপহার দেওয়ার জন্যে যথার্থই উপযুক্ত হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখার জন্যেও। অবশ্যই।

বিনত

বুদ্ধদেব গুহ

পোস্ট বক্স নং - ১০২৭৬

কলকাতা - ৭০০ ০১৯

www.BanglaBook.org

সূচীপত্র

১ বাবা হওয়া / ৯
২ বুলির পা / ২১
৩ গোসাঘর প্রাঃ লিঃ / ২৪
৪ ফেরার সময় / ৪২
৫ বোঁদেদা / ৫৬
৬ কুচিলা খাঁই / ৬৭
৭ মাপ / ৭৯
৮ বাবা মা আমি ও পরমা / ৮৩
৯ অদ্ভুত লোক / ৯৫
১০ খেলনা / ১০১
১১ ফটকে / ১০৬
১২ চরিতখেকো এন্ড কোম্পানী / ১০৯
১৩ তা / ১১৭
১৪ প্রজন্ম / ১২২
১৫ বাইয়ানি / ১৩০
১৬ ম্যাথস / ১৩৯
১৭ গুমোর / ১৫২
১৮ পরী পয়রা / ১৬৪
১৯ কম্পাস / ১৭০
২০ শিল্যুট / ১৭৮
২১ দাদা হওয়া / ১৮৭
২২ ব্রন্টি / ১৯৭
২৩ বনসাইদের গল্প / ২০৩
২৪ জগন্নাথ / ২০৯
২৫ আয়নার সামনে / ২২১
২৬ বীজতলি / ২৪৭
২৭ পালসা / ২৫৮
২৮ জোয়ার / ২৬৮
২৯ প্রান্তিক / ২৭৮
৩০ পহেলি পেয়ার / ২৮৪
৩১ নবীন মুহুরী / ২৯১
৩২ স্বর / ২৯৬
৩৩ মুন্নির বন্ধুদের জন্যে / ৩০৩
৩৪ স্বর্গীয় রাজা / ৩১৯
৩৫ পাক্কিটাডাও চোকরা / ৩৩১
৩৬ পরীক্ষা / ৩৩৭
৩৭ বিড়াল / ৩৪৭
৩৮ চুনাওট এবং ইতোয়ারিন / ৩৬০
৩৯ টাটা / ৩৭৩
৪০ স্বামী হওয়া / ৩৮৬
৪১ প্রবেশ / ৪০১
৪২ বাদাম পাহাড়ের যাত্রী / ৪১৩
৪৩ শান্তকে পাওয়া যাচ্ছে না / ৪২১
৪৪ ছানি / ৪৩৩
৪৫ বাঘের দুধ / ৪৪০
৪৬ ছুঁচো / ৪৪৫

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাবা হওয়া

ডাকবাংলোটা থেকে নদীটা দেখা যাচ্ছিল।

সামনে একটা খোয়ার পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে। পথের দু-পাশে সারি করে লাগানো আকাশমণি গাছ। মার্চের প্রথমে অগ্নিশিখার মত ফুটেছে ফুলগুলো। আকাশপানে মুখ তুলে আছে। বাংলোর হাতায় পনসাটিয়ার ঝাড়। লাল পাতিয়া বলে মালি। পাতাগুলোর লালে এক পশলা বৃষ্টির পর জেল্লা ঠিকরোচ্ছে। কয়েকজন আদিবাসী মেয়ে-পুরুষ খোয়ার রাস্তাটা মেরামত করছে সামনেই।

আমার ছেলে রাকেশ আর মেয়ে রাই নদীর সবুজ মাঠটুকুতে দৌড়াদৌড়ি করে খেলছে। রাকেশ যথেষ্ট বড় হয়েছে। ক্লাশ এইটে পড়ে সে। তাছাড়া বয়স অনুপাতে সে অনেক বেশি জানে। বোঝে। কত বিষয়ে সে যে পড়াশুনা করে, তা বলার নয়। পড়াশুনাতে খুব ভাল সে তো বটেই, কিন্তু শুধু স্কুলের পড়াশুনাতেই নয়।

নিজের ছেলে বলেই শুধু নয়, তার ভালোত্বে আমি সত্যিই গর্ব বোধ করে থাকি।

এই গর্বের কোনো সঙ্গত কারণ আমার থাকার কথা নয়। কারণ ছেলে ও মেয়ের যা কিছু ভালো, তা আমার স্ত্রী শ্রীমতীরই জন্যে। বাবার কর্তব্য হিসেবে একমাত্র টাকা রোজগার ছাড়া আর কিছুই প্রায় করার সময় পাইনি আমি। আমি আমার দোষ স্বীকার করি। আমি অত্যন্ত উদার মানুষ বলেই আমার বিশ্বাস। তবুও খারাপটুকুর দায় শ্রীমতীর উপর অবহেলায় চাপিয়ে আমার ছেলেমেয়ের ভালোত্বের কৃতিত্বটুকু আমি এই মুহূর্তে এই বাংলোর চওড়া বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে তাকিয়ে তাকিয়ে উপভোগ করছিলাম।

শ্রীমতী ঘরে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। ড্রাইভে আমার কালোরঙা, সদ্য-কেনা ঝকঝকে গাড়িটা সাদা সীটকভার পরে কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

আমি একজন সেলফ মেড মানুষ। লেখাপড়া বিশেষ করিনি, মানে ইন্টারমিডিয়েট

www.BanglaBook.org

অবধি পড়েছিলাম। ইংরেজিতে বেশ কাঁচা ছিলাম। পড়াশুনা ছেড়ে দিতে হয় আর্থিক কারণেই। কিন্তু ফিরিওয়ালা এবং নানা রকম চাকরি থেকে জীবন শুরু করে আমি এখন একটা কারখানার মালিক। স্মলস্কেল ইণ্ডাস্ট্রি হিসেবে রেজিস্টার্ড। লোহার ঢালাই-করা জিনিস নানা দেশে এক্সপোর্টও করি। আমার ব্যবসাও যে ভালো সে সম্পর্কেও ছেলে-সম্পর্কিত গর্বের মতো গর্ব আছে আমার।

হাওড়াতে আমার কারখানা। সল্ট-লেকে হালফিল ডিজাইনের বাড়ি। সুন্দরী স্ত্রী। আর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি। বেশ কিছু লোক আমাকে স্যার স্যার করে। ভালো লাগে। কোলকাতার একটি বড় ক্লাবে আমি বছরখানেক হল মেম্বার হয়েছি। ইদানীং ক্লাবে এবং ব্যবসার জগতে আমি আকছার ইংরেজি বলে থাকি। আমি এখন জানি যে, এ-সংসারে টাকা থাকলে ইংরেজি-বাংলা কিছুই না জানলেও চলে যায়। টাকার মত ভালো ও এফেক্টিভ ভাষা আর কিছুই নেই। তাছাড়া, টাকা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সব বিদ্যাই আপনা আপনিই বাড়ে।

লক্ষ্মীর মতো সরস্বতী আর দুটি নেই।

ক্লাবে আমাকে লোকে "ম্যাক চ্যাটার্জী" বলে জানে। আমার আসল নাম মকরক্রান্তি। ছোটবেলায় পাড়ার ছেলেদের কাছে, আমার বাবার কাছে, চাকরি-জীবনের বিভিন্ন মালিকদের কাছে আমার নাম ছিল 'মকরা'। সে ডাকটা এখন ভুলেই গেছি। কেউই ডাকেনা সে নামে। ডাকলে আমি রেগেও যাব।

এই মুহূর্তে আমি একজন সুখী লোক। সংসারে সুখী হতে হলে যা-যা থাকতে হয়, থাকা উচিত, আমার তার প্রায় সবই আছে। আমি একজন কপিবুক সুখী লোক। কিন্তু নদীর সামনে, দূরে খেলে-বেড়ানো আমার ছেলে রাকেশ এবং মেয়ে রাই-এর কারণে আমি ঠিক যতটা সুখী তেমন সুখী অন্য কিছুরই জন্যে নই।

ছেলে-মেয়ে ভালো হওয়ার সুখ, কৃতী হওয়ার সুখ বাবাকে যে আনন্দ এনে দেয়, তা তার ব্যবসা, অর্থ, মান-সম্মান কিছুই এনে দিতে পারে না। অবশ্য ছেলে-মেয়েকে তাদের জীবনে অনেক কিছুই দিয়েছি আমি, আমাকে যা আমার মা-বাবা দিতে পারেননি।

আমি একজন কৃতী কেউ-কেটা যোগ্য বাবা। ভাবছিলাম আমি। বড়লোক হওয়া সোজা। পণ্ডিত হওয়া সোজা, সব কিছু হওয়াই সোজা, কিন্তু ভালো বাবা হওয়া বড় কঠিন। এই শান্ত দুপুরে, আশিস্যে, কবুতরের ডাকের একটানা ঘুমপাড়ানী শব্দে, ছায়ায় স্নিগ্ধ হাওয়াতে, আদিবাসী কুলি-কামিনদের রাস্তা সারানো ছন্দোবদ্ধ খটখট আওয়াজের মধ্যে বসে আমি ভাবছিলাম, আমি একজন সার্থক বাবা।

॥ ২ ॥

বোধ হয় একটু তন্দ্রা এসেছিল। চোখের পাতা বুঁজে গেছিল। এমন সময় একটা গাড়ির এঞ্জিনের শব্দে আচমকা তন্দ্রা ভেঙে গেল।

চোখ মেলে দেখি, আমার কারখানার ওভারড্রাফট অ্যাকাউন্ট যে ব্যাঙ্কে, সেই ব্যাঙ্কেরই ম্যানেজার এসে হাজির।

মিঃ রায়! হঠাৎ? এখানে?

উনি বললেন।

www.BanglaBook.org

ওঁকে দেখেই আমি তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম।

বললাম, আরে? আপনি কোত্থেকে স্যার?

সব স্যারেরই স্যার বলার লোক থাকে? বাবারও বাবা থাকে। লিমিট বাড়ানো নিয়ে গত তিন মাস ধরে বড় রমদা-রমদি চলছে। কানাঘুসোয় শুনেছি, সোজা রাস্তায় হবে না। কিন্তু তেমন জানাশোনা হয় এমন সুযোগও হয়নি। এ একেবারে গড-সেন্ট ব্যাপার!

রায়সাহেব ন্যাশানাইলজড ব্যাঙ্কের বিরাট এয়ার-কণ্ডিশানড অফিসে সবসময়ই এমন একটা 'এয়ার' নিয়ে বসে থাকেন যে মন খুলে কথাই বলা যায় না।

আমি রায়সাহেবকে ইমপ্রেস করার জন্যে ইংরেজিতে কথাবার্তা চালু করলাম। আমি যে হাওড়ার একজন সামান্য ঢালাইওয়ালা নই, ডাবু ধরাই যে আমার শেষ গন্তব্য নয়, টাকা যে নোংরা আর পাঁকের মধ্যেই জন্মায় না, পদ্মফুলের মধ্যেও জন্মায়, একথাটা এহেন আপনগন্ধে কস্তুরিমৃগসম পাগল ব্যাঙ্কারকে বোঝানো দরকার।

এমন সময় রাকেশ ও রাই ফিরে এলো।

আমি আমার ছেলেমেয়ের সঙ্গে রায়সাহেবের আলাপ করিয়ে দিয়ে রায়সাহেবদের সবাইকে মহাসমারোহে বসালাম। রাইকে বললাম শ্রীমতীকে দিবানিদ্রা থেকে তুলতে। টিফিন-ক্যারিয়ারে কিছু খাবার আছে কী নেই কে জানে? চৌকিদারকে ডেকে চা করতে বললাম।

রায়সাহেব বললেন, রাঁচী যাচ্ছি। বাংলোটা দেখে ভাবলাম একটু রেস্ট করে যাই। আমার স্ত্রী ও শালী সঙ্গে আছেন। ওঁরা একটু...যাবেন।

নিশ্চয় নিশ্চয়ই! বলে আমি রাইকে বললাম, রাই, মাসিমাদের বাথরুমে নিয়ে যাও।

রায়সাহেব ইমপোর্টেড সিগারেটের প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরালেন। আমাকেও একটা দিলেন। আমি কৃতার্থ হলাম। কিন্তু ওভারড্রাফট-এর লিমিটটা বাড়লে আরো বেশি কৃতার্থ হতাম।

তারপর বাংলোর সামনে কাজ-করা কুলি কামিনদের দিকে আঙুল তুলে বললেন, দীজ পিপল আর ভেরী অনেস্ট অ্যান্ড নাইস পিপ্‌ল্‌। আই মীন দিজ জাংগলী লেবারার্স।

তারপরেই বললেন, বাট দে আর রিয়্যালি নেভ।

আমি মাথা নাড়িয়ে বললাম, ইয়েস। রাইট ঊ্য আর। দে আর রিয়ালি নেভ।

রাকেশ সিঁড়িতে বসেছিল, হঠাৎ উঠে এসে বলল, কাদের কথা বলছ বাবা?

আমি একটু হেসে, বিদগ্ধ কৃতী বাবার মত মুখ করে ঐ কুলি কামিনদের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ইংরিজিতেই বললাম, উই আর টকিং অ্যাবাউট দেম। দে আর নেভ।

রাকেশ তার ক্লাসের সেরা ছাত্র। তার স্কুলও শহরের সেরা স্কুল।

সে অবাক গলায় বলল, নেভ?

রায়সাহেব সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে কৌতুকের স্বরে বললেন, হোয়াই, সান?

রাকেশ বলল, ওরা অনেস্ট, কিন্তু নেভ দুটোই একসঙ্গে কী করে হবে? তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে আমাকে বলল, আই ডোন্নো হোয়াই ঊ্য কল দেম নেভ।

রায়সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, নেভ বানান জানো?

রাকেশ অপমানিত হল।

আমি, মানে রাকেশের বাবা, নেভ বানান এবং মানে দুটোর একটাও জানতাম না। রায়সাহেব বলেছিলেন বলেই ওঁর কথায় সায় দিয়ে বলেছিলাম! তাই রাকেশের দিকে

www.BanglaBook.org

তাকিয়ে রইলাম, সে বাবার সম্মান রাখতে পারে কী না দেখার জন্যে।

রাকেশ কেটে কেটে বলল, K n a v e। আপনি আর বাবা এই knave-এর কথাই বলছিলেন তো? অন্য নেইভও আছে। তার বানান আলাদা। উচ্চারণও।

একজাক্টলি! বললেন মিঃ রায়।

রাকেশ বলল, আমি তো তাই-ই ভাবছি। তাহলে ঠিকই বলেছি। knave-এর মানে তো অন্য। অনেস্ট আর নেভ একই সঙ্গে হতে পারে না।

মিঃ রায় আমার দিকে চেয়ে বললেন, তাহলে আমিই ভুল বলেছি, কী বলেন মিঃ চ্যাটার্জী?

আমি বললাম, কী যে বলেন স্যার? আপনি কখনও ভুল বলতে পারেন! আজকালকার ছেলেদের কথা ছেড়ে দিন। সব অসভ্য। অভদ্র।

রাকেশ হঠাৎ আমার দিকে একবার তাকাল। এমন চোখে? আমার ছেলে? যে নবজাত ছেলেকে আমি নার্সিং হোমে উলঙ্গ অবস্থায় দেখেছি! দু'পা একসঙ্গে করে ধরে গামলায় চান করিয়ে নার্স যাকে তুলে ধরে বলেছিলেন, এই যে মকরাবাবু, দ্যাখেন আপনার ছাওয়াল। বাবা হইলেন গিয়া আপনে।

সেই ছেলে এমন ঘৃণা ও হতাশা মেশা অবাক হওয়া চোখে কখনও আমার দিকে তাকায়নি। কখনও তাকাবে বলে ভাবিওনি।

একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল রাকেশ। তারপর মিঃ রায়ের দিকে মাথা নিচু করে বলল, আই অ্যাম সরি।

আমি বললাম, স্যরি শুধু নয় রাকেশ, ইনি কে জানো? কত বড় পণ্ডিত তা তুমি জানো?

বলেই ভাবলাম, ও কী করে জানবে? স্টুপিড, ইনোসেন্ট, ইডিয়ট। স্কুলের পরীক্ষাই তো পাশ করেছে। জীবনের পরীক্ষায় তো বসতে হয়নি। ও জানবে কী করে? ব্যাঙ্কের লিমিট না বাড়লে যে ব্যবসা বাড়ে না, গাড়ি চড়া যায় না, আরো ভালো থাকা যায় না, ভালো স্কুলে পড়ানো যায় না ছেলেমেয়েদের, তা ও কী করে জানবে। গাধা!

আমি বললাম, স্বীকার করো ওঁর কাছে যে তুমি অন্যায় করেছ। বলো যে, তুমি ভুল বলেছ। ক্ষমা চাও, তর্ক করেছ বলে।

আমি...

বলেই, রাকেশ আমার দিকে চেয়ে রইল।

ইতিমধ্যে রায়সাহেবের স্ত্রী ও শালী বারান্দায় চলে এলেন।

আমি আবহাওয়া লঘু করে বললাম, বসুন বসুন, এক্ষুনি চা আসছে।

ওঁরা বসতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু রায়সাহেব রুক্ষ গলাতেই বললেন, চায়ের ঝামেলার দরকার নেই, রাস্তায় অনেক পাঞ্জাবী ধাবা আছে। সেখানেই খেয়ে নেবো।

বলেই অত্যন্ত অভদ্রভাবে বললেন, চলি মিঃ চ্যাটার্জী।

শ্রীমতীও ঘর থেকে বাইরে এসেছিল। ওর সঙ্গে মহিলারা ভালোই ব্যবহার করেছিলেন। তাই মিঃ রায়ের এই রকম হঠাৎ চলে যাওয়ার কারণ ও বুঝতে পারল না।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আমি গিয়ে মিঃ রায়ের গাড়ির দরজা খুলে দিলাম। মিঃ রায় সামনের সিটে উঠতে উঠতে বললেন, আপনার ছেলেটি ভাল। কিন্তু ওকে ভাল করে ম্যানারস শেখান। এখনই যদি সব কিছু জেনে ফেলে তবে পরে কী জানবে আর?

আমি হাত জোড় করে বললাম, ওর হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি। অপরাধ নেবেন না।

www.BanglaBook.org

মিঃ রায় সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, অপরাধের কী আছে!

তারপর একটু থেমে, আমার চোখের দিকে চেয়ে বললেন, অপরাধ ক্ষমা করাই তো আমাদের কাজ।

গাড়িটা চলে গেল।

আমি ডাকলাম, রাকেশ। রাকেশ।

আমার ম্যাক চ্যাটার্জীর মধ্যে থেকে মুণ্ডিতলা বাই-লেনের মকরা বেরিয়ে এলো বহুদিন পর। আমি হুংকার দিলাম, কোথায় তুই ছোকরা! তোর পিঠের চামড়া তুলব আজ।

রাকেশ যেন মাটি ফুঁড়ে উঠল। একটুও উত্তেজনা নেই। শান্ত ধীর পদক্ষেপে আমার দিকে এগিয়ে এল। আমার চোখে চোখ রাখল।

ওকে দেখে আমার মনে হল, এ আমার ছেলে নয়। এ আমার শত্রু। আমার ধ্বংসকারী। বিষবৃক্ষ।

আমি বললাম, তুমি ভেবেছটা কি?

রেগে গেলে ছেলেমেয়েদের আমি তুমি করে বলি!

রাকেশ শান্ত গলায় বলল, কি বাবা?

আবার কি বাবা? বলে চটাস করে এক চড় মারলাম ওকে।

বললাম, বাবার মুখে কথা বলা, তুমি বাবার চেয়েও বেশি জানো? তুমি জানো মিঃ রায় কত বড় অফিসার? আমাদের ব্যবসার ভাগ্যবিধাতা উনি। আর তুমি তাঁর চেয়েও বেশি জানো? বড়দের মুখের উপর কথা! মুখে-মুখে কথা।

শ্রীমতী দৌড়ে এল।

আমি বললাম, তুমি সরে যাও। আমি ওকে আজ মেরেই ফেলবো। আমার আজ মাথার ঠিক নেই।

শ্রীমতী রাকেশকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে গেল। কিন্তু রাকেশ নড়ল না। দৃঢ় পায়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু মুখের ভাব শান্ত ; নিরুত্তাপ।

আমি কী করে ওর মনের দৃঢ়তা ভাঙব বুঝতে না-পেরে ওর নরম গালে আরেক চড় মারলাম।

ওর গাল বেয়ে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে গেল।

ওর চোখের দিকে চেয়ে হঠাৎ এই প্রথমবার আমার মনে হল এ সাংঘাতিক ছেলে। বড় হলে এ বোধ হয় নকশাল হবে। অথবা ঐ রকমই কিছু। নিজের বাবাকেই খুন করবে। এক সময়ে রাকেশের মত পড়াশোনায় ভালো ছেলেরাই তো ঐ সব করেছিল!

আমি ভাবলাম, ওকে চণ্ডীমাতা প্রাইমারী স্কুলে পড়াশোনা করালেই ভালো করতাম। ঢালাইওয়ালা মকরার ছেলেকে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট করার স্বপ্ন দেখতে গিয়েই এই বিপত্তি!

শ্রীমতী নিরুত্তাপ, উদাসীন গলায় বলল, অনেক বেড়ানো হয়েছে, পিকনিক হয়েছে ; এবার ফিরে চলো। রাতটা মামাবাড়িতে খড়গপুরে কাটিয়ে কালই কোলকাতা যাব।

॥ ৩ ॥

বাইরে থেকে ফিরে এসেছি দিন দশেক হলো। এসে অবধি ভারী খাটুনী যাচ্ছে। লোডশেডিং-এর জন্যে রাতে ঢালাই প্রায় বন্ধ। একটা জেনারেটর কেনা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি

www.BanglaBook.org

করতে করতে হয়রান হয়ে গেলাম।

সল্ট লেকে বড় মশা। শুয়েছি মশারির মধ্যেই। তবু এখনও ঘুম আসছে না। কেন জানি না, বারে বারে রাকেশের কথাই মনে হচ্ছে।

রাকেশ যখন ছোট ছিল, যখন আমার অবস্থা এত ভালো ছিল না ; তখন আমাদের আমহার্স্ট স্ট্রিটের ভাড়া বাড়িতে শ্রীমতীর সঙ্গে মেঝেতে মাদুর পেতে বসে ও পড়ত। আমি অফিস থেকে ফিরলেই, বাবা বাবা বলে দৌড়ে এসে আমার কোলে উঠত। ঐ বয়সটাই ভালো ছিলো।

নিচের তলায় রাকেশের পড়ার ঘর। আমরা কী ছোটবেলায় এত সুযোগ সুবিধা পেয়েছি? কত কষ্ট করে পড়েছি, বাজে স্কুলে ; বইপত্র ছাড়া। এরা এত কিছু পেয়েই কী এত উদ্ধত হয়ে গেল? অমানুষ হয়ে উঠল কী?

ঘুম আসছিলো না।

বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে যাওয়ার পর আমি আলাদা ঘরে শুই। শ্রীমতী রাইকে নিয়ে অন্য ঘরে। রাকেশ আলাদা ঘরে। সারা বাড়ির আলো নিবোনো। নীচের পর্চে শুধু একটা আলো জ্বলছে, গ্যারেজের সামনে।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিলাম। পায়চারি করতে করতে কখন যে আমি দরজা খুলে, সিঁড়ি ভেঙে রাকেশের পড়ার ঘরে চলে গেছি, আলো জ্বালিয়েছি, জানিও না।

ঘরের এ-পাশ ও-পাশ সব ঘুরে বেড়ালাম। ড্রয়ারে চাবি দেওয়া। ড্রয়ারে কি আছে কে জানে? ড্রয়ার খুলে আবার কী নতুন আতঙ্ক হবে তা তো জানা নেই? ড্রয়ার বন্ধ থাকাই ভালো।

রাকেশের লেখার টেবিলে একটা খাতা। বুক-র্যাকে অনেক বই। মাস্টার মশাইয়ের বসার জন্যে টেবিলের উল্টো দিকে একটা চেয়ার। দেওয়ালে ব্রুস-লীর বড় পোস্টার।

যা খুঁজছিলাম, দেখলাম আছে। দুটি ডিকশনারী আছে।

প্রথমটি কনসাইজ অক্সফোর্ড ডিকশনারী। পাতা উল্টে উল্টে knave কথাটি বের করলাম। লেখা আছে আনপ্রিন্সিপলড ম্যান, রোগ, সারভেন্ট।

রাগে আমার গা জ্বলে গেল। ওই নবাবরদের যদি মিঃ রায় ভেরী নাইস বলে থাকেন এবং ভাল চাকর-বাকর বলে থাকেন ভুল কি বলেছেন?

অন্য ডিকশনারীটা টেনে নিলাম। জুনিয়র স্কুল ডিকশনারী, ফার্স্ট এডিশন, ১৯৬৯। তাতে শুধুই লেখা এ পার্সন হু লিভস বাই চিটিং, আ ডিসঅনেস্ট ক্যারাকটার।

এছাড়া আর কিছুই লেখা নেই।

আমি রাকেশের চেয়ারে বসলাম। দু-হাতের পাতায় মুখ রেখে ভাবতে লাগলাম।

ভেরী নাইস-এর সঙ্গে এই মানেটা খাপ খায় না। কিন্তু মিঃ রায় এত বড় একজন অফিসার ও লেখাপড়া জানা লোক হয়ে কখনও ভুল করতে পারেন না।

বড্ড মশা কামড়াতে লাগল। গিয়ে ফ্যানটা খুলে দিলাম অন করে। হঠাৎ রাকেশের টেবিলে রাখা খাতাটার উপর চোখ পড়ল আমার। মলাটে রাকেশের নাম, ক্লাস, রোল নাম্বার সব লেখা। এটা পুরানো ক্লাসের খাতা। আজে বাজে লেখার জন্যে ব্যবহার করে নিশ্চয়ই।

প্রথম পাতাটা উল্টাতে দেখি রাকেশ লিখেছে, 'নেভার স্টপ লার্নিং।' এই কথাটাই বার বার লিখেছে। লিখে, নিচে আন্ডার লাইন করেছে। আর সেই পাতারই নীচের দিকে

www.BanglaBook.org

লিখেছে, 'ইউ মাস্ট হ্যাভ দ্যা কারেজ অফ ইওর কনভিকশান।'

এর নীচে সে লাইন টেনেছে বার বার তা এত জোরে চাপ দিয়ে টেনেছে যে, কাগজ নিবের চাপে ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে।

খাতাটার দিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় আমার মাথায় কার হাতের স্পর্শে, চমকে উঠলাম ভয় পেয়ে। এত রাতে? কে? রাকেশ?

কে? বলে উঠলাম আমি।

আমি। বলল, শ্রীমতী।

আমি শুধোলাম, রাকেশ ঘুমোচ্ছে?

হ্যাঁ।

আমি বললাম, আমাকে তুমি কিছু বলবে?

শ্রীমতী বলল, না।

বলেই, ঘরে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনই নিঃশব্দে চলে গেল।

একটু পর সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে আমি অনেক কিছু ভাবতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম আমার ব্যবসা, আমার টাকা-পয়সা, আমার সামাজিক প্রতিষ্ঠা, আমার বাড়ি গাড়ি সবই তো রাকেশ আর রাই-এরই জন্যে। যদি ওরাই...। যদি আমি...। ওরাই যদি...।

কী লাভ? কেন এত খাটুনি, এত দৌড়াদৌড়ি, হাওড়ার বাঁশবনে শেয়াল রাজা হবার এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমার? কেন? কাদের জন্যে?

আমার একার জন্যেই কি?

BanglaBook.org

॥ ৪ ॥

সকালবেলাটা যে কী করে কেটে যায় বুঝতেই পারি না। মোল্ড নিয়ে আজ মহা গোলমাল হলো। লয়েডস ইনসপেকশনের একজন লোক কেবলই পাসিং-এর সময় বায়নাক্কা লাগাচ্ছে। এই রেটে রিজেকশান হলে আর ব্যবসা করতে হবে না। ঘোষালের নতুন-হওয়া বাচ্চাটা নার্সিং হোম থেকে আসতে না আসতেই মারা গেছে। কারখানায় আসতেই পারছে না সে। সব দিক আমার একারই সামলাতে হচ্ছে ক'দিন থেকে।

দুপুরের দিকে একবার কলকাতা আসি রোজই। কোনোদিন ক্লাবে খাই, কোনোদিন বা শ্রীমতী বাড়ি থেকে হট-বক্সে কিছু দিয়ে দেয়।

ক্লাবে গেলাম, কিন্তু খেতে ইচ্ছে করল না। শরীরটা ভাল লাগছে না। সুগারটা চেক করতে হবে। বেড়েছে বোধ হয়। একটা ই সি জি-ও করা দরকার। এই বয়সে ইসকিমিয়া হতেই পারে। বাঁদিকের বুকেও মাঝে মাঝে ব্যথা করে।

ক্লাব থেকে বেরিয়ে ড্রাইভারকে বললাম, কলেজ স্ট্রিট যেতে। রাকেশের খাতায় লেখা কথাগুলো কাল থেকে আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। কী বলতে চেয়েছে ও? রাকেশের বাবা কী আমি? না, আমিও ওর শত্রু?

সেইদিন দুপুর থেকে ছেলেটা স্তব্ধ হয়ে আছে। ছেলের মুখের দিকে তাকাবার সময় গত কয়েক বছরে বেশি পাইনি আমি। কিন্তু যে মুখে তাকিয়েছি সে মুখ এ মুখ নয়।

একটা বড় বইয়ের দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করাতে বললাম ড্রাইভারকে।

www.BanglaBook.org

ঢুকে বললাম, ভালো ডিকশনারী কি আছে?

দোকানদার দুটি বের করে দিলেন। ওয়েবস্টারস নিউ ওয়ার্লর্ড ডিকশনারী, সেকেন্ড এডিশান, রিপ্রিন্ট ১৯৭৬।

তাড়াতাড়ি পাতা ওল্টাতে লাগলাম। ৪১৪ পাতা-knave মানে আর্কেয়িক, (ক) এ মেল সারভেন্ট, (খ) এ ম্যান অফ হামবল স্ট্যাটাস (২) এ ট্রিকী রাসকাল, রোগ। (৩) এ জ্যাক (প্লেইং কার্ড)।

আমার মনে হলো রাকেশকে শাসন করে ঠিকই করেছি। মিঃ রায় নিশ্চয়ই ১ (খ) বুঝিয়েছিলেন। ওখানকার সরল ভালো লোকেরা তো men of humble status -এরই। কিন্তু মিঃ রায় মধ্যে একটা but ব্যবহার করেছিলেন। এই but-টাই সমস্ত গুলিয়ে দিচ্ছে।

অন্য ডিকশনারি দেখলাম। শর্টার অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারী ১৯৭০, ১০৮৯ পাতা। (ক) এ মেল চাইল্ড বয়। ১৪৬০ (খ) এ বয় এমপ্লয়েড অ্যাজ সারভেন্ট, মিনিয়াল, ওয়ান অফ লো কন্ডিশান, (গ) অ্যান অ্যানপ্রিন্সিপলড ম্যান, এ বেজ অ্যান্ড ক্রাফটি রোগ (1) JOC- ১৫৬৩ (ঘ) কার্ডস।

One of low condition-এর অর্থে মিঃ রায় কথাটাকে নিশ্চয়ই ব্যবহার করেছিলেন বলে মনে হল আমার।

আমি তবুও পাশের দোকানে গেলাম। সেখানে লিটল অক্সফোর্ড ডিকশনারি, ফোর্থ এডিসান, ১৯৬৯, ২৯৪ পাতাতে বলছে, আনপ্রিন্সিপলড ম্যান, রোগ, লোয়েষ্ট কোর্ট (অরিজিনালি নয়—সারভেন্ট)।

আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। কফি হাউসে উঠে গিয়ে এক কাপ কফি আর একপ্লেট পকৌড়া নিয়ে বসলাম। বহু বছর পর কফি হাউসে এলাম। কফিতে চুমুক দিয়েছি, দেখি শরৎ এসে হাজির। শরৎ আমার ছোটবেলার বন্ধু হেমন্তের একেবারে ছোট্ট ভাই। শুনেছি পড়াশোনায় খুব ভাল হয়েছে? প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ে।

আমাকে দেখে বলল, কি মকরদা? কেমন আছেন?

আমি অন্যমনস্কর মতো বললাম, ভালো।

তারপর বললাম Knave মানে জানো?

ও চমকে উঠল, বলল, আমাকে বললেন?

আমি বললাম, না। না কফি খাবে?

ও বলল, কফি, খাবো না। কিন্তু আমি তো ফিজিক্সের ছাত্র। ইংরেজিতে ত অত ভালো নই।

আমি বললাম, এখানে তোমার ইংরেজির বন্ধুবান্ধব কেউ আছে! সামওয়ান হু ইজ রিয়্যালী গুড।

শরৎ বলল, উ্যনিভার্সিটির বেস্ট ছেলেকে নিয়ে আসছি। ও নির্ঘাৎ ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হবে এবার ইংরেজিতে।

বলেই, শরৎ চলে গেল।

একটু পরে লাজুক লাজুক দেখতে ফর্সা রোগা একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এল শরৎ। বলল, এই যে!

আমি কোনো ভূমিকা না করেই বললাম, আমাকে Knave কথাটার মানে বলতে পারেন? বানান করে শব্দটা বললাম।

www.BanglaBook.org

ছেলেটি বসে পড়ে আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল।

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, কী খাবেন?

ছেলেটি বলল, বিষ ছাড়া যা খাওয়াবেন। খিদেও পেয়েছে।

ছেলেটি বেশ পাকা। ভালো ছেলেরা আজকাল বুঝি পাকাই হয়। রাকেশেরই মতো?

আমি ওদের দু-জনের জন্যেই খাওয়ার অর্ডার করলাম।

ছেলেটি হাসল, একটা কথার তো অনেক মানে হয়।

না, যে মানেটা সব চেয়ে বেশি মানে। আমি বললাম। সেটাই বলুন।

ছেলেটি হেসে ফেলল।

বলল, তার মানে?

বললাম, যদি কথাটার একটাই মানে হত আজকে, তবে সেই মানেটা কী হত?

ছেলেটি হাসল, এক ফালি। ওর কপালে স্কাইলাইট দিয়ে রোদ এসে পড়েছিল।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, "চিটিংবাজ"। এক কথায় বললাম।

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। বললাম। আপনি শিওর?

ছেলেটি সিগারেটের প্যাকেট বের করে বলল, অ্যাবসলুটলি।

আজকালকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে দ্বিধা বড় কম।

'শ্যুওর' শব্দটি ছেলেটি যেমন করে বলল, তাতে ভালো লাগলো আমার খুব। ওদের চরিত্রে একটি সোজা ব্যাপার আছে। ভালো হোক, মন্দ হোক, ওদের মধ্যে সংশয়, দ্বিধা ব্যাপারটা কম। আমাদের ছোটবেলায়, ছাত্রাবস্থায় আমরা ঐ রকম ছিলাম না।

তারপর বলল, অন্য অনেক মানে আছে । কিন্তু সব চেয়ে বেশি প্রচলিত ও প্রযোজ্য মানে নেই।

আমি উঠে পড়লাম। শরৎ-এর হাতে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে বললাম, তুই দামটা দিয়ে দিস শরৎ। আমার বিশেষ তাড়া আছে। কিছু মনে করিস না।

যাওয়ার সময় ছেলেটিকে বললাম, থ্যাঙ্ক ইউ।

যেতে যেতে শুনলাম ছেলেটি শরৎকে বলছে, কে রে? এ যে মেন্টাল কেস।

আমি তাড়াতাড়ি কারখানাতে ফিরে এলাম। এসেই অ্যাকাউন্ট্যান্টকে ডেকে পাঠালাম। বিমলবাবু আমার বহু পুরানো অ্যাকাউন্ট্যান্ট। চার্টার্ড-অ্যাকাউন্ট্যান্সী পরীক্ষার একটা গ্রুপ ফেল। কিন্তু কাজে অনেক পাশ-করা অ্যাকাউন্ট্যান্টের চেয়েই ভালো।

বিমলবাবু এসে বললেন, বলুন স্যার।

বিমলবাবুর চোখ দুটো চিরদিনই স্বপ্নময়। এরকম কবি-কবিভাবের মানুষ অথচ এফিসিয়েন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট খুব কমই দেখা যায়।

বললাম, বিমলবাবু এক্ষুনি একটা ক্যাশ-ফ্লো স্টেটমেন্ট তৈরি করুন। আমাদের ব্যাঙ্কের ওভারড্রাফট আমি এক্ষুনি শোধ করতে চাই। কী অবস্থা জানান আমাকে। ইমিডিয়েটলি। সব কাজ ফেলে রেখে।

বিমলবাবু হাতের বল পেনটা নাড়াতে নাড়াতে বললেন, স্যারের মাথায় গণ্ডগোল হল? অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার কথা ছেড়েই দিন। এক্ষুনি লাখখানেক টাকার বিল ডিসকাউন্টিং ফেসিলিটি বাড়িয়ে আনতে না পারলেই নয়।

আমি দৃঢ় গলায় বললাম, যা বলছি তাই করুন বিমলবাবু।

বিমলবাবু বললেন, কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে স্যার তা হলে।

www.BanglaBook.org

ঢুকে বললাম, ভালো ডিকশনারী কি আছে?

দোকানদার দুটি বের করে দিলেন। ওয়েবস্টারস নিউ ওয়ার্লড ডিকশনারী, সেকেন্ড এডিশান, রিপ্রিন্ট ১৯৭৬।

তাড়াতাড়ি পাতা ওল্টাতে লাগলাম। ৪১৪ পাতা-knave মানে আর্কেয়িক, (ক) এ মেল সারভেন্ট, (খ) এ ম্যান অফ হামবল স্ট্যাটাস (২) এ ট্রিকী রাসকাল, রোগ। (৩) এ জ্যাক (প্লেইং কার্ড)।

আমার মনে হলো রাকেশকে শাসন করে ঠিকই করেছি। মিঃ রায় নিশ্চয়ই ১ (খ) বুঝিয়েছিলেন। ওখানকার সরল ভালো লোকেরা তো men of humble status -এরই। কিন্তু মিঃ রায় মধ্যে একটা but ব্যবহার করেছিলেন। এই but-টাই সমস্ত গুলিয়ে দিচ্ছে।

অন্য ডিকশনারি দেখলাম। শর্টার অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারী ১৯৭০, ১০৮৯ পাতা। (ক) এ মেল চাইল্ড বয়। ১৪৬০ (খ) এ বয় এমপ্লয়েড অ্যাজ সারভেন্ট, মিনিয়াল, ওয়ান অফ লো কন্ডিশান, (গ) অ্যান অ্যানপ্রিন্সিপলড ম্যান, এ বেজ অ্যান্ড ক্রাফটি রোগ (1) JOC- ১৫৬৩ (ঘ) কার্ডস।

One of low condition-এর অর্থে মিঃ রায় কথাটাকে নিশ্চয়ই ব্যবহার করেছিলেন বলে মনে হল আমার।

আমি তবুও পাশের দোকানে গেলাম। সেখানে লিটল অক্সফোর্ড ডিকশনারি, ফোর্থ এডিসান, ১৯৬৯, ২৯৪ পাতাতে বলছে, আনপ্রিন্সিপলড ম্যান, রোগ, লোয়েস্ট কোর্ট (অরিজিনালি নয়—সারভেন্ট)।

আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। কফি হাউসে উঠে গিয়ে এক কাপ কফি আর একপ্লেট পকৌড়া নিয়ে বসলাম। বহু বছর পর কফি হাউসে এলাম। কফিতে চুমুক দিয়েছি, দেখি শরৎ এসে হাজির। শরৎ আমার ছোটবেলার বন্ধু হেমন্তের একেবারে ছোট্ট ভাই। শুনেছি পড়াশোনায় খুব ভাল হয়েছে? প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ে।

আমাকে দেখে বলল, কি মকরদা? কেমন আছেন?

আমি অন্যমনস্কর মতো বললাম, ভালো।

তারপর বললাম Knave মানে জানো?

ও চমকে উঠল, বলল, আমাকে বললেন?

আমি বললাম, না। না কফি খাবে?

ও বলল, কফি, খাবো না। কিন্তু আমি তো ফিজিক্সের ছাত্র। ইংরেজিতে ত অত ভালো নই।

আমি বললাম, এখানে তোমার ইংরেজির বন্ধুবান্ধব কেউ আছে! সামওয়ান হু ইজ রিয়্যালী গুড।

শরৎ বলল, ঊ্যনিভার্সিটির বেস্ট ছেলেকে নিয়ে আসছি। ও নির্ঘাৎ ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হবে এবার ইংরেজিতে।

বলেই, শরৎ চলে গেল।

একটু পরে লাজুক লাজুক দেখতে ফর্সা রোগা একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এল শরৎ। বলল, এই যে!

আমি কোনো ভূমিকা না করেই বললাম, আমাকে Knave কথাটার মানে বলতে পারেন? বানান করে শব্দটা বললাম।

www.BanglaBook.org

ছেলেটি বসে পড়ে আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল।

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, কী খাবেন?

ছেলেটি বলল, বিষ ছাড়া যা খাওয়াবেন। খিদেও পেয়েছে।

ছেলেটি বেশ পাকা। ভালো ছেলেরা আজকাল বুঝি পাকাই হয়। রাকেশেরই মতো?

আমি ওদের দু-জনের জন্যেই খাওয়ার অর্ডার করলাম।

ছেলেটি হাসল, একটা কথার তো অনেক মানে হয়।

না, যে মানেটা সব চেয়ে বেশি মানে। আমি বললাম। সেটাই বলুন।

ছেলেটি হেসে ফেলল।

বলল, তার মানে?

বললাম, যদি কথাটার একটাই মানে হত আজকে, তবে সেই মানেটা কী হত?

ছেলেটি হাসল, এক ফালি। ওর কপালে স্কাইলাইট দিয়ে রোদ এসে পড়েছিল।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, "চিটিংবাজ"। এক কথায় বললাম।

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। বললাম। আপনি শিওর?

ছেলেটি সিগারেটের প্যাকেট বের করে বলল, অ্যাবসলুটলি।

আজকালকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে দ্বিধা বড় কম।

'শ্যুওর' শব্দটি ছেলেটি যেমন করে বলল, তাতে ভালো লাগলো আমার খুব। ওদের চরিত্রে একটি সোজা ব্যাপার আছে। ভালো হোক, মন্দ হোক, ওদের মধ্যে সংশয়, দ্বিধা ব্যাপারটা কম। আমাদের ছোটবেলায়, ছাত্রাবস্থায় আমরা ঐ রকম ছিলাম না।

তারপর বলল, অন্য অনেক মানে আছে । কিন্তু সব চেয়ে বেশি প্রচলিত ও প্রযোজ্য মানে নেই।

আমি উঠে পড়লাম। শরৎ-এর হাতে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে বললাম, তুই দামটা দিয়ে দিস শরৎ। আমার বিশেষ তাড়া আছে। কিছু মনে করিস না।

যাওয়ার সময় ছেলেটিকে বললাম, থ্যাঙ্ক ইউ।

যেতে যেতে শুনলাম ছেলেটি শরৎকে বলছে, কে রে? এ যে মেন্টাল কেস।

আমি তাড়াতাড়ি কারখানাতে ফিরে এলাম। এসেই অ্যাকাউন্ট্যান্টকে ডেকে পাঠালাম। বিমলবাবু আমার বহু পুরানো অ্যাকাউন্ট্যান্ট। চার্টার্ড-অ্যাকাউন্ট্যান্সী পরীক্ষার একটা গ্রুপ ফেল। কিন্তু কাজে অনেক পাশ-করা অ্যাকাউন্ট্যান্টের চেয়েই ভালো।

বিমলবাবু এসে বললেন, বলুন স্যার।

বিমলবাবুর চোখ দুটো চিরদিনই স্বপ্নময়। এরকম কবি-কবিভাবের মানুষ অথচ এফিসিয়েন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট খুব কমই দেখা যায়।

বললাম, বিমলবাবু এক্ষুনি একটা ক্যাশ-ফ্লো স্টেটমেন্ট তৈরি করুন। আমাদের ব্যাঙ্কের ওভারড্রাফট আমি এক্ষুনি শোধ করতে চাই। কী অবস্থা জানান আমাকে। ইমিডিয়েটলি। সব কাজ ফেলে রেখে।

বিমলবাবু হাতের বল পেনটা নাড়াতে নাড়াতে বললেন, স্যারের মাথায় গণ্ডগোল হল? অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার কথা ছেড়েই দিন। এক্ষুনি লাখখানেক টাকার বিল ডিসকাউন্টিং ফেসিলিটি বাড়িয়ে আনতে না পারলেই নয়।

আমি দৃঢ় গলায় বললাম, যা বলছি তাই করুন বিমলবাবু।

বিমলবাবু বললেন, কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে স্যার তা হলে।

www.BanglaBook.org

হলে হবে। আমি বললাম।

আমিই কি বললাম?

মকরা বলল? না ম্যাক চ্যাটার্জী। না রাকেশের বাবা?

জানি না, কে বলল।

বিমলবাবু চলে যাওয়ার আগে আবারও বললাম যে, কত স্টক আছে দেখুন। সমস্ত স্টক ক্র্যাশ-সেল করবো।

কি হয়েছে স্যার?

বিমলবাবুর চোখে মুখে ভয়ের ছায়া নেমে এল।

বললেন, ব্যবসা কী সত্যিই বন্ধ করে দেবেন। আমরা এতগুলো লোক কোথায় যাবো এই বয়েসে। কি হলো, একটু জানতে পেতাম? বড়ই চিন্তা হচ্ছে আপনার কথা শুনে।

আমি হাসলাম।

আমি বোধ হয় অনেক বছর পরে হাসলাম। এমন নির্মল হাসি।

বললাম, না, বন্ধ করব না। শুধু ব্যাঙ্ক বদলাবো। তাতে যা ক্ষতি হয় হবে। অন্য ব্যাঙ্কে চলে যাবো লক-স্টক-অ্যান্ড-ব্যারেল। এই চেঞ্জওভার পিরিয়ডে যা ক্ষতি হবার, হবেই। কিছুই করার নেই।

ক্যাপিটাল লস্ট হয়ে যাবে স্যার অনেক। এমন তাড়াহুড়ো করলে।

আমি এবার শক্ত হয়ে বললাম, হলে হবে। বললামই তো।

তারপর বললাম যে, আমি চলে যাচ্ছি এখন। আজই সব কিছু কমপ্লিট করে রাখবেন। রাজেন আর রামকেও ডেকে নিন। কাল আমি সকাল ন'টায় এসে কাগজপত্র নিয়ে ব্যাঙ্কে যাবো মিঃ রায়ের কাছে। কাগজপত্র সব রেডি করে টাইপ করে রাখুন। দরকার হলে রাতেও থেকে যান। বাড়িতে খবর পাঠাবেন তাহলে। ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করবেন সকলে।

কাগজ রেডি করলেও সব শোধ করবেন কী করে? স্টক ক্র্যাশ-সেল করলেও হবে না।

বিমলবাবু চিন্তান্বিত গলায় বললেন।

আমি বলালম, অন্য সম্পত্তি, এক সাতবাড়িটা ছাড়া বিক্রি বা মর্টগেজ করে দেবো। যা হোক করে হয়ে যাবে। আর কথা বলার সময় নেই আমার আজকে।

BanglaBook.org

॥ ৫ ॥

বহু বহুদিন, বহু বছর পর, আমি দিনের আলো থাকতে থাকতে কারখানা থেকে বেরোলাম। এত সময় হাতে নিয়ে আজ কী করব জানি না। নিউ মার্কেটে গিয়ে কেক কিনলাম। রাকেশ কেক খেতে ভালোবাসে। চকোলেট কেক।

তারপর কলেজ স্ট্রিটের দিকে গাড়ি চালাতে বললাম। পথে যে নার্সিং হোমে রাকেশ হয়েছিল, সেই নার্সিং হোমটা পড়ল। এখন কত বদলে গেছে সব। রাকেশ আমার সেই ছোট্ট উলঙ্গ দুগ্ধপোষ্য ছেলেও কত বদলে গেছে।

কত বদলে গেছি আমি।

কলেজ স্ট্রিটে নেমে অক্সফোর্ডের সব চেয়ে ভালো যে ডিকশনারী, যা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে মাইক্রোস্কোপিক অক্ষর দেখতে হয় ; তা কিনলাম একটা। তারপর বাড়ির দিকে

www.BanglaBook.org

চললাম।

গাড়িতে বসে বসে ভাবছিলাম যে, কালকে মিঃ রায়কে কী বলব। বাবা হয়ে অন্যায়ভাবে চড় মেরেছিলাম রাকেশকে, সেই চড় দুটো ওঁর গালে ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল। ছোটবেলায় বহু মারামারি করেছি, পাড়ায় 'মকরা গুণ্ডা' বলতো অনেকে। কিন্তু আজকে তা আর হয় না। আজকে রাকেশের বাবা আমি। আমার নিজের পরিচয়টাই আমার একমাত্র পরিচয় নয়।

কাল কেমন করে ধীরে সুস্থে মিঃ রায়কে বলব যে, মিঃ রায় আপনি ইংরেজিটা আমার ছেলের চেয়ে খারাপই জানেন। যেই উনি ভুরু কুঁচকে আমার অ্যাকাউন্ট সম্বন্ধে কথা বলতে যাবেন আমি সঙ্গের টাইপ-করা, সই-করা চিঠিটা এগিয়ে দেবো! আর...

বাড়িতে যখন পৌঁছলাম, তখন লোডশেডিং। শ্রীমতী রাইকে নিয়ে পাশের বাড়িতে গেছিল। পর্চ-এর সামনে ল্যান্ডিংয়ে একটা মোমবাতি জ্বলছে। তাতেই সিঁড়িটা আলো হয়েছে একটু।

দেখলাম, রাকেশের ঘরেও মোমবাতি জ্বলছে।

আমার হাত থেকে নগেন বইয়ের আর কেকের প্যাকেটটা নিতে যাচ্ছিল। আমিই বাধা দিলাম। বললাম, থাক।

রাকেশ দরজার দিকে পিছন ফিরে চেয়ারে বসে পড়ছিল। মোমবাতির আলোতে। এপ্রিলে ওর পরীক্ষা। এর আগে কখনও আমি জানিনি বা জিজ্ঞেস করিনি লোডশেডিং-এর মধ্যে আমার ছেলেমেয়েরা কীভাবে পড়াশুনা করে। কারখানায় দেড়লক্ষ টাকা খরচ করে জেনারেটর লাগিয়ে ফেললাম, কিন্তু বাড়িতে পেট্রোম্যাক্সও কিনিনি একটা ওদের জন্য।

টেবিলের পাশের দেওয়ালে সেই বড় পোস্টারটা। ব্রুস-লীর। মোমবাতির আলোটা নাচছে পোস্টারটার ওপরে। কুং-ফুর রাজা এই হতভাগ্য দেশের হতভাগা মানুষদের প্রতিভূ হয়ে যেন এদেশীয় ন্যক্কারজনক রাজনীতিকদের নির্লজ্জ আরশুলাসুলভ অস্তিত্বকে জুডোর প্যাঁচে গুঁড়িয়ে দেবে বলে ঠিক করেছে। আমি দেখলাম, আমার রক্তজাত, আমার যৌবনের স্বপ্নের, আমার বার্ধক্যের অভিভাবক রাকেশ, হাতকাটা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা করছে। মোমের সঙ্গে ওর চোখও জ্বলছে এবং গলছে।

দরজায় দাঁড়িয়ে বই বগলে করে আমি ভাবছিলাম, কী হবে? এত পড়াশুনা করে, ভালো হয়ে, সত্যবাদী হয়ে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করে কী হবে এই দেশে?

মনে মনে বলছিলাম, তুই যে ধনে-প্রাণে মরবি রে বাবা!

চমকে উঠে, রাকেশ মুখ ফেরালো। দেওয়ালে ওর সুন্দর গ্রীবা আর মাথাভরা চুলের ছায়া পড়ল।

রাকেশ বলল, কে?

আমি। বললাম, আমি।

রাকেশ উঠে দাঁড়াল।

বলল, বাবা ; কিন্তু মুখ নিচু করে রইল।

আমি বইয়ের দুটি খণ্ড ওর টেবিলে নামিয়ে রাখলাম। বললাম, তোর জন্যে এনেছি রে।

—কেন বাবা?

রাকেশ অবাক হয়ে শুধোলো। মাথা নীচু করেই।

www.BanglaBook.org

আমার হঠাৎ মনে পড়ল এ পর্যন্ত হাতে করে আমি নিজে আমার ছেলের জন্যে কিছুই আনিনি। সময় হয়নি। মনেও হয়নি।

আমি অস্ফুটে বললাম, তুই...

তারপর গলা পরিষ্কার করে বললাম, রাকেশ, তুই-ই ঠিক বলেছিলি।

কী বাবা? রাকেশ আবারও বলল, অস্ফুটে।

—সেদিন মিস্টার রায় ও আমি দুজনেই তোর প্রতি অন্যায় করেছিলাম।

তারপর হঠাৎ আমিই বললাম কী না কি জানি, কিন্তু নিশ্চয়ই বললাম; তুই আমাকে ক্ষমা করিস। আমার অন্যায় হয়েছিল রে।

রাকেশ আবারও বলল, বাবা!

আমি রাকেশের দু-কাঁধে আমার দুটি হাত রাখলাম।

ভাগ্যিস লোডশেডিং ছিল। নইলে রাকেশ দেখতো আমার দু-চোখের দু-কোণায় জল চিকচিক করছে।

রাকেশ কিছু বলার আগেই বললাম, ওপরে আয়। তোর জন্যে কেক এনেছি। চকোলেট কেক। তোর মা একদিন বলেছিলো, তুই ভালোবাসিস। তোর মা ও রাই আসার আগেই চল আমরা দুজনেই এটাকে শেষ করে দিই।

রাকেশের মুখে সেদিন ডাকবাংলোর যে হঠাৎ অপরিচিতের রঙ লেগেছিল, তা আস্তে আস্তে ধুয়ে এল। ওর সুন্দর মুখটা মিষ্টি, সপ্রতিভ বুদ্ধিদীপ্ত হাসিতে ভরে এল। ও বলল, তোমার না ডায়াবেটিস।

—তাতে কী? একদিন খেলে কিছু হবে না। চান করে নিচ্ছি আমি। তুই ওপরে আয়।

—আসলে মা আর রাইও চকোলেট কেক খুব ভালোবাসে বাবা। মা আর রাই ফিরুক, তারপর একসঙ্গে খাবো।

ওপরে চলে এলাম। জামাকাপড় ছাড়লাম মোমের আলোয়। নগেনকে বললাম, মোমবাতিটা নিয়ে যেতে। মোমবাতিটা নিয়ে গেলে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

এদিকটা বেশ ফাঁকা। সল্টলেকে এখনও সব জমিতে বাড়ি হয়নি। দুদিন বাদে দোল। তাই চাঁদ উঠেছে সন্ধে হতে-না-হতেই। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে চারদিক। আমি বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে বাইরে চেয়ে রইলাম। গেটের দু-পাশে লাগানো হাসনুহানার ঝোপ থেকে গন্ধ উড়ছে। হু-হু করে ঝড়ের মতো হাওয়া আসছিল দক্ষিণ থেকে। মনে হচ্ছিল, ধ্রুবতারাটা কাঁপছে বুঝি হাওয়ায়।

বারান্দায় বসে থাকতে থাকতে বাইরের আলো-ছায়ার রাতের দিকে চেয়ে আমার মনে হল, যেদিন নার্সিং হোমে রাকেশ জন্মেছিল, সেদিন আমি শুধু ওর জন্মদাতাই ছিলাম। এতদিন, এত বছর পরে, আজ এক দুর্লভ ধ্রুব সত্যর সিঁড়ি বেয়ে উঠে আমি ওর বাবা হয়ে উঠলাম।

বাবা!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বুলির 'পা'

রাসবিহারী অ্যাভিন্যু আর ল্যান্সডাউন রোডের মোড়ে লাল আলোতে গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল। জানালার পাশে বসে উদ্দেশ্যহীনভাবে চেয়েছিলাম মোড়ের দিকে। হঠাৎই মনে হলো, যেন পারুলকে দেখলাম।

সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্পের আলোয় জানুয়ারির মাঝামাঝির ধোঁয়াশা আর ডিজেলের ধোঁয়াকেও সুন্দর দেখাচ্ছিলো। দেখলাম, শেয়াল-রঙা ছেঁড়া-র‍্যাপারখানি গায়ে জড়িয়ে পারুল হেঁটে যাচ্ছে প্রিয়া সিনেমার দিকে। ক্লান্তিতে ন্যুব্জ। রোগাও হয়ে গেছে অনেক। হাতে একটি লাঠি।

বুকটার মধ্যে এমন করে উঠলো যে, কী বলব! লোকলাজ ভুলে চিৎকার করে ডাকতে ইচ্ছে করলো পারুলের নাম ধরে। উত্তেজনায় সিট থেকে প্রায় উঠেই দাঁড়িয়েছিলাম। পরক্ষণেই আস্তে আস্তে বসে পড়লাম।

পারুলই তো...

অনেক কিছুই বলার ছিলো ওকে। কিন্তু যে-সব কথা তামাদি হয়ে গেছে সে কথা আর বলা যায় না কাউকেই। ওকে আমার দেওয়ারও ছিলো অনেক কিছু। কিন্তু দেওয়ার সময়েরও একটি সময়সীমা থাকেই, পাওয়ার সময়েরই মতো। সেই সময়ের মধ্যে দেওয়া বা পাওয়া না হলে এই এক জীবনে তা দেওয়া বা পাওয়া বোধহয় হয়ে ওঠে না।

আলো সবুজ হতেই গাড়ি এগোলো ড্রাইভার। যাকে পারুল বলে ভেবেছিলাম, তার কাছে চলে গিয়ে পাশ কাটিয়ে গাড়ি এগিয়ে গেলো। বুকের গভীর থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস উঠে এসে বাইরের ধোঁয়াশায় মিশে গেলো।

মনে মনে বললাম, পারুলের জন্যে আর কিছুমাত্রই করতে এ-জীবনে পারবো না। তার অভিশাপ বাকি জীবন আমাকে বয়ে বেড়াতেই হবে। আমার চেয়েও বেশি হয়তো

www.BanglaBook.org

রিমাকে। পারুল কিন্তু কোনো দিনও মুখে কিছুই বলেনি আমাকে। তবু, মনে হয়।

বাড়ি ফিরে চান-টান করে খাওয়ার টেবিলে যখন খেতে বসলাম তখন খেতে খেতে আমি বললাম, আজ ঠিক পারুলের মতোই একজনকে দেখলাম, জানিস বুলি!

পারুলদি?

আমার কিশোরী মেয়ে বুলি খাওয়া থামিয়ে চমকে উঠলো।

বুলি, আমার একমাত্র মেয়ে, এখন ক্লাস সিক্স-এ পড়ে। একমাত্র ছেলে চুপুও খাওয়া থামালো। মুখে কেউই কিছুই বললো না।

রিমা বললো, খাওয়ার সময় পারুলের কথা না বললেই হতো না কি? আজ জগু কড়াইশুঁটির চপটা কেমন করেছে তা তো খেয়ে বলবে? সারাটা দুপুরই ও এই নিয়ে মকশো করেছে। পুর নিয়ে অনেকই এক্সপেরিমেন্ট। পুরটা বানানো আর ভাজাটাই আসল। পুরে গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়েছে। জানো?

বুলি বললো, যেমনই করুক জগুদা, আর যাই-ই দিক পারুলদির মতো কড়াইশুঁটির চপ কেউ করতে পারেনি আজ অবধি। আর পারবেও না।

সকলেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। খাওয়া বন্ধ করে। হাত থামিয়ে। একেই বোধহয় সভা-সমিতিতে বলে "মৃতের আত্মার প্রতি সম্মান জ্ঞাপনার্থে দুই মিনিট নীরবতা পালন।"

কোনো মৃতকেই মানুষ চিরদিন মনে রাখে না। মহান মানুষেরা হয়তো তাঁদের কীর্তির মধ্যে বেঁচে থাকেন অনেক দিন। আর পারুল অথবা আমার মতো সাধারণ মানুষেরা বেঁচে থাকে কড়াইশুঁটির চপ অথবা প্রভিডেন্ট-ফাণ্ড এর টাকাটার পুরোটাই ধার হয়ে যাওয়ার পারিবারিক শোকের মধ্যে।

খাওয়া-দাওয়ার পর রিমা বললো, টিভি দেখবে?

বুলি বললো, ওর অনেক পড়া। পড়বে।

বুলি চলে গেলো। চুপুও উঠলো। আমাদের বাড়ির চারটে বাড়ি পরেই নতুন মাল্টিস্টোরিড বাড়িতে স্নিগ্ধাদের ফ্ল্যাটের ভি সি আর-এ মোৎজার্ট-এর জীবনীর উপরে যে ছবিটি সাড়া জাগিয়েছে তাই দেখতে যাবে ও। "অ্যামিডিয়াস" না কী যেন!

BanglaBook.org

খাওয়ার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে শোওয়ার ঘরে এসে আমি জানালার পাশে চেয়ার টেনে বসলাম।

একসময় আমি ভাবতাম যে, একজন আধুনিক নগর-ভিত্তিক মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় লজ্জা হচ্ছে তার একঘেয়েমি। এই প্রাত্যহিক, মানডেন মিনিংলেস দিনগুলি রাতগুলির গতানুগতিকতা তাদের প্রত্যেককেই সবসময় ক্লিষ্ট করে রাখে। কিন্তু পারুলের মতো কারোর কথা যেই মনে হয়, তখন মনে হয় যে, তারা সকলেই আমারই মতো নিশ্চয়ই বোঝে যে, মানুষের লজ্জাকরতম লজ্জাটি হচ্ছে তার অহংবোধ।

পারুল আজ থেকে পনেরো বছর আগে আমাদের বাড়িতে এসেছিলো। তখন চুপু ছোট। বুলি হয়ইনি। চাকরিতে আমার এতো পদোন্নতিও হয়নি। পারুল এসেছিলো রাঁধুনি হিসেবে। তারপর নিজের গুনে ও আন্তরিকতায় কী করে যে সে হাউসকীপার, বেবি-সিটার, কেয়ারটেকার, আয়া, দারোয়ান একই সঙ্গে সব কিছুই আস্তে আস্তে হয়ে উঠেছিলো তা আমরা লক্ষ্য পর্যন্ত করিনি।

পারুলের উপরে বাড়ি ছেড়ে আমরা কত জায়গায় বেড়াতে গেছি। বুলি যখন ছ'মাসের তখন তাকে পারুলের জিম্মাতেই রেখে মধ্যপ্রদেশে বেড়াতে গেছিলাম একবার। বন্ধুবান্ধব

www.BanglaBook.org

সকলেই শুনে অবাক হয়ে গেছিল। কিন্তু কী করব! যৌথ পরিবার থেকে বেরিয়ে এলে আর সেখানে ফেরা যায় না। কেউ ফিরিয়েও নেয় না। পারুলরাই অবলম্বন আমাদের। রিমারও তখন খুবই বেড়াবার শখ ছিলো। পারুল আমাদের পরিবারেরই একজন হয়ে গেছিলো।

বুলি কথা বলতে শেখার পর পারুলকে প্রথমে ডাকতো 'পা' বলে।

পারুল হেসে বলতো, কোন 'পা'-রে বুলি? ডান, না বাঁ?

আরও একটু কথা শেখার পর বুলি বলতো পারু। পারুল হাসতো। বলতো আমাকে দেবদাসের পারু করে দিলে গো! বুলি বড় হয়ে যাবার পর অবশ্য পারুদি বলেই ডাকতো। পারুলদির সঙ্গে বুলির যে ধরনের সখ্য, মমত্ব ও স্নেহের সম্পর্ক ছিলো তা হয়তো তার মায়ের সঙ্গেও ছিলো না। পরবর্তী জীবনে তার কোনও প্রিয় সখীর সঙ্গেও বোধহয় হয়নি। ভূতের ভয় থেকে বয়ঃসন্ধির ভয়ের কথার সব কিছুই বোধহয় বুলি পারুর কাছেই শুনেছিলো। রিমার সময় ছিলো না।

পারুলের নিজের ছেলে ছিলো একটি। সে দশ বছর বয়সে নাকি কলেরাতে মারা যায়। অনেকই বছর আগে। পারুলদের বাড়ি ছিলো লক্ষ্মীকান্তপুর না ক্যানিং কোথায় যেন! দোকনো ভাষায় কথা বলতো। পান খেতো, বাড়িতে বানিয়ে। দোক্তা দিয়ে। প্রতি মাসেরই এক তারিখে দুটি যণ্ডা-গুণ্ডা ছেলে আসতো পারুলের কাছে মাইনের টাকা নিতে। তীর্থের কাকের মতো দাঁড়িয়ে থাকতো যতক্ষণ না টাকাটা হস্তগত করে। পারুলকে আমরা পুজোর সময়ে এবং পয়লা বৈশাখে নতুন শাড়ি জামা ইত্যাদি ছাড়াও দু-মাসের মাইনে বোনাস হিসেবে দিতাম। এবং দিয়ে শ্লাঘা বোধ করতাম। টাকা যাই-ই পেতো ও, ওই ছেলে দুটিই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ে যেতো। পারু দশ-বিশ টাকা রাখতো নিজের কাছে। হয়তো হাতখরচা হিসেবেই। মাস পয়লা ছাড়াও নানা দরকারে মাসের মধ্যে একাধিকবার ছেলে দুটি এসে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ডাকত পিস্সি? অ পিস্সি।

রিমা বলতো, পারু, তোমার বুড়ো বয়সে কি হবে? সব টাকাই ওদের দিয়ে দাও কেন? একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করে দিই, জমাতে রাখো।

পারুল হাসতো। বলতো, কী যে বল দিদি। ওরাই তো আমার সব। আপন ভাইপো। ওরাই দেখবে। আমার আর আছেটা কে? তারপর বুলি আর চুপুর দিকে চেয়ে বলতো, ওরাও দেখবে। কী? দেখবে না? ওরাই তো সবচেয়ে আপন আমার। আমার ভাইপোদের চেয়েও অনেক বেশি।

বুলি আর চুপু কিছু না বুঝেই বলতো, নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই!

পারুলের দুপায়েই আর্থারাইটিস ছিলো। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্লাডপ্রেসার অস্বাভাবিক রকম বেশি হয়ে গেলো। হাঁটতে লাগলো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। ভাইপোরা এসে প্রায়ই এটা করতে হবে, সেটা করতে হবে, ওটা করতে হবে বলে উপরি টাকা নিয়ে যেতে লাগল। টাকা অবশ্য রিমাই দিতো। স্কুলের এবং কলেজের সময়ের মধ্যে রান্না করে উঠতে পারতো না পারুল প্রায়ই। অফিসেও আমাকে প্রায়ই না খেয়েই যেতে হতো। রিমা এবং আমি ক্রমশই বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগলাম মানুষটার উপরে মাত্র দুটি মাসেই। অবলীলায় ভুলে গেলাম যে, দীর্ঘ পনেরো বছর সে আমাদের জন্যে কি করেছে আর করেনি।

একদিন রিমা রাতে আমাকে ডেকে বললো, বুঝলে, একটি অল্পবয়সী মেয়ে পেয়েছি। লাজুক প্রকৃতির, স্বভাবও ভালো। চুপু এখন বড় হচ্ছে তো। তাই কুৎসিত দেখতে বলেই

www.BanglaBook.org

ওকে রাখবো ঠিক করেছি। খালি বাড়িতে থাকবে। আগুন নিয়ে খেলা। আমি কোনো রিস্ক নিতে চাই না।

আমি বললাম, কী যে বলো! কিন্তু পারুল! পারুলকে কী করবে?

ওকে তিন মাসের মাইনে দিয়ে ছুটি দিয়ে দেবো। এ বাজারে তো আর কাউকে বসিয়ে খাওয়ানো যায় না। মানুষ নিজের মা বাবাকেই আজকাল বসিয়ে খাওয়াতে পারে না, তার কাজের লোককে।

ওকে কে দেখবে?

কেন? ওর ভাইপোরা। তারাই তো ওর সব। তাছাড়া এতো বছর পারুলকে আমরা কম টাকা তো দিইনি। শুনেছি ওর গ্রামে না কোথায় পাকা বাড়িও করে নিয়েছে পারুল। তাছাড়া সারা জীবন দেখবার দায়িত্ব গভর্ণমেন্টই নেয় না তো আমরা নেবো কোত্থেকে।

আমি বললাম, একদিন, আমরা গিয়ে দেখে এলেই তো পারি পারুলের বাড়ি সত্যিই আছে কিনা। ওর খোকা আর খোকনরা তো ওকে ঠকাতেও পারে।

তোমার মত অত প্রেম আমার নেই। কালকে আমার অবস্থা যদি পারুলের মতো হয় আমার প্রিন্সিপালও কি আমাকে বিদেয় করে দেবেন না? তিন মাসের মাইনেও দেবেন কিনা সন্দেহ। সবাই তো আর তোমার মতো ভালো কোম্পানির চাকরি করে না। অত ভাবলে চলে না। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে সকলকে যেতে হয়ই। তাছাড়া নতুন কাজের লোকটি কোথায় থাকবে? কোয়ার্টার তো একটিই! এ কি তোমাদের বাড়ি। যে প্রচুর ঘর। একতলার একটা ঘর পারুকে দিয়ে দেওয়া যেতো। আমাদের এই টু বেডরুম মাল্টিস্টোরিড ফ্ল্যাটে এক্সট্রা একজন মানুষেরও তো জায়গা নেই।

পারুলও খুব কেঁদেছিলো। ওর কান্নার শব্দ কোনোদিনই কেউ শুনতে পেতো না। কিছু কিছু নারীর কান্না ওইরকমই হয়, সমুদ্রপারের বৃষ্টির মতো।

তারপর একদিন—লাল গোলাপ আঁকা ওর ছোট্ট টিনের তোরঙ্গটি নিয়ে বুলির থুতনি ছুঁয়ে চুমু খেয়ে আশীর্বাদ করে হেলতে দুলতে পারুল সত্যিই চলে গেছিলো।

আর্থারাইটিস-এর জন্যেই ও অমনি হেলেদুলে নইলে চলতে পারতো না। মোটাও হয়ে গেছিলো প্রচণ্ড।

বুলি কিন্তু ফিসফিস করে কাঁদেনি। ডাক ছেড়েই কেঁদেছিলো সেদিন। শিশুর কাছে ঘোড়েল এবং বিষয় ও স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্কদের যুক্তি আদৌ গ্রহণীয় হয়নি। যখন তখন পথে ঘাটে পড়ে পারুল মারা যেতে পারে, একথা জেনেও তাকে কেন যে এমন করে ছাড়িয়ে দিলাম, এ নিয়ে ছোট্ট বুলি তার মায়ের সঙ্গে ঝগড়াও করেছিলো খুবই।

খাবার টেবিলে বসে বুলির দিকে চেয়ে আমি ভাবছিলাম যে, একদিন বুলিও অবলীলায় রিমা হয়ে উঠবে। আমাদের সমাজব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, আমাদের বিবেককে, শুভবুদ্ধিকে নিজ স্বার্থের কাছে নীরবে এবং নেপথ্যে বলি দেওয়াবে। পাতি-বুর্জোয়াদের ভিড়ের মধ্যে সামিল হয়ে যাবে বুলিও।

সে রাতে পথে পারুলকে দেখার মাস দুয়েক পরে আমার বন্ধু সীতেশ ফোন করে বললো, যে পারুল নাকি লাঠি ঠকঠকিয়ে ওর বাড়ি গেছিলো কিছু সাহায্যের জন্যে। পাশের বাড়ির কাজের লোক মতি, পারুলের গ্রাম চিনতো। তাকে দিয়ে এক রবিবার খবর নিতে পাঠালাম। সে এসে বললো, পারুলকে তার ভাইপোরা তাড়িয়ে দিয়েছে। পারুলের পনেরো বছরের রোজগারের প্রতিটি টাকাতে তারা ধান-জমি, বাড়ি, গরু সবই করে নিয়েছে। তাদের

www.BanglaBook.org

বউদের সঙ্গে পারুলের বনেনি বলে তারা ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে পিসিকে। পারুল এখন নাকি লেক-এর কাছে সার্দান অ্যাভিন্যুর ফুটপাথের এক গাড়ি-বারান্দার নিচে রাত কাটায় এবং সারা দিন নাকি পথে পথে ভিক্ষা চেয়ে বেড়ায়।

কথাটা শুনে বড়ো ভয় হলো। না, পারুলের জন্য নয়, বন্ধু ও পরিচিতেরা আমাদের সম্বন্ধে কী আলোচনা করবে তা ভেবে।

পর দিনই অফিস থেকে ফেরার পথে ড্রাইভারকে বললাম, সার্দান অ্যাভিন্যুতে যেতে। তখন সন্ধে হয়ে গেছে। দেখি, দুটি ইঁটের উপরে বসানো একটি পোড়া কালো মাটির হাঁড়িতে শুধু ভাত সেদ্ধ করছে পারুল। দেখলে ওকে চেনা যায় না। মনে হয়, যেন জন্মানোর পর থেকেই ও ভিক্ষা করছে। ভিখিরিদের বুঝি অতীত থাকে না কোনো!

পারুলকে বাড়িতে দেখা করতে বলে এলাম পর দিন সকালে। গাড়ি থেকে নেমে ভিখিরির সঙ্গে কথা বলা যায় না। কে কোথা থেকে দেখে ফেলবে। কী মনে করবে আমাকে। পারুল বললো, অত দূর যে যেতে পারবোনি দাদাবাবু। লাঠি নিয়েও চলতে পায়ে বড়োই লাগে। তা শুনে ওকে দশটা টাকা দিয়ে বললাম, রিকশা করেই এসো।

পরদিন রিকশা করে কিন্তু এলো না পারুল। হেঁটেই এলো। টাকাটা বাঁচিয়েছে। ভিখিরি হয়ে গেলে মানুষ মিথ্যেবাদীও হয়ে যায় বোধহয়। দশটা টাকা অনেকের কাছে অনেকই টাকা। ছেঁড়া দুর্গন্ধ, নোংরা শাড়ি। পায়ময় গায়ময় ধুলো। রিমা তো ওকে ঝকঝকে বসার ঘরে ঢুকতে পর্যন্ত দিলো না। বাইরের বারান্দাতেই বসিয়ে রাখলো। বললো, কত রোগের জার্মস যে ওর পায়ে থিকথিক করছে কে জানে!

আমি পারুলকে বললাম, তোমার কী ক্ষতি করেছি আমরা যে তুমি আমার বন্ধুর বাড়ি গিয়ে ভিক্ষা চাও? এতে কি অসম্মান করা হয় না আমাদের?

পারুল কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো আমার মুখের দিকে চেয়ে।

তারপর বললো, সম্মান অসম্মানের কথা তো ভাবিনি দাদাবাবু। খিদে তো বড়ো ভীষণ জিনিস। কী করে বোঝাবো আপনাদের।

রিমা বললো, ছিঃ ছিঃ, তুমি এতো নীচ।

পারুল চুপ করে রইলো। ওর দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নামল। আবারও ফিসফিসে বৃষ্টি নামলো সমুদ্রপারে।

রিমার অলক্ষ্যে গাড়িতেই ওকে তুলে দিয়ে আমাদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ানের কাছে গিয়ে পরীক্ষা করিয়ে প্রেসক্রিপশান লেখালাম। উনি ওর হিসট্রি জানতেন। নানা রোগ এসে বাসা বেঁধেছে পারুলের মধ্যে। বয়সও হয়েছে ষাটের বেশি। দু'মাসের মতো ওষুধ কিনে দিলাম ওকে। তারপর একশো টাকা দিয়ে বললাম, পারুল, তোমাকে প্রতি মাসে আমি পঞ্চাশ টাকা করে দেবো। প্রতি মাসের তিন তারিখে এসে নিয়ে যেও। অথবা তুমি রাতে যে গাড়ি-বারান্দার নিচে থাকো সেখানেই কাউকে দিয়ে পৌঁছে দেবো।

দাদাবাবু, আপনি বড়ো দয়ালু।

সেই বাক্যটি এবং পারুলের রোগ-পাণ্ডুর জলভরা চোখ দুটি প্রায়ই কানে এবং চোখে ফিরে ফিরে আসে আমার।

এই বন্দোবস্ত চললো দু মাস। তারপরই এক দিন রিমা বাড়ি ফিরেই তুলকালাম কাণ্ড বাধালো। ওর খুড়তুতো দাদা প্রদীপের বাড়িতে গিয়েও নাকি পারুল ভিক্ষে চেয়েছে কাল সকালে। প্রদীপের স্ত্রীকে রিমা একেবারেই দেখতে পারে না। রিমার ধারণা, বড়লোকের

www.BanglaBook.org

মেয়ে বলে দেমাকে পা পড়ে না মাটিতে। আপস্টার্ট। অশিক্ষিত। সে কলকাতার সকলকে বলে বেড়াচ্ছে যে, অ্যাই তো! দ্যাখো! কী শিক্ষিত বড়লোকই না রিমারা! যে মানুষটা এতো কিছু করলো এতোদিন ধরে তার আজ এই দশা! সম্মানেও কি লাগে না? কেমন ছোটো মানুষ বলো তো।

আমার মাসতুতো দাদার বাড়ি সার্দান অ্যাভিনুতে। সেও বললো একদিন যে, পারুল লাঠি ঠকঠকিয়ে ভিক্ষা চাইতে গেছিলো তার কাছেও। পারুল নাকি বলেছিলো, দাদাবাবু দিদি খুবই দয়ালু। আমাকে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দেন। বলেছেন দেবেন। যতদিন বাঁচি। কে দেয় বলুন? কিন্তু পঞ্চাশ টাকাতে তো খাওয়া এবং ওষুধ চলে না। এমনকি ফুটপাথে থেকেও চলে না। তারপর জাতে মেয়ে তো। শরীর ঢাকতেও তো এক বিরাট খরচ!

মাসতুতো দাদার কাছে শুনে আমারও বড়োই রাগ হল। আমার পরিচিত কারো কাছে না-যেতে বলা সত্ত্বেও পারুল তবু গেছে ভিক্ষা করতে আবারও!

পরের মাসে টাকা নিতে এলো না কিন্তু পারুল। আমিও ড্রাইভারকে দিয়ে সার্দান অ্যাভিন্যুতে টাকা পাঠালাম না। রাগ করেই। সত্যই বড়ে অপমানিত বোধ করেছিলাম।

চুপুর এক বন্ধু চুপুকে স্কুলে বললো, কেওড়াতলার কাছে নাকি দেখেছে পারুলকে আগের দিন। ফুটপাথে ভিক্ষা চাইতে।

রিমা রেগে গিয়ে বললো, ভালোই তো। লাস্ট ডেস্টিনেশনের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

চুপু আর বুলি বললো, ওরা গিয়ে পারুলদিকে নিয়ে আসবে।

ছেলেমেয়েকে রিমা বললো, নিজেরা রোজগার করো, পায়ে দাঁড়াও, তারপর আদিখ্যাতা কোরো।

ওরা চুপ করে যে যার ঘরে চলে গেলো।

তার দিন দশেক বাদে পারুলের ভাইপো দুজন সন্ধেবেলা এসে বললো, পিসি মরে গেছে বাবু। খবর পেয়েই আমরা এয়েচি। সৎকারের খরচ দিন।

কখন?

আমি অপরাধীর গলায় বললাম।

আজ ভোর রাতে। শীতটা খুব জোরে পড়েছে তো! বহু বুড়ো-বুড়িই টেঁসেছে আজ।

কোথায় ঘটলো ঘটনাটা?

সে খুব ভেবেচিন্তেই মরেছে আমাদের পিসি। একেবারে কেওড়াতলার শ্মশানের সামনেই। ফুটপাতে।

ওদের থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে করছিলো আমার। অনেক দিন পর মারামারি করতে ইচ্ছে করছিলো। সত্যিই।

টাকা দিয়ে ওদের বিদেয় করে দিলাম। তখন বুলি ও চুপুও বাড়ি ছিলো না। থাকলে, হয়তো শেষ দেখা দেখতে চাইতো।

আমি যেতে পারতাম শ্মশানে। কিন্তু আমার মতো একজন মানুষের এক ভিখারিনীর দেহ সৎকারের জন্যে কেওড়াতলায় যাওয়াটা এই সমাজের মনঃপূত নয়। তাছাড়া গেলেই নানা চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হতো, এ-পার্টিতে সে-পার্টিতে দেখা হওয়া মানুষ। নানা কৈফিয়ত দিতে হতো নানাজনকে। না, না। তা হয় না।

বুলি চুপুরা এখনও ছেলেমানুষ। এখনও ওরা জানে না যে, শেষ-দেখা কখনওই দেখতে নেই, যদি তেমন শেষ দেখা না হয়। সবাইকেই সুন্দরতম দিনে, সুন্দরতম সাজে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখে রাখতে হয়। সেইটুকুই শুধু থাকে স্মৃতিতে।

পর দিন রবিবার ছিলো। ব্রেকফাস্ট-টেবিলে ছেলে মেয়েকে রিমা হঠাৎ বললো, অ্যাই। জানিস তো পারুল মরে গেছে।

পারুলদি? কবে?

বলেই, বুলি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো।

বুলিটা আমার এখনও ঈশ্বরী।

চুপুও খাওয়া থামিয়ে চুপ করে বসে রইলো।

রিমা আমাকে বললো, তোমাকে আরেকটা আলু-পরোটা দিই?

উত্তর দিলাম না কোনো। শুধু ঘাড় নাড়িয়ে জানালাম, না।

আজকালকার সব মেয়েরোই কি রিমারই মতো? অবুঝ, নিজসুখমগ্ন, হৃদয়হীন? ভাবছিলাম, কেনই যে পারুল এমনভাবে ফুটপাথে না খেয়ে মারা গেলো, এই মহৎ জনগণতান্ত্রিক সোনার সংবিধানের দেশে কে বা কারা যে তাকে অলক্ষ্যে খুন করে গেলো, সেই রহস্য অথবা আমার এবং রিমার অসহায়তা বা অপারকতা যে ঠিক কতখানি তা আমার শোকস্তব্ধ অপাপবিদ্ধ অনাবিল ছেলেমেয়েকে বুঝিয়ে বলা যাবে না। এখন বলা গেলেও ওরা বুঝতে পারবে না। বলা যাবে না কোনো দিনও, যদি-না তারা নিজেরাই বড় হয়ে ওঠার পর আমাদের দুজনকে আমাদের পারিপার্শ্বিককে এবং আমাদের সমাজ ও দেশের প্রকৃত স্বরূপকে সত্যিই আবিষ্কার করতে চায়। কিন্তু তেমন ভালো কি আমার ও রিমার মতো নষ্ট-ভ্রষ্ট দম্পতির ছেলেমেয়েরা কখনওই হবে? ওরা কি আমাদের চেয়েও বেশি অসন্তুষ্ট, আত্মমগ্ন, নিজসুখপরায়ণ হবে না?

আমাদের সাততলায় ছোট্ট, স্বয়ংসম্পূর্ণ সুখ-ভরপুর ফ্ল্যাটের ড্রয়িং-কাম ডাইনিং-রুমে তখন উত্তরের জানালা দিয়ে হাওয়া আসছিলো। সে হাওয়ায় কোনো ফুলের গন্ধ ছিলো না।

বারুদের গন্ধ তো নয়ই!

অথচ, থাকা উচিত ছিলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গোসাঘর (প্রাঃ) লিমিটেড

গাড়ি আজ সার্ভিসে গেছে।

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল দুপুর থেকেই। ট্যাক্সি পাওয়ার অনেক চেষ্টা করেও পেলাম না। ডালহাউসী অবধি হেঁটে এসে মিনির জন্যে দাঁড়িয়েছিলাম। চাটুজ্যেও ট্যুওরে গেছে নইলে কোনো প্রবলেমই ছিলো না।

আমি লম্বা লোক। ঘাড়ে ব্যথা হয়ে যায় মিনিতে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থেকে। বেঁচে থাকতে তো অনুক্ষণ মাথা নীচু করতেই হচ্ছে। তার উপরে বাসেও মাথা নীচু করতে ইচ্ছে করে না। এ কারণেই মিনিবাসে আদৌ চড়ি না। বৃষ্টি না হলে হেঁটেই চলে যেতাম আস্তে আস্তে।

হঠাৎই একটি সাদা মারুতি এসে দাঁড়ালো সামনে।

কিটু জানালা দিয়ে মুখ বের করে বললো, কী রেঃ গাড়ি কি হলো?

সার্ভিসে।

বাড়ি যাবি তো?

হ্যাঁ। আর কোথায় যাবো। মোল্লার দৌড় মসজিদ।

কিটু বাঁ হাত দিয়ে দরজা খুলে দিয়ে বললো, উঠে আয়।

পেছনে কুদঘাটের মিনি হর্ন দিচ্ছিলো। কনডাকটর চেঁচিয়ে বললো, অ্যাই প্রাইভেট ছারপোকা! কী পেঁয়াজী হচ্ছে মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে?

কিটু বললো, টেররিজম! টেররিজম ইজ দ্যা অর্ডার অফ দ্যা ডে। মাঝে মাঝে সত্যি ইচ্ছে হয় যে, মিনিবাসের ড্রাইভার আর কনডাকটরদের টেনে নামিয়ে থাপ্পড় কষাই গালে। আজকাল জোর যার মুলুক তার। আইন-শৃঙ্খলা, ভদ্রতা সবই দেশ থেকে উবে গেল।

হুঁ। মাও-সে-তুঙই সার। বন্দুকের নলই হচ্ছে সব ক্ষমতার উৎস। বুঝলি। পাঞ্জাব,

www.BanglaBook.org

মিজোরাম; দার্জিলিং; দেখছিস না? শুধু আমরাই ম্যাদামরা বলে সব সহ্য করে বেঁচে আছি। টেররিজম ডাজ নট লীড ট্যু এনিহোয়্যার।

ও বলল।

গাড়িটা ময়দানে এসে পড়তেই কিটু বললো, সোজা বাড়িতেই যাবি?

আর কোথায় যাব বল? পরাধীন পুরুষ। বাড়ির গর্ত থেকে বেরিয়ে অফিস, অফিসের গর্ত থেকে পেরিয়ে বাড়ির গর্ত। গর্তর জীবই হয়ে গেছি পুরোপুরি।

কিটু গাড়ির লাইটারের স্লট থেকে লাইটারটা বের করে, লাল আলোতে গাড়িটা দাঁড়াতেই সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরালো।

বললো, খাবি নাকি একটা?

নাঃ। ছেড়ে দিয়েছি।

সেকী রে? গ্রেট। কনগ্রাটস। কী করে পারলি, তুইই জানিস।

ট্রাফিক সিগন্যাল সবুজ হতেই অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিয়ে ও বললে, নমিতা কেমন আছে রে?

ভালোই। অরা কেমন আছে?

আমি বললাম।

ভালোই। তাদের খারাপ থাকার কী আছে?

উষ্মার সঙ্গে বললো কিটু।

মনে হচ্ছে, অরার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে আজ? কী রে?

আজ আর কাল কি! ঝগড়া তো রোজকারই। প্রতি সপ্তাহে দিন পাঁচেক বাক্যালাপ বন্ধ থাকে। এবং বিশ্বাস কর, সে কটি দিনই বড় শান্তিতে কাটে।

বাড়ি ফিরে কি করিস? তুই?

কি করি? বাড়ি ফিরে রাতের রান্না করি এবং ছেলেটাকে অঙ্ক করাই।

কেন নমিতা?

ও কুকিং ক্লাসে যায়। জ্যাপানীজ রান্না শেখে।

বাঃ। দারুণ দারুণ রান্না খাস তাহলে!

তা আর বলতে!

কথাটাতে উল্টো মানে হলো।

রোজই যায় রান্নার ক্লাসে?

না। অন্যদিন পিয়ানো শিখতে যায়। বাকি দিন জার্মান।

জার্মান কেন? ও কি জার্মানীতে যাচ্ছে?

শুনিনি তো! তবে ওর এক বয়ফ্রেন্ড জার্মানীতে থাকে শুনেছি।

পার্ক স্ট্রিটে পড়েই কিটু বললো, তোর মতো সুখী দাম্পত্য জীবন তো আমার নয়। তুই খুবই লাকি। নমিতার মতো মেয়ে হয় না। একেবারে আইডিয়াল ওয়াইফ। মধ্যবিত্ত মানুষদের যেমন স্ত্রী দরকার।

ভাবছিস তাই!

আমি বললাম বন্ধুর বোন আর বোনের বন্ধুদের নিজের বোনের থেকে অনেকই ভালো মনে হয়। ছাত্রাবস্থায়। আর বিয়ের পর অন্যর বউকে। সে যার বউই হোক না কেন!

www.BanglaBook.org

বদলাবদলি করেই দ্যাখ না! হুঁ!

তুই আমার ছেলেবেলার বন্ধু। তোর এতো বড় সর্বনাশ আমার দ্বারা হবে না।

আমিই তো অরাকে দিয়ে দিচ্ছি খুশি মনে।

অরা কি তোর বুধি-গাই যে তুই দিয়ে দিলেই সে আমার পেছন পেছন হেঁটে আসবে? তুই এক নম্বরের মেল-শভিনিস্ট।

স্টুপিড। সে জন্যে নয়। অরাকে নিয়ে ঘর করতে হলে সাতদিনেই তুই আত্মহত্যা করবি।

আর আমার বৌকে নিয়ে তুই ঘর করলে তিনদিনের মাথায় তোর সাততলা ফ্ল্যাট থেকে লাফিয়ে পড়তে হবে তোকে।

কিটু বললো, মনটা রিয়্যালি ভালো করে দিলিরে শিবেন। দুঃখী তাহলে আমি একাই নই! দুঃখটা সকলেরই সমান হলে দুঃখের ভারটা লাঘব হয়। কি বলিস?

মনে করে আনন্দ হয় যে, লাঘব হয়। বাড়ি ফিরেই তো যে তিমিরে সেই-তিমিরেই।

অনেকদিন আড্ডা মারা হয়নি তোর সঙ্গে। চল কোথাও বসে কফি খাই।

ভাগ! সন্ধের পর কফি খেয়ে কি হবে। হুইস্কি খাওয়াবি তো বল! তুই কি লেডিজ গ্রুপের মেম্বার যে খামোকা কফি খেয়ে লিভার নষ্ট করবি?

চল, তাই খাওয়াবো।

কোথায় যাবি?

চল, ক্লাবে যাই?

কোন ক্লাবে?

ক্যালকাটা ক্লাবে।

না না ওখানে যাবো না। এক গাদা চেনা লোক বেরুবে। তাও আজ আবার শুককুরবার। দুজনে নিরিবিলিতে আড্ডা দেওয়া যাবে না।

তাহলে চল তোর বাড়িতেই যাই।

কিটু বললো।

ফুঃ। তাহলে আর দুঃখ ছিলো কি? ছেলের পরীক্ষা শেষ না হলে বাড়িতে কাউকেই নিয়ে যাওয়া মানা। টাবু।

এই সময় আবার কিসের পরীক্ষা?

স্কুলের টেস্টস।

তাতো থাকবেই সারা বছর।

সারা বছরই বারণ। তার চেয়ে তোর বাড়ি যাই চল। পঞ্চাশটা গাধা মরে একজন বিবাহিত পুরুষ হয়। বুঝলি! ফিনিতো। একেবারেই ফিনিতো!

মাথা খারাপ। তোকে বা আমার কোনো বন্ধুকে সাতদিনের নোটিস না-দিয়ে আমারও বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই।

তাহলে চল অলিম্পিয়াতে যাই। মুখার্জী অফিস, ফেরতা রোজ ঘণ্টা দুই থাকে নাকি ওখানে। আমাকে অনেকদিনই যেতে বলেছে। এত ডিপ্রেসড ফীল করি যে, একেবারেই ম্যাদামারা হয়ে গেছি। কোথাওই যেতে ইচ্ছে করে না।

ওরও কি ঐ প্রবলেম? মানে মুখার্জীর?

ঐ। ঐ। সব শালারই এক প্রবলেম। এই পরাধীনতা আর সহ্য হয় না। মেনস লিব-এর

www.BanglaBook.org

জন্যে একটা মুভমেন্টের সময় হয়েছে। টাইম ইজ রাইপ। আর সহ্য হয় না। কিছু একটা করা উচিত। হাই-টাইম। সত্যি বলছি। আমরা পুরুষরাই আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। কারনানী ম্যানসনের ভিতরে গাড়ি রেখে যখন কিটুর সঙ্গে অলিম্পিয়ায় ঢুকলাম, দেখি মুখার্জী একতলাতেই বসে আছে। অলিম্পিয়ায় আলো করে। অলিম্পিয়া হচ্ছে কলকাতার আঁতেলদের পুরোনো আড্ডা।

আমাদের দেখেই হাত নেড়ে আসতে বললো ও। ওর টেবিলে একজন দারুণ হ্যান্ডসাম ভদ্রলোক অ্যাশ কালারের একটি স্মার্ট বিজনেস স্যুট পরে বসেছিলেন। আমরা চেয়ার টেনে বসতেই আলাপ করিয়ে দিল মুখার্জী আমাদের সঙ্গে। বললো, মীট মিস্টার হাবুল ঘোষ। জ্যাক কিলবির এম ডি। খুব ভালো ক্রিকেটার ছিলো। দারুণ ইনসুয়িং বল করতো। একটুর জন্যে বেঙ্গলে খেলার চান্স মিস করেছিলো। আমার কলীগ। মানে, জ্যাক কিলবিও আমাদেরই গ্রুপে।

হাবুল ঘোষ উঠে দাঁড়িয়ে হ্যান্ডশেক করলেন। বললেন, নাইস টু মীট উ্য!

মুখার্জী বললো, আরে ওরা দুজন আমারে ছেলেবেলার বন্ধু। এক স্কুল; এক কলেজ। অত ফর্ম্যাল হবার দরকার নেই হাবুল ওদের সঙ্গে।

তারপর আমাকে বললো, তোরা হঠাৎ এই জয়েন্টে? পথ ভুলে?

কিটু বললো, ঠিক পথ ভুলে নয়। মানে...

মুখার্জী বললো, আমি কিন্তু আজ এখুনি উঠবো। তোরা কি খাবি বল? আমিই খাওয়াচ্ছি। আজকেই তোরা এলি! হাবুলের সঙ্গে একটা জায়গায় যাবো যে আমি এখুনি।

তা তুই যা না। আমরা তো আর জলে পড়িনি।

বেয়ারা এসে দাঁড়ালো।

কি খাবি তোরা? হুইস্কি তো?

হ্যাঁ।

হাবুল ঘোষ বললেন, মুখার্জীকে হোয়াই ডোন্ট দে জয়েন আস?

মুখার্জী বললো, আরে তুমি কী পাগল হলে? এরা দুজন হচ্ছে যাকে বলে হেন-পেকড হাজব্যান্ড! ওরা ওখানে গিয়ে কি করবে?

কোথায় যাবার কথা বলছিস রে?

তা বলা যাবে না। যারা সেখানে না-যায় তাদের ঐ জায়গা সম্বন্ধে কিছুমাত্রও বলা বারণ।

কিটু টেবলের নিচে হাত বাড়িয়ে আমার হাঁটুতে চিমটি কাটলো। মুখার্জীটা যে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছে অমন দুশ্চরিত্র হয়ে গেছে তা ভেবেই খারাপ লাগলো আমারও।

আমি বললাম, কোথায় যাচ্ছিস তা না-জেনেই যাই কী করে?

হাবুল ঘোষ বললেন, শ্রেণী সংগ্রামে আমরা, মানে আমি আর মুখার্জী শামিল হয়েছি। স্ত্রীদের দ্বারা অত্যাচারিত স্বামীরা মিলে একটি সিক্রেট অর্গানাইজেশান করেছি আমরা।

তোরা কি ভাবলি খারাপ পাড়ায় যাচ্ছি আমরা? আরে সে সব জায়গায় যেতে পারলে তো টাইটই করে দিতে পারতাম তাদের। আমরা হচ্ছি শালার না ঘরকা, না ঘাটকা। তোরা বৌয়ের আঁচলধরা মেনিমুখো পুরুষেরা কী বুঝবি আমাদের কথা?

মুখার্জী বললো, দুঃখ দুঃখ গলায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাবুল ঘোষ বললেন, "কী যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিসে দংশেনি যারে?"

ভুল হলো।

কিটু বললো।

নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস ঐ পারে যত সুখ আমার বিশ্বাস। আমি বললাম হাসবার চেষ্টা করে।

আমরা উঠছি। সী উ্য এগেইন।

কিটু বললো, "উই আর ইন দ্য সেম বোট ব্রাদার। ইফ উ্য রক্ দ্যা ওয়ান এন্ড/উ্য আর গোয়িং টু রক দ্যা আদার।"

কিটু বললো পল রবসনের গান। অ্যাপার্থায়েড নয় এ। আমাদের দুঃখ আরও গভীর। ফেয়ার সেক্সদের আন-ফেয়ারনেসের বিরুদ্ধেই আমাদের সকলের বিদ্রোহ।

একটা ফোরাম চাই আমাদের বক্তব্য ভয়েস করার। মাউথপিস চাই।

ফোরাম আছে। ফর ইওর ইনফরমেশান। যাবেন তে চলুন।

হাবুল ঘোষ বললেন।

উই আর গেম।

কিটু বললো। তারপর বললো, একটা করে হুইস্কি খেয়ে গেলে হতো না।

ওখানেই হবে। চলুন। গাড়ি কোথায় রেখেছেন?

কারনানী ম্যানসনে।

মুখার্জী বললো, তাহলে কিটু তুই আমাদের গাড়িতে আয়।

কিটুর গাড়িতেই এসেছি আমি। তুই বরং কিটুর গাড়িতে যা মুখার্জী। আমি বরং ঘোষের সঙ্গে যাই।

ফাইন।

হাবুল ঘোষের গাড়ি রাসেল স্ট্রিটে ছিলো। গাড়িতে উঠে আমি শুধোলাম, কতদূর যেতে হবে?

কাছেই। থিয়েটার রোডে।

ব্যাপারটা কি?

গেলেই জানবেন। আসলে ব্যাপারটা কী জানেন? স্ত্রীদের অত্যাচারিত স্বামীদের সংখ্যা যে এত বেশি সে সম্বন্ধে আমাদেরও কোনো ধারণা ছিলো না। আমাদের এই মুভমেন্ট-এর স্নো-বলিং এফেক্ট হচ্ছে। কী বলব আপনাকে, সমাজের বাঘা বাঘা পুরুষরা যে সকলেই মেনি-বেড়াল এবং আমাদেরই দলে এই অর্গানাইজেশনটা না-করলে জানতেই পেতাম না। প্যাথেটিক অবস্থা মশাই। এই সব "ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা!" বুঝেছেন। সারা জীবন লেডিস সিটে যাদের বসতে দিলাম, মাথায় করে রাখলাম নরম লাজুক বলে, তারা যে মশাই এত বড় হারামজাদী তা কী আগে জানতাম!

ছিঃ ছিঃ। মাইন্ড ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ। নিজেদের স্ত্রীদের সম্বন্ধে এমন ভাষা ব্যবহার করা কি ঠিক?

হোয়েন উ্য আর পুশড টু দ্যা ওয়াল তখন...। তখন বেড়ালদের দাঁত খিঁচনো, লোম ফোলানো ছাড়া উপায়ই বা কী? সমস্যাটা আমাদের সারভাইভালেরই সমস্যা মশায়। দজ্জাল মেয়েদের নিয়ে রোম্যান্টিসিসম যারা করে তারা কুইসলিং ছাড়া আর কিছুই নয়।

www.BanglaBook.org

আমরা সীরিয়াসলি ভাবছি, আমাদের এই ফোরামের একটি আর্মড-উইং করবো। তেমন তেমন অত্যাচারী মেয়েছেলেদের গুলি করে মেরে দেবো। মশায় কাগজে কাগজে কেরোসিন দিয়ে আগুন ধরিয়ে মেয়েদের আত্মহত্যার কেস ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ছাপা হয় আর আমাদের মতো লক্ষ লক্ষ স্বামী যে তিল তিল করে স্লো-পয়জনিং-এ মারা যাচ্ছি, খুন হয়ে যাচ্ছি, হাপিস হয়ে যাচ্ছি তাদেরই মৃণালভুজে, তাদের বাঘনখে, সে খবর কে রাখে? পুরুষরাই পুরুষদের বড় শত্রু। 'উইমেনস লিব', 'উইমেনস লিব' করে পুরুষরাই সবচেয়ে বেশি চেঁচায়। শালা ভণ্ডামির পরাকাষ্ঠা। আরে চাচা? আগে আপন প্রাণ বাঁচা।

॥ ২ ॥

থিয়েটার রোডে, এয়ার কন্ডিশনড মার্কেটের কাছাকাছি একটি সম্ভ্রান্ত বাড়ির তিনতলায় উঠে গেলাম লিফটে হাবুল ঘোষের সঙ্গে। একটি ফ্ল্যাটের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বেল টিপলেন হাবুল ঘোষ।

ঐ দেখুন।

হাবুল ঘোষ বললেন।

তাকিয়ে দেখি দরজার উপর ঝকঝকে পেতলের প্লেটে কালো অ্যানোডাইজ করা অক্ষরে লেখা আছে ইংরিজিতে "গোসাঘর প্রাইভেট লিমিটেড"। রেজিস্টার্ড অফিস।

একজন দাড়ি-গোঁফওয়ালা বেয়ারা এসে দরজা খুলে সেলাম করলো হাবুল ঘোষকে।

ভেতরে ঢুকতে দেখি বিরাট ফ্ল্যাট। প্রায় তিনহাজার স্কোয়ার ফিটের হবে। দারুণ সুন্দর সিটিং রুম। একপাশে বার। দেখি মুখার্জী আর কিটু হুইস্কির গ্লাস নিয়ে বসে আছে। বেয়ারা আমাদেরও হুইস্কি দিলো।

BanglaBook.org

হাবুল ঘোষ বেয়ারাকে শুধোলেন সামসের, এখন কজন মেম্বার আছেন?

পাঁচজন স্যার।

উর্দি-পরা একজন কুক এসে জিজ্ঞেস করলো ডিনার খেয়ে যাবো কি না আমরা?

হাবুল ঘোষ বললেন আজ নয়। এখন আছেন কে কে? ভেতরে?

ব্যানার্জি সাহেব, বিজন সেন সাহেব, মনীষ গোস্বামী সাহেব, নাটু চক্রবর্তী সাহেব আর কুচু পালিত সাহেব।

সাহেবদের খবর দাও। বলো যে দুজন ক্যান্ডিডেট নিয়ে এসেছি।

বাবুর্চি গিয়ে খবর দিলো ভিতরে। দিয়ে এসেই বললো, আমি যাই সাহেব। এক সাহেব শুঁটকি মাছ খেতে চেয়েছেন এবং আরেক সাহেব কাউঠার মাংস। চক্রবর্তী সাহেব মুগের ডালের খিচুড়ি, সঙ্গে কড়কড়ে করে আলু ভাজা আর শুকনো লঙ্কা ভাজা। বিজন সাহেব খাবেন শুধুই স্যুপ। আমি যাই স্যার। কিছু খেলে, বলবেন।

সিটিং রুমের দেওয়ালে একজন গোবেচারা শীর্ণকায় মানুষের মস্ত অয়েল পেইন্টিং। ধুতি পাঞ্জাবি পরা সেক্স-স্টার্ভড চেহারার একটি রোগা-পাতলা মানুষ। ছবির নিচে লেখা আছে গোটা গোটা অক্ষরে

"নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই। ভয় নাই ওরে ভয় নাই।"

এ কার ছবি?

কিটু শুধোলো হাবুল ঘোষকে।

এ ছবি, এ যুগের মোস্ট-টরচারড হাজব্যান্ড বিটু ব্যানার্জীর। দুবেলা স্ত্রীর হাতে মার

www.BanglaBook.org

খেতেন উনি। এবং একদিন ঐ মারের চোটেই পটল তোলেন। ওঁর শ্বশুর স্টিভেডর ছিলেন মস্ত বড়। এই অ্যাকসিডেন্ট, থুড়ি, হত্যাকাণ্ডর খবর কোনো কাগজই ছাপেনি। ওঁরই স্মৃতিতে ক্লাবের এই সিটিং রুমের নাম রাখা হয়েছে "বিটু হল"।

বাঃ। ওঁর নাম বুঝি বিটু ছিলো?

হ্যাঁ। ভবিষ্যতে কোনো পুরুষই যেন নারীর হাতে অমন নিগৃহীত হয়ে মারা না-যান তাই-ই দেখা আমাদের সকলেরই কর্তব্য।

এমন সময় ভেতর থেকে সবুজ-চেক লুঙ্গি আর হাতকাটা সাদা গেঞ্জী-পরা একজন ছ ফিট লম্বা ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। হাতে একটি মোটা বই নিয়ে।

কী বই এটা ব্যানার্জি সাহেব?

মুখার্জি শুধোলো।

ব্যানার্জি সাহেব বেয়ারাকে বললেন হুইস্কি উইথ সোডা এন্ড আইস। বলেই, বইটা মুখার্জির হাতে দিয়ে দিলেন। উঁকি মেরে দেখলাম, বইটির নাম "বশীকরণ এবং বগলামুখী কবচ।"

কত্তদিন?

হাবুল ঘোষ শুধোলেন ওঁকে।

দশদিন হয়ে গেলো।

কি রি-অ্যাকশন? হোম-ফ্রন্টে?

রি-অ্যাকশান? আনন্দবাজারে ছেলেকে দিয়ে বিজ্ঞাপন দিইয়েছে "বাবা ফিরে এসো। মা শয্যাশায়ী। অনশনে আছেন।" অথচ কালই খবর পেলাম যে তোমার বৌদিকে দেখা গেছে পাঁচ পদ দিয়ে, মানে তিনশ টাকার কেজি-র গলদা চিংড়ি, দেড়শ টাকা কেজি-র ইলিশ এবং দুশ টাকা কেজির রাবড়ি সহযোগে সকাল-সন্ধে খাচ্ছেন। খোসমেজাজেই আছেন। তাঁর বয়ফ্রেন্ডও আসছেন বাড়িতে রেগুলার।

মুখার্জি বললো, বলেন ত' কড়াক-পিং করে দি। আমাদের অ্যাকশান স্কোয়াড তো প্রায় তৈরি।

কিছুই করতে হবে না রে ভাই। তোমার বৌ-এর বয়ফ্রেন্ডের যা চেহারা! যেন গুড়ের হাঁড়িতে-পড়া নেংটি ইঁদুর। ও গুড়খাত সলিলেই ডুবে মরবে। সংস্কৃত শ্লোক পড়োনি। "দুর্বলে সবলা নারী, সাঃ প্রাণঘাতিকাঃ।"

মুখার্জি হো হো করে হেসে উঠলো।

বললো, আপনার সেন্স অফ হিউমার আছে।

এঁরা কারা? আজ কি এঁদের ইনট্রোডাকশান আছে? নোটিশ পাইনি তো আমরা।

না না ইনট্রোডাকশান আজ নেই। তবে প্রসপেক্টিভ মেম্বার। তাই নিয়ে এলাম দেখাবার জন্য।

ওঁদের বলে দিয়েছো তো সিক্রেট ডাইভালজ করলে কী হবে?

হ্যাঁ। কড়াক-পিং।

হুঁ। কড়াক-পিং। টেররিস্টদের হেল্প ছাড়া কোনো সিক্রেট অর্গানাইজেশনই চলে না। বলেই আমার দিকে চেয়ে বললেন, বৌ লুঙ্গি পরতে দেয় না বাড়িতে। এখানে এসে হাওয়া খেয়ে নিচ্ছি মশাই। বেড়ে আছি। কী যে সুখ কী বলব! আর্নড লিভ পাওনা আছে এক মাস। এক মাসের আগে ঐ শত্রুপুরীতে ফিরে যাচ্ছি না আর।

www.BanglaBook.org

বেয়ারা আমাদের জন্যে হুইস্কি এনে দিলো। সঙ্গে চিনেবাদাম, কাঁচালঙ্কা কাঁচা-পেঁয়াজ।

মুখার্জি বললো, চীজ-টোস্ট খাবি তোরা অথবা চিকেন-ওমলেট? অফিস-ফেরতা আসছিস তো।

কিটু বললো, চীজ-টোস্ট।

আমি বললাম, আমিও তাই।

হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে আমি বললাম বোস সাহেব, আপনাদের এই ক্লাবের অ্যাক্টিভিটিস কি কি?

দজ্জাল স্ত্রীদের হাত থেকে, বলিষ্ঠা স্ত্রীদের হাত থেকে, অতিমাত্রায় বেশি নেকুপুষুমুনু স্ত্রীদের হাত থেকে, ইনটেলেকচুয়াল স্ত্রীদের হাত থেকে, স্বামীর চেয়েও বেশি গুণী স্ত্রীদের হাত থেকে হতভাগ্য পুরুষদের রক্ষা করার জন্যে যা-কিছুই করা দরকার সেইসব কিছু করাই এই ক্লাবের অবজেকটিভস। তাই-ই অ্যাক্টিভিটি।

ব্যানার্জি সাহেবকে হুইস্কি এনে দিলো বেয়ারা।

চুমুক দিয়ে উনি বললেন, সারা পৃথিবীতে এখন "উইমেনস্ লিব"-এর ধোঁয়া উঠছে তাই ঠিক এই মুহূর্তে মেনস লিব-এর আন্দোলনে আমরা সকলে যদি, যাকে বলে, কী বলব, প্রসেশান-করা ছোঁড়াদের ভাষায় যাকে "সামিল" হওয়া বলে তাই-ই না হই, তবে পৃথিবী থেকে সভ্য, ভদ্র, মুখ-চোরা শিক্ষিত পুরুষ জাতটাই অবলুপ্ত হয়ে যাবে।

আমি বললাম, বাঃ আপনি দারুণ বাংলা বলেন তো।

মুখার্জি, আমাদের ছেলেবেলার শ্যামবাজারের টার্মিনোলজীতে বলতো, কার কাছে খাপ খুলছিস? ব্যানার্জি সাহেব খখরখভ উ্যনিভার্সিটির বাংলার হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট।

সেটা কোথায়? খখরখভ উ্যনিভার্সিটি?

কাজাকিস্থানে। কাজাকিরা বাংলা খুব ভালোবাসে। উনি বেনারস উ্যনিভার্সিটিতে এসেছেন ডেপুটেশানে দু বছরের জন্য। অবশ্য ওঁর শ্বশুরবাড়ি বেনারসেই।

বেনারস থেকে আপনি এখানে এসেছেন? কলকাতায়? গোসাঘর-এ?

অবাক হয়ে কিটু বললো।

ধরণী দ্বিধা হলে তারই মধ্যে সেঁধিয়ে যেতাম মশাই আর বেনারস থেকে কলকাতা! স্ত্রী যদি ক্ষুরধার হন তবে সোনা, আর তার উপরে যদি আবার শ্বশুরবাড়ির তিন মাইল রেডিয়াসের মধ্যে থাকেন তবে তো সোনায়-সোহাগা!

কিটু বললো, ব্যাপারটা বোধহয় জেনারালাইজ করা ঠিক নয়। শ্বশুরবাড়ির কাছে থাকতে তো আদর-টাদরও...

সে-সব দিন চলে গেছে। শ্বশুরবাড়ির হ্যাপা যারা সামলায়, তারাই জানে।

এমন সময় ভেতর থেকে একজন স্লিপিং-স্যুট-পরা রোগা-পাতলা ভদ্রলোক হাতে একটি ম্যাগাজিন নিয়ে এসে সিটিং রুমে ঢুকলেন।

হাবুল ঘোষ বললেন, কী হে কুচু! কী খবর?

ওল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট। চামেলী নাকি টি ভি-তে আমি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছি বলে অ্যানাউন্সমেন্ট যাতে হয় তার বন্দোবস্ত করেছে। আজই সন্ধে থেকে। খবর পেলাম বিকেলে। পুলিশে তো খবর দিয়েইছে। তুই পুলিশের অমলচন্দ্র রায় এবং মণীন্দ্রদাকে বলে রেখেছিস তো?

বলেছি। কিন্তু ওঁদের দিয়ে আমাদের পারপাজ কতখানি সার্ভড হবে তা জানি না।

www.BanglaBook.org

ওঁদের দুজনেরই স্ত্রীদের সঙ্গে খুবই সদ্ভাব। ঝগড়া একদিনের জন্যেও হয় না।

তা হলে বীরেনকে বল।

কোন বীরেন?

আরে বীরেন কুণ্ডু।

দূর দূর। ওঁর সঙ্গে ওঁর বৌ-এর একদিনও ঝগড়া হয়নি বিয়ের পর থেকে। আমি জানি। ফর সার্টেন। ওরা সব ভাগ্যবান পুরুষ। আমাদের হতভাগা পুরুষই চাই যাঁরা আমাদেরই মতো। নইলে আমাদের জন্যে করবেন কেন?

তা হলে বিনয় চন্দ্রকে...

সেও ঐ দলেই পড়ে। বৌ বলতে সে অজ্ঞান আর সে বলতে তার বৌও অজ্ঞান।

তা হলে আর কী! বৌ-এর সঙ্গে দু'বেলা ফাটাফাটি হয় এমন পুলিশ অফিসারই দ্যাখ ওপরতলার। কী কেলো! এই বৌ-ভক্ত মানুষেরাই পুরুষদের ডুবিয়ে দিলো।

মুখার্জি বললো, তা কুচুদা, তুমি টি ভি স্টার হয়ে গেলে। আজই কি তোমাকে দেখাবে? টি ভি-তে? মেইডেন অ্যাপীয়ারেন্স?

তাই তো শুনেছি। কিন্তু তোমরা কি এই ম্যাগাজিনটা দেখেছো?

কী ম্যাগাজিন?

সকলেই উৎসুক হয়ে তাকালেন বইটার দিকে।

"প্রমীলা"। এমনিতেই তো তিষ্ঠোনো যায় না তার ওপর স্ত্রীদের মাসোহারা দিতে বলেছে এই কাগজে।

মাইনে? স্ত্রীদের? হাউ ডেঞ্জারাস!

ভীত গলায় বললেন ব্যানার্জি সাহেব।

মুখার্জি বললো, শালা! সারাজীবনই চাকরি করলাম আমি আর মাইনেটা পেলো বউ-ই। এখন আবার বউদের মায়না। কী কেলো মাইরি!

হ্যাঁ।

কুচুদা বললেন, এই পত্রিকার মহিলা এডিটর আমাদের খতম-লিস্টে আছে। 'প্রমীলা'র সম্পাদক হিসেবে বৌয়েদের মাইনের কথা লিখে, ঘরে ঘরে যা অশান্তি এনেছে তাতে তাকে বাঁচতে দেওয়া ঠিক নয়। অ্যাকশান স্কোয়াডকে বলতে হবে।

ব্যানার্জি সাহেব বললেন, আরও একজন ন্যালাখাবা পুরুষ লেখককেও শেষ করো সেই সঙ্গে।

কে সে?

মধুকরীর রাইটার।

কুচুদা বললেন।

কিটু বললো, মধুকরী নয়; "মাধুকরী"।

ঐ হলো। ঐ লেখকটিও ডেঞ্জারাস। মেয়েদের ক্ষেপিয়ে তুলছে আমাদের বিরুদ্ধে।

ব্যানার্জি সাহেব এক ঢোকে হুইস্কি শেষ করে, টাক করে গ্লাসটা সোফার পাশে নামিয়ে রেখে বললেন, মারো শালাকে! আর দেরি নয়।

এঁদের রকমসকম হাব-ভাব দেখে আমার সত্যিই ভয় করতে লাগলো। আমার বৌ-এর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয় ঠিকই, বহু ব্যাপারেই অমিলও আছে। আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে তাও-ও ঠিক কিন্তু সে আমার সন্তানের মা, আমার বিবাহিতা স্ত্রী; ভালোও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে আমাকে নিশ্চয়ই বাসে, যদিও তার মতনই করে। এ-সব কিছু জেনে তার বিরুদ্ধে এমন সাঙঘাতিক জেহাদ ঘোষণা করার প্রবৃত্তি অথবা সাহসও আমার ছিলো না। তার উপর টেররিজম! দাম্পত্যে স্ত্রীদেরই একচেটিয়া অধিকার টেররিজম-এ। কখনোই পুরুষদের নয়। আমার অস্বস্তি লাগছিলো। ভয়ও করছিলো। এভরিথিং হ্যাজ আ লিমিট। বাঘিনীরা যতক্ষণ খাঁচার মধ্যে বা অলক্ষে আছে, সাহসের অভাব হবে না। কিন্তু হঠাৎ যদি...

কুচু সাহেব বললেন, স্বগতোক্তিরই মতো, এভরিথিং হ্যাজ আ লিমিট। শালা! আমার নিজের মেহনতের পয়সায় একটু শুঁটকি মাছ আর কাউঠঠা খাবো তাও একদিনও খেতে দেবে না। বাড়িতে মগ বাবুর্চি আছে। চিটাগাং-এরই লোক, কোম্পানি তাকে হাজার টাকা মাইনে, টোয়েন্টি পার্সেন্টি বোনাস দেয়, আর শালা আমারই বেলা যত্ত সব। "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিয়ে চায় রে কে বাঁচিতে চায়?"

ব্যানার্জি সাহেব বললেন, "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।" রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বলে গেছেন।

মুখার্জি বললো রবীন্দ্রনাথের কথা ছাড়ুন দাদা। তাঁর তো শিলাইদহ ছিলো, পদ্মা বোট ছিলো; স্ত্রীর এক্তিয়ার থেকে কেটে পড়ার নানা উপায় ছিলো। তাছাড়া মৃণালিনী দেবী কতদিনই বা বেঁচে ছিলেন?

কিটু বললো, অনেক ভেবে দেখেছি, ওয়াইফকে গাধা-বোটের মতো যারা জীবনে বেঁধে রেখেছে, তারা যতখানি জল সরিয়েছে তাদের চারপাশে, ততখানি কখনও এগোতে পারেনি। জীবনে যে সব পুরুষ বড় হয়েছে তাদের প্রায় সকলেই হয় বিয়ে করেইনি, নয় সকাল সকাল বউ মরে গেছে। ফর এগজাম্পল বিধান রায়, নেহেরু।

ব্যানার্জি সাহেব বললেন, নয়তো ঘন ঘন বিয়ে করতে হবে। একটা ধরো আর একটা ছাড়ো। এগজাম্পল্ : আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। রিচার্ড বার্টন, এবং আরো অসংখ্য জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ আমাদের সামনেই আছে।

মুখার্জি বললো, তোরাও মেম্বার হয়ে যা। মাসে দুশো টাকা চাঁদা, যে কোনো ভালো ক্লাবের মাসিক চাঁদার চেয়ে অনেকই কম। বউ ত্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করলেই "নিরুদ্দেশ" হয়ে যাবি। এখানে দারুণ খাওয়া। যার যা খুশি খাবি, মেমসাহেব বউরা যা খেতে দেয় না, কচুর শাক, চেতলের পেটি, ট্যাংরার চচ্চড়ি, কাসুন্দি, কুমড়ো-পাতা ভাজা, কাঁঠালের বীচি আর পাটপাতার তরকারী, শুঁটকি মাছ, ইলিশের মাথা দিয়ে পুঁইশাক এটসেটরা। এবং ওয়েল-স্টকড বার তো আছেই। ভিতরের ঘরে সার সার বাঙ্ক আছে দেওয়ালে। শুয়ে পড়লেই হলো। ভিডিও রুম আছে। দারুণ দারুণ সফ্ট-পর্ণর ক্যাসেট আছে। ভালো লাইব্রেরী। অনেকরকম বই। চার্জও থ্রী-স্টার হোটেলের চেয়েও কম। ডাইনার্স-ক্লাব কার্ডও আমরা অনার করি। চলে আসবি, একটা ফোন করে দিয়েই। নাগিনীর ফোঁসফোসানি কমলে, যখন "দেহিপদপল্লবমুদারম" অ্যাটিচ্যুড হবে তখনই রাজার মতো ফিরে যাবি কলার তুলে। ফিরে বলবি, আর যদি "একদিনও" হয়, তবে আবারও 'নিরুদ্দেশ" হয়ে যাব। মেয়েছেলের জাত হচ্ছে শক্তের ভক্ত নরমের যম। বুঝেচিস।

কিটু পার্স বের করে বললো, এই নে দুশো টাকা। মেম্বারশিপ ফর্ম দে। সই করে দিচ্ছি।

না-না ওরকম করে হবে না। অ্যাপ্লিকেশান করলেই তো হবে না। আমাদের কড়া স্ক্রিনিং কমিটি আছে। নরম মনের পুরুষদের দেওয়া হয় না। একজন মেম্বারও বিশ্বাসঘাতকতা করলে পুরো অর্গানাইজেশানটা শ্যাটারড হয়ে যাবে। তাই কথা দিতে

www.BanglaBook.org

পারছি না যে, তুই অ্যাপ্লাই করলেই নিতে পারব আমরা। পুরুষ যথার্থ পুরুষ কী না তা না যাচাই করে মেম্বার করি না আমরা। কোনো রিস্ক-এর মধ্যে নেই আমরা।

ঠিক আছে। ফর্ম তো দে।

তা দিচ্ছি। বেয়ারা! দোঠো ফর্ম লাও।

এমন সময় কলিং বেল বাজলো বাইরে।

বেয়ারা ফর্মদুটি দিয়েই দরজা খুলতে গেলো। দরজা খুলতেই একজন অতি সুন্দরী তন্বী, মাঝবয়সী মহিলা খাটাউ-এর প্রিন্টেড ভয়েল পরে ভিতরে ঢুকলেন।

ব্যানার্জি সাহেব তাঁকে দেখেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন সোফা ছেড়ে।

তু-তু-তু-তু-তুমি!

হ্যাঁ আমি। তাড়াতাড়ি ঐ লুঙি ছেড়ে ভদ্রলোকের জামাকাপড় পরে এসো। বাড়ি যেতে হবে।

কী? কী বলছো তুমি?

ঠিকই বলছি। দশজনের সামনে সীন ক্রিয়েট কোরো না। বে-ইজ্জত হবে। আর চটিও না আমাকে। তোমাদের এই ক্লাবের কথা আমি সবই জেনে গেছি। এবং যতজনকে আমি জানি সকলকেই ফোনে জানিয়েছি। এই অর্গানাইজেশানকে ব্লাস্ট করে দেবো আমরা। তোমরা ভেবেছোটা কি? তারপরই কুচু সাহেবের দিকে ফিরে বললেন, এই যে কুচুদা! তোমার বিরুদ্ধে চামেলীদি ক্রিমিনাল প্রসিডিং আনছে। মেন্টাল টরচার-এর গ্রাউন্ডে।

কেন? কেন? ডিভোর্স চাইলেই পারে। দিয়ে দোব।

কুচু বললো।

অত সোজা! তুম কমলিকো ছোড়নেসে ক্যা হোগা, কমলী তোমকো ছোড়েগা নেহি। চামেলীদি এখন ক্রিমিনাল অ্যাডভোকেট দিলীপ দত্তর বাড়িতেই বসে আছে। কালকেই বড়ুয়া সাহেবের কোর্টে মামলা মুভ করবে। "নিরুদ্দেশ" "নিরুদ্দেশ" খেলা আপনাদের বের করে দেবে। আমরা কুড়িজন স্ত্রী মিলে প্রত্যেকে চামেলীদিকে দুশো টাকা করে দিয়েছি। চার হাজার। ইনিশিয়াল কস্টস্ হিসেবে। গোসাঘর স্যাংচুয়ারী প্রাইভেট লিমিটেডকে আমরা লিকুইডেট করে ছেড়ে দেব।

ব্যানার্জি সাহেব ভিতরে গেলেন।

বেলটা আবারও বাজলো। বেয়ারা দরজা খুলতেই একজন অল্পবয়সী, লম্বা, সুশ্রী মেয়ে একজন অত্যন্ত সুদর্শন-লম্বা পুরুষের সঙ্গে ঢুকলেন ভিতরে। একজন ফটোগ্রাফারকে নিয়ে।

মেয়েটি বললেন, নমস্কার। আমার নাম সুচেতা রায়। আমি "প্রমীলা" থেকে আসছি। ভদ্রলোক বললেন, আমার নাম মাখনলাল ভট্টাচার্য। আমিও "প্রমীলা" থেকে। ইনি কিরণ মিত্র, ফোটোগ্রাফার।

কুচুবাবু তুতলে বললেন, "প্রমীলা"! মাই গড! তারপর মাখনলালকে বললেন, আপনার ল-ল-ল-জ্জা করে না? পুরুষ হয়ে মেয়েদের কাগজে কাজ করেন। আত্মসম্মান-জ্ঞানহীন! আপনি একজন কুলাঙ্গার! মেয়েদের যারা সার্ভ করে তারা সকলেই পুরুষ জাতের কুলাঙ্গার। যারা অত্যাচারীদের, কায়েমি স্বার্থর হাত শক্ত করে তারা নিপাত যাক।

ফোটোগ্রাফার মিত্র ফটাফট ছবি তুলে যেতে লাগলেন।

মাখনলাল হেসে বললেন, আমরা সকলেই মেয়েদের সার্ভ করি। সব পুরুষই।

www.BanglaBook.org

নানাভাবে। এই-ই আমাদের ফেট। ভাগ্য। কুডনট কেয়ারলেস। লজ্জা যদি থাকেই তবে সে লজ্জাস্থান ঢেকে রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। যে দুঃখর নিরসন হবার নয়, হবে না কখনও ; সেই দুঃখ নিয়ে কেঁদে মরা পুরুষের সাজে না। "হোয়েন রেপ ইজ ইনএভিটেবল হোয়াই নট এনজয় ইট" কথাটা পুরুষ জন্ম ধারণ করার পর মুহূর্ত থেকেই প্রযোজ্য। যেখানে বিদ্রোহ মানেই মৃত্যু সেখানে উপায়ই বা কি? তার চেয়ে বরং আসুন। আপনার ইন্টারভ্যু নিই।

আমার?

কুচু সাহেব প্রায় কেঁদে ফেললেন এবারে।

হ্যাঁ আপনার। বলেই মাখনবাবু টেপ-রেকর্ডার বার করলেন কাঁধের ঝোলা থেকে।

স্যার। স্যার। প্লীজ না। আপনি আমার স্ত্রীকে চেনেন না। অমন খাণ্ডার রমণী...

ল্যাঙ্গুয়েজ কুচুদা! ল্যাঙ্গুয়েজ! বলে, মিসেস ব্যানার্জি চেঁচিয়ে ধমকে দিলেন।

মাখনলাল বললেন, কে কার বউকে চেনে দাদা! বউকে চেনার চেয়ে "আত্মানং বিদ্ধি" অনেকই সহজ ব্যাপার।

ঈরে! কার মুখ দেখে আজ সকালে উঠেছিলাম। এমন...ঈরে! বাবা!

আমার ও কিটুরও ছবি তুলতে লাগলেন ফটোগ্রাফার কিরণ মিত্র।

আমি দুহাতের পাতাতে মুখ ঢেকে বললাম, আমার নয়। আমার নয়। আমরা মেম্বার নই। মানে, আমি আর উনি। কিটুকে দেখালাম।

ফোটোগ্রাফার মিত্র হেসে বললেন, জানি। আপনারা শুধু অ্যাবেটমেন্টের চার্জেই পড়বেন। "প্রমীলার" নেকসট ইস্যুতে "গোসাঘর প্রাইভেট লিমিটেডের" উপরে এডিটোরিয়াল লিখবেন সম্পাদক সুপূর্ণা গুপ্ত। যাঁদের বিরুদ্ধে আপনাদের এই জেহাদ তাঁদেরই হাতে বাকি জীবন এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। হি হি।

ভেতর থেকে ব্যানার্জি সাহেব পায়জামা পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে এলেন। দেখলাম চোখ-মুখ একেবারে গর্তে বসে গেছে। মুখের দীপ্তিও উধাও। ফাঁসীর আসামীর মতো হাব-ভাব।

বাবুর্চি বললো, সাব আপকো খানা।

ব্যানার্জি সাহেব দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, রাস্তেকা কুত্তেকো খিলানা। খানা। ফুঃ!

ফুঃ টা ঘৃণার, না অসহায়তার, না সমর্পণের ঠিক বোঝা গেলো না।

মিসেস ব্যানার্জি বললেন, চলো! কিন্ডারগার্টেনের ছেলের মতো ফুঁঃ ফাঁঃ কোরো না। শেমলেস ক্রীচার। বিহেভ লাইক আ জেন্টেলম্যান। আ ম্যান।

অ্যাঁ-এ-এ। ম্যান!

ব্যানার্জি সাহেব ফুঁপিয়ে বললেন।

আপনার ইন্টারভ্যুটা?

মাখনলাল বললেন। মিস্টার ব্যানার্জিকে।

মিসেস ব্যানার্জিই উত্তর দিলেন। বললেন, গাবলু কালকেই ইন্টারভ্যু দেবে আপনাকে। এই নিন আমার কার্ড। টিভলি কোর্টে আমার ফ্ল্যাটে আসবেন রাত আটটাতে। ডিনারও খাবেন। খুশি হবো। স্কচ খাওয়াবো। বাঈ!

ব্যানার্জি সাহেব মনে মনে বললেন, তোমার ফ্ল্যাট! নির্লজ্জ। আমার যা-কিছু সবই তোমার অথচ সেই আমার সঙ্গেই এই ব্যবহার। "যার জন্যে রামের মা তারেই তুমি চিনলা না?"

www.BanglaBook.org

ওরা চলে গেলেন।

আমি বললাম, এবারে আমরাও উঠবো।

উঠতে পারেন। সুচেতা বললেন। তবে, আপনাদের কার্ড দুটি দিয়ে যান। সময়মতো কনটাক্ট করবো। নন-কো-অপারেট করলে আপনাদেরই ক্ষতি। বানিয়ে বানিয়ে যা-তা লিখে দেবো সেটা সত্যির চেয়েও খারাপ হবে।

পার্স থেকে কার্ড বের করে দিলাম আমি আর কিটু।

গাড়িতে এসে স্টিয়ারিং-এ বসেই কিটু হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

বললো কী হবে রে আমাদের? খুঃ-কুঃ-খিঃ—কিঃ। বৌ আমাকে তুলোধোনা করে ছেড়ে দেবে। "প্রমীলা" ও রেগুলার রাখে।

আমি বললাম টেক ইট ইজী। বিপদের সময় ধৈর্য হারাতে নেই।

আমাদের যখন নামিয়ে দিলো কিটু তখন সাড়ে নটা বাজে। দরজার বেল বাজাতেই দানো দরজা খুললো।

বললাম, মেমসাব কাঁহা?

কিচেনমে।

মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। রান্না করার কথা আমারই ছিলো। তার উপর ছেলের টেস্ট।

কিচেনে হাসি-হাসি মুখ করে ঢুকতে ঢুকতে ভ্যাবলার মতো বললাম, কোথায় গেলে? ডার্লিং?

টুলে বসে কী যেন রান্না করছিলো বউ। গ্যাসের উনুনে হাতা নেড়ে। ওর পায়ের কাছেই ছেলে বই খাতা নিয়ে বসেছিলো।

কোনো উত্তর দিলো না বউ আমার।

আবারও বললাম, কী হলো? উত্তর দিচ্ছো না কেন? বলেই, আমি ওর কাছে এগিয়ে গেলাম।

বৌ বললো আরও একটু কাছে এসো। কথা আছে।

"স্ট্রাইকিং ডিসট্যান্সের" মধ্যে আসতেই কড়া থেকে গরম হাতাটা তুলে বৌ আমার মাথায়, একেবারে ব্রহ্মতালুর উপরেই ঝটাং এক হাতার বাড়ি কষিয়ে দিলো। ঝনঝন করে উঠলো মেনস লিব-এর স্বপ্ন। বললো, কাল ছোটোর টেস্ট তা তুমি জানতে না? আর আমি কি তোমার বাঁদী? রান্নাটা করবার কথা কার? মেয়েমানুষ হয়ে অফিসও করবো, ছেলের জন্ম দেবো, আবার রান্নাও করবো?

মনে মনে আমি বললাম, গুলি মারি তোমার চাকরির। মাইনে পাও আটশো টাকা, তা তো চুল ছাঁটতে, "পেডিকিওর", "ফেসাল" করতে, বয়ফ্রেন্ডদের লাঞ্চ-ডিনার খাওয়াতে আর শাড়ি কিনতেই ফুঁকে দাও। আমার কোন ঘণ্টার উপকারে লাগে তোমার চাকরি?

ছোট, বড়দের মতো ইনকুইজিটিভ হয়ে চেয়ে রইলো। মায়ের হাতে বাপের নিগ্রহ ও দারুণ "রেলিশ" করে। ও আমারই মতো একটি মেরুদণ্ডহীন স্বামী হবে বড় হলে। জিন। জিন কোথায় যাবে? কোন মেয়ের ঠ্যাঙ্গানি খাবে কে জানে?

"গোসাঘর স্যাংচুয়ারী লিমিটেডের" সুন্দর, স্বাস্থ্যকর পুরুষালি পরিবেশের ছবিখানি আমার দু চোখের সামনে রাশ রাশ সর্ষেফুল হয়ে ফুটে উঠলো, গরম হাতার মোক্ষম বাড়ি খেয়ে।

রান্নাটা শেষ করো। আমি চান পর্যন্ত করিনি অফিস থেকে ফিরে। বলেই, বৌ টুল

www.BanglaBook.org

থেকে নেমে পড়লো। বললো, জামাকাপড় ছেড়ে, হাত ধুয়ে আটা মেখে রুটি কখানি করে ফেলো। বারোখানা।

এটা কি? বলেই কড়াইতে উঁকি মেরে দেখতে গেলাম।

বৌ আমার চুলের মুঠি ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললো ক্যাপসিকাম আর লংকার তরকারি। তোমার ঘিলু দিয়ে রাঁধো এবারে, যদি ঘিলু বলে কোনো বস্তু আদৌ থেকে থাকে।

ইতিমধ্যে ফোনটা বাজলো।

বুকটা ধক করে উঠলো। "প্রমীলা"! নয়তো মিসেস ব্যানার্জি। উরি মাগো!

নাঃ বাঁচা গেলো।

নমিতা বললো, কী খবর ব্রতীন? ভুলেই গেলে নাকি? লংটাইম নো সী। কবে ফিরেছো দিল্লী থেকে? লেটস হ্যাভ লাঞ্চ টুগেদার অ্যাট ওয়ালডর্ফ টুমরো। দেখো..

নমিতার বয়-ফ্রেন্ড। আহা! স্ত্রীর বয়ফেন্ড যে কত ভালো, "প্রমীলা"র ইন্টারভ্যুর তুলনায়, তা মনে হলো।

বললাম, বাড়িতেই একদিন বলে দাও ব্রতীনকে খেতে।

বৌ বললো, সে আমি বুঝবো। বাড়িটা কি তোমার?

চুপ করে হাতা নাড়তে লাগলাম। ক্যাপসিকাম আমার দু-চোখের বিষ। তা ছাড়া রোজই খেয়ে খেয়ে ঘেন্না ধরে গেছে। কিন্তু কিছুই করার নেই।

ভাবছিলাম, কোনো শালা পুরুষই নিশ্চয়ই ডুবিয়ে দিলো মুখার্জিদের। আফটারঅল মীরজাফরের জাত তো! কী চমৎকার একটা অর্গানাইজেশান গড়ে তুলেছিলো ওরা! আসলে সেই পুরুষের পেছনে কোনো মেয়েও নিশ্চয়ই ছিলো। পুরষদের যাই-ই দুর্বলতা, তাই-ই ওদের বল। অতি অল্পদিনের মধ্যেই একটা সময় আসছেই, যখন পৃথিবীর সমস্ত পুরুষদের ইজরায়েলেরই মতো এক নতুন ছোট্ট রাষ্ট্র গড়ে নিয়ে নারী-বিবর্জিত চমৎকার সব সুখের জীবন কাটাতে হবে। নইলে এই অত্যাচারী অবলা জাতের হাতে পুরুষজাতটাই অচিরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পুরুষই থাকবে, চরিত্রে নয়। নারীরা, কচুরীপানার মতো, তেলাপোকার মতো, তাদের ধ্বংস করা যায়নি, যাবে না।

ছোট হঠাৎ তার বড় মুখ তুলে আমাকে বললো, ড্যাডি! জিওমেট্রিকাল প্রগ্রেশান কি?

আমি চুপ করে চেয়ে রইলাম ওর দিকে।

মনে মনে বললাম, তোমার মায়ের বাড়। মেয়েদের বাড়।

www.BanglaBook.org

ফেরার সময়

সল্ট লেকের নতুন বাড়িতে আজ ওদের বিয়ের দশবছর পালন করছে সিম্পি-নির্মাল্য। খুবই সেজেছে সিম্পি। বাড়ির ল্যান্ডিং-এ দাঁড়িয়ে অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করছে। চৈতালী গাড়ি থেকে নামতেই ওকে জড়িয়ে ধরে বললো, কী খুশি যে হয়েছি তুই এলি বলে! ফোনে সেদিন যা গাঁই-গুঁই করছিলি!

কাল ছেলেমেয়ের স্কুল নেই বুঝি! তাছাড়া তোদের সল্ট লেকে রাত্তিরে বাড়ি খোঁজার চেয়ে আফ্রিকাতে গিয়ে "চাঁদের পাহাড়" খোঁজা অনেকই সোজা। তাছাড়া তোদের মতো আমার নিজের তো গাড়ি নেই। ভাসুরের গাড়ি কি হুট্হাট করে চাওয়া যায়, তবু ভাসুর আমার নিজের দাদার চেয়েও ভালো বলে...। এখন ফিরে যাবে গাড়ি দাদার কাছে আবার।

বুজুদা আর সীমাদি আসবেন তো রে?

আসবেন। আসবেন। কুজুও আসবে ওদেরই সঙ্গে। আমি তো মায়ের কাছে হয়ে এলাম। সেই জন্যেই সেদিন বলেছিলাম তোকে। মায়ের শরীরটা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না। বাবা যাবার পর থেকে ভীষণ রোগাও হয়ে গেছেন তো! তাও টি ভি টা ছিলো। ভাগ্যিস।

সত্যি! একদিন যাবো মাসীমাকে দেখতে। তুই এসেছিস যে শেষপর্যন্ত এতেই আমি খুশি।

তারপর হেসে বললো, কখন থেকে তো নির্মাল্য তোর পথ চেয়েই বসে আছে।

চৈতালী হেসে বললো, ইয়ার্কি মারিস না।

চল, চল ভিতরে। তুই আজ না-এলে না...

এসে তো পড়লামই! আসাটা তো সোজাই! ফেরার সময়ই যত সমস্যা!

www.BanglaBook.org

॥ ২ ॥

গানুবাবু বিছানায় তাকিয়ায় উপুড় হয়ে শুয়ে, টি ভি-র দিকে তাকিয়েছিলেন দু-হাতের তেলোর উপরে থুতনি রেখে। কালার টি ভি। দুই ছেলে মিলে কিনে দিয়েছে।

মণিদীপা চলে যাবার পর এই টি ভি-ই তাঁর সব। টি-ভিময় জীবন। টিভি-টা না থাকলে যে কী হতো তা ভাবতে পর্যন্ত বুক কাঁপে। টি-ভি'ই হচ্ছে বিপত্নীকের স্ত্রী। বিধবার স্বামী।

টি ভি ছাড়াও আছে দু বৌমা, তিন নাতি আর তিন নাতনি। শিশুরাই বৃদ্ধদের প্রকৃত বন্ধু। এখন মনে হয় ওঁর যে, প্রত্যেক বৃদ্ধর মধ্যেই একজন শিশু এবং প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই একজন বৃদ্ধ বাস করে বোধহয়। এই দুই সত্তার মেরুমিলন যে ঠিক কোথায় হয় তা মনস্তাত্ত্বিকরাই বলতে পারবেন। তা নিয়ে আজ তার কোন মাথাব্যথাও নেই গানুবাবুর। আজ প্রায় কোনো কিছু নিয়েই মাথাব্যথা নেই তাঁর। সব ঔৎসুক্য, উচ্চাশা, লোভ, কাম এবং মাৎসর্যর শক্ত হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়েছেন অবলীলায়। কিছুটা হয়তো নিজের অজানিতেও। তবে এখনও রয়ে গেছে একটি জিনিস। ক্রোধ। মানুষ হয়ে জন্মাবার পর রিপুগুলির মধ্যে ক্রোধেরই উন্মেষ হয়েছিল সব থেকে আগে। কিন্তু তার বিলুপ্তি হয়ত ঘটবে চিতাতে শরীর যখন ছাই হয়ে যাবে শুধু তখনই। সব থেকে পরে। স্তিমিত হয়ে এসেছে যদিও ক্রোধ তবুও ছাই-চাপা আগুনেরই মতো হঠাৎ হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠেই প্রমাণ করে দিয়ে যায় যে, সে ছেড়ে যায়নি আদৌ।

ভয় ব্যাপারটা গানুবাবুর চরিত্রানুগ নয় যে, একথা তাঁর আত্মীয় স্বজন এবং পরিচিতরা সকলেই জানতেন। শৈশবে দারিদ্র্য, বর্ষা-সন্ধ্যার দীঘির পারের অন্ধকার বাঁশবন, গ্রীষ্ম-রাতের সাপ, এবং পাঠশালার অত্যাচারী পণ্ডিতমশায়ের নিষ্ঠুর কানমলাকেও ভয় পাননি উনি। চাকরি জীবনেও ভয় পাননি লালমুখো মুনিবদের, খাটনিকে, নিয়মানুবর্তিতার কঠোরতাকে, সাহেবদের চোখ রাঙানিকে। পরবর্তী জীবনে ভয় পাননি ঐশ্বর্যকেও। ঐশ্বর্য, ছোট মাপের মানুষের কাছে বড়ই বিপদ হয়ে আসে। অমানুষ হয়ে যাবার ভয় তাঁকে কখনও আচ্ছন্ন করতে পারেনি। তাঁর সমস্ত বৈভব ও জাগতিক প্রাপ্তির মধ্যে বাস করেও মানুষ গানু রায়কে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন গানুবাবু। গরিবের কষ্ট বুঝেছেন, নিজের দুঃখের দিনের কথাগুলি ভুলে যাননি, কারো প্রতি জ্ঞানত কোনো অন্যায় করেননি। কোনোরকম ভয়েই ভীত হননি একমুহূর্তের জন্যেও।

কিন্তু ইদানীং...

বড় নাতনী ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলের উপরের দিকের কোনো ক্লাসে পড়ে। কোন ক্লাস, রোজই শুধোন তা; কিন্তু পরমুহূর্তেই ভুলে যান। আজকাল পরীক্ষার নাম-টামও তো বদলে গেছে! তাঁদের সময় বলতে এনট্রান্স। ম্যাট্রিকুলেশান তো সেদিনই হলো।

সুন্দরী, ফর্সা নাতনী, মেজ ছেলের বড় মেয়ে, কালো, একটু নাদুস, বড় ছেলের কলেজে-পড়া খেলা-পাগল বড় ছেলেকে বলল; তোর পাঞ্জাবিটা ভুঁড়ির ওপর এমন করে লেপটে আছে না যে, মনে হচ্ছে বেশ "আলতোবেলী" "আলতোবেলী" ব্যাপার।

নাতি হেসে উঠল। যেন অ্যাপ্রিসিয়েট করল যে ওর বোন দীপার রসবোধ আছে। ওয়ার্লড কাপের ফুটবলারকে আলতো করে ভুঁড়ির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়াটা যার তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

দীপা বললো, পার্থকাকা সেদিন বলছিলেন বড়মামাকে।

www.BanglaBook.org

কোন পার্থকাকা?।

আরে বই-পাগলা পার্থকাকা রে।

ছোট নাতনী নীপা বললো, চুপ কর দিদি, দাদু যেন কী বলছেন। কী বলছ দাদু?

গানুবাবু আঙুল দিয়ে দেখালেন।

নাতি বললো, আরও জোর করে দে টি-ভি-টা।

আরও জোর? স্বগতোক্তি করল দীপা। তারপর তার দাদা গগকে বললো, দাদুর কানটা এক্কেবারেই গ্যাসে। কানে একেবারেই শোনেন না আজকাল।

গগ বললো, ছোট পিসীকে বলে দিয়েছে বাবা, মেমফিস থেকে হিয়রিং-এইড পাঠাবে গিফট-পার্সেল করে।

কেন? এখানেই তো পাওয়া যায়।

এখানে?

হ্যাঁ। কেন না? শমিতের বড় মামা তো ফিলিপস থেকে এনেছেন। ওঁদের নিজেদের ডাক্তারও আছেন, ডাঃ আর-এন-মুখার্জী।

তাই-ই? দীপা বললো। বলেই, ওরা সদলবলে চলে গেল একতলাতে।

গানুবাবুর চোখ টি-ভি-র দিকেই। ওরা গেলো যে তা বুঝলেন, কিন্তু চোখ সরাননি। একটি হিন্দী ছবি দেখাচ্ছে। হিন্দী সিনেমা তিনি জীবনে দেখেননি। হিন্দী বলতেও পারেন না। ইচ্ছে করেও বলেননি। তবে আজ গানুবাবুর যায় আসে না কিছুতেই। একটা কিছু নিয়ে থাকা তো চাই। সময় যে আর কাটে না। একদিন ছিল, যখন মরার সময়ই ছিল না তার আজকে সময়ের ভারী পাথরে চাপা পড়ে গেছে স্থবির জীবন; বিবর্ণ, ইঁট-চাপা ঘাসেরই মতো। তাই টি ভি-র প্রোগ্রাম ভাল লাগালাগির কোনো ব্যাপারই নেই। নাতি-নাতনিরা ঘরে গোলমাল করুক। তিনি যে আছেন, একসময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ গানু রায় যে সশরীরে এই ঘরে উপস্থিত, তা জেনেই ভালো লাগে তাঁর। যাঁর মুখের দিকে চেয়ে তাঁর কোনো ভাই বা ছেলেও কথা বলতে সাহস করেনি কোনোদিনও সেই তাঁকেই এই নাতি-নাতনীরা আজ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বলেও একধরনের আনন্দ বোধ করেন তিনি।

বন্ধুভাবে না পেলে এই জীবনে কোনো কিছুই পাওয়ার দাম নেই। আজ বোঝেন কথাটা কতখানি সত্যি। মনি বলতো কথাটা। নাতি-নাতনীরা কোনো আড়াল রাখেনি ওদের আর গানুবাবুর মধ্যে। বৃদ্ধকে তিন বছরের নাতনী এবং কুড়ি বছরের নাতি সকলেই বন্ধু ভাবে। বন্ধু ভাবে বলেই উপেক্ষা করে কখনও কখনও। ওদের অনেক কথাই গানুবাবু বোঝেন না, কানে না শোনার জন্যেই ; তবু কলরোলই যথেষ্ট। অশীতিপর গানুবাবু জেনে আশ্বস্ত বোধ করেন যে, ক্ষয়িষ্ণু, প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে আসা তাঁর নিজের চারপাশে এখনও জীবনের চিহ্নগুলি বড়ই স্পষ্ট। জীবন্ত সব ফুটফুটে টানটান-চামড়ার মুখের টাটকা ছেলেমেয়েদের ছড়াছড়ি। একদিন উনি নিজেও যে ওদেরই মতো ছিলেন একথা ভেবেই খুশি হন খুব।

টি ভি'র পর্দাতে অনেকই মানুষের ভিড়। অনেকই রকমেরও। হাসি, গান, নাচ, মারামারি। অনেক রঙের সহাবস্থান সেখানে। উজ্জ্বল সব রঙ, হয়তো রুচিতে লাগতো, চোখে ঠেকতো কিছুদিন আগেও; আজকে যে-কোনো রঙই যথেষ্ট। এমনকি সাদাও। যদিও সাদা মানেই রক্তশূন্যতা। রঙ দেখলেই উনি খুশি। বিবর্ণ জীবন যাঁদের তাঁরাই জানেন রঙের মূল্য কতখানি।

www.BanglaBook.org

কিছুক্ষণ পরই দুখিয়া তাঁকে ডাকতে এলো। বললো, বাবু খাবার দিয়েছি। সিনেমাও তো শেষ হলো। বন্ধ করেই দিই টিভি এবারে? খাওয়ার পরে আবার চালিয়ে দেবো'খন। ন্যাশনাল প্রোগ্রাম থাকবে। দেখবেন তো?

হ্যাঁ। হ্যাঁ। নিশ্চয়ই।

টি ভি'টা না চললে বড়ই ভয় করে গানুবাবুর আজকাল।

দু পা গেলেই খাবার ঘর। তা-ই মনে হয় বহুদূরের পথ। একটুও জোর নেই পায়ে, রোশনী নেই চোখে। বৌমাদের মধ্যে একজন না একজন খাওয়ার সময় প্রায় রোজই সামনে থাকে। আজ ছেলে-বৌদের নেমন্তন্ন আছে কোথায় যেন। কার যেন ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি, না জন্মদিন না ঐরকম কিছু। মনেও থাকে না নাম-টাম আর। প্রয়োজনও নেই।

টি ভি'র গাঁক-গাঁক আওয়াজ কান, চোখ এবং মস্তিষ্ককে ভরে রাখে। যখন টি ভি দেখেন না তখন মাথাটা ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে। এবং মাথাটা ফাঁকা থাকলেই, মাথার মধ্যে চিন্তাগুলো এমন এলোমেলো হয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে যে, তা বলার নয়। কখনও মনে হয়, মাকড়সার জালে জড়িয়ে যাচ্ছে মস্তিষ্ক। কখনও বা মনে হয়, প্রচণ্ড কালবোশেখী ঝড়ের মধ্যে পড়ে কুটোর মতো উড়ে যাচ্ছে তা। কখনও আবার মনে হয় নৌকাডুবি-হওয়া সাঁতার-না-জানা মানুষের মতোই তাঁর মস্তিষ্কটি ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে অথৈ কোনো নদীর জলের গভীরে। যেখানে চাপ চাপ বোতল-সবুজ নরম শ্যাওলা, প্রথম যৌবনের দাড়ির মতো নরম; যেখানে জলজ অন্ধকারের মধ্যে প্রতিসরিত হালকা হলুদ আর সবুজ-মেশা নরম আলো; প্রথম প্রেমিকার চিঠির মতো; অস্পষ্ট।

হলুদ আর কালো মেলালে সবুজ হয়। যাঁরাই ছবি আঁকেন তাঁরাই জানেন। কিন্তু সেটা তৈরি করা সবুজ। ঐ অবস্থার পরই মস্তিষ্ক যে গভীর সবুজ অন্ধকার নদীতলে হারিয়ে যায়, চারিয়ে যায়; সেই সবুজই আদিম সবুজ। মৌল তার অস্তিত্ব। কোনো শিল্পীরই তুলিতে সে জন্মায়নি। মস্তিষ্কের মধ্যের সেই জলজ সবুজের বোবা অন্ধকারকে বড়ই ভয় পান গানুবাবু।

জানালার ধারে দাঁড়াতেও উনি ভয় পান আজকাল। ভয় পান, আকাশের দিকে চাইতেও। ভয় পান একা একা বাথরুমে নিজের অশক্ত, বার্ধক্যপীড়িত থরথরিয়ে-কাঁপা পা দুটির উপর দ্বিধাভরে ভর দিয়ে দাঁড়ানো শরীরটার করুণ ছায়া আয়নাতে হঠাৎ দেখে। কারা যেন আয়নায় প্রতিফলিত তাঁর হাস্যকর কুদৃশ্য নগ্নতার চারপাশে রথীন মৈত্রর "দ্যা ড্রামার" ছবির মানুষগুলিরই মতো বেসামাল হাত-পা ছুঁড়ে নিঃশব্দে নাচে। প্রচণ্ড প্রমত্ততায় শব্দহীন কিন্তু চিৎকৃত গান গায় সেই ছবির মানুষেরা।

ভয় করে।

বড় ভয়। বড় একা লাগে।

মণি! তুমি কোথায় আছো গো এখন? ভয় কি কেটেছে তোমার? যেখানে গেছো, সে জায়গাটি কেমন? ভালো? লোডশেডিং আছে কি? ইনফ্লেশান? এই মারাত্মক ইনফ্লেশান? যা অবসরপ্রাপ্ত, অশক্ত, অসহায় মানুষদের গেঁটে বাতের চেয়েও অনেক বেশি কষ্ট দেয়? তাও কি আছে?

নাতি-নাতনীরা দল বেঁধে এল দাদুর খাওয়া দেখতে। মা-বাবারা বলে গেছে নিশ্চয়ই পার্টিতে যাবার সময়! এই এক ধারা হয়েছে আজকাল। গানুবাবুদের সময় 'নেমন্তন্ন'

www.BanglaBook.org

শব্দটার মানে ছিলো বাড়িসুদ্ধ সকলেরই নেমন্তন্ন। আজকাল কেউই আর নেমন্তন্ন বলে না। বলে, "পার্টি"। ছেলে-মেয়েরা সকলেই বাদ। ইংরেজ সাহেবদের সঙ্গেই সাহেবী কোম্পানিতে কর্মজীবনের পুরোটাই কাটিয়েছিলেন তিনি। তাইই জানেন যে, ইংরেজদের দোষ যেমন ছিলো, গুণও ছিলো অনেক। সেগুলোর কিছুমাত্রও না-নিয়ে খালি এই বাহ্য ব্যাপার আর ওর ওপর-চালাকিগুলোই নিলো ওরা। বোঝেন না। এখন আর বোঝার ইচ্ছেও নেই। লাভ কি?

নাতি-নাতনীরা টেবিলে বসে গল্প করছিলো নিজেদের মধ্যে। বোধহয় কর্তব্যর কথা মনে পড়ে যাওয়াতেই হঠাৎ বলল দীপা, ভাল করে খেও দাদু। পাতে নুন খেওনা একটুও। রুটিও ঠিক দুটোই। বুঝেছো। বলে গেছে মা।

গগ বললো, দীপাকে থামিয়ে দিয়ে অন্য কথার সূত্রে বলল, তুই যাই-ই বলিস দীপা, "ওয়েট আনটিল ডার্ক"-এর চেয়ে "ভার্টিগো" অনেকই ভালো ছবি। মানে, অনেক বেশি ভয়ের।

"ভয়" কথাটা অস্পষ্ট শুনলেন গানুবাবু। খেতে খেতে মুখ তুলে তাকালেন নাতি-নাতনীদের দিকে।

দীপা বলল, হিচকক-এর "বার্ডস" দেখেছিস দাদা? ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবি।

যা! যা! অজ্ঞান হওয়া অত সহজ ব্যাপার নয়। গগ বললো।

"আলতোবেলী" বলে ব্যাপার! ঠাট্টার গলায় দীপা বললো। তারপর বললো, তুই "টু চেইজ আ ক্রুয়েড শ্যাডো" দেখেছিস। অনেক পুরোনো ফিল্ম। কাল নমুদের বাড়িতে ভি. সি. আর-এ দেখলাম ফ্যানটাস্টিক।

গানুবাবু হাই-পাওয়ারের চশমার মধ্য দিয়ে নাতি-নাতনীদের সুন্দর উজ্জ্বল ফুলের মতো আলো-ঝলমল মুখগুলির দিকে চেয়েছিলেন। ভাবছিলেন, ভয়ের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে ওদের আসলে কোনো ধারণাই নেই বলেই ভয় নিয়ে ওদের এত বিলাস। প্রেমেরই মতো, ভয়ও অল্পবয়সী ওদের কাছে রহস্যময় ভালোলাগা এবং খারাপ লাগাতেও মাখামাখি গা-সিরসির-করা এক অনুভূতি। "ভয়" যে কাকে বলে, তা জানলে ওরা সিনেমাতে দেখা ভয় নিয়ে এতো উচ্ছ্বসিত হতো না।

গানুবাবু জেনেছেন ভয় কাকে বলে। ভয়ের সঙ্গেই তাঁর ওঠা-বসা এখন।

গানুবাবুর খাওয়া শেষ হবার আগেই অনিচ্ছুক কর্তব্য-করতে-আসা নাতি-নাতনীরা কলকল করতে করতে ওপরে চলে গেলো।

তেতলাতে ছোট ছেলে থাকে। চারতলাতে বড় ছেলে। মেজ আজ আঠাশ বছর ন্যু ইয়র্কে। অ্যামেরিকান-চাইনীজ একটি মেয়ে বিয়ে করেছে পাঁচ বছর হলো। একবার মাত্র এসেছিলো। ভালো আমেরিকান চপস্যুউই রাঁধে সুসান। রোম্যান ক্যাথলিক ওরা।

মুখ ধুয়ে এসে খাটে বসে ছোট তোয়ালে দিয়ে ভাল করে হাত মুছছিলেন গানুবাবু। ঠিক সেই সময়েই লোডশেডিং হয়ে গেলো। অন্ধকার। গভীর অন্ধকার। বাড়ির সামনের মস্ত, প্রায় তাঁরই সমসাময়িক বকুল গাছটার বিস্তারিত ডালপালা ভ্যাপসা গরমের রাতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যেন গানুবাবুর মুখের দিকেই চেয়ে আছে তার অগণ্য পাতাদের বুকের মধ্যিখানে বসানো অলক্ষ্যে লুকিয়ে-রাখা অসংখ্য চোখগুলি মেলে। বলছে যেন, আছো কেমন?

কে যেন হঠাৎই খোলা জানালার পাশ থেকে সরে গেল। কে? কে তুমি?

www.BanglaBook.org

বিমুর মতো গলায় কে যেন হঠাৎ পাশ থেকে বলে উঠলো কী রে শালা গানু! কনটেমপ্লেশান করছিস?

চমকে উঠলেন গানুবাবু। বাঁধানো দু পাটি দাঁতই খুলে অন্ধকার হাতড়ে কাচের বাটিটা বের করে বাটির জলে ডুবোলেন।

হুবহু বিমুরই মতো গলা। তাঁর কলেজের বন্ধু। খুবই মজার ছেলে ছিলো। সব কথার আগে একটা করে "শালা" বলতো ও। অথচ ওরকম ভদ্র ছেলে হয় না। দারুণ খেলতো ফুটবল। ঐ খেলার জোরেই চাকরিও পেয়েছিলো রেলে। তারপর নিজ-যোগ্যতাতে উন্নতিও করেছিলো খুবই। সিগারেট খেতো প্রচণ্ড। যাকে বলে চেইন-স্মোকার। জিভে ক্যান্সার হয়েছিলো। ধরাও পড়লো গানুবাবুরই সঙ্গে বাইরে গিয়ে। পরিষ্কার মনে আছে। মনে হয়, সেদিনের কথা। দুজনে গয়ায় পিণ্ডি দিতে গেছিলেন নিজের নিজের বাবার মৃত্যুর পঁচিশ বছর পর। ওঁদের দুজনের বাবাই একই বছরে মারা যান। গয়াতেই জিভের জ্বালা প্রথম ফীল করেন বিমু। গানুবাবুই জোর করে ধরে নিয়ে যান ডাক্তারের কাছে। গানুবাবুদের কোম্পানির সেলস রিপ্রেজেনটেটিভের দাদা ডাক্তার পাণ্ডে ভাল করে বিমুকে দেখে বলেছিলেন কলকাতায় গিয়েই ক্যান্সার-স্পেশালিস্টকে দেখাতে। গানুবাবু আর জুনিয়র পাণ্ডেকে আলাদা করে পাশের ঘরে ডেকে ডাক্তারবাবু বলেছিলেন যা বলার ফিসফিসে গলায়। তখন বিমুর কতই বা বয়স। পঁয়তাল্লিশ-টয়তাল্লিশ হবে।

কলকাতায় ফিরেই চিকিৎসা শুরু হলো। যতখানি ভালো করে সম্ভব। ভাই-বোনেরা সেবা যত্নর কোনোরকম ত্রুটি করেনি। দেখতে দেখতে অতবড় সুন্দর সুগঠিত হাসিখুশি মানুষটা চোখের সামনেই ছোট্ট কালো একটি চামচিকের মতো হয়ে গেলো। মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল ছিল। উঠে গেল তাও সবই। কী বীভৎস চেহারাই যে হয়েছিল বিমুর, এখনও মনে করলে ভয় করে গানুবাবুর। ভয়ে, দুঃখে, গানুবাবু শেষকালে ওকে দেখতে যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছিলেন। বন্ধুদের মুখে খবর নিতেন। তবে, এমনই ঘটেছিলো যে, ঠিক মৃত্যুর দিনটিতেই গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন উনি। বিমুর চোখ-মুখে কী যে অস্বাভাবিক এক ভয় ফুটে উঠেছিলো সেদিন। কী অবিশ্বাস্য এক অসহায়তা! সন্ধে হয় হয়, সেইসময় হঠাৎই একবার হাত তুলে খোলা জানালার দিকে দেখালো ও। বসন্তর দিন, তখনও অনেক আলো ছিল। একতলায় ওর ঘরেই শুয়েছিলো ব্যাচেলর বিমু। ওর রামের মতো দাদা, বৌদি এবং দিদিরা সব ঘিরে ছিলে ওকে। বিমু ফিসফিস করে জানালার দিকে চেয়ে অদৃশ্য কাদের যেন বলছিলো : আঃ, একটু দাঁড়াও না। প্লিজ। একটু দাঁড়াও। যাচ্ছি, যাচ্ছি, আমি।

বিমুর বাল-বিধবা বড়দি অবাক হয়ে শুধিয়েছিলেন, কার সঙ্গে কথা বলছিস রে? বিমু?

ঐ যে। ওরা। ওরা নিতে এসেছে আমাকে। ঐ যে! দেখতো পাচ্ছো না তোমরা?

কারা? কী যে বলিস পাগলের মতো।

ঐ যে! ওরা। যারা সকলকেই নিয়ে যায়। নিতে আসে। তর সইছে না ওদের। আঃ। দাঁড়াও, দাঁড়াও একটু...আমি তো যাবই...

এমন করে বলেছিলো বিমু যে, গানুবাবুর মনে হয়েছিলো, যেন বরই নিতে এসেছে কনের বাড়ির কেউ।

তার পরই, হঠাৎ; যাই! যাইরে দাদা। বৌদি। দিদি। ঘুনটুরে, যাই। চলিরে গানু। চললাম। চললাম সবাই। এই কথা কটি বলা শেষ করেই মাথাটা বালিশে লুটিয়ে দিয়েছিলো বিমু। মুখটি বিকৃত হয়ে গেছিল।

www.BanglaBook.org

বিমুর দাদা সঙ্গে সঙ্গেই গিয়ে যে জানালার দিকে চেয়ে বিমু এসব বলছিলো সেই জানালাটি সশব্দে বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

যে ঐ দেশে একবার চলে যায়, সে ফিরে আসুক তা কারোই অভিপ্রেত নয়। তার প্রিয়তম জনেরও না।

বিমু বলতো গানুবাবুকে : চল শালা! আজ শিশির ভাদুড়ীর থ্যাটার দেখে আসি। একই মেস-এ থাকতো দুজনে। কোনোদিন বলতো। চল আজ ফুটবল খেলা দেখে আসি। ইংল্যান্ডের হাইল্যান্ডার্স টীম এসেছে। মোহনবাগানের সঙ্গে খেলা। ব্যাকে গোষ্ঠ পাল, গোলে মনা গুহ। খেলা তো দেখতে হবে ব্যাক আর গোলকীপারেরই। ওরা তো বুট পরে মেরে ছারখার করে দেবে খালি-পায়ে আমাদের দিশি প্লেয়ারদের।

খুব প্রাণ ছিলো বিমুটার। চিরদিনই। রসিকতাতে ওর জুড়ি ছিল না। যারা ওকে ডেকে নিয়ে গেলো অত কষ্ট দেবার পর; যারা এসেছিলো, তারা কারা? আজও জানা যায়নি।

পরজন্মে-ফন্মে কোনোদিনও বিশ্বাস করেননি গানুবাবু। বিজ্ঞানের ছাত্র তিনি। ধর্ম মানেন না। পুজো করেন না। গুরু-ফুরুতেও বিশ্বাস করেন না। ঐসব দুর্বলতা বরং তাঁর চলে যাওয়া স্ত্রী মণির ছিলো। মণিদের পারিবারিক গুরুর কাছেও দীক্ষা নিতে দেননি গানুবাবু মণিদীপাকে। খুবই দুঃখ ছিলো এই কারণে মণির। মানুষের যে একটা মাত্রই জীবন একথা তিনি চিরদিনই বিশ্বাস করে এসেছেন। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই জীবনের শেষ। রেশ থাকে না কিছুমাত্রই। এইই জানেন। এবং মানেনও তিনি।

কিন্তু...

মণির মৃত্যুর সময়ও উনি নার্সিং-হোমে মণির একেবারে পায়ের কাছেই বসেছিলেন। চারপাশে দাঁড়িয়েছিলো ছেলে-বৌ মেয়ে জামাইরা। শেষ সময়ে বিমুরই মতো মণিও হঠাৎ এক ঝটকাতে খোলা জানালার দিকে তাকিয়েছিলো। পরমুহূর্তেই ওর মুখ-চোখ ভয়ে একেবারে কুঁকড়ে গিয়ে নীল হয়ে গেছিলো। জিভটা বেরিয়ে এসেছিলো হঠাৎ করে। যেন কালী মায়ের জিভ। মণির সেই প্রচণ্ড ভয়ার্ত দৃষ্টিটি গানুবাবুর দুচোখে চিরদিনের মতোই আঁকা হয়ে আছে। কী দেখেছিলো মণি মৃত্যুর মুহূর্তে? জানালার দিকে তাকিয়েছিলোই বা কেন সে? হঠাৎই অমন ভয় পেয়েছিলো কেন?

কীরে শালা? কনটেমপ্লেশান করছিস?

আবার বললো বিমু।

এবার যেন একেবারে গানুবাবুর ঘাড়ের পেছনে দাঁড়িয়েই।

গানুবাবুকে চুপ করে কিছু ভাবতে দেখলেই বিমু ঐ বাক্যটি বলতো ঠাট্টা করে। "কী রে শালা! কনটেমপ্লেশান করছিস?"

বকুল গাছের ঘন সন্নিবিষ্ট পাতার ভিড়ের গভীর থেকে কোনো শব্দ সমষ্টি, ঝা ঝড়, বা অজস্র ফুলের গন্ধ যেন এক দমকে ভেসে আসতে চাইছে গানুবাবুর দিকে। কিন্তু হাওয়া নেই বলেই যেন তারা থমকে আছে।

হাওয়া দিল। লোডশেডিং হলেই হাওয়া দিতে শুরু করে। আলো যখন জ্বলে তখন বোঝা পর্যন্ত যায় না এত কোটি-কোটি ওয়াটের আলো আর লক্ষ লক্ষ ফ্যানের আওয়াজ কলকাতার সব মিষ্টি হাওয়াকে আর নিথর নিস্তব্ধতাকে কী ভাবে খুন করে যায় প্রতিমুহূর্তে। লোডশেডিং হলেই তখন বোঝা যায় পৃথিবীতে কত শান্তি, কত হাওয়া।

বেশ গানের গলা ছিল মণির। বিমু বলতো, মণিবৌদি, এ জন্মে তুমি তো গানুর মতো

www.BanglaBook.org

বেরসিককে বিয়ে করে জীবনটা মাটিই করে গেলে। পরজন্মে তোমাকে আমিই বিয়ে করবো। দেখো। তখন দেখবে জীবন কাকে বলে! আমি তো স্বর্গে পৌছেই রিসেপসনিস্টের কাছে তোমার ঘরের নাম্বার খোঁজ করবো।

মণি হাসি হাসি মুখ করে বলতো, আমি রাজি নই।

কেন? বিমু বলতো, কপট রাগের স্বরে।

মণি বলতো, যে-কোনো হোটেলেরই ঘরের দরজাতে চাবি লাগিয়ে চাবি ঘোরাবার সময়ই মন বড় প্রত্যাশায় ভরে ওঠে, মন ভাবে; এবারে কী নাকি যেন দেখব ভিতরে! কিন্তু ঘর খুললেই দেখা যায় যে, সব ঘরই একই রকম। একই ধরনের ফার্নিচার, কার্পেট, সোফা, বিছানা, বালিশ। নতুনত্ব নেই কিছুই। শুধুই হতাশা, একঘেয়েমি। সব হোটেল, সব ঘরই এক।

আহা! স্বর্গের হোটেলের কথা তুমি জানছোই বা কী করে! তাছাড়া হোটেলে ভালো না-লাগে তো মন্দাকিনী নদীর পাশের ঘাসেই বসবো তোমাকে নিয়ে।

বিমু, না-দমে বলতো।

এতো ফাজিল না! বলেই মণি উঠে যেতো, চা বা খাবার আনতে।

দেখা কি হয়েছে মণির সঙ্গে বিমুর? এতদিনে? কে জানে! আগে গেছে বিমুই। স্বর্গের রিসেপশানে কি অপেক্ষা করে ছিলো ও মণির জন্যে নিজের ঘরের চাবি হাতে নিয়ে? কে জানে? কেন এমন মনে হয়? এসব কথা কেন মনে আসে বারবার? বিজ্ঞানে, আধুনিক প্রযুক্তিতে, যন্ত্রসভ্যতায় মানুষের অসীম জ্ঞানে এবং সর্বজ্ঞতায় প্রচণ্ড বিশ্বাসী গানু রায়ের মনে যে কেন এসব আজগুবী ভাবনা আসে?

ডাড়ু ও ডাড়ু। টুমি বয় পেও না কিন্টু অণ্ডকারে। আমরা আলো এনেচি।

দুখিয়ার কোলে চড়ে ঘরে এসে, হাতে একটি ছোট্ট জ্বালানো-টর্চ ধরে তিন বছরের নাতনীটি বললো, গানু রায়কে।

ওকে গানুবাবুর পাশে, খাটে বসিয়েই দুখিয়া হ্যারিকেনটা জ্বালালো।

ইতিমধ্যে সামনের মারোয়াড়ীর বাড়িতে জেনারেটরও চালানো হয়েছে। ওদের বাড়ির আলোতেই এই বাড়ির এ দিককার ঘরগুলোর অন্ধকার ঘোচে। তবে বড় আওয়াজ। বাড়িটি ছিল প্রফেসর সেনগুপ্তর। হঠাৎ সেরিব্র্যাল অ্যাটাকে মারা যান। ছেলেরা কেউই পায়ে দাঁড়ালো না। মারোয়াড়ী মিঃ আগরওয়ালা কিনে নিয়েছেন। এ-পাড়ার অর্ধেক বাড়ি ওঁরাই কিনে নিয়েছেন, ওঁর সাড়ুভাই, শালা, ভাই-ভাতিজা বেচারাম বাঙালিদের কাছ থেকে, একটি একটি করে।

দুখিয়া হ্যারিকেন জ্বেলে চলে গেলো। কিন্তু আলো এসে গেলো একটু পরই। এবং আলো আসার সঙ্গে সঙ্গে ছোট বৌমাও এলো। ঘরে ঢুকেই বললো, বাবা এক্ষুনি শুনে এলাম উকিলকাকা মারা গেছেন।

অ্যাঁ? তুমি এত তাড়াতাড়ি এলে?

গানুবাবু শুনতে না পেয়ে বললেন।

এলাম, আমার শরীরটা ভালো লাগছে না তাই। উকিলকাকা মারা গেছেন।

অ্যাঁ? কী বল?

হ্যাঁ বাবা।

রণেন?

www.BanglaBook.org

হ্যাঁ বাবা।

কখন?

একটু আগে। আপনি কি যাবেন? তাই-ই ও গাড়ি পাঠিয়ে দিলো আমাকে দিয়ে।

আমি? না ন্না। না! আমি যাবো না। কী দেখতে যাবো?

ভয়ার্ত, বিরক্ত এবং অসহায়তা মাখা গলায় বললেন উনি।

একটু চুপ করে থেকেই বললেন, কোথায় শুনলে।

সিম্পিদের বিয়ের দশ বছরের পার্টিতে গেছিলাম। দুবুদা ফোন করে জানালো।

তোমরা কাল সকালেই যেও। সিধে নিয়ে যেও। ফুল। টাকা নিয়ে যেও আমার কাছ থেকে। গানুবাবু স্বগতোক্তির মতোই বললেন। ওঁর যতটুকু সঞ্চয় আছে তা প্রিয়জনের মৃতদেহের ফুল কিনতেই লাগবে। দীর্ঘ জীবন বড়ই কষ্টের।

কবে যেন এসেছিলো রণেন। অনেকক্ষণ গল্প করে গেলো?

গানুবাবু জিগগেস করলেন ছোটো বৌমাকে।

এই তো পরশু দিন।

পরশু?

হ্যাঁ বাবা।

অ।

ছোট বৌমা চলে গেলো। হ্যারিকেনটা নিবিয়ে দিয়ে।

রণেন! রণেন ঘোষও। অনুজের মতো যদিও কিন্তু ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিলো ও গানুবাবুর। নামী উকিল ছিলো। সিভিলই করতো, শেষের দিকে ট্যাক্সও করছিলো কিছু কিছু। গত সপ্তাহেও কোর্টে গেছে। রোভার, মানে স্ট্যান্ডার্ড টু থাউজ্যান্ড গাড়ি কিনেছিলো একটা অল্প ক'দিন হলো। টেনিস খেলতো এই সেদিনও। রণেনও যে কোনোদিন মরবে বা মরতে পারে তা ভাবতেও পারেননি গানুবাবু। বয়সে ছোট ছিল রণেন গানুবাবুর চেয়ে বছর দশেকের। মণির সঙ্গে রণেনের একটা প্লেটনিক প্রেমের সম্পর্কও ছিলো। বৌমারাও জানে। রণেনের স্বভাবের জন্যেই বৌমারা সকলেই ওকে খুবই পছন্দ করতো। ভাবতেই পাচ্ছেন না। পরশুদিনও ঐ চেয়ারটাতে বসে কত হাসি-ঠাট্টা করে গেলো। ইয়ার্কি মেরে বলেছিলো গানুদা, আমি একজন রক্ষিতা রেখেছি। তোমাকেও নিয়ে যাবো, দেখবে তুমি গেঁটে বাত, হার্টের ব্যামো সব হাপিস করে যৌবন ফিরে এসেছে তোমার।

এবারে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লেন গানুবাবু। দুখিয়ার কথা ছিলো, মশারিটা গুঁজে দিয়ে যাবার। এলো না। এখন আর কেউই মানে না তাঁকে। শরীরের জোর নেই, টাকার জোর নেই, কাউকেই তার কিছু দেবার ক্ষমতা নেই। বাড়িটাও দেশে-থাকা দু ছেলেকে লিখে দিয়েছেন। তবু টি-ভি'টা ছিল, নাতি-নাতনীরা; তাই...

কিন্তু কোথায় গেল রণেন? গেলোটা কোথায়? মণি? বিমু? মরে-যাওয়া মানুষেরা সব কোথায় যায়? সেদিন পাশের বাড়ির ঘোষ সাহেবের তিরিশ বছরের বৌমাটি এমনিই হঠাৎ চলে গেলো। হার্ট-অ্যাটাক। গভীর রাতে অর্গান বাজিয়ে গান গাইতো মেয়েটি। "তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূরে আমি ধাই, কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই..."। রমা না ক্ষমা কী যেন নাম ছিলো, মনে থাকে না। ভারী মিষ্টি মেয়ে। তিরিশ বছরে কেউ কি যায়? না যাওয়া উচিত কারো? এই ছিলো; এই নেই। শরীরটা থেমে গেলো, চোখ বুজে গেলো কিন্তু মস্তিষ্ক? মন? তারাও কি অমনিই চিরদিনের জন্যে সত্যিই থেমে

www.BanglaBook.org

যায়। আত্মা বলে কিছু নেই তা তিনি জানেন। ঈশ্বরফিশ্বরও মানেন না, ব্রহ্মাও নয়। কিন্তু তবে কঠোপনিষৎ-এ অতসব কথা লেখা হলো কেন? কেন লেখা হলো গীতায়। হিন্দুদের সব প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে? সাহেবদের বাইবেল কেন বললো মৃতকে কবর দেওয়ার সময় এই মন্ত্রোচ্চারণ করবে

"উই দেয়ারফোর কমিট হিজ বডি ট্যু দ্যা গ্রাউন্ড, আর্থ টু আর্থ, অ্যাশেস ট্যু অ্যাশেস ডাস্ট টু ডাস্ট ইন শিওর অ্যান্ড ইটার্নাল হোপ অপ রেজারেক্সান টু ইটার্নাল লাইফ।"

"ইটার্নাল লাইফ" বলে কি আছে কিছু?

কঠোপনিষৎ বলছে

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্—
নায়ং কুতশ্চিন্ন বভুব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥"

কেন বললো এই কথা?

পুনর্জন্ম কি আছে? সত্যিই কি আত্মা অন্য শরীরে প্রবেশ করে থেকে যায় পৃথিবীতে?

ধ্যাত! এইসব আজেবাজে বুজরুকিতে বিশ্বাস করেন না গানুবাবু। আধুনিক তিনি।

কিন্তু আজকাল ভয়ও করে খুব। কোথায় যাবেন তিনি এই চিন্তাটা সবসময় জোঁকের মতোই আঁকড়ে থাকে। সব শান্তি শুষে খায়! অনুক্ষণ। রণেন কোথায় গেলো? যাবে কি কোথাও। নাকি থেমেই যাবে? জাস্ট থেমে যাবে? শরীরটা থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এতদিনের মনটা, এত অভিজ্ঞতাময় তীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক সবই কি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে? থাকবে না একটুও?

মরা মানুষেরও মুখে যখনই চেয়েছেন গানুবাবু, মনে হয়েছে মানুষটি ঘুমিয়েই পড়েছে শুধু। জীবনের পথে এতদিনের পথ চলা শুধু কি এইভাবে হঠাৎ একদিন থেমে যাওয়ারই জন্যে? বিজ্ঞান তো নিজেকে নিজে বাতিল করে মাঝে মাঝে। বিজ্ঞানীরাও বলেন, যা ধ্রুব বলে জানতেন, তা ধ্রুব নয়। "স্থবির জ্ঞান" বলে কোনো কথা নেই। না! বিজ্ঞানের জগতেও নেই। জীবনের সঙ্গে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বদলে যায়, বদলে যায় তার পরিধি, রকম। থেমে থাকে না এক জায়গাতে। বিজ্ঞান যা জেনেছে, এই ব্যাপারে, তাই-ই কি চরম জানা? শেষ জানা?

গানুবাবু ভাবেন। নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলেন মুখ গোঁজ করে।

হাওয়া বইছে এলোমেলো। বৌমা ঘরে আসার পর দু-ঘণ্টা সময় চলে গেছে। আগরওয়ালাদের বাড়ির গ্রান্ডফাদার ক্লক বললো।

ঝড় উঠতে পারে। রাত গভীর। ঘুম নেই। রণেনের খবর শোনার পর ঘুম আসেনি। ভাবনা উঠলে সময় উড়েও যায়, মেঘের মতো; বোঝা পর্যন্ত যায় না কী করে সে গেলো। ঝড় উঠলেই রাস্তার আলোটা দোলে আর বকুলগাছের ডালপালার ছায়াগুলো গানুবাবুর সাদা দেওয়ালে নানারকম নাচ নাচে নিঃশব্দে। কালো কালো ছায়ামূর্তির মতো। ভয় করে তখন খুবই।

সাহসী গানুবাবুর সত্যিই বড় ভয় করে আজকাল।

বিমু কাদের দেখেছিলো জানালাতে? গানুবাবু তো ওর সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন। এ-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথা তো শোনা-কথা নয়। চুলহীন, শিশুর মতো ছোট্ট হয়ে-যাওয়া শরীরের বিমু ফিসফিস করে বলেছিলো "একটু দাঁড়াও। আসছি, আসছি আমি।"

মনিই বা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে কাদের দিকে তাকিয়েছিলো জানালাতে? কোন ভয়ে তার মুখ অমন আতঙ্কিত হয়ে গেছিলো? জিভ বেরিয়ে পড়েছিলো বীভৎসভাবে অমন হঠাৎ করে? কেউ কি সত্যিই নিতে আসে যাওয়ার সময়?

টলস্টয়ের একটা গল্প পড়েছিলেন গানুবাবু অনেকদিন আগে। "হোয়াট মেন লিভ বাই"। তখন ভালো লেগেছিলো খুবই। এই মুহূর্তে গল্পটার কথা মনে পড়ে গা ছমছম করতে লাগলো। ওর জীবন শেষ হয়ে এসেছে। এখন "হোয়াট মেন লিভ বাই" তা নিয়ে কোনো ঔৎসুক্যই নেই ওঁর আর।

কাল থেকে দুখিয়াটাকে এই ঘরেই শোওয়াবেন। অথবা, কোনো নাতিকে। শিশুরই মতো হয়ে গেছেন তিরাশি বছরের গানু রায়। একা শুতে বড়ই ভয় করে।

খোলা জানালার পাশ থেকে কে যেন হঠাৎ হাতছানি দিলো। কে? কথা বলছে কি কেউ ফিসফিস করে? টি-ভি'তে কেন যে সারারাতই প্রোগ্রাম থাকে না! থাকলে, এই ভয়ের মুহূর্তে টি-ভি'টা খুলে দিয়ে বসে থাকতেন সামনে। ঘরে কেউই না থাকুক রঙিন পর্দায় তো অনেকেই থাকতো। ভল্যুমটাকে খুব বাড়িয়ে দিতেন। ঘুমুবার অসুবিধা হতো হয়তো বাড়ির অন্য বাসিন্দাদের। হলে হতো। তাঁর জীবনটা তাঁর কাছে যে খুবই দামী। তাঁর বয়স যতই হোক। জীবনের চেয়ে দামী আর কি আছে! পৃথিবীর সব সম্পর্ক, সব মহার্ঘ জিনিসের থেকেও এই পুরনো জীবনটা অনেকই দামী।

রণেন! কাল দাহ করবে নিশ্চয়ই ওকে নিমতলায়। সকালে।

রণেন!

হঠাৎই এক বীভৎস চিৎকারে চমকে উঠলেন গানুবাবু। বড় রাস্তা থেকে একদল জন্তু আওয়াজ দিলো বললো হরবি বোল..

কী সাংঘাতিক। কী প্রচণ্ড অশালীন। এই জন্তুগুলোকে পুলিশের উচিত, গুলি করে মারা। পৃথিবীর কোনো সভ্য, এমন কী অসভ্য দেশেও মৃতর প্রতি এমন অসম্মান কখনোই দেখানো হয় না। ছিঃ ছিঃ। এ কি কোনো সভ্য দেশের শিক্ষিত মানুষদের শহর! বাঙালি ছেলেরাই তো শব বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। মৃতকেও কি ন্যূনতম সম্মান...?

একথা ভাবতে ভাবতেই আবারও ঐ চিৎকার হলো। আর সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করতে লাগলো গানুবাবুর। ভাবলেন, বিছানা ছেড়ে উঠে একটু জল খান। কিন্তু হাত-পা সব অবশ হয়ে এলো। ঘামতে লাগলেন খুব। তারপরে উঠেই পড়লেন এক ঝটকা দিয়ে। হয় এসপার নয় উসপার। এই জীবন বইবার কোনো মানে নেই। নিজের কাছে এবং অন্যদের কাছেও কোনো প্রয়োজন নেই তাঁর। তবু, এই খোলসটাকে ছাড়তে বড় ভয় করে। জীবন ছেড়ে যাওয়ার দুঃখ নয়; অজানা গন্তব্যের ভয়। বড় ভয়। রুখু প্রান্তরের সাপেরই মতো যদি সহজেই খোলসটা ছেড়ে যেতে পারতেন! কিন্তু খোলসটাতেই তো আটকে পড়ে থাকার কথা। বিজ্ঞান তো আত্মাকে অস্বীকারই করে। তবে?

টেবিল-লাইটের সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে উঠে পড়লেন উনি মশারির ব্যূহ পেরিয়ে। সরবিট্রেট খেলেন একটা। জল খেলেন ঢকঢকিয়ে। তারপর পা টেনে টেনে জানালার পাশে এসে দাঁড়ালেন।

গভীর রাতের পথটা আলোতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ট্রাম-লাইন চকচক করছে। বন্ধ

www.BanglaBook.org

দোকানগুলোর নানারঙা সাইনবোর্ডের উপরে চকচক করছে আলো। একটি কালো পাগল এবং একটি কালো কুকুর ল্যাম্পপোস্টের নিচের আবর্জনা থেকে খাবার খুঁটে খাচ্ছে।

ওরাও একদিন মরবে। ওদেরও ডাক দিয়ে যাবে কেউ হাতছানি দিয়ে। বিমু আর মণিরই মতো। রণেনকেও কি ডেকেছিলো কেউ? নিঝুম রাতের উথালপাথাল হাওয়াতে গা সিরসির করছে গানুবাবুর। হঠাৎই মোড়ের মাথায় দেখা গেলো আসছে ছোঁড়ারা। অথবা জানোয়ারেরা। বাঙালির কুলাঙ্গার, কলকাতার বেজন্মারা। বৃদ্ধর শব। গানুবাবুরই সঙ্গী হবেন। ওদের দেশী মদে বা ড্রাগে মত্ত অবস্থায় চিৎকারে আর প্রমত্ততার দুলুনিতে মৃতর মাথাটা জোরে জোরে আন্দোলিত হচ্ছে এপাশে ওপাশে। মৃতদেহটি পড়েই না-যায় খাটিয়া থেকে। "বললো হরির বোল, বলরে শালা জোরসে বল। বোল্লো হররি— হররি বোল।"

গানুবাবুর ছোটো বৌমা, তিরিশ বছরের চৈতালী আচমকা গাঢ় ঘুমের মধ্যে হরিধ্বনি শুনে জেগে উঠলো। হরিধ্বনি তো এ নয়, হার্টফেল করিয়ে মারার মতো জানোয়ারসুলভ হুংকার। পুলিশদের সত্যিসত্যিই উচিত এই ছেলেগুলোকে গুলি করে মারা।

বাইরে গভীর রাত।

চিৎকারটা হতেই লাগল। হতে হতে একসময় মিলিয়েও গেল কিন্তু ঘুম আর এলো না চৈতালীর। বারে-বারেই উকিলকাকার মুখটা ভেসে উঠছিলো বন্ধ চোখের সামনে, দাহ, কাল সকালে। ভোরে উঠেই ওরা সবাই যাবে। আসলে রাতেই যাওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু ওরা দু ভাই-ই বেশ ভালো হুইস্কি খেয়ে ফেলেছিলো খবর পাবার আগেই। এই অবস্থাতে মৃতর বাড়িতে যাওয়া যায় না। ওদের সম্পর্কও এমন নয় যে, নাম প্রেজেন্ট করেই চলে আসবে। উকিলকাকা এই বাড়ির একজনের মতো ছিলেন।

ভোর চারটেতেই উঠে, যাবে ওরা। নিউ মার্কেটে ফুলের কথাও, খবরটা শোনামাত্রই ফোন করে বলে দিয়েছে। ফুল পৌঁছে গেছে রাতেই।

পরশুদিনও মানুষটি এসে কত মজা করে গেলেন। কে বলবে যে, বাহাত্তর বছর বয়স হয়েছে। ভীষণ প্রাণবন্ত ছিলেন মানুষটি। যেখানে থাকতেন, সেই জায়গাই হাসিতে, গল্পে, মুখর হয়ে উঠতো।

চৈতালীর ভয় করতে লাগলো এমন চিৎকারে ঘুম ভেঙে যাওয়াতে। পাশ ফিরে শুয়ে শক্ত হাতে তার স্বামীকে জড়িয়ে ধরে দীর্ঘশ্বাস ফেললো একটা। হঠাৎই মনে হলো যে, একদিন-না-একদিন প্রত্যেক মানুষকেই মরতে হবে। এমনকি তাকেও। জন্মালেই, প্রত্যেক জীবেরই শেষ গন্তব্য মৃত্যু।

কিন্তু মৃত্যুর পর? মরে কোথায় যায় মানুষ? ঝড়ে জলে, রোদে? পাহাড়ে, সমুদ্রে, একা একা? অন্ধকারে? ভয় করে ভাবলেই? পথ চেনা নেই। কোথায় যেতে হবে? কোথাও কি যেতে হয়ই? না, সবই ফুরিয়ে যায় শরীরটা ছাই হলেই?

বড় ভয় করতে লাগলো চৈতালীর। স্বামীকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো ও। জীবু হুইস্কির নেশাতে বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছিলো। তার ঘুম ভাঙলো না। ভয় তাতে বেড়ে গেলো আরও। চৈতালী নিজেকে বললো, আর যে মরে মরুক, ও নিজে কোনোদিনও মরবে না। চিরদিনই বাঁচবে। পারবেই না যেতে এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে ; খোকনকে ছেড়ে।

অসম্ভব!

একটা বেড়াল কেঁদে উঠলো দত্তসাহেবের বাড়ির গ্যারাজের ছাদ থেকে। তারপর সেটা

www.BanglaBook.org

কাঁদতেই থাকলো। আজ নিশ্চয়ই অঘটন ঘটবে কিছু। কী। কী?

জীবুর পিঠের মধ্যে মুখ গুঁজে ঘন, নিথর হয়ে শুয়ে রইলো চৈতালী। ওর চোখের জলে পিঠ ভিজে গেলো জীবুর। তবু তার ঘুম ভাঙলো না। হুইস্কি তাকে জীবন এবং মৃত্যুর হিসেবের অন্য পারে পৌঁছে দিয়েছে কয়েক ঘণ্টার জন্যে।

সাহেব কোম্পানিতে চাকরির ইন্টারভ্যু যেদিন দিতে যান সেদিন তাঁর ঠিক আগে ডাক পড়েছিলো যাঁর তার নামটি আজও স্পষ্ট মনে আছে গানুবাবুর। হিতেন গুহঠাকুরতা। খুবই ভয় করছিলো সব ক্যাণ্ডিডেটেরই। ঝকঝকে বাদামী বার্নিশের পালিশ-করা মস্ত বার্মা-সেগুনের ভারী দরজা। ব্রাসো দিয়ে চক্‌চকে করা পেতলের নব। করকরে করে মাড় দিয়ে ইস্ত্রি-করা, ধবধবে সাদা আর লাল উর্দী-পরা চাপরাসী নাম ডাকছিলো একেক জনের। সাঁতরাগাছির ওলের মতো গায়ের চামড়ার লালমুখো সাহেবরা বড় বড় বাদামী গোঁফ নিয়ে জুতো মসমসিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিলো। ঐ বন্ধ দরজার আড়ালের ঘরটার ভেতরে কি আছে? কি হচ্ছে সেখানে? তা বিন্দুমাত্রও জানা ছিলো না বলেই অত ভয়। সামনের দরজা দিয়ে ঢুকিয়ে নিয়ে প্রত্যেককে ঘরের ভিতরের অন্য দরজা দিয়ে বের করে দেওয়া হচ্ছিলো। যাদের ডাক পড়েনি তাদের জানার উপায় ছিলো না কোনোই, কী হচ্ছে ঐ ঘরে? হিতেন গুহঠাকুরতা যখন ইন্টারভ্যু দিতে ঘরে ঢুকছিলেন তখন হাত নেড়েছিলেন গানুবাবু। কাঁপা-কাঁপা নার্ভাস হাতটি নাড়িয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছিলেন "বেস্ট অফ লাক"।

চাকরিটা বোধ হয় হয়নি হিতেন গুহঠাকুরতার। হলে, এই দীর্ঘ চাকরি-জীবনে তাঁর সঙ্গে একবার অন্তত দেখা হতো, যে ডিপার্টমেন্টেই চাকরি হোক না কেন। বাকি জীবনেও কখনও দেখা হয়নি আর তাঁর সঙ্গে। না। পথে-ঘাটেও নয়।

জানালা দিয়ে মুখ ঝুঁকিয়ে দেখলেন গানুবাবু। মৃত মানুষটির মুখটি কেমন তা বোঝা গেল না। একে চোখে ভালো দেখেন না, তার অনেকই দূর। মৃতদের মুখ অবশ্য মৃতদের মতোই দেখতে হয়। মুখের আমি মুখের তুমির ব্যাপার নয়। জীবিত মানুষদের মুখের সঙ্গে মৃত মানুষের মুখের তুলনা চলে না কোনোমতেই।

শবের মাথাটা এখনও নড়ছে। নড়েই চলেছে। হাত তুললেন গানুবাবু। জানালার গরাদের মধ্যে দিয়ে। কাঁপা-কাঁপা হাত। আজ থেকে ষাট বছর আগে লালমুখো সাহেবদের অফিসের মধ্যে একজন নার্ভাস যুবক কেমন করে হাত তুলেছিলেন, অন্য একজন নার্ভাস যুবককে শুভেচ্ছা জানাতে, ঠিক তেমনই করে। হাত নাড়লেন আস্তে আস্তে, অচেনা অজানা মানুষটিকে, যাঁর মন বা আত্মা চলেছে কোনো অনির্দিষ্ট অজানা গন্তব্যের দিকে, তার ঠাণ্ডা শক্ত হয়ে যাওয়া শরীরটি চলেছে নিমতলা ঘাটে। এবার অস্ফুটে বললেন গানুবাবু; "বেস্ট অফ লাক।" যেন, মাইক্রোফোনেই বললেন। নিজের দু কানে গমগম করতে লাগলো ঐ তিনটি শব্দ।

আবারও বেজন্মারা চেঁচিয়ে উঠলো, বললো হররি হররি বোল...বললো...

জানালা থেকে তাড়াতাড়ি সরে এলেন। বকুলগাছের গভীর অন্ধকার থেকে ছায়ামূর্তিগুলি কখন যে ফিরে আসবে কে জানে? ভয় করে। জল খেয়ে, খাটে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে মশারির মধ্যে ঢুকে গিয়েই একটু নিরাপদ বোধ করলেন। শিশুকালে যেমন করতেন। অশরীরীরা যেন মশারই মতো মশার অরির কাছে পর্যুদস্ত হবেই।

শুয়ে পড়ার আগে একবার জানালার দিকে তাকাতেই চমকে দেখলেন যে, সাদা দেওয়ালে সার-সার কালো কম্পমান ছায়ামূর্তিরা এসে ভিড় করেছে। হেলে দুলে আজ

www.BanglaBook.org

যেন হাত নাড়ছে তাঁকে। হাত নাড়ছে?

হ্যাঁ। তাই-ই তো! হাত নাড়ছে।

যেন, না-বলেই বলছে "বেস্ট অফ লাক" মিস্টার গানু রায়। ফেয়ারওয়েল। অ্যাড্যু: ফ্রেন্ড।

ভয়ে গলা শুকিয়ে এলো গানুবাবুর। ফ্যাকাশে হয়ে গেল শীর্ণ জরাগ্রস্ত মুখটি। বাঁধানো দাঁতের পাটি দুটি খুলে-রাখা, তোবড়ানো, বলিরেখাময় মুখটির ভিতরে মরুভূমির ঊষর জ্বালা নেমে এলো। দূর থেকে আবারও ভেসে এলো সেই বেজন্মাদের গলার স্বর : বললো হররি, হরিরি বোল।

ভয় করতে লাগলো। মশারির মধ্যে জুজুবুড়ির ভয়ে ভীত শিশুর মতোই জড়সড় হয়ে বসে রইলেন উনি। ঠিক এই মুহূর্তটিতে মণি, মণিদীপার অভাব বড় বেশি করে বোধ করতে লাগলেন। উনি বুঝতে পারছিলেন যে, কিছু ঘটবে আজ রাতে। অথচ সবাইকে যে ডাকবেন তেমন ইচ্ছেও করছিলো না।

যেতে যখন একাই হবে, তখন...

মণি চলে যাবার পরদিন থেকেই ভাবতেন, কবে তিনিও মণির সঙ্গে মিলিত হবেন গিয়ে। কিন্তু যাবার সময়ে, যেতে একটুও ইচ্ছে করছে না। এমন কি মণির সঙ্গে মিলিত হলেও নয়। ভয়ে, একেবারেই সিঁটিয়ে গেলেন আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক, ইনটেলেকচুয়াল, অবিশ্বাসী মানুষটি। বুকের কষ্টটা ক্রমশই বাড়তে লাগলো।

এলে তো ফিরতে হবেই। বৃত্ত সম্পূর্ণ তো করতে হবেই। এও তো অয়ন পথই একরকমের! গানুবাবুর বাবা ঠাকুরের নাম করতে করতে চলে গেছিলেন। মনে পড়ল সে-কথাও। ওঁর মাথায় হাত রেখে হেসে বলেছিলেন, গানু বাবা, চলি রে! ভালো থাকিস! যেন ভারী আনন্দই হয়েছে; মহানন্দের ঘটনাই ঘটলো যেন কোনো।

কিন্তু, উনি যে অবিশ্বাসী! অবিশ্বাসীদের ফেরার পথে বড়ই ভয়।

সংশয়-দেওয়ালের বকুলগন্ধী ছায়ামূর্তিগুলি হেলে দুলে তখনও হাত নেড়ে যাচ্ছিলো তাঁকে।

ফেরার সময় হলো। এবারে যেতে হবে।

এবারে...

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বোঁদেদা

বোঁদেদার সঙ্গে প্রথম দিন দেখা হওয়ার কথাটি পরিষ্কার মনে আছে। বোঁদেদাকে একবার যিনি দেখেছেন তাঁর পক্ষে কখনওই ওঁকে ভোলা সম্ভব নয়। অবশ্য তাঁর সার্কলও ছিলো বিরাট। কলকাতা তো বটেই, ভারতবর্ষের এবং বিদেশেরও সব জায়গাতেই তাঁর জানাশোনা মানুষের কমতি ছিলো না।

আলিপুরের উডল্যান্ডস এস্টেটে একটি বহুজাতীয় সংস্থার ডিরেক্টরের ফ্ল্যাটে পার্টি। উডল্যান্ডস নার্সিং হোমের উল্টোদিকে। অফিসে অনেক ঝামেলা ছিলো তাই যেতে দেরী হয়ে গেছিলো। পৌঁছে দেখি পার্টি বেশ জমে উঠেছে। বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে লনের শোভা দেখতে দেখতে প্রীমিয়াম স্কচ-এর গ্লাসে সবে প্রথম চুমুক দিয়েছি ঠিক এমন সময় একজন লম্বা চওড়া ভুঁড়িওয়ালা ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন আমার দিকে।

ভদ্রলোককে আগে দেখিনি। তবে মুখ দেখে মনে হলো বেশ তূরীয় অবস্থায় আছেন। উনি এসেই সম্পূর্ণ অপরিচিত আমাকে বললেন, বোকাটা! বসে বসে কেউ মাল খায়?

অতজন সুন্দরী মহিলার সামনে সম্পূর্ণ অপরিচিত কেউ হঠাৎ বোকা বললে বুদ্ধিমানেরও খারাপ লাগার কথা। তবে ভদ্রলোক যে মানুষ ভালো সে কথা তাঁর মুখেই লেখা ছিলো।

আমি আমতা আমতা করতেই উনি বললেন, হ্যাঁরে। সায়েবরা কি বলে তা জানিস নে?

কি?

আমি এবারে যথার্থ বোকারই মতো বললাম।

বোঁদেদা বললেন, সায়েবরা বলেচে, "হাউ মেনি ড্রিঙ্কস ক্যান উ্য স্ট্যাণ্ড?" তারা কি এ কথাও বলেচিলো "হাউ মেনি ড্রিঙ্কস ক্যান উ্য সীট?"

আমি হেসে ফেললাম ওঁর কথায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তারপরই কে যেন ওঁকে ডাকলেন ড্রইংরুমের ভিতর থেকে। উনি চলে গেলেন। এবং উনি চলে যেতেই হোস্ট কুটুদা আমার কাছে তাড়াতাড়ি এসে বললেন, আপসেট হওনি তো জীবু?

হেসে বললাম আপসেট হবো কেন? চমৎকার রসিক মানুষ। খুব ইন্টারেস্টিংও।

ইতিমধ্যেই আবার ওঁকে আমারই দিকে ফিরে আসতে দেখা গেলো। রায়সাহেব বললেন, এই যে বোঁদেদা, তোমার কথাই হচ্ছিলো। আলাপ আছে?

নেই। কিন্তু হতে কতক্ষণ?

এ হচ্ছে পুরোনো বন্ধু আমার। লেখে।

লেকে? কি লেকে? জাবেদা? না প্রেমপত্র?

আমরা দুজনেই হেসে উঠলাম। ওঁর কথাতে। এবং কথা বলার ধরনেও।

বলতো পারো দুইই। পেশাতে ও ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টট্যান্ট কিন্তু নেশাতে লেখক।

ডেঞ্জারাস কম্বিনেশন।

মন্তব্য করলেন, বোঁদেদা।

বলেই বললেন, নামটাতো বললে না হে।

ওর নাম জীবনানন্দ।

ও তাই বলো। জীবনানন্দ দাশ তো?

অস্বস্তি এবং বিড়ম্বনায় আমার কান লাল হয়ে উঠলো।

একজন মহিলা প্রতিবাদের গলায় বলে উঠলেন, সাহিত্যর কত খবরই আপনি রাখেন বোঁদেদা! জীবনানন্দ দাশ তো অনেকদিনই গত হয়েছেন।

আরে ঐ হল! পোয়েটেরা আসলে কোনোদিনই গত হয় না। তাঁরা হচ্চেন গিয়ে ইমমর্টল। সব পোয়েটই। কবিতা সম্বন্ধে আমারও একসময় একটু উইকনেস ছেল। বুয়েচিস বোকা। আমিও একসময় কিছু লেকালেকি করেচিলুম।

কবিতা? আপনি?

ভদ্রমহিলা, মিসেস সুন্টু সেন, চোখ কপালে তুলে জিগগেস করলেন।

ইয়েস ম্যাম। আমি। এই বোঁদে বাঁড়ুজ্যে। কেন? বিশ্বেস হচ্ছে না? অবশ্য হোল-লাইফে মাত্র দুটোই লিকেচিলুম। মানে, কবিতা।

বললাম, মাত্র দুটোই যখন লিখেছিলেন তখন মনে নিশ্চয়ই আছে।

বিলক্ষণ!

তবে শোনানই না হয়।

শোন তবে বোকাটা! তোকে তুই-তোকারি কচ্চি বলে চটিসনি তো? বিধান রায়ের মতো আমিও কাউকে আপনি বলতে পারি না। হ্যাঁ বলচিলুম, প্রথমটা হচ্ছে গিয়ে

"এক ঠোঙ্গা খাবার নিয়ে যায় মতিলাল।
তাই দেখে দূর থেকে মারলে ছোঁ চিল ॥"

কাছাকাছি যারাই ছিলেন সকলেই তো বোঁদেদার কবিতা শুনে থ।

মিসেস সুন্টু সেন বললেন, এ কিরকম কবিতা হলো?

কেন? তোমাদের আধুনিক কবিতার চেয়ে এই প্রাচীন কবিতা কোন দিক দিয়ে খারাপ? তোমরা তো লিকে ফেল চাঁদমুখ করে "প্রিয়তমা, আমার সঙ্গে তোমার দেকা হবে

www.BanglaBook.org

গতকাল।" আমার কবিতায় মতিলালের 'ল'-এর সঙ্গে চিলের 'ল'-এর মিল কি নেই?

তা আছে। আমি বললাম। 'দেশ' পত্রিকাতে যে সব কবিতা বেরোয় তা কি আমি মাজে-মদ্দে পড়িনা ভেবেচ? তবে বেশি পড়ি না।

কেন?

কোষ্ঠকাঠিণ্য হয়। ছ্যাঃ! ওগুলোও কি কবিতা?

তারপর বললাম আর দ্বিতীয় কবিতাটি? মাত্র দুটিই যখন লিখেছিলেন, দ্বিতীয়টিও মনে আছে নিশ্চয়ই।

মনে আর থাকবে না? সেটি অবশ্য ছিলো দেশাত্মবোধক কবিতা। কিন্তু আমার স্কুলের বাংলার মাস্টের অশ্লীল বলিয়া বিবেচনা করতঃ আমার কবিদশা অতঃপর নাশ হয়। এখন অবশ্য দেশসেবা এবং অশ্লীলতা প্রায় সীনোনিমাসই হয়ে উঠেচে। কি বলচিস?

কবিতাটা বলুন।

মিসেস সুন্টু সেন বললেন।

তখন ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। বুয়েচিস। কলকাতার ফুটপাথে ফুটপাথে মানুষ মরে পড়ে আছে। তা দেকে আমার শিশু বুক দুঃকে উতলে উঠতো। একদিন গলে-যাওয়া হৃদয় নিংড়ে লিখলাম

"দুর্ভিক্ষে সারাটা বঙ্গ করে হাহাকার
লোক নেই, পড়ে আছে ল্যাঙোট তাহার।"

সকলেই হেসে উঠলেন।

তোমরা তো হাসবেই অর্বাচীনের দল। নইলে বাঙালির এমন অবস্থা হয় আজ?

মিসেস সুন্টু সেন গম্ভীর হয়ে বললেন তা নয়, মানেটা ঠিক বুঝতে পারিনি তো তাইই।

মানেটা বোঝা কঠিন কি হল? মানুষটা না-খেয়ে মরে গেচে। করপরেশনের গাড়ি বডি তুলে নিয়ে গেচে। কিন্তু বেচারীর ল্যাঙোটটা রাস্তায় পড়ে আচে। তোমাদের আধুনিক কবিরা হলে এই কবিতাই লিখে তার নাম দিয়ে দিতো "এপিটাফ"। হৈ হৈ পড়ে যেতো কবি-মহলে। সাধু! সাধু! বলতো সকলেই।

কুটুদা ইন্টারাপট করে বললেন, এই দুটি কবিতাও কিন্তু তোমার লেখা নয় বোঁদেদা। এ দুটোই আমাদের রঘুদার কবিতা। রঘু ব্যানার্জীর। কলকাতার অনেক মানুষই এই কবিতার কথা জানেন। রঘুদার নিজের মুখ থেকেই তাঁরা শুনেছেন অনেকবার।

বোঁদেদা বললেন, শোনেননি, এমনও অনেকে আচেন। তোরা এই মিসম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টট্যান্টের দল বুদ্ধি একটু কম ধরিস। সকলেই জানে যে, এ দুটো রঘুদার কবিতা। তবে তোদের কারো শুনতে কি খারাপ নেগেচে? নাম বলেই যদি শালা আবরিত্তি করবো তো রঘু বাঁড়ুজ্যের কবিতা কোন দুঃখে র‍্যা? রবেঠাকুর কি দোষ করে? পরের জিনিস নিজের বলে মনে করাকে চুরি করা বলে না। মনটা যদি খুঁত খুঁত করে তবেই সেটা চৌর্যবৃত্তি।

আমি যেহেতু দেরী করে গেছিলাম, কুটুদা কিছুতেই তাড়াতাড়ি ছাড়লেন না। সকলেই একে একে চলে যেতে লাগলেন বুফেতে খাওয়া সেরে। তখন বুঝিনি যে, আমাকে বোঁদেদার লাশ সামলাবার জন্যেই আটকে রেখেছেন উনি। বোঁদেদাকে কুটুদা বিলক্ষণ চিনতেন। আমার সঙ্গেই এই প্রথম আলাপ।

www.BanglaBook.org

খাওয়া দাওয়ার পর কুটুদা বললেন, বোঁদেদা আপনি কি গাড়ি এনেছেন?

নিশ্চয়ই। কেন? কাউকে লিফট দিতে হবে নাকি? বোকাকে? কি রে বোকা?

এই রে। এই অবস্থায় নিজে গাড়ি চালাবেন কি করে?

আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে নিচু গলায় কুটুদা বললেন।

তোমার ড্রাইভার আছে জীবু?

আবারও নিচু গলায় কুটুদা শুধোলেন।

না। কিন্তু এতো আর বাইসাইকেল নয় যে একাই দু হাতে জোড়া-সাইকেল চালিয়ে চলে গেলাম কিরিং-কিরিং করে।

একটু পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে কুটুদা বললেন, ঝামেলি হবে। গ্রেট ঝামেলি। মাঝে মাঝেই বোঁদেদা এমন করেন। সবসময় কিন্তু নয়। ইচ্ছে করেই আমাকে হয়রানি করার জন্যে করছেন কি না কে জানে। একটা ব্যাপারে আমার উপরে খুব রেগে রয়েছেন। এমন গুগলী-মার্কা লোক কমই দেখেছি।

লিফট অবধি আমি আর কুটুদা বোঁদেদাকে ধরে তো নিয়ে গেলাম। গন্ধমাদন পর্বত বইতেও পবননন্দনের এত ঝক্কি পোয়াতে হয়নি। মনে হচ্ছিলো ভূমিকম্প হচ্ছে। একবার পর্বত আমার গায়ে ভর করছেন আরেকবার কুটুদার গায়ে। তবে বাঁচোয়া এইই যে, ভূমিকম্পই ছিলো তখনও, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়নি। কিন্তু চিত্তির হলো লিফট থেকে নিচের ল্যান্ডিং এ নামতেই। বড় বড় কোম্পানির বড়ো বড়ো সাহেবরা থাকেন এখানে। এ বাড়িতে পার্টি লেগেই থাকে, কিন্তু মাতাল দেখা যায় না বড়ো। দাঁড়িয়ে থাকা পর্বত-প্রমাণ মানুষটি, অদৃশ্য করাতে কেটে গিয়ে গদ্দাম আওয়াজ করে চোখ বুঁজে ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে গেলেন ঐ রেসপেক্টেবল পরিবেশের শ্রাদ্ধ করে দিয়ে।

কুটুদা নিজেকে অভিশাপ দিয়ে বললেন, দেকেছো! ভালো স্কচ-এর এইই দোষ। কখন যে ধ্বস নামাবে তা সেইই জানে। যেন, ডিলেড-অ্যাকশন টাইম বম্ব।

আমি বললাম, এবার থেকে আপনার বাড়ির পার্টিতে বিশুদ্ধ বাংলাই খাওয়াবেন। সঙ্গে খিচুড়ি আর প্যাঁজের চাঁট। বেয়ারা-বাবুর্চি, ভেটকি-মেয়োনিজ, চিকেন-আ-লা-কিয়েভ এ সবের বাহুল্য আদৌ দরকার নেই। যা হবার, তা ছোটা ব্রিস্টলের মতো তড়িৎ-ঘড়িৎই হয়ে যাবে।

বোঁদেদা ফ্ল্যাট হয়ে তখনও পপাতধরণীতলে শুয়ে আছেন। মরেই গেলেন কি না বোঝা যাচ্ছে না। ঠিক সেই সময়ই একটি ঝকঝকে কলো মার্সিডিস গাড়ি থেকে নেমে ডিনার জ্যাকেট পরা, বো-লাগানো একজন সাহেব ল্যান্ডিং-এ ল্যান্ড করলেন। খয়েরী গোঁফ। জোড়া। কুচুটে চোখ। জোড়া। চেহারা দেখে মনে হয় আয়ার্ল্যান্ডে বাড়ি।

কুটুদা লজ্জিত গলায় অধোবদনে বললেন, গুট নাইট এরিক।

এরিক-নামক সেই গুঁফো সাহেব পাইপের গোল্ডব্লক টোব্যাকোর ধোঁয়া ছেড়ে, আড়চোখে হাতঘড়ির দিকে চেয়েই সাঁতরাগাছির ওলের মতো ছিটেল মুখ ফাঁক করে বললেন, গুড মর্নিং কুটু! ভেরী গুড মর্নিং ইনডিড!

ঘড়িতে দেখলাম সোয়া একটা বাজে।

সাহেব বললেন, নীড এনি হেল্প? উ্য লুক ভেরী পারটার্বড।

কুটুদা বললেন, নো, নো। থ্যাঙ্ক উ্য ভেরী মাচ এরিক। বাট হি উইল বি নর্ম্যাল, আই মীন, সোবার। সুন।

www.BanglaBook.org

এরিক লিফট-এ উঠে উপরে চলে গেলেন।

কুটুদাকে শুধোলাম, কে?

আমাদের কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। কুটুদা এমবারাসড গলায় বললেন।

দারোয়ানদের ডেকে তাদের সাহায্যে তো বোঁদেদাকে প্রথমে বসানো হলো। তারপর দাঁড়ও করানো হলো সোজা করে। কুও ভেডিস সিনেমাতে দেখা গলিয়াথ-এর মতো উঠে দাঁড়ালেন বোঁদেদা। কুটুদার প্রেস্টিজ তো পাংচারড হয়ে গেলো দারোয়ানদের সামনে। কাঁদো-কাঁদো গলায় আমাকে বললেন, জীবু, বোঁদেদার গাড়িটা রেখে দিচ্ছি এখানে। তুমি ওঁকে একটু পৌঁছে দাও।

কথাটা ওভারহিয়ার করে বোঁদেদা বললেন, আমি জীবনে পরের গাড়িতে চাপিনি। যতদিন বাঁচি, চাপবোও না।

কুটুদার কুচুটে মুখে আমি চেয়ে রইলাম। বিপদে বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। গলিয়াথ-এর দু হাত দুজনে ধরে হাঁটি হাঁটি পা পা করে পার্কিং-লট এ গিয়েই দেখি, খাইছে! এ যে বেন্টলী গাড়ি। সাদা রঙা। আজকালকার লিমুজিনের মতো লম্বা চওড়া। লাট্টু গীয়ার। কুটুদা বোঁদেদাকে কাচের বাসনের মতো সাবধানে তুলে দিয়েই আমাকে বললেন কানে কানে স্লাম্বারে গেছে জীবু। ডিসটার্ব না করে স্ট্রেট চালিয়ে চলে যাও। এই বেলা।

অসহায়ের মতো আমি বললাম, আমার গাড়ি।

সে দায়িত্ব আমার। কাল সকাল আটটার মধ্যে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে আমার ড্রাইভার। আর কথা বাড়িও না। স্ট্রেইট চলে যাও।

কী বিপদ! যাবোটা কোথায়? মানুষটার পুরো নাম পর্যন্ত যে জানি না। ঠিকানাও জানি না। বোঁদে বলেছে বলেই তো যে-কোনো মিষ্টির দোকানে গিয়ে সেঁটে দিয়ে আসতে পারি না! এই প্রাগৈতিহাসিক মডেলের বেন্টলী গাড়ি জীবনে চোখে দেখিনি, চাপা তো দূরের কথা। কোন ফুটোতে গাড়ির চাবি গলাবো সেটা পর্যন্ত জানা নেই। কিন্তু আমার এতো সব প্রশ্নর জবাব দেওয়ার জন্যে অপেক্ষা না-করে আমার গাড়ির চাবিটা আমারই পকেটা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তিন লাফে ডেঞ্জার এরিয়া ক্লিয়ার করে লিফটের গর্তে ঢুকে গেলেন কুটুদা।

ভাবলাম এমন স্ট্র্যাটেজিস্ট না হলে কি উন্নতি করা যায়?

সামনে চেয়ে দেখলাম উর্দিপরা দারোয়ানেরা বিরক্ত হয়ে অপেক্ষা করছে আপদেরা কখন বিদায় হবে। ঘড়িতে দেখলাম রাত দেড়টা।

বোঁদেদা ঘাড় এলিয়েই স্বগতোক্তি করলেন, ঘড়ি দেকিসনিরে বোকাটা! নাইট ইজ ভেরী ইয়াং। সে সোমত্থ বেটি লজ্জা পাবে যে র‍্যা!

চাবিটা ডেসপারেট হয়ে র‍্যানডম ফুটোময় ড্যাশবোর্ডের ফুটোতে ঢুকোতে চেষ্টা করতে লাগলাম। একটা ফুটোতে এঁটেও গেলো। চাপ দিতেই গাড়ির এঞ্জিন গর্জন করে উঠলো।

বোঁদেদা চোখ বন্ধ করেই বললেন, কেমন বলচে শুনেচিস? যেন মৌজুদ্দিনের গলা। শালা! এই নইলে ব্যাটাচেলের গাড়ি!

সম্বন্ধ করে বিয়ে করেছে এমন নববিবাহিত স্বামী যেমন অতি ভয়ে ভয়ে নববিবাহিতা স্ত্রীর অঙ্গ এবং প্রত্যঙ্গ স্পর্শ করে তেমনই দ্বিধাকম্পিত হাতে, থুরি পায়ে; আমি অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিলাম, লাট্টু গীয়ারকে ফারস্ট গীয়ারে ফেলেই। খানদানী গাড়ি বলে ব্যাপার! গাড়ি আনাড়ী ড্রাইভারের ভয় অগ্রাহ্য করে স্মুথলী এগিয়ে চললো। দু কদম এগোতেই বোঁদেদার নাক ডাকতে লাগলো। একেবারে কুম্ভকর্ণ পারসোরনিফায়েড।

www.BanglaBook.org

বিপদটা ঘটলো গেট থেকে বেরুতেই। ডানদিকে ঘুরতে হবে এবারে। ব্রেকে পা দিতেই দেখি ফুসস-স-স। উডল্যান্ড নার্সিং হোমের দেওয়ালে প্রায় ধাক্কাই লাগাবার উপক্রম হলো। নার্সিং হোমের দারোয়ানেরা তো তেড়েই এলো। একজন ঘাড় নিচু করে অন্যজনকে বললো, পিয়ে হুয়ে হ্যায় ক্যা?

এদিকে কুটুদার বিল্ডিং কমপ্লেক্স-এর দারোয়ানেরা আমাদের রেসকিউ-এ ছুটে এলো। বড়লোকদের চেয়ে তাদের দারোয়ানদের ইজ্জত জ্ঞান অনেকই বেশি। আফটার অল আমরা উডল্যান্ডস এস্টেটের মেহমান।

তিনপাক-ফলস স্টীয়ারিংটা বনবন করে অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে গাড়িটাকে ডানদিকে একটু ঘুরোতেই দেখি বোঁদেদা আমাকে ধমকে বললেন গাড়ি ঠিকসে চালা রামদীন। নইলে তোর মেয়ের বিয়েতে যে কুড়ি হাজার টাকা দেব বলেছিলাম তার একটি পয়সাও দেবো না।

এই রে ! নেশার ঝোঁকে আমাকে বোধহয় ড্রাইভার ভাবছেন। স্কচ হুইস্কির ব্যাপারই আলাদা। এই ঘুম পাড়ায়, এই জাগায়।

এদিকে ব্রেক ফুসস-করায় গাড়ি প্রায় উডল্যান্ডস নার্সিংহোমের দেওয়ালেই গিয়ে ধাক্কা মারে আর কি! সেই গভীর রাতে গাবলু-গুবলু বাচ্চা প্রসব-করা সারে সারে শুয়ে থাকা বড়লোকের বউয়েদের গর্বমাখা সুখে বিঘ্ন ঘটিয়ে দারোয়ানদের চাপা দিতে দিতেও না-দিয়ে গাড়ি গোঁ গোঁ করে এগিয়ে চললো।

বড় রাস্তায় পড়ে আন্দাজেই বাঁ দিকে আবার বনবন করে স্টিয়ারিং কাটালাম। দু পাক ঘোরালে এক ইঞ্চি কাটার এফেক্ট হয়।

কিন্তু যাবোটা কোথায়?

কাতর গলায় ঘুমন্ত বোঁদেদাকে প্রশ্ন করলাম।

বোঁদেদা বললেন, চোপ শালা নিমকহারাম। তোর গাঁয়ের সবকটা লোকই নেমকহারাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটছে লক্ষ্য করলাম। চোখ না খুলেই বোঁদেদা গাড়ি কোনো মোড়ে এলেই বলতে লাগলেন বাঁয়ে। ডাইনে। সোজা ইত্যাদি। কিছুক্ষণের মধ্যেই উত্তর কলকাতার কেনীয়ান সাফারি র‍্যালীর রাস্তায় পৌঁছে গেলাম। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যু।

হঠাৎই বোঁদেদা বললেন, সোনাগাছি পেরিয়ে এলাম, না রে? চোখ বন্ধ করেই বললেন।

হ্যাঁ। বোধহয়।

বোদয় মানে কি রে শালা? নেকুপুসু আমার। যাসনি কখনও?

বিরক্তির গলায় বললাম, না।

কেন?

গুরু পাইনি।

তাই? আমি নে যাবো তোকে? গুরুর অভাব কি? গুরু মিলে লাখ লাখ, চেলা মিলে এক।

এবার ডানদিকে চল। তোকে মিদের দোকানের পান খাওয়াবো। বেনারস থেকে মঘী আনে। এ কি রে এই সন্দেবেলায় দোকান বন্ধ করে শালা বাড়ি চলে গেলো। দ্বিতীয় পক্ষর বউতো! কিন্তু এগারোটা পর্যন্ত তো খোলা রাখেই।

বললাম, এখন দুটো বেজেছে।

www.BanglaBook.org

বেলা দুটো? বলিস কি রে? অথচ রোদ নেই মাইরী একটুও। শালা একেই বলে ঘোর কলি।

আস্তে। আস্তে। ঐ সামনে বাঁয়ের গেট। বোঁদেদা বললেন। ব্রেক চাপলাম শরীরের সমস্ত ওজন দিয়ে। ফুসস-সস। স্টীয়ারিং ঘোরালাম বাঁই বাঁই করে। ক্যালামিটি না ঘটিয়ে টায়ে টায়ে গেটে ঢুকে থামালাম গাড়ি এক বিরাট প্রাসাদের ভিতরের পর্চ-এ।

গাড়ি থামতেই আমি বললাম, আমি এবার যাবো বোঁদেদা।

যাবি? কোতায় যাবিরে বোকা খোকা? আমার সুন্টুপুটুং, ঘুচুংপুচু? বাঁড়ুজ্যে বাড়িতে ঢোকা সহজ কিন্তু বেরুনো সহজ নয়। সে তওয়ায়েফ, ওয়াইফ অথবা পোঁদ-লাল বাঁদর কী ঠোঁট-লাল টিয়া যেইই হোক না কেন!

ঘু-ঘুচু। বলে ডাকলেন বোঁদেদা। একজন লোক এসে দাঁড়ালো। তাকে দেখে মনে হলো সে দিনে ঘুমোয় রাতে জাগে। চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই বাড়ি পানাগড়ে না পানাজীতে।

বোঁদেদা বললেন, ড্রাম্বুই আর সিগার আন।

অবাক হয়ে আমি বললাম, রাত আড়াইটের সময়?

নাতো কি? তুই শালা আমার আসলি দোস্ত। তুই যা করলি, জবাব নেই। কুটুকে কেমন কুটুস দিলুম এককানা। তুই যা করলি, রামপেয়ারিও করতো না আমার জন্যে।

সে কে?

সে বেনারসে থাকে। কী ডেডিকেশান। বেনারসের জিনিসই আলাদা। সে রাবড়িই বল, সিদ্ধিই বল, আর মেয়েচেলেই বল।

আমি বললাম, আপনার কোনো ছোটো গাড়ি নেই? অ্যাম্বাসাডার অথবা ফিয়াট? আমি বাড়ি যাবো।

নারে বোকা। বোকাটা! বাঁড়ুজ্যেরা ছোট গাড়ি চাপে না, ছোট পেগ খায় না।

আমি বাড়ি যাব। আবার বললাম আমি।

তুই কি কিন্ডারগার্টেনের বাচ্চা নাকি রে? থেকে থেকে কেবলই বলটিস, মিস, হিসি করব, মিস হিসি করব। ঝিকে ডেকে দেবো তোকে হিসি করিয়ে দেবে। তুই কি শালা ঝৈন না কি?

ঝৈন মানে?

আরে বোকা! স্ত্রীতে যে আসক্ত সে স্ত্রৈণ, আর ঝিতে যে সে ঝৈন।

ড্রাম্বুই আর সিগার এলো। বোঁদেদা বললেন, খা খা। এই ড্রাম্বুই আর সিগার দিয়ে উইনস্টন চার্চিল হিটলারের সঙ্গে যুদ্ধে জিতেছিলো। তোরা কি ভাবিস অরেটরী দিয়ে। "নেভার ইন দ্যা হিস্ট্রী অফ ম্যানকাইন্ড সো মেনি হ্যাড ওওড সো মাচ, টু সো ফিউ। নারে বোকা! অরেটরী দিয়েই যুদ্ধ জেতা গেলে নেহরুর অরেটরীতে এতদিন দেশের লোকের দুঃকু ঘুচে যেতো। আসল হচ্ছে এই ড্রাম্বুই লিকুওর আর সিগার।

॥ ২ ॥

একবার আমাদের কয়েকজনকে বোঁদেদা তাঁর বাগান বাড়িতে নিয়ে গেছিলেন। সাঁওতাল পরগণাতে। মাছের সঙ্গে ফ্রেঞ্চ বোঁর্দো ওয়াইন, মাংসের সঙ্গে স্প্যানিশ বুলস-

www.BanglaBook.org

ব্লাড রেড ওয়াইন। প্রণ ককটেলের সঙ্গে সাদা অস্ট্রিয়ান স্ন্যাপস। গরম করে, সার্ভ করা জাপানীজ 'সাকে' রাইস-ওয়াইন। তারপর ছ কোর্স ডিনার। খাসীর চৌরী, চাঁব, লাব্বা, পায়া, কবুরা। সঙ্গে তক্কর। তারই মাঝে মাঝে নিম্বু-পানী, হজমী।

একদিন রাতে নিজেই মহুয়া ডক্টর করলেন। চারগাছা করে পুরুষ্টু লবঙ্গ আর এক চামচে চিনি তাওয়াতে লাল করে তেল ছাড়া ভেজে মহুয়ার বোতলে ফেলে ভালো করে ঝেঁকে যখন গ্লাসে সার্ভ করলেন দেখতে হলো একদম রাম-এর মতো। বললেন, দ্যাখ মহুয়ার গন্ধ চলে গেছে। কোথায় লাগে এরকাছে জ্যামাইকান বিকার্ডি রাম।

বড়লোক, রাজা-মহারাজা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাইকুন্স অনেকই দেখেছি জীবনে, বোঁদেদার মতো এমন 'রইসী' কারো মধ্যেই দেখিনি। আমাদের জীপে করে রাতে শিকারে নিয়ে গেলেন। বড় বড় চোখ দেখে "টাইগার টাইগার বার্নিং ব্রাইট" বলে জঙ্গলের মধ্যের এক বাথানের মোষ মেরে দিলেন রাইফেল দিয়ে। কোনো বিকার নেই। বললেন, গুলিটা বিঁধেছে দ্যাখ একেবারে দু চোখের মধ্যে। একেই বলে বোঁদের কপাল। ব্যাটা যদি শুধু ভাইষা না হয়ে বাঘোয়া হতো তো জমে যেত।

তাঁর অনুচরেরা গিয়ে গেঁজে থেকে টাকা বের করে মোষের দাম প্লাস হাজার টাকা কম্পেনসেশান দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে দিল।

॥ ৩ ॥

আমার লানডান প্রবাসী বন্ধু ছুট্টু এসেছে অনেকদিন পর। ওকে নিয়ে গেছি গ্র্যান্ডের চৌরঙ্গী বার-এ। পরে পলিনেশিয়াতে ডিনার খাওয়াবো। সবে একটা করে হুইস্কির অর্ডার করেছি হঠাৎ বোঁদেদার আবির্ভাব। "আবির্ভাব" বলাই ভালো "প্রবেশ" না বলে। যে-কোনো ক্লাবে বা বার-এ বোঁদেদা ঢোকা মাত্র বেয়ারা থেকে শুরু করে স্টুয়ার্ডরা পর্যন্ত ফটাফট সেলামের আর গুড ইভনিং-এর ঝড় [illegible]।

বোঁদেদা বললেন, কী রে বোকা। সঙ্গে এই চালাকটি কে?

ছুট্টুর পরিচয় দিয়ে বললাম, আমার বাল্যবন্ধু। আমরা একসঙ্গে ইংল্যান্ডে ছিলাম। ও রয়েই গেছে।

বেশ করেছিস রে চালাক। এই দেশ আর ভদ্দরলোকদের জায়গা নেই। পোলিটিসিয়ানগুলোর বুজরুকিতে সর্বনাশ হলো। কিন্তু তোর বাল্যবন্ধুকে তো একটা ভালো ট্রিট দিতে হয়। কী বলিস? তবে দুস্‌স শালা ফিরপোই নেই। কলকাতাটা কানা হয়ে গেছে। তা এক কাজ কর। আমার শরীরটা সকাল থেকেই খারাপ। বুকে একটা ব্যথা বোধ করছি। একটু চাঙ্গা হওয়া দরকার। ভালোই হয়েছে তোদের সঙ্গে দেখা হয়ে।

ই-সি-জি করিয়েচো?

দুসস্‌ শালা। ঐ র‍্যাকেটে আমি নেই। ই-সি-জি, ই-ই-জি, ব্লাড ক্লোরোস্ট্রোল, ব্লাড-সুগার, ব্লাড প্রেসার, নিকুচি করিচি। ভগবান এত মানুষ গড়েছেন কেউ বেঁটে কেউ লম্বা, কেউ ফর্সা কেউ কালো, কেউ মোটা কেউ রোগা, আর কোন বাইবেলে লিখেছিলো শুনি যে প্রত্যেকের ঐসব গুণাগুণ এক হবে? আমার বাবার ওজন ছিল সাড়ে তিন মণ। অথচ এমন এনার্জিটিক মানুষ আর দেখলাম না। মদের মোচ্ছব করতেন। আর...নাই-ই বা বললাম। তেরানব্বই বছর বয়সে মায়ের কোলে মাথা রেখে গহরজান বাঈজীর রেকর্ড

www.BanglaBook.org

শুনতে শুনতে, চললুম! বলে চলে গেলেন। যকনি এয়েচো এখানে, ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট আর এক্সপ্যারি ডেট লিখে পাঠিয়েচেন ব্রহ্মা। যেদিন সে ডেট আসবে কান্তি বক্সী, সুনীল সেনেরা ঘেমে গিয়েও বাঁচাতে পারবে না রে বোকা!

বলেই বললেন, চল, আজ অ্যান্টিকুয়ারিয়ান হুইস্কি দিয়ে শুরু হোক। এখানে একটা করে মেরে দিয়েই চল আজ বার-ক্রলিং করব। কলকাতার সব ক্লাবে।

বোঁদেদা কলকাতার সব ক্লাবেরই মেম্বার। ওখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া হল স্যুইমিং ক্লাবে। স্টুয়ার্ড মানু বোঁদেদাকে দেখে সেলাম ঠুকলো। মানু, পি. অ্যান্ড ও. লাইনস-এ কাজ করত আগে। এলমোর মরিস আর পি টি বাসু বললেন, হোয়াট বোঁদে? লং টাইম নো সী?

ওখান থেকে বেরিয়ে অর্ডনান্স ক্লাবে। স্কচ ছিলো। তবে জনি-ওয়াকার।

দুসস্ শালা, জিভটাই যাবে অ্যান্টিকুয়ারিনের পর। চল পালাই। বোঁদেদা বললেন।

সেখান থেকে বেঙ্গল ক্লাবে। অ্যান্টিকুয়ারিয়ান ছিল না সিভাস রিগ্যাল খাওয়া হলো। সেখান থেকে ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবে। রবার্ট ডিপেনিং আর জর্জ ট্রব বিলিয়ার্ড খেলছিল। বিলু বর্মনও ছিল। হৈ হৈ করে উঠলো সকলে বোঁদেদাকে দেখে। ওখানেও সিভাস একটা করে মেরে যাওয়া হলো সি. সি. এফ. সিতে। সালিম লজ্জা পেয়ে বললো, স্কচ নেই। বোঁদেদা বললনে, 'কমিটি মেম্বারদের বলিস এনে রাখতে'। সি. সি. এফ. সি. থেকে বেরিয়ে বেঙ্গল রোয়িং ক্লাব। পথে ডালহৌসী ইনস্টিট্যুট-এও একবার ঢুঁ মেরে একটা করে খাওয়া হলো। ছুট্টু নার্ভাস হয়ে গেলো। বললো সাহেবরাও এতরকম হুইস্কি চোখে দেখেনি।

বোঁদেদা বললেন, তোদের সায়েবরা দেকেচেটা কী? রামপেয়ারীকে দেকেচে। এমন ঘুঘুর-সই ঘুঘুর-সই করে দেবে না যে, মনে হবে টাকা মাটি মাটি টাকা। ফিলজফির হাইট জানবি ওই-ই!

চালাক ছুট্টু বোকার মত চেয়ে থাকলো।

আমি বললাম, পরে বলব। বিস্তারিত।

ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবে হোয়াইট-লেবেল খাওয়া হলো। তখন নেশা চড়েছে। বাছবিচারে বিলাস নেই। তারপর লেক ক্লাব। সুক্কুর খাতির করলো খুব। কিন্তু স্কচ নেই। প্রীতিরঞ্জন রায়, প্রেসিডেন্ট, অ্যাপোলজেটিক হলেন। সেখানে একটা করে পিটার স্কট মেরে সোজা ক্যালকাটা ক্লাবে। মণ্টু, গর্ভনরের মতো মর্যাদায় রিসিভ করলো বোঁদেদাকে। খোকাদা দৌড়ে এলেন। সেখানে পর পর দুটো সিভাস মেরেই বললেন, চল গ্র্যান্ডে ফিরে যাই। ব্যাক টু স্কোয়ার ওয়ান।

আমি বললাম, ডিনার কিন্তু আমি খাওয়াবো। পলিনেশিয়াতে।

চুপ। বড়দা থাকতে ছোড়দারা কথা বলে না। পাক্কি-বিরিয়ানী খাবো মুগল-রুমে। তারপর পিংক-এলিফ্যান্টে নেচে, গার্ডেন-কাফেতে ড্রাম্বুই আর সিগার খেয়ে বাড়ি।

ক্যালকাটা ক্লাবের সিঁড়িতে এসেই বোঁদেদা বললেন, বোকা। তোর গাড়ির চাবিটা রামদীনকে দিয়ে দে। তোরা চল আমার সঙ্গে। সেদিন একটি রুপোলী সানবীম-ট্যালবট গাড়ি এনেছিলেন বোঁদেদা। রূপোলী ভেলভেট কুশান।

বুঝলাম মাথায় কিছু একটা খেলেছে।

ড্রাইভিং সীটে বসে গাড়িটা ব্যাক করেই জোরে এক পাক মেরেই শচীন ব্যান্ডো মশায়ের গাড়িকে প্রায় ধাক্কা দিতে দিতে না-দিয়ে, গাঁ-গাঁ করে ব্যাক করে একজিট গেট

www.BanglaBook.org

দিয়ে বেরোলেন। দারোয়ানেরা ভয়ে লাফিয়ে উঠে সরে গিয়ে প্রাণ বাঁচালো। সার্কুলার রোডের মোড়ে আসতেই পুলিশ বুঝতে পারলো না উনি এগোচ্ছেন কী পেছোচ্ছেন। আলো সবুজ হতেই একেবারে ক্যান্টার করে চল্লিশ কিঃ মিঃ তে গাড়ি পেছোতে লাগলো।

প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে উঠলাম আমরা। বললাম, এ কী? খ্যাঁ?

বোঁদেদা বললেন, আজ শালার সব মিনিবাসের হারামজাদা ড্রাইভারদের পিণ্ডি চটকে দেবো। কালঘাম ছুটিয়ে দেবো স্টেট-বাস, প্রাইভেট বাসেরও। শালারা দিনে পাঁচটা করে মানুষ মারচে আর কী রকম আনঅ্যাবেটেড চলেচে বল? শালার দেশে তো অ্যাডমিনিস্ট্রেশান নেই-ই, মানুষও কী কুকুরের বাচ্চা হয়ে গেছে। সব কিছুই সহ্য করে নেয়। নিজে যতক্ষণ না চাপা পড়ছে ততক্ষণ সব ঠিক হ্যায় এমনই একটা ভাব! দ্যাখ না বোকা। আজ কী করি!

আর দেখা! আমাদের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো। মিনিবাস, প্রাইভেট বাস, স্টেট বাস সব দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে এদিক ওদিক দৌড়তে গিয়ে সেমসাইড করে ফেলার অবস্থা। প্রচণ্ড বেগে একটা হুড খোলা রুপোলী-গাড়িতে একজন স্থিরচিত্ত এবং দুজন অস্থিরচিত্ত মানুষকে লাফাতে লাফাতে পেছনদিকে যেতে দেখে বাস-ট্রামের জানালা দিয়ে মুখ বের করে মানুষজন সব চেয়ে রইলো।

আর পেছনে যেতে-থাকা বোঁদেদার গাড়ির মুখোমুখি অথবা পেছন পেছন আমার নিজের গাড়িতে বোঁদেদার ড্রাইভার রামদীন তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে লাফাতে লাফাতে ডান হাত বের করে বারণ করতে করতে আসতে লাগলো। ট্রাফিক-পুলিশেরা চেঁচাতে আর লাফাতে লাগলো, দাড়ি-না-কামানো-মুখে ফার্স্ট ইয়ারে পড়া জোর করে চুমু-দেওয়া প্রেমিকার মতো। তাদের সাদা-কালো ইউনিফর্মগুলোকে মনে হতে লাগলো মেয়েদের স্কুলের ইউনিফর্ম।

বোঁদেদা হাসতে হাসতে বললেন, বেড়ে লাগছে র‍্যা! প্রতি হপ্তায় একবার এরকম করতে পারলে মিনিবাসওয়ালারা সব ঠাণ্ডা হয়ে যেতো। জানতো যে বাবাদেরও বাবা থাকে।

আপনাকে ধরতে আসছে বোঁদেদা।

ছুটু ভয়ার্ত গলায় বললো।

আমাকে কে ধরবে র‍্যা?

টিকিট দেবে পুলিশ।

আমি বললাম এখানে তোদের লানডানের মতো টিকিট-ফিকিট দেয় না। হয় কিসসুই করে না, নয় থানায় নিয়ে গিয়ে প্যাঁদায়। নয়, পাত্তি চায়।

লিন্ডসে স্ট্রীটের মোড় পেরিয়ে ওকে বোঁদেদা বললেন, বুকের ব্যথা-ফ্যাথা সব গায়েব। দারুণ চাঙ্গা লাগছে এখন।

ছুটু বললো এবারে দেশে আসা যথার্থই সার্থক।

দুজন সার্জেন্ট এবং একটি পুলিশ ভ্যান আমাদের ফলো করছিলো। মানে মুখোমুখি আসছিল। ওরা এগোচ্ছিলেন। আমরা পেছোচ্ছিলাম।

থানায় নিয়ে যাবে। ভয়ার্ত গলায় বললো, ছুটু।

ছাড়তো। ড্রাইভিং-এর জন্যে থানায় নিয়ে গেলে আগে সব পুলিশ ভ্যানের ড্রাইভার, দুধের গাড়ির, কর্পোরেশনের গাড়ির, আর মিনিবাসের ড্রাইভারদের থানায় দিক। পেঁয়াজী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মারার জায়গা পায়নি।

ধরবে এবার কিন্তু—

ছুটু আরও ভয় পেয়ে বললো। আমি চুপ করেই ছিলাম।

বোঁদেদা বললেন, আমি নিজে ধরা না দিলে কোনো শালার সাধ্য নেই যে আমায় ধরে বলেই অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে ব্যাক করেই গ্র্যান্ডের সামনে গাড়িটা লাগিয়ে দিলেন। আমার গাড়ি বন্ধ করে রামদীন দৌড়ে এলো। সার্জেন্ট দুজনও মোটর সাইকেল থেকে নেমে এগিয়ে এলেন। পুলিশ ভ্যানটা দাঁড়িয়ে রইলো।

ধরবে এবারে।

ভীষণ ভয় পেয়ে, ছুটু বললো।

দরজা খুলে নামলেন বোঁদেদা। দুজন ভিখিরি দু'হাত তুলে এবং একটা ল্যাজ-নাড়ানো ময়লা-খোঁটা নেড়ি-কুত্তা তার রুখু ল্যাজের ফ্ল্যাগ হয়েস্ট করে স্যালুট জানালো।

একজন সার্জেন্ট বললেন, ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।

ধরো না!

বলেই, বোঁদেদা ঐ নোংরার মধ্যেই ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে গেলেন।

আমি হেসে ফেললাম। কেউ তো জানে না বোঁদেদাকে। কুটুদার ফ্ল্যাটে লিফ্‌ট-এর সামনে যে খেলা খেলেছিলেন এও সেই খেলা।

সার্জেন্ট বললেন, উঠুন উঠুন।

বোঁদেদা নট নড়নচড়ন নট কিচ্ছু। আজকের অভিনয়ের তুলনা নেই কোনো। শম্ভু মিত্রও লজ্জা পেতেন দেখলে। বোঁদেদা যেন সত্যি সত্যিই মরে গেছেন এমন করে পড়ে রইলেন ঐ ধুলোর মধ্যে নির্বিকারে। ভিড় জমে গেলো।

সার্জেন্টরা বললেন, পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে যাবো। এমন চালাকি আমাদের অনেক দেখা আছে।

আমি বললাম, আগে হোটেলে নিয়ে যাই। তারপরে যা করবার করবেন। সার্জেন্টরাও হাত লাগালেন। লবী ম্যানেজার তো দেখেই ছুটে এসে ডাক্তারকে ফোন করলেন। রেসিডেন্টদের মধ্যেও ডাক্তার ছিলেন কয়েকজন। কী একটা মেডিক্যাল কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করতে এসেছিলেন তাঁরা। রিসেপশান থেকে ফোনে একজন ডেকে আনলো ওঁদের দুজনকে। চারজন ডাক্তারই দেখলেন।

আমি ভাবছিলাম কখন বোঁদেদা বলবেন, কী রে বোকাটা?

কিন্তু বোঁদেদা আর উঠলেন না।

একজন ডাক্তার বললেন, হি ইজ ডেড।

অন্যরাও মাথা নাড়লেন।

বোঁদেদা বলতেন, বুঝলিরে বোকা। বাঁচার অনেক রকম হয়। এক মিনমিন করে বাঁচা। আর গমগম করে বাঁচা। তুই ভুলেও ভাবিসনি যে, আমি কোনোদিন উডল্যান্ডস বা বেলভিউতে খাট-আলো করে কারো সীমপ্যাথীর জন্যে শুয়ে থাকবো একটি দিনও। দেকিস।

কথার খেলাপ করেননি মানুষটি।

www.BanglaBook.org

কুচিলা-খাঁই

জীপের স্টীয়ারিং ধরা বাঁ হাতের কব্জির দিকে তাকালাম।

ঘড়ির রেডিয়ামে আড়াইটা চকচক কচ্ছে। সেই দুপুর দুটোয় কটক শহর ছেড়েছি। তারপর মহানদী আর বিরূপার এ্যানিকাট পেরিয়ে ঢেনকানলের উপর দিয়ে এসে, হিন্দোল পেরিয়ে অঙ্গুলে এসে পৌঁছেচি। সেখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার রওয়ানা হয়ে পূর্ণাকোর্টের মোড়ে-এসে বাঁয়ে ঘুরেছি। তারপরও চলছি—পাহাড়ে জঙ্গলে, চড়াইয়ে উৎরাইয়ে! পথের রাঙাধুলোয় গা-মাথা সব একাকার হয়ে গেছে। জার্কিনের জলপাই রংটার উপর ধুলোর আস্তরণ এমনভাবে পড়েছে যে, ড্যাশবোর্ডের মৃদু আলোয় রঙটাকে খয়েরী বলে মনে হচ্ছে।

জীপের হেডলাইটে দেখলাম, সামনেই একটা শালের খুঁটির গায়ে সাদা এক ফালি তক্তার উপর কালোতে লেখা 'টুল্বকা ফরেস্ট রেস্টহাউস।'

একটি প্রায় সমকোণিক বাঁকে চাকাগুলো আপত্তি জানিয়ে কিচ কিচ করে উঠলো--- ঢুকে পড়লাম, টুল্বকার বাংলোর হাতায়। সামনে পড়ে রইল হিমেভেজা ভুরাত্তির রাস্তা। গাঢ় অন্ধকারে একটা ফ্যাকাশে স্বপ্নের মতো।

তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই।

ভোর হয়েছে।

কুচিলা-খাঁই ডাকছে পাহাড়ের উপরের কুচলিা গাছ থেকে। হঁক্ক হঁক্ক হঁক্ক, হঁ কঁক্ক, হঁ কক্ক কঁ হ্যাঁক হ্যাঁক।

দিলো ঘুমটার বারোটা বাজিয়ে।

এমন অসভ্য অভদ্র পাখি ভারতবর্ষে পাহাড় জঙ্গলে আর দুটি নেই। অন্য অনেক পাখি ডাকে বটে, তবে তাদের ডাক এমন শ্রুতিকটু কিংবা বিরক্তিকর নয়। কোটরার বাচ্চা যেমন

www.BanglaBook.org

বিনা কারণে লাফায়, এরা তেমনি বিনা কারণে ডাকে। সব সময় খাই খাই করছে, আর বিরাট বিরাট ডানা আর বিশ্বলোভী ঠোঁট দিয়ে যা পাচ্ছে তাই ঠোকরাচ্ছে। এমন লম্ফঝম্পমান পাখির তেলে বাত সারবে না, তো বাত সারবে কিসে?

ভেবেছিলাম অনেকক্ষণ ঘুমুব! হলো না তা।

জানালা দিয়ে ডিসেম্বরের সুনীল আকাশ দেখা যাচ্ছে।

এমন আশাবাদী আকাশ বহুদিন দেখিনি। ঝক-ঝকে রোদ্দুর হাওয়ায় উড়ছে। ছুটি—ছুটি—ছুটি।

কম্বলটা সরিয়ে উঠে বসলাম চৌপায়াতে। উঠে বসতেই দেখলাম, বাংলোর পাশের ফাঁকা জায়গাতে, কুয়োতলার কাছে কাপড় শুকানোর দড়িতে কী একটা গোলাপী পদার্থ ঝুলছে।

চোখ কচলে ভাল করে দেখলাম।

প্রথমে বিশ্বাস হলো না। ভাবলাম কাল রাতের নেশা কাটেনি। কিন্তু আবার ভালো করে চাইতেই ইচ্ছা না করলেও পদার্থটির উপস্থিতি বিশ্বাস করতে হলো। একটি গোলাপী-রঙা নাইলন-প্যান্টি। এই নিবিড় জঙ্গলে, হাতি-বাইসন-বাঘ অধ্যুষিত পাহাড়ে, এ কোন মেমসাহেব যে এই ভেঙে-পড়া, ছুঁচোয়-ভরা বাংলোয় এসে রয়েছে?

ঘরের বাইরে যেতে সাহসে কুলোল না। ঘর থেকেই হাঁক দিলাম 'চৌকিদার'।

কহন্তু আইজ্ঞাঁ, বলে চৌকিদার এসে দাঁড়াল।

সে আমাকে আগেও দেখেছে অনেকবার। আঙুল দিয়ে রমণী-বাসটি দেখাতেই, সে কাছে এসে বল্ল, ছিত্তিয়া মেম্বসাহেব। কাল রাত্তির আইলা, আর মতে কহিলা সাত্বদিন রহিবি।

মনে মনে ভাবলাম, জ্বালালে দেখছি।

কোথায় একটু নিরিবিলি খেয়ালখুশি মতো দিন কাটাব না কোত্থেকে ছিত্তিয়া মেম্বসাব এসে জুটল!

হাত-মুখ ধুয়ে, জামা-কাপড় পরে বারান্দায় আসতেই দেখলাম, বারান্দার সামনের ঝাঁকড়া চেরীগাছটার পাশে, যেখানে অসম্ভব উদার একরাশ রোদ আর এক ঝাঁক ছাতার পাখি লুটোপুটি কচ্ছে, ঠিক সেইখানটিতে বেতের চেয়ার পেতে একটি বিদেশী মেয়ে বসে আছে, বাংলোর সামনের পাহাড়টার দিকে চেয়ে। পাহাড়টি বলতে গেলে একেবারে বাংলোর গেটের গা ঘেঁষেই উঠেছে। অনেকগুলো কুচিলা-খাঁই, হঁক্ক হঁক্ক করছে, কুচিলা গাছগুলোতে। পাখা ঝাপটাচ্ছে, উড়ছে, বসছে, এক কথায় এই সুন্দর শান্ত শীতের সকালের সবটুকু সৌকুমার্য এদের কদর্য সশব্দতায়, চিরে ফালা ফালা করে দিচ্ছে।

মেয়েটি কুচিলা-খাঁইগুলোকে দেখছিলো; এক দৃষ্টে চেয়েছিলো। আমি অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে তাকে দেখলাম। ছিত্তিয়া মেমসাহেবকে দেখে নাস্তিকের মতিভ্রম হলো।

এমন স্নিগ্ধ, শান্ত, সমাহিত সৌন্দর্য আগে আমি আর দেখিনি। মেমসাহেবের যে এমন বাঙালি মেয়ের কমনীয়তা থাকতে পারে আমার ধারণার বাইরে ছিল। একটি কচি-কলাপাতা রঙের গরম পোশাকে সে বসেছিল। পায়ের উপর পা দিয়ে। তার গ্রীবাহেলনের মানোরম ভঙ্গি, তার বসার ভদ্রভাব, তার আত্মতন্ময়তা সমস্ত মিলেমিশে আমার একটি চমক লাগল। এই সুস্নাতা, সুগন্ধি, বিদেশী মেয়েটি প্রকৃতির অন্য অনেক সুন্দরী ফুলের মত এখানে এই টুল্বকার জঙ্গলে আমার চোখকে তৃপ্ত করবে বলে কাল রাতে ভাবতেও

www.BanglaBook.org

পারিনি।

ভাবলাম, ওকে 'ডোন্ট-কেয়ার' করে বন্দুক-কাঁধে বেরিয়ে পড়ি। আজকের খাওয়ার সংস্থান করতে ত হবে।

এই ভেবে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে, চেরী গাছটাকে বাঁয়ে ফেলে হনহনিয়ে এগিয়ে গেলাম।

কিন্তু মেমসাহেব পেছন থেকেই সুপ্রভাত জানাল।

অতএব ভদ্রতার খাতিরে ফিরতে হলো।

মেমসাহেব অহেতুক ফর্মালিটি এড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা ঐ যে পাখিগুলো চেঁচা-মেচি করছে, ওগুলোর নাম কী? চৌকিদার বলছিল 'কুলা-খাঁই'।

আমি হেসে বললাম, কুলা-খাঁই নয়; কুচিলা-খাঁই, বাংলায় আমরা বলি ধনেশ পাখি, ইংরিজি নাম 'The Great Indian Hornbill'।

মেমসাহেব খুলে বলল, They are a nuisance to this serenity.

তক্ষুণি বেরুনো হলো না।

ওখানে বসে আর একবার কফি খাওয়া হলো।

সীণ্থিয়া জোনস বল্ল, আমি এসে পড়াতে নাকি খুব ভালো হলো। এক ধরনের বিশেষ লতা সম্বন্ধে গবেষণা করছে ও।

আমি শিকারে প্রায়ই এখানে আসি শুনে বলল, তাহলে তো খুব ভালোই হলো, আপনার এখানের জঙ্গল পাহাড় সব চেনা আছে। তাছাড়া কাল তো আমি বিকেলে হাতির তাড়া খেয়ে পালিয়ে বেঁচেছি। শিকার তো প্রত্যেক বারই করেন, এবার একটু অবলার সহায় হোন! নইলে, আমায় শূন্য হাতে ফিরতে হবে। লতা সংগ্রহ হোক আর না হোক ভয়-মুক্ত হয়ে জঙ্গলে পাহাড়ে বেড়িয়ে বেড়ানোটাও তো একটা আনন্দের মতো আনন্দ।

আমি বললাম, তথাস্তু; তবে একটু-আধটু শিকারও তো করতেই হবে। পটহান্টিং। নইলে খাবেন কী?

সীণ্থিয়া বলল, কেন টিনের খাবার? সব সঙ্গে আছে।

আমি বললাম, টিনের খাবারে আমার অরুচি। এখন উঠি, গোটা দুই মুরগী মেরে আনি।

কিন্তু তক্ষুণি ওঠা হলো না। সীণ্থিয়া উঠতে দিল না। বলল, বসুন না একটু। এমন সুন্দর সকাল একটু গল্প করা যাক।

সীণ্থিয়া অনেক কথা জিজ্ঞেস করল, আমার নাম কী, কী পেশা, শিকার করতে ভালোবাসি কেন, আর কোনো নেশা আছে কি না, কী কী জানোয়ার মেরেছি ইত্যাদি প্রচুর ছেলেমানুষী প্রশ্ন।

অন্য জায়গা এবং অন্য লোক হ'লে হয়ত সব কথার উত্তর দিতাম না—কিন্তু লোকে যখন আমার মতো ছুটি কাটাতেই আসে, তখন একটা অকেজো ছেলেমানুষীর রেশ মাখানো থাকে সেই সমস্ত ছুটিটাতে। বরঞ্চ তখন বুড়োমানুষী করতেই মন চায় না।

শেষকালে আড্ডার মায়া কাটিয়ে উঠলাম। বন্দুকটা নিয়ে বাংলোর হাতা পেরিয়ে পাহাড়ের নিচের সুঁড়ি পথে হারিয়ে গেলাম।

আসবার সময় সীণ্থিয়া বলল, তাহলে মারবেনই মুরগী, ছাড়বেন না?

আমি বললাম, আগে মারি।

ও বলল, তবে মারুন, রান্না কিন্তু আমি করব।

ভাবলাম, আরে এ যে গৌরীপুরী বৌদি আমার। কোথায়, কোন থালায়, কার হাতে

www.BanglaBook.org

যে কার ভাত বাড়া থাকে তা কি কেউ জানতে পায়?

পরদিন বিকেলে চা খাওয়ার পর সীম্মিয়াকে বললাম, চলুন মাছ ধরে আসি।

—কোত্থেকে?

—কেন? ভুরাগুির পথে যে জলপ্রপাতটা আছে, সেখান থেকে।

—আছে বুঝি জলপ্রপাত?

—নেই নাকি। দেখেননি এখনো?

—না তো।

—চলুন, নিয়ে যাচ্ছি। বাংলো থেকে বড় জোর দু ফার্লং হবে।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম লালমাটির রাস্তার উপরের সেই জলপ্রপাতে। বেশ উঁচু থেকে জল পড়ছে, ঝরঝরিয়ে! নিচে বেশ গভীর জল। একটু পুকুরের মতো হয়েছে সেখানে। সেখান থেকে জল তিনটি ধারায় বিভক্ত হয়ে চলে গেছে জঙ্গলের গভীরে। জলটা উপর থেকে যেখানে পড়ছে সেখানে হাজার হাজার শ্বেত সাপের মতো ফেনা কিলবিল কচ্ছে। আর ছোট ছোট মাছ লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে জলের স্বচ্ছ ফোয়ারায়। এর নাম "ভীমধারা"।

সীম্মিয়া তো দেখে অবাক। বাংলোর এত কাছে এমন সুন্দর জায়গা অথচ আগে আসেনি।

আমি বললাম, একা একা বেশি না-আসাই ভালো। বলে, ওকে সঙ্গে করে, যেখানে ঝর্নাটা বিভিন্ন ধারায় ভাগ হয়ে গড়িয়ে গেছে উপত্যকায়, সেখানে নিয়ে গিয়ে জলের ধারে শম্বরের পায়ের দাগের সঙ্গে বাঘের পায়ের দাগও দেখালাম। সীম্মিয়া একটুও ভয় না পেয়ে বলল, আমাকে একদিন বাঘ দেখাবেন?

হেসে বললাম, বাঘ দেখাবো কিনা হলপ করে বলতে পারি না, তবে দেখতে চাইলে, বাইসন-চরুয়া মাঠে নিয়ে গিয়ে বাইসন দেখাতে পারি।

বাচ্চা মেয়ের মতো ভুরু নাচিয়ে বলল, তবে ত আরো ভালো হয়।

আমি বললাম, বেশ তো, দেখাবো বাইসন। পুরো দলটাই। নিশ্চয় দেখাবো।

একটা বড় পাথরের উপর বসে আমরা ছিপ ফেলছিলাম। হাত ছিপ। তবে সুতো মজবুত। আস্তে আস্তে বেলা পড়ে আসছিলো। শীতের বনে, জঙ্গল-পাহাড়ে, আসন্ন সন্ধ্যায় কী যে সে এক করুণ রাগিণী বাজতে থাকে, তা কী বলব! ঘরের মানুষকে সে-সুর ঘরে ডাকে, প্রিয়জনকে সে-সুর কাছে টানে, আর আমার মতো "খোদার ষাঁড়কে" আরো বাউণ্ডুলে করে তোলে!

জলপ্রপাতের উপরের পাথরগুলো, শুয়ে শুয়ে আদিবাসী ছেলের বুকের ছাতির মতো বুক চিতিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে কখন সন্ধ্যাতারা উঠবে সেই ক্ষণ গুনছে। সেখান থেকে একটি ময়ূর বার বার ডেকে উঠছে কেঁয়া, কেঁয়া। একটা কোটরা হরিণও জলপ্রপাতের ডানদিক থেকে ডাকছে ব্বাক, ব্বাক, ব্বাক। রাইফেলটাকে হাতের কাছে টেনে রাখলাম।

এই টানছে, টানছে, ফাৎনা ডুবলো। চেঁচিয়ে উঠল সীম্মিয়া।

আমি বললাম, টানো টানো। এক হ্যাঁচকা টান মারল সীম্মিয়া। মাছটা শেষ সূর্যের আলো আর জলপ্রপাতের জলের ছটায় মুক্তির জন্যে শেষ বারের মতো ঝিকমিক করে উঠলো। তারপরই সঙ্গের বেতের ঝুড়িতে তাকে পুরে ফেলা হলো।

সীম্মিয়া আনন্দে লাফাচ্ছিল। একটা আকাশী নীল-রঙা স্কার্ট আর ফিকে গোলাপী

www.BanglaBook.org

হাতওয়ালা উলের সোয়েটার পরেছে ও। ওর নরম স্বপ্নিল সোনালী চুলে জলের গুঁড়ি হাওয়ায় এসে জমছে। তার উপর ক্লান্ত পৌষের বিষণ্ণ রোদের চুমু লেগেছে। মনে হচ্ছে সীম্থিয়া জোন্স নয়, যেন এক প্রাচীনা আর্যকন্যা তার উদ্ধতা কোমল গ্রীবাভঙ্গিতে এই জলপ্রপাতের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কেন জানি না আমার ওকে ভীষণ পেতে ইচ্ছা করল। ওর মতো সুগন্ধি, সুহাসিনী, স্বচ্ছতোয়া নারী আমার জীবনে এলে, ভাবলাম, হয়ত আমার এই রুক্ষ পৌরুষের দুর্গন্ধময় জ্বালা আর থাকবে না।

এই ভাবনাটা মনে ব্যপ্ত হতে না হতে কোথা থেকে এক ঝাঁক ছাতার পাখি, ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ করতে করতে কোণাকুণি মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল।

আমার ছিপেও একটা মাছ উঠল। বেশ বড় মাছ।

এদিকে সন্ধ্যা এসে জলপ্রপাতের মাথায় তার কালোচুল মেলে দাঁড়িয়েছে দেখলাম। কৃষ্ণপক্ষের রাত। সন্ধ্যাতারাটি পিদিম হাতে পথ দেখাতে এল। বনের পাতায় শিরশিরানি তুলে তার পিছু পিছু একটা হাওয়াও এল।

আমি আর সীম্থিয়া বাংলোর দিকে চললাম।

চলতে চলতে সীম্থিয়া বলল, গোটাম, চল আমরা এখানে সাঁতার কাটব। আপত্তি আছে তোমার?

আমি বললাম, আপত্তি কিছু নেই। তবে সাঁতার কাটার চেয়ে শুধু স্নান করাটাই ভাল হবে। ওখানের পাথরগুলো ভারী অসমান আর জলের তলায় কোথায় যে উঁচু আর কোথায় নিচু তাতো তুমি দেখতে পাবে না। গতবার আমার এক পাইলট-বন্ধু এইখানে এসে সাঁতার কাটতে গিয়ে কলারবোন ভেঙে ফিরেছিল। বেচারার ক্যারিয়ারটাই খতম হয়েছিল একটু হলে।

সীম্থিয়া ওর ডানহাতের পাতায় আমার বাঁ-হাতের পাতাটি নিয়ে বলল, আমাকে ভয় দেখিও না। তা ছাড়া তুমি তো আছ। তুমি থাকতে আমার ভয় কী?

এমনভাবে সীম্থিয়া কথাটা বলল, যেন আমার উপর ভরসা করেই এই অবলা নারী এই রকম জায়গায় লতা খুঁজতে এসেছিল। তবু, যাকে ভালো লাগে, যার সঙ্গ ভালো লাগে; যার হাতে হাত ছোঁয়ালে শিশু বয়সে মার স্তনে হাত ছোঁয়ানোর মতো আশ্বস্ত মনে হয়, সে যদি এমন করে বলে যে, "আমি আছি" জেনে সে নিশ্চিন্ত, তবে তার চেয়ে বড় কিছু প্রাপ্তি আছে বলে তো আমি জানি না। যাকে ভাল লাগে কিংবা ভালোবাসি, তার সবটুকু বিশ্বাস যদি আমার উপর ন্যস্ত হয়, তাহলে আমি তার জন্যে কি না করতে পারি। হয়তো প্রাণও দিতে পারি। তাছাড়া একটা প্রাণের জন্ম তো একটা জৈব দুর্ঘটনা বই নয়, কিন্তু ভালোবাসা তো দুর্ঘটনা নয়, সে যে এক স্বেচ্ছারোপিত ব্যথার ফুল। যার অবয়ব নেই। তবু নড়লে-চড়লে যে ঝুমঝুমিয়ে বাজে।

সীম্থিয়াকে দেখে যে আমার ভারতীয় বলে মনে হয়েছিল, তার কারণ ছিল। ওর মা ভারতীয়, বাবা ইতালীয়। পরে অবশ্য বিচ্ছেদ হয়ে গেছিল দুজনের। তার বেশি কথা ওর সম্বন্ধে জানতে পারিনি এবং জানতে চাইওনি। তাছাড়া ও নিজের থেকে খুশীমনে নিজের সম্বন্ধে যা বলেছিল, তাই শুনেছিলাম।

গতকাল সকালে ওর সঙ্গে পাহাড়ে গেছিলাম। এই পাহাড়-জঙ্গলে একা একা ঘোরা ওর পক্ষে সত্যিই সম্ভব হতো না। হাতি প্রচুর আছে, তাছাড়া বাইসন এবং ভাল্লুকও আছে।

www.BanglaBook.org

এদের কাছ থেকেই অতর্কিত আক্রমণের সম্ভাবনা বেশি। কালকে তো প্রায় আমাদের গায়ের উপর দিয়ে একটা ভাল্লুকের বাচ্চা ডিগবাজী খেয়ে চলে গেছিল। সীঘ্নিয়া খিলখিলিয়ে হেসে বলল, দেখো দেখো, একটা ভাল্লুক-খাঁই।

আমি ওর কথার ধরণ দেখে হাসি চাপতে পারলাম না। কুচিলা-খাঁই নাম দেখে, সব জানোয়ারের পেছনেই ও খাঁই বলতে শুরু করেছে।

জঙ্গলে পাহাড়ে চৈতন্য হবার পর থেকেই ঘুরে বেড়াচ্ছি। অনেক গাছ দেখেছি, অনেক ফুল দেখেছি, অনেক লতা দেখেছি, অথচ তাদের সকলের বৈজ্ঞানিক নাম কখনো জানিনি। তাদের স্থানীয় নাম জেনেছি; তাদের ভালোবেসেছি, এই পর্যন্ত। এই যে জঙ্গল, এতে আসন, শাল, পিয়াশাল, সেগুন, কুচিলা, মহুয়া এবং নানারকম বাঁশে ভরা।

একরকম মোটা-সোটা গাঁট্টা-গাঁট্টা বাঁশ দেখিয়ে সীঘ্নিয়া বলেছিল, এদের নাম কি জান? Bamboosa Robusta আর ঐটা কি বলতো? Bamboosa Ardensia যখনি ফুল ধরতে শুরু করবে, তখনি এদের মরবার পালা শুরু হবে। শুকিয়ে যাবে ধীরে ধীরে।

আমি বললাম, বাঃ চমৎকার নিয়ম ত। মানুষদের জীবনেও এরকম হওয়া উচিত। ফুল ধরবার পরে বেঁচে থাকবার কি মানে হয় জানি না। মৃত্যু, সার্থকতার অনুগামী হওয়াই উচিত। সার্থকতার পর বাঁচবার মতো কোনো যথেষ্ট অনুপ্রেরণা আমাদের নেই। সার্থক হবার চেষ্টাই ত জীবন। তুমি কি বল?

সীঘ্নিয়া নীল-রঙা এক গুচ্ছ ফুল হাতে দোলাতে দোলাতে বলল, মৃত্যু যদি সার্থকতার অগ্রগামী হয় তা হলে?

আমি কিছু বলি না। আমি শুধু শুনি।

গাছপালার মসৃণ গা বেয়ে উদার সূর্যের সহস্র সোনালি আঙুল সমস্ত বনভূমির শরীরে আদর ছোঁওয়াচ্ছিল। আমরা হাঁটছিলাম। শিশির ভেজা ঘাস, লতা পাতা থেকে একটা অদ্ভুত গন্ধ বেরোচ্ছিল। তার সঙ্গে কত শত নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ মিশে মন্থর শীতার্ত হাওয়ায় রোদের আঙুলে কাঁপছিলো। নানারকম হাইবিসকাস এর মুখে সকালের মুখের ছবি দেখছিলাম। সীঘ্নিয়া আপন মনে এক-একটা বিরাট উদ্ভিদ বিজ্ঞানের নাম বলছিল প্রায় স্বগতোক্তির মতো, আর সেই নামের বহর শুনে যে লতা, যে ফুলকে ছোটবেলা থেকে দেখেছি, তাদের হঠাৎ খুবই রাশভারি বলে মনে হচ্ছিলো।

আমি বললাম, Emerson-এর সেই কবিতাটা পড়েছো?

কোন্ কবিতা?

সীঘ্নিয়া বললো।

যতটুকু মনে ছিল, আমি তাই আবৃত্তি করলাম—

"But these young scholars; who invade our hills
Bold as the engineer who fells the wood,
Love not the flower they pluck and know it not,
And all their Botany is latine names—"

সীঘ্নিয়া বলল, Superb! Superb! আচ্ছা গোটাম, তুমি এই জংগল পাহাড়কে খুব ভালোবাস? না? যদি তোমার মতো করে ভালোবাসতে পারতাম।

আমি বললাম, তোমার ভালোবাসা জঙ্গল-পাহাড়ের মতো নির্জীব বস্তুতে অপচয় করবে কেন? ভালো যদি বাসতে চাও, তো তোমার কি পাত্রের অভাব?

www.BanglaBook.org

সীম্বিয়া কথাটার জবাব দিলো না, এড়িয়ে গেল, এবং কেমন ব্যথিত ও চকিত হয়ে আমার দিকে ওর নিভৃত চোখ তুলে চাইলো।

আমার সীম্বিয়া মেমসাহেবকে ভীষণ ভালো লাগছিলো। জীবনে যা আমি বরাবর ভয় করে এসেছি, সরবে যার বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছি, সেই নীড়-বাঁধার মতো লজ্জাকর ও স্থাবর মনোবৃত্তিটা আমারও মনের কোণে উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগলো। মনে মনে তাকে অনেকবার বন্দুক উঁচোলাম, কিন্তু সে কিছুতেই ভয় পেল না।

রাত আটটা হবে। বারান্দায় বসেছিলাম। বাংলোর সামনে কিছুই চোখে পড়ে না! জমাটবাঁধা কালো অন্ধকার চোখের সামনে মনের জমাটবাঁধা ভাবনার মতো ভারী হয়ে বসে আছে। পাহাড়টাই বেশি ভারি না অন্ধকারটাই বেশি, ঠাহর করতে পাচ্ছি না। পাহাড়ের নিচের সেগুন গাছের জঙ্গলে জোনাকীর ঝাঁক জ্বলছে আর নিবছে! অমাবস্যার রাতের ঢেউয়ের বুকের ফসফরাসের মতো।

এই ঘনান্ধকার ভয়গর্ভ রাতের একটা সুপুরুষ ব্যক্তিত্ব আছে। এই অন্ধকার রাতে, বন-পাহাড় যেমন ভাবে অদৃশ্য ও অসাধারণ ভাবে ব্যক্ত হয় তেমন আর কোনো সময়েই নয়! প্রকৃতির বুকের কোরকে যে শক্তিমান পুরুষ বাস করেন, সেই পুরুষ এই অন্ধকারে প্রতীয়মান হন। যাদের চোখ আছে, তারাই তাঁকে দেখতে পায়।

বাংলোর পেছনের সারি সারি আলপনা-দেওয়া ছোট ছোট মেটে ঘর। ছোট উঠোন, পাতকুয়ো, দু-একটি শান্ত বিজ্ঞ গোরু, গুটি কয় চঞ্চল পোষা মুরগী, এবং অনেক নগ্ন, অসুস্থ অথচ সদাহাস্যময় শিশু। এই নিয়ে টুল্বকা গ্রাম। এখন রাত নেমেছে। কালো রঙের তুলির আঁচড়ে সব মুছে গেছে। নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে। গ্রামের পেছনের ধানক্ষেতে হাতি নেমেছে। মাচায় বসে ক্যানেস্তারা বাজাচ্ছে ছেলেরা, শীতের রাতে, পায়ের নিচে সরায় কাঠের আগুন নিয়ে। শাল কাঠের মশাল করে তাতে আগুন জ্বেলে আন্দোলিত করছে। হাতির দল বৃংহন করতে করতে আবার পাহাড়ে ফিরে যাচ্ছে।

সীম্বিয়া, চৌকিদারের হাতে বাসনপত্র দিয়ে বাবুর্চিখানা থেকে বারান্দায় এসে উঠল। বলল, শীগগিরি শীগগিরি এসো, সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল!

নড়বড়ে কাঠের টেবিলে খাবার সাজিয়ে, কম্পমান লণ্ঠনের আলোয় আমার উল্টোদিকের চেয়ারে বসে, আমার জঙ্গলের প্রেমিকা বললো, খাও, গোটাম, শুরু করো!

মুসুরীর ডালের স্যুপ, ফ্রায়েড রাইস এবং মুরগীর রোস্ট। এ জঙ্গলে রোজ রোজ এমন খাবার খাব, আর শুধু তাই নয়, এমনভাবে খাব, কে ভেবেছিল? খেতে খেতে আমি বললাম, তুমি আমার অভ্যেস খারাপ করে দিচ্ছ। আর চারদিন পরে যে চলে যাবে, তখন কী খাবো? সীম্বিয়া বলল, কেন? এবেলা খিচুড়ি, ওবেলা খিচুড়ি, তাছাড়া তোমার ঘোড়ামার্কা রাম ত আছেই। তোমার মতো লোক মানুষ না হয়ে ঘোড়া হয়ে জন্মালেই পারত। বলে, খিলখিলিয়ে হেসে উঠল।

তারপরই গম্ভীর এবং খুব নিচু গলায় আমাকে প্রায় ফিসফিসিয়ে বললো, তুমি খুব মজার ছেলে। তোমার মধ্যে খুব প্রাণ আছে। যে মেয়ে তোমাকে বিয়ে করবে সে খুব সুখী হবে।

মুরগীর ঠ্যাং চিবোতে চিবোতে বললাম, দেখো এই জ্ঞানের ভয়ে লোকালয় ছেড়ে থাকি। জঙ্গলেও যদি জ্ঞান দাও, তো পালাবার জায়গা দেখিনা।

সীম্বিয়া বলল, আমি ঠাট্টা করছি না, যা বলছি তা সত্যি কি না দেখো।

www.BanglaBook.org

ভাবলাম, এও তো আর এক জ্বালা। যাকে মনে মনে ভালো লাগতে আরম্ভ করেছে, যাকে প্রেয়সী বলে ভেবে আকাশকুসুম কল্পনা করছি, সে হঠাৎ পিসীমা ব'নে উপদেশ দিতে আরম্ভ করলো। পড়াশুনাটা করলে, কী করে কথা গুছিয়ে বলতে হয় তা লিখতে পারতাম। একে তো কাউকে আমার আদপে কিছু বলারই থাকে না, যদি বা বলার মতো কোনো কথা জমে, তাও মনে মনে হাঁড়ির মধ্যে খিচুড়ির মতো টগবগ করে। তা বলা হয় না।

আমি কিছু বললাম না। উত্তরে চুপ করেই রইলাম। কারণ আমি জানতাম, বলার সময় এখনো আসেনি। জীবনে একটা ভীষণ রকম প্রয়োজনীয় কথা বলার জন্যে একটু মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন, অন্তত আমার পক্ষে।

আমরা চুপচাপ খাচ্ছিলাম। সীঞ্জিয়া, চামচে করে একটু একটু ফ্রায়েড-রাইস আলতো করে মুখে তুলছিলো। তারপর নিঃশব্দে চিবোচ্ছিল। ওর হাঁটায়, কথা বলায়, চোখের চাউনিতে এমন কি খাওয়াতেও এমন একটা শান্ত শ্রী, এমন একটা সহজীয়া রেশ আছে যে, ওকে দেখে আমার মনে হতো ওর জীবনে বোধ হয় কোনোদিন ওকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলতে হয়নি, নিজে যা ভাল বলে মনে করেছে সেই শুভবুদ্ধি থেকে নড়তে হয়নি। তাই ও পাহাড় থেকে প্রথম বেরুনো ঝর্নার মতো পবিত্র ও স্বচ্ছতোয়া। কোনো বাঁধ বাঁধা হয়নি এ পর্যন্ত ওর ইচ্ছা বা রুচির বিরুদ্ধে। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগত ও যখন হাসত। প্রথমে চোখের তারায় একটু বিদ্যুতের ছটা দেখা যেত, তারপর সেই ছটা ছড়িয়ে যেত, সমস্ত মুখময়, পাতলা দুটি জিনিয়া ফুলের পাপড়ির মতো ঠোঁটে, দু সারি সুচারু দাঁতে, সুকুমারী চিবুকে।

আমি ভাবতাম এমন করেও কি কেউ হাসতে পারে? কিংবা কোনো মেয়ের হাসি এমন ভাবে কোনদিন দেখিনি বা দেখবার চেষ্টাও করিনি কোনোদিন হয়তো বা।

সীঞ্জিয়া যতক্ষণ কাছে থাকত ততক্ষণ আমার সমস্ত সত্তা ঘিরে একটি সুগন্ধ উঠত অনুক্ষণ। ওর সান্নিধ্যে কোনো জ্বালা ছিল না। কোনো কামনার ধারালো ছুরি কখনো আমাকে ফালা-ফালা করত না। ওর সান্নিধ্য, আমার অনেক নৈরাশ্যের অতল গহ্বর আলোকিত করে রাখত, আমার অনেক ভালোলাগাকে মৌসুমী ফুলের মতো সমস্ত সত্তা জুড়ে ফুটিয়ে তুলত। মনে মনে, আমি নিজে যা নই, তাই মনে হ'ত। মন হত আমিও ওর মতো শুচি, পবিত্র, ওর মতো সরল। মাঝে মাঝে এমন হতো যে, আমার ওকে নিয়ে নীড় বাঁধবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা আছে এমন ধারণাও আমার মনের মধ্যে শিকড় গাড়বার চেষ্টা করত। তখন সত্যিকারের ভালোবাসার সন্তান যে বিনয়, সেই বিনয় এসে আমাকে তুড়ে বলত 'তুই একটা অপদার্থ'। অমনি 'মুই অতি ছার' ভাব নিয়ে নিজের নৈরাশ্যের খনির ভেজা সিঁড়ি বেয়ে, অন্ধকারে, অনিশ্চয়তায় আবারও নেমে যেতাম।

আর যাই হোক, বোকা আমি কোনদিনই ছিলাম না। আমি জানতাম, আমি বুঝাতে পারতাম যে, সীঞ্জিয়া যে-কোনো কারণেই হোক আমাকে পছন্দ করে। মানে, নিছক পছন্দ করার জন্য নয়। আমাকে ওর বিশেষ এক ভাবে ভালোলাগে।

আমি বুঝতে পারতাম।

ওর চাউনি, ওর কথার সুর, আমার সামান্য সুখের জন্য ওর উৎকণ্ঠা সবই বুঝতে পারতাম। বুঝতে পারতাম আর অবাক হয়ে যেতাম যে, এই ছাত্রীটির পড়াশুনার চেয়ে আমার প্রতি আগ্রহ বেশি বলে। ওর মধ্যে কোনো সস্তা জিনিস ছিলো না, কোনো ন্যাকাপনা

www.BanglaBook.org

ছিলো না। আমার এই উদ্দাম জংলীপনা ওকে আকৃষ্ট করেছিল। ওর দুচোখে আমি আমার এই আলো-হাওয়া বন-পাহাড়ের জীবনকে শুষে নেওয়ার আকুতি দেখতে পেতাম। ভারী ভালোলাগত। এত ভালো আমার কোনোদিনও লাগেনি।

খাওয়ার পর, বারান্দায় বসে, আর একটু গল্প করা হলো।

সীম্বিয়া বললো, তুমি রোজ আমাকে ঠকাচ্ছ। কাল আমাকে চান করতে নিয়ে যেতেই হবে সেই জলপ্রপাতে।

আমি বললাম, হবে'খন, রাত তো পোয়াক।

তারপর যে যার ঘরে শুতে গেলাম।

শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, সীম্বিয়া প্রায়ই আমাকে বলে you are a darling! You are so sweet ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ এমন করে বলে, যেন পাশের বাড়ির মহিলা তার পাশের বাড়ির মহিলার ছেলেকে বলছেন।

ওকে আমি বুঝতে পারি না। ওকে আমার ভীষণ ভালো লাগে! বলতে গেলে, পাগলের মতো ভালোলাগে। ওরও যে আমাকে ভালোলাগে তা বুঝতে পারি, অথচ কথাবার্তায় এমন একটা সম্মানজনক ও সম্ভ্রান্ত দূরত্ব ও বজায় রাখতে চায় যে, আমার ভালোলাগে না। ও বোধ হয় ভয় পায়; পাছে এই জঙ্গল পাহাড়ে দুরন্ত বেপরোয়া ছেলে, এমন কিছু আবদার করে বসে, যা ওর দেবার সাধ্য নেই। জানি না; কিছুই জানি না।

কুচিলা খাঁই-এর ডাকের জন্যে কোনোদিন ভালো করে ঘুমুনোর জো-টি নেই। রোজ সকালে, আর শুধু সকালে কেন? সমস্ত সময়ই তো হঁক হঁক, হঁক, হ্যাঁক্ হ্যাঁক করছে!

ঘুম থেকে উঠতেই, সীম্বিয়া বাইরে থেকে আমায় ডেকে বললো, গোটাম you better shoot a couple of these noisy filthy birds. They are telling on my nerves.

চৌপায়াতে বসে বসেই বললাম, কেন? তোমার কি বাত হয়েছে না কি?

সীম্বিয়া রেগে বললো, না না সত্যি বলছি, এই পাখিগুলোকে আমি আসা অবধি সহ্য করতে পারছি না।

প্রাতরাশ খেয়ে সীম্বিয়ার সাদা স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ডে চেপে আমরা ঝর্নাটায় গিয়ে পৌঁছলাম।

তখনো জল বেশ ঠাণ্ডা। আমি বললাম, আর একটু পরে নেমো, অসুখ করে যাবে। সীম্বিয়া বলল, বেশ, তবে আগে চলো, জলপ্রপাতের মাথায় যে সুন্দর জায়গাটা দেখা যাচ্ছে, সেখানে উঠি। জলটা কোথা থেকে আসছে দেখব।

আমি বললাম, চল, ঝোঁক যখন হয়েছে তখন তো আর বাধা শুনবে না।

জলপ্রপাতটা বেশ উঁচু মাথা থেকে নিচের পুকুর প্রায় একশ ফিট হবে। তবে সেখানে তিন চারটে প্রপাত। কম বেশি পনেরো কুড়ি ফিট উঁচু, একের মাথায় আর এক। পাকদণ্ডী ঘুরে উপরে উঠতেই চোখ জুড়িয়ে গেল। আমিও কোনদিন উপরে উঠিনি। গভীর জংগল আর লতাগুল্মর আড়াল থেকে চওড়া পাথরের খয়েরী আর কালো চাতাল বেয়ে জলধারা কুলকুল করে বেয়ে আসছে, এসে, শীতের সকালে ক্রীড়াচ্ছলে, রামধনু চুল উড়িয়ে ঝাঁপ দিচ্ছে নিচে। উপরে দুধারে লতাপাতা ঝুঁকে পড়েছে. দুধারই চমৎকার ছায়া-শীতল। রোদে পাথর যতটুকু গরম হয়েছে, তাতে তার উপর শুয়ে থাকতে ভারী আরাম। জলধারার দু-ধারে থোকা থোকা কী একটা জংলী লতায় ফিকে নীল ফুল ফুটে আছে! পাথরের

www.BanglaBook.org

কালোতে-খয়েরীতে, জলের ফেনিল-সাদাতে, আর এই নীল লতার নীলে এমন একটা অপার্থিব ছবি হয়েছে যে কী বলব। সীহ্রিয়া লতাগুলোর কাছে গেলো, তারপর বললো এগুলোর নাম কী জান? প্যাশানফ্লাওয়ার। এগুলো জংলী লতা মোটেই নয়। নিশ্চয়ই কোনো সৌখীন লোক এখানে এনে কোনোদিন লাগিয়ে গেছিল।

সীহ্রিয়া বললো, আমি এমন জায়গা ছেড়ে নিচে যাচ্ছি না।

সেই জলধারা ধরে সামান্য এগোলেও বেশ গভীর দু-তিনটি জায়গা আছে। যেখানে জল এক কোমর থেকে বুক অবধি। সবচেয়ে মজা হচ্ছে, এখানে জল একেবারে স্ফটিক স্বচ্ছ। মন হারালে, মন কুড়িয়ে নেওয়া যায়।

সীহ্রিয়া ফ্লাস্কে করে কফি বানিয়ে এনেছিলো।

আমি বললাম, তুমি চান কর, আমি কফি খাই।

ও বলল, তুমি চান করবে না নাকি?

হালকা গোলাপী রঙের একটা সাঁতারের পোশাক পরেছিল সীহ্রিয়া। ঝকঝকে জলের মধ্যে একটা গোলাপী হাঁসের মতো মনে হচ্ছিলো ওকে। বাদামীতে সাদাতে মেশানো ওর আশ্রয়াকুল হাত দুখানি জলের মধ্যে ফোয়ারা ওঠাচ্ছিল।

মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে বলছিল, সব কফি খেও না কিন্তু!

আমি কফিতে চুমুক দিচ্ছিলাম, আর ভাবছিলাম, এ কদিন শিকারে আমি প্রায় গেলামই না, অথচ কী করে যে ক'টা দিন গেটে গেল টেরই পেলাম না। সীহ্রিয়া তো আর দু'দিন বাদেই চলে যাবে। তারপর সময়টা সকাল বেলার কুয়াশার মতো একেবারে আমার উপর চেপে বসবে। তবু বেশ কাটল এ ক'টা দিন। এত কাছে থেকে এত দূরে কি করে থাকতে হয় সীহ্রিয়ার কাছে তা শেখার আছে।

হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে সীহ্রিয়া চিৎকার করে উঠলো, হেল্প! হেল্প!

তাকিয়ে দেখি, জলের তোড়ে সীহ্রিয়া নিচে প্রপাতের দিকে ভেসে চলেছে আর প্রাণপণে হাত পা দিয়ে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। সেখান থেকে প্রথম প্রপাতটি বড় জোর তিরিশ চল্লিশ ফিট হবে।

কাণ্ডজ্ঞান রহিত হয়ে লাফিয়ে পড়লাম জলে। জল তো সেখানে সামান্য, হাঁটুও নয়; কিন্তু কী পিছল। লাফাবার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রচণ্ড আছাড় খেলাম। হাঁটুতে এমন একটা চোট লাগল পাথরের উপর পড়ে যে মনে হলো অজ্ঞান হয়ে যাবো। অজ্ঞান যে কেন হলাম না জানি না কিন্তু সীহ্রিয়া বেঁচে গেল, আমার পাশ দিয়ে ভেসে যাবার সময় ওর হাত আমার হাতে লাগল, এবং আমি প্রায় শোওয়া অবস্থাতেই হেঁচকা টান দিয়ে একটা বড় পাথরে দু-পায়ে ভর রেখে, ওকে আমার কাছে টেনে আনলাম। ভয়ে বেচারীর মুখ চোখ শুকিয়ে গেলেও, ওর ঠোঁটে সেই আশ্চর্য হাসিটি লেগেই ছিল। কিছুটা অভাবনীয়তায়, কিছুটা প্রাণ প্রাপ্তির-আনন্দে ও অস্ফুটে কী যেন বলে উঠল, বুঝলাম না।

সীহ্রিয়াকে বাঁচাতে পেরে যে আনন্দ না হলো তা নয়, কিন্তু হাঁটুটাকে বোধহয় আর কোনোদিন সোজা করতে পারব না।

আমরা দুজনে কোনোরকমে গড়িয়ে কিনারে এসে পৌঁছলাম, তারপর সীহ্রিয়া নিজে প্রথমে উঠে, আমাকে উঠতে সাহায্য করল! কোনো রকমে পাথরে পৌঁছে, চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম। হাঁটুর মাংস একেবারে থেঁথলে গেছিল। তার উপর রক্ত চোঁয়াতে শুরু করেছিল। সীহ্রিয়া কী করবে বুঝতে পারছিল না। প্রথমে হাত দিয়ে রক্তটা মুছবার চেষ্টা করল,

www.BanglaBook.org

তারপর হঠাৎ অভাবনীয়ভাবে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার কপালে চুমু খেল। তারপর অনেকক্ষণ আমার ভিজে বুকে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ওরকম চাপা মেয়ে যে কী করে এমন বেহিসাবী হলো, ভাবতে পাচ্ছিলাম না। আমি কনুইতে ভর দিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করে বললাম, তুমি কি পাগল হলে বোকা মেয়ে! আমার কিছুই হয়নি।

সীম্বিয়া তবু শুনলো না, আমার পাশে অসহায়ের মতো বসে, আমার দিকে চেয়ে থাকলো। সোনালী চুলে-মোড়া ওর জল-ভেজা শ্বেতা-গ্রীবার দিকে তাকিয়ে একটি রাজহাঁসের কথা আমার মনে হলো! যাকে আমি গুলি করেছিলাম, তারপর বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বাঁচাতে পারিনি।

ভোর হয়েছে অনেকক্ষণ। সকালের চা খাওয়া হয়ে গেছে। বারান্দায় ইজী চেয়ারে বসে আছি। হাঁটুতে ব্যান্ডেজ বেঁধে। লোকজন জোগাড় করে বাঁশ দিয়ে স্ট্রেচার বানিয়ে সীম্বিয়া ঝর্নার ওপর থেকে আমাকে কাল নামিয়ে নিয়ে এসেছিল। নিজে গাড়ি চালিয়ে পূর্ণাকোট থেকে ডাক্তার এনেছিল। ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ে গেছেন আর বলেছেন যে, হাড় ভাঙেনি তবে বিশ্রামের প্রয়োজন।

সমস্ত বন পাহাড় রোদে ঝলমল করছে। বারান্দার থামগুলোর ছায়ার সঙ্গে রোদটা কাটাকুটি খেলছে। সীম্বিয়া বাংলোর সামনের নুড়ি বিছানো ড্রাইভে পাইচারী করছে! প্রথম যেদিন আমরা ঝর্নায় যাই মাছ ধরতে, সেদিনকার সেই পোশাকটি পরেছে আজ সীম্বিয়া। ফিকে নীল-স্কার্ট আর ফিকে-গোলাপী সোয়েটার।

সীম্বিয়াকে দেখছি চুপ করে বসে। যেতে আসতে চোখাচোখি হলেই ও চোখ নামিয়ে নিচ্ছে। কী যেন ভাবছে ও। বোধহয় কালকের কথা। বোধহয় ভেবে লজ্জা পাচ্ছে। আমিও ভাবছি। ভাবছি ওকে দু-একদিনের মধ্যেই বলব সেই কথাটা।

বুলবুলি পাখির সঙ্গে বাসা বাঁধার কথা!

এমন সময় দুটো কুচিলা খাঁই পাখি পাহাড় থেকে উড়ে এসে চেরী গাছটার ডালে বসে কুৎসিত গলায় ডাকতে লাগল হ্যাঁক হ্যাঁক হ্যাঁক। সীম্বিয়া যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো। পাখিদুটো প্রকাণ্ড ঠোঁটদুটো দিয়ে ডালে ঘষতে লাগলো আর বিরাট ডানাদুটো ঝাপটাতে লাগলো।

সীম্বিয়া দৌড়ে আমার ঘরে ঢুকে শটগানটা নিয়ে এসে বলল, মারো তো গোটাম মারো তো! এগুলো সবসময় আমাকে ভয় দেখায়।

ইজীচেয়ারে বসে বসেই গুলি করলাম। সঙ্গে সঙ্গেই মরে গিয়ে পাখি গাছের ডালেই লটকে রইল, মগডালে। অন্যটা হঁক্ক হঁক্ক করতে করতে উড়ে গেল।

কিছুক্ষণ আগে থেকে জংগলের মধ্যে একটা দূরাগত গাড়ির এঞ্জিনের গুনগুনানি শুনতে পাচ্ছিলাম। এখন গাড়িটা দেখা যাচ্ছে। একটা কালো গাড়ি। কাছে এলো গাড়িটা। পূর্ণাকোটের দিক থেকে আসছে। তারপর বাংলোর হাতায় ঢুকে পড়ল। দেখলাম, একটা কালো রোলসরয়েস গাড়ি। সামনে, কোনো দেশীয় রাজ্যের পতাকা উড়ছে পতপতিয়ে।

গাড়িটা এসে বাংলোর সামনে দাঁড়ালো। উর্দিপরা সোফার এসে পেছনের দরজা খুলে ধরলো। একজন মোটাসোটা ছোটোখাটো ভদ্রলোক নামলেন। পরনে দামী স্যুট, মাথায় স্ট্র হ্যাট। বয়স কম করে পঞ্চাশ হবে।

হঠাৎ সীম্বিয়ার দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

www.BanglaBook.org

ওর চোখ দেখে মনে হলো এ ওর চোখ নয়, ছুলোয়া শিকারে তাড়া খেয়ে শিকারীর সামনে পড়া কোনো চিতল হরিণীর চোখ!

যার বাঁচা হলো না। হবে না।

লোকটি চিবিয়ে চিবিয়ে সীম্ভিয়াকে বলল, What's all these about? Why am I paying that old bitch for?

সীম্ভিয়া চোখে আগুন ঝরিয়ে দু-হাত তুলে সমর্পণের ভঙ্গীতে বললো All right! You have your way. Now for God's sake keep you bloody mouth shut.

আমি কিছু বোঝা বা বলার আগেই, সীম্ভিয়া প্রায় আমার হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিল, নিয়ে একবার লোকটার দিকে তুলল, তারপর আমার ঘরে রেখে এল।

রেখে এসে, আমার ইজীচেয়ারের পাশে আমার কাঁধে হাত রেখে, সীম্ভিয়া বললো, গোটাম আমি যাচ্ছি।

ওর হাত চেপে ধরে আমি বললাম, কোথায় যাচ্ছ?

ও বললো আমার অতীতে ফিরে যাচ্ছি। আমি খারাপ, আমি খারাপ, আমি মিথ্যাবাদী, আমি খারাপ।

ওকে কাছে টেনে আমি বললাম, তুমি ভালো, তুমি ভালো, তোমার অতীত নেই, তোমার কেবল ভবিষ্যৎ আছে।

সীম্ভিয়া আমার মুখের দিকে চেয়ে এক মুহূর্ত যেন কী ভাবল, তারপর লোকটার দিকে আঙুল দেখিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, এটা আর একটা কুচিলা খাঁই।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সীম্ভিয়া বললো, চললাম গোটাম, তোমাকে মনে থাকবে! আমাকে ভুলে যেও।

বলতে বলতে, সিঁড়ি বেয়ে নেমে দৌড়ে গাড়িতে উঠল।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, সীম্ভিয়া, সীম্ভিয়া।

কিন্তু উত্থান-শক্তি রহিত আমার চিৎকার ডুবিয়ে দিয়ে মহারাজার গাড়ির আওয়াজ বাংলোর হাতা পেরিয়ে গেল।

পেছনে পেছনে সোফার সীম্ভিয়ার স্ট্যান্ডার্ড হেরাল্ড চালিয়ে নিয়ে গেল।

সেই ভাঙা-সকালের রাঙা-আলোয় আমি একা একা বসে রইলাম টুল্বকার বাংলোর বারান্দায়। হাওয়ার দোলায় মরা কুচিলা-খাঁই পাখিটার পালকগুলো আন্দোলিত হচ্ছিল। একবারের জোর হাওয়ায় মরা পাখিটি ধপ করে নিচে পড়ল।

পাখিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, আমার বড় কষ্ট হলো সীম্ভিয়ার জন্যে।

ওর জীবনময়ই কুচিলা খাঁই।

ক'টা কুচিলা খাঁই আর ও মারতে পারবে?

www.BanglaBook.org

মাপ

এ কী! হাতল দুটো এরকম করলেন?

আঁজ্ঞে?

কী যে সব সময় আঁজ্ঞে আঁজ্ঞে করেন নিলুবাবু! আপনাদের কি আক্কেল বলে কিছু নেই?

আঁজ্ঞে?

আবার আঁজ্ঞে? দেখছেন যে, কী রকম মোটা হয়ে গেছি। পা দুটো জোড়া করে দিনে দশ ঘন্টা বসে থাকা যায় মশাই?

না, আঁজ্ঞে।

কমোন সেন্স, যা হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে আনকমোন; তাইই নেই মশাই আপনাদের একটুও।

আঁজ্ঞে।

এই হাতল দুটো ছোট করতে হতো, যাতে পা দুটো একটু ছড়িয়ে বসতে পারি। কতবার বোঝালাম আপনাকে, তবুও আপনি বুঝলেন না?

আঁজ্ঞে। কিন্তু কারিগরের স্ত্রীর মেয়েলি অসুখ হয়েছে। সে তো পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে ডায়মন্ড-হারবাতে চলে গেছে।

জাহান্নামে যাক মশাই। আপনাদের মতো বুড়ো-হাবড়াদের নিয়ে আমার কাজ চলবে না। কাজের লোক তার অফিসে, তার চেয়ারে বসেই জীবনের তিন-চতুর্থাংশ সময় কাটিয়ে দেয়। সেই চেয়ারটাই যদি একটু আরামের না হয় তা হলে...

আঁজ্ঞে। আমি পনেরো দিন পরে আবার আসব হাত দুটো ছোট করে কেটে দেব।

থ্যাঙ্ক য়্যু। আপনাকে আর আসতে হবে না। ততদিনে আমার দুটি ঊরুতে ফাংগাস

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গজিয়ে যাবে মশাই। আপনি এবারে আসুন।

আঁজ্ঞে।

হরিপদ। বলে, ডেকেই, বড়বাবু কলিং বেল টিপলেন।

হরিপদ এলো ঘরে।

কি? তোমাদের ব্যাপারটি কি?

কি স্যার?

কি স্যার? একটা চেয়ার নিয়ে আর কতদিন ধস্তাধস্তি করব বলতে পারো? যে চেয়ারে বসে কাজ, যে চেয়ারটিই সব; সেটিকেই ঠিক মতো করে দিতে পারছো না। এই দ্যাখো, এই যে! বলেই, বড়বাবু যেই সজোরে বসতে গেলেন অমনি রিভলভিং চেয়ারের পায়ার নিচের একটি ক্রোমিয়াম-প্লেটেড লোহার বল গড়গড়িয়ে চলে গেল টেবিলের নিচে।

বড়বাবু কাত হয়ে পড়লেন ডান পাশে। সামান্য হেলে গেল। ডানে। মাই গুডনেস!

বলেই, উনি লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার ছেড়ে।

তাঁর সঙ্গে সঙ্গে হরিপদও লাফিয়ে উঠল।

অফিসের সবাই বলে যে, হরিপদ বড়বাবুর ছায়া। বড়বাবু লাফালে হরিপদও লাফায়, বড়বাবু রেগে গেলে হরিপদও রাগে; বিষণ্ণ হলে বিষণ্ণ। হরিপদরই মতো অনেক সাফারিস্যুট পরা বড় বড় অফিসারও আছেন এই মস্ত কোম্পানিতে। তাঁরাও বড়বাবুকে দেখে ঐ রকমই করেন অনেকটা। মোসাহেবির শিল্পে তবু হরিপদ এক দারুণ শিল্পী। বড়বাবু সেটা জানেন। এবং জেনেও পুলকিত হন। প্রত্যেক মূর্খ বড়বাবুই মোসাহেবির শিকার হয়ে থাকেন। স্বয়ং ভগবানই হন, বড়বাবুরা তো কোন ছার!

কিন্তু চেয়ারটা?

বড়ই ব্যতিব্যস্ত বড়বাবু এক বছর হলো, এই চেয়ার নিয়ে। মনের মতো, নিজের জন্য আরামসই একটা চেয়ার; কিছুতেই যোগাড় করতে পারছেন না তিনি।

এসব নিলুবাবু-ফিলুবাবুকে দিয়ে হবে না হরিপদ। বাঙালির এই জন্যই ব্যবসা হয় না। সেলসম্যান যদি, যে জিনিস বিক্রি করছেন নিজে সেই জিনিস সম্বন্ধে হাতে-কলমে জ্ঞান না রাখেন, তা হলে সেলসম্যানশিপে আর প্রডাক্ট-এর মধ্যে একটা ফাঁক থাকতে বাধ্য। এই জন্যই বাঙালির ব্যবসা হয় না। মালিক আর সেলসম্যানরা খালি কথার তুবড়ি ফোটাচ্ছেন, আর কাজের বেলায় ডায়মন্ডহারবার যদু ছুতোর। ছ্যাঃ ছ্যাঃ।

হরিপদ!

স্যার!

চিনে মিস্ত্রী নেই এ পাড়ায়?

টেরিটিবাজারে আছে স্যার।

শোনো। মিস সেনকে বলো এক্ষুনি পার্ক স্ট্রীটে ফোন করবে। বেয়ারাদের কাউকে পাঠাও। চেয়ারের লিটারেচার নিয়ে আসবে।

স্যার।

চিনে ছুতোরের কাছেও যাও। মাপমতো একটা চেয়ার এনে দিতে পারলে না তোমরা। ওয়ার্থলেস সব। যে কোম্পানির বড়সাহেবের চেয়ার ঠিক থাকে না, তা উঠে যেতে বাধ্য। লালবাতি জ্বলে যাবে।

বলেই, ঘরের লালবাতির সুইচ টিপে দিলেন। ঘরে এখন কারোই ঢোকা মানা। অত্যন্ত

www.BanglaBook.org

আপসেট তিনি। চেয়ারে বসলেই ডাইনে কাত হয়ে যাচ্ছে চেয়ারটা। ডিসগ্রেসফুল। মনে মনে তিনি একজন লেফটিস্ট। ইন্টেলেকচুয়াল মানুষ তো! ডাইনে এমন কেতরে বসে থাকতে দেখলে লোকে কি বলবে? ছ্যাঃ।

ঘন্টাখানেকের মধ্যে হরিপদ পার্ক স্ট্রিট থেকে ছবিটবি আঁকা লিটারেচার নিয়ে এল। একজিক্যুটিভ চেয়ার। সিংহাসনের মতো। এতো উঁচু যে, তাতে বসে, তাঁর টেবিলের সামনে উল্টোদিকে যাঁরাই বসবেন, তাঁদেরই পিগমি বলে মনে হবে। মডার্ন ম্যানেজমেন্টের এও একটা ভাঁওতা। মানুষের ভিতরের জিনিস যতই কমছে তার চেয়ারের উচ্চতা ও প্রস্থ ততই বাড়ছে।

নাঃ। বড়সাহেবের চেয়ারটা বেঁটেখাটো গোলগাল। ঐ চেয়ারে বসলে তিনি নিজেই চেয়ারটার পটভূমিতে বেপাত্তা হয়ে যাবেন। চলবে না।

হরিপদ।

স্যার।

চিনে মিস্ত্রী!

স্যার।

চিনে মিস্ত্রী এল ঘন্টাখানেক পর। দর্জিকে যেমন করে ট্রাউজারের মাপ দেন তেমন করে তাঁর পশ্চাৎদেশ, ঊরু, কোমর, ঘাড় ইত্যাদির মাপ দিলেন বড়বাবু। মিস্টার চুং ফিং কে বলে দিলেন যে, এমন একটা চেয়ার তিনি চান, যে চেয়ারে বসে চাকরি-জীবনের বাকি আটটা বছর নিশ্চিন্তে, আরামে কাটিয়ে দিতে পারেন।

থ্যাঙ্ক, য়্যু।

বলে, চুং ফিং চলে গেলেন।

॥ ২ ॥

আজ চুং ফিং কোম্পানির চেয়ার আসবে। সকালে দাড়ি কামাতে কামাতেই উত্তেজিত বোধ করতে লাগনে বড়বাবু। চাপা উত্তেজনা; পরকীয়া বড় তাদরে যেমন হয়।

অফিসে যেতেই, সেক্রেটারি মিস সেন বললেন, গুড মর্নিং স্যার। বিহারের ডিলারদের সঙ্গে কনফারেন্স আছে এগারোটায়।

কনফারেন্স রুমে বসিয়ে কফিটফি খাওয়াতে বলবেন ওঁদের। আই মে বী আ লিটল লেট।

নিজের ঘরে ঢুকেই দেখলেন চেয়ারটাকে। বাঃ! ঝরাপাতার মত ফিকে হলুদ রঙ। ফোম-লেদারের কুশান। ক্রোমিয়াম প্লেটেড পায়া, হাতল, পায়ার নিচের চারটে বল। রিভলভিং চেয়ার তো? ঠেলে দেখলেন একটু পেছনে হেলিয়ে। বাঃ। বসে বসে স্বপ্নও দেখা যায়, এমন চেয়ারে।

ইনটারকম টি টি করে উঠল হঠাৎ।

শাট আপ।

চেঁচিয়ে উঠলেন বড়বাবু। লালরঙা-রিসিভারটা তুলে মিস সেনকে বললেন, আধ ঘন্টা কোনও কল দেবেন না আমাকে। নট ইভিন ইন্টারনাল কলস।

ঠাক করে রিসিভারের গর্তে রিসিভারটাকে নামিয়ে রেখে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন

www.BanglaBook.org

চেয়ারটার দিকে। এমনভাবে, চেয়ারটা যেন ফুলশয্যার রাতের বউই!

চেয়ারটার সামনে অ্যাটেনশানে দাঁড়ালেন একবার, মনে মনে স্যালুট করলেন। তারপর ঘুরে আস্তে আলতো করে পশ্চাৎদেশ নামালেন; হাঁস তার শরীরকে যেমন করে জলে নামায়।

আটকে গেছেন বড়বাবু। চেয়ারটায় একেবারেই আটকে পড়েছেন। অক্টোপাসের মতো চীনে চেয়ারটা একেবারে কামড়ে ধরেছে তাঁকে। নড়তে চড়তে পারছেন না পর্যন্ত। এ কী চক্রান্ত মিস্টার চুং-ফিং-এর? বেল টিপলেন পাগলের মতো।

ঝড়ের মতো হরিপদ এসে ঢুকল।

স্যার!

আমাকে ওঠাও।'

স্যার?

আমাকে চেয়ার থেকে তোলো। চেয়ারের সঙ্গে আটকে গেছি আমি। হ-রি-প-দ!

স্যার।

বলেই, রোগা-সোগা হরিপদ আপ্রাণ চেষ্টা করল বড়বাবুকে চেয়ার থেকে ছাড়াতে। কিন্তু পারলো না। মনে হলো, জীবনের মতো আটকে গেছেন।

বড়বাবুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বললেন, চেয়ারটা ঘুরিয়ে দাও তুমি। জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাও আমার। হ-রি-প-দ।

হরিপদ সামান্য গায়ের জোরের সমস্তটুকু খরচ করে ঘুরিয়ে দিল চেয়ারটাকে। সহজেই ঘুরে গেল সেটা।

যাও হরিপদ।

হরিপদ চলে যাচ্ছিল ঘর ছেড়ে।

বড়বাবু ডাকলেন, বললেন, শোনো, কাউকে কিন্তু বলো না।

স্যার।

কাউকেই বোলো না যে আমি আটকে গেছি আমার চেয়ারে।

না স্যার!

রুম-এয়ারকন্ডিশানারের ফিসফিস শব্দ আসছিল। অনেক নিচে ক্যামাক স্ট্রিট দেখা যাচ্ছে। গাড়ি যাচ্ছে সারি দিয়ে। লোহালক্কড়, শেয়ার, ফাউন্ড্রি, চা ও মার্বেলের এক্সপোর্ট। অনেকই ব্যবসা এই কোম্পানির। অনেক মাইনে বড়বাবুর। পারকুইজিটস। দালালি, কমিশন, খাতির, উপরি, ডানে এবং বাঁয়ে। বড়ই আঠা।

আকাশে চিল উড়ছে। এই ঘরে বসে চিলের কান্নাও শোনা যায় না।

কলকাতার আকাশে এখনও অনেক নীল। মানুষের দেখারই সময় নেই শুধু।

নিজেই তো মাপ দিয়ে বানালেন চেয়ারটাকে।

এই চেয়ারের চেয়ে নিজের মাপটা বোধ হয় বড় বলে ভেবেছিলেন উনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাবা, মা, আমি এবং পরমা

মিনিটা ঘুমিয়ে পড়েছে। বড় অবেলাতে ঘুমোলো।

বিষ্ণুপুরে আসার পর থেকেই খাওয়া-দাওয়ার পর ছুটির দিনে বাড়ির সামনের ফাঁকা জমিটুকুতে বসি একটু। এখনও গরম পড়েনি। বসন্ত এখন। চারপাশে অনেকগুলো কৃষ্ণচূড়া গাছ। লালে লাল হয়ে আছে। সারা দুপুরে এবং রাতভর কোকিল ডাকে।

বই-টইও এখানে বিশেষ পাই না। রবিবারের কাগজের লেখাগুলো খুঁটিয়ে পড়ি। অফিস থেকে শনিবার আসার সময়ে কিছু ম্যাগাজিন নিয়ে আসি। শনি-রবিবারে পড়ে আবার সোমবারে ফেরত নিয়ে যাই অফিসে।

দূরে ছিন্নমস্তার মন্দির, রাঠীর বাগানের দিকের ঝুপড়ি-ঝুপড়ি গাছগুলো চোখে পড়ে, লালবাঁধের জল চিকচিক করে দুপুরের রোদে। তার পাশে বনবিভাগের উক্যালিপটা প্ল্যানটেশান। ভারী সুন্দর দেখায় ওদিকটা। কোনো কোনো রবিবার পরমা আর মিনিকে নিয়ে হাঁটতেও যাই ওদিকে। অবশ্য এখানে আমাদের সকলেরই প্রচুর হাঁটাহাঁটি হয়। সকালে বাজার যাওয়া-আসাই তো প্রায় মাইল তিনেক। ফিরেই, মিনিকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে এসে চান করে খেয়ে নিয়ে অফিসে যাই। পরমাই স্কুল থেকে নিয়ে আসে মিনিকে। হেঁটে যায়, হেঁটে আসে। সাইকেল রিকশা নিয়েও যেতে-আসতে পারতো, কিন্তু তাতে রোজ এক টাকা করে খরচ। আমার আয়ে এতো বড় বিলাসিতা পোষায় না। তাও তো এখন গরম পড়েনি। গরম ও বর্ষার দিনে পরমা আর মিনির দুর্যোগের একশেষ হবে।

কিন্তু করার কিছুই নেই।

হঠাৎ পরমা একটা পান হাতে করে এসে বললো, খাবে নাকি?

হঠাৎ পান? বললাম আমি।

www.BanglaBook.org

পরমা বিরক্ত গলায় বললো, অত জেরার উত্তর দিতে পারবো না। খেলে খাও।

পানটা মুখে দিয়ে বললাম, বসবে? চেয়ার আনব ঘর থেকে?

পরমা বলল, না।

তারপর বলল, সময় মতো বাস স্ট্যান্ডে যেও কিন্তু।

বাস স্ট্যান্ডে কেন? আমি শুধোলাম।

তারপর বললাম, রবিদা-বৌদি তো গাড়িতেই আসবেন লিখেছেন।

পরমা বিরক্তির স্বরে বলল, লিখেছেন; কিন্তু যদি বাসেই এসে পড়েন।

বাঃ তা কেন করবেন? আমি বললাম।

পরমা বলল, অত তর্ক করো না।

তারপরই বলল, আমার দাদা বৌদি তো! তোমার গা থাকবে কেন? তোমার বাড়ির কেউ হলে তো সকাল থেকে কতবার গিয়ে বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে খোঁজ-খবর করে আসতে।

আমি এবার বিরক্ত হয়ে বললাম, তা হয়ত করতাম। কারণ আমার আত্মীয়স্বজনদের তো গাড়িতে করে আসার কথা থাকত না।

পরমা চলে গেল।

বলে গেল, ইচ্ছে হলে যেও ; নইলে যেও না। আমার আর কিছু বলার নেই।

পরমা কারো সঙ্গেই মানিয়ে থাকতে পারল না বলেই কলকাতা ছেড়ে বিষ্ণুপুরে আসতে হয়েছিল। আমাদের বসু-পরিবারতন্ত্রে আমার স্থানটা সবদিক দিয়েই এত নিচুতে ছিল যে, ঐ ব্যাপারে অশান্তি পাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। বন্ধু-বান্ধবরা বলত, জয়েন্ট ফ্যামিলির দিন চলে গেছে। শুনতাম, কিন্তু যার একা থাকার সামর্থ্য নেই, তার সকলের সঙ্গে না থেকে উপায়ই বা কি?

একসঙ্গে থাকতে হলে, "শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই" একমাত্র উপায়।

পুতুল খেলার দিন থেকেই প্রত্যেক মেয়েই মনে মনে একটি নিজের নিজস্ব সংসার চায়। যেখানে সে-ই সম্রাজ্ঞী। সে সাম্রাজ্য যতই সামান্য ও দারিদ্র্যময় হোক না কেন! তার স্বাদই আলাদা। অন্তত আমার স্ত্রী এবং অন্যান্য পরিচিতা ও আত্মীয়াদের দেখে আমার এ-কথাই বার বার মনে হয়েছে।

আমি সাধারণ। অতি সাধারণ সরকারি চাকুরে। কোলকাতার বাড়িতে মা-বাবা, নিঃসন্তান কাকা-কাকীমা; দুই দাদা। সকলের ও আমার রোজগারে মিলেমিশে রীতিমত সচ্ছলভাবেই দিন কেটেছে। কিন্তু সচ্ছলতাই সংসারের একমাত্র কাম্য বস্তু নয়। বিশেষত পরমাদের মতো মেয়েদের কাছে। সিনেমা দেখতে যাওয়া নিয়ে, পুজোর খরচ নিয়ে, মায়ের ঠাকুর ঘরে বাতি দেওয়া নিয়ে, ছোট বোনের বাচ্চা হওয়ার সময়ে বোন-ভগ্নীপতির আমাদের অপরিসর বাড়িতে দীর্ঘদিন থাকা নিয়ে অনেকই অশান্তি, মধ্যবিত্ত পরিবারের পারিবারিক রাজনীতির অনেক স্রোত, উল্টোস্রোত, সব মিলে-মিশে এবং বিশেষ করে কাকার গর্ব ও কাকীমার দেমাক নিয়ে পরমার মনের মধ্যে চাপা অসন্তোষ ও টেনসান ক্রমশই এমনভাবে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল যে বদলীর অর্ডারটা আসায় হাতে যেন চাঁদই পেয়েছিলাম আমরা।

পরমা এই প্রথম আলাদা সংসার পেল বিষ্ণুপুরে এসে। আমাদের একমাত্র মেয়ে মিনিকে নিয়ে আমাদের দু-ঘরের আড়াইজনের সংসার পেয়ে সত্যিই খুশি হয়েছিল পরমা।

অফিস যাওয়ার আগে যখন থলে-হাতে বাজারে যেতাম, পরমা তাড়াতাড়ি চা করে

www.BanglaBook.org

দিয়ে বলতো, আজ একটু সজনে খাড়া এনো। সঙ্গে এক ফালি কুমড়ো। কুচো মাছ পেলেও এনো।

ওর ছেলেমানুষ, স্টোভের-আঁচে লাল মুখে এসব গিন্নিবান্নি কথা শুনে অবাক লাগত আমার।

এখানে কুচো মাছ বড় একটা পাওয়া যায় না। বেশিই ছোট পোনা। কিন্তু টাটকা। যা মাইনে পাই তাতে রোজ মাছ খাওয়া অসম্ভব। কিন্তু পরমার গিন্নিপনাতে ধোঁকার বা ছানার ডালনা, ধনেপাতা দিয়ে লাউবড়ির তরকারি, চরু নারকোল-ভাত এসব নতুন নতুন নিরামিষ পদ খেয়ে মাছের শোক প্রায় ভুলতেই বসেছিলাম।

কোলকাতার এজমালী সংসার ছেড়ে এসে নিজের সংসার পাততেই মায়ের হাতের রান্নার কথা বড় মনে পড়ত। পরমা একে একে তাদের বাড়ির সমস্ত স্পেশ্যালিটি রেঁধে এবং খাইয়ে আমাকে দত্তবাড়ির রন্ধন-ঐতিহ্যে বিশ্বাসী করে তুলল। বোসবাড়ির রান্নার স্বাদ প্রায় ভুলেই যেতে বসেছি এখন আমি।

মাঝে মাঝে আমার মন কেমন করত। মায়ের পেটে একটা টিউমার আছে। এক্স-রে করার কথা ছিল। হলো কিনা কে জানে। দাদারা যেহেতু কৃতী, এসব কাজ ছিল আমার। দাদাদের সময়ই হতো না মাকে নিয়ে ডাক্তারখানায় বা হাসপাতালে যাওয়ার। বড়দা অফিস থেকে গাড়ি পেতো। কিন্তু এসব ব্যক্তিগত কাজে সেই গাড়ি ব্যবহার করতে বড়দার সততায় বাধত অথচ শালা-শালীদের নিয়ে সেই গাড়ি চড়েই পিকনিকে বা মেসাঞ্জোরে যেতে সেই সততা বিঘ্নিত হতো না।

বাবার ব্লাড-সুগারটা খুব বেড়েছিল। আসার আগে দেখে এসেছিলাম খাওয়ার পরে রক্ত নিয়ে, দুশো কুড়ি। গুড় খেতে খুব ভালবাসেন বাবা। মায়ের কথা কানেই নেন না। এখনও গুড় খেয়ে যাচ্ছেন কি না, তা দেখবার লোক কেউ নেই। এ-কথা ভেবেও চিন্তা হতো।

নিজের পরিবার ছেড়ে এসে প্রায়ই মনে হতো যে সুখ আর আরাম বোধহয় এক নয়। আরো মনে হতো যে, আমরা যতই ইংরিজি শিখে থাকি না কেন, স্বতন্ত্র সংসারে বিশ্বাস করি না কেন; আমাদের অস্তিত্ব, যৌথ-পরিবারের অনেকই গভীরে প্রোথিত আছে। নিজের সংসারের সব সুখ-স্বাধীনতা দিয়েও বোধহয় সেই দুঃখমিশ্রিত আনন্দের সমান হয় না নিক্তি। কিন্তু কিছুই বলতে পারতাম না মুখে, পরমার খুশি, সুখোজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে।

মিনিটা তার দাদু-দিদাকে বড়ই মিস করত। বাবা প্রত্যেকদিন, ও যতদিন না স্কুলে ভর্তি হয়, ওকে নিয়ে সকালে বসতেন। বাবাই ওকে অক্ষর পরিচয় করান। ইংরিজি ও বাংলা। অঙ্ক করাও শেখান তিনি। সে-যুগের প্রেসিডেন্সীর অঙ্কের ছাত্র ছিলেন বাবা। মা, ভক্ত প্রহ্লাদের কথা বলতেন মিনিকে, ঠাকুমার ঝুলি থেকে গল্প পড়ে শোনাতেন। কখনও বা অবন ঠাকুরের 'রাজকাহিনী', রবি ঠাকুরের 'শিশু ভোলানাথ'।

বর্ষার রাতে রান্নাঘর থেকে ভেসে-আসা খিচুড়ির ফোড়নের গন্ধ, কাকার সিগারের ধুঁয়োর উগ্র গন্ধ, চান করে আসা পরমার গায়ের সাবানের মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে কড়কড়ে করে আলুভাজা ও শুকনো লংকা ভাজার নাক-সুড়সুড় করা গন্ধের মধ্যে আমার ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে আমাদের সেই যৌথ পরিবারের যৌথ গন্ধগুলো আমার সমস্ত মস্তিষ্কের মধ্যে সেঁধিয়ে যেত। সেঁধিয়ে থাকত।

মিনি যখন আরও ছোট ছিল, একদিন সন্ধ্যাবেলায় সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পড়ে গেছিল। আজও মনে আছে, দাদা অফিস থেকে ফিরছিলেন তখন। দারুণ ইস্ত্রি-করা একটা

www.BanglaBook.org

দামী বাদামী-রঙা স্যুট পরে। দাদা দৌড়ে এসে, ছাদের ফুলের টবের জন্য শুকোতে দেওয়া গোবর-মাখা জুতো সুদ্ধু মিনিকে বুকে তুলে নিয়েছিলেন ভয়ার্ত চিৎকার করে। আমি সিঁড়ির মুখে দৌড়ে গিয়েই দেখেছিলাম বাবা-মা, কাকা-কাকীমা, দাদা-বৌদিরা সকলে ভিড় করে আছেন। কাকা, পায়জামা আর হাতকাটা গেঞ্জী পরে বারান্দার লম্বা হাতলওয়ালা ইজিচেয়ারে বসে সিগার খাচ্ছিলেন। ঐ অবস্থাতেই মিনিকে দাদার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ট্যাক্সি করে ডাক্তারখানায় নিয়ে গেছিলেন। কাকার সঙ্গে মেজদা ও পরমাও গেছিল। তখন সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার হঠাৎই মনে হয়েছিল যে, আমার মাত্র পাঁচ হাজার টাকার লাইফ ইনসিওরেন্স থাকলেও আসলে আমার এবং আমার স্ত্রী ও কন্যার জীবন দারুণভাবে সুরক্ষিত। সে রাতে একা ঘরে বসে বড় অপারক মনে হয়েছিল নিজেকে। আমাদের বাসস্থানের মালিক যে-কাকাকে দাম্ভিক, যে-বড়দাকে হৃদয়হীন চালিয়াৎ, যে মেজদাকে স্বার্থপর বলে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিলাম, তাদেরও চরিত্রের যে অন্য বহুদিক আছে, কোনো মানুষকেই যে আমরা প্রাত্যহিকতার বিচারে সঠিক বিচার করতে পারি না, এ-কথা ভেবেই বার বার নিজকে একদিকে কৃতজ্ঞ, অন্যদিকে ছোট বলে মনে হয়েছিল।

ভেবেছিলাম, বড়দার ছোট ছেলে তুমু; যে মিনির বয়সী, সে সিঁড়িতে পড়ে গেলে আমি কি করতে পারতাম? আমি কি আমার অফিস-যাওয়ার সবচেয়ে দামী পোশাকে গোবরলাগা জুতোসুদ্ধু তুমুকে কোলে তুলতাম? তুমুর জন্যে সে রাতে কি ওষুধ ইনজেকশান করে একশো টাকা খরচ করে ফেলতে পারতাম?

তারপরই মনে হয়েছিল যে, না তা পারতাম না সত্যি কিন্তু আমি সারা রাত জেগে তুমুকে সেবা করতে পারতাম। আমার শরীর দিয়ে সামর্থ্যের অভাব পূরণ করতাম। আমি প্রমাণ করতাম অন্যভাবে যে, আমি দাদার ছেলে তুমুকে আমার মিনির চেয়ে একটুও কম ভালবাসি না।

কিন্তু...। যাকগে এসব কথা।

পরমার মামাতো দাদা-বৌদি আসবেন আজ আমাদের এখানে বেড়াতে। আজ মাসের পঁচিশ তারিখ। কাল মানিব্যাগে দেখেছিলাম, তিরিশটি টাকা আছে।

ওঁরা বড়লোক। ডাক্তার দুজনেই। কোলকাতায় নিজেদের গাড়ি-বাড়ি আছে। পরমার নিজের দাদাদের সামর্থ্য ছিল না। ছোটবেলায় ওর বাবা মারা গেছিলেন। এই দাদাই পরমার বিয়ের সময়ে বেশি খরচ দিয়েছিলেন। সে বাবদে পরমার কৃতজ্ঞতা তাঁদের প্রতি স্বাভাবিকই।

আমি আজ বাজারে যাওয়ার সময়ে পরমা কিছু বলেনি। অন্যদিন ফর্দ করে দেয়। আজ বলেছিল হেসে, আমি কি বলব? তোমার যা-খুশি তাই-ই এনো।

বাজারে গিয়ে কুড়ি টাকা খরচ হয়ে গেল তেল-টেল নিয়ে, কিন্তু বাড়ি ফিরে থলে উপুড় করে রান্নাঘরের বারান্দাতে ঢেলে দিলাম যখন, তখন পরমার মুখটা কালো হয়ে গেল। বেশি কিছু বলল না। শুধু বলল, অনেক বাজার করেছ দেখছি আজ!

কিন্তু আমি পরিষ্কার বুঝলাম যে, ওর দাদা-বৌদির জন্যে আমি আরও অনেক কিছু বাজার করব বলে ভেবেছিল ও।

আমার বড় লজ্জা হয়েছিল। দুঃখও।

একটা হাওয়া উঠেছে মাঠে, খোয়াইয়ে; বনে বনে। কৃষ্ণচূড়ার সবুজ পাতা ও লাল ফুলে ভরা ডালগুলো নৌকার পালের মতো ফুলে ফুলে দুলে দুলে উঠছে। খবরের কাগজটাকে

www.BanglaBook.org

একটু নাড়াচাড়া করেই উঠে পড়লাম। বাসস্ট্যান্ডে যাওয়ার কোনোই প্রয়োজন ছিল না। তবুও সময় মতো উঠলাম। ঘরে গিয়ে পায়জামার উপর পাঞ্জাবিটা চাপিয়ে নিলাম।

পরমা জানালার পাশে চেয়ারে বসে উক্যালিপটা বনের দিকে চেয়েছিল। কী যেন ভাবছিল ও। ওর চোখের দৃষ্টি বহু দূরে নিবদ্ধ ছিল। কেমন উদাস দেখাচ্ছিল ওকে। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে ও বলল, অমন হা-ভাতের মতো যাওয়ার দরকার কি? হাওয়াইন শার্ট প্যান্ট বের করে দিচ্ছি, পরে যাও।

আমি কথা বললাম না। একবার ফিরে তাকালাম।

পরমা বলল, চা খেয়ে যাও। পাঁচ মিনিটে করে দিচ্ছি।

আমি বললাম, না। থাক। বাস স্ট্যান্ডেই খেয়ে নেব।

পরমা বলল, তোমার মতো পয়সার অপচয় আর কেউ করে না। কত যেন বড়লোক! ভাব দেখলে হাসি পায়।

আমার গা জ্বলে উঠল। আর কথা না-বাড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

বাস-স্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বাস প্রায় ঘন্টাখানেক লেট করে এল। অনেকক্ষণ পায়চারী করলাম। লাভের মধ্যে রাবারের চটির স্ট্র্যাপটাই ছিঁড়ে গেল। কাল সকালে বাজারে গিয়ে সারানো ছাড়া উপায় নেই। এক পায়ে চটি পরে হাঁটা যায় না। চটি-জোড়া হাতে করে যখন সন্ধের অন্ধকারে বাড়ি ফিরলাম তখন দেখি, বাড়ির সামনের একটি ঝকঝকে কালো ফিয়াট গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। কে একজন গাড়িতে বসে আছে।

ড্রাইভার হবে বোধহয়।

ভিতরে ঢুকতেই বৌদি বললেন, কী হে জয়ন্ত, আমরা তো লিখেইছিলাম যে গাড়িতে আসব।

পরমা বলল, বাস কখন এসে গেছে! আমার উপর রাগ দেখাবার জন্যে বেড়িয়ে-টেড়িয়ে ফিরলেন।

তারপর ওর বৌদির দিকে ফিরে বলল, তোমরা তো আমারই দাদা-বৌদি। ওর তো কেউই নয়!

রবিদা হঠাৎ আমার হাতে-ধরা চটির দিকে চোখ পড়ায় বললেন, ওকি, হাতে ওটা কি?

মিনি হাততালি দিয়ে বলল, এমা, বাবা চটি হাতে হেঁটে এলো।

পরমা চকিতে আমাকে দেখে নিয়ে বলল, সং-এর মত দাঁড়িয়ে থেকো না তো! চটিটা রেখে এসো।

চটি রেখে আসতেই, রবিদা বললেন, আর এক কাপ করে চা খাওয়া পরমা।

পরমা চা করতে গেল ভিতরে।

বৌদি বললেন, আমাদের সঙ্গে কিন্তু ড্রাইভার আছে! ও-ও খাবে বুঝলে জয়ন্ত। পরমাকে বলে দিও।

পরমা ভিতর থেকে বলল, বলতে হবে না। পরমার চোখ আছে। আমি কি আর রাম সিংকে চিনি না?

বৌদি বললেন, জয়ন্ত, এখানে কেন এসেছি বলো তো?

আমি বোকার মতো বললাম, পরমার সংসার দেখতে?

বৌদি বললেন, তাতো বটেই! তবে সেটা আসল কারণ নয়। আসল কারণ বালুচরী শাড়ি। নিয়ে যাবে তো দোকানে?

www.BanglaBook.org

আমি বললাম, নিয়ে যাব না কেন? কিন্তু তার তো শুনেছি অনেকই দাম। হাজার টাকা পনেরোশো টাকা এক-একটা শাড়ি।

রবিদা হাসলেন। বললেন, তোমার বৌদিও কি আর কম দামী হে?

আমি হাসলাম। বললাম, তাতো বটেই!

তারপর বললাম, থাকবেন ক'দিন?

বৌদি বললেন, বেশিদিন থাকলে তোমার আপত্তি?

আমি আবারও হাসলাম। বোকারা অকারণেই হাসে।

বললাম, না, না। কি যে বলেন!

রবিদা বললেন, পরশু ভোরে ব্রেকফাস্ট খেয়েই চলে যাবো। আমার আবার বিকেলে একটা অপারেশান আছে বেলেভ্যুতে। খুব বড় গাড়োয়ারি ব্যবসাদারের একমাত্র মেয়ের অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশন। কাজ কিছু নয়। কিন্তু ভালো মাল-কড়ি আছে। ফোকটে লাভ, বুঝলে না?

ভালো ছাত্র না হলে ডাক্তার হওয়া যায় না জানতাম। জানতাম, ডাক্তারদের প্রফেশান সবচেয়ে নোবল প্রফেশান। কিন্তু রবিদার কথা শুনে, হাব-ভাব দেখে বোঝা যায় না উনি লোহা-ঢালাইওয়ালা, না ডাক্তার! অবাক লাগল।

ওঁরা চা-টা খেয়ে বললেন, এখানে আমার এক বন্ধুর ভাই আছেন এস-ডি-ও। খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। যাই একবার দেখা করে আসি। গেলে অবশ্য বিপদ আছে। নাও ছাড়তে পারে, খাইয়ে তো ছাড়বেই; ওখানে রেখেও দিতে পারে।

তারপর বললেন, তুমি যাবে নাকি সঙ্গে?

আমি বললাম, না না, উনি কত বড় অফিসার। এ সব ছোট জায়গায় আমাদের অনেক প্রোটোকল মেনে চলতে হয়। উনি যদি আমার কথা শুনে আমাকে দেখতে চান বা আলাপ করতে চান, সে অন্য কথা।

আমার কাছ থেকে ডিরেকশান নিয়ে ওঁরা চলে গেলেন ড্রাইভারের চা খাওয়া হয়ে গেলে।

ওঁরা চলে যেতেই পরমা বলল, তোমার মতো ছোটলোক দেখিনি। অমন করে কেউ অতিথিকে শুধোয় যে, ক'দিন থাকবেন? কথাটা কি অন্যভাবে বলা যেত না। তোমার জন্য আমার মাথাকাটা যায় লজ্জায়।

কী বললে তুমি খুশি হতে?

বলতে পারতে যে, বেশ কয়েকদিন থাকতে হবে কিন্তু। তা হলেই জানতে পেতে যে ক'দিন থাকবেন।

তোমার মতো আমার বাড়ি তো শান্তিপুরে নয়। অত সুন্দর করে কথা বলতে শিখিনি।

শেখোনি তো অনেক কিছুই। কিন্তু শিখতে আপত্তি কি?

আমি আর কিছু না বলে, আবার বাইরে গিয়ে বসলাম অন্ধকারে।

মিনি, বারান্দা থেকে তোতা পাখির মতো বলল, বাবা অন্ধকারে বোসো না। মা বলেছে, বিছে কামড়াবে।

পরমা এসে বলল, রাম সিং অনেক দিনের ড্রাইভার আমাদের। ওকে খাতির যত্ন না করলে হবে না। একটু পরই ভিতর থেকে আবার ফিরে এসে বলল, শুনছ, দাদা বৌদি আর আমি আমাদের ঘরেই শোব। মিনিকে নিয়ে তুমি বারান্দার চৌকিতে শুয়ে মিনির

www.BanglaBook.org

ঘরের খাটটা রাম সিংকে ছেড়ে দাও।

আমি বললাম, তাই-ই হবে!

রবিদা বৌদি প্রায় এগারোটায় ফিরলেন। এস-ডি-ওর বাড়ি থেকে।

পরমা রান্না-বান্না সেরে বসে বসে হাই তুলতে-তুলতে মিনির পাশে শুয়ে পড়েছিল। ওঁরা আসতে আবার খাবার-টাবার গরম করে সকলে মিলে খেতে বসা গেল।

পরদিন প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে দুশো টাকা ধার নিলাম। সকালে বাজার করলাম পাশের বাড়ির মুখার্জীবাবুর কাছ থেকে ধার করে।

সকালে বৌদি বলেছিলেন যে, তোমার দাদার ক্লোরোস্টেরল বেড়েছে। লীন মীট ছাড়া কিছু খান না। পাঁঠার মাংস এনো না কিন্তু। চিকেন এনো জয়ন্ত।

তারপর বললেন, এখানে অ্যাসপারাগাস পাওয়া যাবে? পেলে, তোমার দাদাকে সঙ্গে একটু অ্যাসপারাগাসের স্যুপ করে দেওয়া যেত।

পরমা বলল, কাকে কি বলছ বৌদি? ও এসবের নামই শোনেনি। তবে হ্যাঁ, চিকেন আনবে। আর মাছ?

বৌদি বললেন, বড় রুই মাছ পেলে এনো। অনেক দিন মুড়ি-ঘন্ট খাই না। কলকাতায় তো পার্টি-ফার্টি লেগেই আছে। রোজই। আজ ককটেল। কাল ডিনার। দিশি রান্না খেয়ে যে একটু সুখ করব তার উপায় নেই।

বাজার সেরে, কোনোক্রমে খেয়ে, আমি অফিসে গেলাম। পরমা আমাকে বলল, তোমায় নিয়ে যেতে হবে না। আমরা আস্তে-সুস্থে খেয়ে দেয়ে, শাড়ির দোকানে যাব। আমি তো চিনিই।

বললাম, মিনির স্কুল?

পরমা বলল, মেয়ে আমার এমন কিছু এম. এস. সি. পড়ছে না। সবে তো কে-জি ওয়ান। ক'দিন কামাই করলে কিছু হবে না। মামা-মামী এসেছে। ওকেও নিয়ে যাব সঙ্গে।

অফিস থেকে ফিরে দেখলাম পরমা গলদঘর্ম হয়ে রান্না করছে। আর মিনিটা ভরসন্ধেয় ঘুমোচ্ছে।

আমি বললাম, চা খাওয়াতে পারো এক কাপ?

পরমা বলল, মুখ হাত ধোও। করে দিচ্ছি।

পরমার গলার স্বরটা অন্য রকম শোনালো।

পরক্ষণেই বলল, ঢের ঢের ছোটলোক দেখেছি। এমনটি দেখিনি। খালি বড় বড় কথা আর চালিয়াতি। চক্ষুলজ্জা বলেও কোন ব্যাপার নেই। দেখছে লোক নেই, জন নেই, রান্না করছি, নিজে বাসন মাজছি, একটু সাহায্য করতেও তো পারত বউদি! মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে গেল একটা চকোলেট তো কিনে দিতে পারত! তিন-তিনটে বালুচরী শাড়ি কিনল জানো? কত দাম বলো তো? তিনটের দাম আড়াই হাজার টাকা।

আমি বুঝলাম, কোথায় লেগেছে পরমার? ঐ দোকানে আমার সঙ্গে গিয়ে বহুবার ও শাড়ি নেড়ে-চেড়ে দেখে এসেছে। ওর বহু দিনের শখ একটা লাল পাড় গরদের শাড়ির। দাম প্রায় দেড়শো মতো। আমার কাছে তাইই অনেক। ঠিক করেছিলাম, একজন জানাশোনা তাঁতীর কাছ থেকে নিয়ে মাসে-মাসে কুড়ি টাকা করে শোধ করে দেব। যে মেয়ের পক্ষে দেড়শো টাকার শাড়িও স্বপ্ন তারই সামনে অন্য মেয়ে আড়াই হাজার টাকার শাড়ি কিনলে তা কি সহ্য হয়?

www.BanglaBook.org

আমি কিছু বলার আগেই পরমা আবার বলল, এই যে বড়, রুই মাছ আর চিকেন কিনলে, টাকা পেলে কোথায়? এত টাকা কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে?

বললাম, পরমা তোমার মনটা বড় ছোট হয়ে গেছে। এই দাদাই না তোমার বিয়ে দিয়েছিলেন? এঁরা আসবেন বলেই না তুমি কতদিন ধরে অপেক্ষা করছিলে? আর আসতে-না-আসতেই তুমি এত সব কথা বলছ?

পরমা প্রায় কেঁদে ফেলল। বলল, তুমি বুঝবে না। আমার জন্যে আমার ভাবনা নেই। ভাবনা ছিল না। কিন্তু তুমি গরিব বলে ওঁরা তোমার কাছে বড়লোকী দেখাতে এসেছেন। এস-ডি-ওর বাড়িতে উঠলেই তো পারতেন! গরিবের বাড়ি উঠে যদি তাদের কোনো রকম কনসিডারেশন না থাকে তাহলে কি বলতে পারি?

বললাম, ওরকম কোরো না! ওঁরা তোমার কত আপন লোক! আমি তো আনন্দই পেলাম। আমি তো যা করার করছি হাসিমুখেই। তুমি এতে অন্য রকম ভাবছ কেন? আমি যদি তোমাকে কিছু বলতাম, তা হলে তুমি লজ্জা পেতে পারতে। আমি তো কিছুই বলিনি। তোমার এত আপন জনের জন্যে আমি কিছু করতে পারছি বলে কত ভালো লাগছে আমার। পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে, তোমার জন্যে বা তোমার আত্মীয়-স্বজনের জন্যে তো কিছুই করিনি, করতে পারিনি। এইবার যখন সুযোগ এল তখন হাসিমুখে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করো।

পরমা মুখ তুলে অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল চোখ বড় বড় করে।

ওর মুখ দেখে মনে হল, ও আমাকে চেনে না।

তারপর বলল, যাও! শীগগিরি মুখ-হাত ধুয়ে এসো, চা জলখাবার খেয়ে নাও।

বাথরুম থেকে এসে চা জলখাবার খেতে খেতে আমি বললাম, ওঁরা কোথায় গেলেন?

পরমা বলল, বাঁকুড়ায়। পোড়া-মাটির ঘোড়া কিনতে।

তারপরই আমার সামনে এসে আমার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, তুমি প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা ধার করেছো, না?

আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, হ্যাঁ।

ওর ডান হাতে খুন্তি ছিল। আমার নাকের সামনে খুন্তি নেড়ে বলল, কত?

বললাম, দুশো।

দু—শো! বলেই, দীর্ঘশ্বাস ফেলল পরমা।

ওর চোখের দৃষ্টি নরম হয়ে এলো। খুন্তিটাকে খাওয়ার টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে আমার একেবারে কাছে এসে বলল, তোমার উপর বড় অত্যাচার হলো গো! আমি খুব অবিচার করলাম তোমার উপর।

আমার গলার কাছে কী যেন দলা পাকিয়ে এল।

আমি বললাম, ওরকম করে বোলো না। ওঁরা তোমার কত আপনার জন। তোমার জন্যে যাঁরা এত করেছেন, তাঁদের জন্যে আমি করব না? তা কি হয়?

পরমা বলল, খুব খারাপ হল। নিজের উপর খুবই অন্যায় করছ তুমি!

রবিদা বৌদি চলে যাবার ক'দিন বাদেই অফিসে বাবার হাতে লেখা একটি পোস্টকার্ড পেলাম। বাবা লিখেছেন

"রমেনের পীড়াপীড়িতে আমি ও তোমার মা এই মাসের তিরিশ তারিখে বিষ্ণুপুরে

www.BanglaBook.org

যাইতেছি। রমেন তাহার অফিসের গাড়ি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছে। সেই গাড়ি আমাদের সহিতই থাকিবে। আমরা তিন দিনের জন্য যাইতেছি। সাক্ষাতে আর সমস্ত খবর দিব। আশা করি তুমি ও পরমা কুশলে আছ। মিনিকে আমার আদর জানাইও।"

বাবা মা আমার কাছে আসবেন এর চেয়ে বেশি আনন্দের আর কি হতে পারে? কিন্তু এ যে কত বেদনাদায়ক তা অযোগ্য ছেলে মাত্রই জানে। নিজের অযোগ্যতার কারণে বাবা মায়ের জন্যে যা করার, মন যা করলে খুশি হয়; তা না করার যে কী দুঃখ তা আমি সেই মুহূর্তে প্রথম অনুভব করলাম।

যোগ্য হইনি, হতে পারিনি বলে; নিজেকে অভিসম্পাত দিলাম।

পরমা গত দু-দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে বেশ অসুস্থই হয়ে পড়েছে। ওর একটা অ্যালার্জির মতো হয়। হাঁপানির টানের মতো ওঠে। সেইটা উঠেছে। পাছে আমার খরচ বেশি হয়, তাই কিছুতেই অ্যালোপাথিক ডাক্তারের কাছে যায়নি। হোমিওপ্যাথের কাছ থেকে ওষুধ এনে খাচ্ছে।

ঠিক এই সময়েই বাবা মা এবং বড়দার অফিসের ড্রাইভার! এ-খবর আমি পরমাকে দিতে পারবো না। তার চেয়ে ওঁরা আসুন। যেন আচমকা এলেন। আমি মিথ্যে করে বলব যে, চিঠি পাইনি।

সে-রাতে পরমা খুবই কষ্ট পেল। আমি ওর বুকে পিঠে হাত বোলাতে গেছিলাম রাতে উঠে। আমাকে খুব বকল। বলল, কাল তোমার অফিস নেই? আমার কি কাজ? আড়াই জনের জন্যে একটু রান্না। আর সারাদিন তো বাড়িতেই শুয়ে থাকি। আমি ঠিক হয়ে যাব। তুমি ঘুমোও তো দেখি গিয়ে।

চলে যেতে যেতে, মিনির ঘুমন্ত মুখে চোখ পড়ল আমার। মেয়েটার মুখের দিকে চাইলেই বড় কষ্ট হয়। বুকের মধ্যেটা মুচড়ে ওঠে। বড় কষ্ট দেওয়ার জন্যে ভুল করে আমরা পৃথিবীতে এনেছি। এতটুকু শিশু! ওর কি দোষ? আমার অযোগ্যতার জন্যে ওকে ভালো খাওয়াতে পারব না, পরাতে পারব না, ভালো শিক্ষা দিতে পারব না, পারব না ভালো বিয়ে দিতেও। কিন্তু যোগ্যই হই বা অযোগ্যই হই; বাবা তো বাবাই; বড়লোক বা গরিবই হোক, সব বাবা মায়ের কাছেই সন্তান তো সন্তানই! গরিব বাবা মায়ের বুকের মধ্যে চাপা কষ্ট যে কতখানি তা কি সন্তানরা কোনদিনও জানতে পারবে, বুঝতে পারবে? তাদের বাবা মায়েরা তাদের যা দিয়েছিল তা কি মনে রেখে, যা দিতে পারেনি সেই কথার ক্ষোভ ভুলে যাবে বড় হলে। ক্ষমা কি করবে মিনি আমাদের? অন্তরের, বোধের দাম কি ও বুঝবে ভবিষ্যতে? এ-কথা কি জানবে যে, ওকে জাগতিক কষ্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর মা-বাবা তাদের অক্ষমতার কারণে মানসিক কষ্ট পেয়েছে প্রতিটি ক্ষণ?

বাবা মায়ের যেদিন আসার কথা সেদিন আমি ইচ্ছে করেই দেরী করে বাড়ি ফিরলাম। কারণ জানতাম যে, ওঁরা নিশ্চয়ই সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া করে বেরুবেন এবং বিকেল নাগাদ পৌঁছে যাবেন। আজ আমার ভূমিকা অযোগ্য বাবার নয়, অযোগ্য ছেলের। অযোগ্য ছেলের বুকে সেই অযোগ্যতার গ্লানি যে কতখানি বাজে তাও কি বৃদ্ধ বাবা-মা বোঝেন? হয়ত বোঝেন। কারণ, তাঁরাই যে জন্মদাতা। তাঁরাও আমাকে না বুঝলে আর কে বুঝবেন?

বাড়ির সামনে দূর থেকে একটা অ্যামবাসাডার গাড়ি দেখতে পেলাম। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই হাসি, গল্প, হৈ-হৈ শুনতে পেলাম। বাড়ি ঢুকেই অবাক হওয়ার ভান করে বললাম, একি? তোমরা?

www.BanglaBook.org

বাবা বললেন, চিঠি পাসনি?

মিথ্যে কথা বললাম। কিসের চিঠি?

বাবা বললেন, না: এ দেশের কিস্যু হবে না। কলকাতা থেকে বিষ্ণুপুর আসতে চিঠির সময় হলো না। তেলাপোকা হেঁটে এলে এর চেয়ে আগে পৌঁছে যেত।

আমার ভয় ছিল মাকে নিয়ে। বিয়ের পর থেকে এক দিনের জন্যেও মায়ের সঙ্গে পরমার বনিবনা হয়নি। কারণটা আমার সম্পূর্ণই অজ্ঞাত। স্ত্রী চরিত্র নাকি দেবতারাই জানেন না। তাই আমার পক্ষে এর রহস্য আবিষ্কারও অসম্ভব ছিলো। মায়ের এই হঠাৎ আগমন পরমা কিভাবে নেবে এবং তাঁর সবচেয়ে অযোগ্য এবং সে কারণেই সবচেয়ে আদরের ছেলেকে তাঁর কাছ থেকে নিয়ে এসে পরমার এখানে সংসার পাতার অপরাধ মাও যে কি ভাবে নেবেন আমার জানা ছিল না তা।

কিন্তু ঘরে ঢুকে যা দেখলাম, তাতে নারীচরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান আমার যতটুকুও বা আছে বলে জানতাম সেটুকুরও অনস্তিত্ব সম্বন্ধে দৃঢ়প্রত্যয় হলাম।

দেখি, মা রান্না করছেন। পরমা তাঁর পাশে বসে তরকারি কাটছে। মিনি বাবার কোলে বসে গল্পে মশগুল। বাবা বলছেন, আমার কোলটা যে কতদিন ধরে মিনির জন্যে কী রকম কাঁদছিল তা আমিই জানি।

মিনি ছোট ছোট হাত নেড়ে বলল, আমার কোলও যে দাদু তোমার জন্যে কী কাঁদছিল কী বলব!

মা বললেন, ওরে আমার পাকুনী রে!

সবাই হাসছেন, সবাই গল্প করছেন। পরমা খুশি হয়েছে সবচেয়ে বেশি। যে মায়ের সাংসারিক কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে সে ব্যাকুল হয়ে এখানে পালিয়ে এসেছিল সেই মায়ের হাতেই হাতা-খুন্তি তুলে দিয়ে এই মুহূর্তে সে যেন পরম নিশ্চিন্ত বোধ করছে।

মাকে বললাম, কি রাঁধছ মা?

মা বললেন, তুই কতদিন আমার হাতের খিচুড়ি খাস না। তাই এসেই তোর জন্যে খিচুড়ি রাঁধতে বসেছি।

বাবা ফোড়ন কাটলেন, বুঝলে পরমা, এবার আমরা দুজনে নোহ্যোয়ার। খিচুড়ি-ভক্ত মা-ছেলে একসঙ্গে হয়েছে। এবেলা খিচুড়ি, ওবেলা খিচুড়ি।

মা বললেন, জানিস খোকন, তুই কড়াইশুঁটির চপ খেতে ভালোবাসিস, তাই বড়-খোকা টিনের কড়াইশুঁটি দিয়ে দিল আমার সঙ্গে। বড় বউমা বলল, মা আপনি গিয়েই খোকনকে খিচুড়ি আর কড়াইশুঁটির চপ রেঁধে খাওয়াবেন। বলল, দুটো ছেলেমানুষ যে কী করছে সেখানে, কী খাচ্ছে, কী রাঁধছে; ভগবানই জানেন।

বাবা বললেন, তোর আর পরমার জন্যে রাধু দুটো ফোল্ডিং ইজিচেয়ার দিয়ে দিয়েছে রে। তোরা দুজনে বসে গল্প করবি, খবরের কাগজ পড়বি। তুই যে চেয়ারটাতে বারান্দাতে বসে খবরের কাগজ পড়তিস রাধু সেই চেয়ারটা দেখে রোজ বলত, খোকনের বিষ্ণুপুরের কোয়ার্টারে ইজিচেয়ারের অভাবে নিশ্চয়ই ওর খুব কষ্ট হচ্ছে। চেয়ারটাই পাঠিয়ে দিয়েছে গাড়ির মাথায় করে!

রাধু অর্থাৎ কাকা যে আমার মতো অপদার্থ কেরানী ভাইপোটিকে নিয়েও এতখানি ভাবতে পারেন তা আমার স্বপ্নেরও বাইরে ছিল।

আমার চোখের পাতা ভারী হয়ে এল।

www.BanglaBook.org

কত যে জিনিস এনেছেন বাবা-মা। পরমা কই মাছ ভালোবাসে, তাই মেজবউদি হাঁড়ি করে কই মাছ পাঠিয়েছেন। বলেছেন বিষ্ণুপুরে নাকি কই মাছ পায় না ওরা?

মেজবউদি হয় জানেন না, অথবা জানলেও মানতে চান যে, কই মাছ বাজারে উঠলেও তা কিনে খাওয়ার সামর্থ্য আমার নেই।

পরমা বলল, মা তিনদিন থাকলে কিন্তু হবে না। বড়দার গাড়ি পাঠিয়ে দিন কালই। ও চিঠি লিখে দেবে ড্রাইভারের সঙ্গে। আপনি আর বাবা, আমাদের সঙ্গে এক মাস থাকবেন কম করে। এসে যখন পড়েছেন না বলে-কয়ে তখন এক মাসের আগে ছাড়ছি না। কোনো কথাই শুনছি না আমি।

বলেই, বাবার দিকে ফিরে বলল, কি বাবা?

বাবা বললেন, এখন তো আমার কোন মত নেই, তোমার সংসারে এসেছি; তুমি যা বলবে তাইই শুনব।

কতদিন, কতবছর পরে সে-রাতে যে কত আনন্দ করলাম তা কী বলব! মিনিটা রাত বারোটা অবধি জেগেই রইল। খাওয়া-দাওয়ার পর মা ওকে নিয়ে প্রহ্লাদের গল্প বলে ঘুম পাড়ালেন।

পরমা, বাবা মা আর মিনিকে ওর ঘর ছেড়ে দিল জোর করে। কোন কথা শুনল না। বড়দার অফিসের ড্রাইভারকে মিনির ঘরের খাটে আদর যত্ন করে বিছানা করে শোওয়ালো। নিজে, বোধহয় বহুদিন পর মিনি হওয়ার পর এই প্রথম, আমার সঙ্গে শুলো ঢাকা বারান্দায়।

সকালে ঘুম ভাঙতে দেরী হয়ে গেছিল একটু। উঠে দেখি, মা চায়ের জল চাপিয়ে বাইরে নতুন ইজিচেয়ারে বাবার পাশে বসে আছেন। আমাকে দেখেই চা করে দিলেন। বললেন, তোর সঙ্গে আরেক কাপ খাই।

পরমাকে দেখলাম না। ভাবলাম, সকাল সকাল চান করে নিতে গেছে বোধহয় বাথরুমে।

চায়ের কাপ নিয়ে বাইরে এসে দেখি গাড়িটা নেই। বাবাকে শুধোতে, বাবা বললেন, পরমা নিয়ে গেছে। বলল, এক্ষুনি আসছি।

আমি অবাক হয়ে বললাম, পরমা? এত সকালে ওর কি কাজ?

মা বাবা দুজনেই চিন্তান্বিত গলায় বললেন, তা তো আমরা জানি না। কেন? তুইও জানিস না কিছু।

আমি উত্তেজনা না দেখিয়ে বললাম, এলেই জানা যাবে।

মা বললেন, পরমার চেহারাটা যা খারাপ হয়ে গেছে তা বলার নয়। লোকজন নেই, সব একা করতে হয়। অভ্যেস নেই। পারে নাকি এতটুকু মেয়ে? তার উপর মিনিকে দেখা। সব একা হাতে।

একটু পর পরমা ফিরল। এক চ্যাঙারি গরম জিলিপি সিঙ্গাড়া নিয়ে। বাবাকে বলল, বাবা খান। আপনি গরম জিলিপি ভালোবাসেন। তারপর একটা ছোট ঠোঙা বের করে বলল, মা, এটা আপনার। আপনি ভালোবাসেন।

মা বললেন, কি রে ওটা?

দেখুন। বলে পরমা হাসল।

মায়ের সুন্দর মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মা বললেন, বোঁদে?

ভিতরে যাওয়ার সময় পরমা আমাকে ডাকল।

বলল, চা খেয়ে একটু শুনে যেও।

ভিতরে যেতেই শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে পরমা আমার হাতে অনেকগুলো

www.BanglaBook.org

একশো টাকার নোট আর অনেকগুলো খুচরো নোট দিলো। ফিসফিস করে বলল, সাড়ে বারো শো টাকা আছে। তার মধ্যে পাঁচ টাকা খরচ হয়েছে জিলিপি-টিলিপিতে।

আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না। অত টাকা বহুদিন দেখিনি একসঙ্গে। খুব উত্তেজিত হয়ে পড়লাম আমি।

বললাম, এত টাকা? কোথায় পেলে তুমি এই সকালে?

পরমা বলল, আমার একটা গয়না বেচে দিয়ে এলাম মধু স্যাকরার কাছে।

আমি বিশ্বাস না-করে বললাম, দোকান তো এখনও খোলেনি!

দোকানে নয়, বাড়িতে গেছিলাম।

সে কি? কী সাংঘাতিক কাণ্ড! সাতসকালে! গয়না বিক্রি করলে সংসারে অলক্ষ্মী আসে জানো না কি তুমি?,

কি লক্ষ্মী আর কী অলক্ষ্মী আমাকে শেখাতে হবে না তোমার। এখন সরো, তাড়াতাড়ি দরজা খুলি, নইলে বাবা মা কি মনে করবেন?

বললাম, ছিঃ ছিঃ কেন এমন করলে? তুমি জানো, কত ছোট করলে আমাকে তোমার কাছে?

পরমা তখন হাসছিল।

বলল, বাবা মাকে এক মাস রাখবোই আমি। হয়ত তুমিও একদিন বড় অফিসার; বড়লোক হবে, কিন্তু বাবা মার জন্যে কিছু করার সুযোগ আর নাও আসতে পারে। বাবা মার জন্যে যা করবে, ভগবান তার দশগুণ তোমাকে ফেরত দেবেন।

হেসে ফেলে বললাম, তাহলে দশগুণ ফেরত পাবার জন্যেই এই কাণ্ডটা করলে?

কিন্তু হাসলাম যে কী করে; জানি না।

পরমা এবার পরিপূর্ণ হাসল। হাসলে, ওর গালে ভারী মিষ্টি টোল পড়ে একটা। বলল, আজ্ঞে না স্যার। তোমাকে হারাবার জন্যেই করলাম। তুমি কি ভেবেছ তুমিই জিতে যাবে? আমিও কি জিততে জানি না?

কিন্তু মিনি? মিনির ভবিষ্যৎ? এইভাবে চললে ওর কি হবে?

পরমা রেগে উঠল। বলল, সরো, দরজা খুলতে দাও।

তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, নিজের মা-বাবার কারণে কারো ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয় এ-কথা আমি মানি না, বিশ্বাস করি না। আমি যা করেছি, বেশ করেছি। আমার গয়না আমি যা-খুশি করব। আমি তা বিক্রি করি, দিয়ে দিই, ফেলে দিই তোমার তাতে কি?

বলেই, দরজা খুলে রান্নাঘরে গেল।

আমি বাইরে এসে বাবার পাশে বসলাম।

মা ভিতরে গেলেন পরমাকে রান্নায় সাহায্য করতে।

কৃষ্ণচূড়া গাছের শিকড়গুলো চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে। আমার বাবার পাশে আমি....

বাবাকে আজকাল বেশ বুড়ো বুড়ো দেখায়। চুলগুলো সবই সাদা হয়ে গেছে। দাঁড়ালে কুঁজো লাগে। হাতের শিরাগুলো দেখা যায় গাছের শিকড়ের মতো।

বাবার পাশে বসে থাকতে থাকতে আমার হঠাৎ মনে হলো যে, প্রত্যেকটি দূরত্বের লাটাইতেই নৈকট্যের সুতো গোটানো থাকে সব সময়ই এবং শিকড়ের মধ্যেই থাকে গাছের প্রাণ, লতায়, অর্কিডেও।

বাবা, মা, আমি, পরমা এবং মিনি....

www.BanglaBook.org

অদ্ভুত লোক

সোমেশের দশ বছরের ছেলে রুন মুখ গোমড়া করে তার বাবাকে বলল, অদ্ভুত লোক।

কেন? অদ্ভুত কেন?

তিনদিন হল ড্রাইভার আসছে না, তুমিও কিছুই বলছ না। আমার পিয়ানোর স্কুলে যাওয়া হলো না। সাঁতারে যাওয়া হলো না। দাদা টলীক্লাবে রাইডিং ক্লাসে যেতে পারল না। মা পেডিকিউর আর ম্যানিকিউর করতেও যেতে পারল না প্রান্ডে।

মালতী বলল, তাহলেই হয়েছে। তোমার বাবা ড্রাইভারের বাড়ি গিয়ে তাকে ধরে আনবে ভেবেছ! ড্রাইভারের নামটা কি তাইই জানে না। অ্যাটারলী ইউসলেস।

আজকাল একটুতেই মালতী রেগে যাচ্ছে।

সোমেশ বলেছে, সাইকিয়াট্রিস্ট-এর কাছে নিয়ে যাবে শীগগিরি।

সোমেশ বলল, ড্রাইভারের নাম জানি। তবে বাড়ি চিনি না। তাছাড়া আমি তো মিনিবাসে আর হেঁটেই ঘোরাফেরা করি। গাড়ি তো তোমাদেরই জন্যেই। এ সব খবর আমার রাখার কথাও না।...কেন কি হয়েছে তার?

কি আবার হবে? এত ইরেসপন্সিবল আর অশিক্ষিত এই লোকগুলো! সেই শুক্রবার থেকে ডুব মেরেছে তো মেরেছেই, একটা ফোন করে দে! কাউকে দিয়ে খবর পাঠা একটা! তা না। অদ্ভুত লোক।

এই ড্রাইভারকে স্যাক করো।

টেলিফোনের কাছ থেকে সোমেশের সতেরো বছরের ছেলে পুমা বলল। বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে।

ড্রাইভার ড্রাইভার করো না। ওর কি নাম নেই?

www.BanglaBook.org

সোমেশ বলল।

হু বদার্স? নিশ্চয়ই আছে একটা। সে ওর মা-বাবারই ব্যাপার।

পুমা বলল।

ওর নাম মুনেশ্বর। ও বন্দেল গেটের কাছাকাছি কোনো জায়গাতে থাকে। অফিসে ঠিকানাটা নিশ্চয়ই রাখা আছে। কিন্তু মানুষটা তিন দিন হলো আসছে না সে সম্বন্ধে একটা খবর তো তোমরাও নিতে পারতে। ওর নিজেরও যে অসুখ-বিসুখ করতে পারে সে কথা তো একবার মনে হওয়া উচিত ছিল তোমাদের। অন্য কোনো বিপদ-আপদ।

অদ্ভুত লোক!

মালতী বলল, নিজেদের ঝামেলায় নিজেরাই মরি, আবার চাকর ড্রাইভারের খবর নিতে যাবে কে?

কেন? পুমাকে পাঠালেই পারতে।

পুমা...?

মালতী প্রচণ্ড বিস্ময়ে চোখ বড় করে বলল। গড়িয়াহাটের বাজারেই ও যেতে চায় না, বলে, স্টিংকিং গন্ধ লাগে। ও যাবে বস্তিতে ড্রাইভারের খোঁজ করতে?

ড্রাইভার নয়, বল, মুনেশ্বর।

এখন আর ওসব আমাকে শিখিও না। ছোটবেলা থেকেই বাবার মুখে "বয়", "বাবুর্চি" "ড্রাইভার" শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

মালতী বলল।

কুঅভ্যেস ত্যাগ করা উচিত। বেটার লেট দ্যান নেভার।

তুমি আমার বাবাকেও টানছ?

অন্যায়টা অন্যায়ই।

মালতী এবার সোমেশের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। ইনভার্টার খারাপ। সকাল থেকেই লোডশেডিং। মেজাজ খুবই গরম।

সোমেশ ঝগড়া এড়াতে অন্য দিকে চেয়ে বলল, অদ্ভুত লোক! তারপর বলল, রুন! ও কি? তুমি আবার এনিড ব্লাইটন পড়ছ?

সোমেশ ধমক দিল রুনকে।

হ্যাঁ—এ। পড়ছি! সো হোয়াট! বাংলা বই আমার ভালো লাগে না। সেদিন কি একটা দাদার না মামার, কার কীর্তি এনে দিয়েছিলে, পুরো পড়তেই পারলাম না। নট হ্যাফ অ্যাজ গুড অ্যাজ এনিড ব্লাইটন। দাদা বলছিল যে, এনিড ব্লাইটন নাকি এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার অ্যাডভাইসরী কমিটিতেও ছিলেন। তোমাদের বাংলা লেখকেরা তো ট্র্যাশ লেখে। ট্যু কান্ট ফোর্স মী টু রিড হোয়াট আই ডোন্ট লাইক টু রিড। ক্যান ট্যু?

অদ্ভুত লোক!

সোমেশ ভাবছিল, এ সবই সোমেশের অথবা সোমেশদের প্রজন্মরই কৃতকর্ম। তারা ছোটবেলায় ভালো স্কুলে পড়বার সুযোগ পায়নি। ইংরিজি মিডিয়াম স্কুলে তো নয়ই। ছেলেমেয়েদের ভালো শিক্ষা দিতে গিয়ে নিজেদের ক্ষমতার শেষ সীমান্তে পৌঁছেও যে শিক্ষা এদের দিচ্ছে, তাতে এরা প্রায় সকলেই এক একজন বোতল-ছাড়া দৈত্য হয়ে উঠছে। ফ্রী-স্কুল স্ট্রিটের শিকড়হীন সংস্কৃতি দিয়ে ওদের নিজেদের সুন্দর সংস্কৃতিকে নিজেরাই মুছে দিচ্ছে নিজেদেরই হাতে। ইংরেজি জানা আর শিক্ষা যে সমার্থক নয়,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঔদ্ধত্য আর সপ্রতিভতা যে সমতুল নয় এ কথা আজ ও বোঝাবে কাকে? এ সব বলতে গেলেই লোকে বলবে, অদ্ভুত লোক।

দরজায় বেল বাজল।

মালতীর সোনাকাকা এসে পড়াতে যে গৃহযুদ্ধটা একটা সাংঘাতিক মোড় নিতে পারত, সেটা থিতিয়ে গেল। থলিতে করে আম নিয়ে এসেছেন উনি পুষ্যি তার রুন-এর জন্য।

সাদা খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি, সাদা ধবধবে চুল-দাড়ি, রবীন্দ্রনাথের মতো। পায়ে তালতলার চটি। সদাহাস্যময়। বয়স প্রায় সত্তর। মালতীর বাবার সাহেবীয়ানার কারণে, তাঁর সঙ্গে যৌবনে সোনাকাকার বিশেষ সদ্ভাব ছিল না।

দেশ যখন স্বাধীন হল, সোনাকাকা নাকি বলেছিলেন, এ কি স্বাধীনতা...?

পূর্ব আর পশ্চিমবাংলা যেদিন এক হবে সেদিনই নাকি দাঁড়ি-গোঁফ কাটব। তার আগে নয়। দাঁড়ি-গোঁফ রেখেছিলেন পুলিশের অ্যারেস্ট ওয়ারেন্টের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে। মালতীকে তিনি বাক্স-বাক্স ডিনামাইট দেখিয়েছিলেন একবার। চুরুটের মতো দেখতে। মালতীর কাছেই গল্প শুনেছে সোমেশ। বিদেশী সবকিছুই বর্জন করেছিলেন। মদের দোকানের সামনে পিকেটিং করেছিলেন অথচ আজকের সোনাকাকার চার ছেলেই পাঁড়-মাতাল। বিলিতি সিগারেট ছাড়া মুখেই দেয় না তাঁর কোন ছেলে।

অদ্ভুত লোক! সোনাকাকা!

আবার ফোনটা বাজল। মালতী ধরল। বীথিন!

সোমেশ ধরতে, বীথিন বলল, চলে আয়। এখানে নরক গুলজার।

প্রতি রবিবার বীথিনের বাড়িতে আড্ডা দেয় ওরা। কেউ কেউ বিয়ার-টিয়ারও খায়। যারা খায় না, তারা চা, কফি...

মালতীকে বলল, যাব?

এ বাড়িতে মালতিই সব। পুরোপুরি মাতৃতান্ত্রিক পরিবার।

কখন ফেরা হবে?

এখনই তো সাড়ে এগারোটা। ফিরতে ফিরতে প্রায় দেড়টা তো হবেই।

দেড়টা! চাকরটার অসুখ। কুক একা! সত্যি! তুমি অদ্ভুত লোক!

সোনাকাকা হেসে বললেন, ওরে মালু, পুরুষ মানুষকে বেশীক্ষণ নারী সঙ্গে থাকতে নেই। তাতে তার পৌরুষের হানি হয়।

অদ্ভুত লোক। মালতী বলল। কাকীমাকে বলব নাকি ফোন করে?

॥ ২ ॥

বীথিনের বাড়িতে আজ সত্যিই নরক গুলজার। নির্মলেন্দু, শ্যামানাথ, শেষাদ্রি, যোগব্রত, ঋদ্ধি, প্রদ্যোত ও আরও অনেকেই এসেছে।

গদ্য লেখক শ্যামানাথ বলল, অ্যাই যে সোমেশদা। আজকের কাগজে এক বৃদ্ধ ভামের ইন্টারভিউ পড়েছ?

কোন্ কাগজে? না তো!

পড়নি? তবে শোন। 'বর্তমান বাংলা সাহিত্যের গদ্য দুর্গন্ধময়। উপন্যাসে অবক্ষয় চলছে। কিসসুই লেখা হসসে না।' কি বুঝলে?

সাহিত্যিক ঋদ্ধি বলল, অদ্ভুত লোক!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ননী বলল, ভেরী স্যাড। তোমাদের বইয়ের মলাটের খোমা দেখেই খারিজ করে দেন ওঁরা। যত কিছু ভালো লেখা সবই আগে হয়ে গেছে বাংলা সাহিত্যে। এবং ভবিষ্যতে হলেও হতে পারে। বর্তমানে শুধু ইংরিজিতেই ভালো লেখা হচ্ছে। যাচাই করতে হলে পড়তে হয় যে। তার চেয়ে স্মার্টলি না-পড়েই বাতিল করে দেওয়া অনেকই সহজ। আমরা যদি বৃদ্ধ ভামদের একবার ইনসাইড-আউট করে সমালোচনা করতে বসি, তো কি হাল হবে...?

অদ্ভুত লোক! যোগব্রত বলল। রেগে লাভ কি? মহাকাল আছে।

বলিস কী রে! ঘোর কলি। আগামী বছরই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। তেত্রিশশো ছাপা হল নতুন বইটা। শেষ হওয়ার আগেই...

এমন সময় রমেন এলো। ক্যাজুয়ালী। ওর চরিত্রে তাড়াহুড়ো, টেনশান, এ সব কোন ব্যাপারই নেই। •

নির্মলেন্দু বলল, অ্যাই তো রমেন! কাকে ভোট দিলি?

ভোট কাউকেই দিইনি।

কেন? কেন...? লেখাপড়া জানা লোক হয়ে ফ্রাঞ্চাইজ এক্সারসাইজ করলি না। অদ্ভুত লোক!

কাকে দেব। বাদল মিত্রকেই দিতাম। রবীন্দ্রসদনে একদিন এক অনুষ্ঠানে গেছি। বুঝলি, স্বয়ং কবি বামন মজুমদারের পাশে মন্ত্রী বাদল মিত্র। একজন আলাপও করিয়ে দিলেন।

কিন্তু, নো-কগনিজেন্স! ময়দার মতো ফর্সা ধুতি-পাঞ্জাবী পরা কালো ভদ্রলোক দু-হাতের দশ-আঙুল বুকের কাছে জড়ো করে নমস্কার করলেন। ঠাণ্ডা! ওয়ার্মথলেস। ব্যসস। অদ্ভুত লোক!

কেন? অদ্ভুত কেন?

যে লোক বামন মজুমদারের কবিতাই পড়েনি, তার নামই শোনেনি, তাকে ভোট দিতে যাবে অফ অল পার্সন্স রমেন মজুমদার? কোন দুঃখে?

অদ্ভুত লোক!

ঋদ্ধি বলল!

যোগব্রত বলল, বাদল মিত্রের ওপর এত রাগ তো ভগা সেনকে ভোট দিয়ে প্রতিশোধ নিলি না কেন?

রমেন বলল, দ্যাখ যোগা, ওসব প্রতিশোধ-টতিশোধ ইনফিরিয়ার লোকেরা নেয়। তোদের মতো অবক্ষয়ী গদ্য-লেখকরা। কবিরা অত ছোট কাজ করে না। ছোট করতে পারেও না নিজেদের। ভগা সেনকে ভোট দিলাম না নিতান্ত কাব্যিক কারণেই।

অদ্ভুত লোক! কে যেন বলল।

হ্যাঁ, একেবারেই কাব্যিক কারণে। তাঁর ছবি ছাপা হয়েছিল কাগজে। দেখেছিলি। খালি গায়ের ছবি। চেহারাটি মোটেই কাব্যময় নয়।

ওঁর স্বাস্থ্যর গড়নটা আধুনিক কবিদের চেয়ে অনেকই ভাল বলছিস?

অত জানি না। কিন্তু একেবারেই কাব্যময় নয়। তাছাড়া খালি গায়ে থাকলেই আমার নিজের সুড়সুড়ি লাগে। সুন্দর স্তনসম্পন্না মহিলা ব্যতীত খালি গায়ে কোন মানুষকেই আমি সহ্য করতে পারি না। সুড়সুড়ি দেওয়া মানুষকে ভোট দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ঐ ছবিটা মুদ্রিত না হলে উনি আরও বেশি ভোটে জয়ী হতে পারতেন।

ঋদ্ধি বলল, সত্যি রমেন, তুই অদ্ভুত লোক!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এমন সময়ে দীনেশ চৌধুরী এলো। ও একটা মাইকা মাইনে কাজ করে। বিহারেই পড়ে থাকে, জঙ্গলে। অনেক দিন পর পর ধূমকেতুর মতো হাজির হয় এসে। ঢুকেই অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বললো, একটা বড় জিন দিতে বল বীথিন। অপমান করেছে। বড্ডই অপমান করেছে আমাকে?

কে...? সমীর বলল।

আমার বস। এক্ষুনি তার বাড়ি থেকেই আসছি। আমাকে শালা কি বললো জানিস? বলল, আই ফাইন্ড, ট্যু হ্যাভ ইমপ্রুভড ইওর ইংলিশ।

বস তো তোর প্রশংসাই করেছে! অপমানের কি আছে?

দীনেশ বলল, প্রশংসা? ন্যাকা! ইংরেজি ইমপ্রুভ করেছি। ইয়ার্কি করার জায়গা পায়নি। আমিও বলে দিলাম, আই শ্যাল বী ফিফটি নেক্সট জুন। হিঃ হিঃ। জিন দিতে বল। উইথ লাইম।

নির্মলেন্দু বলল, অদ্ভুত লোক!

॥ ৩ ॥

বাড়িতে যখন পৌঁছল সোমেশ, তখনও কারেন্ট আসেনি। পাশের বাড়ির জেনারেটারের ভটভটানিতে পাগল পাগল লাগে। কোন কথা বলা বা শোনা যায় না। দরজায় দুম দুম করাতে দরজা খুলল। ঘামে-ভিজে, প্রচণ্ড বিরক্ত মালতী দরজা খুলেই বলল, অদ্ভুত লোক।

বেশি দেরি তো হয়নি!

দেরি হয়েছে। তবে, সেটা ইম্মেটেরীয়াল। তোমার পেয়ারের ড্রাইভার আধঘন্টা হলো এসে ছাদে বসে আছে। কাঁদছে আর বলছে, তোমার সঙ্গে দরকার আছে। ডিউটিতে ও তিনদিন কেন আসেনি, তা পুমা ওকে ধমকে জিগ্যেস করেছিল। তাতে বলেছে, যা বলার তা নাকি তোমাকেই বলবে। তাতে পুমা খুবই ইনসাল্টেড ফিল করেছে। আফটার অল হি ইজ গ্রোন আপ নাউ। অদ্ভুত লোক।

কে...? সোমেশ বলল।

তোমার ড্রাইভার।

তাহলে ওর সঙ্গে কথাটা বলেই আসি।

দয়া করে আগে খাওয়াটা সেরে নাও।

কথাটা সেরেই আসি। খাবার লাগাতে বল।

ছাদে গিয়ে সোমেশ দেখল মুনেশ্বর এক কোণায় বসে আছে হাঁটুতে মুখ গুজে। ওকে দেখেই চমকে দাঁড়িয়ে উঠল।

বললো, কসুর হো গ্যায়া সাব। তিন রোজ ডিউটিমে আনে নেহী সেকা।

কিন্তু কি হয়েছিল? কাঁদছ কেন?

মুনেশ্বর দু-হাতে মুখ ঢেকে বলল, আমার ছেলেটা সকাল দশটাতে মরে গেল।

বীয়ারে সোমেশের যেটুকু নেশা হয়েছিল, তা উবে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। মেরুদণ্ড বেয়ে একটা ঠাণ্ডা সাপ নেমে গেল। বলল, মরেই গেল? কত বড় ছেলে?

রুনবাবার মতো।

রুন-এর মতো! সোমেশ চোখে অন্ধকার দেখল।

তারপর সামলে নিয়ে বলল, কি হয়েছিল?

তা কি করে বলব সাহেব। অসুখ হয়েছিল। আমাদের শুধু দু-রকমের অসুখ হয়। মরার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অসুখ। আর বেঁচে ওঠার অসুখ।

চিকিৎসা করিয়েছিলে?

দাবাই তো দিয়েছিলাম। পাড়ার হোমিপ্যাথ ডাগদারের। বাঁচাতে পারলাম না।

সোমেশের শরীর খারাপ করতে লাগল।

কি করব বল, আমি তোমার জন্যে? কি করতে পারি...

মুনেশ্বর সোমেশের মুখে বীয়ারের গন্ধ পেয়ে থাকবে।

বলল, আপনার খুশি আমি খারাব করে দিলাম। আমাকে মাফ করবেন সাব।

আঃ! বল, মুনেশ্বর, কত টাকা চাই তোমার?

পঞ্চাশ টাকা সাহেব। সৎকার করতে হবে ছেলেটাকে। ওতেই হয়ে যাবে।

তোমার ছেলেকে ভাল করে চিকিৎসা করালে না কেন? ইস-স আমাকে বললে না কেন একবারও মুনেশ্বর?

সাব, আপনার ডিউটি তো করি না। আমি মেমসাহেবকে বলতে পারিনি। বলিনি। তাছাড়া আমার মা বলেছিল, নিজের যতই অসুবিধা থাক, অন্যের অসুবিধা আগে বিচার করবি। মাসের শেষ। আপনিও তো চাকরি করেন সাহেব। হয়তো মাইনে বেশি পান। কিন্তু চাকরি তো চাকরিই। সেই জন্যেই চাইনি। অসুবিধা সকলেরই থাকে।

পার্স খুলে মুনেশ্বরকে একশো টাকা দিল সোমেশ।

মুনেশ্বর বলল, আপকি দোয়া। বড়া মেহেরবানী। ভগবান ভালা করেগা আপকো।

উঃ! কারেন্ট এসে গেছে।

মালতী যখন আবার দরজা খুলল, ও বলল, কী প্রেমের কথা হচ্ছিল এতক্ষণ ড্রাইভারের সঙ্গে? অদ্ভুত লোক!

রুন ড্রয়িংরুমের সোফায় শুয়ে এনিড ব্লাইটন পড়ছিল। আর পুমা, 'দ্যা পোলিস'-এর রেকর্ড শুনছিল।

সোমেশ ঘরে ঢুকতেই রুন বলল, কি হয়েছে বাবা? ড্রাইভারের? কাঁদছিল কেন?

ঠিক তোমারই মতো বয়সী একটি ছেলে ছিল মুনেশ্বরের। তিনদিন ভুগে সে আজ সকালেই মারা গেছে। দাহ করার জন্যে টাকা চাইতে এসেছিল। সোমেশ বলল।

স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল রুন তার মুখের দিকে। ডিম ফুটে বেরুনোর পর পাতিহাঁসের বড় হতে সময় লাগে একটু। এখনও পাতি-বুর্জোয়ার বয়সে পৌঁছয়নি রুন। ওর মুখে, মুনেশ্বরের জন্যে গভীর এক সমবেদনাও লক্ষ্য করল সোমেশ।

মালতী অভিভাবকসুলভ গলায় বলল, কত টাকা দিলে? তিরিশ-চল্লিশ দিলেই যথেষ্ট। বেশি দাওনি তো? নিয়ে তো যাবে চটে-মুড়ে। এরা সব নিমকহারাম। যতই করো, গুণ গাইবে না। কিন্তু ডিউটি তো করে আমার আর ছেলেদেরই বেশি। আমার কাছে চাইল না কেন সে? এটা তো আমাকেও ইনসালট করা।

সোমেশের মন বলছিল, পুমাকে মুনেশ্বরের সঙ্গে পাঠায়। তার পরই ভেবেছিল, কি লাভ? জিনের প্যান্টের দু' পকেটে হাত দিয়ে দু' পা ফাঁক করে হীরোর মতো দাঁড়িয়ে থাকবে বস্তির উঠোনে। তেলেজলে মিশ খায় না। খাবে না।

পুমা অন্য গার্ল-ফ্রেন্ডের ফোন ধরতে উঠেছিল।

যাঃ! বলে রিসিভার নামিয়ে রেখেই বলল, বেলেভ্যু বা উডল্যান্ডস-এ ভর্তি করে দিলেই পারত ইডিয়টটা। তাহলে হয়তো ছেলেটা মরত না।

সত্যিই অদ্ভুত লোক!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খেলনা

শেষের বাসটি চলে গেল। ইম্ফলের দিকে। চৈতি বারান্দায় দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে দেখল।

দেওয়ালে ঝোলানো আয়নায় মুখটি একবার দেখল, আলতো করে মুখে একটু পাউডারের প্রলেপ বুলোলো। তারপর কনে-দেখা আলোয় বড় করে দগদগে একটি সিঁদুরের টিপ পরলো।

রুদ্র ওদের বাড়ির লাগোয়া ব্যাচেলার্স মেসে তাস খেলতে গেছে। সেখানে তক্তপোশের উপর ঝুঁকে পড়ে বসে ওরা নিশ্চয়ই তাস খেলছে, কাপের পর কাপ চা খাচ্ছে, সিগারেটের পর সিগারেট খাচ্ছে। ঘরটিকে এতক্ষণে আস্তাকুঁড় করে তুলেছে। ছেলে মাত্রই নোংরা। তার উপর অতজন কমবয়সি ছেলে যদি একসঙ্গে থাকে।

আজ শনিবার। মনে পড়ল চৈতির। মনে যে এখনো পড়ে এটাই আশ্চর্য। এই বার্মা সীমান্তের অজ্ঞাত শেষ গ্রাম 'মোরে'তে ক্যালেন্ডারের কীই বা দাম। পুরকায়স্থ কোম্পানির চাকরি করে রুদ্র, পাশের মেসের সকলেই তাই করে। জঙ্গলে থেকে কাঠ কাটায়, হাতী দিয়ে বইয়ে আনে, 'মোরে'র চেরাই কলে কাঠ চেরাই হয়, তারপর লরী বোঝাই হয়ে চালান যায়। প্যালেল হয়ে ইম্ফল।

চৈতি এখন সকাল-সন্ধ্যেয় রান্না করে, তারপর সন্ধ্যের পর পরই খেয়েদেয়ে ঘুম দেয়।

বিয়ের পর পর বেশ লাগত। এমন নিরালা নির্জন জায়গা। সমাজ নেই, লৌকিকতা নেই। শুধু পাখির ডাক, বাঘের ডাক, আর অবিচ্ছিন্ন অবকাশ। আর নিজের স্বাধীনতার সংসারে নানা রকম মজাও ছিল তখন। ভারত-বার্মা চেক-পোস্টের সকলের সঙ্গে ভাব সকলের। দিব্যি, সেই নো-ম্যানস রিভারটির উপরের সাঁকো পেরিয়ে বার্মার গ্রাম "তামু"তে চলে যেত। স্বচ্ছ, রঙীন নাইলনের জামা-পরা বর্মী মেয়েদের সঙ্গে ইশারায় কথা বলত।

www.BanglaBook.org

ওরা ফানুসের মতো হাসিতে ফুলে ফুলে উঠত। ফুলের মতো মুখে ওরা মুখরা হয়ে উঠত। কাঠের প্যাগোডাতে গিয়েও মাঝে মাঝে বেড়িয়ে আসতো। তারপর ভারতের এলাকায় ফেরার পথে পাঞ্জাবী ব্যবসাদারের দোকান থেকে সস্তায় টুকিটাকি কিনে ফিরত। না পাসপোর্ট, না ভিসা। তখন এত কড়াকড়ি ছিল না।

কয়েক বছর আগের দিনগুলোই ভালো ছিল। সবদিক দিয়েই।

এখন আর কোনো মজাও নেই। চৈতির জীবনের সব মজাই যেন শেষ হয়ে গেছে। রুদ্র যে মাইনে পায় তাতে কোনো মজার খেলনা তৈরি করতেও রুদ্র মোটে সাহস পায় না। ওরা খালি ঘুমোয়, ঘুম ভেঙে ওঠে, খায়, রোজকার কাজ করে, আবার ঘুমোয়। চৈতি অনেকবার হাবে-ভাবে বুঝিয়েছে, কিন্তু রুদ্র খেলনা পছন্দ করে না। খেলাও না।

মাঝে মাঝে বড় ক্লান্তি লাগে চৈতির। খারাপও লাগে। খুব খারাপ।

প্রথম যেদিন রমাপিসীর সঙ্গে এখানে বেড়াতে আসে, ওরা ঐ পাহাড়ের উপরের মোরে ডাকবাংলোতে ছিল সে রাতে। পিসেমশাইয়ের গাড়ির পেট্রল ট্যাঙ্ক ফুটো হয়ে গেছিল। পিসেমশায়ের সহপাঠী পুরকায়স্থসাহেবের কর্মচারী রুদ্র চ্যাটার্জীর ডাক পড়েছিল তখন সে বাংলোয়। সেদিনও এমনি কনে-দেখা-আলো ছিল আকাশে। খাকি শর্টস পরনে এবং খাকি হাফশার্ট গায়ে, চটপটে সপ্রতিভ স্বাস্থ্যবান রুদ্র বাংলোর বারান্দার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। পাহাড়ের পটভূমিতে সেই শেষ বেলায় কি যে দেখেছিল জানে না চৈতি, কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারেনি। শুধু ওর হৃদয়টি একটি ঝিনুক—ঝিঁঝির মতো ঝুমুর ঝুমুর করে বেজেছিল।

তারপর যা হবার তাই হয়েছিল। ইম্ফলে বেড়াতে আসা কলকাতার মেয়ে এই মোরের বাংলোয় মরতে চেয়েছিল। মরে গেছিল। তাকে কেউ বাঁচাতে পারেনি।

এখন সূর্য ডুবে গেছে। সেপ্টেম্বর মাস। সারাদিন নীল আকাশে সোনালী রোদ সাঁতার কেটে কেটে বিকেলে হাঁফিয়ে বেড়ায়। ঝুর-ঝুর করে হিজনে পাতায় দোল দিয়ে হাওয়া বয়। গেটের কাছের আমলকি গাছটা সারাদিন ঝুরঝুর করে পাতা ঝরায়। শেষ বিকেলে দাঁড়কাকটা চ্যাগারের উপর বসে বসে শুদ্ধ "খা"-তে কা-কা-কা-কা করে গান গায়। মণিপুরি মেয়েরা খোলের তালে তালে বাড়ির উঠোনে উঠোনে "পুং-চোলোম" কিংবা "থৈবী-খাম্বার" নাচ নাচে। ওদের গানের সুর দেখতে দেখতে কার্তিক মাসের কুয়াশার মতো সন্ধ্যের পর সমস্ত মোরের আকাশ বাতাস ভরে তোলে। সুরের সুরেলা চাঁদোয়ার মতো মোরের আকাশে ওদের গান আর খোলের শব্দ ভেসে বেড়ায়। দুলতে থাকে।

বেশ লাগে। ময়দা মাখতে মাখতে কি প্রেসার কুকারে মাংস চড়িয়ে বসে বসে চৈতি ওর কলকাতার জীবনের কথা ভুলে যায় ভুলে যায় যে, ইচ্ছে করলে ও-ও আজকে বালিগঞ্জ পাড়ায় কোনো এক্সিক্যুটিভের স্ত্রী হতে পারত, এই সময় আলোঝলমল রাসবিহারী অ্যাভিন্যুতে ছোকরা চাকরকে সঙ্গে নিয়ে স্লিভ-লেস ব্লাউজ পরে শপিং-এ বেরোতে পারত।

এখন ওর মনে হয়, ও যেন বরাবর এই মোরেতেই ছিল, মোরেতেই ও বড় হয়েছে; মোরেতেই ওর মরণ হবে।

এমন সময় ঝড়ের বেগে রুদ্র ঘরে ঢুকেই বলল, আকাশের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছিলে? খাবার দাবার কিছু আছে?

চৈতি হেসে বলে দাঁড়াও, একটু বসো ইজিচেয়ারে ; আনছি।

ও সব বসাটসার সময় নেই আমার। আমায় এক্ষুনি যেতে হবে।

কোথায় যাবে?

www.BanglaBook.org

তা দিয়ে তোমার দরকার নেই।

দরকার নেই?

না দরকার নেই। যাচ্ছি আমাদের ব্যাডমিন্টন ক্লাবে, মীটিং আছে।

চৈতি মুখ নামিয়ে বলল, বেশ।

অল্পক্ষণের মধ্যে জামা-কাপড় বদলে রুদ্র বেরিয়ে গেল। যাবার সময় বলে গেল আমার জন্যে আবার বসে থেকো না খাবার নিয়ে, প্রেম দেখাবার জন্যে।

বলেই, বেরিয়ে গেল।

চৈতি নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল, প্রেম আমার আর নেই।

চৈতি জানে, রুদ্র কোথায় গেল এখন।

প্যালেলের রাস্তায় কিছুদূর গিয়ে ডান দিকে জঙ্গলের মধ্যে একটি সুঁড়িখানা আছে। ওর মণিপুরী ঠিকে ঝিয়ের কাছে সব শুনেছে চৈতী। বাঁশের বেড়া-দেওয়া ঘর। মোষের শিং-এর মতো বিনুনী বাঁধা মোটাসোটা খাসীয়া মেয়ে আছে ওখানে দুটি। তাদের দেখতেও নাকি মোষের মতো। তাছাড়া বর্মী মেয়েও আছে একটি। রুদ্ররা সেখানে যায়। সস্তায় দেশী মদ খায়। মেয়েগুলোর সঙ্গে কী করে না-করে জানে না চৈতি। ভাবতেও পারে না। ভাবলেও ওর গা বমি-বমি করে।

এই জঙ্গলে এসে বোধহয় হেরে গেছে চৈতি। যে জঙ্গল পাহাড়কে ভালোবেসে ও এখানে একদিন এসেছিলো সেই জঙ্গল পাহাড়ই ওকে হারিয়ে দিয়েছে। ওর ঘরের মানুষকে ও বেঁধে রাখতে পারেনি। রুদ্রকে নতুন কিছু দেবার মতো কিছু আর বাকি নেই চৈতির। ও নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছে। ওরা যদি দুজনে মিলে একটি হাসি-খুশি গাবলু-গুবলু ঝুমঝুমি বানাতো, তবে হয়তো এমন হত না। তবে হয়ত এমনি সব সন্ধ্যেবেলায় ওরা বসে বসে সেই ঝুমঝুমি বাজাতো। তাকে নাড়তো চাড়তো। তার কথা বলা, তার চোখ-চাওয়া নিয়ে আলোচনা করত। কিন্তু একা একা তো চৈতি কিছুই করতে পারে না। একলা একলা তো কেউ খেলনা গড়তে পারে না। মাঝে মাঝে ও মনস্থির করে ফেলে। ভাবে পরদিনই ভোরের বাসে ফিরে চলে যাবে ইম্ফল। সেখান থেকে কলকাতা। যাবে না তো কি? এখনো কি সেই শরৎচন্দ্রের যুগে আছে? না কি ও কাঁদতে বসবে? কান্নাকাটি নয়। ঝগড়াঝাঁটিও নয়। সোজা বেরিয়ে যাওয়া। এক বস্ত্রে, বাড়ি থেকে।

কিন্তু পারলো কই। ভাবলো তো কতদিন। যখনই ভোরবেলা ঘুম ভেঙেছে, দেখেছে অসহায়ের মতো রুদ্র পাশে শুয়ে আছে। তার কোমরের উপর দিয়ে ডান হাতটি মেলে দিয়েছে। রুদ্রের লজ্জা নেই, ভয় নেই, গ্লানি নেই। তবু, রুদ্রর হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চৈতি উঠে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়াতেই ভোরের মিষ্টি হাওয়া গায়ে লেগেছে। সকালের শুকতারাটি স্নিগ্ধ নীলাভ দ্যুতিতে রঙ্গনের ডালে চুলবুল করে উঠেছে। ও সব ভুলে গেছে। শুধু মনে হয়েছে, রুদ্র এখুনি বেরিয়ে যাবে কাজে, বেচারা কত মাইল পথ পায়ে হেঁটে, হাতীর পিঠে যাবে কে জানে? সব রাগ ভুলে গিয়ে তাড়াতাড়ি চায়ের জল বসাতে গেছে চৈতি।

কিন্তু আর নয়। আজ ও সত্যি সত্যিই প্রতিজ্ঞা করে ফেলল। আর নয়। লজ্জাহীনেরও লজ্জা আছে। সেই লজ্জার সীমাও তার পেরুনো হয়ে গেছে। আজ একটা হেস্তনেস্ত করবে সে। হেস্তনেস্ত মানে চেঁচামেচি নয়। কাল ভোরের প্রথম বাসেই চলে যাওয়া। কোনো বন্ধন নেই চৈতির। রুদ্রর সঙ্গে। একদিন মা-বাবার সঙ্গে যেমন ঝগড়া করে রুদ্রর হাত ধরে চলে এসেছিল এই পাহাড়-জঙ্গলে, আজ আবার রুদ্রর সঙ্গে ঝগড়া করে মা-বাবার কাছেই ফিরে যাবে। মা-বাবার কাছে আবার লজ্জা কি?

www.BanglaBook.org

কিন্তু সত্যিই কি লজ্জা নেই? মাকে সে কি করে বলবে যে, যাকে ভালোবেসে সে মা-বাবাকে দুঃখ দিয়ে এই বার্মাসীমান্তে এসে, অতি দীন জীবন যাপন করছে সেই রুদ্রই তাদের সুগন্ধি চৈতিকে সাঁঝবেলাতে একা ঘরে রেখে, মোষের মতো চেহারার দুটি পাহাড়ী মেয়ের সঙ্গে সময় কাটাতে যায়। এ কথা কি করে কোন মুখে সে বলবে? না না। তার চেয়ে ইম্ফলে গিয়ে লকটাক লেকে ডুবে মরবে। নইলে, মোরে ডাক বাংলো থেকে নীচের পীচের রাস্তায় ঝাঁপ দেবে। যাই করুক, কাল সকালে ও কিছু একটা করবেই।

রাত কত হয়ে গেছে জানে না চৈতি। বাইরের ফিকে জ্যোৎস্নাও ওর মতো খেলনাহীন একাকীত্বে বেদনাতুর, স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। প্রহরে প্রহরে শেয়াল ডাকছে। আর নিঝুম নদীর পাশে পাশে, মাঝে মাঝে একটি হায়না হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে ওর ব্যথার বুক কাঁপিয়েছে। ছেলেদের মেসের কমোন-পেট ভালুকের বাচ্চাটি মাঝে মাঝে কুঁক কুঁক কুঁক করে উঠছে। ওর বোধহয় ভয় করছে কিংবা জ্বর আসছে। চৈতিরই মতো।

চেয়ারে বসে বসেই চৈতি ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঝিঝিগুলো ঝিঁঝির ঝিঁঝির করে বাইরে বসে ওকে পাহারা দিচ্ছিল। এমন সময় দরজায় হঠাৎ ধাক্কা শুনে চৈতির ঘুম ভেঙে গেলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে দরজার পাশের খোলা জানালা দিয়ে টর্চের তীব্র এক ঝলক আলো ওর মুখে এসে পড়ল।

ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চৈতি ভীষণ ভয় পেল। অত ভয় ও এখানে এসে এর আগে কোনোদিন পায়নি। চৈতি কথা বলতে পারল না।

এমন সময় রুদ্র জড়ানো জড়ানো গলায় বলল, 'দরজা খোলো'।

ও দরজা খুলেই রুদ্রর বুকে আছড়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। প্রথমে ও যে ডাকাতের হাতে পড়েনি এই ভেবে চৈতির আনন্দ হয়েছিল। পরক্ষণেই ও যে ডাকাতের হাতেই পড়েছে, এইটে জেনেই ওর কান্না পেয়ে গেল। ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল রুদ্রর বুকে মুখ রেখে। রুদ্র ওকে সবল হাতে ধরে ওর সামনে দাঁড় করাল তারপর টর্চের আলোটা আবার চৈতির মুখের সামনে ধরল। রুদ্র দেখল চৈতির দু-চোখে জল, এবং গাল বেয়ে ধারা নেমেছে। টর্চটা খাটে ছুঁড়ে ফেলে রুদ্র চৈতিকে এমন জোরে জড়িয়ে ধরল যে চৈতির মনে হল ওকে আজ রুদ্র গুঁড়িয়ে ফেলবে। ফুরিয়ে যাওয়া একটি দেশলাইয়ের বাক্সর মতো ওকে আজকে ভেঙে ফেলবে। চৈতির সবকটি আগুন জ্বালানো কাঠ-ই বুঝি শেষ হয়ে গেছে। ও ফাঁকা। ফাঁকা দেশলাই।

কি করছ? লাগছে যে। তার চেয়ে আমাকে একেবারে মেরে ফেল।

রুদ্র তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দিয়ে বলল, খেতে দাও। ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে।

আশ্চর্য! তবু সে কাঁপা কাঁপা হাতে রুদ্রর জন্যে খাবার বাড়ল। এবং খেতে বসার জায়গা করে দিল। রুদ্র হাত মুখ ধুয়ে এসে খেতে বসে বলল, তোমার?

আমি খাব না।

তোমার ঘাড় খাবে।

ভদ্রভাবে কথা বল।

কথা যে ভাবেই বলি না কেন, তোমায় খেতে হবে।

অর্ডার?

হ্যাঁ অর্ডার।

বলে রুদ্র জোর করে চৈতিকে পাশে টেনে বসালো। নিজে হাতে এক গরাস ভাত মাংসের ঝোল দিয়ে মেখে, চৈতির মুখে তুলে দিয়ে বলল, খাও।

www.BanglaBook.org

কথা না-বলে ও লক্ষ্মী মেয়ের মতো নিঃশব্দে খেতে লাগল। তখনো ওর চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছে। রুদ্রর মনে কি হল যে, সেই জানে, রুদ্র জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, তুমি আমার উপর রাগ করেছ?

চৈতি বলল, আমি কি তোমার উপর রাগ করতে পারি? আমি তো তোমার খেলনা ছাড়া আর কিছুই নই। আমাকে কি তুমি মানুষ বলে মনে করো?

রুদ্র খাওয়া থামিয়ে চৈতির মুখের দিকে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর চোখ বড় বড় করে বলল, অ্যাই শোনো!

চৈতি ভাতমুখেই বলল, কি?

রুদ্র বলল, বলছি, আগে মুখের ভাত খেয়ে নাও।

চৈতি তাড়াতাড়ি ভাত গিলে ফেলে বলল, কি?

রুদ্র এঁটোমুখে ওর জল-ভেজা গালে একটি সশব্দ অভদ্র চুমু খেয়ে বলল, আমরা না, আজকে খেলনা গড়ব।

চৈতির ভেজা চোখে আগুন জ্বলে উঠল। ও বলল, মিথ্যুক।

রুদ্র বলল, সত্যি। মিথ্যা কথা না। সত্যি।

কাঁদতে কাঁদতে চৈতি ফিক করে হেসে উঠল, বলল, আমি বিশ্বাস করি না।

প্রত্যয়-ভরা গলায় রুদ্র বলল, বিশ্বাস কর না? আচ্ছা তাড়াতাড়ি খাও।

কিন্তু আর খেতে পারল না। থরথর করে ওর সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। ও ভাবতে পারছিলো না যে, ওরা দুজনে সত্যিই খেলনা গড়বে। ওদের দুজনের খেলনা।

ও বলল, তুমি আমার ভাগেরটাও খাও।

বলেই মাংসর বাটিটা উপুড় করে রুদ্রর পাতে ঢেলে দিল।

রুদ্র বলল, এখনো খেলনার শখ গেল না খুকী। তুমি একটি কচি খুকী।

রুদ্রর রুক্ষ চোখে ওর পেলব চোখ মেলে চৈতি বলল, তুমি ভীষণ অসভ্য।

বলেই খাবার জায়গা ছেড়ে উঠে গিয়ে হাত ধুয়ে, আনন্দিত অস্থিরতায় বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাত দিয়ে একটি বেচারী বালিশকে আশ্লেষে আঁকড়ে শুয়ে পড়ল।

রুদ্র খাওয়া শেষ করে উঠে লণ্ঠনের শিখাটি কমিয়ে দিয়ে খাটে বসে একটি সিগারেট ধরাল। ফসস করে দেশলাইটি জ্বালতেই হলুদ-লালে মেশা আগুনের অসংখ্য আঙুলগুলি দেওয়ালে দেওয়ালে কথাকলি নেচে গেল।

চৈতি মুখ ফিরিয়ে সেই আগুনের দিকে চাইল। ওর চমকিত চাতক মনের চোখের সামনে সারে সারে শত শত লাল নীল দেশলাই এর দেওয়ালী দারুণ দম্ভে দপদপিয়ে উঠল।

চৈতির মাথার মধ্যে ছোটবেলার মিষ্টি ভাবনাগুলি ঝিনুক ঝিঁঝির ঝুনঝুনির মতো কোনো অদৃশ্য সেতারীর ঝালায় ঝরতে লাগল। ললিপপ; লালনীল দেশলাই, খেলনা, শিউলিফুলের গন্ধ, মা-র চোখের চাউনি; সব একে একে সারে সারে, ওর মাথায় ভীড় করে এল। চৈতির মনে হলো, এই শারদ রাতে শুয়ে শুয়ে ও কোনো স্নিগ্ধ সুগন্ধি স্বপ্ন দেখছে।

রুদ্র হ্যারিকেনটা নিবিয়ে দিল।

একদল নরম তুলতুলে সাদা বেড়ালের মতো শরতের জ্যোৎস্না আমলকি গাছের ডাল বেয়ে জানলা গলে ঝুপঝুপিয়ে খাটে এসে নামলো। টিনের চালে চৈতি শিশির পড়ার শব্দ শুনতে পেল। টুপ, টুপ, টুপ।

পাশে শুয়ে রুদ্র কি যেন বলতে যাচ্ছিল।

ওর ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে চৈতি ফিস ফিস করে বলল, চুপ; চুপ।

www.BanglaBook.org

ফটকে

ফটকে সারারাত আলা পাহারা দিয়েছিল। এই আলায়, এই ভেড়িতে, মাঝে মাঝেই সড়কি, পাইপগান নিয়ে মাছ চুরি করতে আসে কারা যেন।

একটা বুড়ো কাঁক কচুরিপানার নালার পাশে নলবনের গভীরে এই সাতসকালে কি করতে যেন নেমেছিল ফটকেকে আসতে দেখেই সে সপ সপ করে হাওয়া কেটে বড় বড় ডানা মেলে ঘোষেদের আলার দিকে উড়ে গেল।

লম্বা গলা কাঁকটা যেখানে বসেছিল তার পাশেই আলার লোকেদের পুঁতে-রাখা বাঁশের উপরে একটা পুরনো পানকৌড়ি চুপ করে বসেছিল পুবে পিঠ দিয়ে। যাতে রোদ পোয়াতে পারে। চোখটা বন্ধ করে বসেছিল ও। ফটকের পায়ের আওয়াজে একবার কষ্ট করে চোখ মেলল। মেলেই আবার চোখ বন্ধ করে ফেলল। ফটকেকে ও বিলক্ষণ চেনে, ফটকের রাহান-সাহান, খাল-খরিয়ৎ সব ওর জানা। তাই তার বংশারূঢ় আসনের বেশ কাছে ফটকের উপস্থিতি সত্ত্বেও কোনোরকম উত্তেজনা না দেখিয়ে ও চুপ করে বসে রইল। ও জানে যে ফটকে ওর কোনো ক্ষতি করবে না।

আলার ঘরের পাশে, একটা বাতাবিলেবুর গাছের নীচে নরম ঝুরঝুরে মাটিতে, পুব দিকে মুখ করে ফটকে শুয়ে পড়ল সামনের পা দুটো বুকের নিচে গুটিয়ে। লেজটা পাকিয়ে।

কাল রাতে বড় শীত ছিল। আবাদের উপর দিয়ে যেন উত্তুরে হাওয়ার ঝড় বয়ে গেছে। আলার লোকেরা সকলেই দক্ষিণের। তাই বোধহয় উত্তুরে হাওয়ার সঙ্গে এদের কারোই বনিবনা নেই।

ফটকে নিজে কোথাকার তা নিয়ে ফটকে কখনও মাথা ঘামায়নি। ফটকে এখানের, এই মাটির এই জলের। ফটকের বলবার মতো কোনো জন্মবৃত্তান্ত নেই। বাবুদের আলার মদ্দা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কুকুরের সঙ্গে ঘোষেদের আলার ছিপছিপে ছাই-রঙা মাদী কুকুরের দেখা হয়ে গেছিল এক কার্তিক মাসের সুন-সান দুপুরে, মাছ-পাহারা দেওয়া ঘরের নীচে। তারপর ফটকের আবির্ভাব। এই ভেড়ি আর আবাদ, এই আলা, এই হোগলা, নল, কচুরিপানা, এই ঢোঁড়া সাপ, পানকৌড়ি, কামপাখির গায়ের গন্ধ তাই মাখামাখি হয়ে আছে ফটকের গায়ে। মাঝে মাঝে ফটকের মন হয়, ওর গায়ে লোম না থেকে আঁশ থাকা উচিত ছিল, তাহলে ও জলের তলায় গিয়ে ফাৎনা নেড়ে নেড়ে, পানায় গুঁতো মেরে মেরে, ঠুকরে খেয়ে বেঁচে থাকত নিজের স্বাধীনতায়।

কিন্তু ফটকেকে এ-জন্মে নিজের খাবারের জন্য চিরদিনই পরের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। পরের এঁটো খেয়েই সে বড় হয়ে উঠেছে; যতদিন বেঁচে থাকবে, খেতে হবে। মাঝে মাঝে ফটকের বড় খারাপ লাগে। বুকের মধ্যেটা যেন কেমন কেমন করে। কিন্তু ফটকে কি করবে? ফটকে কি করতে পারে? যখন ওর বুকে এমনি কষ্ট হয় তখন সামনের দু পা লম্বা করে দিয়ে তার উপর মুখ নামিয়ে সে নিজে শুয়ে থাকে বাবুদের ঘরের বারান্দায়। মাঝে মাঝে তার বুক থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরোয়—ফটকে সেই শ্বাসকে বুকের মধ্যেই রাখতে চায়, কিন্তু বাঁধ-ভাঙা নোনা জলের মতো সে শ্বাস বেরিয়ে আসে। নাকের সামনে থেকে একটু ধুলো উড়ে যায়, শুধু দুটো মাছি উড়ে যায়; এছাড়া ফটকের দীর্ঘশ্বাসে আর কারও কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না।

কাম পাখিগুলো কচুরিপানার গালের মধ্যে কাঁকড়া-কাঁকড়ি করছে। কঁকা-কঁক-কঁকা আওয়াজ এই সকালের জলের উপরে যে একটা আশ্চর্য ঠাণ্ডা শান্তি থাকে, তাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। একটা সাপ উল্টোদিকের নল ঝোপ থেকে বেরিয়ে জলের উপর দিয়ে সোজা সাঁতরে আসছে এ পাড়ের দিকে। সাপটা জল কেউটে—সাপটার পুরো শরীরটাই প্রায় জলের উপর ভেসে আছে। গায়ের সাদা বুটি দেখা যাচ্ছে, সাপের মাথাটা নিস্তরঙ্গ আয়নার মতো জলের ক্যানভাসকে ছুরির ফলার মতো কেটে দু ভাগ করে দিচ্ছে। জলের মধ্যে একটা মস্ত বড় ত্রিকোণ জেগে উঠছে ক্ষুদে ঢেউয়ের। আর সেই ত্রিকোণের সামনে তীরের ফলার মতো সাপের মুখটা এগিয়ে আসছে।

ফটকে চোখ মেলে একবার দেখল, তারপর সূর্যকে মনে মনে গালাগাল করল এখনও ওঠেনি বলে।

আলার বাবুদের যে রান্নাবান্না করে সে লোকটা হাঁসের ঘর খুলে দিল। হাঁসগুলো মোটা গোলগাল কোমর দুলিয়ে প্যাঁক-প্যাঁক করতে করতে জলের দিকে দৌড়ে চলল, কমলা ঠোঁট, আর কমলা-রঙা পা ফেলে। চারটে বাচ্চা দিয়েছে হাঁসিরা। গোলগাল তুলতুলে উলের বলের মতো হলুদ আর নরম। ফটকের মাঝে মাঝে ভারী লোভ হয় যে, গোটা দুই বাচ্চা এক ঝটকায় ধরে মুখে করে নিয়ে গিয়ে ভরা দুকুরে হোগলার ছায়ায় বসে খায়। কিন্তু সাহস হয় না ফটকের। সারাদিন না-খেয়ে থাকলেও সাহস হয় না। কারণ ঘরের মধ্যে বেত আছে, লাঠি আছে, সড়কি আছে। হাঁসের বাচ্চা খাওয়ার যে আনন্দ তার সবটাই মাটি হবে। বলা যায় না, বাবুরা শুনতে পেলে হয়ত তাকে গাড়ির পেছনে করে নিয়ে কোন-না-কোন ভিন দেশে ছেড়ে দেবে। এখানে তবু তো ফটকে বেঁচে আছে। সেখানে গেলে হয়ত মরেই যাবে।

শুয়ে শুয়ে ফটকে ভাবছিল যে, কয়েক বছর আগে এখানে কি সব হয়েছিল। অনেক লোক একসঙ্গে এসে বাবুদের ঘর পুড়িয়ে দিয়েছিল, বাগানের সব ফুল ছিঁড়ে ফেলেছিল,

www.BanglaBook.org

গরুগুলো খুলে নিয়ে গিয়েছিল। নিয়ে গেছিল নৌকাগুলো, ভেড়ীর সব মাছ ধরে ফেলে ছিল দু'তিন দিনের মধ্যে। অত মাছ কেউ খেতে পারেনি, অত অল্প সময়ের মধ্যে কোথাওই বিক্রি হয়নি। মাছের পাহাড় পচে গিয়েছিল চতুর্দিকে। চিলেরা খুব খেয়েছিল, ফটকেও খুব খেয়েছিল দু-দিনে। ফটকের গায়ে তখন মাছের গন্ধ হয়ে গেছিল। মাইলের পর মাইল জুড়ে পচা মাছের গন্ধ ভেসেছিল হাওয়ায়। ফটকের খুব মনে পড়ে সে সময়ের কথা।

ফটকের তখন মনে হয়েছিল যে, এ লোকগুলো ভালো। এরা ফটকের বাবুদের মতো না। ফটকেকে অনেক খাইয়েছিল লোকগুলো দু-দিন। কিন্তু দু-দিন পরই লোকগুলো বাবুদের মতো হয়ে গেছিল। সব ভালোবাসা উবে গেছিল। ফটকে কাছে গেলেই ক্যাঁক করে লাথি মারতো তারা। তাদের খাওয়ার সময় কাছে ঘুরঘুর করলেই জুতো ছুঁড়ে মারতো। ফটকের তখন খুব মনে হয়েছিল, ঐ বাদার আগের বাবুরা আর পরের বাবুরা সকলেই সমান। ঐ ঘরে এলেই, ঐ তক্তপোশে বসলেই; সবাই একরকম হয়ে যায়। ফটকের কথা বা ফটকেদের কথা এই বাবুরা কি ঐ বাবুরা কেউই ভাবে না, ভাবেনি কোনোদিন; হয়ত ভাববেও না।

সূর্যটা এখনও ওঠেনি। ফটকের পেটে বড় ক্ষিদে, ফটকের গায়ে বড় শীত। কখন বাবুদের সকালের জলখাবার রুটি আর তরকারী তৈরি হবে, ফটকে জানে না।

বাবুদের খাওয়া হয়ে গেলে আধখানা রুটি পাবে ফটকে।

ফটকে সূর্যের ভরসায়, বাবুদের দয়ার ভরসায় বেঁচে আছে। এই শীতের মধ্যে, আলোর মধ্যে, এই অন্ধকার জলার মধ্যে।

ফটকে কি বেঁচে আছে?

ফটকে ভাবে।

পুবের দিকে মুখ করে চুপ করে শুয়ে, নাকে বাদার গন্ধ পায় ফটকে, ওর নেতিয়ে-পড়া কানে কাম পাখির কোঁকানি শোনে: আর ভাবে, ফটকে ভাবে; সূর্য কি উঠবে?

সূর্য কি সত্যিই উঠবে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চরিত-খেকো অ্যান্ড কোম্পানি

টেবিলের উপরে কাচের পেপারওয়েটটা শব্দ করে রেখে হীরেন বলল, আর কী হবে। একেই বলে, ঘোর কলি।

সোমেশ বলল, যা বলেছিস। ঠাকমা কালই রাতে চণ্ডীমঙ্গল পড়ছিল শুয়ে-শুয়ে। কলিযুগের কী বর্ণনা রে! যেন কলকাতারই বিজ্ঞাপন।

কী রকম? বল না শুনি।

নেপেন শুধোলো।

হীরেন, সুর করে আবৃত্তি করল

"মহাঘোর কলিকাল নীচ হব মহীপাল
    সর্বভোগ নীচের সাধন
সঙ্গদোষে পাবে দুঃখ লোক ধর্মে পরাঙ্মুখ
    কলিযুগে বেদের নিন্দন।
অন্ধ আদি যত জন রাজধর্মে পরায়ণ
    সন্তায় ছাড়িব সর্বজন
কৃতঘ্ন হইবে নর পরপীড়া নিরন্তর
    বেদনিন্দা করিব ব্রাহ্মণ।"

BanglaBook.org

আরো অনেকখানি আছে।

বলেই, হীরেন থেমে গেলো।

নেপেন বলল, কৃতঘ্ন মানে কি রে?

অকৃতজ্ঞ আর কী। আরও স্ট্রংগার টার্ম।

তাই বল। একেবারে কারেক্ট বর্ণনা। এই সময়ের। এই দেশের। কলকাতার।

www.BanglaBook.org

গজানন সোন্থালিয়া শেয়ার মার্কেটের খবর পড়ছিল মনোযোগ দিয়ে একটা দেশলাই কাঠি দিয়ে কান খুঁচোতে খুঁচোতে। কাগজটা নামিয়ে রেখে বলল, সন্ত তুলসীদাসের রামচরিতমানসেও কিছু কলি-বর্ণনা আছে। কী বলব তোমাদের। বর্ণে বর্ণে মিলে যায় আজকের অবস্থার সঙ্গে।

বুঝতেই পারি। নইলে তুমি শালা হয়েছ আমাদের ফিনানসিয়র। সিনিয়র পার্টনার! পৈতৃক বাড়িতে আপিসটা করেছি, কোনদিন বাড়িটা পর্যন্ত হাতিয়ে নেবে। পুরো কলকাতা শহরটাই তো তুমি আর তোমার ভাই-ভাতিজা মিলে হাতিয়ে নিয়েছ। কলি যে ঘোর, তাতে আর সন্দেহ কি?

সোমেশ বলল।

গজানন কখনও রাগে না। পয়সা রোজগার করতে অনেকই গুণ লাগে। ওকে যাই বলা হোক যত কিছু কটুকাটব্যই করা হোক ও শুধুই হাসে। আর সেই হাসি দেখে সোমেশের বুক কাঁপে। মীরজাফরের হাসি।

নেপেন বলল, তা চণ্ডীমঙ্গল না কি তা তো শোনা গেল। এবার গজানন তোমার সন্ত তুলসীদাসও শুনি একটু।

বলেই হীরেনের দিকে ফিরে বললো চণ্ডীমঙ্গল কার লেখা রে? মা চণ্ডীর?

হীরেন দুঃখমিশ্রিত আক্ষেপের সঙ্গে হেসে ফেলল নেপেনের কথা শুনে।

বলল, যাঃ শালা! ভাল পার্টনারের সঙ্গেই বিজনেস করছি যা হোক। হাঁদা রে। কবিকঙ্কন মুকুন্দর লেখা। সে কি আজকের?

চণ্ডীমঙ্গল কে নেদেছে তা জেনে তো পয়সা রোজগার হয় না। তোর জ্ঞান তোর কাছে রাখ।

একটুও লজ্জিত না হয়ে ক্যাঁট ক্যাঁট করে বললো নেপেন।

মন মেজাজ ভালো নেই। দিশি ডিটেকটিভ কোম্পানিকে লাটে তুলে এখন নতুন কী যে ধান্দা করা যায় তাই ঠিক কর। তোদের এই ফালতু কথাবার্তা আর ভাল লাগছে না।

সোমেশ বিরক্তি ও চিন্তার গলায় বলল।

হীরেন বলল, সেই গিলিগান ডিটেকটিভ এজেন্সি যখন ডিজলভ করা হয়েই গেছে, ডিসিশান নিয়ে ফেলাই হয়েছে, ও নিয়ে আর আলোচনা না করাই ভালো। তাছাড়া দিনকালও খারাপ। দেখলি তো কোম্পানি চালিয়ে। দুসস। আরে, সি. আই. এ., কে. জি. বি. রাও ডাবল-এজেন্ট আর কাউন্টার এসপায়োনেজ-এর জন্যে লাটে উঠতে বসেছে, আর আমাদের এজেন্সি! তাছাড়া বড় বড় কোম্পানিদের তো নিজেদেরই ডিপার্টমেন্ট থাকে। তাদের দরকারই বা কি আমাদের হেল্প নেবার?

নেপেন বলল, হ্যাপার কথা না বলাই ভাল। দেখলি না! মিসেস সেন আমাদের লাগাল মিস্টার সেন তার সেক্রেটারির সঙ্গে প্রেম করছে কিনা তা দেখার জন্যে আর মিস্টার সেন অন্য কোম্পানিকে লাগিয়ে দিল আমাদেরই পেছনে। এমনই ব্যবসা যে, শালা সামনেই এগোব না নিজের পেছন সামলাব তাই ঠিক করতেই লবেদম। যা হয়েছে ভালই হয়েছে! আজই ডিসকাশন করে নতুন লাইনের ব্যাপারটা ফয়সালা করে ফেলতে হবে।

সোমেশ বলল, গজাননকে; শুভ কাজে নামার আগে তোমার ঐ সন্ত তুলসীদাস বাবাজী কলিযুগ সম্বন্ধে কী বলেন তা একটু শুনিয়ে দাও তো দেখি। তা থেকেই নতুন ব্যবসার কোন আইডিয়া মাথায় এসে যেতে পারে হয়তো! কে বলতে পারে?

www.BanglaBook.org

গজানন সোন্থালিয়া দু হাত কপালে ঠেকিয়ে সন্ত তুলসীদাসের উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম করল।

নেপেন বললো, অতি-ভক্তি চোরের লক্ষণ।

গজানন শুরু করল

"মারগ সোই কহঁ জোই ভারা পণ্ডিত স্যেই জো গাল বজারা
মিথ্যারম্ভ দম্ভ রত জোঙ্গি তা কহঁ সন্ত কহই সব কোঙ্গি।"

দুসস শালা। কী ভাষারে এ! এর চেয়ে তো চাইনিজ বোঝা সোজা! মানেটা কী?

মানে হলো, যার যা ভালো লাগে তাই তার পথ। মানে বিবেক টিবেক কিছু নেই। কলিকালে তাকেই পণ্ডিত বলবে সকলে, যে অহঙ্কারী। যে মিথ্যাচারী আর ভণ্ড তাকেই সকলে ভালো লোক বলবে। বলবে আহা। অমন লোক হয় না!

বাঃ। ঠিক। বিবেক একটি হারামজাদা। সে হারামজাদাকে গলা টিপে না মারতে পারলে আজকাল অর্থ, মান, যশ কিছুই পাবার উপায় নেই।

হক কথা। নইলে কলি কী। আরও শোনাও গজানন।

"সোই সয়ান জো পরধন হারী জো কর দম্ভ সো বড় আচারী।
জো কহ ঝুঁঠ মসখরী জানা কলিযুগ সোখ গুনবন্ত বাখানা।"

আরে, মানেটা বলো না পার্টনার। তোমার শ্রাদ্ধর মন্ত্র কে শুনতে চায়?

মানে হলো, এই যুগে তাকেই বুদ্ধিমান বলে যে, পরের ধন চুরি করে। অর্থাৎ চোরেদেরই বাজার এখন। যে এখন যত বড় ভণ্ড সে তত বড় নিষ্ঠাবান। যে মিথ্যাবাদী এবং ফিচেল সেই কলিযুগে দারুণ গুণবান বলে পরিচিত। আরও অনেক আছে।

অনেক দরকার নেই। আর একটা শোনাও। জাস্ট একটা।

"জে অপকারী চার, তিহ্ন কর গৌরব মান্য তেই।
মন ক্রম বচন লবার, তেই বকতা কলিকাল মহঁ॥"

অর্থাৎ যারাই এখন পরের অপকার করে তাদেরই রবরবা, গৌরব। তারাই এখন মান্য-গণ্য কেউ-কেটা। মনে, কথাতে এবং কাজেও যারা মিথ্যাবাদী তাদেরই কলিযুগে বক্তা বলে মানে সকলে।

নেপেন বলল, আমাদের জন্যে আইডিয়াল কন্ডিশান মাইরি। এই বেলা টু-পাইস কামিয়ে নেওয়ার ধান্দা ঠিক করে ফ্যাল।

তারপর বলল, গজানন ভাই, তোমার ব্রেনের তুলনা নাই। সর্ষের তেলে শেয়ালকাঁটা থেকে মাখনে কচুবাটা এসব তো তোমারই মাথা থেকে বেরিয়েছিল একদিন।

কেন? চারভাগ তিসির তেলের সঙ্গে একভাগ ইটালিয়ান অলিভ অয়েল মিশিয়ে "হুইলে ডি অলিভ" করে বেচে গঙ্গা চাটুজ্যের ব্যবসাটা কিনে নিল না? আমাদেরও অবশ্য টু-পাইস হয়েছিল। মিথ্যে বলব না। তবে ব্রেন তো গজাননেরই! তোমার ঝুনঝুনুর ঘিয়ে কি আছে বাওয়া? বুদ্ধি যা বেরোয় এক একখানা!

নেপেন বলল।

এবার একটা বুদ্ধি নিকলাও ইয়ার। এই সামারে ওয়াইফকে নিয়ে আমেরিকা যেতে

www.BanglaBook.org

হবে। বড় শালী চিঠি লিখে লিখে লাইফ হেল করে দিল। মাল চাই। কুইক মাল। আজকাল বাগবাজারে একজন লোকও বের করা মুশকিল বোধহয় যে আমেরিকা যায়নি। সবাই এতো বড়লোক হয়ে গেছে যে, বলার নয়। আমারই পেস্টিজ পাংচার একেবারে।

গজানন আবারও কিছুক্ষণ কান খোঁচাল। বলল, ডিটেকটিভ এজেন্সিটা করার ডিসিশানটা ঠিকই হয়েছিল। তবে লাইনটা বেশি কমপিটিটিভ হয়ে গেছে কিছুদিন হলো। তাছাড়া বড় গ্রুপ থাকলে তার একটা ইউনিট হিসেবে ঐ ব্যবসা চালাতে সুবিধা। একমাত্র ব্যবসা হিসেবে...

একটা কথা। বিজনেস করতে হলে ক্যাপিটাল ইনপুট বেশি। ইন্ডাস্ট্রি তো করতে চাই-ই না আমরা। কনসালটেন্সি-ফেন্সি করাই আজকাল ভাল। খাটনি নেই, ক্যাপিটাল নেই ; ফোকটাই টাকা। রডন স্কোয়ার, সল্টলেক স্টেডিয়ামের কথা সব পড়লি না কাগজে? গর্ভনমেন্টের সঙ্গে লাইন করতে পারলেই পটাপট কাজ। তারপর লাগা লুঠ। "কোম্পানিকা মাল, দরিয়ামে ডাল।"

আজকাল শুধু মিনিস্টার পাকড়ালেই হবে না। অ্যাডমিনিস্ট্রেশানও হাতে থাকা চাই। জমানা খারাপ।

এবং অপোজিশনও।

একটা ইন্ডাস্ট্রির কথা আমার মাথায় এসেছে অনেকদিন হল। এই বাজারেই ভাল চলবে প্রডাক্টটা।

গজানন বলল।

কি?

গরুর চোনার কনসেনট্রেট। কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি। বড় প্লান্টের দরকার নেই। সীড ক্যাপিটাল যদি পাঁচ লাখ দেখাই তো ব্যাংক আর ফিনান্সিয়াল অর্গানাইজেশানগুলো চারগুণ দেবে। কারখানা বলে একটা বাগান বাড়ি কোনও ব্যাকওয়ার্ড এরিয়াতে। মাঝে মধ্যে বাঈজীর গানটান শোনা যাবে। মেসিন তো কিনবই না। পাঁচ হাজার টাকার কম দামী ইউনিট কিনছি এইরকম দেখিয়ে সিধা প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টে ডেবিট করে দিয়ে পুরো ডিপ্রিসিয়েশান নিয়ে বেরিয়ে যাব। তার উপরে সেকশান এইট্টির লুঠমার ডিডাকশান। শালার গভর্নমেন্টের এদিকও মারা হবে। ওদিকও।

সেটা বাড়াবাড়ি হবে না? আজকাল ইনকামট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট খুব কড়া হয়ে গেছে। শেষে অতি লোভ করতে গিয়ে জেলে না যেতে হয়!

সোমেশ বলল।

কলকাতার তোমরাই শালা বুদ্ধু রয়ে গেলে। দিল্লি-বম্বে-ব্যাঙ্গালোরে যে ফুটুনি দেখো, ইম্পোর্টেড গাড়ির সারি, ফাইভ স্টার হোটেলে মোচ্ছব, তার অনেক পার্সেন্টই যে ব্যাংক-মারা টাকাতে আর ভুজুং-ভাজুং-এ তা কি জানো?

গজানন বলল।

কথাটা অন্যদিকে ঘুরে যাচ্ছে। প্রডাক্টটা ঠিক কী? প্রডাক্টটার প্রসপেক্ট কী?

হীরেন বলল।

তোমরা কীরকম বাঙালি জানি না! কথায়ই বলে না, "এক গামলা দুধে এক ফোঁটা চোনা"! ঝুনঝুনুর লোক কি তোমাদের বাংলাও শেখাবে?

তা তো হলো। কিন্তু মানে বুঝলাম না।

www.BanglaBook.org

এখনকার মানুষের টেনডেনসিই হচ্ছে অন্যের অপকার করা। বিশেষ করে বাঙালিদের। কিছু মনে করো না। কারো উপকার করা নয়। সন্ত তুলসীদাস-এর শ্লোক শুনলে না?

হ্যাঁ। কিন্তু এখনও বুঝলাম না। খোলসা করে বলো।

চোনা থেকে, চোনার সমস্ত গুণাগুণ, মানে দোষাদোষ ইনট্যাক্ট রেখে আমরা একটি কালার-লেস অডার-লেস লিকুইড তৈরি করব। ছোট ছোট বায়োকেমিক ওষুধের শিশিতে তা ভরে, ইয়া-বড় প্লাস্টিকের কেসিং করে দাম করব পঞ্চাশ টাকা। কস্ট পড়বে হয়তো পনেরো পয়সা।

তা তো হল। লোকে কিনবে কেন?

অন্যের কর্ম ভণ্ডুল করতে। আবার কেন? মনে করো তোমার জিজার বা স্যাড়ুভাই-এর খুব তেল বেড়েছে, খুব টাকার গরম হয়েছে, তা তার বাড়ির নেমন্তন্নে গিয়ে ডালে ফেলে দাও এক ফোঁটা। ডাল সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার মুত হয়ে যাবে। রসগোল্লা হচ্ছে কোথাও, গিয়ে ফেলে দাও এক ফোঁটা কড়াইয়ে, কেলোমোল্লা হয়ে যাবে।

কিন্তু এই প্রডাক্টের বিজ্ঞাপনই বা দেবে কি করে গজানন? এ প্রডাক্ট তো অ্যাডভার্টাইজ করতে পারবে না।

গুলি মারো তো! আজকাল যে সব অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি হয়েছে না! সব উইজার্ডস। নর্দমার জল বেচতে বলো তাও বেচে দেবে। এখন বিজনেসের আসলি কথা হচ্ছে প্যাকেজিং আর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। প্রোপাগাণ্ডা আর মলাটই সার কথা। মধ্যে যে মালই থাকুক। আরে। আমার বড় শালার বড় ছেলে ছারপোকা মারার ওষুধ বের করেছে। ছোট ছোট হোমিওপ্যাথিক ওষুধের পুঁচকে পুঁচকে শিশিতে লাল নীল সবুজ নানা রঙা ওষুধ ভরা থাকে। দাম পাঁচ টাকা। এজেন্সি টিভি-তে যা অ্যাড করল তা কি বলব? সেই পঁচিশ বছরের ছোকরা কোটিপতি হয়ে গেছে ছ'মাসে।

ছারপোকা নিশ্চয়ই মরে তাহলে। নইলে কি আর...

হ্যাঁ মরে বইকি। গজানন বলল, হেসে। ওষুধের নাম "খটমি।" হিন্দীতে ছারপোকাকে তো "খটমল" বলে। তা থেকেই "খটমি"। ওষুধের গায়ে দারুণ কাগজে ব্যবহারবিধি লেখা থাকে। "সাবধানে ছারপোকা ধরে, যত্নে মুখ হাঁ করিয়ে, এক ফোঁটা গিলিয়ে দেবেন। মৃত্যু অনিবার্য।"

হীরেন হো হো করে হেসে উঠল। গজাননের কথা শুনে। হাসল অন্যরাও।

হাসবার কি আছে? এইটাও তোমাদের বেঙ্গলি পোয়েট সুনির্মল বসুর কোনো গল্প থেকে নেয়া। এখন তো মারামারিরই দিন! কিন্তু এজেন্সি একটি ল্যাজোয়াব সুন্দর মডেলকে দিয়ে গ্রামের মাটির ঘরে ব্যাকগ্রাউন্ডে দড়ির খাটিয়ার সামনে নাচিয়ে নাচিয়ে গান গাওয়াল। দারুন সুরে। "হাই! খটমল! খটমল।

খটমি লেতে আও।
জলদি লেতে আও।
ঔর চৌপাইমে ওরওয়াক্ত
বিবিকি গোড় দাবাও।"

আহা! আর কী মিউজিক! মডেলের কী দারুণ লো-কাট ব্লাউজ। একটু একটু দেখা যাচ্ছে। খটমল-এর বাপের সাধ্য কি তারপরও বাঁচে। জাতে পুংলিঙ্গ হলে তো কথাই নেই।

www.BanglaBook.org

কই টিভি-তে ঐ অ্যাড দেখিনি। ন্যাশনাল নেটওয়ার্কে দেখায় বুঝি?

না না। শুনেছি বিহার আর উত্তরপ্রদেশে দেখায়। লোকালি এই "খটমি" নাকি ক্যান্টার করে দিয়েছে।

ঐ অ্যাড এজেন্সীর নাম কি?

নেপেন শুধোল।

"দ্যা ইমপসিবল (প্রাঃ) লিমিটেড।" এলাহাবাদের সিভিল লাইনস-এ অফিস।

হীরেন ভুরু কুঁচকে ভাবছিল।

বলল, গজানন আজ তুমি তোমার আত্মীয়স্বজনের বিজনেস এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাচিভমেন্ট নিয়েই অত্যন্ত ওভারহোয়েলমড হয়ে আছো। আমাদের নতুন ভেনচার যে কী হবে সে বিষয়ে একটুও এগোনো যাচ্ছে না।

বলেই, নেপেন আর সোমেশের দিকে চেয়ে বলল, তোরাও কিছু সাজেস্ট কর। ব্যবসাটা তো গজাননের একারই নয়! ওর ওপরেই যদি সব দায়িত্ব চাপিয়ে বসে থাকিস তবে আমরা কী করব? টাকার সিংহভাগ দেবে ও, ব্যাঙ্ক লোন যোগাড় করবে ও; গভর্নমেন্ট লেভেল-এ সকলকে ম্যানেজ করবেও ও তো আমরা করবটা কী? ঘণ্টা?

সোমেশ রেগে বলল ছাড় তো। যেন এমনি এমনিই করে! ওর তিন নম্বর রোজগারও তেমন কত তা কি তুই জানিস?

তিন নম্বর?

গজানন অবাক গলায় প্রতিবাদ করে উঠল।

ইয়েস। তিন নম্বর।

মানে?

দু নম্বরের একটা পার্ট ও মারে না? দু নম্বর মারলে তা কত নম্বর হয়? হয় না তিন নম্বর?

গজানন বললো সাব্বাশ সোমেশ। একেই বলে বাঙালির ব্রেইন। তা লাইন একটা বাতলাও না নতুন। ব্রেইনের তারিফ করব আরো।

সোমেশ বলল, তোমার ঐ গরুর চোনার কনসেনট্রেট ব্যাপারটা আমাকে অ্যাপীল করছে না। অন্য কিছু বলো।

আমি ভাবছি। তোমরাও ভাবো। তবে আমি তোমাদের সঙ্গে একমত। বিজনেস বা ইন্ডাস্ট্রির চেয়ে কনসালটেন্সি লাইনই ভালো। আজকাল ঐ সবেরই দিন। কম্প্যুটার টেকনোলজি, ইনভেস্টমেন্ট এজেন্সি, ল্যান্ড বিল্ডিং-এর কনসালট্যান্সি। ছিমছাম অফিস করব। কুড়ি জনের কম স্টাফ। প্রভিডেন্ট ফান্ড নেই, ই. এস. আই নেই, ইউনিয়নের ঝুট-ঝামেলা নেই। এয়ার-কন্ডিশান্ড অফিস। স্মার্ট সুন্দরী রিসেপসনিস্ট।

হীরেন বলল, দুস শালা! গাছে কাঁটাল গোঁফে তেল।

হঠাৎ নেপেন বলল, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। চলবে?

কি? কনসালটেন্সি?

হ্যাঁ রে।

বল। বল। চুপ করে আছিস কেন?

নেপেন দ্রুত হাতে সিগারেটের প্যাকেট বের করল পকেট থেকে।

ছেড়ে দিয়েছিস বললি না সেদিন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সত্যিই দিয়েছি। কিন্তু এইরকম এমার্জেন্সি থিংকিং-এর সময়ে। বুঝতেই পারছিস।

বুঝেছি। বল এবার।

নেপেনের সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দিয়ে দিল সোমেশ এমনই যত্নে যেন বাপেরই মুখাগ্নি করছে।

নেপেন সিগারেটে একটা মস্ত টান লাগিয়ে বলল, আজকের সবচেয়ে বড় আধুনিক অস্ত্র কী বল তো শত্রুনিধনের? মানে শত্রুকে শেষ করার বেস্ট উপায় কী?

কী? নিউক্লিয়ার বম?

গজানন বলল।

ইডিয়ট।

সেলফ-লোডিং রাইফেল। এস-এল-আর?

হীরেন বলল।

স্টুপিড।

বোমা। লেটার-বম্ব।

যাচ্ছেতাই!

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সিগারেটে আরেক টান দিয়ে বলল, নেপেন।

কি তবে?

ক্যারেকটার-অ্যাসাসিনেশান। চরিত্র-হনন। এই হত্যা এমনই এক জিনিস যে, বুলেট-প্রুফ জ্যাকেট বা বুলেট-প্রুফ বক্স বা গাড়ি বা কম্যান্ডো কোনো কিছুর সাহায্যেই এই মৃত্যুর হাত থেকে কেউ বাঁচতে পারে না।

সকলেই হো-ও-ও-ও করে চেঁচিয়ে উঠল নেপেনকে কনগ্রাচুলেট করে।

গজানন বলল, এই জন্যেই বলি! আমার দাদামশাই সাঙ্গেনারিয়াজী বারবার বলতেন ব্যবসা করবে বাঙালিদের বুদ্ধি নিয়ে। ওরা জিনিয়াস্। "কম খাঁই কিন্তু বুদ্ধিতে দুসরা নাই।"

নেপেন বলল, কথা বলো না এখন গজানন। আমার কনসেনট্রেশান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তোমরা সকলেই লক্ষ করে থাকবে যে প্রতি মুহূর্তে আমাদের চার পাশে, স্বামী-স্ত্রী, উকিল-জজ, ব্যবসাদার, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, সম্পাদক-সাংবাদিক-সাহিত্যিক, খেলোয়াড়, ম্যানেজার, ক্যাপ্টেইন, বোলার, ব্যাটসম্যান, গুরু-শিষ্য, উপাচার্য, অধ্যাপক, মাস্টারমশাই-ছাত্র সমানে একে অন্যের চরিত্র হননের চেষ্টা করে যাচ্ছে। এই অপচেষ্টা চলেছে একই পেশার লক্ষ লক্ষ মানুষেরও মধ্যে। প্রতিমুহূর্তে।

আর বলতে হবে না তোকে। বুঝেছি আমরা। চতুর্দিকে এভরি মিনিট যে রেটে মানুষের চরিত্রের মৃত্যু ঘটানো হচ্ছে, মানে চরিত্রকে খুন করা হচ্ছে অথবা খুনের চেষ্টা করা হচ্ছে সেই রেটে ভারতবর্ষ বা চায়নার মেয়েরা কনসিভও করছে না। অনেক সময়ে এই হত্যা কী ভাবে করা হবে তা বিরুদ্ধ পক্ষ ঠিক করেই উঠতে পারে না। ইচ্ছে থাকলেও শক্তি থাকে না। স্ট্র্যাটেজিতে গোলমাল করে। অনেক জায়গায় অত্যন্ত ক্রুড ওয়ে-তে চরিত্রের মৃত্যু ঘটানো হয়, অনেকটা ভারী হাতুড়ি দিয়ে মানুষের শারীরিক মৃত্যু ঘটানোরই মতো। ক্যারেক্টার অ্যাসাসিনেশান আজকে একটা আর্টের পর্যায়েই পৌঁছেছে। অন্তত পৌঁছানো উচিত। এবং এই লাইনে যদি আমরা স্পেশালাইজ করি তো কোনো শালার ব্যাটা শালার সাধ্য নেই যে আমাদের রোখে। আমরাই এই আর্টকে পারফেক্ট করব। পরে, সারা দেশে এবং পৃথিবীতে ব্রাঞ্চ খুলব।

www.BanglaBook.org

গজানন উত্তেজিত হলেই ক কে খ উচ্চারণ করে চিরদিনই।

ও বলল, কিন্তু খি করে খি হবে? মোডাস অপারেন্ডি ঠিখ খরা...

নেপেন বলল, আমরা কনট্রাক্ট নেবো ক্যারেকটার অ্যাসাসিনেশানের। মিনিমাম রেট পাঁচ হাজার টাকা। তারপর পার্টি বুঝে পাঁচ লাখও নিতে পারি। তুই কিন্তু পলিটিক্যাল লাইনের লোকদের কথা ভুলে যাসনি। ঐ এরিয়াতেও আমাদের ব্যবসার প্রচণ্ড পোটেনশিয়ালিটি আছে। বিশেষ করে ইলেকশানের আগে।

হীরেন বলল।

হ্যাঁ। সেই সব ক্ষেত্রে কিন্তু মিলিয়নে হাঁকব। আমাদের ফীস। পার্টিদের টাকার অভাব কী?

সোমেশ বলল, ওরে গজা! আমাদের নেপেনের ব্রেইন দেখলি! ও চলেই যাক আগামী সামারে ওর ওয়াইফকে নিয়ে সিস্টার-ইন-ল'র কাছে। আমেরিকাতে। অন দ্যা হাউস। দ্যা কোম্পানি উইল বেয়ার ওল এক্সপেনসেস। ক্লাব-ক্লাসের টিকিট কেটে দেব আমরা তোকে নেপেন।

সকলে সমস্বরে বলল, নিশ্চয়ই। একশবার।

গজানন বলল, কিন্তু নাম কী হবে কোম্পানির? ক্যারেকটার অ্যাসাসিনেশান প্রাঃ লিঃ?

যাঃ। লোকে ধরে ফেলবে না! কাজটা তো গোপনীয়। এবং ডেঞ্জারাস। একটা ডিসক্রিট নাম দিতে হবে।

আমরাও একটা আর্মড-উয়িং রাখব। টাকা রোজগার করতে ভয় পেলে চলে!

একটা দিশি-দিশি গন্ধের নাম দে। ঐ নামটা চলবে না। এমন একটা নাম যে, দিশি বিদিশি সকলেই ইনকুইজিটিভ হবে।

তাহলে কি? চরিত্র-হনন প্রাঃ লিমিটেড?

হীরেন বলল।

আজ সকলে সন্ত তুলসীদাসের রাম চরিত মানসের শ্লোক বলেছিলাম তো, চরিত্রর বদল চরিত দিলে কেমন হয়?

নেপেন আরেকটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিলো, গজানন ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, বাজে সিগারেট খেও না ভাই। আমি ক্লাসিকস আনিয়ে দিচ্ছি। রাম সিং...

তা আনাও। ততক্ষণে একটা খেয়ে নিই। ভীষণ টেনশানে আছি।

বলেই, নতুন সিগারেট ধরিয়ে একটা কল্কে-ফাটানো টান দিয়েই নেপেন বললো, পেয়েছি নাম।

কি?

চরিত-খেকো অ্যান্ড কোং। "খেকো" কথাটাতে বেশ ম্যানইটার ম্যানইটার একটা গন্ধও থাকবে। আর ইংরিজিতে সাইনবোর্ড ও লেটার হেড হলে নামটাকে ইনোসেন্টও দেখাবে।

বলেই বলল, লেখ তো সোমেশ। দেখা যাক, লিখিতভাবে কেমন দেখায়?

সোমেশ লিখল, CHARIT-KHEKO AND CO.

হীরেন বলল, বাঃ।

গজানন বলল, ওয়াহ। ওয়াহ। জয়। সন্ত তুলসীদাসকি জয়। খি খারবার!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তা

প্রথম দিন অফিস থেকে ফিরে প্রমীলাকে দেখেই চমকে উঠেছিলাম। চমকে উঠেছিলাম, কারণ ওরকম কুৎসিত দর্শন মহিলা আমি এর আগে দেখিনি। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে, কুচকুচে কালো রঙ, উঁচু কপাল, ট্যারা চোখ— এবং অত্যন্ত লম্বা। সব মিলিয়ে প্রথম দেখাটা মনে রাখার মতো।

টাই খুলতে খুলতে রিণিকে বললাম, এ কে?

রিনি গলা নামিয়ে বলল, মুন্নীর নতুন আয়া।

বললাম, কোথা থেকে জোটালে? অন্ধকারে দেখলে মুন্নী তো দূরের কথা মুন্নীর বাবাও কেঁদে উঠবে।

রিনি হাসল, বলল, তুমি ভীষণ অসভ্য। কারো চেহারা নিয়ে ওরকম করে বলতে হয়?

আমি বললাম, সকলেই অপর্ণা সেনের মতো মিষ্টি দেখতে হয় না, তা বলে এতখানি খারাপ হওয়াটাও বাড়াবাড়ি।

রিনি বলল, বাড়ির বাবুদের ছুকছুকে বাতিক থাকলে দেখে দেখে এরকম আয়াই রাখা উচিত।

আমি কপট রাগের সুরে বললাম, এ্যাই! কী হচ্ছে!

রিনি তারপর সিরিয়াসলি বলল, অনেক কষ্ট করে জোগাড় করতে হয়েছে ওকে। চেহারা খারাপ হলে কি হবে, এফিসিয়েন্ট। বেচারার কোনো ছেলেপুলে নেই, তার উপর বালবিধবা।

আমি বললাম, আহা!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

॥ ২ ॥

সেটা প্রথম দিনের কথা।

তারপর দেখতে দেখতে অনেক দিন কেটে গেছে, অনেক মাসও। প্রমীলার চেহারাটা আমার চোখে সয়ে গেছে দেখতে দেখতে। চেহারা ছাপিয়ে যা চোখে পড়েছে তা ওর দরদ। মনে হয়েছে মুন্নী যেন রিনির মেয়ে নয়, প্রমীলার নিজেরই মেয়ে।

রিনিকে ওর অফিসের কাজে প্রায়ই বাইরে বাইরে যেতে হয়। আজ দিল্লি, কাল বোম্বে, আমাকেও তাই। সে কারণে একজন ভাল আয়া আমাদের বিলাসিতা ছিল না; ছিল নিতান্তই প্রয়োজন।

মনে আছে, একবার রিনি দিল্লি ছিল বেশ কয়েকদিনের জন্য। আমি কলকাতাতেই ছিলাম। সেই কদিন আমার চোখের সামনে প্রমীলা যে ভাবে মুন্নীকে বুকে করে রইল তা বলার নয়।

মুন্নীটা যত বড় হচ্ছে, ততই দুষ্টু হচ্ছে। আধো আধো কথা বলতে শিখেছে। সবসময় দুটি ফেস-টাওয়েল মুখের কাছে ধরে রাখা চাই, আর তা দিয়ে অনবরত নাক ঘষা চাই। টেডি-বীয়ার, জাপানী পুতুল, ফ্লুরীর চকোলেট, কিছু দিয়েই তাকে রাখা যায় না, যদি না 'তা' তার সঙ্গে থাকে।

প্রমীলার নতুন নামকরণ হয়েছে আমাদের বাড়িতে। নামকরণ করেছে মুন্নীই। প্রমীলার সেই নতুন নাম : তা।

প্রমীলাকে খেতে পর্যন্ত দিত না মুন্নী। দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর যখনি মুন্নী একটু চোখ বুজত তখন ও বেচারী কোনো রকমে চান সেরে, বেডরুমের মেজেতে বসেই কোনোরকমে খেয়ে নিত। আমি অন্য ঘরেই থাকতাম, তাই প্রাইভেসীর বিঘ্ন হত না।

যেখানেই যাক, যাইই করুক, তার সঙ্গ ছাড়া মুন্নীর একমুহূর্ত চলত না। মাঝে মাঝে রাতে ঘুমের মধ্যে মুন্নী কেঁদে উঠত। আমি আমার ঘর থেকে দৌড়ে আসতাম। বেডরুমের মধ্যে খাটের পাশে টেবল-ল্যাম্পটা। দেখতাম মশারির মধ্যে মুন্নীকে বুকে করে প্রমীলা বসে থাকত। আর ওর কান্না থামাবার চেষ্টা করত। মুন্নীকে বুকে করে ওর বসে থাকার ভঙ্গির মধ্যে এমন এক মা-সুলভ মমতা থাকত যে, মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগত; মুন্নী সম্বন্ধে মমতা কার বেশি? রিনির না প্রমীলার? এই সন্তানহীনা মহিলার মুখে চোখে টেবিল লাইটের আলোয় যে ভাব দেখতে পেতাম তা রিনির মুখেও কোনোদিন দেখিনি।

আজকালকার মডার্ন মায়েরা নির্দয় হওয়াটাকেই আধুনিকতার লক্ষণ বলে মনে করেন। ভাবাবেগ, সে প্রেমিক, বা স্বামীর সম্পর্কেই হোক কি সন্তানের সম্পর্কেই হোক, প্রকাশ করার মধ্যে যে ইনটেলেকচুয়ালিজম নেই তা এঁদের মতো আর কেউ এমন জানেননি।

আমি জানিনা কেন, ইদানীং রিনি প্রায়ই বলত, প্রমীলা বড় আদর দিচ্ছে মুন্নীকে। মেয়েটাকে স্পয়েল করে ফেলল। মেয়েটাকে সামলাতে পারে ও ভাল কিন্তু শুধু ভালবাসলেই তো হয় না, তাহলে তো সকলেই আয়া হতে পারত ভাল।

আমি পুরুষ মানুষের স্থূল বুদ্ধিতে বুঝতে পারতাম না, ভালবাসার চেয়েও বড় কোয়ালিফিকেশন আয়ার মধ্যে আর কী থাকতে পারে? যাই হোক, আমার বুদ্ধি স্থূলই হোক কি সূক্ষ্মই হোক বাড়ির মধ্যে, বাড়ির ব্যাপারে আমার বুদ্ধি ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। সেখানে আমি নন-এনটিটি। তাই বাদানুবাদের মধ্যে না গিয়ে আমি অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতাম। কিন্তু আমার মন কেবলই বলত, এই সন্তানহীনা মহিলার প্রতি রিনি ভাল ব্যবহার করছে না। কারণ, কেন জানিনা, আমার মনে হত প্রমীলাকে আর যে গঞ্জনাই দেওয়া হোক

www.BanglaBook.org

সে তা সইতে পারে, মুন্নীর অযত্ন হচ্ছে, মুন্নীকে ঠিকমত দেখা শোনা হচ্ছে না; এ অপবাদ তার পক্ষে অসহ্য ছিল।

কিছুদিন বাদে রিনি কয়েকদিনের জন্যে জামশেদপুরে গেল। জামশেদপুর যাওয়ার আগেই মুন্নীর জ্বর এসেছিল। জ্বর প্রায় তিন পর্যন্ত উঠেছিল কিন্তু ওষুধ পড়াতে জ্বর আবার কমে যায়। ডাক্তারের অভয়বাণী পেয়ে মুন্নীকে রেখেই রিনি জামশেদপুরে চলে গেল। ওর নাকি না গেলেই নয়।

আমার মন ভালো লাগছিল না। কেবলি মনে হচ্ছিল, কিছু একটা গোলমাল হবে।

রিনি যেদিন বিকেলের ট্রেনে গেল সেদিনই রাতে মেয়ের ধূম জ্বর এল। মুখ চোখের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি ডাক্তারবাবুকে খবর দিলাম, তিনি এসে ওষুধপত্র দিয়ে গেলেন। কিন্তু সারা রাত মুন্নী যন্ত্রণায় চিৎকার করল। সে রাতে আমার ঘর থেকে কম করে পাঁচবার আমি উঠে এলাম। কিন্তু আমার মতো অপদার্থ বাবারা শুধু টাকা রোজগার করতে জানে, ছেলেমেয়েদের, বুকের সব ভালবাসা উজাড় করে ভালবাসতে জানে, কিন্তু তাদের শারীরিক কষ্ট লাঘব করার কোনো উপায়ই জানে না তারা।

মুন্নীর বয়স এখন দু' বছরও হয়নি। আধো আধো কথা বলে, কিন্তু কোথায় ব্যথা, কিসের কষ্ট তা বুঝিয়ে বলতে পারে না। যন্ত্রণায় চোখ দিয়ে জলে পড়ে, কিন্তু জানাতে পারে না, কী করলে সে কষ্টের উপশম হয়। বাবা হওয়ার আনন্দ অনেক কিন্তু অবলা শিশু সন্তানের যন্ত্রণা চোখের সামনে নিরুপায়ে দাঁড়িয়ে দেখাটা বড়ই কষ্টের।

যতবারই আমি দৌড়ে ও ঘরে গেছি ততবারই দেখেছি যে, প্রমীলা মুন্নীকে বুকে করে ওর কষ্ট উপশমের জন্যে নানারকম প্রক্রিয়া করছে। আমি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই মুন্নীর কান্না বা গোঙানি থেমে গেছে। আরামে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে মুন্নী তার তা'র কোলে।

ও থামতেই প্রমীলা বলেছে, দাদাবাবু আপনি গিয়ে ঘুমোন, আমি তো আছি। আপনি কেন কষ্ট করছেন?

পাশের ঘরে আমি শুতে যেতে যেতে ভেবেছি, আমি তো ওর বাবা। ওর জন্য কিছু কষ্ট তো আমার করা উচিত কিন্তু তুমি তো পঞ্চাশ টাকার আয়া—তুমি কী জন্যে ওকে বুকে নিয়ে এত কষ্ট করছ? কেবলি ভেবেছি, আর মনে হয়েছে, প্রমীলা যা করে, যা করেছে এতদিন, তা শুধু ওর কর্তব্য নয়, শুধু টাকার বিনিময়ে করা নয়। ভগবান কখনও ওর কোলে যা দেননি, তা ওর নিজের না হলেও, ক্ষণেকের জন্য, কিছুদিনের জন্যে ওর কোলে পেয়ে ও যেন ধন্য হয়ে গেছে। আমার মনে হয়েছে এই সন্তানহীনা রমণীর কোল থেকে সাক্ষাৎ যমদূত এলেও আমার মুন্নীকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। সত্যি কথা বলতে কি, এ কথা ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে আমি ঘুমুতে গেছি।

পরদিন ভোরেই মুন্নীর সমস্ত শরীর ভরে হাম দেখা গেল। মেয়ে একেবারে বেহুঁশ হয়ে রইল। চোখ মুখ লাল। চোখের পাতা, মুখের ভিতর হাম একেবারে ছেয়ে ফেলেছে। সকালে মুন্নীর মুখের দিকে চেয়ে আমি খুব ভয় পেলাম। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন ভয়ের কিছু নেই। হাম বেরোলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তবুও ভয় পেলাম।

তারপর প্রমীলার মুখের দিকে চাইতেই দেখি আমার মেয়ের ক্লিষ্ট মুখের ছায়া তার মুখে। প্রমীলা মুন্নীর চেয়ে বেশি বই কম কষ্ট পাচ্ছে না।

ডাক্তার আবার এলেন। হাম ভাল করে উঠে যাবার ওষুধ দিয়ে গেলেন।

মন খারাপ করে আমি অফিসে গেলাম। অফিস থেকে বার তিনেক ফোন করে খবর

www.BanglaBook.org

নিলাম। শুনলাম হাম উঠেছে। প্রমীলাই ফোন ধরল, কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, মুন্নী বড় কষ্ট পাচ্ছে দাদাবাবু।

অফিস থেকে ফিরে আমি মুন্নীর অবস্থা দেখে ওর কাছে আর দাঁড়াতে পারলাম না। পাশের ঘরে এসে ডাক্তারবাবুকে ফোন করলাম। তিনি বললেন, কোনো চিন্তা করবেন না, যেমন যেমন বলেছি, ওষুধ খাইয়ে যান। এরকম হয়। অসুখ মানেই তো সুখের অভাব।

আমি একটা গল্পের বই নিয়ে তাতে নিজেকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগলাম।

সে রাতেও সারারাত প্রমীলা ঘুমুল না। সারারাত প্রায় ঠায় বসে কাটাল। পরদিন ও পরের রাতেও ওরকম করেই কাটল।

তার পরদিন ভোরবেলা বহুদিন পর মুন্নীর গলা শুনলাম। মুন্নী তার মার নাম ধরে ডাকল না, তার বাবার নাম ধরে ডাকল না। ঘোরের পর জ্ঞান এলে, মুন্নী প্রথম কথা বললো : তা।

তারপর বারবার ডাকল তা, তা, তা, তা।

আমি দৌড়ে বেডরুমে গেলাম।

প্রমীলা মাথার দিকের জানালার পর্দা সরিয়ে দিয়েছিল। কাচের সার্সি বন্ধ ছিল, কারণ, ঠাণ্ডা লাগানো বারণ। সেই ভোরের আলোয় দেখলাম প্রমীলা মুন্নীকে বুকে নিয়ে বসে আছে, আর তার দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা বইছে আনন্দের। আর মুন্নী তার ছোট ছোট হাত দুটিতে প্রমীলার কুশ্রী মুখটি ধরে সমানে ডেকে চলেছে, তা, তা, তা।

এই দৃশ্য দেখে আমার বুকের মধ্যে কোথায় না জানি কী হয়ে গেল। কোন তারের সঙ্গে কোন অদৃশ্য তারের যোগাযোগ ঘটে গেল। প্রমীলার কাছে নিজেকে বড় ছোট লাগল। মনে হলো, কই? মুন্নীর ডাকে আমার চোখে তো এমন করে জল এল না? না কি আমি পুরুষ মানুষ বলে? না কি আমি দু'পাতা ইংরেজি পড়েছি বলে?

সেদিন সকালের পরই দেখতে দেখতে মুন্নী ভাল হয়ে উঠতে লাগল।

আমি অফিসে গিয়েই কাজে বেরিয়েছিলাম সেদিন। ফিরে জানলাম যে, রিনি কলকাতা ফিরে ফোন করেছিল আমায়। অফিসে ফিরতে ফিরতেই বেলা হয়েছিল বলে এবং তাড়াতাড়ি ফিরব বলে আমি আর রিং ব্যাক করলাম না।

অফিস থেকে ফেরার পথে গাড়িটা ট্রাফিক লাইটে দাঁড়িয়েছিল। আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেছিলাম। মনটা খুব খুশি ছিল আমার। মুন্নীটা ভাল হয়ে উঠেছে, রিনি ফিরে এসেছে। এ কথা ভেবেও ভাল লাগছিল যে প্রমীলা আজ তিন রাত পরে ঘুমুতে পারবে। বেচারী গত তিনদিন তিনরাত একটুও ঘুমোয়নি। অন্য প্রাণীও কেউ ছিল না যে, ওকে একটু রিলিভ করে।

বেল টিপতে ঠাকুর দরজা খুলল। বসবার ঘরে ঢুকতেই মুন্নীর গলা শুনতে পেলাম বেডরুম থেকে। মুন্নী ডাকছে তা, তা ও তা। আধো আধো গলায় করুণ স্বরে ডাকছে মুন্নী। তা, তা, তা।

এমন সময় রিনির গলা শুনলাম, রাগ রাগ গলা। রিণি বলল, খুব বকব। চুপ করো, চুপ করো বলছি। তা তা করবে না, খুব বকব।

দেখলাম ঠাকুরের মুখটা ফ্যাকাশে।

ওকে শুধালাম কী হয়েছে রে?

ঠাকুর বলল, প্রমীলাকে বৌদি তাড়িয়ে দিয়েছে।

সে কি? অবাক হয়ে বললাম আমি।

তাড়াতাড়ি বেডরুমে ঢুকলাম আমি।

রিনি খাটে বসেছিল, মুন্নীকে পাশে শুইয়ে।

আমাকে ঢুকতে দেখেই বলল, তোমার পেয়ারের আয়াকে একটু আগে তাড়ালাম।

www.BanglaBook.org

আমার খুব রাগ হয়ে গেল। বললাম, কারণটা কী?

রিনি বললো, কারণ নিশ্চয়ই একটা ছিল। এটা আমার ব্যাপার। ঘর-গেরস্থালীর ব্যাপার। সব তাতে তোমাকে কৈফিয়ত দিতে পারব না।

তারপর একটু পরে নিজেই বললো, আমার মুখে মুখে কথা বলছিল, অনেকদিন থেকেই বলছিল, তার উপর মুন্নীটার স্বভাব একেবারে নষ্ট করতে বসেছিল।

আমি বললাম, প্রমীলা তিন রাত তিন দিন এক ফোঁটা বিশ্রাম পায়নি, ঘুমোয়নি একটুও। কাজটা কি তুমি ভাল করলে? ওকে কি ফিরিয়ে আনা যায় না?

রিনি চড়া গলায় বলল, ওকে ফিরিয়ে আনলে আমিই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।

আমি কোনো কথা বললাম না। নিজের ঘরে চলে গেলাম।

সে রাতে আমি খাইনি। রিনির সঙ্গে তিন দিন কথা বলিনি, কিন্তু তাতে কারো কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি।

॥ ৩ ॥

প্রমীলার জায়গায় নতুন আয়া এসেছে নেপালী। তার নাম কাঞ্চী। বয়সে প্রমীলার চেয়ে ছোট—দেখতেও প্রমীলার চেয়ে ভাল।

মুন্নীর সব কাজ এখন সেই করে। সকাল বিকেল বেড়াতে নিয়ে যায়। 'নিনি-বাবা-নিনি, মাখন-রোটি-চিনি' বলে মুন্নীকে ঘুমও পাড়ায়। মুন্নী প্রথম কদিন মাঝে মাঝে তা, তা, করে ডেকে উঠত। ইদানীং একবারও ডাকে না।

মাঝে মাঝে ভাবি মেয়েটাও কি তার মায়ের মতই অকৃতজ্ঞ?

কাজ-কর্মের অবকাশে মাঝে মাঝে প্রমীলার কথা মনে পড়ে। খুব ইচ্ছা করে, যদি পথে ঘাটে কোথাও দেখা হয়ে যায় ওর সঙ্গে তাহলে ওর হাত ধরে ক্ষমা চেয়ে নেব, ওর জন্যে যদি কিছু করতে পারি তা করব। প্রমীলা কোথায় গেছে তা আমি জানি না। কেউ জানে না। তার পুরো ঠিকানাটাও আমাদের কাছে নেই।

জানি না, রিনি হয়তো তার মেয়ের ভালর জন্যেই প্রমীলাকে তাড়িয়েছিল। হয়তো তার হিসাবই ঠিক।

কিন্তু এও জানি না, জগতে এবং জীবনে যা কিছু ঘটে সবকিছুই হিসেবের ভিতরে পড়ে কি না। প্রমীলার মমতা, প্রমীলার চোখের জলও তো হিসাবের বাইরেই ছিল।

আমার ভারী ভয় করে। প্রমীলার চোখের জলে মুন্নীর কোনো অভিশাপ লাগবে না তো! পরক্ষণেই মনে হয় মুন্নীর 'তা' কি কখনও তার মুন্নীর কোনো ক্ষতি করতে পারে?

অনেকদিন হয়ে গেছে প্রমীলাকে তাড়ানোর দিন থেকে কিন্তু আজও তার কাছে ক্ষমা চাওয়া হয়নি। সে সুযোগ আসেনি আমার।

প্রমীলা কি কলকাতাতেই আছে? নাকি চলে গেছে ডায়মণ্ডহারবার লাইনে তার গরিব ভাইয়ের আশ্রয়ে?

নাকি আবারো ভুল করে করে কোনো নতুন মুন্নীকে বুকে করে তার বুকের উত্তাপে তার "তা", কি "থা" কি "দা" হয়েছে সে?

মা তো সে কখনওই হতে পারবে না।

জানি না কিছুই। শুধু এটুকুই জানি যে, এই মুহূর্তে এই নির্দয় হৃদয়হীন শহরের অনেক ঘরেই আমার মুন্নীর মতো মুন্নীদের বুকে আঁকড়ে অনেক প্রমীলারা বসে আছে। তিরিশ, চল্লিশ কি পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে হিসাব-বহির্ভূত যা কিছু তারা দিয়েছে, প্রতিমুহূর্তেই দিচ্ছে; তারা তা কখনও ফেরত পাবে না মুন্নীদের অকৃতজ্ঞ মা-বাবাদের কাছ থেকে।

www.BanglaBook.org

প্রজন্ম

আজও পিয়ন এসে চলে গেছে। খোকার চিঠি আসেনি।

সূর্যকান্ত এবং মৃণালিনী খুব চিন্তায় আছেন। গত সপ্তাহের চিঠিতে খোকা লিখেছিল যে, বৌমার একটু জ্বর-ভাব মতো হয়েছে।

চিন্তা করা ছাড়া ওঁদের আর কিছুই করার নেই এত দূর থেকে। ভাবলেও খারাপ লাগে!

মৃণালিনীর দিনের এই সময়টাতেই একটু যা অবকাশ। সূর্যকান্ত ঠিক বিকেল তিনটেয় উঠে পড়বেন। মুখ ধোবেন শব্দ করে। ততক্ষণে মৃণালিনী কেটলিটা চাপিয়ে দেবেন হিটারে। তারপর চা করে দেবেন সূর্যকান্তকে। নিজের চায়ের কাপটা নিয়ে বসবার ঘরে এসে বসবেন।

অনেক বছর হয়ে গেল মৃণালিনীর কাছে পৃথিবী, এই জীবন, বড়ই একঘেয়ে ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে। সূর্যকান্ত কানে আজকাল বেশ কম শোনেন। মাস কয়েক আগেও অন্যরকম ছিলেন। এদিকে কথা বলার লোক বলতে ঐ একজনই; তাঁর স্বামী। বাড়িতে না আছে কোনো চাকর-বাকর, না কোনো ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি।

মেয়ে সুধার বিয়ে হয়েছে পুরুলিয়ায়, এখান থেকে ওখানে। কিন্তু তবুও কী আসে একটু! অবশ্য মেয়ের দোষ নেই কোনো। জামাইও ভালো। কিন্তু মেয়ের শাশুড়ী একটু অদ্ভুত ধরনের মানুষ। তাঁর শাশুড়ী তাঁর ওপর অত্যাচার করেছিলেন বলে তিনিও তাঁর নিজের বৌমার উপর সবরকম অত্যাচার চালিয়ে যান। এ-যুগে এমনটি দেখা যায় না। মৃণালিনীর মাতৃভক্ত জামাইও তেমনই। তার মায়ের মুখের ওপর একটিও কথা বলে না।

এ-বাবদে জামাইয়ের ওপর রাগও যেমন হয়, তেমন জামাইকে তারিফও করেন মনে মনে। সব ছেলেরাই যদি এমন মাতৃভক্ত হতো, স্ত্রীর কথামতো না চলত তবে তাঁর নিজের সংসারের চেহারাটাও আজ অন্যরকম হতে পারত হয়ত।

www.BanglaBook.org

মৃণালিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এই নির্জনে একা ঘরে, নিঃশ্বাসের শব্দে নিজেই চমকে উঠলেন।

বাইরের কাঁচা রাস্তা দিয়ে নয়াটোলীর গয়লা সাইকেল চড়ে ঘণ্টি বাজিয়ে কাছারীর দিকে চলে গেল। ওর সাইকেলে অনেকগুলো দুধের ভাঁড় থাকায় অদ্ভুত একটি ধাতব শব্দ ওঠে। ও যখনই যায়। এই গয়লাটিই ইদানিং মৃণালিনীর ঘড়ির কাজ করে।

বসবার ঘরে বড় ঘড়িটা আজ দু-বছর হলো খারাপ হয়ে পড়ে আছে। তাঁর নিজের রিস্টওয়াচটারও স্প্রিং কেটে গেছে বহুদিন। খোকাকে কখনও সারিয়ে দিতে বলেননি, কিন্তু খোকা ও বৌমা জানে যে ঘড়িগুলো খারাপ। বাড়িতে যে একমাত্র ঘড়িটি সচল, সেটি সূর্যকান্তর রিস্ট-ওয়াচ। কিন্তু সেটা তাঁর বালিশের নিচেই থাকে সবসময়। সকালে যখন সূর্যকান্ত বাড়ির হাতায় হেঁটে বেড়ান, তখনই মাঝে মাঝে হাতে পরেন শুধু আজকাল। রিটায়ার্ড জীবনে ঘড়িটা একটা বেমানান গয়না হয়ে গেছে। রিটায়ার করার পর থেকে এই কয়েক বছরে মানুষটাও একেবারেই অন্যরকম হয়ে গেছেন। যৌবনের প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দাপটে এবং হাসিখুশি মানুষটার সঙ্গে এই স্তব্ধ, দাবিহীন সূর্যকান্তর কোনোই মিল নেই।

আগে রান্নাঘর, খাওয়ার ঘর, সমস্তই ব্যবহৃত হতো; বাড়িতেই কত জাঁকজমকে থাকতেন। ঠাকুর-চাকর সবই ছিল। এখন আর সে দিন নেই। সাতশ টাকা মতো পেনশান পান সূর্যকান্ত। খোকা প্রতি মাসে একশ টাকা করে পাঠায়। আজকাল টাকার কি কোনো দাম আছে? ঐ টাকার মধ্যে ওষুধ-বিষুধ, ইলেকট্রিক বিল, খাওয়া, ডাক্তারের খরচ, অতিথি-আপ্যায়ন সব কিছুই। ওষুধেই চলে যায় অনেক টাকা।

খোকার যে অনেকই খরচ! বেচারা! তার বেশি পাঠাতে পারে না। ওর ছেলেমেয়েরা ভালো স্কুলে পড়ে। অ্যালসেশিয়ান কুকুর আছে একটা, তার পেছনেও খরচ কম নয়। বৌমার ফুলের শখ খুব। তাই মালী রেখেছে একজন। ক্লাবের বিল আছে। অতিথি আপ্যায়ন আছে। বৌমার বাপের বাড়ির অবস্থা ভালো নয়। আসানসোলে, তাদের দিকেও দেখতে হয় খোকাকে নিশ্চয়ই। টাটানগরে তাঁর খোকা একজন হোমরা-চোমরা লোক। ভাবতে গর্ববোধ করেন মৃণালিনী। বিরাট বাংলো, চাকর-বাকর; গাড়ি।

মাঝে-মাঝে মৃণালিনীকে টাটায় নিয়ে যায় খোকা, গাড়ি করে। যখন বৌমা অসুস্থ হয়, অথবা বাচ্চারা কেউ অসুখে পড়ে। হঠাৎ করে ভালো ট্রেইনড আয়া পাওয়া যায় না। যখনই দরকার হয়, মৃণালিনীই যান। নাতি-নাতনীকে কাছে পেয়ে খুশিই হন। তখন অবশ্য সূর্যকান্তর বড়ই কষ্ট হয়। চৌধুরী বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া করতে হয়।

নাতনীটি আড়াই বছরের। ভারী মিষ্টি। বড়ই দিদা-ভক্ত।

চায়ের জলটা বোধহয় হয়ে গেল। মৃণালিনী কেটলি নামাতে গেলেন।

সূর্যকান্ত উঠে পড়েছেন। বালিশের নীচ থেকে হাতঘড়িটা বের করে দেখলেন। দেখেই, রেখে দিলেন। আজকাল বড় ঘন ঘন ঘড়ি দেখেন সূর্যকান্ত। এই শব্দময় পৃথিবী তাঁর কাছে শব্দহীন হয়ে গেছে। কানে কিছুই শোনেন না। আজকে কানে শোনেন না বলেই বড় স্পষ্ট বুঝতে পারেন যে, হাওয়ারও শব্দ ছিল; ছিল রোদের, ভোরের শব্দ ছিল, রাতের, প্রদোষেরও শব্দ। দশদিক ঘিরে শব্দমঞ্জরী। কানে যাঁরা শুনতে পান, তাঁদের কাছে শব্দের দাম থাকে না কোনোই। কত সুন্দর সব শব্দশিঞ্জনে শিহরিত ছিল তাঁর তখনকার জীবন। আজ পাখির ডাক, গাড়ির হর্ন, মৃণালিনীর কথা কিছুই আর শুনতে পান না তিনি। তবে বেয়াল্লিশ বছরের পার্টনারশিপ! ঠোঁট নাড়ালেই বুঝতে পারেন সূর্যকান্ত, মৃণালিনী কী

www.BanglaBook.org

বলতে চাইছেন। সূর্যকান্তর চেয়ে মৃণালিনী বয়সে বছর বারো তেরোর ছোট। আগেকার দিনে তো এদেশের প্রায় সব দম্পতিরই বয়সের তফাৎ ঐরকম হতো। তাঁদের দাম্পত্য জীবনে সুখের অভাব কখনও ঘটেনি। কিন্তু ইদানীং মৃণালিনী যেন একেবারেই ভেঙে পড়েছেন। মনে হয়, সূর্যকান্তর চেয়েও বয়স তাঁর বেশি। হাত-পা ফুলে গেছে। হাই ব্লাড-প্রেসার। ব্লাড-সুগার। প্রায় অথর্বই। অক্ষম, অর্থহীন সূর্যকান্ত আজকাল মৃণালিনীর মুখে সোজাসুজি চাইতে পর্যন্ত পারেন না। বড়ই অপরাধবোধ জাগে।

একটি ঠিকে লোক রাখেন, আজ এমন সামর্থ্যও নেই সূর্যকান্তর। আজকের অপারকতার গ্লানিটা তাঁরই। তাঁরই একার।

ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো, চাকরি যোগাড় করে দেওয়া, বিয়ে দেওয়া, তাদের যার যার সংসার গোছানোতেই তাঁর জীবনের যা-কিছু সঞ্চয় ছিল সবই গেছে। কোনো ইনস্যুরেন্স পলিসি ছিল না সূর্যকান্তর। মৃণালিনীকে গর্বভরে বলতেন, আমার খোকাই আমার ইনস্যুরেন্স। বুড়ো বয়সে খোকা কি আমাদের ফেলে দেবে? দেখোনা, মাথায় করে রাখবে ওর বাবা-মাকে। ও তো আমারই ছেলে!

মৃণালিনী চায়ের দুটি কাপ ট্রেতে বসিয়ে রাবারের বাথরুম-স্লিপার পায়ে, বিবর্ণ বিষণ্ণতার প্রতীক খয়েরী শালটি গায়ে দিয়ে, বাই-ফোকাল চশমা নাকে লাগিয়ে আস্তে আস্তে সূর্যকান্তর দিকে চটি ঘষে-ঘষে এগিয়ে আসেন। যেন এক গ্রহের প্রাণী চলেছেন অন্য গ্রহে।

আজকাল কানে শোনেন না বলে মৃণালিনীর পদশব্দ শুনতে পান না সূর্যকান্ত। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকেন তাঁর বেয়াল্লিশ বছরের সুখ-দুঃখের ভাগীদারের দিকে। নৈঃশব্দ্যের শব্দময়তা মাথার মধ্যে ঝমঝম করে।

মৃণালিনী কি আজকাল নিঃশব্দে চলাফেরা করেন? সূর্যকান্ত ভাবেন। মৃত্যুর পায়ের শব্দ কি শোনা যায় না? মৃত্যু, তবু শান্তির; বড় শান্তির।

সেদিন মুখুজ্যে মশাই গেলেন। গত মাসে সিদ্ধেশ্বর গেল। বার্ধক্য, জরা; এই সবই বড় কষ্টের। যাদের টাকা নেই, যাদের অবলম্বন নেই, যারা শুধুমাত্র কোনোক্রমে বেঁচে থাকার জন্যই নিজেদের বড় সাধের বড় আদরের পুত্রকন্যার দয়ার উপর নির্ভর করেন তাঁদের মতো গ্লানির জীবন যেন শত্রুরও না হয়!

সূর্যকান্ত নিরুচ্চারে দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁতে দাঁত ঘষে বলেন, হ্যাঁ। যেন শত্রুরও না হয়।

মৃণালিনী সূর্যকান্তকে চা দিয়ে নিজেও সামনে বসলেন। পায়ে উলের ছেঁড়া মোজা। সমস্ত শীতকালটা প্রায় সারাদিনই মৃণালিনী মোজা পরে থাকেন আজকাল। এদিকটায় ঠাণ্ডা খুব বেশি। পাহাড়টা কাছে। নদীটাও। আগে ফায়ার-প্লেসে আগুন জ্বালতেন; যখন সূর্যকান্তর চাকরি ছিল, প্রতিপত্তি ছিল।

শুনতে পান, আজকাল অনেকরকম রুম-হিটার বেরিয়েছে। এই বয়সে বড়ই শীত করে। সারা পৃথিবীর পাহাড়-নদীর সমস্ত শীত এসে বুড়ো-বুড়িদের শরীরে জমে। সাইবেরিয়ান হাঁসের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে ওরা উড়ে আসে। এসে, ওদের জলভেজা ফ্যাকাশে হলুদ চ্যাপ্টা পায়ের পাতা দিয়ে সূর্যকান্তকে, মৃণালিনীকে জাপ্টে ধরে। হিসহিসিয়ে শীতের শিস ওঠে।

রাতে হট-ওয়াটার ব্যাগে গরম জল করে দেন তিনি সূর্যকান্তকে। একটাই আছে। তাঁর জন্য জোটে না। সূর্যকান্ত তাঁর ব্যাগটাই মাঝে মাঝে এগিয়ে দেন মৃণালিনীকে। মৃণালিনীর

www.BanglaBook.org

খাটের দিকে। দুজনে দু-বিছানাতে শোন বহুদিন হলো। মাঝের টেবিলে নাতি-নাতনীর ছবি থাকে। কৃতি ছেলে এবং সুন্দরী উচ্চশিক্ষিতা পুত্রবধূর।

সারা দিনে-রাতে সূর্যকান্ত এবং মৃণালিনীর মধ্যে তিন-চারটির বেশি কথা হয় না আজকাল। কথার কিছু নেইও আর।

সূর্যকান্ত হয়ত জিজ্ঞাসা করেন, আজ কি পূর্ণিমা? পায়ের আঙুলে হাঁটুতে এতো ব্যথা হলো কেন?

মৃণালিনী বলেন, এই তো অমাবস্যা গেল।

সূর্যকান্ত ভুল শোনেন। বলেন, ও বৃহস্পতি বার?

মৃণালিনী নিষ্ঠুরের মতো চুপ করে থাকেন। কাঁহাতক কালা লোকের সঙ্গে বকবক করা যায়?

সূর্যকান্ত আজকাল মেনেই নিয়েছেন এই অবস্থা। প্রতিবাদ করেন না, অনুযোগও নয়, চুপ করে থাকেন। ওঁর মুখটা দেখে শিশুর মুখ বলে মনে হয়। যাঁরা একদিন কানে শুনতেন কিন্তু এখন শোনেন না তাঁদের মুখমণ্ডলে কেমন যেন এক অসহায় ভাব ফোটে। অতীতের সমস্ত হাসি, সানাই, গান, ভোরের পাখির ডাক, রাতের শিশির পড়ার শব্দ; সমস্ত শব্দময়তা নিঃশব্দে স্থানান্তরিত হয়ে সূর্যকান্তর মুখের অভিব্যক্তিতে পরিস্ফুট হয়ে থাকে। উঁচু-নীচু হয়ে। ব্রেইলি-সিসটেমের লিপিরই মতো কান দুটোও এখন অবোধ জাবরকাটা গরুর চোখের মতো কিছু হতে চায়!

সূর্যকান্তর মুখে তাকালে বড়ই দুঃখ হয় মৃণালিনীর। নিজের জন্যেও দুঃখ হয়। কিন্তু সূর্যকান্তকে এইরকম-অসহায় অবস্থায় ফেলে তিনি যে আগে চলে যাবেন একথা ভাবতেও বড় ভয় করে। মনে মনে ঠাকুরকে ডাকেন। বলেন, ঠাকুর! আগে যেন ওঁকে রওয়ানা করিয়ে দিতে পারি।

বাইরে দেখতে দেখতে শীতের বেলা পড়ে আসে। আম আর আকাশমণি গাছের ছায়াগুলো দীর্ঘতর হয়ে এককালীন বাগানের সর্বত্র গজিয়ে-ওঠা মরা, লালচে ঘাসগুলোর উপর পড়ে। চারিদিকে, মৃণালিনীর মনের মধ্যে; বিষণ্ণতা গড়িয়ে যায়।

ফুল গাছগুলো যত্নের অভাবে মরে গেছে বহুদিন। মৃণালিনীর এক সময়ে পালিত সীয়ামীজ বিড়ালনীটির মতো। কবে? তা আজ আর সঠিক মনে পড়ে না।

আজকাল সন্ধে লাগতে না লাগতেই বাড়ির হাতার মধ্যেই শেয়াল ঘোরাঘুরি করে। আমগাছের ঝাঁকড়া ডালে বসে হুতোম প্যাঁচা দুরগুম দুরগুম করে বুক কাঁপিয়ে ডাকে। অন্ধকার হয়ে গেলেই থমথম করে নির্জনতা চারিদিকে। ছমছম করে শীত। সন্ধের পর কোলাপসিবল গেট টেনে দিয়ে মৃণালিনী ইজিচেয়ারে আধোশুয়ে পড়েন, এবং ভাবেন। পুরনো দিনের কথা ভাবতে ভাবতে কোথায় না কোথায় চলে যান।

আর সূর্যকান্ত, এককালীন জাঁকজমক-ভরা, এখন শতচ্ছিন্ন কার্পেটমোড়া বসবার ঘরে নিজের আর্থিক সঙ্গতি, নিজের সুখের দিনের স্মারক যৌবনের দামী ফ্লানেলের ট্রাউজার, আর ফুলহাতা সোয়েটার পরে টেবিলের উপর তাসগুলো দুহাতে মেলে ধরেন, বাঁটেন; দান দেন ছুঁড়ে, ছুঁড়ে। বারে বারে, রোজ সন্ধেবেলাই বৃদ্ধ ও অপমানকরভাবে পরাজিত সূর্যকান্ত অনুপস্থিত প্রতিপক্ষকে ওয়াক-ওভারে হারান।

তাসগুলো আবার হাতে তুলে নেন, বাঁটেন; দান দেন।

বাইরে শেয়াল হুক্কাহুয়া করে হেসে ওঠে। হুতোম পেঁচা আবার ডাকে।

www.BanglaBook.org

মৃণালিনীর মনে পড়ে যায়, বহু বছর আগে একবার একটা লক্ষ্মী-পেঁচা এসে বসেছিল এই বাড়িতেই। পূর্ণিমার রাতে। রান্নাঘরের পাশে ছোট ল্যাংড়া আমগাছটার ডালে বসেছিল অনেকক্ষণই। সেবারই সূর্যকান্তর উন্নতি হয়। শেষ উন্নতি। সেই সময়কার খোকা আর সুধার ছেলেমানুষ কচি মুখ ও উজ্জ্বল চোখের কথা মনের মধ্যে ঝিলিক মেরে যায় মৃণালিনীর।

বোসদাকে অনেক ধরাধরি করার পর খোকার জামসেদপুরের চাকরিটা যোগাড় করেন সূর্যকান্ত। মনে পড়ে, সে সময়ই সেকেন্ড-হ্যান্ড অ্যামবাসাডার গাড়িটাও কেনেন। কিন্তু খোকার বিয়ের পরই খোকার তখনকার কোয়ার্টার সুন্দর করে সাজাবার জন্য অনেক টাকার দরকার হয়ে পড়েছিল। বৌমার বাপের বাড়ি থেকে শাঁখা-সিঁদুর দিয়েই পাঠিয়েছিলেন তাকে। সুন্দরী দেখেই পছন্দ করেছিলেন। কুটুম বাড়ি থেকে টাকা নেওয়ার মতো-ছোটলোক কখনওই ছিলেন না সূর্যকান্ত। সেই সময়ই ওঁর গাড়িটাকে বিক্রি করে দেন সূর্যকান্ত। মৃণালিনী নিষেধ করেছিলেন। তাও মনে পড়ে। সূর্যকান্ত বলেছিলেন, আহা ছেলেমানুষ! এই তো আনন্দ, মজা করার সময়। আমাদের বিয়ের পরের দিনগুলোর কথা ভুলে গেলে? আমাদের জন্যে তো করার কেউ ছিলো না। ওরাই তো আমাদের সব। ওদের সুখই তো আমাদের সুখ!

একটা টর্চের আলো পড়ল যেন বাইরে। কেউ কি এল?

মৃণালিনী উদ্বিগ্ন হলেন।

আশে-পাশের বাড়ি থেকে কেউ এলে ভালোই লাগে ওঁদের, যাঁরা ওঁদের ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন; যাঁদের সকলের অবস্থাও প্রায় ওঁদেরই মতো। এক চৌধুরীরা ছাড়া। ওঁদের ছেলে-বৌ প্রতিমাসেই কোলকাতা থেকে ওঁদের দেখতে আসে। কত কী নিয়ে আসে ওদের জন্যে। খাবার-দাবার, জামা-কাপড়। প্রতুল ওঁদের ছেলে। এঞ্জিনিয়ার। কখনও কখনও গাড়ি নিয়েও আসে। তখন মৃণালিনী ও সূর্যকান্তকেও নিয়ে ওরা এখানে-ওখানে যায়। নিজের কারখানা আছে হাওড়া না কোথায় যেন। ছেলের বৌটিও বড় ভালো হয়েছে। যেমন দেখতে, তেমনই স্বভাব। কে বলবে, নিজের মেয়ে নয়? চৌধুরী গিন্নীকে এমন করে মা বলে ডাকে যে, মৃণালিনীর বুকটাও যেন জুড়িয়ে যায়।

চৌধুরীরা এলেই নিজেদের ছেলে-বৌয়ের কথা মনে পড়ে যায় ওঁদের।

বড়ই খারাপ লাগে।

কিন্তু একদিন চৌধুরী-গিন্নী খোকার সম্বন্ধে কী একটা কথা বলতে গেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই মৃণালিনী বলেছিলেন যে, আমার খোকাকেও বকাবকি করেই থামাতে হয়। আমাদের জন্যে যে কী করবে, কিসে আমাদের সুখ, এই ভেবেই মরে ওরা সব সময়। যেমন খোকা, তেমন হয়েছে বৌমা। এমনটি আর হয় না। মৃণালিনী চৌধুরীদের বুঝিয়ে বলেন, আমরা বলি, ওরে, আমরা বুড়ো হয়েছি. তোমাদের সুখই এখন আমাদের সুখ, আমাদের নিজেদের সুখ বলে এখন আর কিছু আলাদা করা যায় নাকি? উনিও খুবই রাগারাগি করেন। বলেন, একেবারে অপচয় করবে না। সামনে তোমাদের সমস্ত জীবন পড়ে আছে। আমাদের আর ক'দিন। তবু কথা শোনে কই ছেলে-বৌ?

চৌধুরীরা বোঝেন সব। মুখে কিছুই বলেন না। এক মা-বাবার কষ্ট অন্য মা-বাবা বোঝেন।

ক'দিন আগে পাটনা থেকে খোকার এক ছোটবেলার বন্ধু এসে থেকে গেল দুদিন

www.BanglaBook.org

ওঁদের সঙ্গে। মিলু ছেলেটো বড়ই ভালো। ডাক্তার। পাটনাতে খুব ভালো প্র্যাকটিস মিলুর। বিয়ে থা করেনি। একেবারে একই রকম আছে। মৃণালিনী কী আদর করবেন ওকে? মিলুই যে কত আদর-যত্ন করে গেল এ-দুদিনে তাঁদের দুজনকে, তা বলার নয়। মৃণালিনীর জন্য শাড়ি, সূর্যকান্তর জন্যে ট্রাউজারের কাপড়, বাটার জুতো, সব কিনে দিল। ইলেকট্রিক টোস্টারটা খারাপ হয়ে পড়েছিল দেখে একটা টোস্টার কিনে আনল। আরও কত কী! কত বছর পর যে রসমালাই খেলেন মিলুর দৌলতে ওঁরা দুজন, আর বড় বড় কই মাছ, ধনেপাতা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে তেল-কই, তা মৃণালিনীই জানেন। সূর্যকান্তর গলায় তো কাঁটাই ফুটে গেল।

ছোটবেলায় খোকা আর মিলু একরকমই ছিল। বড় হয়ে দুরকম হয়ে গেছে। এখানেরই একটি মেয়েকে খুব ভালোবাসত। রানীকে। রানী এখন দুই ছেলের মা। এক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। কোলকাতায় আছে। মেয়েটা ভুলে গেছে, কিন্তু মিলু ভোলেনি ওকে। মৃণালিনীর মনে হয়, পুরোনো স্মৃতির জন্যেই বার বার এখানে ফিরে ফিরে আসে মিলু। বাসারীয়ার চড়ুই-ভাতির জায়গাতে গিয়ে দুপুরে ঘুরে বেড়ায়। একা একা। রানীদের বাড়ী, এক রাজস্থানী ব্যবসায়ী কিনে নিয়েছেন। তবু এখনও সকাল-বিকেল সে বাড়ির সামনের পথ দিয়ে পায়চারি করে ও। ছেলেটা গভীর।

জীবনে অনেক দুঃখ পাবে। ভাবেন মৃণালিনী।

মিলুর কাছে মৃণালিনী ও সূর্যকান্ত তাঁদের সমস্ত অভাব অসুবিধে অতি সাবধানে গোপন করে রেখেছিলেন। বলেছিলেন, এখানে চাকর মোটে পাই না, বুঝেছ বেটা। এ কোনো বাহানা নয়। নইলে, খোকা তিনটে চাকর রেখে দিত আমাদের জন্যে। কাজের লোকগুলোও সব হতভাগা। যদি বা আসে তো দুদিন থেকেই পালায়।

লোক না-রাখতে পারার অক্ষমতাকে নানা অজুহাতেই ঢেকে রেখেছিলেন। মিলুর কাছে থেকে ওঁরা। অন্য সব অক্ষমতাকেও।

মৃণালিনী বলতেন বটে, কিন্তু মিলুর মুখ দেখে মনে হতো, মিলু যেন ওঁর কথা সব বিশ্বাস করছে না। ছেলেটা সব শুনতো আর কেমন অবিশ্বাসী চোখে চেয়ে থাকত মৃণালিনীর দিকে।

যাই হোক। যে ক'দিন ছিল, খুব হৈচৈ হয়েছিল। কত পুরনো দিনের গল্প, খোকা আর সুধার ছোটবেলার কথা; এইই গল্প। কত মজার কথা। গরমের ছুটিতে আম খাওয়া। ওদের সখের থিয়েটার, বাইরে, চাঁদোয়ার নীচে, গালিচা বিছিয়ে; হ্যাজাক জ্বালিয়ে। তখন ইলেকট্রিসিটি ছিল না। কিন্তু অনেকই আলো ছিল মনের মধ্যে।

বাড়ির হাতায় ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছে একটানা। টর্চের আলোটা কি সত্যিই? বাইরে যেন কার পায়ের শব্দও পেলেন মৃণালিনী। এবারে জোরালো টর্চের আলো।

অতিথি-অভ্যাগত কেউ এলেই ভয় করে বড়। কী খাওয়াবেন? কী দিয়ে আতিথেয়তা করবেন? ভেবেই আতঙ্কিত হন।

একদিন এমন ছিল, যখন অতিথি এলে ওঁরা সত্যিই খুশি হতেন। আজ ভীত হন।

টর্চের আলোটা আরও জোর হলো। কে যেন কোলাপসিবল গেট ধরে ঝাঁকালো।

সূর্যকান্ত নির্বিকার। কল্পিত প্রতিপক্ষকে জব্বর দান দিয়েছিলেন এইমাত্র। তারপর উল্টোদিকের শূন্য চেয়ারের দিকে মনোযোগ সহকারে চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। যেন সিদ্ধেশ্বর বসে আছেন উল্টোদিকের চেয়ারে। সিদ্ধেশ্বর তার ছোটবেলার বন্ধু, তাস খেলার বন্ধু। সিদ্ধেশ্বর চলে গেছেন গত মাসে। সেরিব্র্যাল অ্যাটাকে। চার ঘণ্টার মধ্যে।

www.BanglaBook.org

পালিয়েছে শালা!

মনে মনে সূর্যকান্ত বললেন।

এই ঠাণ্ডা, নির্জন, অপমানকর, অবসরপ্রাপ্ত অভাবী জীবনের গ্লানি থেকে পালিয়ে বেঁচেছে শালা!

মাইজী!

কে যেন ডাকল।

মৃণালিনী বললেন, কে?

সূর্যকান্ত শুনতে পেলেন না কিছু। ফিরতি দান দিলেন।

বাইরে চমনলাল কোম্পানির ড্রাইভার জাগগু সিং দাঁড়িয়েছিল। সে হাত বাড়িয়ে একটা খাম দিল মৃণালিনীকে।

বলল, সাঁহাব, হামারা হাঁথসে ভেজিন। প্যাসেঞ্জার লেকে আভভিহি ম্যায় টাটাসে আয়া।

এই ট্যাকসি-ড্রাইভারের হাতে মাসে মাসে চিঠি পাঠায় খোকা।

মৃণালিনী ভদ্রতা করে বললেন, বসবে না জাগগু? বড়ই শীত পড়েছে। চা খাও একটু?

মৃণালিনী জানেন, যতটুকু দুধ আছে তাতে কাল সকালে ওঁদের চায়ের মতই হয়ত হবে না। কিন্তু তাহলে কী হয়? উনি হলেন গিয়ে টাটানগরের সান্যাল সাহেবের মা। উনি কী গরিব হতে পারেন? হলেও তা দেখাতে পারেন কি কারো কাছে?

জাগগু সিং ভাগ্যে সবিনয়ে বলল, নেহী মাতাজী। আভভি, চায়ে পী কর আঁয়ে।

জাগগু সিং-এর হাতে চিঠি পেয়ে দুজনেই বড় আশ্বস্ত হলেন।

খোকার চিঠি এলেই সূর্যকান্ত তা জোরে জোরে পড়েন, মৃণালিনী তাঁর চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে চেয়ারের হাতলে হাত রেখে শোনেন। প্রত্যেকটি প্রত্যেকটি শব্দ। উৎকর্ণ হয়ে।

চিঠি দেখেই সূর্যকান্তর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তাস রেখে বললেন, চিঠি এসেছে? দাও দাও ; আমাকে দাও। কী লিখেছে আবার বেটা দেখি?

মৃণালিনী, সূর্যকান্তর পাশে দাঁড়ালেন। বললেন, চিঠিটা পড়ো, বৌমার জ্বরটর বাড়লো না তো। হঠাৎ রাত করে চিঠি পাঠাল। পড়ো পড়ো, তাড়াতাড়ি পড়ো।

সূর্যকান্ত চিঠিটা খুলেই জোরে জোরে পড়তে লাগলেন।

BanglaBook.org

নীলডি
জামশেদপুর
২০/১২/৮৩

বাবা,

এখুনি জামশেদপুর ফিরলাম কলকাতা থেকে। পরশু কলকাতা গেছিলাম, কারণ জয়তীর দিদি-জামাইবাবুর বিয়ের অ্যানিভার্সারি ছিল। এসেই আপনার চিঠি পেলাম ও পাটনা থেকে মিলুর চিঠি।

মিলু যেভাবে আমাকে লিখেছে তাতে এ সম্বন্ধে আমার কোনোই সন্দেহ নেই যে, নিজেদের অভাব-অসুবিধার কথা ওর কাছে বলেছেন। হয় মা, নয় আপনি। অথবা দুজনেই। আমি যে আপনাদের কত খারাপ ছেলে, আমি যে আপনাদের প্রতি কোনো কর্তব্যই করি না, এসব প্রচার করেছেন। নইলে ওর এত বড় সাহস হতো না আমাকে এই সব লেখার। মানে, যা ও লিখেছে।

যাই হোক। মিলুর চিঠি পড়ে জয়তী তো রাগে প্রায় পাগলের মতো হয়ে গেছে। ও

www.BanglaBook.org

চিরদিনই আমাকে বলেছে, আপনাদের জন্যে কিছুই না করতে। আপনাদের কোনো রকম দায়িত্বই আমাদের নয়। আজকালকার কোনো ছেলে এ দায়িত্ব নেয় না। নেওয়াও সম্ভব নয়।

আপনাদের জন্যে আমি যা করেছি, জোর করেই করেছি, জয়তীর মতের ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে। এখন দেখছি, ভুলই করেছি।

আমার এখানে নানা রকম অসুবিধা। "মৌকে" এই মাস থেকে পিয়ানো শেখাবো ঠিক করেছি।

আপনারা আপনাদের ছেলেমেয়েকে যেভাবে মানুষ করেছিলেন আমরা সেই রকম জন্তুজানোয়ারের বাচ্চার মতো ছেলেমেয়ে মানুষ করার কথা ভাবতেও পারি না।

এই মাস থেকে আপনাদের আমার পক্ষে পঞ্চাশ টাকার বেশি পাঠানো সম্ভব হবে না। আমার কিছুই করণীয় নেই। গত দশ বছরে আমি আপনাদের জন্যে যা করেছি তাতে আপনারা আমাকে "মানুষ" করতে যা করেছিলেন তা শোধ হয়ে গেছে বলেই আমার বিশ্বাস।

আমার এই মানসিক অবস্থাতে আর কিছুই লেখা সম্ভব নয়। ইতি—ক্ষমাপ্রার্থী

—আপনার খোকা

সূর্যকান্ত প্রথম দিকে খুব জোরে জোরে চিঠিটা পড়তে আরম্ভ করেছিলেন। কানে কালা হবার পর ওঁর গলার স্বর অনেকই জোর হয়ে গেছে। কিন্তু চিঠিটা যতই পড়তে লাগলেন, ততই তাঁর গলার স্বর নেমে আসতে লাগল।

চিঠিটা পড়া শেষ করেই চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন সূর্যকান্ত।

বেশ কিছুক্ষণ পর মৃণালিনীর দিকে চাইলেন একবার। দেখলেন মৃণালিনীর দু-চোখ বেয়ে জল ঝরছে ঝরঝর করে।

বহুদিন, বহু যুগ যুগ পরে, সূর্যকান্ত মৃণালিনীকে হাত ধরে কাছে টানলেন। তারপর নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। অস্ফুটে কী সব বললেন।

বোঝা গেল না।

অনেকক্ষণ পর সূর্যকান্ত বললেন, মিনু, আমি চাই যে তুমি মরো। তুমি মরে বেঁচে যাও। আমি তোমাকে টানাটাড়ের শ্মশানে রওয়ানা করিয়ে দিয়ে তারপরই যাব। তুমিই আগে যাও।

মৃণালিনী অস্ফুটে বললেন, এমন করে বোলো না।

আমি চলে গেলে, পেনসানের টাকাটাও যে বন্ধ হয়ে যাবে।

গলা বুঁজে এল সূর্যকান্তর। সে কথা বলতে বলতে।

মৃণালিনী মুখে কিছুই বলতে পারলেন না। শুধু মাথাটা ডান দিকে বাঁ দিকে নাড়াতে লাগলেন।

বাইরে একটা পেঁচা ডেকে উঠল জোরে।

এটা লক্ষ্মী পেঁচা নয়। হুতোম পেঁচা।

লক্ষ্মী পেঁচারা আর এখানে আসবে না।

কোনদিনও।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাইয়ানী

একটা তিনছক আছে।

বালিয়াড়ি আর ঝাউবনের ভিতর দিয়ে দীর্ঘ কালো কালো কালনাগের মতো একটা পিচ-বাঁধা পথ এসেছে ইনসপেকশান বাংলোর কাছে। অন্য পথটা চলে গেছে ওড়িশা ট্যুরিজম ডেভালাপমেন্ট করপোরেশানের পান্থনিবাস, আর আই-টি-ডি-সির অশোক ট্রাভেলার্স লজ হয়ে পিপিলির দিকে।

মোড় থেকে আর একটা রাস্তা চলে গেছে ব্ল্যাক পাগোডার পদপ্রান্তে।

রোদ পড়লে, হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। পথটা খুবই নির্জন। মাঝে মাঝে ঝাউ-এর কাটা ডাল ভর্তি করে দু একটি মন্থর গরুর গাড়ি নয়ত কচিৎ ক্যাঁচোর-কোঁচর শব্দতোলা সাইকেল ঝাউবনের মর্মরধ্বনির শব্দকে ডুবিয়ে দিয়ে, নির্জন নিটোল শান্তিকে ছিদ্রিত করে চলে যায়। ঝাউ-এর বনে বনে ফল এসেছে এখন। ক্ষুদে ক্ষুদে কাঁঠালের মতো দেখতে ফলগুলো। গাছে ঝুলে আছে। মাটিতে পড়ে আছে।

ঝাউ-এর ফল থেকে গাছ হয় না। এই ফল শুকিয়ে ফাটিয়ে এ থেকে বীজ বের করে তারপর দু তিন গ্রীষ্মের খরা সেই বীজকে খাইয়ে তবেই ঝাউ-এর চারা করা সম্ভব।

ট্রাভেলার্স লজ-এর বেয়ারাটি বলেছিল।

আমার মুখ যেদিকে, সে দিকে সমুদ্র। সমুদ্রর বাঁ দিকে চন্দ্রভাগার নীল দহ। যে নদীতে বহু বহু বছর আগে কৃষ্ণপুত্র শাম্ব চান করে কুষ্ঠরোগমুক্ত হয়েছিলেন। সমুদ্রতীরে এসে পীচ রাস্তাটা একটি আশী ডিগ্রি বাঁক নিয়ে ডানদিকে চলে গেছে। চওড়া, উড়াল পীচ রাস্তা। বাঁদিকে সমুদ্র, ঝাউবন। ডানদিকেও বালিয়াড়ি আর ঝাউবন। এইই নতুন মেরিন-ড্রাইভ। পথে একটি ব্রিজ হতে বাকি আছে। যখন ব্রিজটি হয়ে যাবে, তখন পুরী আর কোনারকের দূরত্ব একেবারেই কমে যাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সমুদ্রতীরে এসে দাঁড়ালাম। আজ প্রকৃতি উদ্দাম। সাইক্লোনিক আবহাওয়ার সংকেত থাকাতে কোনো জেলে-নৌকাই জলে নামেনি সকাল থেকে। দূরের জেলেবস্তীতে জেলেরা তাদের মসৃণ উজ্জ্বল কালো উরুতে ঘষে ঘষে, পাক দিয়ে দিয়ে জাল বুনছে। মেয়েরা নানারকম কাজ করছে।

ওরা নিজেরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলে অনুচ্চস্বরে, তখন গরমের দুপুরবেলার তৃষিত মোরগ-মুরগীর কথোপকথনের কথা মনে পড়ে যায় আমার। জনশূন্য দীর্ঘ সমুদ্রতীরে শুধু একজোড়া "সমুন্দর-চড়াই" কোমর দুলিয়ে, লেজ নাচিয়ে, ঝাঁকি মেরে মেরে হেঁটে বেড়াচ্ছে। এই ভরা বর্ষায় নোনা জলের গন্ধে, বালিয়াড়ি আর ঝাউবনের শী-শী হাওয়ার শব্দের পটভূমিতে ওদের এই আশ্চর্য চমকে চমকে হাঁটাতে এক যাযাবর যৌনতা উড়ছে অনুক্ষণ, সামুদ্রিক হাওয়ায়।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফেরার পথ ধরলাম। আজ সূর্যমন্দিরে শেষ সূর্যের সূর্যপ্রণাম দেখব। সূর্যদেবতার পায়ে মাথা ছুঁইয়ে দিনের প্রথম রোদ যেমন করে পৃথিবীতে দিন আনে, তেমনি করেই শেষ রোদ রাত নামায়।

সে নাকি এক দারুণ দৃশ্য।

কিছুদূর হাঁটার পরই দেখি দুটি হিপিনী হেঁটে আসছে এদিকে। সঙ্গে কোলবালিশের মতো অদ্ভুতাকৃতি দুটি ব্যাগ নিয়ে। কাঁধেও ব্যাগ ঝুলছে দুজনের। একজনের পরণে শতচ্ছিন্ন জিনস। উপরে গুরু পাঞ্জাবী। অন্য জনের নিম্নাঙ্গে একটি লাল ঘাঘরা। ঊর্ধ্বাঙ্গে গুরু পাঞ্জাবীই।

আমাকে দেখে মেয়ে দুটি বলল, এদিকে কোনো ফ্যামিলি হাউস আছে?

আমি এখানে মাত্র কালই এসেছি। বলতে পারবো না, ঠিক।

ফ্যামিলি হাউস কেন, কোনোরকম বাড়িই তো চোখে পড়ল না পথে, একটু এগিয়েই একটা ছোট ঝুপড়ি মতো ছাড়া, যার বাইরের দেওয়ালে দুর্গাবাড়ি না কি যেন লেখা আছে। তবে, লোকজন থাকে কি? জানি না।

একটা গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল উল্টোদিক থেকে। মেয়েদুটির মধ্যে একজন বলল, "দোজ বাস্টার্ডস"।

কিন্তু আমার কাছে কোনো সাহায্য বা উপকার চাইল না ওরা। পশ্চিমের মানুষদের চরিত্রে সাহায্য প্রার্থনা বা করুণা প্রার্থনা অত্যন্ত বেমানান।

গাড়িটা স্পীড কমাল কিন্তু আমাকে দেখেই বোধহয় দাঁড়াল না আর।

দেখলাম, ভিতরে চার-পাঁচটি অল্পবয়সী ছেলে। কামার্ত হায়নার মতো কর্কশ দলবদ্ধ চিৎকার ছুঁড়ে দিয়ে প্রমত্ত অবস্থায় তারা চলে গেল। মেয়েদুটি সম্বন্ধে ওড়িয়াতে অশ্রাব্য কিছু কথা বলে।

বোধহয় কাছাকাছি বড় শহর থেকে এসেছে। আজ শনিবার।

দেশবাসীর ব্যবহারে লজ্জিত হয়ে আমি ওদের উপকার করার জন্যে বললাম, "মে আই হেলপ উ্য"?

প্রথম মেয়েটি নৈর্ব্যক্তিক গলায় বলল, ফ্যামিলি-হোম।

ফ্যামিলি-হোম কোথায় তা জানি না। রাত হয়ে আসছে। যদি জায়গা না পাও, তাহলে ট্রাভেলার্স লজ-এ এসো। থাকতে পারো। টাকা না থাকে, তো একরাত আমার অতিথি হয়েই থেকো। ভারতবর্ষের লোক খুব অতিথিপরায়ণ।

প্রথম মেয়েটি বলল, হাত জোড় করে, নমস্কারম। ওনলি ফ্যামিলি হোম, উই ওয়ান্ট।

www.BanglaBook.org

আমার ওখানেই থাকো না কেন?

আমি ঔদার্য দেখিয়ে বললাম।

ওরা বলল, উই আর নট বেগারস।

হোয়ার ইউ ফ্রম?

আমি জিগ্যেস করলাম।

আমি যে অনেক দেশ এবং খুব সম্ভব ওদের দেশও দেখেছি এ কথাটি প্রচার করার ইচ্ছাটা সামলাতে পারলাম না।

"ডাজ নট রিয়্যালী ম্যাটার! উই ওয়ান্ট আ ফ্যামিলি হোম। টু স্পেন্ড দ্যা নাইট"।

বলেই, হাতনেড়ে আমাকে সামারিলী ডিজপোজ-অফফ করে দিল।

এর পরেও তাদের সাহায্য করতে যাওয়াটা অসম্মানের কারণ হতে পারে ভেবে আমি হন হন করে পা চালিয়ে এগিয়ে এলাম কোনারকের সূর্যমন্দিরের দিকে। সূর্য কখন ঝুপ করে ডুব মারবে। সূর্যরশ্মির সূর্যমন্দিরের সূর্যদেবতাকে প্রণাম না-করাটা না দেখলেই নয়। মন্দিরের চত্বরে যখন এসে পৌঁছলাম তখন আমি ছাড়া আর কেউই নেই সেখানে। কোনারকে এখন অফফ সীজন। তার উপর সাইক্রোনিক ওয়েদার। দিশী ট্যুরিস্টরা সব 'ফসলি-বটের'। শীতকালে যখন কোনোরকম অসুবিধা থাকে না, তখনই আসেন বেশি। তবে, বিদেশীরা আসেন সবসময়ই।

সূর্যরশ্মি সূর্যদেবের পায়ে মাথা রাখল কিছুক্ষণ। তারপরই সরে এল। চারপাশের ঝাউবন, বালিয়াড়ি, কাজুবাদামের ঝাড় সবকিছুর ছায়া ঘনতর হয়ে কালো প্যাগোডার গম্ভীর মৌনব্যক্তিত্বকে আরো গাম্ভীর্য দিল।

জগমোহনের দিক থেকে নাটমন্দিরের দিকে হেঁটে আসছি, হঠাৎ এক ভৌতিক উচ্চহাসিতে চমকে উঠলাম। রীতিমত ভয়ই পেয়ে গেছিলাম। পিছন ফিরে দেখি, একটি বছর উনিশ কুড়ির মেয়ে হি হি হি করে হাসছে।

আমি তার দিকে তাকাতেই সে একটি মিথুন মূর্তির দিকে আঙুল তুলে দেখালো। মূর্তিটি দেখলে সঙ্গমরতা বলে মনে হয় না নারী ও পুরুষকে। মনে হয় উনিশশো বিরাশির অলিম্পিয়াডের জন্যে অ্যাক্রোবেটিকস্-এর অনুশীলন করছে।

মেয়েটি কেঁপে কেঁপে হাসতে লাগল। তার পরনে একটি নোংরা নীল শাড়ী। কোমরে জড়ানো আর আঁচলটা বুকের কাছে ফেলা। তার পিঠ উন্মুক্ত, দুটি দারুণ সুন্দর বুকের দু পাশ উন্মুক্ত তার বুকের সৌন্দর্যের কাছে কোনারক-এর মৈথুনরত নারীদের বক্ষ সৌন্দর্য্যও ম্লান। এমন সুন্দর শরীরের এবং মিষ্টিমুখের নারী খুবই কম দেখেছি আমি। আশ্চর্য! তার মাথার চুল বব করে কাটা। যেমন করে ইংরেজি-শিক্ষিতা আধুনিকারা কাটেন।

আবারও মেয়েটি ফুলে ফুলে হাসতে লাগল। শাড়ি দুলে দুলে উঠতে লাগল। তাকে দেখে আমার হঠাৎই মনে হলো, মন্দিরগাত্র থেকে কোনো কোবাল্ট পাথরের মূর্তি জীবন্ত হয়ে নেমে এসেছে নীচে।

এমন সময় একজন গাইড কোথা থেকে এসে হাজির হলো। মেয়েটিকে ধমকে বলল, এই এ বাইয়ানী। চাল, চাল, তু কঁড় করুচি ইয়াড়ে?

জীবি, জীবি! মু এটি রহিকি কঁড় করিবি? নিশ্চয় জীবি। তাংকু সঙ্গেরে জীবি। বড্ড ক্ষুদা লাগিলানি।

রক্ত হিম করা হাসি হাসতে হাসতে মেয়েটি বলল, আমারই দিকে আঙুল দেখিয়ে।

www.BanglaBook.org

পরক্ষণেই, মিথুন মূর্তির গায়ে এক গাদা থুথু ছিটিয়ে বলল, ছিঃ! ছিঃ!

আমার গা ছম-ছম করছিল। ভাবছিলাম, মানুষের মেয়ে ত?

চত্বরের বাইরে এসে দেখি একটি পান-সিগারেটের দোকান তখনও খোলা। সে দোকানও দোকানী বন্ধ করার বন্দোবস্ত করছে।

পান আর সিগারেট কিনতে কিনতে দোকানীকে শুধোলাম, ঐ মেয়েটি কে?

দোকানী অবাক হয়ে, তাকিয়ে থাকল, একটুক্ষণ আমার মুখের দিকে। তারপর বুঝতে পেরে বলল, ওঃ। ও বাইয়ানী। ও কে তা এখনও আমরাই তেমন ভাল করে জানি না। শুনেছি, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সামনে যে মস্ত চক, যেখানে মন্দিরের চারদিকের রাস্তা ঘুরে ঘুরে এসে পড়েছে ও সেইখানেই ঘুরে বেড়াতো। কোথা থেকে এল, কার মেয়ে, পাগলই বা হলো কিভাবে, তা কেউই জানে না। তবে, কাল থেকেই দেখছি ওকে।

পুলিশে দিলে না কেন?

দোকানী বলল, পুলিশের এমনিতেই কত দায়িত্বপূর্ণ কাজ, তাদের সময় নষ্ট করার সময় কোথায়?

কালকে এখানে এল কিসে করে মেয়েটি? কার সঙ্গে এল? কেন এল?

আমি জানি না।

দোকানী দরজার পাল্লা বন্ধ করতে করতে বলল। তবে, একজন গাইড বলছিল, এক বাসের কণ্ডাকটর ভুলিয়ে ভালিয়ে ছানা-পোড় খাইয়ে, নিয়ে এসেছিল। রাতেও তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যা করবার করে, বাস নিয়ে যাবার সময় ফেলে রেখে চলে গেছে। আর কি? মাথা-খারাপ জোয়ান, সুন্দরী মেয়ে। যে তাল পাবে, সেই একবার সুখ করে নেবে।

বাংলোতে ফিরে আসতে আসতে আমার জ্বর-জ্বর লাগতে লাগল। কখনও এমন হয়নি আমার এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে। তিনু আর গুরচির কথা মনে হল আমার। আমার স্ত্রী ও ছেলে। কিন্তু সেই বাইয়ানী মেয়েটির কাছে আমার সমস্ত অতীত, আমার বংশপরিচয়, আমার সুনাম এবং আমার ভবিষ্যতের সমস্ত সম্মানের শান্তির সাধ ধূলিসাৎ হয়ে গেল এক নিমেষেই। শেষ-বিকেলের কোনারকের কালো প্যাগোডার কালো কালো অসংখ্য মিথুন-মূর্তি আর কামকেলির মধ্যে ঐ কালো জীবন্ত মেয়েটিকে আমার অনৈসর্গিক বলে মনে হয়েছিলো।

অপ্রাকৃতিক!

সে কি ঐ মন্দিরের দেওয়াল বেয়েই নেমে এলো? ক্ষণিকের জন্যে? হাজার হাজার বছর আগে কখনও কি সে আমার প্রেমিকা ছিল? যুগে যুগে সে কি আমাকেই চেয়েছিলো? নইলে সে অমন করে হাসলো কেন? দেওয়ালের মিথুন-মূর্তি দেখিয়ে? সে কথা না বলেও চোখে মুখে আমাকে অমন করে বুকের মধ্যে শিহর তুলে ডাকল কেন?

এ কথাও সত্যি যে, জীবনে আমি কোনদিনও এমন তীব্র তীক্ষ্ণ কামভাব বোধ করিনি। এত জ্বালা। কেউ আমার বোধের কেন্দ্রমূলে যেন একটি উত্তপ্ত ছুরি আমূল বিদ্ধ করে দিয়েছিল। কী অস্বস্তি! কী অবিশ্বাস্য জ্বালা, সারা শরীরে! বুঝলাম, জ্বরটাও এই জ্বালারই জন্যে। এ অন্য জ্বর নয়, কাম-জ্বর।

লজে ফিরেই, শাওয়ার খুলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম শাওয়ারের নীচে। শাওয়ারের জলের ফিনকি শরীরের ঘাম ধুতে পারে, সুগন্ধি সাবানের ফেনা ধুতে পারে, কিন্তু কাম ধুতে পারে না। কাম কেবল নিবৃত্তিতেই তৃপ্ত হয়, অন্য কিছুতেই নয়।

www.BanglaBook.org

চান সেরে বারান্দায় এসে বসলাম। আজ দ্বাদশী বা ত্রয়োদশী হবে। চাঁদ উঠেছে সামুদ্রিক ঝোড়ো হাওয়ায় চুল উড়িয়ে। চাঁদের আলোয় ঝাউবন যেন দোলনা দুলছে।

আমার ঘরটা খুবই নিরিবিলি। এক নম্বর ঘর। ম্যানেজার মিস্টার রায় দেখে শুনেই দিয়েছেন, যাতে লেখা-পড়ার অসুবিধে না হয়। পুবে আর দক্ষিণে জানালা। বাইরে চওড়া বারান্দা। বারান্দার পর অনেকখানি কম্পাউণ্ড। নীচে দেওয়াল তোলা। উ্যক্যালিপটাস, ঝাউ, ঝোপ-ঝাড়। ঐ বালি আর জমির মধ্যে বোগোনভিলিয়া ছিল। পাতাই হয়েছে একগাদা। ফুল নেই। মালিটা বোধ হয় খুব জল ঢালে। কোনো ফুল আদরের জলদানে ফোটে, কোন ফুল রুক্ষতায়, পাথরে, অনাদরে। এই তথ্যটিই যার জানা নেই, সে মালী হবে কী করে? ফুল ফুটানো কি সকলেরই আসে? এতই সোজা?

বারান্দায় চেয়ারে বসে অনেক কথা ভাবছিলাম। মনটাকে, শরীরটাকে শান্ত করতে চাইছিলাম। কিন্তু পাগলী মেয়েটা আমাকেও পাগল করে দিয়ে গেছে।

কী করি, কেমন করে তাকে কাছে পেতে পারি, তাকে যত্ন করতে পারি, এই বাংলোতে এনে সুখে রাখতে পারি পাশের ঘরে? আহা। ভাল খেত, ভাল ঘুমোত। শাড়ি জামা কিনে দিতে পারতাম। তার মা বাবার খোঁজ করার চেষ্টাও করতাম। তাকে শারীরিকভাবে পাওয়াটা হয়ত এখন আর সম্ভব নয়। আমি সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত, ঠিকানা সর্বস্ব নামী এক ভদ্রলোক। আর ও পরিচয়হীন, ধুলিমলিন, উকুনচুলের একজন পথের পাগলি।

সম্ভব নয়, এখানে এখন নয়। কখনওই নয়।

হয়ত সম্ভব। তবে লোক চক্ষুর অন্তরালে। মুখোশটা খুলে রেখে। বিবেক ব্যাটাকে ভাঙ-এর গুলি খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে। যা কিছু সম্মানের সঙ্গে, মাথা উঁচু করে নিজের ঠিক-ঠিকানা জাহির করে পাওয়া যায় না অথচ পেতে বড়ই ইচ্ছা করে, তাকে পেতে হয় ভণ্ডামির মধ্যে দিয়েই, ভান করে, নামগোত্র পরিচয় ভাঁড়িয়ে, নির্জনে। ভণ্ডামি আর ভাঁড়ামির আরেক নামই তো সভ্যতা!

বেল দিয়ে বেয়ারাকে ডাকলাম। বেয়ারা এসেই বারান্দার সুইচ টিপে আলো জ্বালাল। আমি নিভোতে বলে দিলাম। এমন সুন্দর চাঁদ-ওড়া পাখি-ভাসা রাত! এমন রাতে কেউ বিজলী বাতি জ্বালে? ওকে জিজ্ঞেস করলাম ঐ বাইয়ানীটি সম্বন্ধে ও কিছু জানে কি না?

ওর নাম প্রফুল্ল। ও বলল, জানে না।

উল্টে ও জিজ্ঞেস করল, কেন হঠাৎ ও কথা জিজ্ঞেস করছি আমি।

বললাম ওকে। যতটুকু বলা যায়। যাকে বলে, শাকে মাছ ঢেকে।

আমাদের সারাদিন তো এখানেই কেটে যায়। বেরুতে পারি কই? বাইরের খবর আর রাখি কোথায়?

আজ কি খুব গরম?

আমি শুধোলাম প্রফুল্লকে।

না তো! আজ তো রীতিমত ঠাণ্ডা। কালকে সাইক্লোন আসতে পারে। সারাদিন তো মেঘই ছিল, ঝোড়ো হাওয়া, মেঘলা। বিকেলের দিকেই শুধু একটু উজলী হলো।

আমি বললাম, একটা বীয়ার পাঠিয়ে দিতে বলো তো বারম্যানকে। বড় গরম লাগছে আমার।

বারম্যান নেত্রানন্দ নিজে এল বীয়ার এবং বরফ নিয়ে। বারান্দাতে চাঁদের আলোয় সব ঠিকঠাক করে দিয়ে সেলাম করে চলে গেল।

বীয়ারে চুমুক দিতে দিতে আমি সামনের সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ঝাউবন আর কাজুবাদামের

www.BanglaBook.org

বন আর বালিয়াড়ির দিকে চেয়ে রইলাম। লাঙুলা নরসিমাদেব, পূর্ব গঙ্গা ডাইনাস্টির রাজা এই সূর্য-মন্দির বানিয়েছিলেন বারোশো খ্রীষ্টাব্দে। তার মন্ত্রী শিব সামন্ত রায়, বারোশো ভাস্কর এবং খোদাইকারকে দিয়ে ঠিক কতদিন ধরে এই সূর্যমন্দির বানিয়ে ছিলেন তা কেউ সঠিক জানেন না। বিদেশী নাবিকরা সমুদ্র বেয়ে তাদের জাহাজে করে ভাসতে ভাসতে চলে যাবার সময়ে এই ব্ল্যাক প্যাগোডার সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে যেত। বাৎসায়নের কামসূত্র, কোকোকার রতিশাস্ত্র, কল্যাণমল্লর অনঙ্গ-রঙ্গ এবং শেখ নেকজ্যউইর পারফ্যুমড গার্ডেন যেন মূর্ত হয়ে রয়েছে এই আশ্চর্য মন্দির গাত্রের পাথরে পাথরে।

লোকে বলে যে, ব্রিটিশরা যদি আগে তাজমহলকে না দেখতেন তাহলে কোনারক-এর মন্দিরকে তাজমহলের চেয়েও উঁচুতে স্থান দিতেন। মানে। তবে, কোনারকের মান ও সম্মান এখনও তাজমহলের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। সকলেই এই মন্দিরের সম্বন্ধে একটি কথা ভেবে অবাক হয়ে যান যে, তখনকার দিনে যখন যাতায়াত ব্যবস্থা ও যন্ত্রযান বলে কিছুই ছিল না, তখন অত বড় বড় পাথরের চাঁইগুলোকে অবিকৃত ও অক্ষত ভাবে বয়ে আনা হলো কিভাবে?

বিখ্যাত এঞ্জিনীয়ার মনোমোহন গাঙ্গুলী তাঁর "ওড়িষ্যা এণ্ড হার রিমেইনস" বইতে লিখেছেন "ইট ইজ ও ম্যাটার অফ গ্রেট ওয়ানডার এ্যাজ টু হাউ সাচ হেভী স্টোনস এ্যান্ড আইরন বীম কুড বি রেইজড টু গ্রেট হাইটস বিফোর দ্যা ইনভেনসন অফ স্টীম এঞ্জিন, ওয়্যার-রোপ, ডেরিক এ্যান্ড পুলি ব্লকস।"

কোনারকের পুব দিকের প্রবেশদ্বারের কাছে একটি কারুকার্য করা পাথর ছিল তাতে সপ্তাহের সাতটিদিন সম্বন্ধে নানা কারুকার্য করা ছিল। শুধু সেই জায়গার পাথরটিকে (বড় বড় পাথরের কথা বাদই দেওয়া যাক) ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কোলকাতার মিউজিয়ামে স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করেন তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের তাবৎ শক্তি প্রয়োগ করেও এই বালিময় জায়গাতে সে পাথরটিকে মাত্র দুশো গজ মতো নিয়ে যেতে পারা যায়। অতএব স্থানান্তরের চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়।

অনুমান করতে কষ্ট হয় না, কিভাবে এই মহান শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। হাজার হাজার, হয়ত লক্ষ লক্ষ সাধারণ প্রজা এবং হাতী ঘোড়া মিলেই নিশ্চয়ই এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে পেরেছিল। তাদের মধ্যে কত হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছিল অনাহারে অসুখে এবং সামন্ততন্ত্রের অত্যাচারে তার হিসাব ইতিহাস রাখেনি। এমনকি ঐ ইতিহাস, এই ব্ল্যাক-প্যাগোডার যিনি প্রধান ভাস্কর, তাঁর নামও লিখে রাখা প্রয়োজন বোধ করেনি। আজকের ইতিহাসেও যেমন আঠারশ বছর আগের ইতিহাসেও তাই, শুধু রাজা লাঙুল নরসিমাদেব এবং তার মন্ত্রী শিবসামন্ত রায়ের কথাই স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

রাজা এবং রাজনীতির কারবারীরাই ইতিহাসের পাতা চিরদিন জবরদখল করে রেখেছেন এবং করছেন। এটাই এদেশীয় নিয়ম। কোনারকের সূর্যমন্দির আনন্দিত চিত্তে এবং আনন্দ বিকীরণের জন্যে দেখা দরকার কিন্তু এখানে এসে প্রথমেই আমার মনে হয়েছে . অসংখ্য মানুষের চোখের জল এই মিথুন মূর্তিগুলির মুখের স্মিতহাসির আড়ালে স্থবির প্রস্তরীভূত হয়ে রয়েছে। পিংক স্যান্ড স্টোন আর সফট ডার্ক-গ্রীন ক্লোরাইট শিস্ট পাথরে তৈরী এই প্যাগোডার মিথুনমূর্তিগুলি একদিন রোদে জলে ঝড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, কিন্তু ব্ল্যাক-গ্রানাইটের কালো অন্ধকারের মধ্যে যতদিন কোনারক বেঁচে থাকবে, ততদিন সেই অনামা অপ্রশংসিত লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখের জলে লিপ্ত থাকবে এই সূর্যমন্দির। ঝাউবনের কান্নায় এবং বালিয়াড়ির দীর্ঘশ্বাসে সেই সব মানুষের আত্মারা চিরদিন ঘুরে

www.BanglaBook.org

বেড়াবে এই মন্দিরের আশেপাশে।

বাইয়ানী! বাইয়ানী! বাইয়ানী রে!

রাতে আমার ঘুম আসছিলো না। কেবলই এপাশ ওপাশ করছিলাম খাটে। কী আশ্চর্য উজ্জ্বল চোখ মেয়েটির। কী সুঠাম বুক, কোমর। পিঠের শিরদাঁড়ার সমান্তরাল নদীখাতটি কী সাবলীলতায় এসে হারিয়ে গেছে সুন্দর নিতম্বের দুটি টিলাতে। বাইয়ানী! তুমি মানুষ নও। আমি জানি তুমি দেওয়াল থেকেই নেমে এসেছিলে আমাকে ভুলিয়ে মারতে। নিয়ে যেতে, কামজ্বরে ক্লিষ্ট করে চাঁদনী রাতের দুধলি বালিয়াড়িতে। তারপর আঁচল খসাতে খসাতে নাচতে নাচতে দৌড়তে দৌড়তে নরম বালির মধ্যে নিঃশব্দ পায়ে, আর আমাকে ছোটাতে তোমার পেছনে পেছনে। তারপর একসময় সমুদ্রের পারে নিয়ে গিয়ে ঢেউ-এর দোলায় নরম এবং না-ছোড় হাতে ধরে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিতে আমায়। কি করতে তা তুমিই জানো।

বাইয়ানী, তুমি আমার জীবনের দ্যুতি। মৃত্যুর দূতী।

হঠাৎই এক আর্ত চিৎকারে আমার ঘুম ভেঙে গেল। একটি তীক্ষ্ণ, তীব্র নারীকণ্ঠের চিৎকার। তারপরই একটা অ্যাম্বাসাডর গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ। দুজন পুরুষের উত্তেজিত সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা। তারপরই গাড়ির এঞ্জিন রিভার্স করার কর্কশ শব্দ।

আমি মশারী তুলে একলাফে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। বাইরে চাঁদ ছেঁড়া উথাল-পাতাল ফিস-ফিস হিস-হিস হাওয়ার চাঁদোয়ার নীচে উদলা রাত।

গাড়িটাকে পান্থনিবাসের বাংলোর হাতার কিছুটা দূরেই ঝাউবনের মধ্যে পীচ রাস্তায় রিভার্স করছিল ওরা। গাড়ির টেইল-লাইটের লাল জোড়া চোখ দুটি, অস্পষ্ট মেঘলা জ্যোৎস্নায় ঝাউ-এর দোলা লাগা ছায়ায় আমার সদ্য-ঘুমভাঙা চোখে কোনো প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর চোখের মতো মনে হচ্ছিল।

আমি চিৎকার করে উঠলাম বাইয়ানী বাইয়ানী!

বলেই হাতার মধ্যে দিয়ে দেওয়ালের দিকে দৌড়ে গেলাম।

প্রফুল্ল এবং নাইট গার্ডও দৌড়ে এল আমার পেছন পেছন "স্যর" "স্যর" করতে করতে।

মেয়েটির এবং আমার চিৎকারে বোধহয় লজ-এর অনেকেরই ঘুম ভেঙে গেছিল। আমার পাশের ঘর থেকে ইয়ান স্টিভেনের আর জ্যাকি ম্যাকআইভর স্লিপিং স্যুট পরেই দৌড়ে এসে আমাকে ধরল।

আমি শুনলাম, জ্যাকি বলল, ইজ হি আউট অফ হিজ মাইন্ড?

আমি প্রফুল্লকে বললাম, গাড়িটা পালিয়ে যাচ্ছে। চলো চলো, ধরি ওদের।

কিন্তু কেউই আমার সঙ্গে গেলো না। কেউই না। ওরা সকলে মিলে জোর করেই আমাকেও যেতে দিল না।

প্রফুল্ল বললো এখানে রাতে এমন করে কেউ বেরোয় না। ভয় আছে। সাপ আছে। মন্দিরে এই সময় দেব-দেবীরা নাচ করেন।

শেষ রাতে ঘুমোলাম, ঘুম আসছিলো না।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না। যখন ঘুম ভাঙল তখন অনেক বেলা। ঝকঝকে রোদ-ওঠা শ্রাবণের সকাল। যথারীতি মুখ ধুয়ে এসে বারান্দার চেয়ারে বসে চা আনবার জন্যে বললাম। চা না-আনা অবধি গত রাতে কোনো ঘটনা ঘটেছে বলে জানতেও পারিনি। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, সমস্ত বাংলোতে একটা থমথমে ভাব।

www.BanglaBook.org

চা খেতে-খেতেই আমার চোখ গেল দূরে। ঝাউবনের মাঝের পীচের পথে। সেখানে বেশ বড় একটা ভিড় জমেছে। আর পথের দু-পাশের ঝাউবনে শকুনের সারি। গলা বাড়িয়ে নীচের পিচের পথে তারা কি যেন দেখছে। উৎকট ঔৎসুক্যর প্রতীক পাখিগুলো।

বেল বাজালাম।

প্রফুল্ল এল।

ওখানে কি? প্রফুল্ল?

প্রফুল্ল জবাব দেবার আগেই ম্যানেজার এলেন। ভদ্রলোক খুব ভদ্র ও পরিশ্রমী। সমস্ত লজটি যথাসাধ্য সুন্দর করে চালাবার চেষ্টা করেন সবসময়ই। সচরাচর সরকারি ট্যুরিস্ট লজে এমন বিবেকসম্পন্ন লোক বেশি দেখিনি। পশ্চিমবঙ্গে তো নয়ই!

আপনার শরীর কেমন আছে?

ওঁর প্রশ্নের জবাব না দিয়েই আমি উঠে দাঁড়ালাম। ঐ দিকে তাকিয়ে রইলাম। স্বগতোক্তির মতো বললাম, ওখানে কি? কিসের ভিড়?

ম্যানেজার ক্ষমা-চাওয়া মুখে বললেন, একটা পাগলি এসেছিল কোথা থেকে। অ্যাম্বাসাডার গাড়ি করে আসা একদল ছেলে তাকে গ্যাঙ-রেপ করার পর ছুরি মেরে শেষ করে এখানেই ফেলে গেছে পথের উপরে। পুলিশ এসেছে। ডেডবডি মর্গে নিয়ে যাবে একটু পরেই।

আমি একটু যাবো।

আমি স্বগতোক্তির মতো বললাম।

ভাবছিলাম, কাল রাতে যে-সময়ে চিৎকারটা শুনেছিলাম ঠিক সেই সময়েই নিশ্চয়ই ঘটনাটা ঘটেছিল। পান্থনিবাসে এতলোক থাকতে আমাদের মধ্যে একজনও রাতে তাকে বাঁচাতে যাইনি।

আপনার যাওয়া ঠিক হবে না স্যার। আপনি কি ঐ বাইয়ানীকে চিনতেন?

ম্যানেজার আবার বললেন।

চিনতাম।

আমি বললাম।

বলেই, চা-এর কাপ নামিয়ে রেখেই পা বাড়ালাম। আমার মন বলছিলো, জন্ম-জন্মান্তর থেকেই যেন চিনতাম ওকে। যার সঙ্গে প্রেম ছিলো আমার। ছিলো মৈথুন।

ম্যানেজার ও প্রফুল্লও চললেন সঙ্গে সঙ্গে। ওঁরা বোধহয় আমাকে ছাড়তে চায় না একা।

প্রফুল্লর মুখ দেখে মনে হল ও যেন ভূতগ্রস্থ হয়েছে। আসলে ও আমাকেই ভূতগ্রস্ত ভাবছিলো। ও বোধহয় ভেবেছিলো, কাল রাতে আমায় "নিশিতে" ডেকেছিলো।

না গেলেই ভাল ছিল। অবশ্য না গেলে প্রায়শ্চিত্ত করা হতো না। দেখলাম, বাইয়ানীর পরনের নীলরঙা রক্তমাখা শাড়িটিকেই খুলে, তার শরীর ঢেকে দেওয়া হয়েছে।

মুখটা একটু দেখব আমি। এক সেকেণ্ডের জন্যে।

আমি বললাম। পুলিশটি ম্যানেজারের মুখের দিকে চাইলেন।

একজন পুলিশ এদিকে দৌড়ে আসতে আসতে বলল, ছেলেগুলো ধরা পড়েছে। এইমাত্র খবর এল। ভুবনেশ্বরের কাছে। গাড়িটাও ধরা পড়েছে হাইওয়েতে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে খালি পায়ের হাড় জিরজিরে একজন লোক বলল, "ধরিলেভি কঁড় হব্ব? পচারিকি দেখ্বি, দেখিবে সেমানে মিনিস্টারংকু, কী এম এল ও মানংকু পুওমান সব্বে। ধরিকি কঁড় হব্ব? গুট্রে টেলিফোন আসিবে। সেমানংকু পুলিশ ছাড়ি দেবি।

www.BanglaBook.org

আমি ভাবছিলাম, হিপিনী মেয়ে দুটি যদিও বাইয়ানীর চেয়ে অনেক বেশি নোংরা, নেশাগ্রস্তা, পাপবিদ্ধা; তবুও চামড়া সাদা বলেই তারা অক্ষত রইল। যেহেতু বাইয়ানী গরিব ভিখিরি, সহায় সম্বলহীনা, তাই নেকড়েগুলোর দলবদ্ধ কামের শিকার হল বেচারী।

পুলিশটি বাইয়ানীর মুখে কাপড়টা সরালো একটু। মুখে কামড়া-কামড়ির কালসিটের দাগ। কিন্তু আশ্চর্য! চোখে কোনোই আতঙ্ক নেই বরং এক আশ্চর্য ক্ষমাময় হাসি লেগে আছে। বাইয়ানীর মুখ পশ্চিম দিকে যেদিকে সূর্যমন্দির। যে দেবতার পায়ে প্রণাম করে সূর্য এখন তার সাতরঙা সাততি ঘোড়ার রথে চড়ে অনেক পথে চলে গেছেন অয়নপথে।

কোনারকের মন্দিরের দিকে তাকালাম। চোখ জ্বলছিল আমার। মূর্তিপুজোয় বিশ্বাস করি না আমি। কিন্তু ঈশ্বরে করি। সেই ঈশ্বরে, যে ঈশ্বর, এই মন্দির বানাবার সময় লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুকে উপেক্ষা করেননি, যাঁর কাছে লাঙুল নরসিমাদের তাঁর মন্ত্রী শিব সামন্ত রায় আর সেই নামহীন গোত্রহীন ইতিহাসে অনুল্লেখিত লক্ষ লক্ষ মানুষগুলি সবাইই সমান। কাল রাতের দ্বিতীয় যামে যমরূপী ছেলেগুলো, যারা এ যুগের সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ, তারাও তাদের কামের কানীন নখরাঘাতে এই দুখিনী বাইয়ানীকেও হাজার হাজার অনামা অনুল্লেখিত মানুষের ভিড়ে মিশিয়ে দিয়ে গেল। মিষ্টি মুড়কিকে, নোন্তা মুড়ির সঙ্গে। মন্দিরের সৌন্দর্য বাড়ল। বাইয়ানীও সেই কালো-কোলো সাধারণ উদোম গায়ের মানুষগুলোর অদৃশ্য ভিড়ের মধ্যে কেমন মিশে গেল, একটি মাত্র আর্ত চিৎকার রাতের বোড়ো হাওয়ায় ঝাউবনে উড়িয়ে দিয়ে।

প্রণাম করলাম আমি। মন্দিরকে নয়! বাইয়ানীকে।

ছেলেগুলো জানে না, ওদের বদলে আমিই কাল এই ঘৃণীত দুষ্কর্ম করতাম হয়ত। কারণ আমি তো ওদেরই সমাজের একজন। আমরা তো এই-ই করে এসেছি চিরদিন। অন্তত করতে চেয়েছিলাম। এবং করলে, যেহেতু আমি ভদ্রলোক, মানী লোক, সেই হেতু পাছে বাইয়ানী কাউকে এ কথা বলে দেয় এই ভয়ে তাকে যে করেই হোক খুনও হয়ত করে ফেলতাম বালিয়াড়িতে। ঝাউবনে। তারপর পুঁতে দিতাম ওর লাশ পাছে আমার মান সম্মান না প্রোথিত হয়।

আমি বেঁচে গেলাম। মরল বাইয়ানী এবং ছেলেগুলোও।

ছেলেগুলো এখনও দাগী হয়নি, আমার মতো ধাউর হয়নি। তাই-ই ধরা পড়ল। চিরদিন বোকারাই তো ধরা পড়ে।

সবাই ভুলে যাবে ধূর্ত-ধাউরদের ইতিহাস। যারা মন্দির বানিয়েছিল এবং পাথর বয়ে এনেছিল সেইসব অনভিজাত মানুষদের যেমন করে ভুলে গেছে সকলেই বাইয়ানীকেও সকলে ভুলে যাবে। কোনারকে মিথুন-মূর্তিদের কাছাকাছি না থাকলে পাথরে-গড়া মূর্তির মতো মেয়েটি হয়ত এমন করে মরতো না। মরতো ঠিকই, আস্তে আস্তে ঘা-হওয়া পথের কুকুরীর মতো; কারণ যারা বাঁচতে এসেছে আমার মতো, ও তাদের দলের নয়। মরতো ও পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের সামনে, যেখানে রোজ হাজার হাজার পুণ্যার্থী আর মহৎ প্রাণের গর্বিত মানুষদের যাওয়া-আসা।

বাইয়ানীর শক্ত হয়ে-যাওয়া, জোড়া জোড়া কামার্ত দাঁতের দাগ-ভরা স্তনযুগলের আভাস ও ক্ষরিত-রক্ত ভূলুণ্ঠিতা নিঃসাড় শরীরের দিকে চেয়ে আমার মনে পড়ে গেল যে, বাইয়ানী মিথুন মূর্তির উপর থুথু ছিটিয়ে বলেছিল ছিঃ ছিঃ।

কিছু একটা বলতে চেয়েছিল ও।

কিন্তু পাগলের মনের কথা তো পাগলরাই শুধু জানে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ম্যাথস

বাঁদরের তৈলাক্ত বাঁশে চড়ার অঙ্কই হোক, কি চৌবাচ্চার জল ফুরানোর হিসেবের অঙ্কই হোক, কোনও অঙ্কই আমার ঠিক হত না। এমনকি, সামান্য যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগেও ভুল হত।

অক্ষয়-স্যার আমাদের স্কুলের মাস্টারমশাই তো ছিলেনই, ম্যাথস-এ কাঁচা বলে বাবা ওঁকে বাড়িতেও পড়াতে বলেছিলেন আমাকে। টকটকে ফর্সা রং ছিল ওঁর। খোঁচা-খোঁচা কালো গোঁফ। ধুতি আর পাঞ্জাবী পরতেন। গায়ে একটি এণ্ডির চাদর থাকত। পায়ে পাম্প-শু্য।

টেবিলের উলটো দিকের চেয়ারে বসে আমার খাতার উপর ঝুঁকে পড়ে অঙ্কের ফল দেখতে-দেখতে ওঁর মুখ বিরক্তিতে ভরে উঠত। ভুরু কুঁচকে যেত। বলতেন, 'ই-ইটা কী?'

কখনও বা গম্ভীর গলায় বলতেন, যেন টেবিল-চেয়ারকেই বলছেন, 'আর কতবার বলতে হবে তোমাকে যে, সংখ্যাকে না বদলে তা কেটে পাশে পরিষ্কার করে লিখবে?'

আমি মুখ নিচু করে থাকতাম। ভীষণ কষ্ট হত বুকের মধ্যে!

অক্ষয়-স্যার যখন আমাকে বকতেন, মারতেনও কখনও, তখন আমার অত কষ্ট হত হত না। কিন্তু ওঁর মুখে যখনই বিচ্ছিরি বিরক্তির ভাব ফুটে উঠত, সেই মুখে আমি স্পষ্টই পড়তে পারতাম, আমি একটি গাধা এবং উনি আমাকে নিয়ে রীতিমতই নাজেহাল। অথচ ট্যুইশানিরও দরকার নিশ্চয়ই ছিল তখন ওঁর। তাই বলতেও পারতেন না বাবাকে যে, আমাকে আর পড়াবেন না।

ওঁর একমাত্র ছেলে গোপেনদা ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিলেন। ওঁর জন্যে অক্ষয়-স্যারের গর্বের অন্ত ছিল না।

উনি চলে গেলে অনেকক্ষণ একা ঘরে আমি বসে থাকতাম। নিজের উপর বড়ই রাগ

www.BanglaBook.org

হত। অথচ কী করব? অঙ্ক আমার একেবারেই ভালো লাগত না। কবিতা লিখতে, ছবি আঁকতে, গান গাইতে ভালো লাগত। কিন্তু ওইসব তো গুণের মধ্যে পড়ত না। যে-গুণ ভাঙিয়ে টাকা রোজগার না-করা যায়, তা কি আর গুণের মধ্যে পড়ে?

বাবা অফিস থেকে ফিরলেই শব্দ পেতাম। গ্যারাজ ছিল একতলাতেই, আমার পড়ার ঘরের পাশেই। অফিস থেকে ফিরেই বাবা একবার আমার ঘরে ঢুকতেনই। বলতেন, খোকন, কেমন হচ্ছে পড়াশোনা? পরীক্ষা তো এসে গেল। কোনওদিন বলতেন, আমি তো জানিই, তুই স্কলারশিপ পাবিই। তবে স্ট্যান্ড করলে আরও খুশি হব।

বাবাকে আমি ভালোবাসতাম খুবই। কিন্তু আমার সম্বন্ধে বাবার এমন উঁচু ধারণায় কুঁকড়ে যেতাম। আপত্তিও করতে পারতাম না। বলতে পারতাম না যে, আমি হয়তো ফার্স্ট ডিভিশনই পাব না।

নিজের ছুঁড়ে-দেওয়া কথাতে নিজেই খুশি হয়ে, দোতলায় উঠে যেতেন বাবা আমাদের ফক্স-টেরিয়ার কুকুর 'ম্যাডা'কে আদর করতে করতে। বাবার গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ পর্যন্ত চিনত ম্যাডা। গাড়ি যখন রাস্তায় এবং আর কেউই যখন বুঝতে পর্যন্ত পারত না, ম্যাডা তখন উত্তেজিত গলায় ডাকতে-ডাকতে দোতলা থেকে তার পায়ের নখে খচর-খচর আওয়াজ করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে তড়িৎগতিতে নেমে এসে গ্যারেজের সামনে ছুটোছুটি করত।

বিহারের মধুবনী জেলার এক রং-রুট ড্রাইভার সুরজনারায়ণ ঝা, অতি-উত্তেজিত ম্যাডার একটা পায়ের উপর চাকা তুলে দিয়ে সামনের বাঁ পাটাকে একবার প্রায় ভেঙেই দিয়েছিল একদিন।

বাবা উপরে চলে যাওয়ার পর আরও খারাপ লাগত। অক্ষয়-স্যার পড়ালে গোরু-গাধাও নাকি ফার্স্ট ডিভিশন পায়। আমি অন্য সব বিষয়ে খুব ভালো না হলেও, অঙ্কের মতো অতটা খারাপ ছিলাম না। তাই অঙ্কের দায়িত্ব অক্ষয়-স্যারের হাতে তুলে দিয়ে বাবা নিশ্চিন্ত হয়ে যা খুশি তাই ভাবছিলেন।

বন্ধুদের কাছেও শুনতাম যে, অন্যের সকলের বাবাও নাকি ওইরকমই বলতেন। প্রত্যেকের মায়েরাই বলতেন, 'তোর বাবা কোনওদিন ক্লাসে সেকেন্ড হননি। আর তুই?'

আমার বন্ধু প্রণব একদিন দুঃখ করে বলেছিল, ভেবে দ্যাখ, সকলের বাবাই যদি ক্লাসে ফার্স্ট হতেন, তা হলে ওঁদের সময়ে ক্লাসে সেকেন্ড হতেন কে বল তো?

প্রীতি বলেছিল, আর ফেলই বা করতেন কারা? আমি তো ভেবেই পাই না।

॥ ২ ॥

অক্ষয়-স্যার সপ্তাহে তিনদিন আসতেন। তাঁর বিরক্তি আর আমার হতাশা ও অপরাধবোধ ক্রমশ বেড়েই চলেছিল।

একদিন এক টিপ নস্যি নিয়েই উনি আমাকে বললেন, খারাপ-ভালোর অনেকরকম হয়, বুঝেছ? তোমার মতো ছেলে আমি আর দেখিনি। তোমার বাবা মিছেই তোমার পেছনে পয়সা খরচ করছেন। আমি এবার তোমার বাবাকে বলব। তোমার মতো দু-চারটি ছাত্র পেলেই আমার এতদিনের সুনাম ডুববে। এত সোজা অঙ্ক, তাও তুমি...

আমি মাথা নিচু করেই ছিলাম। অনেক ছেলে, বাবা-মায়ের কাছে রিপোর্ট লুকোয়, পাছে তাঁরা মারেন, বকেন। আমি কখনই লুকোইনি। অক্ষয়-স্যার আমার কথা বাবাকে বলে

www.BanglaBook.org

দিলেও বাবা আমাকে কিছুই বলতেন না, কিন্তু বড় দুঃখ পেতেন নিশ্চয়ই। বাবাকে ভালোবাসতাম বলে বাবা দুঃখ পান, তাও চাইতাম না। অথচ আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেও তৈলাক্ত বাঁশে বাঁদরের ওঠার অঙ্ক বা চৌবাচ্চার জল ফুরনোর অঙ্ক কিছুতেই করতে পারতাম না। সেই সময় কোন রবীন্দ্রসঙ্গীতের কলি কানের পাশে ঘুরঘুর করত। চোখের সামনে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক'-এর রাজা দোবরুপান্না বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'র হোসেন মিঞার মুখ ভেসে উঠত! অ্যালজেব্রাও একদম ভালো লাগত না। জিওমেট্রি একটু ভালো লাগত। মনে হত ছবি আঁকছি। কিন্তু থিওরি এলেই মাথা একেবারে গোলমাল হয়ে যেত। আমি পরীক্ষায় ভালো ফল না করলে যে বাবা দুঃখ পাবেন—এই কথাটা ভেবেই আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসত। বাবার দুঃখ পাবার ভয়ে নিজে আগেভাগে এত দুঃখ পেতাম যে, তা বলবার নয়। বাবার মস্ত কারখানার ভার তাঁর একমাত্র ছেলে নেবে এই-ই ছিল বাবার ইচ্ছে।

ভালো ছাত্র ছিলাম না বলেই স্কুলের কোনও মাস্টারমশাই ভালো চোখে দেখতেন না আমাকে। যদিও ব্যবহার এবং স্বভাব পড়াশুনোর তুলনায় একটু ভালো ছিল বলে কেউ খারাপ বলতেন এমনও নয়। আমি জানতাম যে, শিশির অথবা অনিমেষ, সকলেই ছাত্র হিসেবে আমার চেয়ে অনেকই ভালো ছিল। কাটু, বান্টা, এরা সব পড়াশুনাতে শিশিরদের মতো ভালো না হলেও খেলাধুলার জন্যে আলাদা এক ধরনের সম্মান পেত স্যারদের কাছ থেকে। পুরো স্কুলের ছেলেরাও তাদের হিরো-জ্ঞানে দেখত। কাটুর তো তখন এতই কদর ফুটবলে যে, চার ফুট দশ ইঞ্চি হাইটের ম্যাচ হলেই এক বিকেলে চার-পাঁচ জায়গায় ওকে ভাড়া করে নিয়ে যেত বিভিন্ন ক্লাব। ওর নিন্দুকেরা বলত, ও নাকি এককাপ চা ও একটা বিস্কুট পেলেই ভাড়ায় খেলে দেয়। কাটু বিকেলের প্রথম খেলাতে নেমেই গোটা ছয়েক গোল দিয়ে তাদের এগিয়ে রেখে অন্য ম্যাচে গিয়ে পটাপট গোল দিয়ে আবার প্রথম ম্যাচের জায়গায় গিয়ে দেখত, প্রতিপক্ষের স্ট্রাইকাররা গোল শোধ করে দিয়েছে কি না। যদি ছটার বেশি গোল তারাও দিত, তবে কাটু তক্ষুনি গোটা দুই তিন গোল দিয়ে সেই ম্যাচের ইতি টানত।

প্রাইজ ডিসট্রিবিউশনের দিন শিশির এত বই পেত প্রাইজ হিসেবে, যে, একা বয়েই নিয়ে যেতে পারত না। তিন-চারজনের সাহায্য লাগত। স্পোর্টস-এর প্রাইজের দিনও অন্যান্য ছেলেরা কত মেডেল, কাপ সব পেত।

জীবনে কি পড়াশুনোতে, কি স্পোর্টসে, কোনওদিন একটিও প্রাইজ পাইনি। রেজাল্ট বেরোবার দিন, প্রাইজের দিন, বড় মনমরা হয়ে বাড়ি ফিরতাম। এই ভেবে সান্ত্বনা দিতাম নিজেকে যে, আমরাই তো দলে ভারী। যারা প্রাইজ পেল, তারা আর ক'জন? তবুও বড় ছোট, সাধারণ, ভিড়ের মধ্যের একজন বলে মনে হত নিজেকে। কোনও কোনওবার প্রাইজ ডিসট্রিবিউশনের অনুষ্ঠানে গান গাইতে বলা হত আমাকে। সে-গান আমার মা'ই শিখিয়ে দিতেন। গানও কিছু আহামরি গাইতাম না। অমন গান সকলেই গাইতে পারত।

কেবলই ভাবতাম, আমি খারাপ। আমি কোনও কিছুতেই ভালো নই। ফার্স্ট বয়দের মতো লাস্ট বয়দেরও একটা আলাদা পরিচয় থাকে, বৈশিষ্ট্য থাকে। আমার তাও ছিল না। যে বয়সে প্রত্যেকেই ইমপর্ট্যান্ট হতে চায়, সেই বয়সে তখন আন-ইমপর্ট্যান্ট হয়ে থেকে মরমে মরে যেতাম।

আমাদের ক্লাসের লাস্ট বয় গজু। বয়সে সে আমার চেয়ে অন্তত চার-পাঁচ বছরের বড়

www.BanglaBook.org

ছিল। একই ক্লাসে ছিল পাঁচ বছর। গতবার ফাইনাল পরীক্ষায় বাংলা পরীক্ষার দিনে আমার পাশেই সিট পড়েছিল গজুর। ও ঘাড় নিচু করে আমার কানে মুখ ঠেকিয়ে গরম নিশ্বাস ফেলে বলেছিল, বিপ্রকর্ষ কি রে?

গার্ড ছিলেন নরু-স্যার। দুষ্টু ছেলেরা তাঁকে ডাকত 'ঘাড়-ছোট নরু-স্যার' বলে। গজুর কথাতেই আমার দিকে তাকিয়েছিলেন উনি। ওঁর অভ্যাস ছিল ক্লাসের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি পায়চারি করে বেড়ানো। ক্লাসে পড়াবার সময়ও অমনই করতেন। গার্ড দেবার সময়ও তাই করছিলেন। উনি যেই দূরে চলে গেলেন, গজু ফিসফিস করে বলল, তোর পেট যদি আজ ছুরি দিয়ে না ফাঁসাই, তো আমার নাম গজশোভা রায় নয়।

সেকথা শুনেই আমার পিলে চমকে গেল। গলা শুকিয়ে এল। কানাঘুষোয় আমি শুনেছিলাম যে,'গিরিশ পার্কের পাশে ও একটি মরচে-পড়া ছুরি দিয়ে একটি ছেলেকে খুন করেছিল। মরচে-পড়া ছিল বলে ছেলেটাকে বাঁচাতে পারেনি ওর মা-বাবা অনেক চেষ্টা করেও। কিন্তু গজুর বাবা ছিলেন পুলিশের দারোগা। তাই কিছুই হয়নি ওর।

ঘাড়-ছোট নরু-স্যার কথাটা শুনে ফেললেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, গজু, কেন ছেলেমানুষকে ভয় দেখাচ্ছ? বিপ্রকর্ষর মানে জানতে চাও তো আমিই বলে দিচ্ছি। কিন্তু এই একটি প্রশ্নের উত্তর ঠিক লিখলেই কি তুমি পাশ করে যাবে এবারে?

গজু নরু-স্যারকে ধমকে বলল, স্যার আমি অলরেডি চটে আছি। আমাকে আর চটালে কার পেট যে ফাঁসবে তার ঠিক নেই।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। একটু নস্যি নেবে? বলেই ঘাড়-ছোট নরু-স্যার গজুর কাছে গিয়ে ওকে নস্যি অফার করলেন। গজু রেগুলার নস্যি নিত। স্যারের ডিবে থেকে একটিপ নস্যি নিয়ে কিছুটা আমার নাকে উড়িয়ে একটি নোংরা রুমাল বার করে নাক ঝাড়ল।

সেই মুহূর্তে ভালো ছাত্র শিশির সম্পর্কে যেরকম সম্ভ্রম ছিল আমার মনে, খুনি এবং ওঁচা ছাত্র গজু সম্পর্কেও, তার দুর্দান্ত প্রতাপ দেখে ঠিক সেরকম নয়, তবে অন্য একরকম সম্ভ্রম জাগল। সেই মুহূর্তে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, জীবনে বিশেষ কেউ হতে হলে খুবই ভালো হতে হবে। এখানে মাঝামাঝিদের কোনও পরিচয় নেই, দামও নেই। খুব ভালো যদি না হওয়া যায়, তা হলে খুব খারাপ, গজুর মতো হওয়াও বোধহয় ভালো। কিছু না-হয়ে-থাকার চেয়ে তবু কিছু একটা হওয়া হলো। আমাদের বন্ধু রাজেন যেমন 'কিছু' হলো সেদিন রাস্টিকেটেড হয়ে। বাবার আলমারি ভেঙে টাকা নিয়ে সে বোম্বে যেতে চেয়েছিল সিনেমায় নামবে বলে। খড়গপুরেই পুলিশ পাকড়াও করে নিয়ে আসে তাকে। বোম্বেও যাওয়া হল না, রাস্টিকেটেডও হলো।

॥ ৩ ॥

যেদিন স্কুল ফাইনালের রেজাল্ট বেরোল, সেদিন বাথরুমে গিয়ে খুব কাঁদলাম। আমার চেয়ে বেশি কাঁদলেন মা। এবং মা'কে অপদার্থ ছেলের জন্য কাঁদতে দেখে আমার বুক ফেটে যেতে লাগল।

সন্ধের পর অক্ষয়-স্যার এলেন। আমি পড়ার ঘরেই ছিলাম। ট্যাবুলেটরের কাছ থেকে উনি মার্কস জেনে এসেছিলেন। যেহেতু অঙ্কই পড়াতেন, অঙ্কের মার্কসই শুধু জেনেছিলেন। ওঁর মুখে আমার প্রতি সেই ঘৃণা, বিতৃষ্ণা আর অধৈর্য চিরদিনই ছিল। সেইসব আবারও তীব্র ঝলকে ফুটে উঠল। পথের ডাস্টবিনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অনেকে যেমন নাকে রুমাল চাপা দেন, তেমন করে আমার খারপত্তর গন্ধও যেন ওঁর নাকে

www.BanglaBook.org

লেগে ওঁকে ভীষণ পীড়িত করছিল। নস্যি-মাখা রুমাল দিয়ে নাক চাপা দিলেন উনি।

মুখটি নিচু করেই রইলাম আমি। এ-মুখ কাউকেই দেখানোর নয়।

অক্ষয় স্যার বললেন, তুমি আমার লজ্জা। তোমার মতো গোটা-দুই ছেলে যদি আমার লিস্টে থাকে, তবে আমার প্রাইভেট টিউটর হিসেবে যে সুনাম, তা একেবারেই উবে যাবে। তোমার বাবাকে বোলো, অন্য টিউটরের খোঁজ করতে। তুমি পঁয়তাল্লিশ পেয়েছ। বুঝেছ? ইয়ে! পঁয়তাল্লিশ! আর অ্যাডিশনাল ম্যাথ্স-এ পেয়েছ পঁচিশ। ছোঃ ছোঃ। অ্যাডিশনাল ম্যাথস! শখ কত্ত। কী স্পর্ধা! আর শোনো, ফার্স্ট ডিভিশনও জোটেনি কপালে। দশ নম্বর কম আছে।

আমি মুখ নিচু করেই রইলাম।

অক্ষয়-স্যার হঠাৎ একটিপ নস্যি নিয়ে উঠে পড়েই বললেন, তোমার বাবাকে কোন মুখে ফেস করব? উনি আসার আগেই আমিই উঠছি। বাবাকে বোলো, তোমার ব্রিলিয়ান্ট মার্কসের কথা। ছিঃ, ছিঃ! কী বাবার কী ছেলে! লজ্জা, লজ্জা! তুমি আমার ছেলে হলে...।

হলে যে কী করতেন, সেটা না বলেই এগোলেন। গোপেনদা যে আমার চেয়ে কত ভালো তা আমি জানতামই। ও-কথা ওঁর বলার দরকার ছিল না। চলে যেতে গিয়েই ফিরে দাঁড়িয়ে আবার বললেন, তোমার বাবা আমাকে যদি কিছু বলেন, তা হলে আমি কিন্তু ওঁকে ভালো করেই শুনিয়ে দেবো, গাধা পিটিয়ে ঘোড়া নিশ্চয়ই করা যায়, কিন্তু তু-তু-তুমি তো...।

চলে গেলেন উনি।

টেবিল-লাইটটা জ্বলছিল। আমি টেবিলের উপরেই দু-হাতের মধ্যে মাথা পেতে শুয়ে ছিলাম। একটু পরই হঠাৎ ম্যাডার ঘনঘন চিৎকারে চমকে উঠলাম। শুনতে পেলাম বাবার গাড়িটা গ্যারেজে ঢুকল। ড্রাইভার বাহাদুর জিজ্ঞেস করল বাবাকে, কাল সকালে কখন আসবে? তারপর চাবি দিয়ে 'সেলাম সাহাব,' বলে চলে গেল।

ম্যাডা লাফাতে-লাফাতে বাবার পায়ে-পায়ে আমার ঘরে এসে ঢুকল। আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। বাবা আমার মুখের দিকে চেয়েই বুঝলেন। বললেন, কী খোকন? মনটা খারাপ মনে হচ্ছে! হলোটা কী?

আজ যে স্কুল ফাইনালের রেজাল্ট বেরোবে তা বাবা জানতেন। কিন্তু আমি যে স্কলারশিপ পাবই তা যেন উনি ধরেই নিয়েছিলেন। সামান্য অবাক হয়ে বললেন, কী? ভাল হয়েছে ফল?"

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কোনওরকমে আমি বললাম, সেকেন্ড ডিভিশান।

বলতে চাইলাম, কিন্তু বলতে পারলাম না যে অঙ্ক আমার কোনওদিন ভালো লাগেনি বাবা। তুমি মিছিমিছি পয়সা নষ্ট করলে অক্ষয়-স্যারকে রেখে।

ও! বাবা বললেন।

তারপর এক মুহূর্ত চুপ করে থেকেই বলেন, "ম্যাথস কীরকম হলো?"

ম্যাথ্স-এ পঁয়তাল্লিশ। আর অ্যাডিশন্যাল ম্যাথ্স-এ পঁচিশ। বলেই আমি দু'হাতে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলাম। বাবা আমার কাছে এসে পিঠে হাত রাখলেন।

একটুক্ষণ পর গলা তুলে জগুকে ডাকলেন।

জগু গেট ছেড়ে ভেতরে আসতেই বাবা বললেন, মাকে বল, আমি নিউমার্কেটে যাচ্ছি। মাটন আনব আর গলদা চিংড়ি। পোলাও রাঁধতে বল। তোরা কী রে? খোকন আজ পাশ করেছে পরীক্ষায়, তোরা জানিস না? এই নে জগু, তুই একশো টাকা রাখ আজ খুশির দিন।

www.BanglaBook.org

বলেই বললেন, চল খোকন। জগু তুই ম্যাডাকে ধর। নইলে ঝামেলা করবে।

বাবা নিজেই গাড়ি বের করলেন গ্যারাজ থেকে। সামনের বাঁদিকের দরজা খুলে দিলেন। ওই সিটে মা বসেন। আমি বসে পড়েই দরজা বন্ধ করে দিলাম।

জগুদা গেট খুলে দিল। বাবা গাড়ি চালিয়ে চললেন, নিউ মার্কেটের দিকে। বললেন, এই রে! চিংড়ি মাছ তো তোর মা ভালোবাসেন। তুই তো ভালোবাসিস ভেটকি মাছের ফ্রাই। চল, দেখি। পেয়ে যাব ঠিকই। এখন ফ্রাই পিস করে কাটার লোক পাব কিনা সেই হচ্ছে কথা!"

আমি চুপ করে ছিলাম। আমার ভীষণ জোরে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু চলন্ত গাড়ির মধ্যে কাঁদলে লোকে কী ভাববে?

পার্ক স্ট্রিটে পড়েই বাবা বললেন, তোর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত আমার। উচিত কেন, চাইছিই ক্ষমা। বুঝলি খোকন!

কী বলছ বাবা? আমি হতভম্ব হয়ে বললাম।

হ্যাঁ, তোর ইনক্লিনেশান ছিল আসলে আর্টসেরই দিকে। প্রথম থেকেই লিটারেচারে তুই তো ভালোই। আসলে লিটারেচার হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষিত মানুষের সাবজেক্ট। আমরা তো হলাম গিয়ে মিস্তিরি। সে এঞ্জিনিয়ারই বল, আর অ্যাকাউন্ট্যান্টই বল। জজ বল, ব্যারিস্টার বল, ডাক্তার বল—যিনি সাহিত্য না পড়েছেন বা পড়েন, বা সাহিত্যের খোঁজ না রাখেন, তিনি আসলেই অশিক্ষিতই। সাহিত্যই হচ্ছে শিক্ষিত মানুষের মনের সবচেয়ে বড় এক্সপ্রেশান।

একটু থেমে বললেন, এত বড় ফ্যাক্টরিটা করেছিলাম। তুই ছাড়া আমার তো কেউই নেই। একমাত্র সম্বল তুইই। আজকাল কত সব কথা শুনছি। বিদেশে গিয়ে কমপিউটার ব্যবহার হচ্ছে সব ব্যাপারেই। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি প্রতিদিন কোথায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মানুষকে, মানে, মেটিরিয়াল ওয়ার্ল্ডে। ভেবেছিলাম, সায়েন্স নিয়ে পড়লে তোর পক্ষে...। যাক গে, মাই লাইফ ইজ মাই লাইফ, অ্যাণ্ড ইওর লাইফ ইজ ইওরস। তুই যা হাতে চাস খোকন, তাই-ই হয়ে ওঠ জীবনে। আমি তোকে আর ভুল পথে চালাব না। আই অ্যাম সরি। রিয়েলি আই অ্যাম।

নিউ মার্কেটের সামনেটা তখন ফাঁকা। আলো প্রায় সব নিবে গেছে। ফুলের দোকানগুলো খোলা আছে শুধু। কেউ বাইরে ঝাঁপ নামানো! গ্লোব সিনেমার সামনে একটা বিরাট হোর্ডিং। সিনেমার বিজ্ঞাপন। ছবির নাম 'আই উইল ক্রাই টুমরো।'

বাবা একটু পরেই মুটের মাথায় বাজার নিয়ে ফিরে এলেন। আমি তাড়াতাড়ি নেমে বাবার হাত থেকে চাবি নিয়ে গাড়ির বুটটা খুললাম। মাল সব রেখে বাবা মুটেকে পাঁচ টাকা দিলেন। মানুষটি বলল, ফুটা নেহি সাহাব।

বাবা বললেন, আমার ছেলে আজ পরীক্ষায় পাশ করেছে। কলেজে যাবে। তোমাকে বকশিশ দিলাম।

মানুষটি একটু অবাক হয়ে মাথায় হাত ঠেকাল।

গাড়িটা ময়দানের দিকে নিয়ে চললেন বাবা। ময়দানে পৌঁছে বললেন, পোলাও হতে হতে আমরা পৌঁছে যাব কী বল? তোর মা আছেন, নগেন আছে, জগু আছে, রাঁধতে কত সময় লাগবে? চল, একটু পায়চারি করি।

বাবা গাড়িটার পাশেই সামনে-পিছনে হাঁটবেন বলে মনে হল। একটু হেঁটে বললেন, নাঃ, চল তোর মা ভাববেন। যেতে যেতেই তোকে গল্প বলব। একটু চুপ করে থেকে

www.BanglaBook.org

বললেন, তুই মেন্ডহেলসনের নাম শুনেছিস?

না তো!

সে কী রে? একটি বই আছে ওঁর জীবনী নিয়ে লেখা, নাম 'বিয়ন্ড ডিজায়ার'। পিয়ের ল্যা মূর-এর লেখা। তোকে কিনে দেব। পড়িস। সেদিন তুই মোৎজার্ট-এর রেকর্ড নিয়ে এসেছিলি সম্বিৎদার বাড়ি থেকে। বিটোভেন শুনিস প্রায়ই, আর মেন্ডহেলসনের নামই শুনিসনি?

শুনিনি। আমি বললাম নির্লজ্জের মতো। পরীক্ষাতে এত বাজে রেজাল্ট করার কথা বেমালুম ভুলে গিয়েই।

ফেলিক্স। নাম ছিল তাঁর ফেলিক্স মেন্ডহেলসন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের ইউনাইটেড জার্মানীর সবচেয়ে বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্কার ছিলেন ওঁর বাবা। পৃথিবীর সবচেয়ে বড়লোকদের মধ্যে একজন। ফেলিক্সের-বাবার নাম কিন্তু ভুলে গেছি। ফেলিক্সও ছিলেন তোরই মতো, তাঁর বাবার একমাত্র সন্তান। ফেলিক্স খুব আর্টিস্টিক ছিলেন। দারুণ পিয়ানো বাজাতেন। ওঁর ইচ্ছে ছিল যে, উনি কম্পোজার হবেন। পিয়ানোতে নতুন নতুন সুর সৃষ্টি করবেন।

সে ব্যবসা দেখবে না, এই কথা শুনে বাবার মাথায় তো আকাশই ভেঙে পড়ল। ছেলেও নাছোড়বান্দা। মায়ের কিন্তু খুবই ইচ্ছে ছিল যে, ছেলে কম্পোজার হোক। আসলে মায়েরা সন্তানদের যতখানি বোঝেন, বাবারা কখনও ততখানি বোঝেন না। তোর মা'রও কিন্তু উচিত ছিল, তোর আসল ভালোলাগা কোনদিকে, তা আমাকে জানানো। জানালে, তোর মন আজ খারাপ হত না। জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষাতে ফল খারাপ করতিস না।

যাই হোক, ফেলিক্সের মায়ের ইচ্ছে যেরকমই হোক, তাঁর বাবার বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য। শেষে বাবা তো ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করার ভয়ও দেখালেন। বললেন, তোমাকে সম্পত্তির এক কণাও দেব না, যদি আমার ব্যবসাতে না আসো। সাবধান!

পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে এসে ট্রাফিক লাইটে গাড়িটা দাঁড়াতে বাবা বললেন, ফেলিক্স কিন্তু শুনলেন না। যে একবার গান-বাজনার জগতের স্বাদ পেয়েছে, সাহিত্যের রসের আস্বাদ পেয়েছে, তার কাছে টাকাপয়সা কী? চলে গেলেন সব ছেড়ে। যা হতে চেয়েছিলেন, তাইই হতে। রাজার চেয়েও বড়লোক বাবার ছেলে, অতি অল্প বয়সেই যক্ষ্মা হয়ে মারা গেলেন, একটি আন-হিটেড ঘরে। ইউরোপের সব জায়গাতে তো হিটিং ছিল না তখন ঘরে ঘরে। যক্ষ্মারও চিকিৎসক ছিল না বিশেষ। কিন্তু ওই বয়সেই ফেলিক্স যা করে গেলেন, টাকা রোজগার করে নয়, ক্ষমতা একীভূত করে নয়, কিছু করার মতো করে।

আজ পৃথিবীর মানুষ কিন্তু ফেলিক্স মেন্ডহেলসনের বাবাকে বেমালুম ভুলে গেছে, আর যদি-বা মনেও রেখেছে, তাও ফেলিক্সের বাবা হিসেবেই। প্রচণ্ড পয়সাওয়ালা মস্ত ব্যবসাদার, দারুণ ক্ষমতাবান তো কত মানুষই আসে যায় পৃথিবীতে। কিন্তু তাদের মনে রাখে কে? যদি-বা কেউ রাখেও, ভালোবেসে মনে রাখে, তাদের মধ্যে খুব কম মানুষকেই, মনে রাখে ঘৃণায়। "স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে", বুঝলি না!

আমি যে কোনও কিছুতেই তত ভাল নই বাবা! আমি যে মাঝামাঝি, মিডিওকার।

অসহায়ের মতো বললাম আমি।

বাবা আমার কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, "স্কুল ফাইনাল পরীক্ষাই তো জীবনের একমাত্র পরীক্ষা নয়, খোকন। যতদিন মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়, ততদিন, প্রত্যেকদিনই তাঁকে অনবরত পরীক্ষায় বসতে হয়। যতই দিন যাবে, ততই এই

www.BanglaBook.org

কথা বুঝতে পারবি। স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় যারা ফার্স্ট হয় এবং লাস্টও, তাদের মধ্যে বেশির ভাগকেই কিন্তু জীবনের মঞ্চে খুঁজে পাওয়া যায় না। জীবনের বড়-বড় পরীক্ষাতেও ওপরে উঠে আসে এই মাঝামাঝিদের ভিড়ের ভেতর থেকেই, কেউ-কেউ। যারা ননডেসক্রিপ্ট। 'জনতা' বলি আমরা যাদের।" বলেই বললেন, "চল, ফিরি এবার।"

বাবা গাড়ির এঞ্জিন স্টার্ট করবার পর আমি বললাম, "আমি যে এত খারাপ করলাম, তুমি দুঃখ পাওনি? মা খুব কেঁদেছে।"

বাবা হেসে বললেন, "তোর মা একটুতেই কাঁদেন। কাঁদলে চোখের মণি উজ্জ্বল হয় কিনা! তাই তোর মা কথায়-কথায় কাঁদেন। যাঁরা সুন্দর মানুষ তাঁরাও ওরকম অনেক কিছু করেন আরও সুন্দর হওয়ার জন্যে।"

আমার কথার উত্তর দিলে না তুমি বাবা?

আমি? না না, দুঃখ পাইনি। তবে অবাক হয়েছি। রেগে গেছি। সেটা তোর ওপরে নয়। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ওপরে। তোর মাস্টারমশাই অক্ষয়বাবুর ওপরে। আমার নিজেরও ওপরে। আমার উচিত ছিল, তোকে একটা ভালো ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া। আমার পক্ষে মোটেই তা অসুবিধের ছিল না। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম যে, আমার দেশের লক্ষ-লক্ষ ছেলেমেয়ে যে শিক্ষার সুযোগ পায়, আমার ছেলেই বা তাদের থেকে বেশি সুযোগ পাবে কেন? তা ছাড়া বাংলা তো আমাদের মাতৃভাষাই। বেশির ভাগ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলেই বাঙালিদের সংস্কৃতি, সাহিত্য, গানবাজনা পরোক্ষে নষ্ট করে দেওয়া হয়। তুইও তেমন হয়ে উঠিস, তা আমি চাইনি... চেয়েছিলাম বাঙালি হবি।

আমি আসলে বাজে ছেলে। আমার কিছুই হবে না। স্কুল ফাইনালেই যে খারাপ করল, তার কাছে তো জীবনের সব দরজাই বন্ধ। এই পরীক্ষাই তো প্রবেশিকা।

হাঃ হাঃ করে হাসলেন বাবা। বললেন, তোর নিজের কাছেও কি বন্ধ? আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থাটা তোতাপাখির শিক্ষা। এখানের অধিকাংশ পণ্ডিতদেরই শিক্ষার গুমোর আছে, দম্ভ আছে, প্রকৃত শিক্ষা নেই। তা ছাড়া শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে গেছে টাকা রোজগার। টাকা যাতে রোজগার করতে পারে, যেসব লাইনে বেশি টাকা আছে, সেইসব লাইনেই ভিড়। আমি চাই না তুই তেমন শিক্ষিত হোস, চাই না যে তুই টাকার অঙ্কের সঙ্গে জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে শিক্ষাকে গুলিয়ে ফেলিস। সত্যিই আমি চাই না। আমাদের দেশে টাকাওয়ালারা কোনওদিন সম্মান পায়নি। পাওয়া উচিতও ছিল না। আজ যে পাচ্ছে, তা এই ফালতু শিক্ষার ভুল-চাহিদার দোষেই। সরস্বতীর সাঁকো বেয়ে লক্ষ্মীর দরজায় পৌঁছতে চাইছে প্রত্যেকেই। আর লক্ষ্মী যেখানে থাকেন, সরস্বতী সেখান থেকে অভিমানে সরে আসেন। আমি কিছু মনে করিনি রে, খোকন। তুই আমার ভারি ভালো ছেলে। জীবনে ভালো হোস। মানুষ হোস, সত্যিকারের শিক্ষিত হোস, ডিগ্রি অনেক নাই-ই বা পেলি। আমি তো আর চিরদিন বাঁচব না। তোকে এই আশীর্বাদই করে গেলাম। তা ছাড়া আমি নিজে তো কখনও তেমন মেধাবী ছিলাম না। তোর কাছ থেকে আমার প্রত্যাশাটা অন্যায়। এক জেনারেশানে হয় না। মেধাবী যারা, তাদের মা-বাবা ঠাকুর্দা দাদু-তাঁরাও বোধহয় মেধাবীই হন।

॥ ৪ ॥

কলকাতায় এসেছিলাম পুজোর সময়। পরশু দিল্লি ফিরে যাব। আমার একমাত্র ছেলে খোকা এবার দিল্লি বোর্ডের পরীক্ষা দিল। আমি তো ভালো ছাত্র ছিলাম না। খোকাও

www.BanglaBook.org

পড়াশুনোতে মাঝামাঝিই হয়েছে। ও অভিনেতা হতে চায়। গ্রুপ থিয়েটারের দলে ঢুকেছে। টিভি-ফিল্ম নিয়ে পড়াশুনো করাবার ইচ্ছে আছে। আস্ত পাগল!

অনেকগুলো বছর চলে গেছে। সত্যি অনেকই বছর। আজ মা নেই, বাবাও নেই। দক্ষিণ কলকাতার বাড়িও রামকৃষ্ণ মিশনে দিয়ে দিয়েছি আমি। দিল্লিতে থাকি এখন। আজ কুড়ি বছর হয়ে গেল। আমার স্টুডিও করেছি ভাড়া বাড়িতে,, দিল্লির বাঙালিপাড়া চিত্তরঞ্জন পার্কে। ছবি আঁকি, মূর্তি গড়ি। প্রদর্শনী এবং এমনিতে কিছু-কিছু বিক্রি হয়। বড়লোক হতে পারিনি ঠিকই, কিন্তু বাঙালিরা আমাকে চেনেন। দিল্লির বাঙালিরা তো বটেই, ভারতবর্ষ এবং বিদেশের বাঙালিরাও। তাতে আমার কোনও গর্ব নেই। আনন্দ আছে। পয়সার লোভে সকলেই যা করে চারপাশে, যা চায়; তাদের অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে নিজস্বতাকে এখনও খুইয়ে বসিনি যে, এইটেই আনন্দের। বাবার শিক্ষার অমর্যাদা করিনি আমি। আজকের দিনে এটা সম্ভব হত না, যদি-না শ্রাবণী আমাকে সাপোর্ট করত। স্ত্রীদের উপরে স্বামীদের জীবন, জীবনের গন্তব্য অনেকখানিই নির্ভর করে। বাড়িটার দাম পেয়েছিলাম পাঁচ লাখ। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব অনেকেই বলেছিল, যে নিজের সংসার চলে না, অত দাতাগিরিতে কাজ নেই। শ্রাবণী কিন্তু বলেছিল, মা-বাবাই যখন নেই, তখন যা আমাদের স্বোপার্জিত নয়, তা দিয়ে সহজ সুখ চাই না আমি। বড়লোকের ছেলে হলে খোকাও মানুষ হবে না। অত্যন্ত কষ্টকর হলেও বাংলাসাহিত্য, বাংলা গান, বাংলায় যা কিছু ভালো তার সঙ্গে যোগাযোগ প্রবাসে বসে আমরা এখনও রেখে চলি। এই মাঝামাঝি মিডিওকার মধ্যবিত্ত বাঙালিরাই এখনও বাঙালির যা-কিছু ভালো তা প্রাণান্তকর কষ্টেই ধরে রেখেছেন বলে মনে হয় আমার। বিত্তবান বাঙালিদের অধিকাংশই বাঙালিত্বকে অসম্মান করেন, ছোট চোখে দ্যাখেন।

কলকাতায় এসে এবার উঠেছি আমার শ্যালকের বাড়িতে। খোকা আর শ্রাবণী কলকাতার পুজো দেখতে চেয়েছিল, তাই। ভাইফোঁটার পরই ফিরে যাব আবার দিল্লিতে।

আমাদের স্কুলের উলটো দিকের পার্কে ছেলেবেলায় কত ফুটবল-ক্রিকেট খেলেছি। বন্ধুদের সঙ্গে কত গল্প মজা। আজ তাই প্রথম বিকেলে একটা মিনিবাস ধরে এসেছি এখানে। একজন কিশোরের চোখে এই পার্কটিকেই কত বড় বলে মনে হত। ছোট-ছোট পায়ে এটি পার হতে হতে মনে করতাম তেপান্তরের মাঠই পেরোলাম বুঝি! আজ পার্কে ঢুকেই মনে হল, পার্কটি খুবই ছোট। গাছগুলি উধাও হয়ে গেছে। ভিড়, বড় ভিড়। ধুলো। ছেলেবেলার সেই চোখ দুটিও তো হারিয়ে গেছে!

মন যদিও খারাপ হয়ে গেল, তবু ভাবলাম, কয়েকটি পাক হেঁটেই যাই পার্কের চারপাশের পিচ-বাঁধানো রাস্তায়।

আধ পাক যেতেই মনে হল যেন একটা বেঞ্চে লাঠি-হাতে অক্ষয়-স্যার বসে আছেন। ঠিক দেখলাম কি?, তাঁর সামনে দিয়েই চলে গেলাম। ঠিকই চিনেছি। অক্ষয়-স্যারই। গোঁফচুল সব পেকে সাদা হয়ে গেছে। মাথায় বাঁদুরে-টুপি হাতে লাঠি। মুখে পৃথিবীর সব বিতৃষ্ণা, কষ্ট। খারাপ ছাত্র পড়ানোর কষ্ট নয়, বার্ধক্যের জরার কষ্ট। গায়ে একটি নস্যি-রঙা ছেঁড়া আলোয়ান। আমাকে চিনতেও পারলেন না। না পারারই কথা। আমার মতো কত খারাপ ছাত্রকেই তো তিনি পড়িয়েছেন। খুব ভালো আর খুব খারাপ ছাত্রদেরই স্যারেরা শুধু মনে রাখেন। মাঝামাঝিরা হারিয়েই যায় তাঁদের স্মৃতিতে। 'বর্ষে বর্ষে দলে দলে আসে বিদ্যামঠতলে, চলে যায়, তারা কলরবে, কৈশোরের কিশলয়, পর্ণে পরিণত হয়, যৌবনের শ্যামল গৌরবে।' কালিদাস রায়ের বিখ্যাত কবিতার লাইন মনে পড়ে গেল অক্ষয়-স্যারের

www.BanglaBook.org

চোখের ঝাপসা দৃষ্টি দেখে। ওঁকে পেরিয়ে এসেই নতুন করে মনে পড়ল যে, অক্ষয়-স্যারের মতো এতখানি অপমান আমাকে জীবনে আর কেউই করেননি। তাঁর প্রতি আমার বিদ্বেষ ছিল না। কিন্তু বুঝলাম গভীর এক উদাসীনতা জন্মে গেছে এক ধরনের। বহু বছরের দূরত্ব তা গাঢ় করেছে আরও।

আরও এক পাক ঘুরে আসার পর ওঁর সামনে দাঁড়ালাম আমি। অক্ষয়-স্যারের মুখে কোনও ভাবান্তর ঘটল না। প্রণাম করে বললাম, কেমন আছেন স্যার?

ভালো নয়, ভালো নয়। কিন্তু চিনতে পারলাম না তো তোমাকে? কে?

আমি সিদ্ধার্থ স্যার। দক্ষিণ কলকাতায় থাকতাম। অঙ্ক...।

ও বুঝেছি, বুঝেছি। তা কী করছ এখন তুমি সিদ্ধার্থ?

ছবি আঁকি স্যার। মূর্তি গড়ি।

পেট চলে তাতে? আর্টিস্টরা তো না খেয়েই থাকে শুনি।

কোনওক্রমে চলে যায় স্যার।

তা ভালোই করেছ। অঙ্ক তোমার লাইন ছিল না। অঙ্কে মাথা লাগে। অঙ্ক...

জানি। একটু চুপ করে থেকে বললাম, গোপেনদা কী করছেন স্যার?

মানে, আমার ছেলে গোপেনের কথা বলছ?

হ্যাঁ।

ও? অক্ষয়-স্যারের ম্লান, করুণ, কাতর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, গোপেন তো ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিল। জানো তো? ম্যাথমেটিক্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিল। তারপর চলে গেল নতুন করে ফিজিক্সের লাইনে। নিউক্লিয়ার ফিজিক্স। এখন আমেরিকার হিউস্টনে আছে। আরে, নেভাদার মরুভূমিতে যে বোমা ফাটাল সেদিন আমেরিকা, সে তো তার একারই হাতে গড়া!

এমন করে বললেন, অক্ষয়-স্যার, যেন উড়নতুবড়ি বানানোর কথাই বলছেন। গোপেনদা যেন একা হাতে মশলা আর লোহাচুর ভরে উড়নতুবড়িই বানিয়েছেন একটা। আলোর ছটার জন্যে নয়, পৃথিবীর যা-কিছু ভালো, সব ফুল, পাখি, প্রজাপতি, অরণ্য মানুষ সব-কিছুকেই ধ্বংস করার জন্যে।

দারুণ আছে। বুঝলে হে। বিরাট বাড়ি। ক্যাডিলাক লিমুজিন গাড়ি। আমেরিকান মেয়ে বিয়ে করেছে। কী ফুটফুটে মেমসাহেব। নাতি-নাতনিরাও সব ফুটফুটে। পাক্কা সাহেব। বাংলা বলতেই পারে না।

গর্ব ঝরল অক্ষয়-স্যারের কথায় বসনতুবড়ির ঝরনার মতো।

আপনি যাননি? ওঁরা আসেন না?

কী যে বলো। আমার কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের বাড়িতে ইন্ডিয়ান বাথরুম। পায়রার খোপের মতো দু'খানা ঘর। জঞ্জালে ভরা। ওখানে ওরা থাকবে কি করে? তুমি যেমন অঙ্কে গবেট ছিলে, ও ছিল তেমনই সত্যিই ব্রিলিয়ান্ট। জানো তো স্কুল ফাইনালে স্টার পেয়েছিল। অঙ্ক, সংস্কৃত আর ভূগোলে লেটার পেয়েছিল। ইতিহাসেও।

আপনি এখনও কি পড়ান স্যার? আর মাসিমা মানে, গোপেনদার মা কেমন আছেন?

"উনি গত হয়েছেন পাঁচ বছর হল।"

একমাত্র ছেলের প্রশংসাতে উজ্জ্বল মুখ হঠাৎই নিভে গেল অক্ষয়-স্যারের। বললে, "বড় কষ্ট পেয়ে, বিনা শুশ্রূষাতে, বিনা চিকিৎসাতেই প্রায় চলে গেলেন। আমিও তো পা বাড়িয়েই আছি, বুঝলে। টিকিট কাটা হয়ে গেছে। শুধু বার্থটাই রিজার্ভেশন হয়নি। বাত,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাঁপানি, দুটো হার্ট অ্যাটাক। আছি কোনওরকমে। একে থাকা বলে না।"

তা হলে এখন আর ট্যুইশানি করেন না? স্কুল থেকে তো নিশ্চয়ই বহু বছর রিটায়ার করেছেন?

"পঁচিশ বছর। ট্যুইশানি, তা করি নিশ্চয়ই করি। নইলে চালাচ্ছি কি করে? কেন তোমার ছেলেও বুঝি তোমারই মতো অঙ্কে কাঁচা?

আমি হাসলাম। কষ্ট হলো অক্ষয়-স্যারের জন্যে।

উনি বললেন, এখন থাকো কোথায়? ওই বাড়িতে তো অন্যরা থাকেন। ওই পাড়াতে আমার একটি ট্যুইশানি ছিল। তাই জানি। তুমিই বলো, সকালে অথবা দুপুরে আমি নিশ্চয়ই গিয়ে পড়াব যত্ন করে। রাতে আর কোথাও যাই না। চোখে তো দেখি না। ছেলের চেয়েও যেমন নাতি আদরের, ছাত্রর চেয়ে ছাত্রর ছেলেও তেমনই!

তা এই বয়সেও এত কষ্ট করেন কেন, গোপেনদা এত বড় এবং বড়লোক হয়েছেন। আপনাকে প্রতি মাসে টাকা পাঠান তো নিশ্চয়ই। এসব তো ছেড়ে দিলেই পারেন। এই শরীরে। আর কতদিন কষ্ট করবেন?

একটু চুপ করে থেকে অক্ষয়-স্যার গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, অভাব আমার কিছুই নেই। তবে একেবারে বসে গেলে শরীরটা আর চলবে না। তাই-ই চালিয়ে যাচ্ছি টুকটুক করে।

আচ্ছা চলি স্যার।

তোমার ছেলে? পড়বে না সে আমার কাছে?

অঙ্ক ও পড়বে না স্যার। অভিনয় করবে বলছে।

অক্ষয় স্যারের মুখটি, আমার অঙ্ক দেখে যেমন বিকৃত হয়ে যেত তিরিশ বছর আগে, তেমনই বিকৃত হয়ে গেল। বললেন, লাইক ফাদার লাইক সান। ও তো তোমারই মতো গাধা হয়েছে তা হলে। অঙ্কে গবেট?

হেসে বললাম, তাই।

সন্ধে হয়ে এল। আলো জ্বলে উঠেছে। পার্ক থেকে বেরিয়ে আসছি, এমন সময়ে আমার স্কুলের বন্ধু রাজেনের সঙ্গে দেখা। চিনতেই পারিনি। বুড়ো হয়ে গেছে। সিনেমায় নামবে বলে বাবার আলমারি ভেঙে টাকা নিয়ে এই রাজেনই বোম্বে যাচ্ছিল। পুলিশ ধরে আনার পর স্কুল থেকে রাস্টিকেট করে দিয়েছিল ওকে। ওর নাম ধরে ডাকতেই, আমার নাম বলতেই, বুকে জড়িয়ে ধরল রাজেন। বলল, কী রে সিদু? কীরকম বুড়ো মেরে গেছিস তুই।

আর তুই কি কচি আছিস নাকি? টেকো-বুড়ো। আমি বললাম।

হেসে ও বলল, চল, চল আমার দোকানে। বিকেলে একটু হাঁটতে বলেছেন ডাক্তার। দোকানে বসে-বসে ডায়াবিটিসে ধরেছে বুঝলি। চল, চল, দোকানের পর আমার বাড়িতে। সীমা কত্ত খুশি হবে। বাড়ির একতলাতেই তো দোকান।

কিসের দোকান?

আবার কিসের? স্টেশনারি দোকান দিয়েছি বাড়ির একতলাতে। আমি আর কী করব? সংসার তো চালাতে হবে।

মেসোমশাই কেমন আছেন?

বাবা নেই। অনেক চেষ্টা কললাম রে। সব সঞ্চয়, মায়ের, এমনকী সীমারও সব গয়না, আমার স্কুটারটা পর্যন্ত বিক্রি করেও তবু বাঁচাতে পারলাম না।

কী হয়েছিল?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্যান্সার।

মাসিমা কেমন আছেন?

বুড়ো হয়ে গেছেন। কিন্তু ভালোই আছেন। চল, চল, তোকে দেখে কত্ত খুশি হবেন। তুই বিজয়ার পর মায়ের হাতের কুচোনিমকি আর নারকোলের নাড়ু খেতে ভালোবাসতিস। চল, এখনও কিছু আছে। আজকাল বিজয়া টিজয়া তো উঠেই গেছে। আমেরিকান হয়ে গেছি আমরা। কী বলব তোকে, এই শ্রীমান রাজেন দাসের একমাত্র ছেলেও ইংরেজি গান আর ইংরেজি বই ছাড়া পড়ে না। ইংরেজি নাচ নাচে।

কী করছে ও?

চোরের ছেলে আর কী করবে? ডাকাত-টাকাত হবে হয়তো। এখন কবিতা লিখছে। বাবা তো লক্ষপতি। লিটল-ম্যাগ আন্দোলনে সামিল হয়েছে ছেলে।

আরে হোক হোক। ওর জীবন ওর। বাধা দিস না। আমি বললাম।

দোকানেই আগে নিয়ে গেল রাজেন। খুব মজা লাগল দেখে যে, বোম্বের বৈজয়ন্তীমালার বিরাট একটি ছবি টাঙানো আছে দোকানের দেওয়ালে। তাতে চন্দন-টন্দনের ফোঁটা দেওয়া।

বললাম, এ কী রে? যাকে বিয়ে করবি বলে পালিয়েছিলি।

রাজেন হেসে বলল, কী বলিস তুই? যার জন্যে পুলিশের ঠ্যাঙানি খেয়ে বুকের হাড় ভাঙল, চোর বদনাম হল, তাকে কি ফেলে দিতে পারি? বাবা-মাকে যেমন ফেলে দেওয়া যায় না, একেও তেমনই।

বলে, নিজেই হো-হো করে হেসে উঠল।

রাজেনের মা খুবই খুশি হলেন। রাজেনের বউ সীমা বলল, আপনাকে আজ না খেয়ে যেতেই দেব না। যা রান্না হয়েছে গরিবের বাড়ি, তাই খেয়ে যেতে হবে। এত বড় আর্টিস্ট আমাদের বাড়ি এসেছেন। আপনাকে কখনও চোখে না দেখলেও আমার স্বামীর বন্ধু বলেই কত্ত মানুষের কাছে গর্ব করি। আপনার গর্বে আপনার বন্ধুর তো মাটিতে পা'ই পড়ে না।"

বলেই বললেন, "দোকানঘরের দেওয়ালগুলো দেখে এসেছেন তো?"

হেসে বললাম, দেখিনি আবার!

সীমা হেসে গড়িয়ে বলল, ফোটোর সতীনকে নিয়ে কোনও ঝামেলা নেই, আমিও ফুলটুল দিই মাঝেমধ্যে।

অক্ষয় স্যারের সঙ্গে দেখা হলো রে, বুঝলি রাজেন। আমি বললাম রাজেনকে।

তাই? আমার সঙ্গে তো রোজই হয়। দোকানেও বলে রেখেছি যে, রোজকার পাঁউরুটি যেন বিনে পয়সায় দিয়ে দেয় ওঁকে। গুরু-ঋণ বলে কথা! রাস্টিকেটেড ছাত্রই হই আর যাইই হই! কী কানমলাই না দিতেন! মনে আছে? ও, তুই তো আমার চেয়ে অনেক ভালো ছিলি অঙ্কে। বাঁ কানটা চিরদিনের মতো হাফ-কালা হয়ে গেছে রে। একেবারে রগে রগে ঘষাঘষি করতেন অক্ষয়-স্যার!

গোপেনদা কিন্তু দারুণ ভালো ছিল। স্যারের কাছে শুনলাম যে, বিরাট নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট হয়েছেন আমেরিকায়... আমি বললাম।

তা তো হয়েছেন! কিন্তু মা মারা গেলেন বিনা চিকিৎসায়। বিনা ওষুধে। অঙ্কে দারুণ খারাপ ছেলে পাঁউরুটি দান করে বুড়ো বাবাকে তার বাঁচিয়ে রেখেছে। অমন ভালোর দাম কী বলতে পারিস? একটা টাকাও পাঠায়নি বিদেশ যাওয়ার পর থেকে। একবারও আসেনি।"

অক্ষয়-স্যারের ট্যুইশানি তো আছে এখনও কয়েকটা?

www.BanglaBook.org

ছাড় তো! ট্যুইশানি। এখনকার দিনে কি আর তৈলাক্ত বাঁশে বাঁদরের ওঠার অঙ্ক কষতে হয়? না শুভঙ্করীর আর্যা মুখস্ত করতে হয়, কে পড়বে ওঁর কাছে। এখন অঙ্ককে অঙ্ক বলে না। বলে 'ম্যাথস'। সীমাকেই জিজ্ঞেস কর না। স্যার পটকে যখনই যান, তখন শুশ্রূষা করে সীমাই, ফ্লাস্কে করে পথ্য নিয়ে গিয়ে। যত ঝামেলা এই রাস্টিকেটেড ছাত্ররই। সত্যি! যাকগে, আমি যেমন ছাত্র ছিলাম আমার ছেলেমেয়ে তার তুলনায় অনেকই ভালো। এইই স্যাটিসফ্যাকশান!

মাসিমার হাতে বানানো কুচোনিমকি, আর নারকোল নাড়ু, সীমার রান্না লুচি-বেগুনভাজা, কুমড়োর ছেঁচকি আর ডিমের ঝোল খেয়ে যখন প্রায় দশটা নাগাদ রাজেনের সঙ্গে বাসস্ট্যান্ডে এলাম, তখন ভারি ভালো লাগছিল। অঙ্কে আমরা কেউই যে ভালো ছিলাম না, এটা মনে করে সত্যিই আনন্দ হচ্ছিল।

রাজেনকে বললাম, সীমাকেও বলে এসেছিলাম, আগামী শীতে সব্বাইকে নিয়ে দিল্লি আয়। মাসিমাকেও নিয়ে আসিস। একটু অসুবিধে হলেও তোদের আনন্দ হবে খুব।

রাজেন বলল, খুব চেষ্টা করব। কী বলব তোকে, বিয়ের পর সীমাকে একবার দীঘা ছাড়া আর কোথাওই নিয়ে যেতে পারিনি। কত্ত যে ঝামেলা। আর রোজগার তো লবডঙ্কা!

বললাম, "থ্রি-টায়ারে করে চলে আয়। স্টেশনে তোদের রিসিভ করার পর থেকে সব দায়িত্ব আমার।

বাস এসে গেল। বললাম, চলি রে।

শীত কিছুই পড়েনি। তবে কলকাতার মানুষেরা তো ক্যালেন্ডার দেখে গরম জামা পরেন। তাছাড়া ধোঁয়াশা আর ডিজেলের ধোঁয়ার কলকাতাকে এখন মনে হচ্ছে শীতের লন্ডন। দু-বছর আগে এগজিবিশন নিয়ে গিয়েছিলাম ওখানে। তাই জানি।

পরের স্টপে ঠিক অক্ষয়-স্যারের মতো এক ভদ্রলোক উঠলেন। মাথায় বাঁদুরে টুপি। হাতে লাঠি। তবে বয়স অত হয়নি। বাস হঠাৎ ছেড়ে দিতেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। উঠে দাঁড়িয়ে ওকে আমার সিটে বসালাম।

উনি মুখে কিছু বললেন না। কৃতজ্ঞতার চোখে তাকালেন।

তোতাপাখির 'থ্যাঙ্ক ইউ' আমার দেশের ঐতিহ্য নয়। আমরা চোখ দিয়েই অনেক জরুরী কথা অনেক বেশি গভীরভাবে চিরদিনই বলে এসেছি। ওই বৃদ্ধও তাই করলেন।

আমি বেঁটে লোক। মিনিবাসের রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। কলকাতার পাবলিক বাসে দিল্লির পাবলিক বাসের চেয়ে অনেক কম ভিড়। দিল্লি হচ্ছে বড়লোক চাকুরে আর ব্যবসাদারদের সুখের জায়গা। মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তদের বিত্তরই অসুবিধে সেখানে। ভাবছিলাম, বাড়িটা দান করে দেওয়া বোধহয় ঠিক হয়নি। কলকাতাতে থাকলেই হত। বাঙালি মধ্যবিত্তের পক্ষে এখনও কলকাতার মতো নিরাপদ ও সুখের জায়গা আর নেই।

কন্ডাকটারকে একজন যাত্রী বললেন, এটা কী হল দাদা? অঙ্কটা কিরকম হল? দিলুম পাঁচ টাকার নোট, যাব শ্যালদা, আর ফেরত দিলেন এই? অঙ্কের জ্ঞানটা একটু ভালো করুন।

অক্ষয়-স্যারের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার। নস্যি নিয়ে, অঙ্ক-কষিয়ে, ছাত্রদের কান মলে, গালাগালি করে, প্রত্যেককে অঙ্ক-বিশারদ করতেই কাটিয়ে দিলেন সারাটা জীবন মানুষটি।

কিন্তু নিজের জীবনের অঙ্কটাই, একটা মাত্র অঙ্ক, অতি সাদামাটা অঙ্ক, তাও মিলল না।

www.BanglaBook.org

গুমোর

সেরাইকেলা থেকে এসে টাটা শহর পেরিয়ে পড়েই হাইওয়েতে ওদের খেয়াল হলো যে, তেল নেয়নি। কিছু পথ আসতেই পেট্রল পাম্প পড়ল সামনে। গাড়ি আস্তে করে পাম্পে ঢোকাল দীপ।

তাতা বলল, ব্যাটারির জল, মবিল এসব চেক করেছিলি!

সব, সব। তুমি তো জমিদারবাবু। তখন ঘুমুচ্ছিলে। তাছাড়া মবিল তো দেখতে হয় গাড়ি স্টার্ট করার আগে। গাড়ি চললেই মবিল উপরে উঠে আসে।

তাতা বলল, আমি আর গাড়ির কি বুঝি? আমার মিনিবাসই ভাল। তবে গাড়ি গণ্ডগোল করলে তখনই বোঝা যাবে তুমিও কতটুকু বোঝো না বোঝো। ঠিকমত যতক্ষণ চলছে, ততক্ষণ তো থিওরিতে সকলেই ডক্টরেট।

একটি ছেলে দৌড়ে এল পাম্পের ভিতর থেকে। বলল, কিতনা সাহাব?

গাড়িটা বন্ধ করে দিয়েছিলো দীপ। আবার একবার চাবিটা ঘুরিয়ে তেল কতখানি আছে দেখে বলল, পঁচিশ।

যতক্ষণে ছেলেটি তেল দিচ্ছিল ততক্ষণে অন্য একটি ছেলে এসে গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনটা পরিষ্কার করে দিল।

তেল দেওয়া শেষ করে প্রথম ছেলেটি বলল, আউর কুছ চাইয়ে সাব? মবিল, ব্যাটারিকা পানি?

নেহী ভাই।

পানি পিজিয়েগা সাব?

দ্বিতীয় ছেলেটি শুধোল।

নেহী। সুক্রিয়া।

www.BanglaBook.org

হিন্দী ফিল্মের নায়কের মতো বলল, তাতা।

টাকা দিয়ে, চেঞ্জ নিয়ে, গাড়ি যখন হাইওয়েতে পড়ল, তখন একটা সিগরেট ধরিয়ে তাতা দীপকে বলল, ডিফারেন্সটা দেখলি?

কিসের?

গীয়ার বদলাতে বদলাতে দীপ জিগগেস করল।

সার্ভিসের।

হুঁ।

এ যদি বাঙালির পাম্প হত, তো দেখতিস, দশবার হর্ন বাজানোর পর একজন লোক অত্যন্ত বিরক্ত মুখে বেরিয়ে বলত, আমার দশটা হাত নেই মশাই! অত তাড়া কিসের?

যা বলেছিস।

দীপ বলল।

এমন লেথার্জিক জাত দুটো নেই। নো-ওয়াভার, সমস্ত কলকাতা শহরে এখন বাঙালিরা মাইনরিটি! মানে, দে ডু নট রিয়্যালী ম্যাটার এনি মোর!

দীপ নিজের মনেই হেসে উঠল। বলল, রাসবিহারী অ্যাভিন্যুতে একবার এক বাঙালি দোকানে জ্যাঠাইমার জন্যে শাড়ি কিনতে গেছি। গরমের দিন। দুপুরবেলা। লোডশেডিং ছিল। দেখি ক্যাশবাক্স সামনে নিয়ে গেঞ্জিটা গুটিয়ে বুক অবধি তুলে মালিক হাত পাখা হাতে, অদ্ভুত ভঙ্গীতে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুচ্ছে। আর যে দোকানে মালিক ঘুমোয়, কর্মচারী তো নিশ্চয়ই ঘুমোবে। যাই হোক, প্রায় ঠেলেঠুলেই বলতে গেলে একজনকে তুলে বললুম, শাড়ি দেখান। ধনেখালি।

সেলসম্যান, ঘুম ভাঙাতে বিরক্ত হয়ে লাল চোখ করে আমাকে বলল, কত দামের?

প্রথম প্রশ্ন শুনেই রক্ত চড়ে গেল মাথায়। আমার সাধ্য পঞ্চাশও হতে পারে পাঁচশও হতে পারে। শাড়ি না দেখিয়েই দাম?

যাই হোক। বললাম, শ'খানেকের মধ্যে।

একটা পুঁটলি খুলে গোটা কয় শাড়ি দেখালে। রঙ পছন্দ হলো না, পাড় পছন্দ হলো না; জমিও নয়।

বললুম, আর নেই?

কেন? এতগুলোর মধ্যে একটাও পছন্দ হলো না।

হলো না তো!

কী জানি বাবা!

নিজের মনেই বিড়বিড় করে বললো সেলসম্যান। তারপর উপরের দিকে তাকিয়েই হাঁক দিল, নিত্যে-এ-এ। এই নিত্যে! শালারা দোতলাতে গাঁটরীর আড়ালে সবসময়ই ঘুমুচ্ছে।

নিত্যে সাড়া দিল না।

আমার দিকে চেয়ে সেলসম্যান বললো, আপনিও মশাই শাড়ি কিনতে আসার আর টাইম পেলেন না?

ইতিমধ্যে নিত্যে গাঁটরীর আড়াল থেকে বললো, বলতিচো কি গো গোবিন্দদা? যা বলবে বলো না, অত চেঁচাতিছ কেন?

ধনেখালি। মনোহারী, ফেল গাঁট।

www.BanglaBook.org

—এই ফেললুম।

বলেই ধপ্পাস করে একটা ইয়াব্বড় গাঁট সটান কাঠের দোতলা বারান্দা থেকে নিচে। একটু হলে আমার ঘাড়েই পড়ত।

সেলসম্যান বিরক্ত মুখে গাঁটরী খুলে বলল, দেখুন; এর মধ্যে পছন্দ না হলে বুঝতে হবে শাড়ি-কেনার মতলবে আপনি আসেননি। আমাদের ঘুম ভাঙাবার মতলবেই এয়েচেন।

জবাবে কী বলব ভেবে না পেয়ে, মালিকের দিকে তাকালাম।

মালিক মাঝে একবার দয়া করে চোখ খুলেছিলেন; আবার চোখে বুঁজে ফেললেন। শাড়ি কিনলে তো টাকা ওঁর কাছেই দিতে হবে আমাকে। তখন তো চোখ খুলতেই হবে। অনেকই কষ্ট হবে তাই একটু আরাম করে নিচ্ছেন।

তাতা বলল, তারপর? ধনেখালি-মনোহারীর গাঁটরীতে মনোমত শাড়ি পেলি?

দুসস। টেস্ট বলে কিসসু নেই। গুচ্ছের ক্যাটকেটে রঙের দামী শাড়িতে ঠাসা। নেড়েচেড়ে বললাম, আর নেই।

আরও?

সেলসম্যান বলল, আমার আস্পর্ধা দেখে চোখ রাঙিয়ে।

তারপর কি বলল জানিস? বলল, এত শাড়ি বাপের জন্মে কখনও একসঙ্গে দেখেছিলেন?

আমি বললুম, কি করে দেখব? আমার বাবার তাঁতের কাজ ছিলো না; শাড়ির দোকানও নয়। অতএব...

দীপ হেসে উঠল।

বলল, টিপিক্যাল বাঙালি ব্যবসাদার!

তাতা বলল, শোন না। আরও কিছুদূর হেঁটে এসে দেখি এক সিন্ধীর দোকান। ছোট্ট দোকান। কিন্তু এয়ার-কন্ডিশানড। দরজা ঠেলে ঢুকতেই মনে হলো আমি যেন কোনো রাজা মহারাজা! কে মালিক, আর কে কর্মচারী কিছুই বোঝবার উপায় নেই। যে ক'জন লোক ছিল সকলে একই সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে আপ্যায়ন করল।

তাঁতের শাড়ি কথাটা আমার মুখ থেকে বেরুবার আগেই আমার সামনে বোধ হয় একটার পর একটা এবং কম করে গোটা বিশেক শাড়ি খুলে দেখানো হয়ে গেল। আর এক একটা শাড়ি, ধরে খুলে পাড়ের প্রশস্তি করে, জমির গুণ গেয়ে এমন ভালোবেসে যত্নের সঙ্গে দেখাতে লাগল যে, মনে হলো যেন শাড়ি তো দেখাচ্ছে না, মেয়ে-দেখতে আসা ভাবী-শ্বশুরবাড়ির লোকদের সামনে নিজের মেয়েকেই দেখাচ্ছে।

ইতিমধ্যে কোথা থেকে একটা উর্দি-পরা ছোকরা এসে হাতে একটা ক্যাম্পাকোলার ঠাণ্ডা বোতল আর স্ট্র ধরিয়ে দিয়ে গেল।

তারপর?

তাতা পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে আরাম করে বসে বলল, তারপর, তুই-ই বল? মহিলারা হলে আলাদা কথা ছিল। তাদের চক্ষুলজ্জা বলে কিছুই নেই এসব ব্যাপারে। কিন্তু যে কোনো পুরুষমানুষের পক্ষেই এর পরেও সে দোকান থেকে শাড়ি না কিনে বেরিয়ে আসা সম্ভব?

পছন্দসই শাড়ি পেলি?

পছন্দসই মানে কি? প্রত্যেকটা পছন্দসই। কোনটা ফেলে কোনটা নিই এ নিয়েই এক

www.BanglaBook.org

মহাচিন্তায় পড়ে গেলুম। কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্যাকেট বগলে নিয়ে ক্যাম্পাকোলা খেয়ে বেরিয়ে এলুম।

দাম? দাম বেশি নিল না?

কোনো সন্দেহ নেই। কম করে ঐ বাঙালি দোকান থেকে পাঁচ-দশ টাকা বেশিই নিলে, কিন্তু হোয়াট ডাজ ইট ম্যাটার? থিঙ্ক অফ দ্যা সার্ভিস। দ্যা ডিফারেন্স ইন অ্যাপ্রোচ। ওরা ব্যবসা করতে এসেছে। খদ্দের ওদের কাছে ভগবান। আর বাঙালি দোকানদার মাত্রই মনে করে, তারা খদ্দেরকে কৃতার্থ করছে।

সত্যি! ভারী দুঃখ লাগে। ভাবলে, এত্তো খারাপ লাগে।

সিগারেটটা জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দীপ বললো, হবে না, কিসসু হবে না; ভিখিরি হয়ে গিয়েও শিখলাম না কিছুই।

তাতা বললো, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস? আজকাল কিন্তু সাউথের পাড়ায় পাড়ায় শাড়ির দোকান হয়েছে অনেক।

তা হয়েছে। বেকার ছেলেরা করছে। অথবা তাদের বউরা। আজকাল সাধারণ চাকরিতে কি একজনের রোজগারে চলে? তবে, এসব কি আর ব্যবসা? আসল যা ব্যবসা সবই চলে গেছে মাড়োয়ারি, গুজরাটি, পাঞ্জাবীদের হাতে। ওরা চব্বিশ ঘন্টা খাটে। ব্যবহার ভাল। কোথা থেকে এসে কোথায় জুড়ে বসেছে। ফলে, আমরা এখন নিজের দেশেই নিজেরা পরদেশী। বাঙালির ব্যবসা ক'টা আছে এই বাংলাতেই? আর যা আছে তা ক'পয়সার ব্যবসা? বল?

যা বলেছিস। আজ থেকে দশ-পনেরো বছর বাদে কলকাতা শহরের চৌহদ্দির মধ্যে ক'জন বাঙালি থাকে দেখিস। সকলকেই চলে যেতে হবে শহরতলীতে। ব্যাঙ্করাপ্ট হয়ে যাচ্ছি আমরা।

সবদিক দিয়েই।

দীপ বলল।

আজকাল প্রফেশনেও ওরা লীড করছে। কেন এরকম হচ্ছে বল তো? আমাদের আসল দোষটা কি?

পরশ্রীকাতরতা। শ্রমবিমুখতা। নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি, কামড়া-কামড়ি। নিজেদের কম্যুনিটিতে কেউ বড় হলে অন্য সকলে তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা তো দূরে থাকুক, তাকে কিভাবে কাছা-ধরে টেনে নামাবে এই চক্রান্তেই সবটুকু সময় নষ্ট করছে। এবং সবচেয়ে দুঃখের কথা, আলটিমেটলী, নামাচ্ছেও। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করাতে এমন দক্ষ জাত আর এই দেশে নেই।

যা বলেছিস।

অবশ্য এর মধ্যে একটা কথা ভাবার আছে। একটা বড় কথা। বাঙালির কাছে কোনোদিনও ম্যাটেরীয়াল ওয়েল-বীইংটা বড় ছিল না হয়ত। বাঙালি গান শোনে, বাজনা বাজায়, বই পড়ে, বই লেখে, বাঙালির রবীন্দ্রনাথ আছেন। রবিশঙ্কর, সত্যজিৎ আছেন। বাঙালি ফুটবল আর ক্রিকেট পাগল। ক্রিকেটের এমন সমঝদার আর কোন জাতে আছে বল? খুব কম অন্য-প্রদেশীয়দেরই জীবনে এত বিভিন্ন দিক আছে, এত ওয়াইড-ইন্টারেস্ট আছে।

বুলশীট।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দীপ উত্তেজিত গলায় বলল।

টোটাল বুলশীট। লেম এক্সকিউজ।

তারপর বলল, যাঃ যাঃ, আসল কথা হলো "মুখেন মারিতং জগৎ।" একটি ফাঁকিবাজ হুজুগে জাত আমরা। ক্রিকেট এতই যদি বুঝি তো টেস্ট-ক্রিকেটে ক'জন বাঙালির নাম করতে পারি আমরা? জানি আমরা সবই, কিন্তু করিনা, কিছুই। কিসসু না করেই সবজান্তা! সাধনা না-করেই সব-বোদ্ধা!

একটু চুপ করে থেকে দীপ আবার বললো, বাঙালির সবচেয়ে বড় শত্রু কি বলতো?

সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স।

না। তার চেয়েও বড় শত্রু? কি নয়, কে? যে এই জাতটার সর্বনাশের গোড়া? এই ফালতু সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সেরও মূল?

—কে?

—জোব চার্নক। সে ব্যাটা ইংরেজ যদি সুতানুটি, গোবিন্দপুরে এসে জাহাজ না ভেড়াত, তাহলে এ জাতটার হয়ত আর এই দুর্দশা হত না। ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথমে ইংরেজি শিখে, প্রথমে আই.সি.এস. জজ, ডাক্তার, উকীল, ব্যারিস্টার, সলিসিটর, বেনিয়ান, মুৎসুদ্দী সব হয়ে আমরা ভাবলাম, আমরা কী বুঝি হনু! ইংরেজি ভাষাকে আমরা শিক্ষার সঙ্গে গুলিয়ে ফেললাম। যেন ভারতবর্ষে তার আগে শিক্ষা-সভ্যতা বলে কিছুই ছিলো না। শুধু পা-চেটে আর ইংরেজির জ্ঞান দিয়ে বৈতরণী যে পেরুনো যায় না এখন তা আমরা চোখের জলে নাকের জলে বুঝছি। কি বলিস? বুঝছি না?

বুঝলাম আর কই! এখনও তো গুমোর যায়নি। আর সবই গেছে, কিন্তু গুমোর যায়নি। যে-কোনো জায়গায় তিনশ টাকা মাইনেতে চাকরি করতে পারি আমরা, কিন্তু পারি না একটা পানের-দোকান করতে। বড়ই ইজ্জতে লাগে। ইজ্জৎ! বে-ইজ্জতের আর কি বাকি আছে?

ছাড় তো। অন্য কথা বল। মন খারাপ হয়ে যায়। নিজেদের কথা আর বলিস না। এসব কথা যদি কাউকে বলতেও যাস, সে বলবে মেলা জ্ঞান দেবেন না মশায়! চুপ কর। যা হবার হোক।

একটু চুপ করে থেকে দীপ বললো, যে কম্যুনিটি নিজেদেরই টেনে নামায়, যাদের কোনো ফিলিং নেই একে অন্যের প্রতি ; কিছুমাত্রও যারা করে না অন্যের জন্যে, নিজেদের মধ্যে কারো ভালো হলে হিংসেয় যাদের বুক জ্বলে যায় ; তাদের কপালে আরো অনেক দুঃখ আছে। এখনই কি? তুই লিখে রাখ।

আরও কত দুঃখ? এখনও কি যথেষ্ট হয়নি?

না। হয়নি।

॥ ২ ॥

বহড়াগড়ার কিছু আগে টায়ার পাংচার হলো ওদের গাড়ির। হতেই, দেখা গেলো যে, গাড়ির প্যাসেঞ্জারের মতো মালিকও গাড়ি সম্বন্ধে কিছুই জানে না। কাঁদো-কাঁদো মুখে কবুল করল যে, জীবনে কখনও নিজে-হাতে টায়ার বদলায়নি দীপ। অতএব, দুজনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে জামা-কাপড়ে ধুলোবালি মেখে, অনেক কসরত করে অনেকক্ষণ ধরে টায়ার চেঞ্জ করল।

www.BanglaBook.org

বহড়াগড়াতে পৌছতে পৌছতে প্রায় সাতটা হয়ে গেল। টিউবটা সারাতে হবে। সেই ফাঁকে চা-টা খেয়ে নিল ওরা।

তাতা বললো, তোর বিদ্যে তো দেখলাম! এবার পথে রাতের অন্ধকারে কোনো মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল ট্রাবল হলে কি হবে?

অলুক্ষুণে কথা বলিস না তো!

দীপ বিরক্তির গলায় বলল।

তারপর বললো, স্বগতোক্তির মতো; রাতের বেলা এসব রাস্তা আজকাল সেফ নয়। কোনো রাস্তাই সেফ নয়। গাড়ি তো দূরের কথা; ট্রেন পর্যন্ত সেফ নয়। তাই-ই ওসব কথা একেবারেই বলিস না।

টিউব সারিয়ে নিয়ে বেরোল যখন, তখন প্রায় পৌনে আটটা বাজে। আকাশে বেশ মেঘ করেছে। কলাইকুণ্ডার আগে থেকে বৃষ্টিও পেলো। কুড়ি-পঁচিশ কিলোমিটার রাস্তা। তারপর বিদ্যুৎ চমকানি আর মেঘের গর্জন।

আন্দুল যখন পৌছল এসে, তখন ঠিক এগারোটা। বটানিকস-এর পাশে এসে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। তারপর রামকেষ্টপুরে গাড়ি পৌছতেই গোঁ-গোঁ-গোঁ শব্দ করে গাড়ি থেমে গেল।

রাস্তা-ঘাট প্রায় জনশূন্য। কিছুক্ষণ গাড়িতে বসে ওরা একে-অন্যকে গালাগালি করল গাড়ি সম্বন্ধে কিছুই না-জানার জন্য।

তারপর তাতা নেমে ঠেলতে লাগল গাড়ি, বৃষ্টির মধ্যেই। দীপ স্টীয়ারিং-এ বসে কি করা যায় তাই ভাবতে লাগল, আব্রাকাডাব্রা ; আব্রাকাডাব্রা।

তাতা গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে গাড়ির মালিক বন্ধু দীপকে যা-তা গালাগালি করতে লাগল মনে মনে। এমন বন্ধুর চেয়ে শত্রুও ভালো।

তেমাথাতে এসে পৌছল গাড়িটা। সামনে একটা পেট্রল পাম্পও ছিল। বাঙালির পাম্প। দীপ গাড়ি থামিয়ে পাম্পে গিয়ে মিস্ত্রীর খোঁজ করল।

মিস্ত্রী নেই। এত রাতে মিস্ত্রী কোথায়?

কী করা যায়?

কী বলব?

একটা ফোন করতে পারি?

ফোনের চাবি মালিক নিয়ে গেছেন। মালিক ঠিক আটটায় চলে যান। ফোন ধরা যাবে; কিন্তু করা যাবে না।

গাড়িটা এখানে রাতের মতো রেখে যেতে পারি? আরও তো ট্যাক্সি-ফ্যাক্সি আছে দেখছি পাম্পে।

পারেন। গাড়ি চুরি হলে, আমরা কোনো দায়িত্ব নেবো না। আর রাতে রাখার জন্য দশ টাকা নেবো।

তাহলে কি করা যায়?

কী বলব?

বলেই, ভদ্রলোক হাঁক ছাড়লেন, কি রে পেঁচো, দু'খিলি অখয়েরী-গুণ্ডী মোহিনী আনতে বললুম না তোকে!

দীপ ফিরে এল গাড়িতে। তারপর বনেটটা খুলে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকল পাশে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যে কিছুই বোঝে না গাড়ির, সে বনেট বন্ধ থাকলেও বোঝে না, খোলা থাকলেও বোঝে না। তোর সঙ্গে আসাই অন্যায় হয়েছে। এই-ই শেষ, তুই একটা ইরেসপনসিবল চাইল্ড। এ যদি রামকেষ্টপুর না হয়ে জঙ্গলের মধ্যে হত?

তাতা রাগে ফেটে পড়ে বলল।

দীপ লজ্জিত ছিল; অপদস্থও। এবার রেগে গিয়ে বলল, এ তো জঙ্গলের বাপ। আজকালকার জঙ্গলের বাঘ-ভাল্লুক, শহরের মানুষের চেয়ে অনেক ভালো।

তাতা এবার একটা সিগারেট ধরিয়ে বিদ্রূপাত্মক গলায় বলল, গাড়িটা স্টার্ট কর—চল তাহলে জঙ্গলেই ফিরে যাই আবার।

দীপ কথাটা হজম করে গুম মেরে বসে রইল।

কয়েকজন ধুতি-পাঞ্জাবী পরা মাঝবয়সী বাঙালি ভদ্রলোক জটলা করে দাঁড়িয়েছিলেন গাড়িটার কাছেই, একটা পানের দোকানের ছাউনীর নীচে, বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচিয়ে। বৃষ্টির জোর ততক্ষণে কমেছে কিন্তু টিপটিপ করে পড়ছে। মনে হচ্ছে, এমনই চলবে সারারাত।

দীপ বনেট বন্ধ করে এসে গাড়িতে বসল। ভিজে একেবারে চুপচুপে। তাতা তো আগেই ভিজেছিল গাড়ি ঠেলতে গিয়ে। কাচ-মোছা ন্যাকড়া দিয়ে দুজনেই ভালো করে মাথা মুছল।

তাতা হঠাৎ বলল, ঐ দ্যাখ বাঙালিদের। বঙ্গনন্দনরা সব গ্যাঁজাচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। লোকগুলোর কখনও বয়স হবে না। কলেজ জীবনে যেমন ফুটপাথে দাঁড়িয়ে গ্যাঁজাত, এখনও তেমনিই গেঁজিয়ে যাচ্ছে। এক ব্যাটাও কি একটু সাহায্যের কথা বলবে? তুই গিয়ে বল, দেখবি খেঁকিয়ে উঠবে। রাস্তাও তো ক্রমশ নির্জন হয়ে আসছে রে! এত রাতে এখান থেকে যে ট্যাক্সী করে ভবানীপুর যাব, তারও তো উপায় নেই। গাড়িটাকে ফেলে রাখাও যায় না। নতুন গাড়ি। কি করি বল তো?

গাড়ি তো আমার নয়। থাকলে, গাড়ি কেন এবং কী করে চলে আর কেনই বা হঠাৎ পথে থেমে যায়, তা নিশ্চয়ই জেনে নিতাম গাড়ি নিয়ে শহর ছেড়ে বেরুবার আগে। আমি বরং এগোই তাহলে। হেঁটে অথবা রিকশা করেও হাওড়া স্টেশনে পৌঁছাতে পারলে একটা গতি আমার হবেই। তোর গাড়ি, তুই থাক।

চাপা অভিমানের গলায় দীপ বলল, তুই তাহলে তাই-ই চলে যা। আমার জন্যে কেন ঝামেলায় পড়বি?

ঝোড়োকাকের মতো পাতলা হয়ে যাওয়া ক'গাছি ভেজা চুল নাড়িয়ে তাতা প্রচণ্ড চটে উঠে বলল, ঝামেলার বাকি কি আর রেখেছো?

তারপরেই তাতা পানের দোকানের দিকে চেয়ে একটু কান খাড়া করে শুনে বলল, লোকগুলো কি নিয়ে আলোচনা করছে রে?

ঘোড়া।

ঘোড়া?

হ্যাঁ। কাল শনিবার না? রেস আছে তো।

তারপর বললো, সকলেই টেনে আছে। মুখে গন্ধ পেলাম। শালা! কী আর হবে এদের! তুই এদের বলবি সাহায্যের জন্য? ফুঃ।

—একবার গিয়ে বলই না, তবুও...।

দীপ অনুনয় করে বললো।

www.BanglaBook.org

কী, বলবটা কি। বলব, আমরা বুড়ো খোকারা গাড়ি চড়ে সাতশ' মাইল ঘুরে এলাম জঙ্গলে জঙ্গলে। আর বাড়ির দোরগোড়াতে রামকেষ্টপুরে এসে গাড়ি খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু কী যে খারাপ হলো, কেন খারাপ হলো আমরা জানি না, বুঝি না। কচিখোকা! দুধের শিশু! দাদারা, আমাদের বাঁচান? এই বলে কাঁদবো?

দীপ এ অপমানটাও বেমালুম হজম করলো।

—লোকগুলো যে ভদ্রলোক, ছিনতাই পার্টি নয়; তাই বা কে জানে? আমার হাতের ঘড়িটা আবার রোলেক্স। মানিব্যাগেও শ'পাঁচেক টাকা আছে।

—আমার এইচ-এম-টি। তোর গাড়িতে বেড়াতে এসে আমার ঘড়ি গেলে তুই-ই কিনে দিবি। মানিব্যাগে সাঁইত্রিশ টাকা আছে। গেলে, সেটাও দিবি। প্লাস মানিব্যাগের দাম, তেরো টাকা। মনে থাকে যেন।

দীপ তবুও চুপ করে রইল।

পথ আস্তে আস্তে একদম ফাঁকা হয়ে আসছে। লোকগুলোর আলোচনা কিন্তু তখনও শেষ হয়নি। ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করত, ভারতের অন্যান্য প্রদেশীয়রা রাজ্যের পর রাজ্য জয় করত অবহেলায়। স্বয়ম্বর সভা থেকে সুন্দরী তুলে আনত। আর এই বাঙালিরা? ঘোড়ায় চড়ে সর্বনাশের পথে যাচ্ছে! রেসের ঘোড়া। তাও নিজে চড়ে নয়।

এবার বোধহয় আড্ডা ভাঙলো। একে একে দলছুট হতে লাগলো লোকগুলো। ডি-ফ্রস্ট হয়ে গড়িয়ে গেলো বিভিন্ন দিকে।

দীপ গলা বাড়িয়ে ওদের কিছু বলবে বলবে করল, কিন্তু লজ্জা করল; বলতে পারল না।

এই লজ্জাই বাঙালিকে খেল। এই লজ্জা, এই অদ্ভুত মানসিকতা। দীপ ভাবল।

এমন সময় ওঁদের মধ্যে একজন গাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে থেমে গিয়ে বললেন, কি হলো দাদা? অনেকক্ষণ থেকেই দেখছি দাঁড়িয়ে আছেন ঠায় এখানে। এ পাড়া কিন্তু ভাল নয়। রাতও হলো। এবার এগোন।

তারপর বললেন, হলোটা কী? গাড়ি খারাপ হলো না কি?

হ্যাঁ। দীপ বলল।

হ্যাঁ-টা এমনভাবেই বললো যে, তাতার মনে হলো, বলল; ভ্যাঁ।

কি খারাপ হয়েছে? তেল আসছে না?

তাতা তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। জামা-কাপড় এমনিতেই ভিজেছে। তাই বাঁ-হাতটা জানলা দিয়ে বাইরে রেখেই বসেছিল। পিটপিট করে বৃষ্টি পড়ছিল হাতে। পড়ুক। এখন শরীর মনে সাড় নেই কোনো। ক্লান্ত, বিরক্ত।

ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞেস করলেন, গাড়ির কমপ্লেইনটা কি দাদা, তা তো বলবেন?

তাতা মুখটাকে এক হ্যাঁচকাতে আরো বাঁদিকে ঘোরালো। ঘাড়ে লাগলো।

দীপ হঠাৎ ফোঁড়া-ফাটার মত বললো : জানি না। গাড়ির কিছুই বুঝি না দাদা!

অ্যাই রে! কি ঝামেলায় ফেললেন বলুন তো! আমার তো গাড়ি নেই, আমি যে সাইকেলের সওয়ারী। সাইকেল হলে, এক্ষুনি ঠিক করতে পারতুম। বলেই, হাঁক ছাড়লেন বন্ধুদের, অ্যাই রমেশ, চাঁদু, মানকে, চিনু যাসনি তোরা। এঁরা বিপদে পড়েছেন। ইদিকে আয়।

www.BanglaBook.org

যাঁরা এলেন তাঁদের মধ্যে মনে হলো, একজন গাড়ি সম্বন্ধে কিছু বোঝেন-টোঝেন।

যে ভদ্রলোক প্রথমে এসেছিলেন, তিনি চিনিয়ে দিয়ে বললেন, অ্যাই যে, আমার বন্ধু মানকে। মানকে দাস। যৌবনে মহা-কাপ্তান ছেল। লাল-রঙা স্পোর্টস-মডেল বেন্টলী চেপে ঘোড়ার মাঠে যেত আমাদের নিয়ে। স্কচ ছাড়া খেতো না। বেনারসের সুরাতিয়া বাঈজী ছাড়া কারো গলার গজল-ঠুংরী ভালো লাগত না তখন। এখন পা-গাড়ির ওনার। তবে, এখনও কোনো গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ শুনেই আমার দোস্ত বলে দেবে কি ব্যামো গাড়ির।

—কিন্তু কোনো শব্দই করছে না যে এঞ্জিন।

দীপ হতাশার গলায় বলল।

সে কি মশাই! ভদ্রলোক হেসে ফেললেন। আঁতুড়েই নুন গিলিয়েছেন?

মানিকবাবু, মানে মানকে, দেখে-টেখে বললেন, হয় ব্যাটারী জ্বলে গেছে, নয় ডায়নামো চার্জ দিচ্ছে না। ব্যাটারীতে জল ছিলো তো? ফ্যানবেলট? ফ্যানবেলট ঠিক আছে?

দীপ যেন ল্যাটিন কি হিব্রু শুনছে। এমনই মুখ করে তাকিয়ে রইল মানিকবাবুর মুখে নির্বাক হয়ে।

তাতা হঠাৎ বলল, আরে, এতক্ষণ আপনারা পানের দোকানের ছাউনির নীচে ছিলেন, এখন একেবারেই ভিজে গেলেন যে।

চাঁদু বলে যে ভদ্রলোক, তিনি বললেন, বাঙালি বিপদে পড়েছে, একটু না হয় ভিজলুমই! রোজ তো আর বিপদে পড়ছেন না আপনারা! তাছাড়া, এতো দেশেরই বৃষ্টি। এতে অসুখ ধরবে না।

তারপর ওঁরা সকলে মিলে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে মিনিট পাঁচেক উত্তেজিত আলোচনা করার পর মানিকবাবু বললেন, পটলের গ্যারেজেই নিয়ে যেতে হবে। এছাড়া উপায় নেই কোনো।

পটলা কি আর মানুষ আছে? বাঙলা টেনে, খিচুড়ি সেঁটে, লম্বা দিয়েছে এতক্ষণে। ঠাণ্ডার দিন।

লম্বা দিলে আমরা টেনে ওকে ঝাঁকিয়ে দেবো। রোজ তো আর করি না। দাদারা বিপদে পড়েছেন।

বলেই বললেন, থাকেন কোথায় দাদারা?

দীপ বলল, আমি ভবানীপুর। আর আমার বন্ধু টালীগঞ্জ।

হুঁ! বাবাঃ এ পৃথিবীর একেবারে অন্যপ্রান্তে।

তাতা ও দীপ এতক্ষণে নেমে দাঁড়িয়েছিলো। এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, ঠেলবার লোকও তো দেখছি না একজনও। কোনো কুলী, কি ঠেলাওয়ালা...

কেন? মানিকবাবু বললেন। আমরা কি লোক নই?

সে কি? আপনারা? তাতা বলল। গাড়ি ঠেলবেন?

দীপ অবাক হয়ে বলল, পটলবাবুর গ্যারাজ কত দূর?

তা আধমাইলটাক তো হবেই কম করে। পৌনে এক মাইলও হতে পারে।

বলেন কি? দীপ আঁতকে উঠল।

এছাড়া উপায় কি? এখন কোনো গ্যারাজ খোলা নেই। পটলা আমাদের, মানে; বন্ধুর মতো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চাঁদুবাবু বললেন, কথায় কথা বাড়ে। খামোখা দেরি করছিস কেন?

তারপর দীপকে প্রায় ধমক দিয়েই বললেন, দাদা আপনি স্টিয়ারিং-এ বসুন তো।

তাতা ওদের সঙ্গে হাত লাগাল। দীপ ওদের নির্দেশানুযায়ী স্টিয়ারিং ঘোরাতে লাগল। তরতর করে নৌকার মতো চলতে লাগল গাড়ি।

বেশ দূরে যাবার পরে গাড়িটা একটা ভাঙাচোরা কাঁচা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। লোডশেডিং হয়ে গেল ঝুপ করে। ঠিক সেই সময়েই।

দীপের তলপেট ভয়ে গুড় গুড় করতে লাগল। আজকে প্রাণটাই যাবে।

তাতা গাড়ি ঠেলতে ঠেলতেই, দৌড়ে পালিয়ে যেতে হলে কোন দিকে দিয়ে যাবে, তা একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল। ওরও ভয়ে গলা শুকিয়ে গেছিল।

ক'টা বাজল রে?

মানিকবাবু শুধোলেন।

দীপ বলল, পৌনে বারো।

রোলেক্স অটোমেটিক-ডে-ডেট!

আমি দেখে নিয়েছি।

মৃন্ময়বাবু বললেন।

দীপের জিভ শুকিয়ে কাঠ হয়ে এল। কী ঘড়ি? সেটা পর্যন্ত দেখে নিয়েছে। এরা নিশ্চয়ই ডাকাত-ফাকাত।

কখন যে পটল মিস্ত্রীর গ্যারেজে পৌঁছল গাড়ি, অন্ধকারে পচা-নর্দমার পাশ দিয়ে, দীপ বুঝতেই পারল না। ঘোরের মধ্যে ছিল যেন। মাটির-মেঝে, বাঁশের চাঁচের; মাত্র দুটি-গাড়ি-ধরে এমন সাইজের একটি টিনের শেড। অতি ছোট্ট কারখানা।

পটল মিস্ত্রী সত্যি সত্যিই লম্বা দিয়েছিল। একটা কাঠের বেঞ্চে আন্ডারওয়্যার পরে শুয়ে, খালি গায়ে নাক ডাকছিল।

কথা মতই তাকে টেনে বেঁকা করলেন মানিকবাবু, চাঁদুবাবু আর মৃণ্ময়বাবু মিলে।

মানিকবাবু ঠিকই ধরেছিলেন। কাট-আউটের গোলমাল ও আর্মেচারেরও সামান্য গোলমাল ছিল। সারতে লাগল প্রায় এক ঘণ্টা। যতক্ষণ না গাড়ি ঠিক হলো ওঁদের মধ্যে মৃন্ময়বাবু আর মানিকবাবু বসে রইলেন। দীপ আর তাতাকে নমস্কার করে চাঁদুবাবু একটু আগে চলে গেছিলেন।

বাঃ বাঃ! এঞ্জিন তো চমৎকার বলছে। হেড লাইট, হর্ন; সব ঠিক।

দীপ উজ্জ্বল মুখে বলল, কত দেবো?

পটল বলল, কাটুন তো আপনারা। এই মানকেদাটার যত্ত থার্ড কেলাশ কাণ্ড। কাটুন। এবার একটু ঘুমুই। ঘুমুতে দিন। পয়সা নেবো না।

তা কি হয়?

দীপ বলল।

মৃন্ময়বাবু বললেন, জোর করেই যদি দ্যান তো দিয়ে দিন পাঁচটা টাকা।

পাঁচ টাকা কি? উনি কতবড় উপকার করলেন আমাদের, কতক্ষণ ধরে পরিশ্রম করলেন এত রাতে।

দীপ কুড়িটা টাকা বের করল।

www.BanglaBook.org

পটল মিস্ত্রী মানিকবাবুকে রুক্ষস্বরে বলল, অ্যাই মানকেদা, ভদ্রলোককে বলে দাও, আমি ভিখিরি নই যে বকশিশ নেবো। নেহাৎ তোমার খাতিরেই মাঝ রাত্তিরে করলুম। আমি শালা বাঙালির বাচ্চা, পয়সাই আমার কাছে সব নয়। পয়সা চাইলে অনেক মালই এতদিনে জমাতে পারতুম।

মানিকবাবু ধমকে বললেন, মেলা ভ্যাচোর ভ্যাচোর করিসনি। নে, এই দশটা টাকা রাখ। আমি দিচ্ছি। শালা, চ্যারিটেবল ডিসপেনসারী খুলে বসেছে এখানে। গাড়ল।

বলে, বাকি দশ টাকা দীপকে ফেরত দিলেন। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করে গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে, এঞ্জিন স্টার্টে রেখেই দরজা খুলে দীপ গাড়ি থেকে নামল। তাতাও। বলল, আপনারাও উঠুন এগিয়ে দিই।

মৃন্ময়বাবু হাসলেন। বললেন, সে তো এগোনো হবে না দাদা, পেছোনো হবে। আমরা দুজনেই এদিকেই থাকি।

বলেই, লোর্ডশেডিং-হওয়া রাতের হাওড়ার কাঁচা নর্দমা ঘেরা ঐ অন্ধকার গলির গভীরতর অন্ধকারে আঙুল দেখালেন।

দীপ বলল, আপনাদের জন্যে আমি, মানে আমরা কি করতে পারি...? যদি বলেন, মানে...বলেই, ও কাউকেই জীবনে ঠকায়নি, ঠকাতে চায় না এমন ভাবমাখা গর্বগর্ব মুখ করে হিপ পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল।

মানিব্যাগ বের করার পরও ওঁদের চুপ করে থাকতে দেখে, ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি বলল, কালকে আবার আপনাদের রেস...আপনারা বই দেখছিলেন...রেস মানেই তো খরচা।

মানিকবাবু, বুক-ছেঁড়া একটা অতি সস্তা মোটা কাপড়ের পাঞ্জাবি আর মোটা ধুতি পরে ছিলেন।

হেসে বললেন, বাঙালি হয়ে অন্য বাঙালির বিপদে এতটুকুই না করলে, কী করলাম!

মৃন্ময়বাবু বললেন, আমার একটা ছোট্ট ঘড়ি-সারানোর দোকান আছে। রাধাবাজার। দোকান মানে, একটা ঘড়ির দোকানের বারান্দাতে বসি। একদিন আসবেন। চা খেয়ে যাবেন এককাপ। আপনার ঘড়িটা কিন্তু রাজা-ঘড়ি।

দীপ বোকা-বোকা হাসল। কি বলবে, তা একেবারেই ভেবে পেল না। মানিব্যাগটা পকেটে রেখে বলল, আপনারা কিন্তু কিছু মনে করবেন না, আমি কিন্তু আপনাদের অপমান করতে চাইনি।

মানিকবাবু হেসে বললেন, অপমান কে কাকে করে মশাই! আমরা গায়ে মাখলে তো ওসব কথা। আসল ব্যাপার কি জানেন? টাকাকে যদি এতই দামী ভাবতুম, তবে অমন করে টাকা ওড়াতে পারতুম না। বাঙালির কাছে টাকার চেয়েও বড় যে অনেক কিছুই ছিল। এবং আছে। টাকাওয়ালা মাড়োয়ারী-গুজরাতী-পাঞ্জাবীরা বাঙালিকে, শুধু টাকা নেই আর টাকার লোভ নেই বলেই হেয় করে এল চিরদিন। আর বাঙালিও কান নিয়ে গেছে শুনে ওদের কথা মতো দৌড়ুতে শুরু করল নিজের কানে হাত না দিয়েই।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, কিন্তু আপনি তো একজন বাঙালি। বাঙালি হয়েও বাঙালিকে ভুল বোঝা কি ঠিক?

তাতা কথা ঘুরিয়ে বলল, রাত তো প্রায় দেড়টা। আপনাদের খাওয়া-দাওয়া...বাড়িতে

www.BanglaBook.org

চিন্তা...

মানিকবাবু জোরে হেসে উঠলেন। বললেন, আমার তো বউ-ই নেই। যখন মাল ছেল, না-বিয়ে করা অনেকেই ছেল। তবে, মৃন্ময়ের আছে। বিয়ে-করা বউ। পাড়ায় যখন যারই বিপদ হয়, মৃন্ময় সবচেয়ে আগে দৌড়ে যায়। ওর বউ নিশ্চিত ভাত নিয়ে জেগে বসে থাকবে ওর জন্যে। আপনাদের কোনোই চিন্তা নেই। মৃন্ময়কে সে ভাল করেই চেনে।

দীপ বলল, ছিঃ ছিঃ এত রাতে। আমাদের জন্যে আপনাদের সকলের...

মানিকবাবু ধমক লাগালেন।

বললেন, যান, পালান তো এবার। আপনাদের বউরা কি ওয়্যারলেসে খবর পেয়েছেন যে, আপনারা কেয়ার-অফ মৃন্ময় বাঁড়ুয্যে আছেন? চিন্তা বুঝি তাঁদের নেই?

মৃন্ময়বাবু বিনীত মুখে বললেন, আপনাদের তাড়া না-থাকলে গরিবের বাড়িতেই একটু খিচুড়ি খেয়ে যেতে পারতেন। আমার বউ খুব তাড়াতাড়ি রেঁধে দিত। দেরী হত না কিন্তু।

দীপ বলল, না, না, আমাদের রাত নটার মধ্যে পৌঁছনোর কথা ছিল।

তাহলে আর একটাও কথা নয়। এক্ষুনি রওয়ানা হোন ভালোয় ভালোয়।

তাতা নমস্কার করে বলল, যাচ্ছি, দাদা।

যাওয়া নেই, আসুন।

বলে, ওঁরা দুজনেই হাত তুলে নমস্কার করলেন ওদের দুজনকে। তারপর ঝুপঝুপে অন্ধকার আর টিপটিপে বৃষ্টিতে কাঁচা গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

গাড়ির হেডলাইটটা অন্ধকার গলিটাকে পুরোপুরি আলোয় ভরে দিয়েছিল! দীপ গাড়ি চালাচ্ছিল চুপ করে। তাতাও চুপ করে ছিল। কেউই কোনো কথা বলছিল না। তাতার চোখের সামনে মানিকবাবুর বুক-ছেঁড়া, মোটা, অতি সাধারণ কাপড়ের সস্তা পাঞ্জাবিটা ভেসে উঠছিল।

দীপের চোখের কোণ দুটো জ্বালা করছিল।

তাতা একটা সিগারেট নিজের মুখে দিয়ে, ধরিয়ে, দীপের মুখেও একটা গুঁজে দিল। তারপর কাঁপা কাঁপা হাতে দেশলাই জ্বালতে জ্বালতে বিড়বিড় করে বলল; বুঝলি, এই আমরা; আমরা শালা একটা আশ্চর্য...

তাতার মুখ-নিঃসৃত বাক্যের শেষাংশটি ভেঙে গেল ওর জিভের মধ্যে।

দেশলাই-এর কাঠিটা জ্বলে উঠেই দপ করে নিবে গেল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরী পয়রা

ডানদিকে শাল আর চাল্লার জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ চলে গেছে ন্যাশনাল হাইওয়ের দিকে। সেখানে গিয়ে উঠলে সোজা লোধাশুলি। আরও এগিয়ে গেলে শালবনী। ঝাড়গ্রাম।

মুঠিয়া জায়গাটা, বাংলা আর ওড়িশার সীমান্তবর্তী। পয়রা পদবিটা শহরের লোকের বিশেষ পরিচিত নয়। এই পয়রাদের কাজ স্যাকরাদেরই মতো। গাঁয়ে-গঞ্জেও স্যাকরা থাকে।

মদন পয়রা, পরীর বর। বয়সে বছর বারোর ব্যবধান দু-জনের। মদন বাড়ি এসে গয়না বানিয়ে বালেশ্বরে বড় মহাজনের দোকানে অর্ডারি গয়না সাপ্লাই করে। কখনও-সখনও নিজের পছন্দসই ডিজাইনের গয়না নিয়ে বাংরিপোসি আর ঝাড়ফুকুরিয়ার মধ্যে সপ্তাহে যে একদিনের হাট লাগে সেখানে গিয়ে বেচে আসে। তবে সে হাটে বিকোয় রুপোর গয়নাই বেশি। সরু কোমরের, করৌঞ্জ আর নিমের তেল-মাখা তন্বী মেয়েরা আসে মাঝবয়সী কালো কবুতরের মতো। বুকের আর বগলতলির ঘামের গন্ধে ছেয়ে যায় হাট, মুরগি আর মুরগির ডিমের আঁশটে গন্ধের সঙ্গে মিশে।

শেষবেলা অবধি কেনাবেচা করে জঙ্গলের পথ ধরে অনেকখানি এসে সুবর্ণরেখা পেরিয়ে মুঠিয়া গ্রামে ফেরে মদন রাতের বেলা। কখনও চাঁদ থাকে। কখনও থাকে না। গ্রামের সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে গল্প করতে করতে হাঁড়িয়া-খাওয়া-সুখে অতখানি পথ যেন উড়েই আসে মদন। শরীর তখন পাখির শরীর হয়ে যায়। রাত-পাখির মতো। বসন্তর বনের হাওয়া শালের পাতায় ফুরফুর করে। তার শরীরেও। যেন পালকে ভরে গেছে বলে মনে হয় শরীর।

মদনকে মুঠিয়া গ্রামের অনেকেই হিংসে করে। বিঘে পাঁচেক ডাঙা জমি। পঁচিশ বিঘা

www.BanglaBook.org

ধান-জমি। তদুপরি এই সোনা-রূপার ব্যবসা। কিন্তু এইসবও কিছু নয়। হিংসে করে পরীর জন্যে। ডানা-কাটা পরীরই মতো রূপ ছিলো পরীর। এখন তিরিশে এসে সে-রূপে বান ডেকেছে।

সোনা-রুপোয় মুড়ে রাখে পরীকে মদন, তবু পরীর মন পায় না। ছেলেমেয়ে নেই ওদের। তার জন্যেও দুঃখ নেই মদনের। যদি বুঝতে পারতো একটিবারেরও জন্যে, পরী কি চায় তার কাছ থেকে? কিসে তার সুখ? তবে বর্তে যেতো সে।

ও যা কিছু চায়, সবই পরী দেয় তাকে। যা খেতে ইচ্ছে হয়, রেঁধে দেয়। যখন আদর করতে ইচ্ছে করে, আদর করতে দেয়। যেমন করে চায় ও, তেমন করেই দেয়। অনেক পুরুষ বন্ধুদের কাছে মদন শোনে তাদের স্ত্রীদের সম্বন্ধে নানা অনুযোগের কথা। গণেশ কোকশাস্ত্রর বই এনে দিয়েছিলো একটা কলকাতা থেকে। কামশাস্ত্রর ছবিওয়ালা বইও। সব ছবিকেই ও তার শোবার ঘরের বিছনার ফ্রেমে বাঁধিয়েছে একবার বা একাধিকবার। পরীর কিছুতেই আপত্তি নেই।

কিন্তু সব দিয়েও পরী যেন কিছুই দেয় না মদনকে। কী যে সে তার নিজের কাছে রাখে, তা বুঝতে পারে না মদন তার সব বুদ্ধি দু-হাতে জড়ো করেও। বুঝতে পারে না বলেই জৈষ্ঠের দুপুরের চড়াই-এর মতো ছটফট করে।

পরী কথা বলে না আদর খাওয়ার সময়ে। বিলিতি পুতুলের মতো মদনের কথামতো কাজ করে যায়। তখন পরীর মুখে এক আশ্চর্য হাসি লেগে থাকে। প্রদীপের পলতে নয় সে হাসি। ভালোবাসার হাওয়া লেগে তা বাড়ে-কমে না। ইলেকটিরির বাল্বের মতো স্থির সমান উজ্জ্বলতায় জ্বলতে থাকে তা। মাঝে মাঝেই মদনের মনে হয় যে, তার কোনো মানুষীর সঙ্গে বিয়ে হয়নি; বিয়ে হয়েছে কোনো সত্যি পরীরই সঙ্গে। যে-পরীরা গা-ছমছম জ্যোৎস্না-রাতে শালের বনে কী সুবর্ণরেখার সোনার মতো বালুভূমিতে খেলে বেড়ায়। মেয়েমানুষটার বুক চিবুক দু-হাতের মধ্যে নিয়ে, তার নিঃশ্বাসের মিষ্টি গন্ধে নিজের বিড়ি-ফোঁকা দুর্গন্ধি মুখ সুগন্ধি করে তুলেও মেয়েমানুষটার মনের কাছে কোনোদিনও আসতে পারেনি গত পনেরো বছরে।

পরী রাতের পর রাত তাকে বনের পরীর মতো কুহকের রাজ্যে নিয়ে যায়। সর্বস্বান্ত হয়ে মদন পয়রা হাহাকার করে। যাকে অন্য যে-কেউই সুখের চরম বলে জানতো, তা পেয়েও মদন বুঝতে পারে সুখের বাড়ি অনেক দূরে।

পরীর কোনো দোষ নেই। শরীরে কোনো রোগ নেই। সৌন্দর্যে কোন খুঁত নেই। তার গায়ের চামড়া জলপিপির গাঁয়ের মতো উজ্জ্বল। অথচ কুসুমফুলের মতো নরম লাল। পরীকে সুবর্ণরেখা নদীর বালির মতো নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে দেখেও তার মনের সোনার এক কণাও তার নখে তুলতে পারেনি মদন।

দোষ বলতে একটাই। প্রতিবছর বসন্তর রাতে, দোলের চাঁদের পনেরো দিন আগে থেকে পরীকে যেন পরীতে পায়। চাঁদ যত বড় হতে থাকে, পরীর পাগলামি ততই বাড়ে।

রাতের বেলা সে দরজা খুলে বেরিয়ে গাঁয়ের সীমানা পেরিয়ে সুবর্ণরেখার দিকে চলে যায়, যেখানে অসমসাহসী পুরুষও একা-একা যেতে সাহস পায় না গভীর রাতে। মজা এইই যে, ঠিক সেই সব দিনেই মদনকে ঘুমে পায়। পরী শেষরাতে যখন নদী থেকে ফিরে আসে তখন ওর ঘুম ভাঙে। আর যখন যায়, তখন গভীর ঘুমে মড়ার মতো পড়ে থাকে। ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্যে মদন এই পনেরোদিন রাত নামলেই একাধিকবার আদর করে

www.BanglaBook.org

পরীকে। তৃপ্ত নারীর ঘুম সাপের কামড়ও টের পায় না, এ-কথা কে-না জানে! তবু পরী তারপরও ঠিক বেরিয়ে যায়; মদন যা কিছু চায় সব দিয়ে তারপরও পরীর অনেকই উদ্বৃত্ত থাকে। সেই উদ্বৃত্ত সে কোথায় কার জন্যে যে বয়ে নিয়ে যায়, নিশির ডাকে সাড়া দিয়ে; সে এক গভীর রহস্য।

পরী গত পনেরো বছরে দিনে গড়ে পনেরোটি কথাও বলেনি। পাঁচ প্রশ্নর উত্তর একটি হাঁ অথবা একটি না-তে সারে। মুখে সেই ইলেকটিরির বাল্বের হাসি লেগে থাকে সবসময়ই। বাড়া-কমা নেই কোনো।

পরীর বাড়ি যে গ্রামে, সেই গ্রাম নদীর ওপারে। সেই গ্রামে এক মাতাল গেঁজেল জুয়াখেলায় সর্বস্ব-খোয়ানো পুরুষের বাস। সে মদনেরই বয়সী হবে। নাম তার খেয়ালি। খেয়ালির সব কিছুই গেছে। গ্রামের কোণের এক পড়ো-পড়ো কুঁড়েতে তার বাস। মাধুকরী করে খায় সে। সবই দোষ। গুণের মধ্যে সে, গান গায়। সে গানও কাউকে শোনাবার জন্যে নয়। কেউ শুনতেও চায় না। বনে বনে, দিনে রাতে, সেই একা পাগল গান গেয়ে গেয়ে ফেরে।

কানাঘুষোয় শুনেছিলো মদন যে, ছেলেবেলায় পরীর সঙ্গে তার ভাব ছিল খুব, পরীর মা যতদিন বেঁচে ছিলেন। মদন এও শুনেছিলো যে, পরীর বিয়ের পর থেকেই খেয়ালি মানুষটা অমন হয়ে যায়। দাবা খেলে, যুধিষ্ঠিরের মতো সব খোয়ায় একে একে। মন দিয়ে খেললে ওকে হারাতে পারে এমন লোক কমই ছিলো দশটা গাঁয়ে। কিন্তু মানুষটা হারবে বলেই পণ করে যেন খেলতে বসতো। তারপর নেশা শুরু করে।

খেয়ালির সঙ্গেও পরীর বিয়ে হতে পারতো। কিন্তু জাতে তারা ছিল মুচি। মরা পশুর চামড়া শুকিয়ে তা দিয়ে জুতো বানাতো। যে-ঢোল মন্দিরে বাজে, সেই ঢোলের চামড়া আসতো তাদেরই ঘর থেকে, যে-খোলে ঠাকুর দেবতার নাম-কীর্তন হয়, সেই খোলের চামড়াও আসতো তাদের বাড়ি থেকেই; তবু অন্যের চোখে তারা জাতে নিচু।

পরীরা ছিল স্বর্ণকার। দেবীর গয়না বানাতো তার বাপ। তার মেয়ের সঙ্গে খেয়ালির বিয়ে হলে সমাজে ঠাঁই দিতো না কেউই তাদের। তাই পরীর বিয়ে দিয়েছিলো বাপ খগেন, পাল্টি-ঘরে মদনের সঙ্গে।

বড় অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়ে এই পরী। বাপকে অমান্য করেনি। কিন্তু বিয়ের পর একদিনের জন্যেও আর বাপের বাড়ি যায়নি। পা দেয়নি বাপের গাঁয়ে। অনেক ঝুলোঝুলি সাধাসাধিতেও না। শুধুই হেসেছে। ইলেকটিরি-হাসি।

মায়ের মৃত্যুতেও তাকে কেউই নিয়ে যেতে পারেনি! নিজ-গাঁয়ে মরা মায়ের মুখ দেখতে। সুবর্ণরেখার জলের পাশে সে তর্পণ আর কাজ সেরেছে। নদীর এপাশে।

বড় অদ্ভুত চরিত্রের মেয়েছেলে বটে!

সকলেই বলে এ কথা।

মদন কিন্তু বড় ভালোবাসে তার পরীকে। শুধু ছটফট করে মরে সব সময়ে, যা পরী তাকে দেয়নি; তা পাবার জন্যে। প্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল মাটির ঘরে শালকাঠের তক্তপোশের ওপর শিমুল তুলোর তোষকের ওপরে বিছানো খড়গপুর থেকে কিনে-আনা ফুলকাটা নরম বিছানার চাদরের ওপর পরীর পাশে শুয়ে পরীকে বার বার বলে, তুমি আমার হও, পরী, তুমি আমার! তোমাকে পুরোপুরি দাও আমাকে, একটুও বাকি না-রেখে।

পরী মুখে সেই ইলেকটিরি হাসি হেসে, খাট থেকে নেমে, সায়া আর লালপেড়ে শাড়ি

www.BanglaBook.org

খুলে আলনায় রাখে। তারপরে তার হাঁটু সমান চুলের অর্ধেক সামনে এনে জঘন ঢাকে। অন্যপাশ থাকে পেছনে। নিতম্ব ছেয়ে। পরীর হাসি বলে, এই তো আমি! নাও আমাকে। নাও! না-বলে বলে, এর চেয়েও বড় পাওয়া বলে অপর কিছু কি জানে পুরুষেরা?

নেয় মদন! খাট থেকে নেমে তাকে কোলে করে তুলে এনে শোওয়ায় খাটে। আঁতিপাঁতি করে পরীর শরীরের সব রহস্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। কিন্তু পরীর শরীরের আড়ালে যা থাকে, কিছু কি থাকে? যা মদন পেতে চায়, তা একদিনের জন্যেও পায় না।

পরী হেসে বলে, এই তো আমি!

এই তুমিই কি সবটুকু তুমি?

আর কী বাকি আছে আমার? মেয়েদের শরীরই তো সবটুকু। আর কী!

আর কিছু নেই?

আর কি?

তুমি আমার নও।

তবে আমি কার? এতভাবে এতবার দিয়েও কি দেওয়া হলো না?

না, না। তুমি কী যেন লুকিয়ে রাখো। কী যেন দাও না আমাকে পরী।

আর কিছু নেই। একজন মেয়ের যা-কিছু আছে, থাকতে পারে, সবই তো পেয়েছো। আর কি চাও?

তা আমি জানি না। শুধু জানি যে, তুমি, তোমার মধ্যে যে আর-একজন আছে, তাকে লুকিয়ে রাখো সব সময়। তাকে দাও না কখনও আমাকে।

একদিন পরী মদনকে বলেছিলো, তুমি অহল্যার গল্প জান তো? আমরা মেয়েরা, এ দেশের সব মেয়েরা, অহল্যারই মতো পাথর হয়ে গেছি। তোমাদেরই চোখের অভিশাপে। শরীরের পাথরেই আমাদের বাস। তোমাদের বীর্য ধারণ করি জরায়ুতে। গর্ভে তোমাদের সন্তান। আবার তা ফিরিয়ে দিই। তোমাদেরই ফিরিয়ে দিয়ে তোমাদের অসম্পূর্ণ দান সম্পূর্ণ করি আমরা। বেঁধে খাওয়াই। রোগে সেবা করি। তোমরা মরে গেলে মাথার চুল কেটে ফেলি। নিরামিষ খাই। জীবনের এক আকাশ আলোকে নিভিয়ে দিয়ে সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকি। এইই তো তোমরা চেয়েছিলে চিরদিন। এই চেয়েছিলে বলেই এর চেয়ে বেশি কিছু চেয়ে আমাদের বিব্রত করো না, কষ্ট দিও না।

এতো কথা মদন কিংবা পরী, পয়রা দুজনের কেউই স্পষ্ট করে বলে না। এমন ভাষাও তাদের নেই। তবে চোখ বলে। চোখ যা বলে, তা কি মুখ কোনো দিনও বলতে পেরেছে?

আজ চতুর্দশী। পলাশ শিমুল কুসুমের ফুল আর পাতা সেদ্ধ করে ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েরা রঙ বানিয়েছে। কাল সকালে দোল খেলবে বলে। শটি আর রঙ মিশিয়ে আবীর বানানো হয়েছে ঘরে ঘরে। হরিসভায় দোলোৎসব হবে রাতে। ঘরে ঘরে মিষ্টি বানানো হয়েছে। রঙ দিতে-আসা ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দেবে বলে। গাঁয়ের পাড়াতুতো দেওর আর বৌদিদের চোখে ঘুম নেই, কাল সকালে দোলের অছিলায় স্পর্শসুখের শিহরিত আনন্দের স্বপ্নে।

পরীর পাগলামি আজ তুঙ্গে। মদন তার বেয়াল্লিশ বছরের যৌবনের সবটুকু নিংড়ে দিয়ে প্রথম রাত থেকে বহুভাবে আদর করেছে পরীকে। আজ পরীকে সে আদরের স্যালাইন ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়াবেই। পরীকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টায় ক্লান্ত হয়ে এখন নিজেই মরা মানুষের মতো ঘুমিয়ে আছে মদন। পুরুষের ভূমিকা, ফুরিয়ে যাবার, দাতার; নারীর, পূর্ণ

www.BanglaBook.org

হবার, গ্রহীতার।

রাত এখন অনেক। নদীপারে শেয়াল ডাকছে। শাল, মহুয়া আর করৌঞ্জ-এর গন্ধে মাতাল হয়ে-যাওয়া ঝড় তুলেছে চাঁদের বনে বনে। ঘরের মধ্যে প্রদীপের পলতে কাঁপছে ঘরে-ঢোকা দামাল হাওয়ায়।

নগ্না পরী, বিছানা ছেড়ে নামলো। তার এলোকেশী নগ্না শরীরের ছায়া প্রদীপের দেওয়ালে নড়ে উঠলো। শুধুমাত্র শাড়িটা জড়িয়ে নিয়ে দরজার খিল খুলে বেরিয়ে পড়ল পরী। একটা খরিশ-কেউটে হিস-হিস করে চলে গেল প্রায় পায়ের ওপর দিয়েই। কামড়ালো না। ভাল হতো কামড়ালে। এই স্থির-হয়ে-থাকা ইলেকটিরি-হাসির জীবনে পচা-পানায় ভরা, সমান-সুখের একঘেয়ে জীবনে, তবু কিছু হঠাৎ-জ্বালার সুখ অথবা বিষ চারিয়ে যেতো।

পরী ভাবছিলো, সুখ মানেই তো বিষ। এই সমাজে। বিষের মতই পরিত্যাজ্য সব সুখ, যা, চামচে-মাপা; স্বামী-দত্ত নয়; সব সুখ। এই সমাজ-সংসারের কৃপণ হাতের কুনকে-ঢালা সুখ। ভারী ইচ্ছে করে, একদিন সাপের কামড় খেয়ে দেখতে। এই খরিশ কেউটেও তো এই পয়রা গ্রামেরই সাপ। ভুল লোককে ভুল করে সাপও কামড়ায় না কি এখানে। হিঃ! ছিঃ।

কুকুর ডেকে উঠল। শুঁড়িদের বাড়ির একটা মদ্দা আর একটা মাদী ওর পিছু নিলো. কিছুটা। তারপর আর সাহস পেল না। গ্রামের কুকুরগুলোও সাপটারই মতো। নতুন জায়গায় যেতে, নতুন কিছু করতে ভয় পায়।

পরী চললো আঁচল লুটিয়ে; সুবর্ণরেখার দিকে। শাল বনের গভীরে আসতেই এবার তার মনে হতে লাগলো যে, সে সত্যিই পরী। সত্যি সত্যিই পরী হয়ে যাচ্ছে পরী পয়রা! আঁচলের জায়গায় তার ফিনফিনে কুসুমের পাতার মত পাতলা আর কুসুম-লাল ডানা গজিয়ে গেছে মস্ত দুটি। উড়ে চললো পরী। তার স্বামীর আদরে আদরে পুরনো হয়ে-যাওয়া শরীর, তার সকাল থেকে সন্ধের নিয়মবদ্ধ জীবন, সব পেছনে ফেলে এসে সে যেন সদ্য-ঋতুমতী কোনো পঞ্চদশী হয়ে গেল। অচুম্বিতা, অনাঘ্রাতা, প্রত্যাশাতে ভরপুর। উড়ে এলো একেবারে সুবর্ণরেখার মধ্যে। যেখানে বড় বড় কালো কালো পাথর আছে সোনালী বালির মধ্যে। চতুর্দশীর চাঁদের আলোয় বালি এখন রুপোলী। শাড়ি খুলে ফেলে সেই পাথরের স্তূপের ওপর পায়ের ওপর পা রেখে বসল পরী।

হু-হু হাওয়া আসছে তাদের গ্রাম থেকে। খেয়ালি, কী করছে কে জানে? এত বছর এই দোলের আগের চাঁদের রাতে পরী এখানে এসে বসে শুধু সেই মানুষটা আসবে বলে। আহা! কী তার গলা। গাত্রের কী ভাব! পরীর জন্যেই এমন করে নষ্ট হয়ে গেলো মানুষটা, সর্বস্বান্ত। দু-বেলা দু-মুঠো ভাতও জোটে না খেয়ালির। অথচ পরীর কিছুই করবার নেই। ও পেটপুরে খায়। ভাল শাড়ি পরে, কোমরের পৈঁছা থেকে গলার সীতাহার। পায়ের পায়জোর, নাকের নথ, সবই পরে। যেন, সোনা দিয়েই পেট ভরে একজন মানুষীর। হয়তো ভরে! যাদের ভরে। কারো কারো। পরী তাদের মত নয়। তার মনের মানুষটার জন্যে যদি একটু কিছুও করতে পারতো! মানুষটা যদি একবারও এসে সামনে দাঁড়ায় পরী পয়রা তার স্বামীর দেওয়া শাড়িটা পর্যন্ত এই বালিতে ছেড়ে রেখে তার হাত ধরে নিরাবরণ হয়ে চলে যাবে, সে যেখানে নিয়ে যাবে। সেই নরকে।

অনেক বছর আগে এক দোলের রাতে, গোয়ালঘরের পাশে দাঁড়িয়ে, গরুর গায়ের গন্ধ,

www.BanglaBook.org

গোবরের গন্ধ, চোনার গন্ধ আর জাবনার গন্ধের সঙ্গে মিলে-যাওয়া দোল পূর্ণিমার রাতের সব গন্ধর মধ্যে খেয়ালি, চোদ্দ বছরের পরীকে চুমু খেয়েছিলো তাদের গ্রামে। বঞ্চিত চুমু। চুরির চুমু। ব্যথার চুমু। প্রেমের চুমু। সেই রাতেই পরী জেনেছিলো প্রথম ও শেষবারের মতো যে পরীর মধ্যে এক অন্য পরী আছে।

সে আর এলো না। কোনোদিনও আসেনি। কই আর এলো? আসবে না, জানে। যারা পরীদের ডানা গজাতে জানে, যাদের ঠোঁটে কুসুম ফুলের মসৃণতা, যাদের গলায় পাগল-কোকিলের গান, সেইসব পুরুষ, নারীর জীবনে ক্ষণিকের জন্যেই আসে। এসেই, পরক্ষণেই হারিয়ে যায়। দূর থেকে পুলক ভরে ডাক পাঠায় বাসন্তী হাওয়ায়। চেয়ে থাকে, সন্ধেতারার চাউনি হয়ে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে, চৈত্রের দুপুরে শালের বনে। কিন্তু তারা জীবনে আর আসে না।

পরী পয়রারই মতো সব নারীরই জীবন, সব নারীরই শরীর, মদন পয়রাদেরই জন্যে। অভ্যেসের খোঁটায় বাঁধা গরুর মতো সুখের জাবনাতে জাব খায় তারা। খরিশ কেউটের কামড় তাদের জন্যে নয়।

পরী জানে।

তবু পরী পয়রা এও জানে যে, অভ্যেসের বাঁধন এখনও তাকে পুরোপুরি বাঁধতে পারেনি। পরীর ভেতরের পরীর ডানা দুটি এখনো বছরের এই কটি দিনে জল-ফড়িংয়ের ডানারই মতো ফরফর করে ওঠে। বাঁধন ছেড়ে উড়ে যেতে চায় সব নারীর মধ্যেই যে দ্বিতীয় নারী থাকে, সে গ্রীষ্মবনের খয়েরী তিতিরের মতো ছটফট করে উঠে বলতে চায়, এ নয় গো! এ নয়! জীবনের মানে এ নয়! বাঁচার মানে এ নয়!

পরী জানে যে, এ দেশের সব পরীরই মুক্তির আরও অনেক অনেকই দেরি আছে। খেয়ালিরাও তো পুরুষই! নারীকে মুক্ত করতে পারে, পরীর মধ্যের পরীকে ডানা মেলে উড়তে দিতে পারে, একমাত্র পুরুষের মতো পুরুষরাই। মদন পয়রাও নয়, খেয়ালি মুচিও নয়।

প্রথমজন, প্রেমের কিছু বোঝে না।

দ্বিতীয়জন, প্রেমে যে সাহসের দরকার তা রাখে না।

যে-দেশের পুরুষেরা এমন, সে দেশের পরীরা সন্ধেতারার দিকে চেয়ে চেয়েই চিরদিন দিন গুনবে।

ডান পা-টাকে এবার বাঁ পায়ের ওপরে করল পরী। নিজের অনাবৃত ঊরুর উপরে অন্য ঊরুর পরশে শিহর লাগল। আরও একটু বসে থাকবে। মদন পয়রার স্ত্রী হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে এমন একা-একা নিজের এক ঊরুতে অন্য ঊরুর উষ্ণতায় ধন্য করে বাঁচাও ঢের ভাল ছিলো। এ জন্মে হলো না!

কাল সকালে গ্রামের যে ছোট-ছোট মেয়েরা পুলকভরে দোল খেলবে, চিকন চিৎকারে; ওরা যেন সত্যিকারের পরীর জীবন পায়! পরী পয়রার জীবন নয়। সত্যিকারের স্বাধীন, উড়াল পরীর জীবন।

পরী ভাবে যে, ও বেঁচে উঠবে ওদের মধ্যে। অন্য জন্মে, অন্য জীবনে!

www.BanglaBook.org

কম্পাস

কুকুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল সেদিন আমার এক সাহিত্যিক বন্ধুর বাড়িতে। কুকু এসেছিলো, পরিচালক এবং প্রযোজকের সঙ্গে একটি উপন্যাস নিয়ে ছবি করার বিষয়ে আলোচনা করতে।

কুকুকে শেষ দেখেছিলাম আজ থেকে তিরিশ বছর আগে। তখন আমি সবে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে কলেজে ঢুকেছি। আর কুকু তখন বোধ হয় সিক্স-সেভেনে পড়ে। খুব ফর্সা, একটু মেয়েলী। এবং খুবই সুন্দর দেখতে। অবস্থাপন্ন বাবা-মায়ের চোখের মণি। আদরে, যত্নে, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল; চোখ-কাড়া। একমাত্র সন্তান।

কুকুরা পুজোর ছুটিতে এসেছিল উত্তরপ্রদেশের বিন্ধ্যাচলের কাছে শিউপুরা নামে একটি ছোট্ট গ্রামে। আমি গেছিলাম আমার বাবা-মা-ভাই-বোনেদের সঙ্গে। সকলে একত্রিত হয়ে মাছিন্দার পথে চড়ুইভাতি, গঙ্গার ঘাটে "ড্যাম চিপ" নামী রকম মাছ কেনা এবং পরিশেষে বিজয়া-সম্মিলনীও।

পথের এবং প্রবাসের আলাপ সাধারণত পথে প্রবাসেই হারিয়ে যায়। যাঁরা ব্যস্ত মানুষ, তাঁদের কারো পক্ষেই কলকাতার কর্মব্যস্ততার ঘূর্ণির মধ্যে ফিরে এসে আর সেই অবসরের সম্পর্ক বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয় না।

কুকুর বাবা-মা, কাকা-কাকী আমার মা বাবাকে বলতেন, কলকাতা ফিরে যেন এই সম্পর্ক বজায় থাকে।

বাবা বলতেন, দেখা যাবে। কলকাতায় ফিরেই প্রমাণ হবে হৃদয়ের টান খাঁটি না ঠুনকো।

কুকুর বাবা ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের ব্যস্ত উকীল। কাকা সলিসিটর। ওঁদের নিবাস ছিল উত্তর কলকাতায়। শ্যামবাজারে।

আশ্চর্য সেবার ছুটির পর কলকাতায় ফিরে প্রবাসের সম্পর্ক আরো গাঢ় হয়ে

www.BanglaBook.org

উঠেছিলো মুখ্যতঃ কুকুদের পরিবারের আন্তরিকতাতেই। এমন একটি শিক্ষিত, রুচিসম্পন্ন পরিবার আমি খুব কমই দেখেছি। বাড়ির প্রত্যেক মহিলাই সুন্দরী। বিভিন্নরঙা তাঁতের ডুরেশাড়ি পরা তাঁদের সুন্দর চেহারা এখনও আমার চোখে ভাসে। রান্না-বান্না, সেলাই-ফোঁড়াই; গান-বাজনা সব কিছুতেই সমান উৎসাহ ছিল দত্ত পরিবারের। সেই পুজোর পরও অনেক বছর কুকুদের ও আমাদের পরিবারের মধ্যে যোগাযোগ আশ্চর্যভাবে বজায় ছিল।

কুকু বড় হবে, এই নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা করতেন তখন থেকেই ওর অভিভাবকেরা। কারো ইচ্ছা ছিলো কুকু ডাক্তার হোক। কেউ চাইতেন, কুকু বড় হয়ে তার বাবার ওকালতীর পসারকে আরো বাড়িয়ে তুলুক। মেশোমশাই-এর চেম্বার খুবই ভালো জায়গায়। অনেক মক্কেল। ওঁদের কারোরই সন্দেহ ছিল না যে, পড়াশোনাতে ভাল ছাত্র কুকু তার সুন্দর সপ্রতিভ ব্যবহারে এবং চোখ-কাড়া চেহারাতে একদিন তার বাবার চেয়েও বেশি সুনাম করবে হাইকোর্টে। সচ্ছল পরিবারের স্বাচ্ছল্য আরো বাড়াবে। বনেদী, কোনো পড়তি-অবস্থার পরিবার থেকে কুকুর জন্যে সুন্দরী শান্তস্বভাবা বিনয়ী পাত্রী পছন্দ করে আনবেন তাঁরা, যাতে তাঁদের পারিবারিক সুখ এবং ঐতিহ্য স্বাচ্ছল্যের হাতে হাত রেখে আরও উজ্জ্বল হয়।

আমার ইচ্ছে ছিলো সাহিত্যিক হবার। কিন্তু আমার প্র্যাকটিকাল, কৃতি বাবা বলতেন, বাঙালি সাহিত্যিকেরা না-খেয়েই থাকেন। যাঁরা সাহিত্যের সঙ্গে প্রকাশনের ব্যবসাতেও জড়িয়েছেন সফলভাবে নিজেদের, সেই মুষ্টিমেয় দু-একজন ছাড়া, সচ্ছলতার মুখ কেউই দেখেননি। বাবার আদেশ ছিলো যে, তাঁরই মতো ডাক্তার হতে হবে।

সাহিত্য নিয়ে পড়া পর্যন্ত হলো না বলেই আমার যে বাল্যবন্ধু আর যশস্বী সাহিত্যিক, তাকে মনে মনে খুবই ঈর্ষা করতাম। সেই কারণেই আমার বন্ধুর মধ্যে আমি যা হতে চেয়েছিলাম, সেই না-হওয়া সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশকে প্রত্যক্ষ করে প্রতি ছুটির দিনে চেম্বার এবং এমন-কি কল-এ যাওয়াও যথাসাধ্য স্থগিত রেখে তার বাড়িতেই সাহিত্য আলোচনা করে কাটাতাম। তার মাধ্যমেই নামী-দামী সব সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপও হতো। যাদের সম্বন্ধে অগণিত পাঠকমহলে অতীব কৌতূহল, তাঁদের খুব কাছ থেকে দেখতাম।

বাঙালি মানসিকতায় যাদের 'সফলতম' বলে, আমি এখন সেই শ্রেণীর লোক। বাবা ছিলেন শুধুই এম-বি ডাক্তার। আমি এম-বি-বি-এস করার পর এম-এস-ও করেছিলাম। সপ্তাহে বারো থেকে কুড়িটি পর্যন্ত অপারেশন করতাম বড় বড় নার্সিংহোমে। টাকার অভাব ছিলো না আমার। নিউ আলিপুরে বাড়ি করেছি। শোফার-ড্রিভন গাড়ি আছে। কলকাতার একাধিক নামী ক্লাবের মেম্বার হয়েছি। এক কথায় অন্য মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত যে-কোনো বাঙালি যেসব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের স্বপ্ন দেখেন, ছোটবেলা থেকে বাবার বাধ্য ও যোগ্য সন্তান হয়ে সেই সমস্ত প্রাপ্তিই ঘটেছে আমার।

কিন্তু তারই সঙ্গে বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় যে পাস্ট-টাইম, সেই ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতার নিত্য শিকার হয়েছি আজ আমি। কোন বাঙালি কত বড়, তা প্রমাণিত হয় তাঁর প্রতি ঈর্ষাকাতর বাঙালিদের সংখ্যা কতো, তার উপর। এই পরীক্ষাতে আমি প্রথম শ্রেণীতে, প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ। ছেলে-মেয়ে, নিউ আলিপুরের বাড়ি, স্ত্রী, সল্টলেকের শ্বশুরবাড়ি, আমার মধ্যমগ্রামের ছোট্ট সুন্দর বাগানবাড়ি ও আমার পেশার খ্যাতি নিয়ে আমি একজন আদর্শ বাঙালি। আত্মীয়স্বজনরা বলে থাকেন মানুষের মতন মানুষ হয়েছি আমি। এমন মানুষ নাকি আমাদের তিনকুলে কেউ কখনও হয়নি। আমাকে এক নামে সকলে

www.BanglaBook.org

চেনে। পেটের অপারেশান? ডাঃ মুৎসুদ্দীর কাছে যাও। ধন্বন্তরি! অপারেশান থিয়েটারে আমি গাউন পরে গ্লাভস হাতে নিলে নতুন অল্পবয়সী নার্সরা রীতিমত নার্ভাস হয়ে পড়ে। পরম বিস্ময়ে এবং শ্রদ্ধাতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

কুকু সম্বন্ধে ওর অনেক আত্মীয়-স্বজনের কাছেই শুনতাম যে, ছেলেটা মানুষ হলো না। বয়েই গেল একেবারে। কিছুই হলো না। ফিল্ম লাইনে ভীড়ে গেছে। নেশা ভাঙ করে। ড্রাগ খায়। রোজগার পাতি নেই। বিয়ে করলো না। করবেই বা কি করে? বৌকে খাওয়াবে কি। মা বাবাকেও দেখে না। দেখবে কি করে? মানি-শূন্য মানি-ব্যাগ পকেটে নিয়ে বাবা-মায়ের পায়ে হাতে বুলোলেই কি ছেলের কর্তব্য করা হয়? টাকাই হচ্ছে সার কথা। কিছুই করলো না জীবনে।

এতদিন পরে দেখে, কুকুকে আমি চিনতেই পারিনি। সাহেবের মতো ফর্সা রঙে একেবারে কালি ঢেলে দিয়েছে। কুচকুচে কালো হয়ে গেছে ও। কোঁকড়া নরম কালো চুলের জায়গায় মাথা-ভর্তি টাক। মুখে একগাল দাড়ি। আধময়লা একটা ট্রাউজার ও হাওয়াই শার্ট পরনে।

ও-ই আমাকে বললো, নিশ্চয়ই আমাকে চিনতে পারছো না টুটুদাদা।

অবাক হয়ে বলেছিলাম, না তো!

আমি কুকু।

কুকু!

হ্যাঁ, মনে পড়ে না? শিউপুরার কুকু। বিন্ধ্যাচল, মাছিন্দা?

কুকু! বিস্ময়ে, হতাশায় আমি বলেছিলাম। মাই গুডনেস্!

ওদের কাজ শেষ হতে বেলা হলো অনেক। ফিল্ম লাইনের লোকেরা বড় বেশি কথা বলেন। যে-কাজ পাঁচ মিনিটে হয়, সে কাজ ওঁরা তিন ঘন্টায় করতে ভালবাসেন। এক কাপ চা-খাওয়া শেষ করতে যাঁদের দেড়ঘন্টা লেগে যায় তাঁদের অভ্যেসটাই বোধ হয় খারাপ হয়ে যায়।

কুকু বললো, উঠবে নাকি টুটুদাদা? বাড়ি যাবে না?

বাড়িতে না গেলেও হতো। কারণ, আমার সম্বন্ধীদের সঙ্গে আমার স্ত্রী ও পুত্র বাগানবাড়িতে গেছে। এ রবিবার সকালে একজন ধনী ব্যবসাদের স্ত্রীর অপারেশন ছিল। প্রথমে 'না' করে দিয়েছিলাম। কিন্তু এমন একটা টাকার অঙ্ক বলে বসলো যে, লোভ আর সামলাতে পারলাম না। ভগবানেরও একটা দাম ধার্য করেছে ওরা। টাকা দিয়েও কেনা যায় না এমন মানুষ সংসারে বোধ হয় আর বেশি নেই।

ভাবলাম, যে ছোকরার কিছুই হলো না জীবনে, তাকে নিয়ে একটু ক্লাবে যাই। ওকে বোঝাই যে, এ ওর পরম দুর্ভাগ্য যে চোখের সামনে ওর চেয়ে সামান্যই কয়েক বছরের বড় আমি মানুষটা জলজ্যান্ত থাকা সত্ত্বেও ও সে দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হতে পারলো না। নিঃশেষে নষ্ট করলো এমন করে নিজেকে। নিজের সব সম্ভাবনা।

বললাম, চলো ক্লাবে যাই। বীয়ার-টিয়ার খাও তো!

কুকু বললো, সবই খাই।

তাহলে চলো।

বাইরে আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিলো। সাদা সীট-কভার লাগানো এয়ার কণ্ডিশাণ্ড কালো ঝকঝকে গাড়ি। টুপি পরা ড্রাইভার।

www.BanglaBook.org

আশ্চর্য! কুকু ইম্প্রেসড হলো না। একটুও।

বোধহয় বম্বে-টম্বে যায় প্রায়ই। ফিল্ম আর্টিস্টদের দেখেছে নিশ্চয়ই। ও পিছনের সিটে আমার পাশে এসে বসল।

কে কে ইলেকটেড হবেন আর কে কে হবেন না তাই জোর ফিসফিসানি চলছে। আমাকে ক্লাবের অনেকেই চেনে। চেনে বলেই তো কুকুকে নিয়ে আসা! ও দেখুক, জানুক আমি কী হয়েছি আর ও কি...কলকাতার সব গণ্যমান্য মানুষই এই ক্লাবের মেম্বার।

বীয়ারের অর্ডার দিলাম। ছুটির দিনে আমি এক বোতল করে বীয়ার খাই। জাস্ট এক বোতলই। কুকুকে সে কথা বললামও।

কুকু বললো, মেজার গ্লাসে করে ঢাকার সাধনা ঔষধালয়ের সারিবদি-সালসা খেলেই পারো। শরীর এবং চরিত্র দুইই ভাল থাকবে। মদ এবং জীবন যারা মেপে মেপে খায় এবং খরচ করে তারা মানুষ ভালো কখনওই হয় না।

আমি কিছু বললাম না।

ও বললো, মদ; মানুষের ইনহিবিশান কাটিয়ে দেয়। কিছু মানুষ আছে, যাদের ইনহিবিশান কেটে গেলে সবই কাটাকুটি হয়ে যায়। বাকি থাকে না কিছুই। সেই মানুষগুলোই মদ খেয়ে মাতাল হতে ভয় পায়।

মাতাল হলে, এই ক্লাব থেকে বের করে দেবে।

বিরক্তস্বরে আমি অন্য দিকে মুখ করে বললাম।

মাতাল হওয়া আর মত্ত হওয়াটা এক নয়। মত্ত হওয়ার কথা বলিনি আমি। যাকগে। বললেও হয়তো তুমি বুঝবে না। তার চেয়ে বলো টুটুদাদা! লেখা-টেখা কি ছেড়েই দিলে একেবারে? কি সুন্দর লিখতে তুমি—

আমি চাপা গর্বের সঙ্গে বললাম, সময় পেলাম কোথায়? প্রফেশানেই তো...

কুকু বললো, খুবই ব্যস্ত থাকো বুঝি?

তারপরই চারদিকে তাকিয়ে বললো, এই সব মানুষেরা কারা?

ক্লাবের মেম্বার, মেম্বারদের গেস্টস আর কারা?

কি করেন এঁরা?

কেউ অ্যাকাউন্টেন্ট, কেউ ডাক্তার, কেউ এঞ্জিনীয়ার। কত্ত প্রফেশান। ইন্টিরীয়র ডেকরেটর, ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্ট, আর্কিটেক্ট, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, বিজনেস একজিকিউটিভস। আজে বাজে লোক তো ক্লাবের মেম্বার হতে পারে না।

কুকু বীয়ারে চুমুক দিয়ে চশমার আড়ালের গভীরে কালো চোখে প্রচ্ছন্ন হাসির ঝিলিক তুলে বললো, স্বাভাবিক। এখানে যাঁরা আসেন তাঁরা সকলেই তোমারই মত কৃতী পুরুষ জীবনে। তবে টুটুদা ব্যাপারটা কি জানো? এঁদের বেশিরভাগেরই কোন গন্তব্য নেই মনে হয়। শ্যালো, মেগালোম্যানিয়াক মানুষ এঁরা। আমি একেবারেই স্ট্যান্ড করতে পারি না এই ধরণের মানুষদের।

কুকুর ধৃষ্টতা আমাকে মর্মাহত করলো। আমার সঙ্গে না এলে এখানে কোনোদিন ও ঢুকতেই হয়তো পারতো না। আনগ্রেটফুল সিলি চ্যাপ। এমনিতেই, ঐ পোশাকের অদ্ভুত জীবটির দিকে সকলেই তাকাচ্ছে। আমারই পয়সায় বীয়ার খেতে খেতে আমাকেই ঘুরিয়ে যা-তা বলছে। একেবারেই অমানুষ হয়ে গেছে ছোকরা।

গন্তব্য নেই মানে কি? সকলকেই কি হরিদ্বারে গিয়ে সাধু হতে হবে নাকি?

আমি শ্লেষের সঙ্গে বললাম।

www.BanglaBook.org

কুকু হাসলো। বললো, তা নয়! আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, এঁদের সাকসেস এবং টাকাকে বিযুক্ত করে ফেললে মানুষগুলির জীবনে বাঁচার মতো কিছু কি বাকি থাকবে? লোকে কি কেবল বাড়ি, গাড়ি, টাকা, নামী-ক্লাবের মেম্বার হওয়ার জন্যেই বেঁচে থাকে? ওঁরা নিজেরা যা করেন, তা কি এনজয় করেন? ওঁরা কি বেঁচে আছেন? ওঁদের মধ্যে কজন সত্যিই বেঁচে আছেন?

এতো সব কথার উত্তর আমার কাছে নেই।

কুকু এবার হাসলো। বললো, আছে নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তুমি জবাব দিতে চাও না। নিজেকেও কখনও এ সব প্রশ্ন ভুলেও করতে চাও না। কারণ তুমি ভালো করেই জানো যে, আমি কী বলছি। যা করে, মানুষ আনন্দ পায় না, তা মানুষ করবে কেন? তোমার জীবনের উদ্দেশ্যটা কি? কখনও ভেবেছো এ নিয়ে, টুটুদা?

শ্লেষের সঙ্গে আমি বললাম, তোমার জীবনের উদ্দেশ্যটাই বা কি?

আমার উদ্দেশ্য, আমি যা করে আনন্দ পাই, তাই-ই করা? শুনলেই তো! ফিল্মের স্ক্রিপ্ট লিখি। ছবি ডাইরেক্ট করারও ইচ্ছা আছে।

পড়াশুনাই তো শেষ করলে না। য়্যুনিভার্সিটির ডিগ্রী থাকলে কত্তো সুবিধা হত বল তো?

কুকু আবার হাসল। বলল, বিদ্যার সঙ্গে ডিগ্রীর সম্পর্ক কি? "দা পারপাস অফ আ য়্যুনিভার্সিটি ইজ টু টেক দি হর্স নিয়ার দা ওয়াটার অ্যান্ড টু মেক ইট থার্সটি।" জিগীষার উন্মেষ ঘটানোই য়্যুনিভার্সিটির কাজ। ডিগ্রী তো একটা পাকানো কাগজ। এক কাপ চায়ের জলও করা যায় না তা পুড়িয়ে।

অনেক বড় বড় কথা শিখেছো যা হোক কুকু। নাও, বীয়ার খাও। সঙ্গে কিছু খাবে।

নাঃ।

কোন কোন ছবির স্ক্রিপ্ট করেছো তুমি? কোনো নাম-করা ছবির?

একটা খুব নাম-করা উপন্যাসের স্ক্রিপ্ট করেছিলাম। কিন্তু প্রডিউসার তাঁর স্ত্রীর নামেই চালিয়ে দিলেন। যাক, আনন্দটা আমারই আছে। আমার একার। নামটা অন্যর। আর একটা ছবির স্ক্রিপ্ট এখন করছি। মানে, গত পনেরো বছর ধরেই করছি। কবে শেষ হবে জানি না। আদৌ শেষ হবে কি না তাও জানি না। কখনও ভালো প্রডিউসার পেলে কিন্তু দেখিয়ে দেবো। একটাই ছবি করবো জীবনে। ছবির মতো ছবি!

সত্যজিৎ রায় হয়ে যাবে বলছো? রাতারাতি!

আমি বললাম। ঠাট্টার গলায়।

তা, কে বলতে পারে? মানিকদা যখন কফি হাউসে বসে লাঞ্চের সময় কাপের পর কাপ কফি নিয়ে দূরে তাকিয়ে একটার পর একটার সিগারেট খেতেন, তখন অত লোকের মধ্যে থেকেও তিনি নিশ্চিন্দিপুরেই থাকতেন। 'পথের পাঁচালী' তো একদিনে হয়নি। আমি স্ক্রিপ্ট এর কথাই বলছি। কোন বড় কিছুই একদিনে হয় না টুটুদা। জীবনে দামী কিছু পেতে হলে যোগ্য দাম দিয়েই তা পেতে হয়।

বললাম, সে কথা আমাকে না বললেও চলবে। কারণ, আমিও যা পেয়েছি, তা যোগ্য দাম দিয়েই পেয়েছি। কিন্তু তুমি যদি নাম না করতে পারো, তাহলে কি তুমি স্বীকার করবে যে জীবনটাকে নিয়ে তুমি ছিনিমিনি খেললে!

কুকু এবার খুব জোরে হাসলো।

বললো, জীবনের মতো, ছিনিমিনি খেলার দারুণ জিনিষ তো আর একটিও দেখলাম

www.BanglaBook.org

না। একমাত্র তোমার নিজের জীবনটাই তোমার হাতে। তুমি জীবনে যা দামী বলে মনে করেছো, হয়তো তার পিছনেই ছুটছো। আমি ছুটছি আমি যা দামী বলে মনে করি, তারই পিছনে। নিজের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার নিশ্চয়ই সকলেরই আছে। একটা কথা আমার মনে হয় প্রায়ই, জানো টুটুদা। জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে আমরা খুব ভয় পাই বলেই আমাদের কিসসু হলো না। ছিনিমিনি খেলার মধ্যেই ক্রিয়েটিভিটি নিহিত থাকে।

আমি বললাম, প্রতিভা থাকলেই হয় না। প্রতিভারও গৃহিণীপনার প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলছি।

তুমি হাসালে। রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথই। তুমি কি বলতে চাও প্রতিভার গৃহিণীপনা না থাকলে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ হতেন না? আর প্রতিভার গৃহিণীপনা থাকলেই তোমার বন্ধুর মতো আজকালকার ঢক্কা-নিনাদিত পোষা পাখি সাহিত্যিকরা সব রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠতেন?

তোমার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই।

হ্যাঁ। লাভ নেই। কারণ, তোমার যুক্তি নেই টুটুদা। তুমি যখন কলেজ জীবনে লিখতে, তখন একটা ভালো গল্প লিখে তুমি যে আনন্দ পেতে, আজ তুমি জীবনে যা কিছু পেয়েছো, তার যোগফল কি সেই আনন্দের সমান? একটি ভাল গল্প লেখার আনন্দই কি এই সাফল্যর চেয়ে দামী বলে মনে হয় না তোমার কাছে? সত্যি করে বলো তো?

ভাবিনি কখনও। তবে, কমই বা কি পেয়েছি? এত লোকের জীবন বাঁচাই। এতে আনন্দ নেই? এত স্তুতি, এত যশ, এত টাকা, খাতির, প্রতিপত্তি! কম কি?

আনন্দ আছে কি? আসলে, তেমন করে ভাবোনি তুমি। তাছাড়া তুলনাও চলে না অসম জিনিসে। আনন্দ হয়তো থাকতো, যদি স্বার্থহীনভাবে অন্যের জীবনটা বাঁচাবার জন্যেই তা করতে। তুমি ম্যাড্রাসের ডাঃ বদ্রীনাথের নাম শুনেছ। ভেলোরে গেছ কখনও। ওঁরাও ডাক্তার। কিন্তু ওঁরা জানেন, আনন্দ কি জিনিস। তোমার অধীত-বিদ্যা সব তো নিজের কারণে, নিজের হিতেই প্রয়োগ করলে সারাজীবন। তোমার মতো পেশাদার লোকমাত্রই তো পয়সাওয়ালা লোকেদের চাকর। সবাই চাকর। ওরা তোমাদের 'স্যারই' বলুক আর যা-ই বলুক। তুমিও যেমন চাকর, তোমার সাহিত্যিক বন্ধুও চাকর। পশ্চিমবঙ্গে আজ যে কারণে, ডাক্তারের মতো ডাক্তার বিরল, ঠিক সে কারণেই সাহিত্যিকের মতো সাহিত্যিকও বিরল। আমার মনে হয়, পেশার মধ্যে; একমাত্র বেশ্যাবৃত্তিই বোধ হয় সবচেয়ে স্বাধীন পেশা এখন। এবং সৎ।

আমি চুপ করে রইলাম। একজন পরিচিত মেম্বার কানের কাছে এসে বললেন, মুৎসুদ্দি, আমাদের টাই-আপের কথাটা মনে আছে তো? ওরা কিন্তু ওদিকে সব কিছুই করেছে। ঢালাও ড্রিঙ্কস, গার্ডেন পার্টি...বুঝেছ! ইলেকশান, কিন্তু এসে গেছে!

কুকু চারদিকে চেয়ে বললো, তোমাদের ক্লাবে আজ এত উত্তেজনা কিসের?

উত্তেজনা?

ওঃ। ইলেকশানের জন্যে। ক্লাবের অফিস-বেয়ারাদের ইলেকশান আছে সামনে।

এই ইলেকশানে কেউ জিতলে কি হবে? তাঁর নতুন হাত-পা গজাবে?

কি আবার হবে? ম্যান অফ ইম্পর্ট্যান্স হবে। আল্টিমেটলি প্রেসিডেন্ট হতে পারলে ক্লাবের কমিটি রুমের দেওয়ালে ছবিও ঝুলবে।

কুকু আবার হাসলো। এবারে শ্লেষের হাসি।

বললো, সত্যি টুটুদা! তুমি আমাকে ঝুলিয়ে দিলে! আরও বীয়ার আনাও। তোমাদের

www.BanglaBook.org

এই ক্লাবে না এলে অনেক কিছুই অজানা থাকত তোমাদের জগৎ সম্বন্ধে। এই-ই তোমাদের এ্যামবিশান? ব্যস-স-স? এইটুকুই? ক্লাবের দেওয়ালে ছবি ঝোলানোই গন্তব্য তোমাদের জীবনের? এত সামান্য এ্যামবিশান সমাজের শিরোমণিদের? তোমাদের এমন এলিটিস্ট ইলেকটোরেটের যদি এই স্ট্যান্ডার্ড, তবে দেশের গরিব, অশিক্ষিত, অনাহারী, ভোটারেদর দোষ দিয়ে লাভ কি?

আমি বললাম, আস্তে, আস্তে। কেউ শুনতে পাবে।

কুকু হাসলো।

বললো, তুমি কেন এক বোতলের বেশি বীয়ার খাও না এবারে বুঝলাম। পাছে, সত্যি কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। পাছে তুমি এই সমাজে, এই ভিড়ে, অপাংক্তেয় হয়ে পড়ো। তাই না?

বললাম, অন্য কথা বলো কুকু। অন্য কথা বলো।

আহা টুটুদা। তুমি তো অনেকই টাকা রোজগার করলে। বাকি জীবনটা বিনা পয়সায় অপারেশন করো না? গন্তব্য মানে, শুধু হরিদ্বারে গিয়ে সাধু হওয়াই নয়। আমি এই গন্তব্যর কথাই বলছিলাম। নয়তো সব ছেড়ে দিয়ে এবার লেখো। যা কিছু লিখতে চেয়েছিলে, নিজেকে উজাড় করে লেখো। বেটার লেট, দ্যান নেভার।

স্বগতোক্তির মতো বললাম আমি, তুমি তো বলেই খালাস কুকু! ছেলেটার পায়ে দাঁড়াতে এখনও অনেক দেরী।

হাঃ! জোক অফ দ্য ইয়ার। পুওর ফাদার! আমার বাবার কথাই মনে পড়ে গেল! আমার বাবাও ঠিক এই কথাই বলতেন। যার দেখছো তো আমাকে! এখনও ল্যাংচাচ্ছি। পায়ে আর দাঁড়ানো হলো না টুটুদা! তোমার ছেলেটাকে মুক্তি দাও না। ও যা হতে চায় ভালবেসে, যা করে ও আনন্দ পায়; তাই-ই করুক না ও। একটাই তো জীবন। বাপের কথামত নাই-ই বা বাঁচল। ওকে নিজের মতই বাঁচতে দাও। জীবন মানে কি শুধুই ভাল-থাকা, ভাল-খাওয়া? জীবনের মানেটাই তো এক একজনের কাছে এক এক রকম। তাই না?

দেড়টা তো বাজে। এখানেই লাঞ্চ খেয়ে যাও কুকু। ওহো ভুলেই গেছিলাম। তোমাকে তো ডাইনীং রুমে ঢুকতেই দেবে না।

আমি বললাম।

কেন?

কুকু মুখ লাল করে বললো, দেবে না কেন?

তুমি যে স্যুট পরে নেই। উ্যা আর নট প্রপারলি ড্রেসড।

স্যুট পরে নেই মানে? আমার তো স্যুট একটিও নেইও। কিন্তু ব্যাপারটা কি?

না। ব্যাপার কিছু নয়। শীতকালে স্যুট ছাড়া এই ক্লাবের ডাইনীং হলে ঢোকা বারণ।

কুকু, হোঃ হোঃ করে ফুলে ফুলে হাসতে লাগলো।

অনেকক্ষণ পর হাসি থামিয়ে বললো, আমাদের বাবারা সব অসহযোগ করে, খদ্দের পরে আর চরকা কেটে ইংরেজ তাড়ালো পঁয়ত্রিশ বছর আগে দেশ থেকে। আর আজকেও স্যুট ছাড়া দিশি লোকদেরও তোমরা খাওয়ার ঘরে ঢুকতে দাও না? জয়। ভারতের জয়! তোমাদের জয়। এই ভারতবর্ষ স্বাধীন করার জন্যেই আমার ন'কাকা পুলিশের গুলি খেয়ে মরেছিলো। সত্যই সেলুকাস! কী বিচিত্র এই দেশ।

অনেকেই আমাদের টেবিলের দিকে দেখছিলো। পরে জিজ্ঞেস করবে নিশ্চয়ই, কাকে নিয়ে এসেছিলাম আমি। ইজ্জত একেবারে গলিয়ে দিল কুকুটা। আসলে, দোষ আমারই।

www.BanglaBook.org

এ-সব লোককে নিয়ে পার্ক স্ট্রিটের বারে-টারেই যাওয়া উচিত ছিল।

কুকু বটমস-আপ করে বলল, এবার উঠবো। আমার দম-বন্ধ দম-বন্ধ লাগছে এখানে। থ্যাঙ্ক য়্যু ভেরী মাচ। নট সো মাচ ফর দ্যা বীয়ার। বাট, আমাকে এক নতুন জগতের সঙ্গে আলাপিত করালে বলে। এখানে আজ না এলে, আমি হয়তো বোকার মতো পুরনো বিশ্বাসই পোষণ করতাম যে, পৃথিবীতে ডাইনোসররা আর বেঁচে নেই।

বাইরে বেরিয়ে কুকু আর গাড়িতে উঠল না।

বললো, আমি বাসেই চলে যাব। তুমি তো যাবে উল্টোদিকে। কেন ঘুরবে মিছিমিছি আমার জন্যে?

খাবে না? চল, অন্য কোথাও গিয়ে খাই।

খেয়ে নেব কোথাও। খাওয়াটা তো এমন কিছু ব্যাপার নয়। কিছু জুটলেই হলো ক্ষিদের সময়। চলি, টুটুদা।

কুকু আমার সঙ্গে এলেই ভালো হতো। বাড়িতেই খিচুড়ি বা ভাতে ভাত খেতাম। একবার ভাবলাম, কুকুকে জোর করে বাড়িতে ধরে নিয়ে যাই। গিয়ে, অনেকগুলো বীয়ার খাই, খেয়ে; যে সব কথা আজকে অনেক বছর আমার বুকের মধ্যে পাথরের মতো চেপে বসে আছে, যে সব কথা আমার স্ত্রী, আমার পরিচিত মানুষেরা, আমার সমাজে যাদের যাতায়াত তারা কেউই কখনও শুনতে চায়নি এবং বলতেও দেয়নি আমাকে, যে সব কথা শুনলেও কানে আঙুল দিয়ে আমাকে বলেছে, 'সাইকোলজিকাল কেস', 'কনফিউজড' বলেছে, 'ইডিয়ট', সেই সব কথা কুকুর হাতে হাত রেখে, চোখের জলে বলতাম...

কিন্তু কুকু ততক্ষণে মোড়ের ভিড়ে মিলিয়ে গেছে বড় বড় পা ফেলে।

কী সুন্দর ওর হাঁটার ভঙ্গী। ইসস! কত্তো দিন আমি ভিড়ের মধ্যে, আমার এই ফালতু, মেকী সত্তাকে হারিয়ে দিয়ে, দশজনের একজন হয়ে হাঁটি না। কত্তো দিন ছোটবেলার মতো ফুচকা খাই না। আলুকাবলী। রাধুর দোকানের চিকেন রোস্ট, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। বসন্ত কেবিনের মোগলাই পরোটা।

ড্রাইভার বললো, কাঁহা চলেগা সাব?

আমি দরজা খুলে নেমে পড়ে বললাম, তুমি বাড়ি চলে যাও। আমি চলে আসব।

ও একটুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইলো আমার মুখের দিকে।

তারপর কিছু না বলে, চলে গেলো।

ভিড়ের মধ্যে শীতের মিষ্টি রোদে হাঁটতে খুব ভাল লাগছিল আমার। হাঁটতে হাঁটতে, নিজের কাছ থেকে নিজে দূরে এসে আমার কাচের ঘরের জীবনটাকে স্বচ্ছভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম আমি। যে-সমাজে আমার মেলা-মেশা, চলা-ফেরা, সেখানে ড্রাইভারেরা রোবোট। নিজে থেকে কথা বলা বারণ তাদের। তারা মানুষ নয়।

হয়তো সেখানে প্রত্যেকটা মানুষই রোবোট। সেখানে নিজের মস্তিষ্ক দিয়ে কেউই ভাবে না। নিজের চোখ দিয়ে কেউ দেখে না। নিজের ইচ্ছেতে কেউই চলে না। সারাজীবন, সেখানে প্রত্যেকটি মানুষ, অন্য কোন মানুষের ভূমিকাতে রং মেখে, স্যুট পরে, উদ্দেশ্যহীন, উৎকট অভিনয় করে চলে। প্রতিদিন। আমৃত্যু।

কুকু গড্ডালিকায় গা-ভাসানো, পথ-হারানো আমাকে এইমাত্র সঠিক পথের হদিশ দিয়ে গেল।

www.BanglaBook.org

শিল্যুট

তিনু ফোন করেছিলো। বললো, কিরে? গে-ব্যাচেলর? কেমন কাটছে দিন? শুনলাম রাণু আর ছেলেমেয়েরা সকলে দেড়মাসের জন্যে ইংল্যান্ডে গেছে? রাজীব হেসে বললো, যা বলেছিস। ভারত স্বাধীন।

কি করছিস? পার্টি-ফার্টি লাগা বাড়িতে লাগাতার। আমার বৌকে তো ভাই একটি দিনের জন্যেও কোথাও পাঠাতে পারলাম না। শ্বশুরবাড়িও পাঁচ মিনিটের পথ। গত কুড়িবছরে একদিনও রাত্রিবাস করেনি অন্য কোথাওই। যদি বা স্টেশন-লিভ করেছে তাও আমারই সঙ্গে হলিডেতে। বৌ-ছাড়া এমন দীর্ঘদিন মেনস-লিব-এর কথা ভাবাই যায় না। আই রিয়্যালি এনভী উ্য। কবে তোর বাড়ি আসব বল?

রাজীব চুপ করে থাকলো। বললো, বলবো তোকে, ফোন করে।

বলিস। তোর ফোনের অপেক্ষাতে থাকবো।

ফোনটা ছেড়ে দিয়ে নিজের লেখা-পড়ার ঘরে ঢুকতেই মহাদেব বললো, বাজার কি হবে? কে যাবে বাজারে?

পাপু বললো, দাদাবাবু গ্যাস শেষ হয়ে গেছে। ওরা বলছে, দেরি হবে। অফিস যাবার সময়ে একবার ডীলারকে বলে যাবেন। লক্ষ্মণ বললো, নিউমার্কেটের বোসের দোকান থেকে ফোন করেছিলো। বৌদি মাসের বাজার করে দিয়ে গেছেন। টাকা চেয়েছেন ওঁরা।

বিরক্ত গলায় রাজীব বললো, হবে, হবে।

লেখার টেবিলে বসতে-না-বসতেই মহাদেব আবারও এলো। বললো, বৌদি যে পার্টটাইম জমাদার ঠিক করে গেছিলেন, সে টাকা চাইছে। পনেরো দিন কাজ করেছে, বলছে দেড়শো টাকা চাই।

রাজীবের মেজাজ গরম হয়ে গেল। বলল, এরা ভেবেছেটা কি? আমার কি হারামের পয়সা? অনেকই খেটে টাকা রোজগার করতে হয়। আবারও এক কথাই বললো উত্তেজিত

www.BanglaBook.org

হয়ে, ভেবেছোটা কি এরা? অফিসে আট থেকে দশ ঘণ্টা খাটি তার পরও যতটুকু সময় বাঁচে লেখা-পড়ার কাজ নিয়েই থাকি। ভেবেছিলাম এই দীর্ঘ নিরুপদ্রব স্বাধীনতার সময়টুকুতে এবারে ছবি আঁকব কিছু। তার কি উপায় আছে কোনো?

নিজের মনে, কিন্তু নিরুচ্চারে নয়, এতগুলো কথা বলে ফেললো লোকজনদের উদ্দেশ্য করে।

রাণু এবং তার খিদমদগারেরা রাজীবকে পাগল বলেই জানে। রাজীবের মুখের উপর কথা বলে না কোনোই।

বাইরে গিয়ে জমাদারকে বললো, ভেবেছোটা কি। মেমসাহেব ফিরে এলেই টাকা নিয়ে যেও। হোল-টাইম জমাদারের মাইনেই বা কত হয়? আমি পঞ্চাশ টাকা দিতে পারি বেশি হলে। নিলে নাও, নইলে মেমসাহেব ফিরলেই এসো।

জমাদার টাকা নিয়ে চলে গেলো। রাজীব বললো যে, দারোয়ান, তিওয়ারীর কমিশন ধরে নিয়েই জমাদার টাকা চেয়েছিলো। সকলেই জেনে গেছে যে দাদাবাবুকে ঠকানো সোজা।

মহাদেব আবার এসে বললো, বৌদি আধ কেজি করে দুধের কথা বলে গেছিলেন। আপনি তো লেবু-চা-খান। দুধ কি করব? ছানা না দই?

রাজীব বলল, যা খুশি করো। আমাকে এখন বিরক্ত কোরো না।

রাণু আর ছেলেমেয়েরা দেড়মাসের বেশিই থাকবে না ভেবে ওরা যাওয়ার আগে মনে মনে সত্যিই খুশি হয়েছিলো। দীর্ঘ অবকাশ। দীর্ঘ অনাবিল স্বাধীনতা। বন্ধু-বান্ধব, পুরনো বান্ধবীরা, নিরবচ্ছিন্ন অবকাশে নির্ঝঞ্ঝাট লেখালেখি, গান-বাজনা, ছবি-আঁকা। কেউই বিরক্ত করার নেই। বাড়িতে চেঁচামেচি নেই। ভেবেছিলো, সুখের বন্যা হয়ে যাবে।

উইমেন্স লিব-এর মতোই রাজীবের মতো বিবাহিত, বিবেকবান পুরুষদের প্রায়ই মেনস লিব-এর কথা মনে হয়। সমস্তটা জীবন খেটে যাও গাধার মতো, স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সেবা করো। বদলে একটুও কনসিডারেশন নেই, কৃতজ্ঞতা জানানো নেই। কথা বলবে, একটি মাত্রই কথা। টাকা দাও। শুধুই টাকা।

রাজীবের সন্দেহ হতো, সংসার বাবদে যে টাকা ও দেয় রাণুকে, তা থেকে নিশ্চয়ই ও অন্য কিছু করে। এতটাকা দরকার কিসে হয় কে জানে? যা চায়, তাইই দেয় কিন্তু খাটনিটা কি তাদের? তারা তো বসেই থাকে বাড়িতে? গাড়ি নিয়ে নিউমার্কেট যাবে। ফুল কিনবে। গ্রান্ড হোটেলে গিয়ে চুল-ছাঁটাই, পেডিকিওর, ফেসালস ইত্যাদি আর রাজীব বাড়ি ফিরলে তাকে এক মুহূর্তের জন্যেও শান্তি দেবে না। সত্যিই ও ভেবেছিলো যে এই দেড়মাসে বহুদিন পরে এবারে ব্যাচেলরের নির্ঝঞ্ঝাট জীবনই উপভোগ করে নেবে।

একটি গল্প লিখতে হবে আজ। লিখতেই হবে। সম্পাদকের তাড়া ছিলো এতদিন। এখন অভিমান হয়েছে। কলম খুলে প্রথম লাইনটি লিখলো : "করবীর কথা মনে পড়লেই সবচেয়ে আগে যা মনে হয়, তা হচ্ছে ..."

ঠিক সেই সময়ে পিড়িং করে বেল বাজলো।

কে রে?

রাজীব ডাকলো পাপুকে।

পাপু এসে বললো, কান্ট্রি-ক্লাব থেকে জ্যাম-জেলী আর চীজ নিয়ে এসেছে। বৌদি বলে গেছিলেন আপনার জন্য রেখে দিতে। পঁয়তাল্লিশটা টাকা দিন।

ড্রয়ার খুলে টাকা দিলো রাজীব। বিরক্ত মুখে।

www.BanglaBook.org

এবার উঠে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলো ও। দিয়ে আবার কলম খুলে যতটুকু লিখেছিলো তা পড়লো। "করবীর কথা মনে পড়লেই সবচেয়ে আগে যা মনে হয়, তা হচ্ছে ..."

বাইরে থেকে ড্রাইভার রাম সিং ডাকলো, সাব।

আঃ! বলে, চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজা খুললো গিয়ে।

কি? ব্যাপারটা কি? ছুটির দিনেও কি তোমরা একটু কাজ করতে দেবে না আমাকে? নিজের কাজ। যে কাজ করে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাই?

গাড়িতে তেল নেই। স্লিপ কাটতে হবে। টিউনিং করতে হবে গাড়ি। অ্যাকসিলারেটরের তারে বোধ হয় খিঁচ ধরেছে। অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিলেই ধাক্কা মারছে গাড়ি।

রাজীব মনে মনে বললো, তার আমি কি করব? গাড়ি তো আমি চড়ি না। তোমার বৌদিই চড়ে। আমারও শরীরের অনেক জায়গাতে খিঁচ ধরেছে। গাড়ির ভাবনা আমি ভাবতে পারবো না।

স্লিপটা সই করে দিন পেট্রলের। কত তেল নেবো? আর মণ্ডলবাবুর গ্যারাজে চিঠি লিখে দিন। কাজগুলো করিয়ে নিতে হবে।

রাজীব ভিতরে ভিতরে গর্জাতে গর্জাতে লিখে দিল স্লিপ। এবং চিঠিও।

রাম সিং বাইরে চলে গেলো।

"করবীর কথা মনে পড়লেই সবচেয়ে আগে যা মনে হয়, তা হচ্ছে..."

সাব।

কি-ই-ই-ই?

রাম সিং আবার ঘরে ঢুকে বললো, গাড়ি কাল সার্ভিসে যাবে? সকাল দশটাতে বুক করা আছে। আপনি তো তার আগেই অফিসে যাবেন? আপনাকে নামিয়ে দিয়েই কি নিয়ে আসব গাড়ি পেট্রল-পাম্পে?

আমি বাসে যাব, ট্যাক্সিতে যাব, দরকার হলে হেঁটে যাব। তোমাদের যা খুশি করো। বিরক্ত করো না। আর যদি কেউ বিরক্ত করে আমাকে, খারাপ হয়ে যাবে। ভীষণই খারাপ হয়ে যাবে।

পাপু দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে বললো, মহাদেব একটা কথা বলেই চলে যাবে।

কি কথা? আবার কি কথা?

আপনার জন্যে কি মাছ আনবে বাজার থেকে তাই জিজ্ঞেস করছে।

তোদের জন্য কি রান্না হচ্ছে?

এঁচড়ের তরকারি, ডাল আর ভাত।

তোরা যা খাবি আমিও তাই খাব। কিছু আনতে হবে না। বাজারেও যেতে হবে না। এইবারে দরজা বন্ধ করলাম।

"করবীর কথা মনে পড়লেই সবচেয়ে আগে যা মনে হয় তা হচ্ছে..."।

বাইরে আবারও পিড়িং করে বেল বাজলো। একাধিক নারী ও পুরুষের গলার সম্মেলক স্বর শোনা গেলো।

কলম থামিয়ে উৎকণ্ঠিত উৎকর্ণ হয়ে রইলো রাজীব। মুখ কালো করে।

দরজায় আবারও কে যেন ধাক্কা দিলো। পাপু নিশ্চয়ই নয়। ওর এতো সাহস হবে না। আরে, এ যে বেশ জোরে জোরেই ধাক্কা দিচ্ছে।

কে?

www.BanglaBook.org

বিরক্তি এবং রাগমিশ্রিত গলায় বললো রাজীব।

খোলোই না গো দরজাটা রাজীবদা একবার। ঝুমা আমি।

ঝুমা, পুরনো পাড়ার বন্ধু নেপালের বোন। বড়লোকের বাড়ির বৌ এখন। ঝুমার সঙ্গে কৈশোরে একরকমের মিষ্টি সম্পর্ক ছিলো রাজীবের।

দরজা খুললো রাজীব।

ঝুমা বললো, অত কাজ দেখিও না তো! আমার মেজমাসীমার সেজ দেওরের ন'ছেলের মুখে ভাত। আগামী রবিবার। ওঁরা নিজেরা এসেছেন তোমাকে নেমন্তন্ন করতে।

রাজীব ভাবছিলো, রাণু থাকলে এই সমস্ত ঝক্কিই রাণুই সামলায়। তার গায়ে আঁচড়টি লাগতে দেয় না। তার কাজ বিঘ্নিত হতে দেয় না একটুও।

তবুও ও বাইরে এলো। ঘামে জবজবে পাজামা আর পাঞ্জাবী পরে। একজন বয়স্কা কিন্তু ঢঙী মহিলা এবং একটি অল্পবয়সী ছেলে।

ছেলেটি বললো, আমাদের পাড়ায় মুখ দেখাতে পারবো না আপনি না গেলে। সকলেই আপনাকে দেখতে চায়। আপনি না গেলে ওরা ভাববে, আপনি বোধহয় আমাদের কাছের মানুষ নন।

"কাছের মানুষ" কথাটা শুনলো রাজীব।

তার পরে নীরবে চেয়ে রইলো ভদ্রমহিলার মুখে। কার্ডটা হাতে নিলো ও।

বললো, বসুন, বসুন। ওরে পাপু, পাখাটা জোর করে দে। রাম সিং কি চলে গেছে? একটু মিষ্টি আনতে দে শিগগিরই।

ঝুমা বললো, মিষ্টিই যদি খাবে তো রাবড়ি খাও মাসী। রাজীবদার বাড়ির মতো রাবড়ি কোথাওই খাওনি তোমরা। বৌদি খাইয়েছিলো আমাকে একদিন। ঐ রাবড়ি খেলে শর্মার রাবড়ি মুখে দেবে না আর।

রাবড়ি পাওয়া যাবে তো রে?

হেসে পাপুকে শুধোলো রাজীব। বোকার মতো।

রাবড়ি কোথায় পাওয়া যায়? আরও বোকার মতো বলল, পাপু।

আঃ। রাম সিংকে ডাকনা।

বিরক্ত গলায় বললো রাজীব।

রাম সিং ড্রাইভার তো চলে গেলো। তেল আনবে তারপর...

আঃ। মহাদেবকে ডাক।

মহাদেবকে দোকানটার কথা বুঝিয়ে দিতে সে বললো, সে তো অনেক দূর দাদাবাবু। বাসে করে না গেলে তো আবার রান্নার দেরি হয়ে যাবে।

কতক্ষণ লাগবে যেতে আসতে? রাজীব শুধোলো তার অভব্য রান্নার লোককে।

আধঘন্টা তো বটেই। আধঘন্টা শুনেও ঝুমা অ্যান্ড তার আননোন গেস্টসরা কিছুই বললো না, বা বললেন না।

ওকে ঘর থেকে টাকা এনে দিয়ে রাজীব বললো, যাবে আর আসবে। দেরি করো না। বুঝেছো!

ছোট ছেলেটি বললো, আপনার লেখার ঘরটি একটু দেখতে পারি?

মহিলা বললেন, একটি বই কিন্তু আমাকে অটোগ্রাফ করে দিতেই হবে। মিসেস সান্যাল তা না হলে বিশ্বাসই করবেন না।

কি বিশ্বাস করবেন না? মিসেস সান্যাল কে?

www.BanglaBook.org

যে, আপনি আমাদের এতো আপন! মিসেস সান্যাল হিতু সান্যালের স্ত্রী। বড়লোক তো। ভারী দেমাক।

ও।

এমন সময় ফোনটা আবার বাজলো।

পাপু ধরলো। বললো, বিষ্ণুপুর থেকে বিরিঞ্চিবাবু।

বিষ্ণুপুরে রাণু ওর এক বন্ধুর মাধ্যমে ছোট্ট জমি পেয়েছে একটু। সেখানে বাগান-সমেত একটি এক-কামরার বাংলো বানানো আরম্ভ করে গেছিলো ও। বিদেশ যাবার আগেই। ওখানকার ঠিকাদার বিরিঞ্চিবাবু।

বলুন।

রাজীব বললো।

এসে গেছি কলকাতায়। এবার কুয়ো আর সেপটিক ট্যাঙ্ক করতে হবে। টাইলস-এর কি করলেন মিহিরবাবু? টাইলস আর প্লাম্বিং-এর জিনিস সব একবারেই নিয়ে যাবো টেম্পোতে করে। হাজার পনেরো টাকা চাই কালকের মধ্যেই। নইলে কাজ আটকে যাবে।

চেক বই তো অফিসে থাকে। পরশু অফিসে আসুন।

পরশু? এই রে। তাহলে সকালে ঠিক দশটায় পৌঁছব। বেয়ারার চেক চাই কিন্তু, পরশুই টাকা তুলে চলে যাবো বিষ্ণুপুর। আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই! বাড়ি করছেন, একবার দেখতে পর্যন্ত এলেন না?

আমার সময় নেই। রাণুর বাড়ি। মানে মিসেস সেনের। উনিই যাবেন।

তা ওঁকেই পাঠান। তবে গরমও পড়েছে প্রচণ্ড। কবে পাঠাবেন? গাড়িতে আসবেন?

উনি নেই।

কোথায়?

ইংল্যান্ডে।

তাহলে আপনার ছেলেকে পাঠান।

তারাও সকলেই গেছেন।

ইংল্যান্ডে কোথায়? আমাকে একবার জানালেনও না? মিডেক্স-এ আমার মেজ শালা, পিনার-এ আমার খুড়তুতো ভাই, বেলফাস্ট-এ আমার ন-কাকার সেজ শালী থাকেন। প্রত্যেকেরই নিজের বাড়ি-গাড়ি। মিসেস সেনের কত দেখাশোনা করতে পারত ওরা।

কথা কেটে রাজীব বললো বিরিঞ্চিবাবুকে, ঠিক আছে। পরশুই আসুন অফিসে।

যাঁরা নিজেরা কখনও বিদেশে যাননি তাঁদের ধারণা বিদেশের সব মানুষেরাই নিষ্কর্মা। কবে কারা গিয়ে তাঁদের কৃতার্থ করবেন সেই ভরসাতেই থাকেন তাঁরা।

আপনিই চলে আসুন বিষ্ণুপুর। কামিং উইকে। বিরিঞ্চিবাবু বললেন। আফটার অল বাড়ি মিসেস সেনের হলেও আপনি তো আসল।

আচ্ছা রাখি।

বলে, দীর্ঘশ্বাস ফেললো রাজীব একটা। ভাবলো, কে আসল কে নকল তা বিরিঞ্চিবাবু কি জানেন? কেওড়াতলা ছাড়া যাওয়ার আর কোনোই জায়গা নেই ওর এখন। একমাত্র যেখানে গেলে বিশ্রাম, শান্তি, ঘুম...নিরিবিলিতে...।

ঝুমা খুবই মডার্ন মেয়ে। পাতি-পরিবারের মেয়েরাই আজকাল সবচেয়ে বেশি আধুনিক হয়ে গেছে।

ঝিং-চ্যাক একেবারে। কে বলবে আজ ছেঁড়া ফ্রক-পরা কুমুদিনী স্কুলের সেই ঝুমাই

www.BanglaBook.org

এই ঝুমা। এমনই মেমসাহেব হয়ে গেছে ও যে বাংলায় বই-টই লেখালেখি হয় তা ও জানে না। বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য এবং সাহিত্যিকও ওর কাছে পেঙ্গুইন বা অ্যালবাট্রস পাখিরই মতো অদেখা অজানা কিছু। কিন্তু কোনোই উৎসাহ নেই সে সব সম্বন্ধে।

ভদ্রমহিলা বললেন, আপনার 'যাদুকরী' উপনাসের শেষটা অমন করলেন কেন বলুন তো? কেমন ম্যাদামারা হয়ে গেলো।

ছেলেটি বললো, আমার মাসীমণি কিন্তু বলছিলো, 'যাদুকরী'র শেষটা উপন্যাসটিকে একটা অন্য হাইটে তুলে দিয়েছে।

চার ফিট উচ্চতার ছেলের মুখে উপন্যাসের 'হাইটে'র কথা শুনে ঠিক কি ভাবে ব্যাপারটাকে নেবে তা ঠিক করে উঠতে পারলো না রাজীব।

নানারকম প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে একসময় মহাদেব ফিরে এলো রাবড়ি নিয়ে। রাবড়ি দেওয়া হলো সবাইকে। তারপর ওঁরা 'না এলে কিন্তু চলবেই না' বলে চলে গেলেন।

ঝুমা বললো, বাপ্পি! তুমি রাজীবদা কেমন বুড়োটে মেরে যাচ্ছো। বৌদি নেই, এই সময়ে একটু আফেয়ার-ট্যাফেয়ার করো। বলো তো আমিই আসব। আই অ্যাম গেইম।

ঝুমা কথাটা রসিকতা করেই বললো।

সম্পর্কটা তো রসিকতারই। কিন্তু রাজীবের মনে হলো রসিকতা নাও হতে পারে। অনেক সময়, সত্যিকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্যি বলে মনে হয়।

ঘড়িতে ততক্ষণে নটা বেজে গেছে। এবার ঘরে যাওয়ার আগে রাজীব বললো, শোন তোরা ভালো করে। আবারো যদি কেউ আমাকে বিরক্ত করিস তবে আটতলা থেকে তোদের আমি নিচে ছুঁড়েই ফেলে দেব।

ঘরে ঢুকে কলমটা খুললো। পড়ল : "করবীর কথা মনে পড়লেই সবচেয়ে আগে যা মনে হয়, তা হচ্ছে..."

পিড়িং করে বেল বাজলো। আবার।

কে রে?

এবার মেরে-ধরেই দেবে। যেইই আসুক। ভাবলো রাজীব।

পাপু এসে একটা কার্ড দিলো। বললো, পোকা-মারা কোম্পানির লোক এসেছে। আজ রান্নাঘরে ওষুধ দেওয়ার দিন। বৌদি রান্নাঘর থেকে আভেন-টাভেন সব বের করে রাখেন আগে থেকেই। আজ তো করা হয়নি। ওঁরা অবশ্য আবার ঘুরে আসবেন দুপুরবেলায়।

বলে দে, আজ হবে না। কিসের পোকা?

পাপু চলে গেলো।

কিন্তু একটু পরেই আবার এসে বললো, রাতে তেলাপোকা দেখা যাচ্ছে কিনা রান্নাঘরে তা জানতে চায়। দেখা গেলেও কত তেলাপোকা?

তার আমি কি জানি? মহাদেবকে ডাক।

মহাদেব এসে বললো, রাতে আমি তো কোয়ার্টারে চলে যাই দাদাবাবু। আমার তো জানার কথা নয়।

বৌদিই মাঝরাতে উঠে তেলাপোকা গুনে গুনে একটা খাতাতে লিখে রাখেন। আপনি তো অন্য ঘরে শোন তাই জানেন না। বৌদি আর খুকু জানে।

রাজীব বললো, অসম্ভব অবস্থা। আমি পাগল হয়ে যাবো। ওঁদের চলে যেতে বল আজকে। সোমবার আমি যখন থাকবো না তখনই আসতে বল। তোরা যা পারিস কর।

পাপু বললো, টাকা চাইছে। কনট্রাক্ট রিনিউ হবে।

www.BanglaBook.org

কত টাকা?

আড়াই শো।

নিয়ে যা। বিদায় কর ওদের এক্ষুনি। রাজীব ভাবছিলো, রাণুকে মাসে যে টাকা ও দেয় সংসারের জন্যে এবং তা নিয়ে হম্বি-তম্বি করে, সেই টাকাতে সারা মাস চালায় কি করে রাণু? দুদিনেই তো ওর অবস্থা কাহিল হয়ে উঠেছে।

পেস্ট-কন্ট্রোলের লোকেরা চলে গেলে, লেখার প্যাডে মনোনিবেশ করলো আবার রাজীব। নাঃ এবারে...

"করবীর কথা মনে পড়লেই সবচেয়ে আগে যা মনে হয়, তা হচ্ছে...।"

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে করবীর গল্পর যে লাইনটা লেখা হয়েছিলো তা কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে রাণুকে একটি চিঠি লিখতে বসলো ও। ফোনে তো এত কথা বলা যাবে না। দিল্লি থেকে ফোন করেছিলো রাজীব, রাণুরা পৌছবার পরদিনই। লানডানে। গত সপ্তাহেও ফোন করেছিলো। ফোনে এক ঝলক কথা হয়েছিলো। খোকন, খুকু, এবং রাণুর সঙ্গেও। তখনও জেট-ল্যাগ যায়নি ওদের। বেশি কথা হয়েছিলো খুকুর সঙ্গেই। তার আদরের ছোট মেয়ে খুকু। বেশি বয়সে যে সন্তান আসে, তার প্রতি এক বিশেষ মায়া পড়ে। বেশি আদরের হয় তারা।

লিখলো রাজীব, চিঠির প্যাড বের করে।

কলকাতা, ২৫-৫-৮৭

রাণু, কল্যাণীয়াসু,

এক অসহায় অবস্থায় পড়ে তোমাকে এই চিঠি লিখছি। অসহায় যেমন, তেমন অপরাধীও বটে আমি। এবং কী জানি হয়তো অনুতপ্তও।

অনুতাপ যে এমন মহৎ বোধ তা কিন্তু আগে জানা ছিলো না। ধূলিমলিন বাসি অভিমানের মধ্যে এক ধরনের দীপ্তিও বোধ হয় নিহিত থাকে, যা আগে জানতাম না। ধুলো সাফ করার সময়ে ঝিলিক মারে তা। আগে জানতাম না।

সংসার এবং সংসার-সংক্রান্ত কারণে তোমাকে রাগের মুখে অনেকই কটু কথা বলেছি অনেকই সময়ে। প্রায় প্রতিদিনই। তোমার আড়ম্বরের সংসারের খোঁটা দিয়ে তোমাকে ব্যথিত করেছি। বলেছি, তোমার এই ঝকঝকে তকতকে বাড়িতে তো আমার কোনোই অধিকার নেই। তাই, তা থাকলো কী না থাকলো, তাতে কীই বা এসে যায়। প্রতি শনিবারে নিউমার্কেট থেকে নানারকম ফুল কিনে এনে ফুল সাজিয়েছো যখন, তখন বলেছি যে কে আসবে আজ?

তুমি হেসে গান গেয়ে বলেছো, "ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি।" বলেছো, তুমি আর আমি থাকলেই তো উৎসব। বাইরের লোকের আসার দরকার কি?

যে পুরুষের জীবনে কাজটাই বড়, 'Work is worship', কাজটা যার কাছে পুজোর মতো, তার যে সংসারী হওয়ার মতো ভুল আর দুটি নেই এই কথাটা বারবার দিনের পর দিন বছরের পর বছর বলতে বলতে অবচেতনে সে কথা আমি বিশ্বাসও করে ফেলেছিলাম।

মাঝে-মাঝেই আমার তাই মনে হতো, তোমার দুর্ব্যবহারে, খোকন ও খুকুর আমার প্রতি ঠাণ্ডা, আশ্চর্য ও উদাসীন মনোভাবে যে, বিয়ে করার মতো পাপ বোধ হয় আর দুটি নেই। অফিস এবং লেখালেখি করে দিন ও রাতের আঠারো ঘন্টা সময় বন্ধক দিয়ে শুধুমাত্র তোমাদেরই সেবা করে কিন্তু নিজেকে অনুক্ষণই ঠকিয়ে, স্থির পদক্ষেপে, কেওড়াতলার দিকে হেঁটে চলেছি আমি। এ কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছি। একা-আসা, একা-যাওয়া;

www.BanglaBook.org

মিথ্যে এই মাঝের পুতুল খেলা। আমার ছেলেমেয়েদের ভাবতাম স্বার্থপর। এইটুকু বয়সেই তারা নিজের নিজের কেরিয়ারের ভাবনাতে মশগুল। তাদের বাবা যে তাদের আনন্দ, তাদের ভবিষ্যৎ-এর কথা ভেবে নিজের বর্তমানটাকে গুলি করে মেরে দুর্গন্ধি হায়নার চামড়ার মতো টাঙিয়ে রেখেছে আকাশ-প্রদীপ করে তা ওরা কখনও জানবে না, বুঝবে না।

আজ বুঝতে পারছি যে হয়তো তুমি একাই নও, প্রত্যেক বাঙালি স্ত্রীই তার স্বামীর জন্যে কি করে না করে! তাদের সন্তানদের জন্যেও।

তুমি যদি একা হাতে এই সংসারের হাল ধরে না থাকতে, তবে বোধ হয় আমার কাজকর্ম, লেখালেখি কিছুই হতো না, হতো না ছবি আঁকা, গান গাওয়া। আমরা পুরুষরাই যে সংসার-তরণী এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মূলে, টাকাই যে সব নয়, সংসারের একমাত্র জ্বালানি নয়, এই কথাটা আমার মতো অনেক সাফল্যে উদ্ধত, উচ্চমন্য স্বামী মনে করেন না। আমাদের অজানিতে, আমরা যখন অফিসে কাজ করে তোমাদের ধন্য করি বলে মনে করি, তখন তোমরা যে আমাদের চোখের আড়ালে এই সংসারকে নিপুণভাবে চালাবার জন্যে কি আর কতটুকু করো তার কোনো ধারণাই আমাদের মধ্যে নিরুনব্বুইভাগ পুরুষের নেই।

আমারও ছিলো না। কিন্তু তিনদিন সংসার করেই আমার পাগল হবার মতো অবস্থা হয়েছে। সারা দুপুরও কি তুমি একটুও বিশ্রাম পাও না? এই সংসার, চাকরবাকর, কলিং-বেল, টেলিফোন সব চারপাশ থেকে তোমাকে অক্টোপাসের মতো বেঁধে রেখেছে। এবং তুমি যে কত অসহায়, এবং কত সাহসীও, তাও বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না।

ফাঁকা বাড়িতে এখন আমি তোমার ও খোকন ও খুকুর ঘরে ঘুরে ঘুরে দেখি। ঘরের মানুষ না থাকলে সেই ঘর যেমন শূন্যতায় খাঁ খাঁ করে তেমনই সে ঘর আবার এক ধরনের পূর্ণতাও পায়। সে পূর্ণতা যে সেই ঘরে পদার্পণ করে তারই স্মৃতিতপ্ত বিরহী মনের। পূর্ণতার নৈবেদ্য দিয়ে সেই স্ত্রী-সন্তানহীন বাড়ির শূন্যতাকে সেই স্বামী তখন ভরিয়ে তোলে। নানা ভাবে। চোখের কোণা ভিজেও আসে কখনও কখনও।

আজ কেন যেন মনে হচ্ছে, যে-কথাটি গত কুড়ি বছরে কখনওই বুঝিনি সেই কথাটিই আজ ব্যাকুলভাবে বুঝতে পারছি।

নারী আর পুরুষকে বিধাতা যে একসূত্রে বেঁধেছিলেন এবং এত হাজার বছরেও যে সেই যোগসূত্রটি ছিন্ন হয়নি, তার পেছনে যুক্তি যথেষ্টই আছে। তোমাদের পটভূমিতেই আমরা ভাস্বর হই। তোমাদের কাছ থেকে সুখ, শান্তি, আত্মবিশ্বাস সব প্রতিফলিত হয়ে হয়ে আমাদের উজ্জ্বল করে তোলে অথচ পরম মূর্খেরই মতো আমরা সেই উজ্জ্বলতা সম্পূর্ণই আমাদের স্বসৃষ্ট বলে মনে করি।

আরও একটা কথা। তোমার সঙ্গে প্রায় সব সময়ই ঝগড়া করি। তুমি না থাকাতে আজ বুঝতে পারছি যে ঝগড়া করা যায় শুধুমাত্র তারই সঙ্গে, যার উপরে আমার দাবি বা অধিকার বিষয়ে আমার কণামাত্রও সন্দেহ নেই। আমি তো তোমার সঙ্গে যেমন করে ঝগড়া করি তেমন করে মহাদেব বা পাপুর সঙ্গে কোনোদিনও করতে পারব না। পারব না, যখন খোকনের বিয়ে হবে বা খুকুর, তাদের স্ত্রী ও স্বামীর সঙ্গে। ঝগড়াটাই যে ভালোবাসা, জোর, স্বভূমি এই কথাটা তুমি এতদিনের জন্যে দূরে না গেলে জানতেও পেতাম না।

ভেবেছিলাম এই দীর্ঘ ও বিলম্বিত স্বাধীনতা দারুণ ভাবে উপভোগ করব। এখন ভাবছি কবে তোমরা ফিরবে। বাড়ি আবার গমগম করবে।

আমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না অনেকেই দিন। কাল পরশু একটা ই-সি-জি করাবো। প্রেসারও নিইনি অনেকদিন। যদি দেখা না হয় আর? কে বলতে পারে। তাই তড়িঘড়ি এই

www.BanglaBook.org

চিঠি পাঠাচ্ছি। জেনো যে, আমার অনেক দোষ সত্ত্বেও তোমাকে আমি আমার মতো করেই ভালোবাসতাম। ভালোবাসার প্রকাশ তো সকলের সমান হয় না!

ভালো থেকো। খুব মজা করো, বেড়াও। খুকুকে যত রকম আইসক্রীম পাওয়া যায় ইংল্যান্ড ও ইয়োরোপে, তা খাইয়ে দিও। আইসক্রীম ও খুব ভালোবাসে। আর ডেজার্টও।

ইতি তোমাদের রাজীব এবং বাবা।

চিঠিটা লেখা শেষ হলে অনেকক্ষণ জানালা দিয়ে দূরের রাস্তার ফুলে ভরা কৃষ্ণচূড়া গাছেদের হাওয়ায় ফুলে-ফুলে ওঠা ডালগুলির দিকে চেয়ে রইলো রাজীব উদ্দেশ্যহীন ভাবে।

আজ ও আর কিছুই করবে না। মাঝে মাঝে এমন কর্মহীনতা ভালো। নিজের জীবনের চলার পথের কম্পাসের কাঁটার দিকেও দেখা দরকার। নইলে দিগভ্রষ্ট হতে হয়। যেমন হয়েছিলো এত দিন, এত বছর। লেখালেখিও করবে না।

লেখা আসে, মনের ঘরের শূন্যতা থেকে। আজ মনে মনে রাজীব বড় পূর্ণতা পেয়েছে। সুখী বলে মনে করছে নিজেকে। এতরকম অশান্তির মধ্যে যে এমন গভীর এক প্রত্যয়পূর্ণ শান্তি লুকোনো ছিল সকাল থেকে, এই অগণ্য উপদ্রবই যে তাকে নিজের ঘর, নিজের স্ত্রী, নিজের সন্তানদের প্রত্যেকের নিজস্ব এবং প্রকৃত ভূমিকাতে প্রতীয়মান করে তুলে তার মনটাকে এতখানি দ্রব করে তুলেছে এই কথা ভেবেই এক স্মিত হাসি ফুটে উঠলো ওর মুখে।

পাপু দরজা ঠেলে ঢুকে বললো, কি খাবেন? ব্রেকফাস্টে? কি বানিয়ে দেবে বাসুদেব?

রাজীব ভাবলো, ফলের রস থেকে ভিটামিন ট্যাবলেট এমন গুছিয়ে রাণুর মতো আর কেউই দিতে পারবে না।

তারপর হেসে বললো, যা খুশি তাইই দে।

পাপু হতভম্ব হয়ে গেলো দাদাবাবুর মেজাজের অমন হঠাৎ পরিবর্তন দেখে। কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। মহাদেব আর লক্ষ্মণ বললো, তোর আবার কি হলো, হাসছিস কেন? "যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রাম শন্না।"

পাপু বললো, গলা নামিয়ে, পাগলের কারবার। এই মারতে উঠেছিলেন একটু আগে আর এখন হাসছেন। বাবুদের কারবার। শালা, বোঝা ভার!

মহাদেব যা দেবে তাইই খাবে! এই বললেন।

লক্ষ্মণ কোমর দুলিয়ে হেসে উঠলো, আলো বাপ্পালো! বলে।

ও আগে ওড়িশার গ্রামের যাত্রায় মেয়ে সাজতো। ওর বলার ভঙ্গিতে অন্যরাও হেসে উঠলো একসঙ্গে।

রাজীবও হাসছিলো একা ঘরে বসে। শব্দ না করে। আনন্দের হাসি। এই সংসারের প্রাত্যহিকতার, মলিনতার পৌনঃপুনিক পটভূমিতে সংসারের বিষণ্ণ সায়াহ্নকালের ছবিটার সঙ্গেই ওর গভীর পরিচয় ছিলো কিন্তু সেই পশ্চিমাকাশের বিধুর পটভূমিতে আজ রাণুর ছবিটি ফুটে উঠলো। তা অন্য ছবি। একেবারেই অন্য। স্পষ্ট হয়ে নয়। তার শাড়ির রং জামার রং বা হাসির ভাব কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না। সব কিছুই অস্ফুট। অস্পষ্ট। তবু এই সংসারের পটভূমিতে একজন নারী ফুটে উঠছিলো ক্রমশ। মুহূর্তে মুহূর্তে স্পষ্ট হচ্ছিলো তার উপস্থিতি, অবয়ব। রাণুই।

নতুন রাণু!

www.BanglaBook.org

দাদা হওয়া

জোরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে একটু আগেই। দোকানের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে একবার দেখলো সূর্য। নাঃ। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে একেবারে।

দশ ট্রাক জ্বালানী-কাঠ-ঢেনকানল থেকে এনে আজই গোলার হাতার মধ্যে আনলোড করেছে হরজিত সিং ট্রাকওয়ালা। সেগুলো শেড-এর নীচে নেওয়া গেলো না কুলিরা সব পরবের জন্যে ছুটি নিয়ে চলে গেলো বলে। কাঠগুলো সব ভিজে একসা হয়ে গেলো। দু-তিন দিনের কড়া রোদ পেলে তবেই শুকোবে, না-শুকোলে শেড-এর নীচে তোলাও যাবে না। ফরেস্ট করপোরেশানের কাঠগুলোও এসে যাবে মনে হয়, কালকের মধ্যেই। এদিকে বৃষ্টিরও ছাড় নেই। কতদিন পরে যে আকাশ আজ পরিষ্কার হলো! আবার কখন নামবে কে জানে!

চালান করে মালগুলো পারিজাতবাবুর আর শশধরবাবুর করাত-কলে পাঠাতে হবে পরশু-তরশুর মধ্যেই। কতরকম যে কাজ থাকে, তা বলার নয়। দিনের শেষে নিজেকে মনে হয় ঝড়ের মধ্যে-পড়া ডানা-ভাঙা কোনো পাখি।

মেজভাই চাঁদ চলে গেছে পাঁচটার সময়ে। পুজোর নাটকের মহড়া শুরু হয়ে গেছে ওদের ক্লাবের। বাখরাবাদ ক্লাব এধারে ভদ্রক থেকে খুব ভালো যাত্রা আনছে। চাঁদরা "ছত্রপতি শিবাজী" করবে। এখন থেকে রোজই বিকেল পাঁচটাতেই চলে যাবে চাঁদ। পুজোর মাত্র দেড়মাস বাকি। সবচেয়ে ছোট ভাই তারা তো রোজ আসেই না। খুশি হলে আসে, নইলে নয়। যেদিন আসে, সেদিন দুজনেই খেতে যায় বাড়িতে বারোটা নাগাদ। ঘুমিয়ে টুমিয়ে ফেরে তিনটে নাগাদ।

দোকানের দরজা বন্ধ করে তালাগুলো সব লাগালো সূর্য। তারপর তালাগুলোর উপরে

www.BanglaBook.org

পাকানো-কাগজে আগুন জ্বেলে আরতির মতো করলো। বাবা ব্রহ্মা সেন হাতে ধরে তাকে শিখিয়ে দিয়ে গেছিলেন। এই রিচুয়াল। বিশ্বাস করে কি না জানে না নিজেই, তবু করে আসছে তিরিশ বছরের চেয়ে বেশি।

কৃপাসিন্ধু আর বাইধর তালাগুলো টেনেটুনে দেখে নিলো ঠিকমতো আটকেছে কি না! চাবির তোড়াটা থলেতে পুরে সাইকেলের ক্যারিয়ারের স্প্রিং-লাগানো ঢাকনার নীচে রাখলো। তারপর বললো, কাল সকাল আটটার সময় আসবো রে বাইধর।

কৃপাসিন্ধু বললো, আমিও চলে আসবো আটটারই মধ্যে। কেন্দ্রাপাড়া আর নুয়াগড় থেকে মালও যে আসবে কাল সকাল আটটা নাগাদ!

ক'ট্রাক? আগে তো বলোনি কৃপাসিন্ধু!

সূর্য শুধোলো।

বলবো কি বড়বাবু! আপনার কি নিঃশ্বাস ফেলার সময় ছিল?

কেন্দ্রাপাড়া থেকে দু-ট্রাক আর নুয়াগড় থেকে তিন ট্রাক।

কি কাঠ রে?

ভালো কাঠ আর কোথায় আছে বাবু দেশে? সরু সরু শাল আর কিছু রসসি আসবে কেন্দ্রাপাড়া থেকে। মিটকুনিয়া, সাহাজ আর বুনো আম আসতে পারে নুয়াগড় থেকে।

হুঁ।

সূর্য স্বগতোক্তি করলো। মাঝেমাঝে ওর মনে হয় প্রকৃতির দেবতা বোধহয় কোনোদিন তাদের পুরো পরিবারকেই সাংঘাতিক শাস্তি দেবেন নিবিড় অরণ্যকে দুই পুরুষ ধরে এমনভাবে নষ্ট করার জন্যে! নষ্ট এমনিতেই হতো। ওরা নিমিত্ত মাত্র। মানুষের লোভ আর মানুষের সংখ্যাই সুন্দর সবকিছুকেই একেবারেই নষ্ট করে দেবে যে, সে বিষয়ে সূর্যর কোনোই সন্দেহ নেই।

সাইকেলে উঠলো সূর্য। ওরাও যার-যার সাইকেলে উঠলো। কাঠগোলা প্রায় সবই বন্ধ হয়ে গেছে। ঐ মহল্লা ছাড়িয়ে এসে অন্য মহল্লাতে পড়লো। সেখানেরও প্রায় সব দোকানই বন্ধ হয়ে গেছে। পথে বেশি লোকজনও নেই। কাঠজুরি নদীর পারের রাস্তায় কিছু লোক আর ফেরিওয়ালা আছে। বেশিই কলেজের ছেলেমেয়ে। নদীপারের চওড়া রাস্তা ছেড়ে দিয়ে ওদের পাড়ার কাঁচারাস্তাতে ঢুকতেই নদীর জলের আর নদীর পারের রাস্তার মিশ্র কলরোল আর কোলাহল থেমে গেলো।

নায়েকবাবুর বড় মেয়ে সরস্বতী রোজকার মতো আজও রিয়াজ করছে। পাশ দিয়ে যেতে যেতে মনে হলো কাফী ঠাটের কোনো রাগ। এখন আর তেমন ধরতে পারে না সূর্য। সুনন্দা পট্টনায়েকের কাছে নাড়া বেঁধেছে সরস্বতী।

রোজই দোকান বন্ধ করে ফেরার সময় যখন নায়েকবাবুর বাড়ির সামনে আসে তখনই ওর মনটা খারাপ হয়ে যায়। ও নিজেও ক্লাসিকাল গান শিখতো একসময়। র‍্যাভেনশ কলেজে পড়াশোনাও করতো। পড়াশুনোতে কিছু খারাপও ছিলো না। বাবার একবার ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হলো। তখনই কলেজ ছাড়িয়ে ওকে ব্যবসাতে ঢোকালেন উনি। বাবা, ব্রহ্মা সেন বলতেন, ব্যবসাদারদের ছেলেরা বেশি পড়াশুনো করলে তাদের গুমোর হয়ে যায়। আর গুমোর হলেই ব্যবসা মাটি। বেশি বিদ্বান ছেলেরা কি আর দোকানে বসতে চায়?

www.BanglaBook.org

ফলে, ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাটা পর্যন্ত দেওয়া হলো সূর্যর। গান-বাজনা করা তো দূরের কথা। বাবা বলতেন, ব্যাটাছেলে আবার গান গাইবে কি? গান তো গায় বাঈজীরা! সেই ব্রহ্মা সেনেরই অনেক পরিবর্তন এসেছিল পরবর্তী জীবনে।

মেজ ভাই চাঁদ ঐ কলেজ থেকেই বি.এ. করেছিলো। কটকের নামকরা কলেজ। আর ছোট ভাই তারাও ঐ কলেজ থেকেই বি.এ. করে য়্যুনিভার্সিটি থেকে পোলিটিক্যাল সায়ান্স-এ এম.এ. করেছিলো।

চাঁদ ও তারা যে বড় ভাই সূর্যর থেকে বেশি পড়াশুনো করেছে, এ কারণে মাঝে মাঝে সূর্যকে অপ্রস্তুত হতে হয়। ভাইয়েরা কিছু বলে না, কিন্তু ভায়েদের স্ত্রীদের কথাবার্তায় মাঝে মধ্যে তা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

সূর্যর স্ত্রী সাবিত্রী স্কুল-ফাইন্যাল পাশ। উত্তর কলকাতার এক ভালো বংশের পড়ে-যাওয়া অবস্থার বাড়ির মেয়ে সে। মেজোভাই চাঁদের বউ ঝুমরীদের বাড়ি ভুবনেশ্বরে। ঝুমরীর বাবা ভুবনেশ্বরের একজন বড় ঠিকাদার। বেশ পয়সাওয়ালা পরিবার। ঝুমরী নিজেও বি. এ. পাশ। ঝুমরীর বাবা অনেকই দিয়ে-থুয়ে বিয়ে দিয়েছিলেন বলে ঝুমরীর দেমাকও খুব। একটি ফিয়াট গাড়িও দিয়েছিলেন। সেটি বিক্রি করে দিয়েছে চাঁদ ক'দিন হলো। মারুতি বুক করেছিলো, অ্যালটমেন্টের চিঠি পেয়ে গেছে।

ছোট ভাই তারার স্ত্রী দক্ষিণ কলকাতার মেয়ে। সেখানকার কলেজে পড়া। রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্কুলের ডিপ্লোমাও আছে। তার পয়সার দেমাক নেই কিন্তু সংস্কৃতি আর আধুনিকতার দেমাক আছে। ওড়িশাপ্রবাসী এই কাঠ-ব্যবসায়ী পরিবারে চুমকি যেন দয়া করেই এসেছে বউ হয়ে, এমনই একটা ভাব।

সূর্য, নারায়ণের কাছ থেকে দুটি পান নিয়ে প্রায় জোর করেই গগনবাবুকে খাওয়ালো। গুণ্ডির পিক ফেলে বললো, আরে, ওরা আজকালকার ছেলে, ওরকমই! যাই হোক, আমিই ওর হয়ে ক্ষমা চাইছি। মার্জনা করে দেবেন। আমি তো আপনাকে কখনও অপমান করিনি।

আরে, আপনার কথা কে বলছে? আমি তো আমার ছোট ভায়েদের বলি সবসময়ই! কী বলেন?

বলি, আমাদের এই কারবারে মানুষ ঐ একটাই আছে। সততা আর বিনয় আর কথার দামের আরেক নামই তো ব্যবসা! না কি? সেই যে সেবার পারাদীপের অত বড় সাপ্লাইয়ের কয়েক লাখ টাকার লোকসান দিলেন, সে তো কথার দামেরই জন্যে, না কি? সবসময়ই বলি!

সূর্য হেসে বললো, কিসের লোকসান গগনবাবু? যে-সাপ্লাইয়ে লাভের কথা থাকে তাতে হয়ে যায় লোকসান আর যাতে লোকসানের কথা, তাতে লাভ। ডানহাতের তর্জনী তুলে উপরে দেখিয়ে সূর্য বললো, দাঁড়িপাল্লা নিয়ে ঐ উপরে একজন যে বসে থাকেন, খতিয়ান মেলে; উনিই হরেদরে রেওয়া ঠিকই মিল করে দেন। ওঁর উপরে ভরসা রাখুন গগনবাবু, চিন্তাভাবনা ওঁর উপরে ছেড়ে দিন। নিজের বোঝা হালকা লাগবে। আমাদের নিজেদের হাতে কতটুকু আছে?

পান খেতে খেতে গগনবাবু আবার বললেন, ছোটভাই তারাও কি আলাদা ফার্ম করলো নাকি? তারাও শুনি প্রায়ই জাজপুরে যায়। জাজপুরে আমার শ্বশুরবাড়ি তো! ও-ও ওখানে একটা ধান্দা করছে মনে হয়। আপনি কি জানেন এ সব? একটু খোঁজ খবর রাখবেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সূর্যবাবু। দশটা গাধা মরে একটা বড় ছেলে হয়। আমাকে দেখে শিখুন। কী করলাম সংসারের জন্যে আর কী পেলাম।

সূর্য অনেকখানি গুণ্ডির পিক একবারেই গিলে ফেললো। বললো, আরে গগনবাবু, আমিই তো ওদের পাঠাই। এক ঝুড়িতে সবকটি ডিম রাখা কি ভালো? তাছাড়া, ওরা তো আমার মতো পুরোনো আমলের লোক নয়। ওদের ভাবনা চিন্তাই আলাদা ; মডার্ন। তারাটা তো বলেছিলো, কম্প্যুটারের এজেন্সী নেবে। বিজনেস অব দ্য ফিউচার। আমি না হয় তেমন লেখাপড়া শিখিনি, ইংরেজি বলতে পারি না ফটফট করে, খালপাড়ের এই কাঠগোলায় পড়ে-থাকা ছাড়া আমার না নয় আর কোনোই উপায় নেই, তাবলে ওরা অন্য কিছু, নতুন কিছু করবে না কেন! ওদের বুদ্ধিসুদ্ধিই আলাদা!

গগনবাবু সূর্যর কথাতে একটু মনমরা হয়ে গেলেন। ভেবেছিলেন, ভায়েদের এই স্বার্থপরতাতে সূর্য আহত হবে। দু-চার কথা বলেও দেবে ভায়েদের নামে।

বললেন, ও। আপনি তাহলে জানেনই সব! তাহলে তো ভালোই! খুবই ভালো। ডাইভার্সিফাই করা তো ভালোই।

গগনবাবুর জিপ চলে গেলে সূর্য সাইকেলে উঠলো। মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেলো। এসব কোনো কিছুই সূর্য জানতো না। ভাইয়েরা পারিবারিক ব্যবসায়ে তাকে সাহায্য না করে, ব্যবসায়ে ঢুকতে না ঢুকতেই নিজেদের আলাদা রোজগারের ধান্দা করতে শুরু করেছে অথচ ব্রহ্মা সেনের কারবারে তিনজনেরই সমান অংশ। কী করবে! বাবা বেঁচে থাকলে অভিমান করে বাবাকে কিছু বলতে পারতো। কিন্তু বলেও লাভ বোধহয় হতো না। স্নেহ চিরদিনই নিম্নগামী। বাবা থাকাকালীনই সে কথা সূর্য বুঝতে পেতো। ছোট ভায়েদের ব্রহ্মা সেন আলাদা চোখে দেখতেন।

মাঝে মাঝেই সূর্যর মনে হতো ও বোধহয় বাবার সৎ ছেলে।

মা ও বাবার মৃত্যুর পর তাঁদের সিন্দুকে কী ছিলো-না-ছিলো তা ভায়েরা সূর্যকে কেউই কিছু বলেনি। সূর্যর জানবার কোনো ঔৎসুক্যও হয়নি কখনও। বাবার মৃত্যুর পর বলেছিলো, মায়ের বাপের বাড়ি সম্বলপুর থেকে বাবাকে লেখা মায়ের কিছু চিঠি ছাড়া বাবার আলমারিতে আর কিছুই ছিলো না। মায়ের অসংখ্য দামী গয়না ছিলো, মা সাবিত্রীকে দেখিয়ে রেখেছিলেন, এই-যে সাবু, এইটে আর এইগুলো তোমার, আর এইগুলো হলো আমার বড় ছেলের মেয়ে, আমার ছায়া নাতনীর! কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর চাঁদ ও তারা বলেছিলো, মায়ের কোনো গয়নাই ছিলো না। যতটুকু ছিলো তা তো একমাত্র বোন দরিয়ার বিয়ের সময়েই সব দিয়ে থুয়েই গেছেন। ইনকামট্যাক্সের উকিল পানিগ্রাহীবাবুকে দিয়ে সাফাই গাইয়েছিলো।

"মিসেস সেন এর ওয়েলথ-ট্যাক্স এর রিটার্ন-এ তো কোনো জুয়েলারী দেখানো ছিলো না কোনোদিনও। গয়না থাকলে তো দেখানোই হত!'

সূর্য একটিও কথা বলেনি। মনে মনে হেসেছিলো। কিন্তু যারা চোখের পাতা একটুও না-কাঁপিয়ে ডাহা মিথ্যে বলতে পারে, তাদের কাছে সত্য নিয়ে তর্ক করার মতো নোংরামির মধ্যে সূর্য যায়নি।

সাবিত্রী বিস্ময়ের চোখে চেয়েছিলো সূর্যর দিকে, মায়ের কাজের সময়ে।

সূর্য চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো।

www.BanglaBook.org

সম্পত্তি, জমি-জমা, দলিল-পত্র ইত্যাদি কোনো বিষয়েই ব্রহ্মা সেন কোনোদিনও বড়ছেলের সঙ্গে পরামর্শ বা আলোচনা করেননি। সবই ছোটদের সঙ্গে। শুধু ব্যবসাটার পুরো ভারটা তার কাঁধে চাপিয়ে তাঁকে প্রথম যৌবন থেকেই ন্যস্ত করে রেখেছিলেন। সেই বোঝার ভার আজও লাঘব হয়নি।

গগনবাবুরই মতোন বহু পরিচিত মানুষই বলেছেন সূর্যকে, জমি-বাড়ির দলিল চোখে দেখেননি! আশ্চর্য! অথচ আপনি বড় ছেলে! আপনি আলাদা হয়ে নিজের কারবার করছেন না কেন? আপনিই তো সব!

সূর্য হেসে বলতো, আমিই কেন সব হতে যাবো? এজমালি ব্যবসা। আমি বড় ভাই, তাই ঝক্কিটা আমার বেশি। অনেক পরিবারে এই ঝক্কি মেজোভাই বা ছোটভাইকেও পোহাতে হয়। তাছাড়া সত্যি বলতে কি, আমার মোটা বুদ্ধিতে এই ব্যবসাটুকুই আমি বুঝি। বাবার মতো বুদ্ধিমান মানুষ কমই দেখেছি। বাবা ভালো মনে করেছিলেন বলেই ছোট ভায়েদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। মায়ের পেটের ভাইয়েরা কি আমাকে ঠকাবে? তাছাড়া ওদের বিষয়-বুদ্ধি আমার চেয়ে অনেক বেশি। কাজেরও ওরা অনেক। ছোট বোন দরিয়ার বিয়ের সময় বিয়ের নিমন্ত্রণের চিঠি ছাপা থেকে, প্যাণ্ডেল বাঁধা থেকে, রসুই ভিয়েন সব কিছু তো ওরাই সামলেছে। সূর্য তো শুধু করেছে, আসুন-বসুন। ওরাই তো সব কিছু করে, সবসময়ই। তারপরই উপরে আঙুল দেখিয়ে তাদের প্রত্যেককেই বলেছে, উপরওয়ালা আছেন। কারো কপাল তো কেউ নিতে পারে না মশাই। নিতেও পারে না, দিতেও পারে না। ওখানে যেটুকু পাওয়ার কথা লেখা আছে শুধু ওটুকুই আমার বরাদ্দ।

কিন্তু আজকে গগনবাবুর কথা শুনে মনটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেছিলো সূর্যর। সেই আগের সূর্য তো আর নেই। অস্তমিত হবার সময় ক্রমশ এগিয়ে আসছে। রক্তের তেমন তেজও আর নেই। নিজের কোনো ছেলেও নেই। একটি মাত্র মেয়ে, ছায়া, তাও বিয়ের বহুদিন পরে হয়েছে। তার বয়স এখন বারো। মাঝে মাঝে এখন মনে হয় যে তার, সাবিত্রীর এবং ছায়ার ভবিষ্যতের কথা একটু ভাবা হয়তো উচিত এখন।

এই সব ভাবতে ভাবতেই বাড়ি পৌঁছিলো সূর্য। গেট দিয়ে ঢুকেই সাইকেলের ঘন্টা বাজালো কিরিং কিরিং করে। চাঁদ-এর ছেলে জ্যোৎস্না আর তারার মেয়ে দ্যুতি দৌড়ে এল 'জেটু!' 'জেতু!' করতে করতে।

সাইকেলটা রেখে সূর্য তাদের দু-কাঁধে তুলে নিয়ে চকোলেট বার করে দিলো।

চাঁদের ছেলে জ্যোৎস্না বললো, জেটু! বাবার মারুতি গাড়ি আসবে সোমবারে।

বাঃ তাই না কী? কী রঙ-এর রে?

সাদা। মা পছন্দ করেছে।

বাঃ।

ছোটভাই তারার মেয়ে দ্যুতি বললো, আমাল বাবা মোটলথাইকেল কিনেতে দেতু। দেকবে? দ্যাকো, দ্যাকো! তলো আমাল থঙ্গে, তলো। বলেই সূর্যর শার্ট-এর কোণা ধরে টেনে নিয়ে গেলো ভাইঝি।

সূর্য দেখলো, বাবার আমলে যেখানে বাবার বেবি-অস্টিন গাড়িটা থাকতো সেই চালাঘরের নীচে ঝকঝকে জোড়া সাইলেন্সার লাগানো নীল-রঙা হণ্ডা মোটর-বাইক দাঁড়িয়ে আছে।

www.BanglaBook.org

জ্যোৎস্না বললো, কটকচণ্ডী দেবীর কাছে পুজো দিয়ে নিয়ে এসেছে কাকু। ঐ দ্যাখো না, জবাফুলের মালা!

আবাল হেলমেট আতে বাবাল!

দ্যুতি বললো।

তাই? বাঃ কী মজা! আমাদের একটা সাইকেল, একটা মোটর সাইকেল, আর একটা মারুতি গাড়ি হলো।

দ্যুতি বললো, তোমাল ভাঙা থাইকেলটা ফেলে দাও দেতু।

সূর্য হাসতে হাসতে বললো, দেবোরে দেবো। নিজেকেও ফেলো দেবো এবারে। সাইকেলটার মতো আমিও তো বুড়ো হয়েছি, ভেঙে গেছি।

সূর্যর মেয়ে ছায়া বসবার ঘরে বসে স্কুলের পড়া করছিলো। সে একবার ওদের দিকে মুখ তুলে চাইলো। মেয়েটার মুখটা বড় করুণ দেখালো সূর্যর চোখে।

সাবিত্রীর উপরেই রান্নাঘরের সব ভার। যদিও রাঁধুনী ও চাকর আছে। মা কোনোদিনই পছন্দ করতেন না যে ছেলেরা রাঁধুনী ও চাকরের রান্না খাক। ডাল-ভাত হয়তো তারা নামিয়ে দিতো কিন্তু ভালো পদ এবং ছুটির দিনে সৌখিন পদ মা নিজে রাঁধতেন। বড় বৌ হিসেবে সাবিত্রীকেও অনেক রান্না শিখিয়েছিলেন। সাবিত্রীও শিখে নিয়েছে। আর তো কোনো গুণ নেই বড়বৌ-এর!

ঝুমরী গিটার বাজায়, গাড়ি চালাতে জানে, ইংরেজি গান গায়। চুমকী রবিঠাকুর, হিন্দী ছবি ও বাংলা সাহিত্য গুলে খেয়েছে। কলকাতার অনেক লেখকের সঙ্গেই তার আলাপ আছে। কলকাতায় গেলেই সে তাঁদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে। শুনেও তাজ্জব হয়ে যায় সূর্য। কলকাতার বাঘা-বাঘা সাহিত্যিক এবং চিড়িয়াখানার গণ্ডার তার কাছে সমান বিস্ময়ের। এ পর্যন্ত দুয়ের একটিকেও দেখা হয়নি তার। দেখার সাহস এবং সুযোগও নেই। 'রবিঠাকুর'ও গুলে খেয়েছে ও। ওদের 'ক্লাসই' আলাদা।

সূর্য আর সাবিত্রীরা সম্পূর্ণ অন্য 'ক্লাসের'।

ঘরে এসে, শার্টটা হ্যাঙ্গারে টাঙিয়ে রেখে, ধুতিটা কুঁচিয়ে তুলে রাখতে যাবে, এমন সময় সাবিত্রী এসে ঘরে ঢুকলো। সূর্য বাড়ি ফেরার আগেই সাবিত্রী গা ধুয়ে নেয়, বাড়িতে-কাচা ইস্ত্রীবিহীন টাটকা শাড়ি পরে চুল বাঁধে। সিঁদুরের টিপ পরে, বড় করে। সূর্য ছাড়া, সাবিত্রীর যে অন্য কোন গুণ নেই, অবলম্বন নেই, প্রত্যাশা নেই, সেই কথাটাই তার মস্তবড় সিঁদুরের টিপ-এর মধ্যে দিয়ে প্রচণ্ড ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে প্রতিভাত হয়, নীরব বিদ্রোহের মতো।

এই নাও তোমার পান।

সূর্য বললো।

খাবো না।

কেন? কি হলো!

তুমি কি গো?

কিসের কি?

সেই সাতসকালে আধসেদ্ধ দুটি মুখে দিয়ে দোকানে দৌড়োও সাইকেল ঠেঙিয়ে আর এই আটটা সাড়ে আটটাতে ফিরে আসো, আর তোমার ছোটভায়েরা...

www.BanglaBook.org

সূর্য বললো, আরে ওরা তো ছোট। ছোট বলেই না...

কাজের বেলায় তুমি, আর...

আরে, কাউকে তো কাজ করতে হবে। বাবার দোকান নইলে যে উঠে যাবে।

উঠলে তোমার কি ক্ষতি? থেকেই বা তোমার কি লাভ? পাশের বাড়ির ময়নাদি বলেন, তোমার যে ঐ বন্ধুরা, ঐ হরেনবাবু আর জগদীশবাবু তাঁরাও তো বাবার বড় ছেলে। ব্যবসাতে তো ছোট ভাইদের একটি চেয়ারও দেননি বসতে। তেমন করলেই বোধহয় ভালো করতে তুমিও।

সূর্য একটু বিরক্তি মাখা গলায় বললো, আমার ভালো নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না। হরেন আর জগদীশ আমার বাল্যবন্ধু হতে পারে, কিন্তু ওরা ওদের ছোট ভাইদের প্রতি যে ব্যবহার করেছে তার জন্যে ঈশ্বরের কাছে তাদের শাস্তি অবশ্যই পেতে হবে। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

ঈশ্বরের সঙ্গে কি তোমার কথা হয় নাকি?

শুধু আমার সঙ্গেই কেন, যাদেরই বিশ্বাস গভীর, তাদের সকলের সঙ্গেই হয়। ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া জীবনের কোনো প্রাপ্তিই প্রাপ্তি থাকে না সাবিত্রী। এটা ঘোর কলি। ধূর্ত-ধাউড়ে-কুচক্রীতে পৃথিবী ছেয়ে গেছে। কিন্তু তারা কতদূর যায়, তুমি এই জীবনেই দেখে নিও। ঈশ্বর-বিশ্বাসের চেয়ে বড় সম্পত্তি আর কিছুই হতে পারে না।

তুমি যে কী, তা তুমিই জানো! কটকচণ্ডীর মন্দিরে প্রতি সপ্তাহে আমি যাই না?

নিশ্চয়ই যাও। কিন্তু তোমার দৌড় মন্দির অবধিই। কটকচণ্ডীর কাছে পৌঁছনো তোমার হবে কি না জানা নেই। কথাটা বললাম বলে রাগ কোরো না। চানে যাবো এবারে।

লুঙ্গি, ফতুয়া, গামছা দিয়েছো তো?

দেওয়া আছে।

চান সেরে এসে বারান্দার ইজিচেয়ারে বসলো সূর্য। রোজই বসে। খুব খিদে পেলেও অফিস থেকে ফিরে চান করে একটু কিছু খেয়ে নেয় ও। তারপর ভায়েদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খাবে বলে অপেক্ষা করে।

কিন্তু আজকাল বেশিরভাগ দিনই ছোটভাই তারা আর চুমকি, হয় নিজেদের ঘরে খায়, নয় বাইরে কোথাও-না-কোথাও তাদের নেমন্তন্ন থাকে। ওরা আজকাল ঘরে বসে, খাওয়ার আগে একটু ড্রিঙ্ক করে। চুমকিও খায়। দ্যুতি একদিন বলে দিয়েছিলো সূর্যকে। শিশুরা সব ঈশ্বর-ঈশ্বরী। কোনো কোনো দিন হাওয়াটা এইদিকে মোচড় দিলে বারান্দায় বসে গন্ধও পাওয়া যায়।

ওরা খায় খাক। ওরা মডার্ন, উচ্চশিক্ষিত, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়া! চুয়ান্ন বছরের বুড়ো, অশিক্ষিত সূর্য কি বলবে ওদের? যা ভালো মনে করে ওরা করবে।

চাঁদ আর ঝুমরীও আজকাল হয় আগে-আগেই খেয়ে নেয়, নয়তো সূর্যর খাওয়া হয়ে গেলে তারপর খায়। যতক্ষণ না সকলে খাচ্ছে, ততক্ষণ সাবিত্রীর ডিউটি শেষ হয় না। কোনো কোনো দিন সব কাজ সেরে ঘরে আসতে রাত এগারোটা বেজে যায় তার।

সূর্য তাই কিছুদিন হল ভাবছে যে ওদের সঙ্গে খাবে বলে খিদে পেটে বসে না-থেকে, ও-ও দোকান থেকে ফিরেই চান করে খেয়ে নেবে। দুপুরের খাবার তো থাকেই। রাতের রান্না না হলেও তাতেই চলে যাবে।

www.BanglaBook.org

কিন্তু ভাবছেই। পারে না। ওরা আসুক খাওয়ার ঘরে আর নাই বসুক, এ বাড়ির একতলার এই রান্নাঘরের লাগোয়া এই খাওয়ার ঘরের বড় বড় পিঁড়িতে, ব্রহ্মা সেনের আমলে যেমন ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় রাত সাড়ে নটার সময় বাড়ির সব পুরুষেরা, বাবা ব্রহ্মা সেন, সূর্য, চাঁদ, তারা, গোমস্তা গিরিমশায়, বড় বড় কাঁটালকাঠের পিঁড়িতে একসঙ্গে খেতে বসতেন, আজও সূর্য তেমনি কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে নটার সময়েই এসে বসে। ফাঁকা খাওয়ার ঘরে। বাচ্চারা নটার সময়েই খেয়ে নেয়। সূর্য সেন একা বসে খায়। সাবিত্রী, সাবিত্রীরই মতো সামনে বসে থাকে। বামুনদি খাবার এনে দেয়। সাদা বিড়ালটা খাওয়ার ঘরের দরজায় বাঘের মতো বুক ফুলিয়ে বসে পাহারা দেয়। ব্রহ্মা সেনের আমলেও এর পূর্বপুরুষেরা, কালো-ধলো-কী বাদামী এমনি করেই বসে থাকতো। পুরোনো কথা মনে পড়ে যায় সূর্যর খেতে খেতে। বাবার আমলে খাবার সময়ে খাওয়ার ঘর, রান্নাঘর গমগম করতো। বাবা, তিন ছেলে, গিরিবাবু খেতেন আর মা, সাবিত্রী, ঠাকুর, চাকরেরা তত্ত্বাবধান করতো! এখন বাইরের উঠোনে পেঁপে গাছে তক্ষক ডাকে। বলে ঠিক। ঠিক ঠিক। নিঃশব্দ খাওয়ার ঘরে তক্ষকের ডাকটা ঠিকরে আসে। সূর্য যখন খায়, তখন কোনো দিন চাঁদের ঘর থেকে ক্যাসেট প্লেয়ারে ইংরেজি গান ভেসে আসে। কোনো কোনোদিন ভি সি আর-এ ছবি দেখে ওরা। কোনো কোনো দিন দরজা জানলা বন্ধ করে জ্যোৎস্নাকে সাবিত্রীর জিম্মায় পাঠিয়ে দিয়ে দেখে। কী ছবি, কে জানে!

চুমকি আর তারার ঘর থেকে বিখ্যাত কবিদের স্বরচিত কবিতার আবৃত্তি ভেসে আসে। ক্যাসেটের মাধ্যমে। কোনো কোনো দিন বাণী ঠাকুর বা মায়া সেন-এর রবীন্দ্র-সঙ্গীত।

সাবিত্রী বললো, কিছু-একটা করা উচিত তোমার। পেছোতে পেছোতে, ভার বইতে বইতে তুমি তো একেবারে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছো। তোমাদের দোকানের লাভের অংশ তো সকলেরই সমান। কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হয়, তুমি অন্যদের চাকর। এটা আমার কথা নয় পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন সকলেই এই কথা বলে।

সব পরিবারেই কাউকে চাকর হতে হয় সাবিত্রী, প্রত্যেক যৌথ-পরিবারেই। নইলে কারবার থাকে না। নিজেকে চাকর ভাবলেই চাকর, আর মালিক ভাবলেই মালিক! এতো ভাবাভাবিরই ব্যাপার।

আচ্ছা, আমি না হয় বাঁদী, তোমার জায়েদের ঝি! কিন্তু তুমিও কি কেউ নও? তোমার কি মানুষের মতো বাঁচতে ইচ্ছে করে না একদিনের জন্যেও? ধুতি-জামা, তাও দুদিন পরা চাই। বাহন, সেই মান্ধাতার আমলের ভাঙা সাইকেল। পায়ে তালি মারা কাবলি-জুতো। বয়স যার দশ।

সূর্য হেসে বললো, বাবা কি বলতেন জানো? বলতেন "আ রূপী সেভড ইজ আ রুপী আর্নড।" বুঝেছো। যতক্ষণ জুতো পা থেকে খুলে না পড়ে যায় ততক্ষণ বদলাতে যাবো কোন দুঃখে? তাছাড়া 'আমার আমার' করো কেন? সব তো আমাদেরই। মোটরসাইকেল, গাড়ি সবই তো আছে আমাদের বাড়িতে। এটা ব্রহ্মা সেনের বাড়ি। তার ব্যবসা, তার জমি-জমা থেকেই সব কিছু হয়েছে এটা ভুলে যেও না।

ঠিক আছে। আমাদেরই যদি সব, তবে সে গাড়িতে একদিনও কি আমি-তুমি চড়েছি? আমার দরকারও নেই। তোমার মতো নই আমি। আমার আত্মসম্মান আছে।

আমার কথা ছাড়ো, তোমার মেয়ের কি হবে? এরা যেরকম স্বার্থপর দেখছি, মেয়েটার

www.BanglaBook.org

যে বিয়ে পর্যন্ত দিতে পারবো না। তুমি যদি হঠাৎ চলে যাও। আমার যে কী হবে!

সূর্য হাসলো। বললো, হঠাৎ? শুধু আমি কেন? সকলকেই তো হঠাৎই চলে যেতে হবে। বলে কয়ে আর কজন যেতে পারে বলো? তবে তোমার মেয়ের কথা? এই শুনে নাও সাবিত্রী। তোমার মেয়েকে বাড়ি বয়ে এসে খুবই ভালো পরিবারের ছেলে উপযাচক হয়ে নিয়ে যাবে। দেনা-পাওনার কথা তুলবে পর্যন্ত না। কোনো চিন্তা করো না। তোমার কিসের অভাব? তোমার কী নেই যে, আমার ছোট ভায়েদের তুমি ঈর্ষা করো?

ঈর্ষা করি? ছিঃ আমার কি আছে? আমার জায়েদের তো পা থেকে মাথা পর্যন্ত গয়নায় মোড়া। এত গয়না তারা পেলো কোথায়? পায় কোথায়। আর আমি, তোমার স্ত্রী!

গয়না? গয়না একটা ঈর্ষা করার জিনিস হলো সাবিত্রী? গয়না নিয়ে গর্ব করে শুধু নির্গুণ আর অশিক্ষিতরা! ছিঃ!

বেশি শিক্ষা দেখিও না। নিজে তো ইন্টারমিডিয়েটও পাশ না করে কলেজ ছেড়েছিলে। আমি স্কুল-ফাইন্যাল! আমার চেয়ে তুমি বেশি কি?

সাবিত্রী খুবই রেগে গিয়ে বললো।

অবশ্য নিচু গলায়।

কিছুক্ষণ আকাশের দিকে চেয়ে থেকে সূর্য বললো, শিক্ষার অনেকই রকম হয়। একধরনের শিক্ষা মানুষ প্রতিষ্ঠান থেকে, মানে ভালো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পায় আর অন্য এক ধরনের শিক্ষা নিজের ভিতরে ভিতরে গড়ে নেয়। পাঁচটা পাস দিয়েও মানুষ অশিক্ষিত থাকতে পারে, আবার একটাও পাস না দিয়েও উচ্চশিক্ষিত হতে পারে। শিক্ষা আর ডিগ্রীর পাকানো কাগজ এক কথা নয়। বিশেষ করে, এই দেশে।

তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না।

তোমার মন আজ ভালো নেই, কোনো কারণে। এসো সাবু, আমার পাশে এসে বসো। মোড়াটা নিয়ে। কী সুন্দর দেখাচ্ছে দ্যাখো আকাশটা। মনে হচ্ছে, পুজো বুঝি এসেই গেছে। কী নীল আকাশ! চাঁদ ছমছম করছে পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘে মেঘে।

ও ভালো কথা। পুজোর লিস্টিটা বানিয়ে ফেলো। আর তো দেড়মাসও বাকি নেই। চাকর-বাকর, দোকানের কর্মচারীরা, আত্মীয়স্বজন, কেউই যেন বাদ না যায়। এ বছর তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা বেশি দেবো।

BanglaBook.org

সাবিত্রী বললো, তোমাকে বলবো বলবো করে বলা হয়নি, ঝুমরী আর চুমকি বলেছে যে, ওদের পুজোর টাকা আলাদা করে দিতে। মানে স্বামীদের অংশ। ওদের বাপের বাড়ির লোকজন, বন্ধুবান্ধব, চাকরবাকর সব ওরা নিজেরাই নিজেদের হিসেব মতো দেবে। বলেছে, তাছাড়া রুচিরও একটা ব্যাপার আছে। আমি যা কিনি, তা প্রায় কারোরই পছন্দ হয় না।

সূর্য চেয়ারে উঠে বসলো বললো, তাই! তা হবে। মানে, হতেই পারে। রুচি ব্যাপারটা তো নিশ্চয়ই নিজস্ব। আমাদেরই উচিত ছিলো এই ব্যাপারটার কথা ভাবা অনেক আগে। তাছাড়া ওরাও তো বড় হয়েছে। সত্যিই তো! এবারে তাই দিও। ওদের টাকাটা আলাদা করেই ধরে দিও। ভালোই হলো, তোমার ঝক্কি কমে গেলো।

তোমার বোন দরিয়াও রাগ করে চিঠি লিখেছে যে, দাদা কাজে এতোই কি ব্যস্ত থাকে যে, মাঝে মাঝে চিঠি লিখে খোঁজ নিতেও পারে না। টাকাই সব নয় সংসারে। পয়লা

www.BanglaBook.org

বৈশাখে, আর পুজোয় আর ভাইফোঁটায় টাকা পাঠালেই ভালোবাসা দেখানো হয় না! টাকা পাঠাতে তোমাকে মানা করেছে দরিয়া।

সূর্যর গলা এবার গম্ভীর শোনালো। বললো, তাই বলেছে? দরিয়া? চিঠি লেখার অভ্যেসই যে নেই আমার। কাউকেই তো লিখি না। যাক। টাকা ওকে আর কারা পাঠায়? টাকা বুঝি কষ্ট করে রোজগার করতে হয় না। কাউকে কিছু দেয়া মানেই নিজেকে কিছু থেকে বঞ্চিত করা। নিজেকে; নিজের পরিবারকে।

তারপর স্বগতোক্তিরই মতো বললো সূর্য, সংসারে অনেকেরই অনেক থাকে হয়তো কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেরই অন্যকে স্বার্থহীন ভাবে দেওয়ার মন থাকে না। এ তো জানাই ছিলো। আজকে জানলাম, এ সংসারে নেওয়ার মন নিয়েও কম লোকই আসে। হৃদয়ের অতটুকু ঔদার্যও যে কেন বিধাতা তাঁদের দ্যান না। ভারী মজার জায়গা কিন্তু এই পৃথিবী।

সাবিত্রী বললো, তোমার ভায়েরা বলেছে যে, দোকানের কর্মচারীদের আলাদা করে কিছু দেওয়ার রেওয়াজটাও আদিখ্যাতা। ওরা তো বোনাস পায়ই।

হুঃ। সে আর কটা টাকা! এই বাজারে! কিন্তু ওরা বলেছে এ কথা? কবে?

পরশু।

ঠিক আছে। ওদের টাকা আলাদা করে দিয়ে দেবো। আমি আমার একার অংশ থেকেই দোকানের কর্মচারীদের দেবো পুজোতে। এতদিন দিয়ে এসেছি, আর...

বাবার আমলেও নাকি এইসব কোনোদিনও দেওয়া হয়নি? তুমিই বা কেন...

সূর্য অবাক হলো। বললো, এ কথাও বলেছে ওরা তোমাকে? এ কথাটা ভুল বলেনি। বাবার আমলে দেওয়া হয়নি যে তা ঠিকই। কিন্তু এটা যে আমারই আমল সাবিত্রী!

আর হাসিও না। তোমার আমল! যেন কোনো সাম্রাজ্যের মহারাজ তুমি! তুমি তো বান্দা! তুমি অন্ধ। তুমি কী...তুমি কী মানুষ? না ভগবান? না, তুমি ভূত?

সূর্য হো হো করে হেসে উঠল জোরে।

তারপর পাশে-বসা অবাক-হওয়া স্ত্রীর হাতের উপর নিজের হাতটি রেখে বললো, সাবিত্রী, আমি দাদা! আমি দাদা যে!

www.BanglaBook.org

ব্রন্টি

দিনের কাজ প্রায় শেষ, এবার উঠব অফিস থেকে। ঘড়িতেও সাড়ে পাঁচটা বাজে। গজেন আর ঘোষ ছাড়া আর কেউই নেই এখন। আমি উঠলেই জমাদার ঘর পরিষ্কার করবে। দারোয়ান আজকের মতো তালা-টালা লাগিয়ে দিয়ে যাবে বাইরে।

এমন সময় ইন্টারকম-এ ঘোষ বলল, একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, স্যার! বলছেন, আপনার বন্ধু। নাম বরুণ চ্যাটার্জী। অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই।

বরুণ চ্যাটার্জী? আমার বন্ধু?

মনে পড়ছে না ঐ নামের কোনো বন্ধুকেই। রাত সাড়ে পাঁচটাতে বলা নেই কওয়া নেই অফিসে এসে হাজির হলো কে? কি দরকার? আমি চিনিই না। বলে দাও, এমন অসময়ে দেখা হবে না। আমি এক্ষুণি বেরিয়ে যাব। তুমি কি জানোনা যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া আমি কারো সঙ্গেই দেখা করিনা? বলে দাও ওঁকে।

পরমুহূর্তেই আবার ইন্টারকম চ্যাঁ চ্যাঁ করে উঠল।

উনি যেতে চাইছেন না স্যার। বলছেন, কোনো কাজে আসেননি, এমনিই এসেছেন। আপনার সঙ্গে কলেজে পড়তেন নাকি। ওঁর ডাকনাম ব্রন্টি!

ব্রন্টি? ও হো ব্রন্টি! তাই বলো। কিন্তু তবুও

আচ্ছা, দু-মিনিট লাগবে আমার। আমি ডিকটেটেড ম্যাটারগুলো দেখে, সই করে দিয়েই ডাকছি। একটু বসতে বলো।

এমিলি ব্রন্টির উইদারিং হাইটস পড়া আর ব্রন্টির সঙ্গে পরিচয় আমার প্রায় একই সময়। তাই-ই ওর নামটি এ জীবনে ভোলার নয়। টাইপ-করা চিঠিগুলোতে চোখ বোলাতে বোলাতে ভাবছিলাম। ব্রন্টি! ব্রন্টির ভাল নাম যে বরুণ চ্যাটার্জী, তা ভুলেই গেছিলাম। মনে

www.BanglaBook.org

থাকার কথাও ছিলো না। আমরা সকলেই ওকে ব্রন্টি বলেই ডাকতাম।

বন্ধু বলতে ঠিক যা বোঝায়, ও তা ছিলো না। শুধু আমারই নয়। ও কারোরই বন্ধু ছিলো না। কারো বন্ধু হওয়ার যোগ্যতা বা মানসিক সমতা ওর ছিলো না। ক্ষমতাও বোধহয় ছিলো না। কলেজে প্রথম দু-বছর শুধু একসঙ্গে কতগুলো কমন ক্লাস করেছি। ব্রন্টি চিরদিনই ভুলো-ভালা। ট্রাউজারের মধ্যে এমনভাবে শার্টটাকে গুঁজত যে, পিছন দিকে অথবা সামনে দিকেও অনেকখানি শার্ট বেরিয়ে থাকত। যতদূর মনে আছে, খুব বড় পরিবারের অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে ছিল ও। ওদের প্রাসাদের মতো পৈতৃক বাড়িতেও গেছিলাম একদিন। চমৎকার অ্যাকসেন্টে ডান হাতের তর্জনী নাড়িয়ে কথা বলত। বেশিই ইংরেজিতে। কিন্তু ওর বেশির ভাগ কথারই কোনো মানে ছিলো না। মনে হত, ও কাল্পনিক কোনো সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলছে।

আমার আর এক সহপাঠী, রুদ্র, গত সপ্তাহে একদিন ফোন করেছিল বম্বে থেকে। নানা কথার পর বলছিল, ব্রন্টির নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। অবশ্য জানি না, কবেই বা ওর মাথার ঠিক ছিল।

—তোর সঙ্গে দেখা হয়েছে কি রিসেন্টলি?

—না ত! কলেজ ছাড়ার পর আর দেখাই হয়নি। কি করে রে ব্রন্টি এখন? রুদ্রকে শুধিয়েছিলাম।

—করার মতো কিছুই ত' করত না। বি-এ পরীক্ষাটাও ত দিলো না শেষ পর্যন্ত! কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হয়ে গেছিল হঠাৎ। মনে নেই তোর?

টাইপ-করা চিঠিগুলো সব সই করে গজেনকে ডেকে বললাম, কাল সব যাবে ডাকে। আর যিনি ঘোষবাবুর কাছে বসে আছেন, তাঁকে এবারে ডাকো। ঘোষবাবুকেও চলে যেতে বলো। তুইও ব্রিফকেসটা ড্রাইভারকে নামিয়ে দিয়ে বাড়ি চলে যা। আমি একটু পরই উঠব। দারোয়ানকে বলে যাস।

চেয়ার থেকে উঠে দরজা খুলে দেওয়ার আগেই ব্রন্টি ঢুকল। চেহারাটা অবিকল সেইরকমই আছে, তবে রোদে জলে ময়লাটে, তেলচিটে, এইই যা। চুলে ও জুলপিতে পাক ধরেছে যদিও, কিন্তু বয়সের ছাপ পড়েনি এখনও তেমন। নোংরা শার্ট আর ট্রাউজার। শার্টটা ঠিক সেইরকমভাবে গোঁজা। সামনে পেছনে খাবলা খাবলা বেরিয়ে আছে।

ব্রন্টি বললো, হাল্লো নাচু, হাউ নাইস টু হ্যাভ মেট উ আফটার এইজেস।

বললাম, বোসো বোসো।

ও বসে বললো, থ্যাঙ্কস। হাউ ইজ লাইফ?

—চলে যাচ্ছে। নাথিং টু গ্রাম্বল অ্যাবাউট।

—খুব সুখী তাহলে। ইসস সুখী হওয়া কী কঠিন! আমি যদি হতে পারতাম!

—তুমি কি করছ এখন ব্রন্টি?

—আমি? সেইমথিং—। সেইম ওল্ড থিং।

—কোথায় আছ তুমি? আই মিন, কোন্ কোম্পানীতে? না-কি ব্যবসা-ট্যাবসা? বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী?

ব্রন্টি সেই ছেলেবেলারই মতো আমার দু-চোখে ওর দু-চোখ রেখে নির্ভেজাল গলায় বললো, আছি মানে, আছি ঠাকুর্দারই বাড়ির দোতলার বারাণ্ডারই এক কোণে। এখন সবই ভাগাভাগি হয়ে গেছে। থাকার ঘর, ভালোবাসা, মন, হৃদয়ের তাপ; সব। ছোটকাকার

www.BanglaBook.org

সখের কুকুরের নাতির নাতি আর আমার থাকার জায়গা হয়েছে একই কোণে। ফারস্ট ক্লাস আছি নাটু। কুকুরের ক্যারেকটার স্টাডি করছি, একেবারে খুবই কাছ থেকে। কুকুরটা একেবারে ডোসাইল মানুষদেরই মতো। একটা থীসিস তৈরি করব ঠিক করেছি। আ কমপারেটিভ স্টাডি।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকেই ও বললো, এক গ্লাস জল হতে পারে?

বিব্রত হয়ে বললাম, ইসস, সকলেই চলে গেল যে! আচ্ছা, আমিই দিচ্ছি। একটু দাঁড়াও—

ঘরের কোণের ছোট্ট ফ্রিজ খুলে ওকে জল ঢেলে দিলাম।

ফ্রিজটা যখন খুললাম, তখন ব্রন্টি বললো, কিছু খাবার হতে পারে? যা হোক কিছু? আমি জেনারেলি লাঞ্চটা ফিরপোতেই করি। আজ করা হয়নি। সময়ই হয়নি।

ফিরপো? অবাক হলাম, আমি। মনটাও খারাপ হয়ে গেল ফিরপোর কথাতে। এখন একটা বাজার বসেছে সেখানে। কলকাতা যদিও ফিরপো ছাড়া কানা হয়ে গেছে কিন্তু কবে বন্ধ হয়েছে ফিরপো? বছর কয়েক হতে চলল। ব্রন্টির মাথা সত্যিই খারাপ!

লজ্জিত গলায় বললাম, খাবার? না, খাবার ত রাখি না ফ্রিজে। শুধু চীজ আছে একটু, খাবে?

—চীজ খাই না। আরে! মাখন আছে দেখছি এক প্যাকেট। হতে পারে?

—তাই? আছে বুঝি? আমার পার্টনার রেখেছেন তাহলে। ক্রিম-ক্র্যাকার বিস্কিটে মাখিয়ে খান। এগিয়ে দিতে দিতে, অ্যাপোলজিটিক্যালি বললাম আমি।

—খাব, খাব। রোজই মাখন খাওয়া উচিত আমার। জানো, নাটু, শরীরে খুবই লাবণ্যর অভাব ঘটেছে। লাবণ্য ত' বিয়েও করল না আমাকে। সে সব ছোটবেলার কথা। তোমাকে কি কখনও বলেছিলাম লাবণ্যের কথা? জানি না। লাবণ্যের কোনো সাবস্টিটিউট হয় না; হলো না। দাও, মাখন দাও। লাবণ্য। হাঃ হাঃ। আমাদের ছিল কাফ-লাভ। আজকাল ত' ডগ আর বিচদের যুগ। কি বল? হিঃ হিঃ। ডোন্ট থিংক সো?

একমুহূর্ত চুপ করে থেকেই বলল, একটু প্রেম, ভালোবাসা, হতে পারে?

এ কথার উত্তর হয় না। চুপ করেই রইলাম।

ব্রন্টি মাখনের প্যাকেটটা খুলে, চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেই, বলতে গেলে প্রায় চুষেই পুরো প্যাকেটটা একেবারে সড়াৎ করে খেয়ে ফেললো, আমি ডিশ চামচ বের করার আগেই। তারপর যেটুকু মাখন হাতে লেগেছিল, সেটুকুও দুগালে মেখে নিয়ে বলল, ন্যাপকিন দেবে নাকি একটা?

কাগজের ন্যাপকিন দেওয়ার আগেই ও জামাতে ও ট্রাউজারে হাত মুখ সব মুছে ফেললো। চোখ কুঁচকে বললো, শার্ট আর ট্রাউজারটাও একটু লাবণ্যময় হোক। কি বল? হোক। লাবণ্য-নির্মূল জীবন অন্তত আমূল-লাবণ্যে ভরে থাকুক। আ-মূল। মাই ফুট। ওয়াট আ সাবস্টিটিউট। দ্যাট লাবণ্য; অ্যান্ড দিস।

মনে পড়ে গেল, কলেজে থাকাকালীন ব্রন্টি আধুনিক কবিতা লিখত। ও একবার লিখেছিল ; 'প্রিয়তমা, দেখা হবে আমাদের নিশ্চয়ই গতকাল।'

গ্রেট পোয়েট! আমাদের ব্রন্টি! প্রমিস ছিল ; কারণ ওর মধ্যে দুর্বোধ্যতার গ্রেটনেস ছিল।

মনে পড়ে গেল, একদিন লাইটহাউস সিনেমার উল্টোদিকে বইয়ের দোকান থেকে 'দ্যা ফ্লাইট অফ দ্যা পাইডহর্নবিলস' বলে একটা পেপারব্যাক বই হঠাৎ কিনে তাতে ও নিজে

www.BanglaBook.org

হতে লিখে দিয়েছিল : 'টু ডিয়ার নাটু। আই ক্যুড ডু নো বেটার এন্ড দিস আই বিলিভ।'

ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, pied hornbills সম্বন্ধে তোমার বুঝি খুব ইন্টারেস্ট?

ও বলেছিল, দুসস। কে জানে? কোনো পাখিটাখি হবে হয়ত। শিংওয়ালা কোনো জানোয়ারও হতে পারে। হু কেয়ারস?

—সে কি? তাহলে, হঠাৎ আমাকে এই বইটি কিনে প্রেজেন্ট করলে?

—জানো না? আজ বোদলেয়ারের জন্মদিন যে! প্রত্যেক কবিকেই আজ উদার হতে হয়। দিস ইজ মাই ওয়ে অফ রিমেম্বারিং দ্যা পোয়েট।

আড়াইশ গ্রাম মাখন খেয়ে লাবণ্যময় হয়ে উঠে ব্রন্টি বললো, তোমার ছেলেমেয়ে কি?

—মেয়ে বড়। ছোট ছেলে।

—মেয়ে কত বড়? বিয়ে দিয়েছ?

—বয়স হয়নি মেয়ের। মাত্র এগারো বছর। তাছাড়া, বিয়ে ত' আস্তে আস্তে উঠেই যাচ্ছে। এখন ত লিভ-টুগেদারের দিন।

—জানি। তবু, আমি পুরনো দিনের লোক। আমি বিয়েতে আজও বিশ্বাস করি। আমি কিন্তু বিয়েই করব। এবং করলে, তোমায় নেমন্তন্ন করব। তোমার মেয়েকেও।

—কবে হবে? তোমার বিয়ে?

—হাঃ? দাটস আ মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন। লাবণ্য নেই। নো হোয়্যার ইন দ্যা ওয়ার্লড। আই হোপ, য়্যু নো, হোয়াট আই মীন। লাবণ্য ইজ আ মাচ ওয়াইডার, ডীপার, ওয়ার্ড। লাবণ্য, বুঝলে নাটু ; শী ইজ আ সীম্বল। শী ইজনট জাস্ট মাই গার্ল। অর, ফর দ্যাট ম্যাটার ; এনিবডিজ এলসএস গার্ল ইদার। শী ইজ আ সুপারলেটিভ এলিমেন্ট। আ কনসেপ্ট, হু মুভস আওয়ারসেলভস ফ্রম উইদিন। মুভস হেভেন অ্যান্ড আর্থ।

একটু চুপ করে থেকে আরেক ঢোক জল খেয়ে বললো, বাই দ্যা ওয়ে, নাটু, আমার এক বোন বলছিল তুমি নাকি আজকাল গল্প লেখো বাংলায়? ফিকশান? বই লেখো? তুমি? নাটু সেন? অফ ওল পার্সনস?

হেসে বললাম, বাংলা সাহিত্য কোন পর্যায়ে নেমে এসেছে তাহলে বুঝতেই পারছ। নইলে, নাটু সেনও গল্প লেখে?

—হাঃ। আই লাইক দ্যাট। তোমার সেন্স অফ হিউমার এখনও ঠিক সেইরকমই আছে। ভেরী ফিউ উইল পুল দ্যাট আ ফাস্টওয়ান অন হিমসেলফ। গ্রেট! বাই দ্যা ওয়ে! হোয়াটস ইওর নেক্সট প্রজেক্ট? অ্যান অটোবায়োগ্রাফী অফ অ্যান ইডিয়ট? অর ফর আ চেঞ্জ, দ্যাট অফ আ মেগালোম্যানিয়াক?

এরও উত্তর হয় না। প্রজেক্ট দুটিই ভেবে দেখার মতো। তাই চুপ করেই রইলাম।

—গাড়ি কিনেছো?

—ফার্মই দিয়েছে। বহুদিন।

—ফ্ল্যাট কিনেছো?

—না। বাড়িই তৈরি করছি, সল্ট লেকে।

—নিজের বাড়ি? বাঃ।

—ফরেনে গেছো?

—গেছি বারকয়েক।

—কোথায়?

—ব্যাংকক।

www.BanglaBook.org

—বাঃ! তবে ত গেছই।

—ক্লাবের মেম্বার হয়েছো?

—হ্যাঁ। অনেকদিন।

—কোন ক্লাব?

—ক্যালকাটা ক্লাব।

—তোমার বিয়ের তারিখে ইংরেজি কাগজের পার্সোনাল কলামে তোমার শালীর শুভেচ্ছা ছাপা হয়?

—হ্যাঁ। হয় বৈকি। শালী ছাড়া আরও অনেকেরই হয়।

এবার মনে মনে আমি বিরক্ত হয়ে উঠছিলাম।

—বাঃ। তবে ত তুমি একজন সম্পূর্ণ মানুষ। টোটাল। সাকসেস ত একেই বলে। কনগ্রাচুলেশনস। জীবনে তোমার আর কী-ইবা চাইবার থাকতে পারে? বাঙালির বাচ্চাদের পক্ষে ঢের করেছো। যুগ যুগ জীও। তোমাকে দেখে ছোটকাকার পেডিগ্রী গ্রেট-ডেন কুকুরের নাতির নাতি পর্যন্ত লজ্জা পাবে। সাব্বাশ।

কথা ঘুরিয়ে বললাম, তুমি কি করো ব্রণ্টি, এখনও খুলে বললে না ত?

—সেইমথিং! বললাম ত। ওঃ খুলে বলিনি বুঝি এখনও। আউচ। দ্যাট বাটার অফ ইয়োরস, রিয়্যাল গুড।

ব্রণ্টি আরেকটা ঢেকুর তুললো।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, একটা জেলুসেল হতে পারে?

না। নেই। সরি।

ডোন্ট বদার। তোমরা যাকে 'করা' বল তেমন কিছুই করি না আমি। আই অ্যাম সিম্পলি স্যাম্পলিং লাইফ। গত পঁচিশ বছর ধরে এইই করছি। গ্রেট ফান। নিজের জীবন কুরে কুরে খেয়ে দেখছি ভুট্টার দানার মতো। স্বাদ চাখছি। দেখছি, নোন্তা না মিষ্টি। একসপীরিমেন্ট করে দেখছি, জীবন সলিড, না লিকুইড, না গ্যাসী? আই রিয়ালী ডু স্যাম্পল মাই ও-ওন লাইফ। ঠিক কি ভাবে বলব জানি না ; ধরো যদি বলি, অ্যাজ আ টি-টেস্টার স্যাম্পলস টি। সামথিং ভেরী মাচ অ্যাকিন টু দ্যাট। বুঝলে নাটু। আই এনজয় মাইসেলফ, থারোলী, এভরী মিনিট অফ মাই লাইফ। একটা শামুকের মতো, দার্জিলিং-এর রেলগাড়ির মতো। আর তোমরা?

তোমরা সবাই জেট প্লেনে টাকা, নাম, যশ, সিকিওরিটি এসবেরই পেছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছ। তাই না? তোমাদের করুণা করি আমি। তোমরা সকলেই, তুমি, রুদ্র, শ্যামল, আ প্যাক অফ স্টুপিড উলফস।

—আর তুমি? নিজে? তুমি নিজে কি করছ, করলে জীবনে?

—নাটু। আমি রেললাইনের পাশের টেলিগ্রাফের তারে বসে থাকা ছোট্ট ননডেসক্রিপ্ট ফিঙে। করার মতো কিছুই করি না আমি। তোমাদের দেখে মজা পাই। তোমরা কেউই জানো না, জানবার সময়ই পেলে না যে, লাইফ ইজ ফর লিভিং। তোমাদের জীবন, জীবনই নয় হে, সে একটা অভ্যেস। ইয়েস। ইয়োরস ইজ ওনলী অ্যান অ্যাপলজী ফর আ লাইফ। হোয়াট্ আ শেম্।

বলেই ব্রণ্টি বললো, কুড়িটা টাকা হতে পারে? খুবই ক্ষিদে পেয়েছে। লাবণ্য তার অস্তিত্বে এবং অনস্তিত্বে মাঝে মাঝেই আমার মধ্যে বড় ক্ষিদের উদ্রেক করে। কী দারুণ বাংলা বললাম, দেখলে। তোমার সঙ্গগুণেই কি? গ্রেট!

www.BanglaBook.org

কুড়ির জায়গায় ওকে একশটা টাকা দিলাম। বললাম, তোমাকে বেশিই দিলাম, যাতে তোমার বার বার না আসতে হয়। সত্যিই আমি খুবই ব্যস্ত থাকি। উইদাউট অ্যাপয়েন্টমেন্টে কারো সঙ্গেই দেখা করতে পারি না। কিছু মনে করো না ব্রন্টি।

ফেয়ার এনাফ!

বললো, ব্রন্টি। ফেয়ার এনাফ। তুমি কি বলতে চাইছ বুঝেছি। আর হয়ত আসব না। কিংবা কি জানি, আসতেও পারি। তোমার মাখন বড় ভাল। লোকে মাখন দেয়, আমি নেব।

তারপরই বললো, পঁচিশ বছর পর কলেজের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো। আরও জাস্ট দেড়শটা টাকা কি হতে পারে? পার ইয়ারে তাহলে দশ টাকা করে হবে। হিসেবে গোলমাল কোরো না। আমার অ্যাডিশানাল ম্যাথস ছিল। অঙ্কে ভুল হয় না।

—আজই ব্যাঙ্ক থেকে হাজার টাকা তুলেছিলাম। তাই-ই দিতে পারছি তোমাকে।

ব্রন্টি হাসল। বলল, বড়লোকেরা এমন বলেই থাকে। দু-নম্বর কি একনম্বর টাকা তাতে ভিখিরির কি এসে যায়? দু-নম্বর টাকা হাত বদলালেই তিন নম্বর হয়ে যায়, তাও জানো না। নাও, দাও, দাও, আরও দেড়শটা টাকা দাও, ফর ওল্ড টাইমস সেক। হতে পারে?

টাকা তুলেছিলাম প্রয়োজন ছিল বলেই। তবু নাও।

টাকাটা যেই দিলাম, অমনি তা পকেটে পুরে হঠাৎই উঠে পড়লো ব্রন্টি। ডান হাতের তর্জনী নেড়ে বললো, নেভার এক্সপ্লেইন ইওর কনডাক্ট। ন্যো। নট ইভিন টু ইওরসেলফ!

পরমুহূর্তেই যেমনই আচমকা এসেছিল তেমনই আচমকা উধাও হয়ে গেল ও।

অনেকক্ষণ হতভম্বর মতো চেয়ারে বসে রইলাম। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছিল না। সত্যিই কি ব্রন্টি? আমাদের কলেজের বন্ধু ব্রন্টিই।

নিচে নেমে যখন আমি গাড়িতে উঠলাম, তখন দেখি ব্রন্টি আমারই অফিসের নিচের জিলিপি-শিঙাড়ার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে শুকনো শালপাতার দোনায় দু-হাতে রস আর আলু প্রায় মাখামাখি করে সিঙাড়া জিলিপি খাচ্ছে। পাশে দাড়িয়ে একটা ষাঁড় ওকে নিবিষ্টমনে লক্ষ্য করছে।

ষাঁড়টা হঠাৎ চলি কি চলি না করে চলতে আরম্ভ করল, রাস্তা থেকে আবর্জনা কুড়িয়ে খেতে খেতে। জনস্রোত তাকে ধাক্কা দিতে লাগল। ধাক্কা দিতে লাগল ব্রন্টিকেও। ব্রন্টি তখন তার টুকরো করে ভেঙে খাওয়া নিজের জীবনেরই একটি টুকরোর মতো শিঙাড়া-জিলিপি স্যাম্পলিং করছিল। আমি যেন শুনতে পেলাম, বাঁ হাতের চেটোয় শালপাতার দোনা ধরে ডান হাত দিয়ে খেতে খেতে ও বলছে, লিভিং ইজ গ্রেট ফান। য়্যু ওনলী হ্যাভ টু ফ্লোট উইথ ইট। নেভার ট্রাই টু স্যুইম এগেইনস্ট লাইফ।

ষাঁড়টা চলেছে সোজা। এবার সেন্ট্রাল এভিনিউতে গিয়ে পড়বে। তার মুখ বড়বাজারের দিকে।

বী আ ফ্লোটসাম।

কে যেন বললো, কানের পাশে।

তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। টাকাটা কোনো ব্যাপারই নয়। ও আবারও টাকা চাইবে, শুধুমাত্র এই ভয়েই ব্রন্টিকে আমি আসতে বারণ করিনি। ও আসলে ভীষণ, ভীষণই খারাপ লোক।

দারোয়ানকে বলে দিতে হবে যাতে ওকে আর কোনোদিনও ঢুকতে না দেয়।

www.BanglaBook.org

বনসাইদের গল্প

এখন অনেক রাত। বম্বের অভিজাত পাড়ায় রাত অথবা দিনে বেশি তফাত না থাকলেও এখানেও রাত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে এখন।

মিসেস সেন একবার লিভিং রুমে এসেছিলেন হালকা নীল রঙা নাইটি পরে। দরজা ঠিকমত লক হলো কি না, ছোট নাইট-লাইটগুলো ছাড়া অন্য বাতি সব নেভালো কী না বেয়ারা, তাই দেখতে। সব দেখেশুনে মিসেস সেন আবার এয়ার-কন্ডিশানড বেডরুমে ফিরে গেলেন।

আমাকে মিসেস সেন বড়ই ভালোবাসেন। ঘরে যাবার আগে একবার আমার গায়ে হাত রেখেছিলেন। একে ভালোবাসা বলে কী না জানি না। তবে, আজকের রাতের পার্টিতে মিসেস সেন-এর পালি হিল-এর এই ফ্ল্যাটে বম্বের যে সব গণ্যমান্য মানুষ এসেছিলেন তাঁরা আমাকে দেখে মিসেস সেনের আশ্চর্য প্রতিভার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেছেন। আমার কারণে তিনি সবসময়ই গর্বিত। তবে, আমার সম্বন্ধে মিসেস সেন যখনই সবাইকে ডাহা মিথ্যে কথাটা বলেছিলেন, তখন ওঁর মুখের কোথাও চামড়ার একটুখানিও কোঁচকায়নি। বড় বড় চোখের সুন্দর গভীর পাতাতেও একটুও কাঁপন লাগেনি।

মানুষ মিথ্যা কথা বলতে পারে আমি জানতাম। তবে মানুষের মেয়েরা আরও বেশি বলে যে, সে কথা জানতাম না। প্রত্যেক মেয়েই বোধ হয় জন্মেই অভিনেত্রী।

আসলে, মানুষদের কথা আমার তো অজানা থাকার কথা নয়। মানুষের হাতে আমার জন্ম না হলেও মানুষের হাতেই বড় হয়ে ওঠা। মানুষের ঘরেই আমার বন্দীত্ব।

মিস্টার সেনের পূর্বপুরুষদের দেশ ছিল পূর্ববঙ্গে। নিজে যদিও একবার দুবার ছাড়া কখনও যাননি। তবে, আমারই মতো, কিছু কিছু গাছ এবং হয়ত মানুষও থাকে, যত উঁচুতেই বাস করুক না কেন, অথবা উঁচুতলায়; তাদের গায়ে তাদের শিকড় লেগেই থাকে,

www.BanglaBook.org

লেগে থাকে শিকড়ের মাটির গন্ধ।

মিসেস সেন অবশ্য অন্য কথা বলেন, 'ইউ মাস্ট কাট ইওর রুটস রুথলেসলি। যে যুগে মানুষ চাঁদে পা দিচ্ছে সে যুগে রুটস কথাটাই টাইমবারড হয়ে গেছে।"

হয়ত হবে। শিকড় সঙ্গে করে বয়ে বেড়ালে, উপরে ওঠা যায় না; ওড়া যায় না; ওড়া যায় না এই নতুন পৃথিবীর আকাশে।

শিকড়ের কথাতেই মনে পড়ল আমার জন্ম হয়েছিল কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগরে যে হাইওয়ে গেছে তারই পাশে। কৃষ্ণনগরের কাছেই। আমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ সব একই জায়গায়। গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করেই বেড়ে উঠেছিলাম আমরা। একে অন্যের গায়ের গন্ধ নিয়ে। বটের ঝুরি নামে, ফল থেকে চারা গজায়। আমিও আমার সেই অভিজাত প্রাচীন বটবংশের এক শিশুবট ছিলাম। সবুজ পাখির ঠোঁটের ঠোকরে মাটিতে পড়া লাল বটফল থেকে আমার জন্ম। কলকাতার এক শৌখিন বাঙালিবাবু আমাকে শেকড়সুদ্ধ উপড়ে নিয়ে এসে আলিপুরে আচার্যি সাহেবের মেমসাহেবকে দান করেন। তিনিই আমাকে বামন করে দেন।

তাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য চীন দেশের মেয়েরা যেমন এক সময় লোহার জুতো পরে পায়ের গড়ন ছোট রাখতো, তেমনি আমার বটজাতীয় চরিত্রকে অক্ষুণ্ণ রেখেই নানারকম মানুষী বজ্জাতির সঙ্গে আমাকে মিসেস আচার্যি এবং অন্য অনেকে মিলে পরামর্শ করে বামন করে দিয়েছেন। জীবনের মতো নির্বাসন দিয়েছেন একটি চার ইঞ্চি বাই চার ইঞ্চি পোর্সিলিনের টবে। তবে, সাধারণ টব নয় সে। বম্বের বিখ্যাত দোকান, 'পেডার' থেকে কেনা। চমৎকার কারুকাজ, রঙের খেলা সে টবে।

বামন না বানালে আমি হয়ত আজ হাত-পা ছড়িয়ে চল্লিশ বছরে দশকাঠা জমির উপর ঝাঁকড়া চুলের নিশান উড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। মানুষ আমার দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে আমাকে বলত 'বনস্পতি'। কত পাখি এসে বাসা বাঁধত আমার ডালে। সোহাগ খেত। নীড়ের মধ্যে প্রেম ভালোবাসা সব ক্রীস্টালাইজড হয়ে সুন্দর উষ্ণ ডিম হয়ে প্রকাশিত হত। তারপর আরেক নতুন প্রজন্মের পাখি হয়ে ডিমের মধ্যে থেকে অনাগত ডিমের বাহক এবং ধারক সব পুরুষ ও মেয়ে পাখিরা কিচির-মিচির করে উড়ে যেত আমার নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে। গভীর রাতে, কেউটে সাপ হানা দিয়ে পাখির বাচ্চা আর ডিম খেত এবং প্রমাণ করত যে, সমস্ত রকম নিরাপত্তার মধ্যেই বিপদের বীজ নিহিত থাকেই। ডাকাতের আর মাতালের আর মৈথুনকারীর রম্য স্থান হত আমার ঘনঘোর স্নিগ্ধ ছায়া। শিবলিঙ্গ বসাতো কেউ এনে আমার পায়ের কাছে। সিঁদুর লেপে তাতে। জল ঢালত অনেক বোকা মেয়েরা ঘড়া ঘড়া তার মাথায়, আর চালাক বামুন পয়সা লুটত। ভক্তির 'ভ' নেই মনে অথচ ঠাকুরকে নিয়ে ব্যবসা পাতত কেমন! যেমন প্রেমের 'প' ও না নিয়ে ঘর বেঁধেছেন মিসেস সেন।

সততা মরে গেছে। আমার উচ্চতার মতই, সততা এ পৃথিবী থেকে উবে গেছে! অথবা, আমারই মতো; তাকে বামন করে রেখেছে সাবধানী, সতর্ক, নির্গুণ সব উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষেরা।

হঠাৎ মিসেস সেনের বেডরুমের দরজার উল্টোদিকে ঘরের দরজাটা খুলে গেল। মিস্টার সেন দরজা খুলে বাইরে এলেন। ভদ্রলোকের খালি গা, একটা কালো চেক-চেক লুঙি পরা। উনি এয়ার কন্ডিশানড ঘরে থাকেন না। বসবার ঘরও এয়ার কন্ডিশানড, যেখানে

www.BanglaBook.org

আমি এবং আরও অনেক বামন-গাছ থাকি এবং যেখানে বড় বড় মানুষ আসেন, হুইস্কি খান, বাখ, বীটোভেন এবং মোৎজার্ট, চাইকোভোস্কি শোনেন। আর্ট ফিল্ম নিয়ে দুর্বোধ্য সব আলোচনা করেন।

মিস্টার সেন মানুষটার মধ্যে দুটো মানুষ বাস করেন। বুঝতে পারি। একটা মানুষ অন্যরকম, অন্য দশজনের মতো। কিন্তু আরেকটা মানুষ? তিনি এই গভীর রাতের নিঃসঙ্গ, হৃদয়হীন, সঙ্গীহীন, প্রেমহীন একা ফ্ল্যাটে-থাকা মানুষটা। মিসেস সেন যখন সামনে বা বাড়িতে থাকেন না, শুধু তখনও সেই মানুষটা প্রকাশিত হন। কাফকার মেটামরফসিস এর গ্রেগর এবং সেই পোকাটার সঙ্গে মিস্টার সেনের আর আমার, এই বামন-বটের কোথায় যেন একটা দারুণ মিল আছে।

আজ রাতেই একজন অতিথি, আমার অসংখ্য কানের একটা কান মুলে দিয়ে তাঁর জাভেরী ব্রাদার্সের হীরে মোড়া সঙ্গিনীকে ফিসফিস করে বলেছিলেন, "উড নট বী সারপ্রাইজড, ইফ সাম ডে আই ভেঞ্চার টু রাইট অ্যাপালিং ডায়ারী অফ দি গ্রেট, ওল্ড, পুওর, ডোয়ার্ফর্ড চ্যাপ; অ্যা বনসাই ব্যানীয়ন!"

সঙ্গিনী ধন্য হয়ে বলেছিলেন, "হানি, ঠাট্টা করো না। আমি ভাবছি, 'ফ্রেন্ডস অফ দ্য ট্রীজ'-এর মতো, 'সোসাইটি ফর দ্য প্রিভেনশান অফ ক্রুয়েলটী টু ট্রীজ' নাম দিয়ে একটা সোসাইটি ফাউন্ড করব। দিস ইজ অ-ফুল। দিস বনসাই বিজনেস। গাছেদের বুঝি লাগে না? বলো হানি! জানো তুমি! সেদিন একটা বই পড়ছিলাম, 'দ্য সিক্রেট লাইফ অফ প্লাণ্টস।' ফ্যান্টাসটিক। ওরাও আমাদের মতো জীবন্ত, ওরাও ভালোবাসে, ভালোবাসা বোঝে মানুষদেরই মতো। ঈ-স-স-স।"

মিস্টার সেন ফ্রিজ খুললেন। বিরাট লিভিং রুম পেরিয়ে, অন্য প্রান্তের ডাইনিং রুমে গিয়ে। তারপর পান্তা ভাতের বাটিটা বের করে কার্পেটের উপর খবরের কাগজ বিছিয়ে বসলেন, বাবু হয়ে। শুকনো লঙ্কা পোড়া আর বড় বড় আস্ত কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে চাকুম চুকুম করে খেতে লাগলেন পান্তা ভাত। যেন ছোট্ট ছেলেটি। অনাবিল, ঋজু, অকলুষিত।

কোনো কোনোদিন পাশের ফ্ল্যাটের বাংলাদেশী আয়াকে দিয়ে শুঁটকি মাছও রান্না করিয়ে রাখেন সেনসাহেব। গভীর রাতে, আয়ার ছেলে লুকিয়ে এসে সে মাছ দিয়ে যায়। মিস্টার সেন পেঁয়াজ রসুন আর ঝালে লাল সেই শুঁটকি মাছ জমিয়ে খান।

মিসেস সেন শুঁটকি মাছের গন্ধ পেলেই স্মেলিং সল্টের শিশি তলব করেন এবং ওডিকোলন স্প্রে করান ফ্ল্যাটময়। খাওয়ার সময় মিস্টার সেনের চোখেমুখে এমন একটা ভাব ফুটে ওঠে যে, তা দেখে আমার কৃষ্ণনগরের কাছের সেই পথের পাশের পুরোনো চেনা গন্ধের বনস্পতির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। উড়াল চুলের কালবোশেখীর মেঘ, প্রথম বর্ষার সোঁদা গন্ধ, বর্ষার ঘনঘোর, রাতভর ব্যাঙের ডাক, জোনাকির নীলচে আলোর কাঁচটিপ, দুর্গা পুজোর ঢাকের আর কাঁসির বাদ্যির অনুরণন, এই সমস্ত স্মৃতি আমার পাতায় পাতায়, শিরায় শিরায়, শিরশিরানি তোলে। পাট পচানোর কটু কিন্তু দেশী গন্ধ, পাট কাচার চটাং-পটাং আওয়াজ, পুকুরের হাঁসেদের সম্মিলিত গলার প্যাঁক-প্যাঁকানি এবং গায়ের আঁসটে গন্ধ সবই ভিড় করে আসে আমার ডালে ডালে, পাতায় পাতায়; শিরায় শিরায়।

মিস্টার সেন খাওয়া শেষ করে নিজেই প্যানট্রিতে সব ধুয়ে ফেললেন। বাসন সব

www.BanglaBook.org

জায়গামত তুলে রাখলেন। পাছে মিসেস সেন বা বাবুর্চি না জানতে পান। তারপর জানালা খুলে দিলেন লিভিং রুমের।

মিস্টার সেন যখন গভীর রাতে এমন করে জানালা খোলেন শুধু তখনই আমি এবং আমার অন্যান্য বামন সঙ্গীরা একটু হাওয়া পাই। সমুদ্রের আওয়াজ আর নোনা গন্ধ কান ও নাক ভরে দেয়। এই বাইশতলার মার্বেল এবং কার্পেটে মোড়া ফ্ল্যাটে বছরে তিনশ পঁয়ষট্টি দিন এয়ার-কন্ডিশানারের একই রকম ঝিরঝিরে ঠাণ্ডায় থেকে থেকে আমাদের গুঁড়ি আর ডালপালাতে বাত ধরে গেছে। সেই আড়ষ্টতা নোনা হাওয়ায় ছেড়ে যেতে থাকে। আমরা বেঁটে বেঁটে হাত তুলে মিস্টার সেনকে নিঃশব্দে ধন্যবাদ জানাই।

মিসেস সেনও কখনও কখনও আমাদের রোদ খাওয়াবার জন্য জানালা খুলে জানালার তাকে রাখেন। তখনও একটু মাটি দেখতে পাই। মাটিরই গাছ আমরা। এখন যে চার ইঞ্চি বাই চার ইঞ্চি পোর্সিলিনের টবে থাকি সে মাটি মিসেস সেন প্লেনে উড়ে গিয়ে কলকাতার হর্টিকালচারাল সোসাইটি থেকে পলিথিনের ব্যাগে করে নিয়ে এসেছিলেন। মাইতিবাবু নিজে যত্ন করে সে মাটি বানিয়ে দিয়েছিলেন, সার, ক্ষার সব হিসেব করে। কিন্তু সে মাটিতে কেষ্টনগরের গন্ধ নেই। আমি আসলে আর আমি নেই। আমি বুঝতে পারি। আমার অবয়বে, আমর সুখে দুঃখে, আমার কামনা-বাসনা চাওয়া-পাওয়া আর শব্দে-গন্ধে একেবারেই বামন হয়ে গেছি। আমার অনেক নামডাক, অনেক মূল আমার, অনেকই গাছ এবং গাছের মালিকের ঈর্ষার কারণ আমি। কিন্তু যে গর্ভে জন্ম আমার, যে গর্ভে আমার বীজ রোপণ করার কথা ছিল, আমার হৃদয়ের সব লালিমা দিয়ে যে লাল ফল ফলাবার কথা ছিল তা সবই বিফল হলো এ জন্মে। আমি একটি নন-এন্টিটি, একটি বামন, একটি জড়দগব প্রাণ হয়ে গেছি। প্রশ্বাস নিচ্ছি এবং নিঃশ্বাস ফেলেছি। আমার হাত-পা ডাল-পাতা সবই আছে, কিন্তু শুধু প্রাণেই আমি জীবিত আছি। বেঁচে থাকা মানে যে প্রাণে বাঁচার চেয়েও অনেক বড় কিছু, সে কথা আজ প্রায় ভুলেই গেছি।

শুধু আমিই নই, আমার সব সঙ্গীরাই সে কথা বলে গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে। সঙ্গী বলতে, একটি কনকচাঁপা গাছ, একটি ছোট্টা রঙ্গন, আর একটি বোগোনভেলিয়া।

বাইশ তলার জানালায় বসানো অবস্থা থেকে যখন আমরা নীচে তাকাই তখন মাথা ঘুরে ওঠে আমার। তবে ওদের আরও বেশি ঘোরে। কনকচাঁপা আর আমি তাও আকাশের কথা বুঝি কিছু, কারণ আকাশের অনেকখানিই আমাদের থাকার কথা ছিল, বামন না হলে। এখন আমাদের আকাশ বলতে শুধু এই ডুপ্লে ফ্ল্যাটের হালকা খয়েরী রঙের সীলিংটুকু।

মিস্টার সেন এসে মাঝে মাঝে আমার সামনে দাঁড়ান। আমার গায়ে মাথায় হাত বুলান। বড় সহানুভূতি আর করুণা থাকে সেই হাতের আঙুলে। মিসেস সেনের আঙুলে শুধুই গর্ব আর মালিকানার দুর্গন্ধ। উনি আমার গায়ে হাত দিলেই আমার পাতাগুলি লজ্জবতীর পাতার মতোই আপনা থেকেই কুঁকড়ে যায়। মিসেস সেন পুলকিত হন। আমার যেটা ঘেন্না, সেটাই ওঁর তীব্র আনন্দ। উনি হয়ত বটগাছের "বনসাই"-এর মধ্যে লজ্জাবতীর লক্ষণ দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে ওঠেন, পরের "শো" তে অন্য একটা প্রাইজ পাবার আশায়। দশজনকে এই অভূতপূর্ব গুণ দেখিয়ে চমকিত করার আশায়।

শুনেছি, মিস্টার সেন মস্ত কাজ করেন। অনেক বছর আমেরিকাতে ছিলেন। এখন এক

www.BanglaBook.org

মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানির নাম্বার ওয়ান। এয়ার-কন্ডিশানড বাড়ি, এয়ার-কন্ডিশানড সাদা রঙা মার্সিডিজ, সে গাড়িতে আমিও চড়েছি অনেকদিন, বটানিস্টের বাড়ি যেতে। সে গাড়িতে চড়েও বাইরের হাওয়া পাই না একটুও। জৈষ্ঠ্যের দুপুরের গরম কাকে বলে আমি ভুলে গেছি। ভুলে গেছি গ্রীষ্ম রাতের স্নিগ্ধ হাওয়ার প্রলেপ। আমার চুলে খোলা হাওয়া আর কখনও চিরুণি বুলোবে না। যা হবার হয়ে গেছে; এ জন্মের মতো।

মিস্টার সেন মানুষটা বড়ই একা। মনে হয়, মানুষটাকে মিসেস সেন বনসাই করে দিয়েছেন। তাঁর সমস্ত নিজস্বতা ছাঁটতে ছাঁটতে, যেমন করে আমাদের নতুন গজানো পাতা আর নতুন গজানো ডাল মিসেস সেন তাঁর রুপোর কাঁচিতে ছাঁটেন, তেমনই করে ছেঁটে ছেঁটে কেটে ফেলে ন্যুব্জ, বামন করে দিয়েছেন মানুষটাকে।

মানুষটার বড় সুখ। সকলেই বলে। অথচ এই কোনো সুখেই যেন আমারই মতো মানুষটারও প্রয়োজন ছিল না কোনোই। অশান্তি এড়াবার চেষ্টা করতে, করতে; মানুষটা আজ রাতে এই বাইশতলার খোলা জানালার কাছে...

হঠাৎ মিস্টার সেন খোলা জানালা থেকে ফিরে এলেন। ফিরে এসে, আমাদের প্রত্যেককে এক এক করে জানালায় এনে বসালেন। তারপর, অনেকদিন থেকে যা ভেবেছিলাম, মানে যা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করেছিলাম, তাই করে বসলেন তিনি।

আমাদের জন্যে হঠাৎ এক তীব্র আনন্দে এবং মানুষটার জন্যে দুঃখে আমার মন কঁকিয়ে কেঁদে উঠল।

মিস্টার সেন হঠাৎই লুঙিটা খুলে ফেললেন। নাইট লাইটের স্বল্প আলোতে উদোম মানুষটাকে হঠাৎ যেন আমার বনস্পতি প্রপিতামহর ছায়ায়, তাঁর পায়ের কাছে ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকা সেই নাগা সন্ন্যাসীর মতো মনে হলো। মানুষটা মনে মনে বোধহয় সন্ন্যাসীই ছিলেন। এই অপ্রয়োজনের আড়ম্বর এবং অবিচ্ছিন্ন আরামকে মানুষটা তার বাড়তি পোশাকের মতোই হঠাৎই খুলে ফেললেন। তারপর একে একে বোগোনভেলিয়া, রঙ্গন দুটি, এবং কনকচাঁপাকেও জানালা গলিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর আমাকে যত্ন করে দুহাতে বুকে তুলে নিলেন।

আহা! কনকচাঁপা এবং রঙ্গনেরা মাটির সঙ্গে মিশে গেল! হাত-পা, চুল ছড়িয়ে ওরা যখন গভীর রাতের বম্বের মাল্টি-স্টোরিড বাড়ির ইঁট-কংক্রিটের জঙ্গলের মাঝের খোলা জায়গা দিয়ে দ্রুত নিচে পড়তে লাগল তখন যেন নিচের মাটি দু-হাত বাড়িয়ে দিল তাদের ধরবার জন্যে। মুহূর্তের জন্যে আরব সাগরের জল উছলে উঠল ওদের এই মুক্তির আনন্দে।

"আর্থ টু আর্থ, অ্যাশেস টু অ্যাশেস, ডাস্ট টু ডাস্ট"

হঠাৎ মিস্টার সেন জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে দিয়ে, নিজেও জানালার তাকে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর ধবধবে উলঙ্গ শরীরের চুলে সামুদ্রিক-হাওয়া বিলি কাটতে লাগল। তাঁর বুকের ঘন চুলের মধ্যে আমাকে তিনি আর একবার চেপে ধরলেন। তারপর টব থেকে আমাকে এক হ্যাচকা টানে মুক্ত করলেন। তাঁর বুকের ঘন চুলে মাইতিবাবুর যত্ন করে সাজিয়ে দেওয়া মাটি মাখামাখি হয়ে গেল। তারপর বামন আমাকে, হতভাগ্য এক শিশুরই মতো দু-হাতে বুকে জড়িয়ে আধুনিক সভ্যতার অর্থ ও যন্ত্রদানবের অত্যাচারে অত্যাচারিত, বড় একা মানুষটি, লোভ, গর্ব এবং অহমিকায় স্ফীত-নাসা এই ক্লান্তিকর অস্তিত্ব থেকে

www.BanglaBook.org

মুক্ত হবার জন্যে এক লাফ দিলেন জানালা দিয়ে।

জোরে হাওয়া লাগতে লাগল গায়ে। রাতের আরব সাগর থেকে সীগাল আর টার্নরা তাদের শান্তির সাদা ডানা মেলে হঠাৎ জল ছেড়ে অন্ধকারে উড়ে এল আমাদের স্বাগত জানাতে। মুক্তির গান ঠোঁটে করে। উড়ন্ত মৃত্যুতে মিস্টার সেনের সঙ্গে মিলিত হলাম।

একজন বামন-মানুষ। আর একটি বামন-গাছ!

প্রচণ্ড শব্দ হলো একটা। মিস্টার সেনের মাথাটা ফেটে গেল টুকরো হয়ে। নাক দিয়ে গরম রক্ত গড়িয়ে এল। এসে, চ্যাটচেটে হয়ে আমার সবুজ পাতাতে মাখামাখি হয়ে গেল। আমার এতদিনের শীত মুছে দিল।

দারোয়ান, চৌকিদার, পুলিশ সব দৌড়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে। মিস্টার সেন আমাকে যে সোহাগে, যে মমতায়, যে প্রেমে বুকে জড়িয়ে রেখেছিলেন তেমন করে মিসেস সেনকেও কোনদিন হয়ত জড়াতে পারেননি। অথচ, নিশ্চয়ই জড়াতে চেয়েছিলেন। গাছের মতো, মানুষেরও মনটাই আসল। তেমন করে মন ডাক না দিলে, মানুষের শরীরও কথা বলে না। আসলে গাছ, পাখি বা মানুষ সকলেই এক জায়গায় সমানই। বরাবর। কেউই কারো চেয়ে বড় নয়। ছোটও নয়। বামন করা যায় গাছকে, বা মানুষকে নিশ্চয়ই। কিন্তু অগাছ বা অমানুষ করা যায় না কখনই।

এই বনসাই গাছ—আমার, সবুজ পাতার রঙ গাঢ় লাল হয়ে এল বনসাই মানুষটার টাটকা তাজা ভালোবাসার, মুক্তির রঙে।

ভীষণই ভালো লাগতে লাগল। কারণ কোনোদিন আবার আমি সবুজ, বিরাট গাছ হব; প্রাচীন বনস্পতি! লাল ফল আসবে আমারও ডালে ডালে। অনেক ভালোবাসার টিয়া পাখী তার সঙ্গিনীকে আদর করবে আমারই বুকের নীড়ে বসে। নাগা সন্ন্যাসী, গভীর রাতে আমার পায়ের কাছে ধুনি জ্বালিয়ে বসে চুপ করে ভাববে, অন্ধ রাতে, সেই গন্তব্যের কথা, যেখানে চিরন্তন মানুষ চিরদিনই যেতে চেয়েছিল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জগন্নাথ

পুলিনবাবু নস্যির ডিবেটা বের করে এক টিপ নস্যি নিলেন।

নীল-রঙা ফুল-হাতা সার্টের কোলের কাছে পড়লো কিছুটা। ঘাড় নিচু করে দেখলেন একবার উদ্দেশ্যহীন চোখে, বাইফোকাল চশমার ফাঁক দিয়ে। বাঁ পকেট থেকে ছেঁড়া ন্যাকড়া বের করে ঝাড়লেন জায়গাটা।

তারপরই, সামনে খুলে-রাখা পার্সোনাল লেজারটাতে চোখ দুটি নিবদ্ধ করলেন।

উল্টোদিকের টেবিল থেকে তাঁর অল্প-বয়সী সহকর্মী হেমেন বললো, কি সিনেমা দেখলেন দাদা? দেখলেন কিছু? দাদা?

শুনতে পেলেন না পুলিনবাবু।

যখন যে কাজটা করেন তাতে এমনই ডুবে যান উনি যে, তখন পৃথিবীর অন্য কিছু সম্বন্ধেই হুঁশ থাকে না।

হেমেন আবারও বললো এই যে পুলিনদা, কোনো সিনেমাই দেখলেন না এবারে কলকাতায় এসে? গৌতম ঘোষ-এর 'পার'-ও না?

মুখ তুললেন উনি।

হেমেনের দিকে একবার তাকিয়েই, মুখ নামিয়ে বললেন, 'পার' অনেক দূরে এখনও। তেষট্টি হাজার দুশো পঁয়ষট্টি টাকার ডিফারেন্স ছিলো ট্রায়াল ব্যালান্স-এ। মোটে হাজার পাঁচেক টাকা খুঁজে পেলাম। কিন্তু সাড়ে ছ'হাজার আবার বেড়ে গেলো। ক্রেডিটে বেশি ছিলো।

ঘরের সকলেই প্রায় হেসে উঠলো একসঙ্গে। পুলিনবাবুর কথা শুনে।

তাদের সম্মিলিত হাসির শব্দে মুখ তুলে চাইলেন পুলিনবাবু। হাসির কারণটা ঠিক বুঝতে পারলেন না।

www.BanglaBook.org

হেমেন বললো, আপনাকে নিয়ে চলে না দাদা! ট্রায়াল ব্যালান্স-এর পার তো চিরদিনই দূরে থাকে। 'পার' ছবিটাও দেখলেন না। কলকাতায় এলেন আপনি। গৌতম ঘোষের ছবি। একটা বড় কিছু মিস করলেন জীবনে?

ছবি?

পুলিনবাবু স্বগতোক্তি করলেন। স্বপ্নোত্থিতর মতো।

হ্যাঁ হ্যাঁ ছবি! ফিলিম।

উনি কোনো উত্তর দিলেন না। চোখ নামিয়ে নিজের কাজ করতে লাগলেন।

বেশিদিন খাতা লিখলে মানুষ সত্যিই আপনার মতো মাছিমারা-কেরাণীই হয়ে যায়। হেমেন বললো।

হেমেনের টেবিলেই বসে যীশু। যীশু বললো, শুয়োর পার করাবার সীনটা দারুণ, না রে?

জবাব নেই!

সমরেশ মজুমদারের লেখা, না?

সমরেশ মজুমদার নয় রে। গুরু সমরেশ বসুর। গল্পর নাম ছিল 'পাড়ি'।

গৌতম ঘোষের সঙ্গে আলাপ থাকলে বলতাম, এবার আমাদের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী নিয়ে একটা ছবি তুলতে। এই ধর আমাদের পুলিনদা। এঁকে নিয়ে যদি কোনো লেখক একটি গল্প লিখতো তবে কী করুণ হতো বলতো? শুয়োরগুলো তাও পেরিয়ে গেল নদী। কত মানুষ আছে আমাদেরই মধ্যে, যারা চেষ্টা করলো, নাকানি-চোবানি খেল; কিন্তু নদী আর পেরুনো হলো না তাদের।

গোপেন হেসে উঠলো হেমেনের কথায়।

কিন্তু হাসাবার জন্যে বলেনি হেমেন কথাটা। অন্যরা স্তব্ধ হয়ে পুলিনদার দিকে চেয়ে রইলো।

স্টিল-ফ্রেমের চশমাটা সরু নাকের ডগায় নেমে এসেছিলো।

পুলিনদা চোখ দুটি লেজার থেকে তুলে ওদের দিকে তাকালেন। বললেন, ঠিকই বলেছো হেমেন। বায়োস্কোপের হীরো-হওয়া-শুয়োরের চেয়েও নিকৃষ্ট অনেক মানুষই থাকে। সত্যিই থাকে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, যেমন আমি।

এমন সময় রণ্টু, হেমেনের সিগারেট আর পুলিনবাবুর পান, স্যুয়িংডোর খুলে ঢুকলো।

ঢুকেই বললো, আবার এয়েচে।

কে?

পানটা নিতে নিতে পুলিনবাবু শুধোলেন।

সেই! কম্পু কোম্পানির লোক।

হেমেন, গোপেন এবং অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের সকলেই কাজ ছেড়ে এই নতুন আলোচনায় মেতে উঠল।

রণ্টু, চায়ের জলটা চাপিয়ে দিলে বললো, ইনি অন্য কোম্পানির লোক। সেদিন এসেছিলো এইচ. এম. টি. থেকে।

ছোট সাহেব কি বলছেন?

ছোট সায়েব তো নেবেনই বলেছেন।

সবাই শালা রাজীব গান্ধী হয়ে গেল মাইরী! কম্প্যুটার না বসালে তার এফীসিয়েন্সী বাড়ছে না! সকলেই মডার্ন। ছোটবাবুর বাবা খোদ মালিক যে এতদিন হাফ-হাতা ফতুয়া গায়ে

www.BanglaBook.org

আর ভুঁড়ির নিচে ধুতি পরে এই বিজনেস এত বড় করে গেলো সেই আসল মালিকই এখন ফোতো। কম্প্যুটার না বসালে নাকি এফীসিয়েন্সী বাড়ানো যাচ্ছে না। প্রাগমাটিজম আনতে হবে। আমরা সকলেই ওয়ার্থলেস। শালা আমাদের শুদ্ধু নাজাই খাতে লিখে দিলে র‍্যা!

ঠিক সেই সময়েই ছোটোবাবু দরজা খুলে ঢুকলেন। চোখে ফোটোসান লেন্সের চশমা। আলো বাড়া কমার সঙ্গে সঙ্গে রং পাল্টে যায়। ছোটবাবুর মুখের খচরামির রঙেরই মতো। জিন্স-এর ওপরে ঘি-রঙা একটা টি-সার্ট। সিল্কের।

ওকে দেখেই সকলে চুপ করে গিয়েই দাঁড়িয়ে উঠলেন।

শুধুমাত্র পুলিনবাবু ছাড়া। টেবলের নিচে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া একপাটি চটি খোঁজার জন্যে এদিকে-ওদিকে পা চালাচ্ছিলেন উনি তখন আপ্রাণ চেষ্টায়। বাঁ পায়ের চটিটা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলেন না। এই রণ্টু ছোকরা যতবারই ওঁর টেবিলের কাছে আসে, ততোবারই লাথি দিয়ে ওর চটিগুলো এদিক-ওদিকে ছটকে দেয়। ইচ্ছে করে যে করে, তা নয়। ছোঁড়ার পায়ে ক্ষুর লাগানো আছে।

পুলিনবাবু।

ছোটবাবু ডাকলেন।

স্যার।

বলেই, একপায়ে চটি গলিয়ে উঠে দাঁড়ালেন উনি।

কতদূর হলো, আপনার? বাগান থেকে ফোন এসেছিলো। তাড়াতাড়ি দরকার আপনাকে সেখানে। এবারে আবার ট্যাক্স-অডিটের ঝামেলা আছে। অডিটরের ছেলেরা আপনার জন্যে বসে আছে। মিলিয়ে দিয়েই ফিরে যান।

ছোটবাবু প্রায় বাঙালিদের মতোই বাংলা বলেন। অথচ বাঙালি ওঁরা মোটেই নন। বাঙালিরা এই কোম্পানিতে কেরাণীই। যত বড় বড় পোস্ট সবই তাঁর নিজের রাজ্যের লোক।

পুলিনবাবু বললেন, আজ্ঞে। কিন্তু ডিফারেন্স যে বেড়ে গেল এদিকে, স্যার।

তা আমি জানি না। মিলিয়ে দিয়েই চলে যাবে। বুঝেছেন?

শেষ শব্দটাতে অসহিষ্ণুতার ছোঁওয়া লাগানো।

ছোটবাবু চলে গেলেন তাঁর নিজের চেম্বারে।

বাবাই বললো, কম্প্যুটার। কম্প্যুটারের কথা আর বলিস না। তার খেল দেখলি সেদিন?

কোনদিন?

সকলেই জিগগেস করলো সমস্বরে। পুলিনবাবু ছাড়া।

আরে! ঐ তো শনিবার না রবিবার রাতে। মিস ইউনিভার্স-এর সিলেকশন দেখালো না টি-ভি'তে? স্টেটস-এর মায়ামি থেকে? স্যাটালাইটে? একটা কাপড় কোম্পানীর স্পনসরড প্রোগ্রাম ছিলো।

আমরা তো দেখিনি!

আমি গেসলুম মামাবাড়িতে। রাত প্রায় পৌনে এগারোটায় ছিল। কালার টি-ভি'তে দেখলুম। সুন্দরী মেয়ে ছিল দুটিই। আর সবই দাঁত বের-করা। কী করতে যে গেছে। একজন মিস আয়াল্যান্ড। আর অন্য জন মিস স্পেইন। কম্প্যুটারে সব জাজদের দেওয়া ডাটা ফীড করে তার উত্তর আবার সেখানকার মস্ত এক অ্যাকাউন্টান্সী ফার্ম-এর পার্টনার নিজে নিয়ে এলেন।

কে হল মিস ইউনিভার্স?

ঝুল। পুরো ব্যাপারটাই ঝুল। ওদের দুজনেরই কেউই হলো না। হলো বোধহয় মিস

www.BanglaBook.org

পুরটোরিকো। সোনাগাছির মাসীর মতো চেহারা মাইরী। দাঁতের পাটির মধ্যে আবার কী একটা মিসিং। এবং মিশি অ্যাডেড। কোনো মানে হয়!

হেমেন বললো, কথাই তো আছে! কম্প্যুটারে যদি গার্বেজ ফীড করো, তো গার্বেজই বেরুবে। মানুষের মাথার কোনোই দাম নেই। সবই নাকি কম্প্যুটারে করে দেবে? আমরা কি বসে বসে...

বাবাই বললো, আরে! তোরাও যেমন! আজকাল আমার ছোটোবাবুর মতো সাহেব ব্যবসাদাররা কি করছে জানিস না? খাতায় যত তিন-নম্বরী হিসেব সব কম্প্যুটারের ভেতর পুরে দিচ্ছে। ধরো শালা? রেইড করে কি ধরবে? ইনকাম-ট্যাক্স ডিপার্টের লোক এসে আঙুল চুষবে বসে বসে। নো খাতাপত্তর, নো হিসেব। লুকিয়ে থাকবে জ্বলজ্বলে নানা-রঙা ডিজিটালস-এ...

এবার যতীন বললো, তিন-নম্বরীটা আবার কি মাল মাইরী? আমাদের দু-নম্বর অবধিই তো জানা ছিলো। তুইও দেখছি কম্প্যুটারের মতোই অ্যাডভান্সড হয়ে যাচ্ছিস। আমাদের মোটা বুদ্ধির বাইরে।

সে কীরে! অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে কাজ করসি আর তিন-নম্বর কাকে বলে তাই-ই জানিস না?

না তো?

সকলেই বললো সমস্বরে।

একমাত্র পুলিনবাবু ছাড়া।

এখানে উনিই একমাত্র মানুষ, যিনি এক নম্বর ছাড়া কিছুই জানেন না! এক নম্বরী মানুষ তিনি, যে যুগের মানুষ, সে যুগে কম্প্যুটারও ছিল না, দু-নম্বর এ সবও ছিলো না।

সকলে আবারও বললো, বল বাবাই! বুঝিয়ে বল।

বাবাই যীশুকে বললো, আগে সিগারেট ছাড়ো তো গুরু!

সিগারেটটা ধরিয়ে লম্বা একটা টান মেরে বললো, মনে কর আমাদের পাঁচজনের একটা পার্টনারশিপ ফার্ম আছে। আমরা প্রফিট করলাম, ধর, পাঁচ লাখ। তার মধ্যে আড়াই লাখ এক-নম্বরে দেখালাম আর আড়াই লাখ দু-নম্বর করে দিলাম। মনে কর আমার হাতেই অ্যাকাউন্টস। এই ব্যাপারটা শুধু আমিই জানি। আমি অন্য পার্টনারদের বললাম, আসলে প্রফিট হয়েছিলো সাড়ে চার লাখ মানে আড়াই নয়, শুধু দুলাখই দু-নম্বর করা হয়েছে। ঐ দুলাখ পাঁচজনে চল্লিশ হাজার টাকা করে ভাগ করে নিলাম। বাকি পঞ্চাশ আমি একা মেরে দিলাম। ঐ পঞ্চাশ হাজার টাকাটা আমার তিন নম্বর হলো না?

সকলেই হো হো করে হেসে উঠলো।

যতীন টেবিল বাজালো উত্তেজনায়।

শুধু পুলিনবাবুই হাসলেন না।

আরও এক টিপ নস্যি নিয়ে ট্রায়াল ব্যালান্স-এর ডিফারেন্স খুঁজতে লাগলেন। মনে মনে বললেন, এই ছোকরাগুলো পোস্টিং কাস্টিং কিছুই ঠিক করে করবে না, তা ডিফারেন্সের কি দোষ। ডিফারেন্স তো হবেই। একদল দায়িত্বজ্ঞানহীন ছোকরার দল।

হেমেন বললো, তুই এই তিন-নম্বর শিখলি কার কাছ থেকে?

কেন? আমাদের যে ফার্ম চায়ের বাক্স সাপ্লাই করে, সেই আগরওয়ালার কাছে। তাদের অ্যাকাউন্ট্যান্ট ভারী কম্পিটেন্ট।

পুলিনবাবু একবার তাকালেন আড় চোখে।

www.BanglaBook.org

কিন্তু কিছু বললেন না।

মনে মনে বললেন, কম্পিটেন্ট! চোর হলেই আজকাল কম্পিটেন্ট!

পুলিনবাবু বাগানের অ্যাকাউন্ট্যান্ট। উত্তরবঙ্গ ডুয়ার্সে এখন বাঙালিদের বাগান আর নেই বললেই চলে। সাহেবদের বাগানগুলোও সব কিনে নিয়েছে বড়লোক মাড়োয়ারীরা।

ছোট বাগানগুলোও সব কিনে নিয়েছে মাঝারী মাড়োয়ারীরা। তারাই এখন সাহেব।

একটা দুটো বাগান অন্যরাও কিনেছে। যেমন কলকাতার কেনিলওয়ার্থ হোটেলের সিন্ধী মালিক ভরত সাহেব। পরে অবশ্য বাগান ছেড়ে দিয়েছেন উনি।

যারাই তাদের অন্ন দিয়েছে, তাদের চাকরি খাবার ক্ষমতা যাদেরই হাতে যখনই ছিলো, যারাই লাথি মারার ক্ষমতা রেখেছে তাদের; বাঙালিদের কাছে তারাই সাহেব। মালিক চিরদিনই।

সাহেবরা এই দেশ শোষণ করতে এসেছিলো বটে তবুও তাদের রাখ-ঢাক, আদব-কায়দা ছিলো। এখানকার বিভিন্ন দেশীয় এক-পুরুষ দু-পুরুষের বড়লোক সাহেবদের সেসব কিছুই নেই। চায়ের গাছের ডাল ভেঙে পাতার সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে। যা খুশি করছে। চক্ষুলজ্জা ব্যাপারটা জলাঞ্জলী না দিলে বোধহয় পয়সা করা যায় না। পয়সার জন্যে মানুষ এমন হামলে পড়েছে যে, যা-কিছুই ভালো তার সব কিছুকেই ফেলে দিচ্ছে সকলে। যার টাকা আছে সেইই সব। আর কোনো কিছুরই দরকার নেই "সাহেব" হতে। আগে দরকার হতো। যে মানুষই গাড়ি চড়তেন তাঁরই শুধুমাত্র টাকা ছাড়াও অন্য ব্যাপার ছিলোই। বিদ্যা, মেধা, সততা, আভিজাত্য; ইত্যাদি ইত্যাদি।

পঁয়ষট্টি বছরের পুলিনবাবুর পক্ষে এই নতুন পরিবেশে খাপ-খাওয়াতে প্রতিমুহূর্ত বড়ই অসুবিধে হয়। উনি এই কম্প্যুটারের যুগের মানুষ তো নন। সাহেবী আমলের ডানকান ব্রাদার্স-এর একটি বাগানের অ্যাকাউন্ট্যান্ট ছিলেন তিনি। সেই চাকরী ছেড়ে এসে এই চাকরীতে ঢুকেছেন। তাও বছর দশেক হয়ে গেলো।

ওঁর মনে পড়ে গেলো যে, যেদিন প্রথম একটি অ্যাডিং-মেশিন আসে তাঁদের বাগানে, তার পরদিনই নবীন মুহুরী আত্মহত্যা করেছিলো কৃষ্ণচূড়া গাছের ডাল থেকে গলায় দড়ি বেঁধে। নবীনের সবচেয়ে বড় গর্ব ছিলো যে, চোখের নিমেষে সে ট্রায়াল ব্যালান্স, ব্যালান্সসীট, ডেটরস-ক্রেডিটরস-এর লিস্টের নিচে ডান হাতের তর্জনী দ্রুতগতিতে বুলিয়েই যোগফল বসিয়ে দিতে পারত। নবীনের কোনো যোগে কেউই কখনও ভুল ধরতে পারেনি। সাহেব কোম্পানির অডিটররা এসে ধন্য ধন্য করতেন সবাই নবীনকে। জীবনের পঞ্চাশ বছর ধরে সে যা গড়ে তুলেছিলো; খ্যাতি, গর্ব, তার পারদর্শিতা, সবই এক নিমেষে একটি সাড়ে সাতশো টাকা দামের সবুজ-রঙা ছোট্ট জার্মান মেশিন গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিল। এই অপমান, অসহায়তা; ভবিষ্যতের অনিশ্চিতি কিছুতেই সহ্য করতে পারেনি নবীন।

নিজেকে মেরেই নিজেকে বাঁচিয়েছিলো সেদিন। কিছু মানুষ ঐরকমই হয়। জীবনের চেয়েও মানকে বেশি ভালবাসে তারা। পুলিনবাবু নবীনের মতো হতে পারেননি।

বৈশাখের সকালে শিমুলের ডাল থেকে ঝুলতে-থাকা সাদা ধুতি-জড়ানো অর্ধ-উলঙ্গ দুলতে-থাকা মৃতদেহটা এখনও দুঃস্বপ্নে দেখেন পুলিনবাবু।

মাঝে মাঝে ভাবেন, মরে গিয়ে বেঁচে গেছে নবীনটা!

এতদিন পরে, এই কম্প্যুটার বুঝি তাঁরও মৃত্যুর কারণ হয়ে এল!

অথচ তিনি যে নিজেকে মেরে নিজেকে বাঁচাবেন তার উপায় নেই কোনো। দুটি মেয়ে এখনও বিয়ের বাকি। ছোট ছেলেটা অমানুষই হয়ে গেলো। লেখাপড়া তো করলোই না।

www.BanglaBook.org

এক পার্টির অ্যাকশন-স্কোয়াডে আছে সে।

শিলিগুড়িতে গিয়ে মাস্তানী করছিলো এতোদিন। এখন নাকি নেপালের ধুলাবাড়ি থেকে যেসব জিনিস চোরাচালান হয়ে শিলিগুড়িতে আসে রাতারাতি, সেইসব নিয়ে আসে তাদেরই জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, যাঁদের মুখ চেনেন না, নাম জানেন না নবীনবাবু অথচ যাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে এক নীরব অসহায়তার অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে তিনি আজও বাঁধা আছেন; তাঁদেরই মেয়ে বৌ-রাই নাকি রাতের অন্ধকারে জঙ্গলে জঙ্গলে মাথায়-করে, আঁচলে বেঁধে, সীমান্তের নদী পেরিয়ে টেপ-রেকর্ডার, মদ, ক্যালকুলেটার, ভি. সি. আর. এবং আরও কত সব চকচকে জিনিস, যা নইলে আজকের আধুনিক মানুষদের "বেঁচে থাকার" কোনো মানেই হয় না, সেইসব বয়ে নিয়ে আসে।

সেই মেয়ে-বৌ এরা শুধু গতরে পরিশ্রম যে করে তাই-ই নয়। তাদের নিজেদের অনেক সময়েই মানুষ-খেকো হিংস্র হায়নাদের হাতেও তুলে দিতে হয়। বিনিময়ে, মোটা ভাত-কাপড়ও জোটে না তাদের। আর মুনাফা লোটে ধুলাবাড়ির আর শিলিগুড়ির অবাঙালি ব্যবসাদারেরা।

পুলিনবাবুর ছোট ছেলে এখন এইসব চোরাচালানের কোনো একটি দলের গুণ্ডা হিসেবে ভিড়ে গেছে। তৈরি হয়েই আছেন পুলিনবাবু। যে কোনোদিন শিলিগুড়ি থেকে তার মৃত্যু সংবাদ পাবেন।

বড়টা মানুষ হয়েছিলো। কিন্তু মানুষ হবার পরই অমানুষ হয়ে গেছে। মানুষ-অমানুষ অনেক রকমেরই হয়।

তিন হাজারী চাকরি করে এখন সে কলকাতায়। কিন্তু শ্যামবাজারের একটি মেয়েকে বিয়ে করে সে কুঁদঘাটে নিজের বাড়ি করে ক্যালকেশিয়ান হয়ে গেছে। স্কুটার কিনেছে। বাবা-মা-ভাই-বোন সকলকেই ভুলে গেছে। তার শাশুড়ি আর শালীই তার সব এখন।

পুলিনবাবুর মনে হয়, এও এক ধরনের মৃত্যু। নবীন মুহুরী, শিমুল গাছ থেকে ঝুলে পড়েছিলো। নিজেকে মেরেছিলো; নিজেকে বাঁচাবার জন্যে। তাঁর বড়ছেলেও নিজেকে মারলো। অন্য মৃত্যু। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে। মৃত্যুরই মতো, সে বাঁচাটাও অন্য এক ধরনের বাঁচা জীবন এবং মৃত্যুরও অনেকই রকম হয়।

॥ ২ ॥

বাগানে ফিরে এসেছেন পুলিনবাবু। এক্ষুনি ফিরলেন। বড়ই ক্লান্ত।

যেদিন ফেরার কথা ছিলো, তার দু-দিন আগেই। কলকাতায় যেতে হয়েছিলো, কারণ কলকাতার ট্রায়াল ব্যালান্স ওরা কেউই মিলোতে পারেনি বলেই। আজকালকার ছোকরারা নিজের নিজের কাজ ছাড়া সব বিষয়েই পণ্ডিত! লজ্জা করে ওদের দেখে।

মিলিয়ে দিয়ে ফিরে গেছেন উনি। ডান পকেটের নস্যিমাখা লাল রুমালটারই মতো নিজের আত্মশ্লাঘায় বুক ভরে। জীবনে তিনি একে একে হারিয়েছেন অনেক কিছুই। স্ত্রী মনোরমাকে। বড়কে, ছোটকে। নিজের বুকের মধ্যের এই জিনিসটিও হারিয়ে গেলে বেঁচে থাকার মতো আর কোনো অবলম্বনই যে থাকবে না তাঁর!

সকাল থেকেই খুবই বৃষ্টি হয়েছে। উত্তর বাংলার বৃষ্টি! আগস্টের মাঝামাঝি। বিকেলের দিকে আকাশ পরিষ্কার হয়ে তিস্তা আর হিমালয় চমৎকার দেখাচ্ছিলো। নদ এবারেও তাণ্ডব করবে মনে হচ্ছে। কাল, বাগানের অফিসে শুনেছিলেন যে, কাঠামবাড়ির বাংলো নাকি আবারও ভাসাবার উপক্রম করেছে হারামজাদা। চ্যাংমারির চরের অবস্থাও তথৈবচ।

www.BanglaBook.org

বিনু বলল, খাইয়া লও বাবা। দুগা খাইয়া লইয়্যা ছুটি কইর‍্যা দ্যাও আমারে। তিনুটার জ্বর তিনদিন থিক্যা। আমারও শরীলডা ভাল ঠ্যাকতাছে না।

রাঁধছস কি?

কী আর। পোলাউ মাংস তো আর রান্ধি নাই। হেই বর্ষায় তরি-তরকারীরও আকাল পড়ছে। পাওন যায় না কিছুই। ধোঁকার ডালনা আর রুটি রাঁইধা থুইছি। দিমু কি না, কও?

চাঁদটা উঠেছিলো বিশ্ব-চরাচর উদ্ভাসিত করে। কোয়ার্টার্সের বারান্দায় বসে বৃষ্টি-ভেজা প্রকৃতি, চায়ের বাগান, কুলি লাইনের টিনের ছাদ, ম্যানেজারের বাংলো এসব দেখতে দেখতে অনেকই পুরনো দিনে চলে গিয়েছিলেন পুলিনবাবু।

বিনুর কথায় বললেন, দিয়া দে তবে। তরে ছুটি কইর‍্যাই দি।

অভিমানের সুর লেগেছিল গলায়।

তিনি নিজে যে কবে ছুটি পাবেন চিরদিনের মতো? কিন্তু ছেলেমেয়েরা কেউই বোঝে না তাঁর গলায় কখন অভিমান লাগে আর চোখে কখন দুঃখ চমকায়। সে সব বুঝতেন, একমাত্র মনোরমাই। একজন পুরুষের জীবনে তাঁর স্ত্রীর মতো বুঝদার মানুষ বোধহয় আর কেউই হয় না। হয়তো স্ত্রীর জীবনেও, স্বামীর মতো। মজার কথা এই যে, দুজনেই বেঁচে থাকাকালীন ঝগড়াই হয় বেশি। ঝগড়া যে সকলের সঙ্গে করার অধিকার আদৌ নেই, এ কথাটা দুজনের মধ্যে একজন হঠাৎ চলে গিয়ে অন্যজনকে বুঝিয়ে দিয়ে যান।

খাওয়া দাওয়ার পর বারান্দায় বসে ছিলেন পুলিনবাবু। এই কোয়ার্টার্সটা একেবারে ফাঁকায়। ধারে-কাছে আর কোয়ার্টার্স নেই কোনো।

মনোরমা, নির্জনতা, গাছ-গাছালি এসব পছন্দ করতেন বলেই অফিস থেকে এবং অন্য কোয়ার্টার্স থেকে দূর হলেও এই কোয়ার্টার্সই নিয়েছিলেন। একজন মেকানিকের কোয়ার্টার্স ছিল আগে এটি। বাগানের মোটর, ট্রাক্টর সারাতো সে।

নিজেই পান সেজে খেলেন একটা। হাতলভাঙা কাঠের ইজিচেয়ারটাতে বসে, বারান্দায় খুঁটির গায়ে দু-পা তুলে দিয়ে, জোনাকি-জ্বলা, ব্যাঙ-ডাকা রাতের দিকে চেয়ে বসে রইলেন।

খেতে যতটুকু সময় গেছে তারই মধ্যে চাঁদ ঢেকে গেছে মেঘে। ঝুরুঝুরু করে হওয়া বইছে। বৃষ্টি নামবে এক্ষুনি। কদম গাছ দুটিতে খুব কদম ধরেছে। কদম আর তাঁর দরজার পাশের যুঁইয়ের লতার গন্ধ মিলে আমেজের মতো লাগছে।

বিনু বারান্দায় এসে বললো, শুইবা না তুমি?

শুমু আনে! তিনু কই? তার জ্বর কত দেখছস?

দেখুম।

বলেই বিনু ঘরে চলে গেলো।

মিনিট পনেরো পর আবারও বিনু এসে বললো, তোমার আজ হইলোডা কি? শুইয়া পড়ো। রাত তো প্রায় নয়ডা বাজে।

সোজা হয়ে বসলেন পুলিনবাবু চেয়ারে। মেয়ের ব্যবহারটা কেমন যেন বিসদৃশ, সন্দেহজনক ঠেকলো তাঁর কাছে।

কী মনে করে, উনি 'যাইতাছি' বলে, নিজের ঘরে গিয়ে শোবার ভান করে পড়ে রইলেন।

বাইরের বৃষ্টি-ভেজা প্রকৃতি আসন্ন বর্ষণের জন্য তৈরি হচ্ছিল। ফিসফিস করছিল হাওয়া দূরের ঝরনার আওয়াজের মতো মৃদু ঝরঝরানি আওয়াজ ভেসে আসছিলো কানে দূরের তিস্তার আওয়াজ।

www.BanglaBook.org

পুলিনবাবুর একটু তন্দ্রামতো এসেছিলো। এমন সময় একটা গাড়ির শব্দ শুনলেন তাঁর কোয়ার্টার্সের রাস্তায়। এদিকে এটা ছাড়া দ্বিতীয় বাড়ি নেই। গাড়ি তো আসে না এ পথে কোনো? কার গাড়ি? এত রাতে? হেডলাইট জ্বালিয়ে একটা অ্যাম্বাসাডার গাড়ি এসে থামলো তাঁরই কোয়ার্টার্সের সামনে।

পুলিনবাবু মড়ার মতো পড়ে রইলেন। সস্তা সেন্টের গন্ধ পেলেন হঠাৎ নাকে। বুঝলেন, বিনু তাঁর ঘরে এলো। শাড়ির মৃদু খসখসও শুনতে পেলেন। শুলেই পুলিনবাবুর নাক ডাকে। বিনু ভাবলো, উনি গভীর ঘুমে আছেন।

এমন সময় একটি চেনা গলা শুনতে পেলেন। তিনু!

তিনু বললো, দিদি! তুই এখনও তৈরি হস নাই?

বিনু ধমকে বললো, চুপ! আস্তে ক' ছেমড়ি। বাবায় আইস্যা গেছে গিয়া।

অ্যাঁ?

হ্যাঁ।

কোথায়?

ঘুমাইতাছে।

পরক্ষণেই স্বগতোক্তি করলো, ঘুমাইছে কী না তাইই বা কমু ক্যামনে? ওরে বরং বইল্যা দে তুই যে, আমি আজ যামু না। বাবায় উইঠ্যা পড়ে যদি তো এক্কেরে পেরলয় বাধাইবে।

কইস কি তুই? গিরিধারী তো নেশায় চুর হইয়া গাড়ির পেছনের সিটে বইস্যা আছে। আর বাগানের বাংলোয় বইস্যা আছে জোড়া-খাটে তাগো বাগানের মালিক। হ্যায় লোকডা একডা জংলীরে!

আস্তে। আস্তে। তরে কইলাম কী আমি?

বিনু বললো, বিরক্তি, ভয় এবং উদ্বেগ। নিচু গলায়।

তিনুর বয়স আঠারো। স্বভাব চঞ্চল, বেপরোয়া। গলার স্বরও জোর। সে তেড়ে বললো, অত চুপ চুপ করতাছিস কির লইগ্যা? বাবায় কিছু কইলাই দেখুক না একবার! কী রাজকন্যাদের মত্বই রাখছে আমাগো। বেশি কিছু কইলে আমি রাত্তারাতিই চইল্যা যামু আনে।

গলা শুকিয়ে গেল বিনুর।

বললো, যাবি কোন চুলায়?

ক্যান? কোলকাতায়! গিরধারীর মালিক কইছে। কইছে, রানী কইর্যা রাখবো আমারে। ভাবছস কি তুই?

এবারে পুলিনবাবু যথাসম্ভব কম শব্দ করে উঠে বসলেন খাটে। গিরধারী তাঁদের বাগানের পাশেই যে মাড়োয়ারীর বাগান, তার ক্যাশিয়ার। আর যে বাঙালি ছেলেটির গলা পেলেন তিনি এক্ষুনি, সে তার ছোট ছেলের বন্ধু। স্টোরসবাবুর সেজ ছেলে বন্ধু।

তাঁর দুই অবিবাহিত মেয়েই তাহলে...

বুকের মধ্যে ভীষণ কষ্ট হতে লাগল তাঁর। বুকের মাঝখানটাতে ব্যথা করতে লাগলো।

এখন উঠে বাইরে গেলে গিরধারী এবং ছোটর বন্ধু বন্ধু জেনে যাবে যে, পুলিনবাবুর কিছুই অগোচর নেই। অথচ না গেলেও...। এবং গেলেও...

কিন্তু যাবেনই বা কেন? কী করে যাবেন? কোন মুখে? তার মেয়েরা চলে যাক যেখানে খুশি। ছেলেরা যেমন গেছে। শিলিগুড়ি বা জলপাইগুড়ির পাড়ায় ঘর নিয়ে ব্যবসা করুক গিয়ে। নয়তো কলকাতাতেই যাক। তাদের বুড়ো, হতভাগা বাবার ঘরে তারা তো

www.BanglaBook.org

রাজকন্যার মতো ছিলো না! তারা যদি ভাল-খাওয়া ভাল-থাকাকেই সবচেয়ে বড়ো বলে ভেবে থাকে, তবে তাইই থাক তারা। তাইই পাক। এক জীবনে যে যা চায়, তাইই তো পায়। পাওয়া উচিত অন্তত। যে যেমন করে তা পেতে চায়, তেমন করেই পাক।

গাঁড়ি থেকে গিরধারীর জড়ানো গলা ভেসে এলো।

আররে এ বঙ্কু! কিতনা দের লাগেগী শালীকী তৈয়ারী হোনেমে?

বঙ্কু তাকে চুপ করবার জন্যে যেন কী বললো, চাপা গলায়। গাড়ির দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ হলো।

পুলিনবাবু খাটে উঠে বসলেন। পুরোপুরি। পদ্মাসনে বসলেন। একটু পর শবাসন। মনটাকে দু-পায়ের জড়ো-করা বুড়ো আঙুলে সমাধিস্থ করবেন।

তিনু বললো, যা না দিদি। রাত কাবার কইর‍্যা ফিরিস না তা বইল্যা আবার। আমারও ভীষণই ঘুম পাইছে। বাজে লোক একডা। ঐ মালিকডা যাচ্ছেতাই! এমন চটকা-চটকি করছে না। আমি পাল্লা ভ্যাজাইয়া দিয়া শুইয়া পড়ুম।

টাকা? তরে টাকা দিছে?

বিনু শুধোল তিনুকে।

হ্যাঁ। দিবে না ক্যান?

কত দিছে?

পঞ্চাশ! তোরেও তাইই দিবে। যা গিয়া এখন।

তিনু, বিনুকে মিথ্যে কথা বললো।

পেয়েছিল আসলে দুটি পঞ্চাশ টাকার নোট।

মনে মনে হিসেব করল। একটি টু-ব্যান্ড রেডিও আর একটা ক্যাসেট-প্লেয়ার তার কখানা ভাল শাড়ি সায়া ব্লাউজ এবং একজোড়া সোনার বালা এবং একশিশি বিলাইতি ইন্টিমেট পারফ্যুম...। এইসব কেনার টাকা জমতে ও নিজেই ক্ষয়ে যাবে বোধহয়, চন্দন কাঠেরই মতো, ঘর্ষণে ঘর্ষণে।

পুলিনবাবু আবারও শুয়ে পড়লেন। শুয়ে শুয়ে সবই বুঝতে পারলেন। তার ছোট মেয়ে ঘরে ফিরলো, বড় মেয়ে চলে গেলো। গাড়িটার শব্দ যতক্ষণ না মিলিয়ে গেলো ততক্ষণ শুয়েই রইলেন খাটে। মড়ার মতো। শবাসনে। তিনি তো মড়াই।

—এখন মরে গিয়েও যে বাঁচবেন, সে সময়ও আর বাকি নেই। কিন্তু মনটা কিছুতেই দু-পায়ের জোড়া-করা বুড়ো আঙুলে বসে থাকতে চাইছে না।

পাশের ঘরে তিনু শাড়ি বদলাচ্ছিল। শব্দ পাচ্ছিলেন পুলিনবাবু। বিনুর চেয়েও তিনুর ওপরে রাগ অনেকই বেশি হচ্ছিল তার। মাত্র আঠারো বছর বয়স! এই ছোকরা-ছুকরিগুলান কত্ত সহজে নষ্ট হইয়া যায়। কত্ত সহজে! কত্ত সস্তায়! সহ্যশক্তি কত্তই কম অ্যাদের! লোভও কত বেশি। ছিঃ ছিঃ! ওদের মূল্যবোধ পুলিনবাবুদের বোধ থেকে কতই আলাদা।

পূর্ব-বাংলার দেশ থেকে যেদিন ভিটে-মাটি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল পুলিনবাবুর তখন তার বয়স এই তিনুরই মতো আঠারো। বাবাকে কেটে ফেলেছিলো তার পরিচিত মানুষেরা। মাকে বিবস্ত্র করে বাঁশবাগানের পাশ দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো তাদেরি মাঠে, এমন মানুষেরা, যাদের পুলিনবাবু মামা বা চাচা বলে ডাকতেন। মায়ের চিৎকার, "ও খোকন, আমারে বাঁচা"। তারপর "মাইরাই ফ্যালও তোমরা। মাইরাই..."

একটা তীব্র ক্রোধ, অসহায় এক বোবা বোধ কাজ করেছিলো তাঁর ভেতর তখন। অসহায়ের নিষ্ফল ক্রোধ। যা, পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে এই মুহূর্তেও অসংখ্য মানুষের ভিতর

www.BanglaBook.org

কাজ করছে। সেই বোধটাই আজ তেষট্টি বছর বয়সেও কাজ করে যাচ্ছে। তাঁকে প্রতিমুহূর্ত কুরে কুরে খেয়ে যাচ্ছে। কতগুলো অশিক্ষিত, নিপীড়িত, হীনম্মন্যতায়-ভোগা মানুষ যা করতে পেরেছিলো তার বাবার প্রতি, মায়ের প্রতি, তা তিনি কি করে করবেন? ভাবতেই পারেননি। প্রতিশোধ নেবার স্পৃহা পর্যন্ত জাগেনি। তখন ভগবানকে বলেছিলেন, ভগবান! ক্ষমা করে দিও এদের। ভগবান! আমাকে আমার চেয়েও অনেক বড় করে দাও। যেন, ক্ষমা করতে পারি সকলকে।

মারামারি, কাটাকাটি বলাৎকার, চুরি ডাকাতি, এ-সব করার শিক্ষা তো তিনি বাবা-ঠাকুর্দার কাছ থেকে কখনও পাননি! তাই সেই আঠারো বছরের নিঃসম্বল অবস্থা থেকে, আজকের এক অন্যরকম নিঃসম্বল অবস্থাতে পৌঁছতে কত এবং কতরকম কষ্টই যে করতে হয়েছে, তা তিনিই জানেন। কিন্তু কখনওই সম্মান খোয়াননি। মাথা নোয়াননি। মূল্যবোধ হারাননি মোটেই। কষ্টর, সবরকম কষ্টর পরীক্ষাই তিনি পাশ করে এসেছেন। জীবনের এই পর্যায়ে পৌঁছেও তিনি নিজেকে বদলাতে পারলেন না। কিন্তু বদলানো যে দরকার নিজেকে, তা বেশ বুঝতে পারছেন। বিশেষ করে, আজ রাতে। কোনো মানুষেরই পক্ষে চিরদিন গৌতম বুদ্ধ হয়ে থাকা উচিত নয় সারাজীবন মনুষ্যত্ব খুইয়েও।

সারা রাত ঘুম হলো না পুলিনবাবুর। খাটে বসে লুঙিটাকেই চাদরের মতো গায়ে জড়িয়ে জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে নস্যি নিয়ে রাতটা কাটালেন। আওয়াজ পেলেন, রাত তিনটে নাগাদ তাঁর বেশ্যা মেয়েদের মধ্যে বড়জন ফিরে এলো।

ভোরের আলো ভালো করে ফুটতেই দেওয়ালের পেরেকে ঝোলানো পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়ে লুঙি পরেই বেরিয়ে পড়লেন পুলিনবাবু, তখন তাঁর আদরের, গর্বের, তাঁর জীবনের শেষ অবলম্বন বিনু আর তিনু অঘোরে ঘুমোচ্ছিলো।

মাধবের চায়ের দোকানে অনেকে চা খাচ্ছেন। কাগজ আসতে আসতে এখানে বিকেল হয়ে যায়। ট্রানজিস্টর খুলে দিয়েছে মাধব। চা খেতে খেতে আরও অনেকেই এলো দোকানে। পুলিনবাবুকে দেখে মাধব তো অবাক! এই বাগানে অনেক বছর এসেছেন। ডানকানের বাগান থেকে রিটায়ার করার পর একদিনও মাধব দেখেনি পুলিনবাবুকে তার দোকানে আসতে। এতো সকালে তাঁকে দেখে বললো, আরে! আপনি যে বাবু?

পুলিনবাবুর মাথা কাজ করছিলো না। কানদুটি ভোঁ ভোঁ করছিলো।

তবু বললেন মাধবের ওরিজিনাল দেশ রংপুরের ভাষাতেই। বয়স তো হতিছে! এট্টু মর্নিং ওয়াক কইরবার লাগে।

একজন অপরিচিত ভদ্রলোক চা খেতে খেতে অন্যজনকে বললেন, পাঞ্জাব-সমস্যা তো মিটিয়ে দিলেন রাজীব গান্ধী। এবার আসামও মিটবে।

সন্দ আছে। মিটবে কি? আসামকে উনি দেবেনটা কি? চণ্ডীগড়? না, নদীর জল?

প্রথমজন বললেন, তা জানি না। তবে একটা কথা বুঝে ফেলেছি, যদিও বড় দেরী করে বুঝলাম।

কি?

এই পৃথিবী হচ্ছে শক্তর ভক্ত, নরমের যম। এ সর্দারজীগুলো তার মাকে না মারলে ছেলের সুর কি এত নরম হতো? বাংলাতেও তো পার্টিসান হয়েছিলো। আমরা বাঙালিরা না, আমাদের যারা তাড়াইলো তাদের সঙ্গে লড়লাম, না, অন্য কারো সঙ্গেই। মার খেতে খেতে আমাদের ভদ্দরলোকি গুমোর নিয়ে পিছু হটতে হটতে এমন জায়গায় পৌঁছেছি আজ যে, আমাদের এখন পশ্চিমবঙ্গ থেকেও চলে যেতে হয় কি না দ্যাখো!

www.BanglaBook.org

ঠিকই কইছেন। অন্য সক্কলই হইল গিয়া বীরের জাত, আর আমরা হইলাম গিয়া ভীরুর জাত। সক্কলেই চিন্যা ফ্যালাইছে আমাগো।

হাঁটতে হাঁটতে চললেন পুলিনবাবু, চা খাওয়ার পর, কামারের বাড়ির দিকে। বাসস্ট্যাণ্ডের পাশেই তার বাড়ি আর কামারশালা। দিবারাত্র হাপর চলে খপর-খাপর।

রাধু সবেই দোকান খুলে বসেছিলো।

আরে! অ্যাকাউন্ট্যান্টবাবু যে! খবর কি? এত সক্কালে? কোনদিকে আইছিলেন?

তোমারই কাছে।

কন দেহি, কী দরকার? বঁটি বানাইয়া দিমু একখান? কোদাল লাগব নিশ্চয় বাগানের লইগ্যা?

না রাধু। বঁটি বা কোদালে চলব না। একখান রামদা বানাইয়া দাও দেহি। লাইটের ওপর। বেশি ভারী য্যান না হয়! বুঝছো!

কাইটবেন কি, তা দিয়া? তা তো আমারে কইবেন। হেই মতোই বানাইয়া দিমু আনে এক্কেরে ফাসকেলাস কইর‍্যা।

কি যে কাটুম, তা এহনো ঠিক করি নাই। তবে, ঘরে একটা থাকনের দরকার বড়। যা দিনকাল! মানুষই কাইটতে অইবো হয়তো।

তা ঠিকোই কইছেন বাবু। চুরি ডাকাতি তো লাইগাই আছে। চোর-ডাকাইত কাটোনের লগ্যেই বানাইয়া দিমু আনে। লাইটের উপর। ভার অইব না। দুহাতে তুইল্যা বসাইয়া দিবেন। ধড় থিক্যা মুণ্ডুখান সট কইর‍্যা খুইল্যা যাইবো গিয়া!

কবে দিবা রাধু?

তাড়াতাড়িই দিমু।

কবে?

সাতদিনের মধ্যেই দিমু।

সাতদিন? কও কি তুমি? না, না। আমার একদিনের মধ্যেই চাই।

কন কি বাবু? পাঁঠা বাঁইধ্যা থুইছেন নাকি উঠানে। এত্ত তাড়াতাড়ি কিসের?

পেরায় সেই রকমেই। বাঁইধাই থুইছি কইতে পারো।

বললেন, পুলিনবাবু।

তারপর বললেন, নিবা কত, তা কও?

আপনাকে সস্তা কইর‍্যাই দিমু। আইজকাল ইস্টিলের যা দাম! তাও তো র‍্যালকোম্পানির চোরাই-ইস্টিল বইল্যাই এত হস্তায় দিত্যা পারতাছি! তা, একশই দিবেন আনে আপনি।

একশ? এতগুলো টাকা!

চমকে উঠলেন পুলিনবাবু।

তারপরই ভাবলেন, পাক্কা স্টিলের একটা মানুষ-মারা হাতিয়ারই তো? তাঁর মেয়েদের এক একজনের এক-ঘন্টা দু-ঘন্টার ভাড়াই যদি একশো টাকা হয়, তাহলে মাধুর এত পরিশ্রম এবং ইস্পাতের বিনিময়ে একশ'টা টাকা তো বেশি চায়নি। যে করেই হোক জোগাড় করে দেবেন তিনি।

উনি বললেন, দিমু আনে। কিন্তু কাল সন্ধ্যার পরই লাগব আমার।

কাউরে খুনটুন কইরবেন না তো আবার? আপনার ভাব-গতিকে তো আমার ভাল ঠ্যাকতেছে না!

www.BanglaBook.org

হাসলেন, পুলিনবাবু। ম্লান হাসি।

বললেন, খুন-খারাবি যদি কইরতেই পারতাম তাইলে আজ আমাগো কি এই দশা হয় রাধু? আমারই একলার ক্যান, পেত্যেক বাঙালিরই কি আজ এই দশা হইতো?

রাধু কথাটার মানে না-বুঝে চেয়ে থাকলো। কথাটা অস্পষ্ট হলেও তার মন যেন কথাটাতে সায় দিলো।

তার কিছু জিগগেস করার আগেই পুলিনবাবু চলে গেলেন। তাড়াতাড়ি হাঁটার জন্যে লুঙিটাকে উঁচু করে কোমরে বেঁধে নিয়ে।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরতে ঘুরতে নদীর ধারে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়লেন পুলিনবাবু।

তর্জন-গর্জন করা তিস্তা দিয়ে জঙ্গলের কাঠ ভেসে যাচ্ছে। সেই প্রবলবেগে ভেসে যাওয়া বড় বড় গাছের গুঁড়িগুলোকে কী দুঃসাহস এবং পরিশ্রমের সঙ্গে অল্প ক'টি মানুষ তাদের শক্ত সবল হাত আর হাতে-হাতে জড়ানো দড়ি দিয়ে বাঁচিয়ে নিচ্ছে। একটি একটি করে। জীবন বিপন্ন করেও। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন অনেকক্ষণ পুলিনবাবু।

লোকগুলো চেঁচামেচি করছিলো।

উনি শুনলেন, গতকাল ওদেরই মধ্যে একজনকে নাকি নিয়ে গেছে তিস্তা। নেপালী চার পাঁচজন। অন্যরা, ভারতের অন্য প্রদেশের লোক।

ভেসে-যাওয়া কিছুকে বাঁচাতে হলে নিজেদের মধ্যেও কারও কারও ভেসে যাওয়ার জন্যে তৈরি থাকতে হয়ই বোধহয়। ভাবলেন উনি। এমনি করেই, বর্ষার তিস্তার স্রোতেরই মুখে ভেসে-যাওয়া কাঠের মতো একটা পুরো জাত তার ডাল-পালা শিকড়-বাকড় শুদ্ধু ভেসে যাচ্ছে, তাঁর নিজের এবং সমস্ত জাতের চোখের সামনে দিয়েই; অথচ একজনও মানুষ, কী একটাও হাত; তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করলো না। প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করা দূরে থাকুক, একটা আঙুল পর্যন্ত নাড়ালো না কেউই।

ভেসে যাচ্ছে, শুধু পুলিনবাবুর একার সংসারই নয়, পুরো একটা জাতের ভবিষ্যৎ; গত সাঁইত্রিশ বছর ধরে নিশ্চিত সর্বনাশের দিকে।

সময় নেই আর।

শুধু ভিক্ষা চাওয়ার জন্যেই পেটের-রোখা দুটি হাত নিয়েই বোধহয় জন্মেছিলেন পুলিনবাবুরা। ভগবানের কাছে ভিক্ষা, মালিকের কাছে ভিক্ষা, ভিনরাজ্যের ব্যবসাদারদের কাছে ভিক্ষা, নিজের রাজ্যে, নিজেরই রাজধানীতে থেকেও তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে বেঁচে থাকার ভিক্ষা, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ভিক্ষা।

তাঁদের উদাসীন গালে সকলেই চড় মেরে যায়। সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে, ভদ্রতার দোহাই দিয়ে থুথু গেলেন বাঙালি জাতের বুদ্ধিজীবীরা। তাঁরা সকলেই আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠার প্রতিযোগিতাতে সদাই সামিল।

হাত কি পুলিনবাবুদের আদৌ আছে? বা ছিলো? যে-হাত প্রয়োজনে সোজা হয়ে উপরে উঠে সত্যিকারের প্রতিবাদ করতে পারে? যে-হাত, চড় মারতে পারে, যে-হাত নিশ্চিত অন্যায়কারীর গলা টিপে ধরে, শ্বাসরুদ্ধ করে; তার দু-চোখের মণিকে ঠিকরে বাইরে আনতে পারে?

পুলিনবাবুরা এক ঠুঁটো জগন্নাথের জাত।

কোয়ার্টার্সের দিকে ফিরতে লাগলেন তিনি। বাবুলাইনের পাশ দিয়ে। বাঙালি বাবুরা সবাই ঘুমোচ্ছেন এখনও। কে জানে, কখন ভাঙবে এঁদের ঘুম।

চিরঘুমে পেয়েছে সকলকে।

www.BanglaBook.org

আয়নার সামনে

মনে পড়ে, সেদিন লক্ষ্মী পূর্ণিমা ছিল। উত্তর প্রদেশের বন ও পাহাড়-ঘেরা অখ্যাত জায়গা তিতিরঝুমায় বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছিল। আমি কলকাতায় আসছিলাম ছুটিতে। গরুরগাড়ি করে বারো মাইল পথ আসতে হ'ত তখন লাঠিয়ালিয়া স্টেশনে ট্রেন ধরতে।

রাতের গাড়ি ধরব বলে বিকেল বিকেল বেরিয়ে পড়েছি। সঙ্গে চৌহান সাব। খড়ের উপর কম্বল বিছিয়ে তার উপরে বসে ছইয়ে হেলান দিয়ে আমরা গল্প করতে করতে আসছি।

বাইরে ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। কাঁচা রাস্তা, তাই বলদগুলোর পায়ে পায়ে ও গাড়ির চাকায় ধুলো ছিটোচ্ছে, কিন্তু উড়ছে না। কারণ শিশিরে ভিজে ধুলো ভারী হয়ে আছে। দু-পাশে কিতারী ও বজরার ক্ষেত। দূরে বিন্ধ্যাচলের পাহাড়ের রেখা দেখা যাচ্ছে। আদিগন্ত সমান উচ্চতায় একটা দেওয়ালের মত।

ধুলোর গন্ধ, শিশিরের গন্ধ, জ্যোৎস্নার গন্ধ, গরুর গায়ের গন্ধ, খড়ের গন্ধ, শিশির-ভেজা বজরা ও কিতারীর গন্ধ মিলে একটা অদ্ভুত মিশ্র গন্ধ বেরুচ্ছে।

দেখতে দেখতে আমরা টুণ্ডুর মোড়ে পৌঁছলাম। গাড়োয়ান গাড়িটার মুখ ডানদিকে ঘোরাল। এবার আমরা পাহাড়ের সীমানায় তিতিরঝুমার মাঠে এসে পড়লাম। ধু-ধু মাঠের একদিকে পাহাড় আর অন্যদিকে বুটবুটিয়ার খাস জঙ্গল।

রাজিন্দার সিং গরুর গাড়ির পেছনের দিকে বসেছিল। গায়ের উপর আলতো করে ফেলে রেখেছিল একটা দেঁহাতী কম্বল। রঙটা এখনো মনে আছে। সাদার উপরে কালো বড়-বড় চেক। কম্বলের উপর, রাজিন্দরের কাটা-কাটা অথচ ভাবুক মুখে চাঁদের নরম ভিজে আলো এসে পড়েছে। রাজিন্দর পথের পেছনের গাছ-গাছালি, চন্দ্রালোকিত ধু-ধু

www.BanglaBook.org

প্রান্তর ও দূরের পাহাড়ের দিয়ে চেয়ে যেন কি ভাবতে ভাবতে চলেছে।

একটা সাদা লক্ষ্মীপেঁচা পথের পাশের একটা ঝাঁকড়া বাবলা গাছ থেকে উড়ে এসে নিঃশব্দে আমাদের চলমান গরুর গাড়ির উপরে চক্রাকারে উড়তে উড়তে অনেকখানি এলো, তারপর আবার ফিরে গিয়ে সেই গাছে বসলো।

হঠাৎ রাজিন্দার বললো, নিজের মনেই, আমার দিকে মুখ না ফিরিয়েই বললো, কী সুন্দর আমাদের দেশটা, না বেণীবাবু? বড় সুন্দর এই দেশটা। এদেশের মানুষগুলো, মানে আমরা সকলে যদি এই দেশের মতো হতাম?

আমি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, দেশের মতো সুন্দর মানে?

—ও বললো, শারীরিক সৌন্দর্যর কথা নয়। সুন্দর হত যদি সব মিলিয়ে, যদি মানুষের মতো মানুষ হতো!

—মানুষের মতো মানুষ মানে তুমি কি বলতে চাইছ? মানুষ তো আমরা সকলেই। কি? আমরা মানুষ নই?

—রাজিন্দার আমার দিকে মুখ ফেরাল এবার, বললো, কই? দেশে মানুষ কই? মানুষের মতো মানুষ কই?—আমরা সকলেই, বেশির ভাগই তো মানুষের ছাঁচ মাত্র। কিছু বদ রক্ত, কিছু জল, কিছু মেদ, কিছু অস্থিচর্মের সমষ্টি। কতগুলো ছাঁচে-ফেলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জঞ্জাল। এই কোটি-কোটি লোকের মধ্যে মানুষ ক'জন আছে বল?

গরুর গাড়িটা একটা কালভার্টের দিকে এগোচ্ছিল।

হঠাৎ গাড়োয়ান চাপা ভয়ার্ত গলায় বললো, কালভার্টের উপরে মাথা-মুখ চাদরে ঢেকে কয়েকজন লোক বসে আছে। মনে হচ্ছে ডাকাত।

এই তিতিরঝুমার মাঠ ডাকাতির জন্যে কুখ্যাত। ডাকাত অবশ্য আমার কাছে নেবেই বা কি? তবে জামা-কাপড় ও গত এক বছরে সামান্য মাইনে থেকে যা সঞ্চয় করেছি সবই সঙ্গের স্যুটকেসে আছে, নিয়ে গেলেই গেল।

গাড়োয়ান গাড়িটাকে ভয়ে দাঁড় করিয়েই ফেললো।

রাজিন্দার ধমক দেওয়ার গলায় ওকে শুধোল, রোকা কিউঁ?

গাড়োয়ান উত্তরে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, হুজৌর।

রাজিন্দার ধমকে একটা গাল দিয়ে বললো, তোর ভয়টা কি? তোর না আছে বুকের ভিতরে কিছু না বাইরে কিছু—তোর আবার ডাকাতের ভয় কি রে শালা? তারপরই বলল, গাড়ি হাঁকা। সোজা হাঁকিয়ে ওদের সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করা। তারপর ওদের দেখাচ্ছি। ওরা জানে না, গাড়িতে আমি আছি।

দেখতে দেখতে গাড়িটা প্রায় কালভার্টের কাছাকাছি পৌঁছে গেলো। ভয় যে আমার একেবারে করছিলো না, তা নয়, ভয় লাগলেও রাজিন্দর সঙ্গে থাকলে ভয় আবার লাগেও না।

গাড়িটা থমকে দাঁড়াল। গাড়িটা দাঁড়াতে দেখেই লোকগুলো উঠে দাঁড়াল।

প্রত্যেকে ছ'ফুটের উপর লম্বা। এ অঞ্চলের কোন লোকই বোধহয় ছ'ফুটের কম নেই। পরনে সব মালকোঁচা-মারা ধুতি, দেহাতী খদ্দরের জামা, গায়ে ভারী দেহাতী চাদর। পায়ে নাল-বসানো নাগরা জুতো। হাতে সাত ফুট লম্বা কোঁৎকা কোঁৎকা লাঠি।

রাজিন্দার তার গম্ভীর কিন্তু চিলের মতো তীক্ষ্ণ গলায় একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল ওদের দিকে। বলল, তু লোগ কওন হো, হো?

www.BanglaBook.org

ওরা সমস্বরে হেসে উঠলো।

সেই চাঁদের আলোয় তিতিরঝুমার মাঠে দাঁড়ানো আপাদমস্তক ঢাকা লোকগুলোকে ভৌতিক বলে মনে হলো।

ওরা হেসে বললো, তেরা বাপ হো।

রাজিন্দর নিরুদ্বেগ ঘৃণা-ভরা গলায় বললো, তু লোগ সব কুত্তে হো কুত্তে। তারপরেই ওদের সকলের সহোদরাদের প্রতি অশ্লীল একটা উত্তরপ্রদেশীয় উত্তপ্ত উক্তি করে বললো, জানসে বাঁচনে চাহতে ত আভভি রাস্তে ছোড়ো, নেহি তো সব শালে লোঁগোকো গোলিসে ভুঞ্জ দিয়া যায় গা।

লোকগুলো নড়লো না। যেমন দাঁড়িয়েছিলো, তেমনি দাঁড়িয়েই রইলো।

বলদ দুটো নিরুদ্বেগ চোখে লোকগুলোর দিকে চেয়ে জাবর কাটতে লাগলো।

রাজিন্দর তেমনি বসে বসেই একটুও উত্তেজিত না হয়ে, একটুও না নড়ে বললো, ম্যায় কই বাঁতে দোবারা নেহি কহতা হুঁ। রাস্তে ছোড়ো কুত্তেকো বাচ্চে।

হঠাৎ লোকগুলোর মধ্যে একটা চমক খেলে গেলো। জলের তলায় চমকে-ওঠা এক ঝাঁক মাছের মতো ওরা দলবদ্ধ হয়েই নড়ে উঠলো। তারপর সেই জ্যোৎস্নার মধ্যে ওরা পথ ছেড়ে বুটবুটিয়ার জঙ্গলের দিকে নিঃশব্দে চলে যেতে লাগলো।

—ওদের মধ্যে কে যেন চাপা শ্রদ্ধামিশ্রিত গলায় বলে উঠলো, চৌহান সাব।

আর একজন বললো, জলদি ভাগ। আজ জানসে বাঁচ গ্যয়ে।

স্টেশনে পৌঁছে আলো-ঝলমল ওভারব্রিজ পেরোবার সময় আমি ভাল করে তাকালাম রাজিন্দরের দিকে। পায়জামা আর সবুজ খদ্দরের পাঞ্জাবী-পরা সুপুরুষ ভাল মানুষ দীর্ঘদেহী রাজিন্দরকে দেখে কে বিশ্বাস করবে যে, একটু আগে ডাকসাইটে ডাকাতের দল তার নাম শুনেই পালিয়ে গেছে।

একটু পর রাজিন্দর চলে গেলো।

ট্রেন এলে উঠে পড়লাম। প্রথমে বসার জায়গাও ছিলো না। এক স্টেশন পরে জানালার পাশে একটা চেয়ার খালি হলো। বসে পড়লাম।

জানালায় বসে বসে ভাবতে লাগলাম। ভাবনার পাখি নানা জায়গা ঘুরে এসে আবার রাজিন্দরের দাঁড়ে বসলো।

আমার পরিচয় দেবার মতো কিছুই নেই। নানারকম কসরৎ করে টুইশানি করে কোনোরকমে বি-এস-সি-টা পাশ করেছিলাম। এই নয় যে আমার অবস্থা স্বচ্ছল হলেই আমি মেধাবী হতাম। মেধাবী আমি কোনোকালেও ছিলাম না। কোনোরকমে না টুকে সাধারণভাবে বি-এস-সি-টা পাশ করেছিলাম। তারপর এই বিশ্বটাড় জায়গায় একটা লাইমস্টোন কোয়ারীতে চাকরি নিয়ে আসি। বিয়ে-টিয়ে করা হয়নি প্রধানত সচ্ছলতার অভাবে, দ্বিতীয়ত সাহসের অভাবে। বিধবা মার খরচ ও আমার খরচ চলে যায় কোনোরকমে, যা পাই তাতে। রোজকার দিনের কথা ভেবেই দিন চলে যায়। কখনো নিজের চাকরি, নিজের মালিক, নিজের মা, নিজের বন্ধুবান্ধব এসবের বাইরের কোনো ভাবনা মাথায় স্থান দিইনি। বরাবর জেনেছি যে, এসবের বাইরে যে-কোনো ভাবনাই 'বড় ভাবনা'। যা আমাকে মানায় না।

গত এক বছর হলো রাজিন্দরের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে আমার মাথায় যেন ভাবনার ভূত চেপেছে। আমাদের দেশের কথা, আমার দেশের লোকের কথা, ঘুরে ফিরেই

www.BanglaBook.org

মনে পড়ে যায়। হয়ত রাজিন্দরের সঙ্গ-দোষেই এমন হয়েছে, ও সব সময় বলে, কোনো ভাবনাই বড় ভাবনা নয়। আমরা সকলেই এ ভাবনাগুলোকে পরের ভাবনা বলে এড়িয়ে যাই বলেই ত আমাদের দেশের এই দশা।

ও বলে, এ পোড়া দেশ আমার তোমার প্রত্যেকের কাছে কিছু-না-কিছু আশা করে।

অথচ ভাবলে আশ্চর্য লাগে যে, রাজিন্দর যে পরিবেশে থাকে, যেভাবে থাকে, ওর যা সঙ্গীসাথী, তাতে ও এত সব কথা ভাবে কি করে?

ও কোনো পার্টি করে না, ওর নেতা হবার কোনো আকাঙক্ষা নেই, এম. এল. এ. বা এম. পি. ও হতে চায় না। অথচ ও সব সময় এমন সব ভাবনা ভাবে, এমন সব কাজ করে, তা সাধারণ বুদ্ধিতে ওর এক্তিয়ারের বাইরে থাকা উচিত।

রাজিন্দরের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে আমার জীবনের মানে যেন বদলে গেল। জীবন মানে যে শুধুই চাকরি করা নয়, শুধুই নিজের পোস্ট অফিস সেভিংস অ্যাকাউন্টের দিকে চোখ চেয়ে থাকা নয়, নয়, নিজের স্ত্রী নিজের ছেলেমেয়ের গণ্ডীর মধ্যে দিন কাটানো, তা যেন ওকে দেখে আমি আস্তে আস্তে শিখছি। ওকে যতই দেখছি, ততই ওর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে আসছে। কেবলি আমার মনে হয়, রাজিন্দরের মতো গোটা কয়েক লোক এ দেশে থাকলে এ দেশের চেহারাটা বুঝি অন্যরকম হত।

রাজিন্দরের সঙ্গে আমার আলাপটা একটা দুর্ঘটনা বই আর কিছুই নয়। কারণ, এই জঙ্গল-পাহাড়-ঘেরা নির্জন প্রবাসে আমার ডেরা থেকে তিন মাইল দূরে গভীর জঙ্গলাকীর্ণ উপত্যকার মধ্যে এককালীন এক অত্যাচারী জমিদারের বিনয়ী ও সাহসী পুত্রের সঙ্গে আমা হেন একজন বাঙালি খনি-বাবুর পরিচয়কে দুর্ঘটনা ছাড়া আর কি বলতে পারি?

বাবা মারা যাবার পর বাবার বন্দুকটা আমার নামে ট্রান্সফার করিয়ে নিয়েছিলাম।

মাছের রক্ত দেখেই আমার মন খারাপ করে, তাই বন্দুকে রক্ত লাগাবার অভিপ্রায়ে আমি ওটাকে সঙ্গে নিয়ে এখানে আসিনি। কিন্তু এখানে আসার পরই আমার বেয়ারা ধক্কনলাল কেবলি আমাকে উস্কানি দিতে লাগল, সাহাব একঠো বরহা মারকে দিজিয়ে।

শ্রীমান ধক্কন আমাকে নিয়ে এক রবিবারে খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের ডেরা থেকে মাইল দুয়েক হাঁটিয়ে নিয়ে পাহাড়ের মালভূমির একেবারে এক কোণায় এনে দাঁড় করাল।

সেই মুহূর্তে সে জায়গায় দাঁড়িয়ে নীচের দিকে চোখ পড়ায় আমি আমার অতীত ভবিষ্যৎ সব কিছুর কথা বিস্মৃত হয়ে চুপ করে তাকিয়ে রইলাম।

আমি কলকাতার গলিতে ক্যাম্বিসের বল দিয়ে ক্রিকেট খেলেছি, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলা দেখতে গিয়ে জামা ছিঁড়ে, জলে-ভিজে, মাউণ্টেড পুলিশের তাড়া খেয়ে বাড়িতে ফিরেছি, পাশের বাড়ির ফার্স্টইয়ারে-পড়া মেয়ে রুমাকে নিষ্ফল প্রেমপত্র লিখে ইঁট বেঁধে ছুঁড়ে দিয়েছি। এই সবই আমার অভিজ্ঞতার অভিধানে ছিল অ্যাডভেঞ্চারের পরাকাষ্ঠা। এই নিসর্গ দৃশ্যের সৌন্দর্য এবং ভয়াবহতার সম্মুখীন হওয়ার মতো কিছু যে এ-দেশে থাকতে পারে, এমন ধারণাও আমার ছিলো না।

আমি বহুক্ষণ বন্দুক কাঁধে স্তব্ধ হয়ে সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

জায়গাটা বেহড় মতো। মালভূমি এখানেই শেষ হয়ে গেছে—তার নীচে এক বিস্তীর্ণ সবুজ উপত্যকা। উপত্যকার তিনদিক পাহাড়ঘেরা, একদিকের শেষ দেখা যায় না। ছোট-ছোট টিলা আর ঝোপ-ঝাড় ঝাঁটি-জঙ্গলে উপত্যকাটি ভরে আছে। পাহাড়ের কোলে কোলে নেমে এসেছে গভীর জঙ্গলের সবুজ রোমশ হাত। সময়টা বর্ষাকাল ছিল। পাহাড়

www.BanglaBook.org

থেকে নেমে-আসা তিন চারটি নালা উপত্যকাটিকে কাটাকুটি করেছে।

একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। কিন্তু এখন বর্ষার উজ্জ্বল রোদ, পাহাড়, নদী এবং উপত্যকার নরম হালকা সবুজ মখমলের মতো ঘাসে বেঁকা হয়ে এসে পড়েছে। এখানে-সেখানে একদল নীলগাই ইতস্তত ঘুরে ঘুরে, খুঁটে খুঁটে ঘাস খাচ্ছে। রোদের লাল, উপত্যকার সবুজ, নীলগাইয়ের মেঘ-মেঘ রঙ এবং আকাশের নীল সব মিলে মিশে কী যে এক অপূর্ব ছবির সৃষ্টি হয়েছে কী বলব।

একঝাঁক টিয়া যৌবনের দূতীর মতো পুলকভরা ডাক দিতে দিতে, সে ডাক আমার মাথার মধ্যের সমস্ত কোষময় ছড়িয়ে দিয়ে এতবছরের সমস্ত শ্যাওলাধরা জমে-থাকা অসাড় ভাবনাকে ছিটিয়ে দিয়ে, কী যেন এক নতুন অনাস্বাদিত অনাঘ্রাত সবুজের রাজ্যে আমাকে হাতছানি দিয়ে নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেল।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ধক্কনলাল বলল, ঈ সব চৌহান সাহাবকা এলাকা হ্যায় হুজৌর। চলিয়ে, হামলোগ উঁহিয়ে পর চলেঙ্গে।

পাকদণ্ডী পথ দিয়ে উপত্যকার মধ্যে নেমে পড়ার পর বুঝলাম জায়গাটা কতখানি সুন্দর, আর কত ভয়াবহ।

উপরে দাঁড়িয়ে শুধু চোখে যতটুকু দেখা যায়, ততটুকুই দেখেছিলাম। নীচে নেমে এসে আমার চোখের সঙ্গে ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ও ঝুমঝুমির মতো আনন্দে বাজতে থাকল। পৃথিবীতে যে এতো ভালোলাগা আছে, যে এমন সুন্দর জায়গা আছে, চৌহান সাহেবের এলাকার মধ্যে ঢুকে না পড়লে বুঝি জানতে পেতাম না।

প্রায় মাইল খানেক হেঁটে গিয়ে আমরা একটা বড় বজরার ক্ষেতের কাছে এলাম। তখন রোদের তেজ যে শুধু পড়েছে তাই-ই নয়, আকাশে আবার মেঘের ঘনঘটা শুরু হয়েছে।

ক্ষেতের পাশে একটা টিলা। ছোট টিলা, তার মাথায় একচালা খাপরার একটি ঘর। টিলায় উঠতে উঠতে ধক্কন ডাকল, এ বাজীরাও, বাজীরাও ভাইয়া।

বাজীরাও নামধারী লোকটি বেরিয়ে এল, এসেই পরনাম জানিয়ে একটা চারপাই বের করে বসতে দিল। তারপর একটু দেহাতী গুড় আর জল খেতে দিল।

বললো, সন্ধ্যে হবার সঙ্গে সঙ্গেই শুয়োর আসবে বজরা ক্ষেতে।

বাজীরাওই বললো, শুয়োর ত একটা-দুটো আসে না বাবু, দল বেঁধে আসে। এখনো সময় আছে, রাজিন্দরবাবুর ওখানে গিয়ে চা-টা খেয়ে আসুন, আর রাজিন্দরবাবুকেও নিয়ে আসুন, যাঁর জন্যে আমরা এখানে আছি এবং বেঁচে আছি।

বাজীরাও-এর বাড়ি থেকে আধ মাইল আসতেই দূর থেকে চোখে পড়ল একটা প্রাচীন গড়ের মত বাড়ি। দেখলে রাজবাড়ি বলে মনে হয়, এখন ভেঙে গেছে, রঙ উঠে গেছে কবে যেন, বৃষ্টিতে রোদে এককালীন প্রাসাদে এখন আবার পাহাড়ের নিজের রং ফিরে এসেছে।

বাড়িতে ঢুকে মনে হলো না কোনো লোক থাকে বলে, তারপর বাইরের চত্বর পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই দেখা গেল অন্য চেহারা। অনেক লোক কাজ করছে। নানারকম কাজ। কেউ গোরুকে খাবার দিচ্ছে। কেউ শুকাতে দেওয়া বীজ ঘরে তুলছে, কেউ সারের বস্তা সাজিয়ে রাখছে।

আমাদের দেখে ভিতর থেকে একজন দীর্ঘদেহী সুপুরুষ বেরিয়ে এলেন। পরনে

www.BanglaBook.org

মালকোঁচা-মারা ধুতি, তার উপর খদ্দরের পাঞ্জাবী। আপ্যায়ন করে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন চারপায়ার উপর। চারপায়াটা বাজীরাও-এর চারপায়ের চেয়ে কিছুমাত্র ভাল নয়। তবে তাতে ছারপোকা ছিল, এতে নেই, তফাৎ এই।

সব শুনে উনি হাসলেন। বললেন, আপনাকে এখন ছাড়া হচ্ছে না। শুয়োর অন্য লোক মেরে দেবে। আমি তাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনার আজ এখান থেকে যাওয়া চলবে না। এখানে অতিথি এলে তাকে ছাড়া হয় না।

সেই একরাত ছিলাম চৌহান সাহেবের সঙ্গে। তাঁর ব্যবহার, অন্যদের সঙ্গে তাঁর আচরণ, তাঁর অতিথিপরায়ণতা এ সব কিছু ছাপিয়ে যে কথাটা আমার মনে সে রাতে চিরদিনের জন্যে দাগ কেটে বসেছিল তা হচ্ছে যে, চৌহান সাহেব একজন আদি ও অকৃত্রিম মাটির লোক, এই দেশের লোক, একজন খাঁটি লোক।

এমন লোক আমাদের দেশে সচরাচর দেখা যায় না।

সেই এক রাতের আলাপেই চৌহান সাহেব আমার কাছে রাজিন্দর হয়ে গেলেন।

সেই দিনের পর প্রায় প্রতি সপ্তাহের শেষেই ওখানে গিয়ে থেকেছি, খেয়েছি-দেয়েছি আর দিনে দিনে শ্রদ্ধা বেড়েছে আমার লোকটার উপর। মনে হয়েছে, লোকটা ছদ্মবেশী সাধু। একটা খেয়ালি প্রতিভা, যে, তার সারা জীবন তার আশপাশের লোকের জন্যে, তার সুন্দর দেশের জন্যে উৎসর্গ করবে বলে মনস্থ করেছে। পায়রা-ওড়ানো বাইজী-নাচানো পিতা-পিতামহর বংশধর হয়ে লোকটা এমন অদ্ভুত হলো কি করে ভাবলেও অবাক লেগেছে। কিন্তু দিনে দিনে তার আকর্ষণ আমার কাছে শুধু দুর্নিবারই হয়ে উঠেছে।

এবারে কলকাতা যেন অসহ্য লাগছিলো, অথচ কখনো ভাবিনি যে কলকাতা খারাপ লাগতে পারে আমার। বাসের জন্যে ধর্মতলায় অপেক্ষা করতে করতে, থলে-হাতে বাজারে গুঁতোগুঁতি করতে করতে ভিড়ের চাপে, ডিজেলের ধোঁয়ায়, লক্ষ লোকের ঘামের গন্ধে অতিষ্ঠ হতে হতে কেবলি ভেবেছি কবে আবার ফিরে যাবো—তিতিরঝুমার মাঠে বুটবুটিয়ার জঙ্গলে এবং রাজিন্দরের সেই স্বপ্নময় উপত্যকায়।

BanglaBook.org

ফিরে এসেই সে সপ্তাহেই রাজিন্দরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ওরও যেন অনেক কথা জমে ছিল। কত কথা যে দুজনে বললাম, তার ঠিক নেই।

রাজিন্দর বললো, খুব একটা ভাল খবর আছে। পিয়াসা নদীর উপর ড্যাম বানানো হচ্ছে। এখানের জননেতাদের, মুরুব্বীদের ধরাধরি করে অনেক কষ্টে রাজী করিয়েছি। আর মাসখানেকের মধ্যেই কাজ আরম্ভ হয়ে যাবে। এই ড্যামটা হয়ে গেলে আমার এই পুরো এলাকার আর দুঃখ থাকবে না।

মুশকিল কি জানো বেণীবাবু, লোকগুলোর আত্মসম্মান-জ্ঞান নেই। বেশির ভাগ লোকেরই নেই। না বড়লোকের, না গরিবের, না শিক্ষিতের, না অশিক্ষিতের। আত্মসম্মান না থাকলে কি নিয়ে বাঁচব আমরা বল?

পিয়াসা নদীর উপর দশ লাখ টাকা খরচ করে যে ড্যাম তৈরি হবে তার কনট্রাক্ট পেয়েছেন পাণ্ডেবাবু। রনধীর পাণ্ডে। পাণ্ডেবাবুর বয়স বেশি নয়। চল্লিশের নীচে, কিন্তু এ বয়সেই তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। স্টেশনের কাছে তাঁর প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ির ন্যাংটা ও রঙিন ফ্লুরোসেন্ট বাতিগুলো পথে যেতে আসতে চোখে পড়ে। একটা ইটের ভাঁটাও করেছেন। উত্তরপ্রদেশ সরকারের ইন্ডাস্ট্রিজ ডিপার্টমেণ্টে ঘোরাফেরা করছেন

www.BanglaBook.org

কিছুদিন হলো একটা সুগার মিলের লাইসেন্স যোগাড় করার জন্যে। এ অঞ্চলে আখ [কিতারি] প্রচুর পরিমাণে হয়। পিয়াসা নদীর ড্যাম হয়ে গেলে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে কোনো চিন্তা নেই। এখানেই একটা ছোট জেনারেটিং স্টেশন হবে। তারপর সেচের জল এবং বন্যা নিবারিত হলে চাষের পরিমাণও অনেক বেড়ে যাবে।

এ ক'দিন হলো পাণ্ডেবাবুর কাছে প্রায় রোজ যাতায়াত করছে রাজিন্দর। ওর খুব আনন্দ। এখানে ড্যাম হবে, সুগার মিল হবে, মিলের চিমনি দেখা যাবে দূর থেকে। সকাল-বিকেলে বুকের মধ্যে আনন্দের বাঁশী বাজিয়ে মিলের সাইরেন বাজবে। দলে দলে লোকে কাজ করতে যাবে। অসংখ্য বেকার লোক, অর্ধ-নিয়োজিত লোক, বসে বসে হাড়ে মরচে-পড়ে-যাওয়া লোক চাকরি পাবে। মিল ছুটির পর সাইকেলের ঘন্টি বাজবে ক্রিং ক্রিং করে। ওরা সব ওদের সম্মানের রুজি-রোজগার করে, মেহনত করে টাকা আনবে ঘরে। সন্ধ্যের পর আগুনের পাশে গোল হয়ে বসে বাজরার কেন, তখন গমেরই রুটি খাবে। সপ্তাহে এক দু-দিন ভাতও খেতে পারে। ওদের কোয়ার্টার গড়ে উঠবে, খেলার মাঠ, হাসপাতাল, স্কুল, সব কিছু হবে। রাজিন্দর বলে, সব হবে, হবে না কেন? সব হবে। বিশ্বাস থাকলে, আত্মসম্মান থাকলে সব হয়, অপেক্ষা করতে হয়, তার জন্যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, এবং এ-সব করলে যা হবার তা হয়ও।

রাজিন্দর আজকাল প্রায়ই শহরে যায়—। যাতায়াতের পথে আমার এখানে কখনো সখনো থামে। মাঝে মধ্যে আমার বাঙালি রান্না খেয়ে যায়।

সত্যি কথা বলতে কি, রাজিন্দরের সঙ্গে মেশার পর আমি অনেক বেশি কর্তব্যনিষ্ঠ হয়েছি। আসলে দোষটা আমার রক্তের। বাবাকে ছোটবেলা থেকে শুনেছি, বাড়ি ফিরে মাকে রসিয়ে গল্প করতে, সেদিন কি করে বড় সাহেবকে ধোঁকা দিলেন, কি করে অফিসের চেয়ারে কোট ঝুলিয়ে রেখে দুপুরে ম্যাটিনী শো দেখে এসে আবার বিকেলে ওভারটাইম করতেন। বাবা মাইনেও তেমন পেতেন না অথচ রুপো বাঁধানো হুঁকোয় হুঁকো খেতেন, সিল্কের জামার উপর গরমে তসর ও শীতে জামেয়ার কোট পরতেন, দুবেলা মাছ ছাড়া আমরা কখনো খাইনি, এবং বাবা রিটায়ার করার আগেই উত্তর কলকাতার এক অজ্ঞাত পল্লীতে একটা ছোটখাট বাড়িও করে ফেলেন। বাবা প্রায় রোজই বলতেন, ওঁর অফিসের সাহেবদের সম্পর্কে, শালারা আমার দাম বুঝল না। তাই নিজেই দাম করে নিতে হলো।

স্কুল-কলেজে ক্লাস কাটাকে বরাবরই বাহাদুরী বলেই জেনেছিলাম। পরীক্ষার প্রশ্ন বেছে বেছে পড়ে ও পরীক্ষার পনেরোদিন আগে তা মুখস্থ করে কোনোরকমে পাস করে যাওয়াটাই বুদ্ধিমত্তার পরম উৎকর্ষ বলে বিশ্বাস করেছিলাম। এখানে চাকরি পাওয়ার পর মোটাসোটা ভালো মানুষ মালিক যখন বললেন, দেখিয়ে বেণীবাবু, বাঙালিদের আমি বহত পসন্দ করি। আপনাদের মাথা সাফ আছে। আপনারা ইমানদারও আছেন। এই লাইমস্টোনের কারবার আপনার ওপরে থাকল। আমি দেখতে পারব না। আমার সময় নেই। ভাল করে দেখলে আপনারই থাকলো, ভাল করে না দেখলে, লোকসান হয়ে উঠে গেলে আপনার চাকরিটাও কোম্পানির সঙ্গে সঙ্গে যাবে।

তখন মাথা নেড়েছিলাম, মনে মনে বলেছিলাম, হ্যাঁরে শালা, সব জানা আছে। মুনাফা ভাল হলে কত দিবি আমাকে? তোর জন্যে আমি এত সব করতে যাব কেন? কি দরকার আমার? চাকরি করি, চাকরি রক্ষা করতে যতটুকু মিনিমাম এফর্টের দরকার তাই-ই করবো। তার বেশি একটুও না।

www.BanglaBook.org

.কিন্তু তখন আমার একবারও মনে হয়নি যে চাকরিটা ত শুধু চাকরিই নয়, সেটা আমার ক্ষমতা, আমার কৃতিত্ব প্রদর্শনের একটা ক্ষেত্রও ত বটে। আমি যে পারি, আমি যে ভালো করে পারি, এটা ত আমার নিজেরই জানা উচিত। তাছাড়া, পরের জিনিস যত্ন করে, নিজের ভেবে, যদি না বাড়াই, না বড় করি, তবে যদি কখনো নিজের কোন জিনিস হয় তাই-ই বা রাখব কি করে? তখন আমার একবারও মনে হয়নি, যে ফেল করতে করতে বেঁচে-যাওয়া আমি বড় পিসেমশাইর দৌলতে এই চাকরিটা পেয়ে কী দারুণ হতাশার হাত থেকে মুক্ত হয়েছিলাম।

এবারেও ছুটিতে গিয়ে কলকাতায় দেখলাম আমার সঙ্গে পাশ-করা আমার কতো মেধাবী সহপাঠীরা এখনো সাঙ্গুভ্যালী রেস্টুরেন্টে ডাবল-হাফ চায়ের অর্ডার দিয়ে সিগারেট হাতে একগাল খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে বসে আছে। পরীক্ষা পাশের চার বছরের মধ্যেও বেচারীদের কোনো চাকরি জোটেনি। অথচ ওদের পিসেমশাই ছিলো না এবং আমার ছিলো। তাই ওরা.পড়াশুনায় আমার চেয়ে অনেক ভালো হয়েও আজও ওরা বেকার।

আসলে রাজিন্দর ঠিকই বলে, বলে যে এদেশে যার চাকরি আছে, ব্যবসা আছে, কিছু একটা করার আছে, তাদের তা ভালো করে না-করাটা একটা ক্রিমিনাল অফেন্স।

এবার ছুটিতে গিয়ে যে-রুমাকে একদিন ইটের টুকরো মুড়ে প্রেমপত্র ছুঁড়েছিলাম, সেই রুমাকে দেখলাম। আমার সুন্দরী প্রেয়সী কেমন বুড়ি হয়ে গেছে।

বি. এ. পাশ করে, পাড়ার করপোরেশন প্রাইমারী স্কুলে একটা চাকরি পেয়েছে। আমি যখন ওকে প্রেমপত্র দিয়েছিলাম ও তখন সাধন সরকার বলে আমাদেরই বন্ধু, পাড়ার একটি ছেলের সঙ্গে প্রেম করছিল। সাধন আমার সঙ্গে পড়ত। বরাবর পড়াশুনায় ও আমার চেয়ে অনেক ভাল ছিলো, চেহারাও অনেক সুন্দর ছিলো। পড়াশুনায় ভাল ছিলো, কিন্তু এমন ভাল ছিলো না যে ন্যাশনাল স্কলারশিপ পায়। কোনো টেকনিক্যাল লাইনেও যেতে পারেনি পয়সার অভাবে। তাই সাধনও সাঙ্গুভ্যালির অন্যদের একজন হয়ে গেছিলো। পুজোর সময় সাধন প্যাণ্ডেলের পাশে প্রতি বছর তেলে-ভাজার দোকান দেয়, এই অপরাধে নাকি রুমা তার সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলো।

শুনে আমার এতো ভাল লাগল সাধনের জন্যে এবং এতো খারাপ লাগলো রুমার কথা ভেবে যে কি বলবো।

আমাদের বাঙালি মেয়েরা কবে যে সাধনের মতো ছেলেদের বুঝবে, ভালবাসতে শিখবে, তা জানি না।

আমার সাধনের জন্যে খুব গর্ব হলো। সেই সমস্ত ছেলেদের জন্যেই হয়, যারা পড়াশুনা শিখেও এঞ্জিনিয়ার হয়েও এই হ-য-ব-র-ল দেশে চাকরি না পেয়ে অন্য কিছু একটা করে; করার চেষ্টা করে। ফুটপাতে হাঁটতে হাঁটতে এদের দেখে যেমন গর্ব হয়, তেমন নিজে. জন্যে লজ্জায় মাথা নুয়ে আসে।

আমি এই বেণীমাধব সেনগুপ্ত আমার চেয়ে অনেকানেক গুণ ভাল ছেলেদের বঞ্চিত করে শুধু পিসেমশায়ের জন্য আজ যথেষ্ট ভাল আছি। এ লজ্জার কথা.নয়? নিশ্চয়ই লজ্জার কথা। তাই, চাকরিটা যখন পেয়েইছি, তখন চাকরি পাওয়ার প্রক্রিয়ার লজ্জাটাকে আমি আমার কাজের গর্ব দিয়ে অন্তত ঢেকে রাখতে চেষ্টা করি।

জানিনা, হয়ত, প্রত্যেকের জীবনের ট্রায়াল ব্যালান্সেই কিছু গরমিল থাকে। গরমিল-ওয়ালা ট্রায়াল ব্যালান্স নিয়ে সকলকেই শুরু করতে হয়। তারপর চেষ্টা করতে হয় তা মেলাতে। যে, সেই গরমিল মিলিয়ে তার জীবনের ব্যালান্স শীটকে শেষ পর্যন্ত মেলাতে

www.BanglaBook.org

পারে সেই সার্থক, সেই একমাত্র বেঁচে থাকার অধিকারের অধিকারী।

কেন জানি না, রাজিন্দরের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে আমার কেবলি মনে হয়, সারা জীবন গোঁজামিল দিয়ে চালানো যায় না। প্রত্যেকের জীবনেই প্রত্যেককে কতগুলো সরল সত্যকে ভণ্ডামিহীন ঋজু মেরুদণ্ডের সঙ্গে এক সময় গ্রহণ করতে হয়। বাইরের কোনো লোক বা কোনো শক্তির সঙ্গে লড়তে না হলেও প্রত্যেক মানুষকেই জীবনের কোনো-না-কোনো সময়ে নিজের সঙ্গে দারুণভাবে লড়তে হয়। সে লড়াই বাইরে থেকে দেখা যায় না, অথচ ভিতরে তার ঢেউ উথাল-পাথাল করে।

রুমা পর পর তিনদিন এসেছিলো আমাদের বাড়িতে। রুমার চোখে একটা আকুতি দেখেছিলাম। যেন ও বলতে চায় সেই ইটের টুকরো মোড়া আমার চিঠিটিই ওর জীবনে সত্যি। আর সাধন? সাধন সরকার মিথ্যা, মিথ্যা। কারণ সে ফুটপাথে তেলে-ভাজার দোকান দেওয়ার মতো সৎসাহস রাখে।

অথচ আমি এমন কুকুর যেন, একটু হলে বলেই ফেলতাম রুমাকে কিছু। একবার বললেই রুমা এক্ষুনি আমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়। ওকে সে কথা বলার লোভ আমি অনেক কষ্ট করে সামলেছিলাম।

আমি কি মানুষ? যে-চাকরিতে আমার যোগ্যতানুসারে অধিকার নেই, যে মেয়েকে আমি সুস্থ প্রতিযোগিতায় জয় করতে পারিনি, তাকে কিনা আজ সেই চাকরির জোরেই আমি পেতে চাই?

ওখানে সাধনকে কিছু বলতে পারিনি। ওকে যদি বলতাম, বাইরে চাকরি করবি? আমি যেখানে করি? হয়ত হাসত, ভাবত আমি চালিয়াতি করছি। তাই কিছু বলিনি।

কিন্তু ফিরে এসেই আমি ওর আর রুমার কথা খুব ভাবছি। আমার খুব ইচ্ছা করে, আমি সাধনের জন্যে একটা মোটামুটি চাকরি যোগাড় করে দিয়ে ওকে এবং রুমাকে লিখি এখানে চলে আসতে বিয়ে করে। জীবনে করার মতো কিই বা করলাম এ পর্যন্ত? এমন কিছুই কারো জন্যে করিনি, স্বার্থ ছাড়া, পারিশ্রমিক ছাড়া। এই একটা সৎকর্ম যদি করতে পারি তাহলেও কিছু একটা করা হয়।

যদি সত্যিই যা ভাবছি তা করতে পারি তবে পরের পুজোয় কলকাতা যেতে আমার দারুণ লাগবে।

পুজোর দিন রুমার সঙ্গে দেখা হবে। বড় করে সিঁদুরের টিপ পরবে রুমা। নতুন তাঁতের শাড়ি পরবে। সাজবে-গুজবে। ওর নতুন তাঁতের শাড়ির গন্ধের সঙ্গে আমার মনের স্বার্থহীন, কলুষহীন আনন্দের গন্ধ একাত্ম হয়ে যাবে। ভাবতেই ভাল লাগে।

আমার কোম্পানির মালিক এইখানে একটা শিল-নোড়া বানাবার ফ্যাক্টরি করবেন বলে ভাবছেন। যদি হয় তো বেশ বড় ফ্যাক্টরিই হবে। সাধনকে যদি ম্যানেজার করে আনতে পারি তবে বেশ হয়। মাইনে হয়ত আড়াইশো-তিনশোর বেশি হবে না প্রথমে— নাই-ই বা হল, নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। শরীরের মরচে তো ছাড়বে। রুমার মুখে হাসি ত ফুটবে। তারপর একবার কাজে লেগে গেলে কার কি ভবিষ্যৎ কেউ বলতে পারে?

সেদিন রবিবার ছিল। ভেবেছিলাম বেলা অবধি ঘুমোব। শীতটা এখানে বেশ বেশি। তবুও সপ্তাহের অন্য ছদিন ভোর পাঁচটায় উঠি। অন্ধকার থাকতে থাকতে, তারপর পুবে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই খনিতে বেরিয়ে পড়ি। খুঁটিনাটি ছোট-বড় সব কাজ দেখাশোনা করি।

www.BanglaBook.org

দুপুরে একবার সাইকেল নিয়ে ডেরায় ফিরে খেয়ে যাই। আবার সন্ধ্যে অবধি কাজ করি।

সন্ধের পর বই পড়ি। রাজিন্দর অনেকগুলো বই পড়াল আমাকে পরপর।

প্রতি সকালে উঠে, সকালের রোদের সঙ্গে, উড়ে-যাওয়া পাখির চিকন ডাকের সঙ্গে, শিশিরের গন্ধের সঙ্গে আমার রোজ মনে হয়, জীবনটা কি দারুণ একটা পাওয়া। আমি, বেণীমাধব সেনগুপ্ত, তিনশ টাকার কেরানি-কাম ম্যানেজার, আমার মত সুখী লোক যেন দুনিয়াতে নেই। জীবনে সকলেই আমরা বড় কিছু হই না, বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট নাই-বা হলাম, বড় লেখক নাই-বা হলাম, বিবেকসম্পন্ন একজন সুস্থ সৎ লোক হতে আমার বাধা কোথায়? সে আনন্দ, সে অধিকার আমার ত আজ আর কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না।

এককাপ চা খাওয়া হয়ে গেছে, এমন সময় রাজিন্দর এসে হাজির। রাজিন্দরকে কেমন অন্যমনস্ক দেখালো।

উঠে এসে বললাম, কি হলো? চৌহান সাহেবের মুখ ভার কেন?

রাজিন্দর প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলো। বললো, উঠে পড় বাঙালিবাবু, চলো, একটু বেড়িয়ে আসি।

কোথায়?

আহা, চলোই না।

চা ও লুচি তরকারী খেয়ে আমরা সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

শীতের ভোরের বাতাস শিরশির করছিল গায়ে। প্রায় মাইল পাঁচেক সাইকেল চালিয়ে আমরা পিয়াসা নদীর ধারে এলাম। পথের ধারে সাইকেল রেখে, নদীর পাশের টিলাটায় উঠে গেলাম দুজনে, তারপর দুটো বড় পাথরের উপর বসে পড়লাম।

বসে বললাম, এবার বলো ত রাজিন্দর, কি হয়েছে?

রাজিন্দর প্রথমে চুপ করে থাকলো কিছুক্ষণ, তারপর বললো, কি বলবো বেণীবাবু, বাজীরাওটা কাল আমার গুদাম থেকে একবস্তা সরি চুরি করে বেচে দিয়েছে বাজারে। তুমি জান, সে গুদামটা আমার হলেও, আমার নয়। আমি তার জিম্মাদার মাত্র। ওরাই চাষ করে, ওরাই ফসল তোলে, ওরাই তা সাজিয়ে রাখে, আবার ওরাই তা সারা বছর ওদের প্রয়োজন মতো তা থেকে নিয়ে যায়। আমি আমার এই প্রচারহীন সুন্দর সমবায় গুদামের জন্যে খুব গর্বিত ছিলাম।

বাজীরাও-এর কোনো দুঃখ ছিল না। আমি যা খাই, ও-ও তাই-ই খায়। ওর স্ত্রী-পুত্রের দেখাশোনা অনেকের স্ত্রী-পুত্রের দেখাশোনার মতোই আমি করি। চাবি, সব ওদের কাছেই থাকে, ভাগে ভাগে। ওরা যে কারোরই দয়ানির্ভর হয়ে জীবেন বাঁচে না, কোনো মানুষই কারো দয়ানির্ভর হয়ে বাঁচতে পারে না, এই বোধটা আমি ওদের মধ্যে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করছিলাম, ওদের যা নেই, সেই পরম ধন, আত্মসম্মানে ওদের সম্মানিত করতে চেয়েছিলাম। অথচ, বাজীরাও চুরি করলো।

—কেন চুরি করলো, জানতে পেলে?

জানলাম।

কেন?

ওর বউ একটা ট্রানজিস্টার রেডিও চেয়েছিল, তাই।

ট্রানজিস্টার রেডিও নিয়ে কি করত বাজীরাও-এর বউ?

ফিল্মের গান শুনত।

www.BanglaBook.org

আমার বাজীরাও-এর কথা মনে হলো, যাকে বেঁচে থাকতে হয় নীলগাই আর শুয়োরের সঙ্গে বর্ষা আর খরার সঙ্গে যুদ্ধ করে, যে একদিন বেঁচেই থাকত না হয়ত যদি না রাজিন্দর সব সময় ওর পাশে পাশে থাকত। অথচ ওর এক্ষুনি একটা ট্রানজিস্টার রেডিওর হঠাৎ ভীষণ দরকার হলো।

রাজিন্দর নিজের মনেই বলে উঠলো, মুশকিল, মুশকিল। এই মানুষগুলোকে নিয়ে তুমি কি করবে বেণীবাবু, বলতে পারো? এদের নিয়ে তুমি দেশ গড়বে?

তারপর অনেকক্ষণ আমরা চুপচাপ বসে রইলাম। রাজিন্দর কোনো কথা বললো না।

নীচে সুন্দরী পিয়াসা নদী বয়ে গেছে। নরম গেরুয়া বালি, স্বচ্ছ জলে শীতের রোদ এসে পড়েছে। এক ঝাঁক পিন-টেইল হাঁস উড়ে এসে বসেছে জলে। ঘুরে ঘুরে খুঁটে খুঁটে কি যেন খাচ্ছে। তারা যখন জলে মুখ ডোবাচ্ছে তাদের ছুঁচলো লেজগুলো জলের উপরে সোজা উঁচু হয়ে থাকছে।

আমি শুধোলাম, ড্যামের কাজ কবে শুরু হবে?

কথাটা বলতেই রাজিন্দরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললো, এই সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই। পাণ্ডেবাবু লোকটা এফিসিয়েন্ট। এ রকম লোকেরই দরকার এখন। বেশির ভাগ লোকেই ইন-এফিসিয়েন্ট।

আমি বললাম, বাজারে যে গুজব, পাণ্ডেবাবু পুকুর-চুরি করে? কথাটা সত্যি?

রাজিন্দর চমকে উঠে আমার দিকে তাকাল। বললো, তাই নাকি? রাজিন্দরের মুখটা বিমর্ষ দেখালো। তারপর বললো, করে দেখুকই না শালা, আমিও ওকে দেখাব। কিন্তু আমার মনে হয় না চুরি করে বলে। দেখা যাক। মানুষের উপর মানুষ হিসাবে বিশ্বাস রাখতে হয়। তারপরও যদি সে অমানুষ হয় তখন দেখা যাবে।

আমি হঠাৎ বললাম, আমার অনেকদিন ধরে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে—তুমি দেশের জন্যে এত ভাবো, এত করো, তোমার কোনো-না-কোনো রাজনৈতিক মতবাদ একটা নিশ্চয়ই আছে অথচ কখনও তা স্পষ্ট করে জানিনি, তাই, জানতে ইচ্ছে করে।

রাজিন্দর পিয়াসা নদীর দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো, তারপর বললো, বেণীবাবু, আমি কমিউনিস্টও না ক্যাপিটালিস্টও নই, আমি হিউম্যানিস্ট, ন্যাশনালিস্ট। তাছাড়া যে দেশে মানুষ নেই, নেতা নেই, সে দেশে এ সব ইজম-ফিজম ফাঁকাবুলি ছাড়া কি? তাছাড়া এ দেশ ত কোনো দলের বা কোনো নেতার একার নয়। কোনো শালার বাবার একার নয়ত এ দেশ। এদেশ আমাদের সকলের, আমার, তোমার, বাজীরাও-এর, পাণ্ডেবাবুর সকলেরই। প্রত্যেকেরই বিশেষ বিশেষ ভূমিকা আছে এখানে। আমরা প্রত্যেকে যদি প্রত্যেকের ভূমিকা মতো কাজ করি, তাহলেই কোনো ঝামেলা থাকে না।

কিন্তু আমরা তা করি কোথায়?

তাহলে তুমি বলছ, সোস্যালিজম-এ বিশ্বাস করো না রাজিন্দর, অথচ তোমাকে দেখে...।

রাজিন্দর আবার হাসলো, বললো সোস্যালিজম বলতে তুমি কি বোঝ জানি না বেণীবাবু, তবে তোমাকে একটা সোজা উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে পারি। এই যে মাঠটা দেখছ নদীর পাশে, চেয়ে দেখো, মাঠটায় পাঁচ-ছটা বড় গাছ আছে আর অসংখ্য ছোট গাছ। তুমি আমাকে একটা কুড়ুল এনে দাও, আমি রাতারাতি এ মাঠে তোমার সোস্যালিজম এনে দেব। সস্তা সোস্যালিজম।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কি রকম?

www.BanglaBook.org

ও বললো, কেন? এ ত সোজা। কুড়ুল দিয়ে কটা বড় গাছ আছে সেগুলোকে ছোট গাছগুলোর সমান করে দেব ছেঁটে। ব্যস, সবাই সেই মুহূর্তে বরাবর হয়ে গেল। এও ত সোস্যালিজম।

তবে তোমার কিসে বিশ্বাস? সবাই সমান হয় একি তুমি চাও না?

রাজিন্দর আবার হাসলো, বললো, নিশ্চয়ই চাই। হয়ত অনেক জনদরদী নেতার চেয়ে অনেক বেশি করেই চাই। চাই যে, তা তুমি জান, ভাল করেই জান।

তা জানি। কিন্তু তুমি কি করতে চাও?

আমি করতে চাই ছোট গাছগুলোকে বড় করতে এবং বড় গাছগুলো যাতে আরো বড় না হয় তা দেখতে। ছোট গাছগুলোকে জল দিয়ে সার দিয়ে ওদের প্রত্যেকের মধ্যে বড় হবার, আলোর দিকে, বাতাসের দিকে হাত বাড়াবার, মেরুদণ্ড সোজা করে উঠে দাঁড়াবার জোর সঞ্চারিত করতে চাই। এ যদি করা যায় ত দেখবে, দেখতে দেখতে আমাদের চোখের সামনে ছোট গাছগুলো, প্রত্যেকটি ছোট গাছ বড় গাছগুলোর কাঁধ ছুঁই-ছুঁই করছে। তারপর একদিন দেখবে যে, সব গাছগুলোই সমান হয়ে গেছে। সেই হলো সত্যিকারের সমান হওয়া।

বুঝলে বেণীবাবু, আমার মতে, পার্টি বা ইজম গৌণ। মুখ্য যা, তা হচ্ছে মানুষ। জানিনা বেণীবাবু, আমার ধারণা হয়ত ভুল, কিন্তু আমার মনে হয় এই মনুষ্যত্বর বাবদেই আমরা সব এগিয়ে-যাওয়া দেশের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছি। রাস্তাঘাট বাড়ি-ঘর বানানোটা কিছুই নয়। বাইরের অনেক কিছু হয়ত আমরা বানিয়েছি, বানাচ্ছি। কিন্তু বুকের ভিতরে যা কিছু গড়ে তোলার ছিলো, তার কিছুই আমরা গড়িনি।

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। রাজিন্দরের কথাগুলো বোঝবার চেষ্টা করছিলাম। আমার মতের সঙ্গে ওর মতের কোথায় অমিল তা অনুধাবন করার চেষ্টা করছিলাম।

আমার ভাবনার জাল ছিঁড়ে রাজিন্দর বললো, চেয়ে দেখ ওই যে পুবে গ্রামটা দেখছ, ওই গ্রামের জায়গায় রিজার্ভার হবে আর ওই যে বুড়ো আমলকি গাছটা—তার কাছে হবে জেনারেটিং স্টেশন। তুমি যদি এখানে থাক আরো পাঁচ-দশ বছর, ত দেখবে এ জায়গার চেহারা বদলে গেছে। তখন আমাকে দেখে তুমি চিনতে পারবে না। আমার মতো সুখী লোক তুমি এ তল্লাটে খুঁজে পাবে না তখন।

তারপর বাতাসে নাক উঁচু করে নিঃশ্বাস নিয়ে রাজিন্দর বলল, ঈসস। কবে আসবে? সেদিন কবে আসবে?

আরো কিছুক্ষণ ওখানে বসে থাকার পর রোদের তেজ বাড়ল।

আমি বললাম, এবার নামা যাক।

রাজিন্দার বললো, চল।

তারপর টিলা থেকে নামতে নামতে বললো, আজ সন্ধেবেলায় কি করছো?

আমি বললাম, কি আর করব? কার্পেট কারখানার ছেলেরা যদি ব্যাডমিন্টন খেলে ত খেলব, নইলে বই পড়ব বাড়ি বসে।

রাজিন্দর বললো, আজ কিছুই করতে হবে না, আজ আমার সঙ্গে এক জায়গায় চলো।

কোথায়?

চলোই না ইয়ার। গেলে তোমার ভালো লাগবে। আমিও ব্যাচেলার, তুমিও তাই। মাঝে মধ্যে একটু নাচনা গানা দেখা ভালো, নইলে জীবনটা বড় ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। মাঝে মাঝে মেয়েদের সঙ্গ বেশ লাগে, কি বল?

www.BanglaBook.org

আমি বললাম, মাঝে মাঝে কেন? সবসময় লাগে না?

দূর দূর, বলে হাসলো রাজিন্দর। বললো, মেয়েরা কিছুক্ষণের জন্যে ভালো। কোনো বুদ্ধিমান পুরুষমানুষ কোনো মেয়ের সঙ্গে সারা জীবন থাকতে পারে না। থাকলে তাদের বুদ্ধি উবে যায় বলেই আমার বিশ্বাস।

এটা তুমি কি কথা বললে? এত হাজার-হাজার বিদগ্ধ বুদ্ধিমান লোক তাবলে বিয়ে করে বুড়ো বয়স অবধি সুখে ঘর-সংসার করছে কেন? কি করে?

তুমিই বেণীবাবু, এবার একটা বোকার মতো কথা বললে।

মানে? অবাক হয়ে আমি বললাম। তারা তবে কি বোকা?

মানে, তারা বুদ্ধিমান ঠিকই, আমার তোমার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান, কারণ সে সব লোক জানেন একজন মেয়ের সঙ্গে সারা জীবন থেকেও কি করে তার সঙ্গে না-থাকা যায়। এমন বুদ্ধি আমার নেই। তাই ঠিক করেছি, আমার পক্ষে ওদিকে পা না-বাড়ানোই ভালো। বলেই, হো হো করে হাসতে লাগলো রাজিন্দর।

সাইকেলের প্যাডেলে পা রেখে রাজিন্দর বললো, চলি ইয়ার। আমি তিতিরঝুমার মাঠের মধ্য দিয়ে শর্টকাট মারব। বিকেল পাঁচটায় ঠিক তোমার ডেরায় পৌঁছব—ভাল করে সেজেগুজে থেকো। তোমাকে নিয়ে যাওয়ায় বিপদ আছে আমার। আমার এতদিনের বান্ধবী না হাতছাড়া হয়ে যায়।

আমি হাসলাম। বললাম, ইয়ার্কি কোরো না।

সেদিন বিকেলে তখনো বেলা ছিলো, এমন সময় আমার ডেরার সামনে একটা ফিটনগাড়ি এসে দাঁড়াল। দুটো সাদা তেজী ঘোড়ায় টানা কালো কুচকুচে ফিটন। ফিটন থেকে যে লোকটি নামলো, তাকে আমি কখনো দেখেছি বলে মনে হলো না।

ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবী, চিকনের কাজ-করা, সঙ্গে চুড়িদার পায়জামা পরে চৌহান সাহেব আমার সামনে যখন এসে দাঁড়ালো তখন সত্যিই সেই দেবদর্শন লোকটিকে চেনবার কথা ছিল না আমার। মোটা দেহাতী খদ্দরের পায়জামা-পাঞ্জাবী-পরা অবস্থাতেই তাকে বরাবর দেখে এসেছি। তাই, মনে হলো ও যেন খোলস বদলে এসেছে কোনো নতুন পিছল সাপের মতো। গায়ে খয়েরী কাশ্মীরী শাল, পায়ে সাদা নাগরা জুতো।

আমি বললাম, তুমনে কা কিয়া ইয়ার?

রাজিন্দর হাসলো, ও দারুণ মুডে ছিলো, ওকে সিনেমার হীরোর চেয়েও অনেক ভালো দেখাচ্ছিল, সারা শরীর থেকে আতরের গন্ধ বেরুচ্ছিল। রাজিন্দর বললো, কা কিয়া? গজাব কিয়া, কিসিকি ওয়াদেপে।

আমি বললাম, উর্দু বুঝি না। বুঝিয়ে বলো।

রাজিন্দর বললো, বিশ্বাস করেছি, কারো কথায়, সকলের কথায়, আমার প্রেয়সীর কথায় বিশ্বাস করেছি।

রাজিন্দরের সঙ্গে ফিটনে বসে পড়লাম। বললাম, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

রাজিন্দর হাসলো, বললো, মীর্জাপুরে।

সে ত বহু দূরে।

ও বললো, যাকে ভালবাসি তার সঙ্গে দেখা করতে অন্য পৃথিবীতেও যেতে পারি, আর এ ত সামান্য দূর।

শীতের বিকেলের রোদ, মাঠে, ঘাসে, গাছে, পাহাড়ে ছড়িয়ে গেছে। সব কেমন সুন্দর

www.BanglaBook.org

স্বপ্নময় মনে হচ্ছে।

আমরা দুজনে চুপ করে দুদিকে চেয়ে বসে আছি মুখোমুখি।

ফিটন চলেছে। ঝুমঝুম করে ঘোড়ার গলার ঘন্টা বাজছে, মহুন্দার ছায়াঘেরা পথ দিয়ে ফিটন চলেছে।

বিরহী নদীর বুকে রোদের আঁচ লেগেছে। একটা মাছরঙা পাখি তার বিচিত্রবর্ণ শরীর নিয়ে জলে ছোঁ মেরে মেরে মাছ ধরছে, ছিটকে-ওঠা জলের রঙ, মাছরাঙার রঙ সব মিলে মিশে সব সেই মুহূর্তে একীভূত হয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে। আমার মনের আড়ালে লুকিয়ে-রাখা সমস্ত মিষ্টি দুষ্টু ইচ্ছেগুলোও ছিটকে-ওঠা ক্যারাম বোর্ডের গুটির মতো মাছারাঙাটার সঙ্গে লাফিয়ে উঠছে।

অনেকক্ষণ পর রাজিন্দর বললো, তুমি কখনো কাউকে ভালোবেসেছ বেণীবাবু?

আমি হাসলাম, তারপর ওর চোখের দিকে চেয়ে বললাম, কখনো কাউকে ভালোবাসেনি এমন পুরুষমানুষ কি কেউ আছে?

বোধ হয় নেই। বলে রাজিন্দর চুপ করে রইলো।

তারপর আবার বললো, ভালবাসা বলতে তুমি কি বোঝো জানি না বেণীবাবু, তবে আমার ভালবাসা একটু অদ্ভুত। হয়ত আমি নিজেই অত্যন্ত অদ্ভুত তাই।

এ কথার পিঠে কোনো কথা হয় না। তাই চুপ করে রইলাম।

ধীরে ধীরে বিকেলের স্নিগ্ধ রোদ রাতের অন্ধকারে গড়িয়ে গেলো। সন্ধ্যাতারাটা দিগন্তরেখার উপরে পৃথিবীর সব প্রেমিকের ভালবাসার চোখ হয়ে জ্বলজ্বল করতে লাগলো। একটি একটি করে তারা ফুটতে লাগল আকাশে। পথের পাশের শিশিরের গন্ধ, ক্ষেতের গন্ধ, সব কিছু রাজিন্দরের গায়ের আতরের গন্ধে মিশে গেলো।

অনেকক্ষণ পর আমরা আলো ঝলমল মীর্জাপুরে এসে পৌছলাম।

ফিটন থেকে আমরা যেখানে নামলাম, সেটা একটা চওক। হয়ত চাঁদনী চওক কি মীনাবাজার হবে। আতরের দোকান, ফুলের দোকান, দেওয়ালজোড়া আয়না বসান পানের দোকান।

রাজিন্দর একটা পানের দোকানে দাঁড়িয়ে খুশবু-ভরা জর্দা দিয়ে বানারসী মঘাই পান খেল। আমাকেও খাওয়াল। তারপর আয়নায় নিজেকে একটু ঠিকঠাক করে নিল।

ওর দিকে চেয়ে আমি হাসলাম।

ও ভর্ৎসনার চোখে আমার দিকে চাইলো। বললো, তোমরা পুরুষমানুষরা বড় স্বার্থপর। তোমরা আশা করো তোমাদের প্রেমিকারা সব সময় সুন্দর করে সেজে তোমাদের কাছে আসবে অথচ তোমাদের যেন তাদের প্রতি কোনো কর্তব্য নেই? বুঝলে বেণীবাবু, যখন তোমার প্রেমিকার কাছে যাবে, সেজে যেও। তোমার সবচেয়ে সুন্দর চেহারা ও মনের মধ্যে যে সবচেয়ে সুন্দর মন আছে সেই মন নিয়ে তার কাছে যেও : নইলে তাকে ঠকানো হয়।

একগোছা লাল গোলাপ কিনল রাজিন্দর, তারপর আমাকে নিয়ে পাশের গলিতে ঢুকে পড়লো।

ঢুকে পড়েই মনে হলো কোথায় যেন এলাম।

ঝাড়-লণ্ঠনের নরম আলো, সারেঙ্গীর বিধুর কান্না, তবলার আলতো ঢেউয়ের ছলাৎ-ছলাৎ আর তার সঙ্গে মিষ্টি সুরে ভরপুর গলার পুরবী। মনে হলো যেন কোনো স্বপ্নরাজ্যে এসে পড়লাম।

www.BanglaBook.org

ফুলের গন্ধ, আতরের গন্ধ, সুন্দরী মেয়েদের গায়ের গন্ধ মাড়িয়ে এসে আমরা পাথরের সিঁড়ি বেয়ে দোতলার একটা ঘরের চৌকাঠে এসে পৌঁছলাম।

রাজিন্দর সিং চৌহান, জরির ঝালর দেওয়া পর্দা সরিয়ে দরজায় দাঁড়াতেই— ভিতরের গান থেমে গেল, সারেঙ্গী স্তব্ধ হয়ে গেল, সমস্ত ঘর নিঃশব্দ হয়ে গেল, ভয়ে নয়, আনন্দে।

সামনে যাকে দেখলাম, তার মতো কোনো মেয়ে আমার জীবনে দেখেছি বলে মনে পড়লো না।

রাজিন্দর বলল, ও ও সালেমা, মেরী সালেমা! তুম কৈসি হো? মেরী পেয়ারী, তুম কৈসি হো?

সালেমা কুর্নিশ জানাতে জানাতে উঠে দাঁড়াল। নিচু স্বরে বিশুদ্ধ উর্দুতে কি যেন সব আবেগময় আনন্দের কথা বললো। বুঝতে পারলাম না।

রাজিন্দর আমার দিকে ফিরে আমাকে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললো, মেরা দোস্ত, কলকাত্তাকা বেণীবাবু। তারপর সারেঙ্গী নিয়ে যে অল্প বয়সী ছেলেটি বসেছিল তার দিকে ফিরে বলল, নৌসের তু কৈসে হো?

এরপর সালেমা এবং নৌসের আমাকে অবাক করে রাজিন্দরকে ধরে বললো, যে, অনেকদিন পরে এসেছো, তোমায় গান শোনাতে হবে রাজিন্দর।

রাজিন্দর যে গান গায় এ কথা জানার অবকাশ আমার কখনো হয়নি। ওর চরিত্রের দৃঢ়তা ও দেশের জন্যে ওর অনুক্ষণ পাগলামি দেখে কখনো মনে হয়নি ওর জীবনের একটা অন্য রকম দিকও আছে। মনে হয়নি যে, সমস্ত সুস্থ মানুষের জীবনেই প্রেম থাকে। কোথাও-না-কোথাও থাকেই। প্রেমিক না হলে, জীবনে কেউই সার্থক হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তিরই, সে কর্ম-জীবনে যেই-ই হোক, যাই-ই হোক, ব্যক্তিগত জীবন না-থাকাটাই অস্বাভাবিক।

রাজিন্দর ফরাসে বসে পড়ে হাসল, আমাকে টেনে বসাল পাশে, তারপর সালেমাকে বললো, তুমি আগে গাও। কতদিন তোমার গান শুনিনি।

আবার সারেঙ্গী কাঁদতে লাগলো, তবলা ছলাৎ ছলাৎ করতে লাগল, সালেমার গলায় কোনো শিশির-ভেজা নরম সুরের পাখি উড়ে এসে বসলো।

সালেমা শুরু করলো, 'এওঁহি অগর হামারি তরফ দিখতে রহোগী ত একরোজ জরুর পেয়ার বণ যায়েগী।'

মানে তুমি যদি এমনি করে আমার দিকে চাও, চেয়ে থাক—চাইতে থাক—তবে একদিন, তবে নিশ্চয়ই একদিন তোমার সঙ্গে আমার প্রেম হয়ে যাবে।

সালেমা গান গাইছিল, আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওর দিকে চেয়েছিলাম।

একটা আকাশী-নীল ভেঙ্কটাগিরি শাড়ি পরেছে সালেমা, চোখে সুর্মা, নরম প্রশস্ত কপাল, মাজা-রঙে উজ্জ্বল মুখটি যেন প্রদীপের মতো নীল পিলসুজের উপর জ্বলছে। সাইবেরিয়ান রাজহংসীর মতো গ্রীবা, উদ্ধত চিকন চিবুক। ভেলভেটের কাঁচুলি-ঘেরা বুক। আর সালেমার চোখ। কী চোখ, কী চোখ। চোখের সাদা অংশটা সাদা নয়, কেমন নীলাভ আর কণীনিকা কোমল উজ্জ্বল কালো। মুখ দিয়ে যা না বলছে, চোখ দিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি বলছিল সালেমা, আমার রাজিন্দরের প্রেমিকা। বলছিল বারে বারে, বিভিন্ন পর্দার আলাপে এবং তানে ও বিস্তারে বলছিল, এমনি করে যদি চেয়ে থাক; যদি চাও যদি চাইতে থাক আমার দিকে, তবে একদিন তোমাকে কিন্তু সত্যি সত্যিই ভালবেসে ফেলব।

সালেমার গান শেষ হয়ে গেলে রাজিন্দর অনেকক্ষণ মুখ নিচু করে বসে রইল, কথা

www.BanglaBook.org

বললো না, তারপর সারেঙ্গীওয়ালা নৌসেরের হাত থেকে সারেঙ্গীটা নিয়ে, বাঁ পায়ের পাতা এবং ডান পায়ের উরুর মধ্যে বসিয়ে গান গাইবে বলে তৈরি হলো।

সালেমা এতক্ষণ আসন করে বসেছিল গান গাওয়ার সময়, এবারে পা ভেঙে পাশ ফিরে বসে পাঁচ বছরের মেয়ের মতো আনন্দে ও কৌতূহলে সুপুরষ রাজিন্দরের মুখের দিকে বড় বড় উজ্জ্বল চোখ মেলে চেয়ে রইলো।

রাজিন্দার গজল ধরলো, 'পুছোঁ না মুঝকে দিল কা ফাসানে, ঈস্কহি বাঁতে, ইস্কহি জানে।'

অর্থাৎ আমাকে আমার মনের কথা কিছু শুধিও না, কিছু বলতে পারব না আমি। ভালবাসার কথা শুধু ভালবাসাই জানে।

মেঘ গর্জনের মতো গম্ভীর অথচ শীতের রোদের মতো শান্ত রাজিন্দরের গলায় যে এত দরদ ছিল কখনো জানিনি। দরদ যার থাকে তার বোধহয় সব ব্যাপারেই এমন দরদ থাকে। ও যেমন দরদ দিয়ে ওর দেশকে ভালোবাসে তেমন দরদ দিয়ে ওর প্রেমিকাকেও ভালোবাসে।

জাফরানী-রঙা বিরিয়ানী পোলাউ এবং রেজালা খেয়ে, পান মুখে দিয়ে যখন আমরা সালেমার ঘর থেকে বেরোলাম তখন রাত অনেক হয়ে গেছে।

রাজিন্দর কোনো কথা বলছিল না। চুপ করে চেয়েছিল বাইরে।

বাইরে যদিও খুব ঠাণ্ডা ছিলো, তবুও আমরা গাড়ির জানালা খুলে রেখেছিলাম। ভিজে জ্যোৎস্নায় ফসলের ভারি গন্ধ উঠছিলো, একটা টিটি পাখি ফাঁকা মাঠে কাকে যেন কি শুধিয়ে বেড়াচ্ছিলো।

ঝুমঝুমি বাজিয়ে ফিটন চলছিলো।

রাজিন্দর হঠাৎ বললো, ভাবলে কেমন আশ্চর্য লাগে, তাই না বেণীবাবু? কোনো একজনের, কোনো বিশেষ একজনের কাছে গেলে, তার চোখের দিকে চাইলে, তার মুখোমুখি একটু বসলে কী যেন এক ভালোলাগায় সমস্ত মন ভরে যায়। খুব বেশি চাইলে তার হাতে একটু হাত রাখতে চাওয়া যায়, তার চোখের পাতায় কি কানের লতিতে অথবা তার গ্রীবায় আলতো করে একটা চুমু খাওয়া যায়, এর চাইতে বেশি কিছু কিন্তু মেয়েদের কাছে কখনো চাইতে নেই। জানো, বেণীবাবু, প্রত্যেক মেয়েই, আমার মনে হয় তাজমহলের মতো। তাদের বেশি কাছে যেতে নেই। তাদের দূর থেকে দেখে মনে মনে নিজের বাসনা ও আবেগ ও ইচ্ছা দিয়ে বাকিটা ভরিয়ে নিতে হয়। যারা তাজমহলের ভিতরে ঢুকে দুহাত দিয়ে খুঁচে খুঁচে 'কৃ' দিয়ে তাজমহল দেখে আমি তাদের দলে নেই। সে মালিকানায় আমি বিশ্বাস করি না।

BanglaBook.org

তারপর বললো, কি? তোমার কী মত?

আমি বললাম, তাজমহল আমি এখনো দেখিনি, দূর থেকেও দেখিনি। আশা করি আমিও কোনোদিন সাজাহান হব। যদি হই, তবে সেদিনই তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনায় বসা যাবে।

পরের শনিবার বিকেলে রাজিন্দরের বাড়িতে পৌঁছতেই ও বললো, একটা নতুন এক্সপেরিমেন্ট করছি বেণীবাবু। চল তোমাকে দেখাই।

আমি শুধোলাম, কিসের এক্সপেরিমেন্ট?

ও বললো, চলোই না। একটা খুব সিরিয়াস ব্যাপার। এক্সপেরিমেন্ট ইন্ লিডারশিপ।

সে আবার কি?

আহা, চলোই না!

www.BanglaBook.org

ওদের মূল বাড়ি থেকে এক ফার্লং দূরে ওর ঠাকুর্দার বানানো শীসমহল ছিলো। এখন অশ্বত্থ ও নানারকম জংলী গাছে ছেয়ে ফেলেছে দালানটা। আমি এর আগে কোনোদিনও ঢুকিনি এতে। দূর থেকে দেখেছি। ঠক্কনলাল আর বাজীরাও-এর মুখে শুনেছি যে, এখন এতে সাপ ও ভূত-পেত্নীর বাসা।

তখন সন্ধে হবো-হবো। বাইরের বড় ফটক দিয়ে ঢুকতেই গা ছম্‌ছম্‌ করতে লাগলো। কতগুলো বাদুড় আর চামচিকে ওড়াওড়ি করতে লাগলো। একটা বিচ্ছিরি পচা গন্ধ।

ভিতের ঢুকলেই অন্ধকার। ভাল দেখাই যায় না।

রাজিন্দর কার উদ্দেশ্যে যেন ডাকল, ঈজ্জৎ...ঈজ্জৎ...ঈজ্জৎ।

কেউ সাড়া দিল না।

তারপর রাজিন্দর হাততালি দিল।

হাততালি দিতেই, কোথা থেকে এক রুপোলি-চুলের নুয়ে-পড়া গলিত-নখদন্ত বৃদ্ধ একটা পেতলের মোমবাতিদানে বসানো জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে এসে হাজির হলো। বৃদ্ধকে দেখে মনে হলো না বৃদ্ধ এখানকার লোক। এখানকার লোকের চেহারার সঙ্গে কোনো মিল খুঁজে পেলাম না তার চেহারায়।

উর্দু-মেশানো চোস্ত হিন্দীতে সেই পলিত-কেশ বৃদ্ধ "ঈজ্জৎ" আমাদের স্বাগত জানাল।

বৃদ্ধ মোমবাতি নিয়ে আগে আগে যেতে লাগলো। আমরা পেছনে চললাম।

একটু গিয়ে বৃদ্ধ দাঁড়ালো, মোমবাতিদানটা রাজিন্দরের হাতে দিলো। দিয়ে মরচে-ধরা বড় একটা তালা খুলতে লাগলো। নানারকম আওয়াজ হতে লাগলো কিন্তু তালাটা খুললো না।

বৃদ্ধ আবার চেষ্টা করতে লাগলো।

এমন সময়ে সেই বন্ধ ঘর থেকে কতগুলো ক্রুদ্ধ জানোয়ারের হুংকার ভেসে এলো।

আমি চমকে উঠলাম, শুধোলাম এঘরে কি আছে রাজিন্দর? বাঘ?

হা হা হা করে হেসে উঠলো রাজিন্দর।

ছাদের ফাটল থেকে ভয় পেয়ে কটা বুনো কবুতর ডানা ঝটপট করে উড়ে গেলো। অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকারতর বাদুড়গুলো নড়ে উঠলো।

রাজিন্দর বললো, বাঘ থাকলে তো খুশিই হতাম বেণীবাবু। একদিন যেন এতে বাঘই থাকে। অথবা সিংহ। সেই চেষ্টাই তো করছি। তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক বেণীবাবু।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, কি আছে এতে? বলোনা?

রাজিন্দর আবার হেসে উঠলো, বললো, ভয় পাচ্ছ কেন? দেখতেই পাবে।

প্রচণ্ড শব্দ করে তালাটা খুলে গেলো।

ঈজ্জৎ আগে ঢুকলো।

তারপর মোমবাতি হাতে রাজিন্দর। পেছনে আমি।

ভিতরে ঢুকতেই চমকে উঠলাম। দেখি একটা বিরাট হল ঘর। দেওয়ালের চতুর্দিক ছাদ এবং আয়নায় ঘেরা। অনেকগুলো আয়না দাগ হয়ে খারাপ হয়ে গেছে। তবে এখনও অনেকগুলো ভালোও আছে। রাজিন্দরের হাতের মোমবাতিটা হাজার মোমবাতি হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেল। ঘরটা নরম সোনালী আলোয় ভরে যেতেই আমি সভয়ে ও বিস্ময়ে দেখলাম, মেঝের ফরাসের ওপর ও তাকিয়ার পাশে বসে আছে চারটে বিরাট-বিরাট কালো কুচকুচে অ্যালসেসিয়ান কুকুর। তাদের চারজোড়া চোখ দেয়ালের চতুর্দিকের আয়নায় চার হাজার চোখ হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে আছে।

www.BanglaBook.org

তালা খোলার আগে কুকুরগুলোই তাহলে ঝাঁপাঝাঁপি করছিল, এখন সাদা পোশাকের ঈজ্জৎকে দেখে সব থমকে গেছে।

রাজিন্দর হঠাৎ ওর পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটা রুটি বের করে ছুঁড়ে দিল ওদের দিকে।

একটি কুকুর সেটাকে সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে উঠে লুফে নিল মুখে, তারপরই ঘরের অন্য কোণায় দৌড়ে গেল একা-একা খাবে বলে।

রাজিন্দর রেগে উঠে চেঁচিয়ে বলল, ঈজ্জৎ, চাবকাও শালাকে।

ঈজ্জৎ অমনি দেওয়ালে ঝোলানো চাবুক নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে যেতেই কুকুরটা রুটিটা মুখে করে নিয়ে ফরাসে রাখল।

রাজিন্দর নিজে হাতে রুটিটাকে চারটে ভাগে ভাগ করে চারজনকে ছুঁড়ে দিলো।

ঐ চারটে কুকুর কুকুরের স্বভাববশেই অন্য-হস্ত প্রদত্ত রুটি খেতে লাগলো একমনে।

দেখে মনে হলো ওরা অনেকদিন কিছু খায়নি।

রাজিন্দর ওদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বললো, যে দৌড়ে গেল একা রুটিটাকে নিয়ে, ওর নাম কি ঈজ্জৎ?

ঈজ্জৎ উত্তর দিলো না। বোবার মত মুখে রাজিন্দরের দিকে তাকাল।

পরমুহূর্তেই রাজিন্দর লজ্জা পেয়ে হাসল। বললো, ওহো, আমি ভুলেই গেছিলাম।

আমি শুধোলাম, কি ভুলে গেছিলে রাজিন্দর?

ভুলে গেছিলাম, যে ওদের নাম ঈজ্জৎ জানে না। ওদের নাম দিয়েছি আমি।

আমি শুধোলাম, একে যোগাড় করলে কোথা থেকে? মানে ঈজ্জৎকে?

রাজিন্দর গলায় বিরক্তি ফুটিয়ে বলল, অত কথায় তোমার দরকার কি? তারপরই লজ্জা পেয়ে বললো, ওকে অনেক কষ্টে যোগাড় করেছি। ও কত কুকুর পিটিয়ে বাঘ করেছে তার ইয়ত্তা নেই। তাই তো ওকে নিয়ে এসেছি এখানে।

আমি এ সব হেঁয়ালি কথা কিছুই বুঝলাম না। রাগ-রাগ গলায় বললাম, তোমার এই চার-চারটে কালো কুকুর আর এই সাদা পোশাকের বৃদ্ধর মানে আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। তুমি কি কুকুরের বাচ্চার ব্যবসা করবে?

রাজিন্দর আবার একচোট হাসলো, বললো, না হে বেণীবাবু, না। এই যে চারটে কুকুর দেখছো এদের আমি এলাহাবাদ থেকে আনিয়েছি। একজনের নাম আমির, অন্যজনের নাম গরিব, আরেকজনের নাম নোকর, আর চতুর্থ জনের নাম রেখেছি মালিক। এই কুকুরগুলোর মধ্যে থেকে আমি একজন বাঘের মতো নেতা তৈরি করতে চাই। হয় কিনা দেখতে চাই। তাই আমি সবরকম ভাবে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখছি যে, কুকুরদের মধ্যে একজন কুকুরেরও বাঘ হওয়ার ক্ষমতা আছে কিনা! মানে, বাঘের মতন কুকুর! নেতৃত্ব করার মতো গুণ এদের মধ্যে একজনেরও আছে কিনা। ওদের সকলকে না খাইয়ে রেখে দেখছি, ক্ষুধার্ত অবস্থায় ওদের মধ্যে কে কিরকম ব্যবহার করে। তারপর ওদের একসঙ্গে সমান ভাগে ভাগ করে খাওয়ার দিয়ে দেখছি ওদের ব্যবহারের তারতম্য। তারপর আবার একজনকে ভর পেট খাইয়ে রেখে দেখব অন্য তিনজন ক্ষুধার্তর প্রতি সে কিরকম ব্যবহার করে। প্রত্যেককে এমন করে দেখব। তারপর সবইকে পেট ভরে খাইয়ে দেখব তখনও ওরা ভদ্রতা, ন্যায়, আত্মসম্মান জ্ঞান, সততা শেখে কিনা, অন্যকে ও নিজেকে সম্মান করে কিনা! এমনি করে দেখতে অনেক সময় লাগবে।

www.BanglaBook.org

আমার জন্যে প্রার্থনা কোরো বেণীবাবু, ওদের জন্যে প্রার্থনা কোরো, ওদের মধ্যে একজনও যেন নেতৃত্বর আসনে বসবার যোগ্যতা অর্জন করে, ওদের মধ্যে একজনও যেন কুকুর হয়ে জন্মেও বাঘের মতো স্বভাব পায়।

অনেকদিন রাজিন্দরের ওখানে যাওয়া হয়নি। তার উপর মাঝে আমাকে প্রায় দু-সপ্তাহের জন্যে লক্ষ্ণৌ যেতে হয়েছিল। এখানে ছিলাম না। দেখতে দেখতে শীতের দিন গিয়ে বসন্তের দিন এসে গেল। কি করে যে দিনগুলো মাসগুলো কেটে গেল বুঝতে পর্যন্ত পেলাম না।

ফিরে এসেই একটা খুব ভালো খবর পেলাম। আমার মালিক কারখানা করার সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেলেছেন। সাধনের কথা বলতেই উনি একবাক্যে মেনে নিলেন। তবে বললেন, কলিকাতার পড়ে-লিখে আদমী এই জঙ্গলে কি থাকতে পারবেন এসে।

আমি বললাম, কেন? আমি বুঝি থাকছি না?

আপনার কথা আলাদা, আপনি ব্যাচেলর মানুষ, বাড়িতে বিধবা মা ছাড়া আর কেউ নেই, আপনার কথা অন্য। আপনার বন্ধু কি বিয়ে শাদী করেছেন?

আমি অকপটে মিথ্যে কথা বললাম, হ্যাঁ করেছেন।

তবে?

আমি বললাম, ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই খুব নির্জনতা ভালোবাসে। তাছাড়া নতুন বিয়ে করেছে তো। ওদের খারাপ লাগবে না।

অতএব মালিক রাজী হয়ে গেলেন। তিনশ পঁচিশ টাকা মাইনে, কোয়ার্টার এবং একজন রান্নাবান্না ও খিদমদগারী করার লোক—।

খারাপ কি এই বাজারে?

সেদিনই সন্ধের সময় রুমাকে চিঠি লিখতে বসে গেলাম।

অনেক প্যাডের কাগজ নষ্ট করে, অনেক কলম কামড়ে, অনেক কাপ চা ও সিগারেট ধ্বংস করে শেষ পর্যন্ত একটা দাঁড় করালাম খসড়া। তাতে অনেক কাটাকুটি হলো। সেই অবস্থাতেই পাঠাব বলে মনস্থির করে ফেললাম—নইলে আর পাঠানোই হবে না বলে আমার মনে হল।

লিখলাম,

তোমাকে এর আগেও একটি চিঠি লিখেছিলাম। তখন আমিও ছোট, তুমিও ছোট। ঢিল মুড়ে সে চিঠি তোমাদের ছাতে ফেলে দিয়েছিলাম। মনে আছে?

তুমি তার কোনো উত্তর দাওনি।

জবাব পাইনি প্রথম চিঠির। আশা করি এ চিঠির জবাব দেবে।

ছোটবেলায়, মানে ছোটবেলা থেকেই তোমাকে আমার ভালো লাগে। যখন তুমি ফ্রক পরে, বেণী দুলিয়ে, পাড়ার গলিতে এক্কা-দোক্কা খেলতে তখন থেকে তোমায় আমি এক বিশেষ চোখে দেখি। সেই ছেলেমানুষী ভালোলাগা কখন যে ভালোবাসায় গড়িয়ে গেছিলো আমি নিজেও কখনো জানিনি।

আজও আমি তোমাকে ভালোবাসি, কিন্তু সে এক অন্য ধরনের ভালোবাসা।

যখন আমি তোমাকে প্রথম চিঠিটি দিই, সে প্রায় আট বছর আগের কথা, তখন আমি জানতাম না যে, সাধনকে তুমি ভালোবাস। জানলে, হয়ত ও চিঠি আমি দিতাম না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তখনকার সেই অল্প বয়সের আবেগে যা হঠাৎ করে বলা যায়, লেখা যায়, সে সব বলা বা লেখা এখন আর সম্ভব নয়।

সত্যি কথা বলতে কি, গত পুজোর পরে যখন কলকাতা গেছিলাম তখন, তোমার সঙ্গে কথা বলে ও সাধনকে দেখে আমার খুব মন খারাপ হয়ে গেছিলো। সেদিন থেকে আমি ভেবেছি, কি করে তোমাদের দুজনের ঐ দুঃখ ঘোচানো যায়।

তুমি জানো যে, আমি একজন সামান্য মানুষ। আমার ক্ষমতা বলতে কিছুই নেই, তবু তুমি শুনে বোধহয় খুশি হবে যে, সাধনের জন্যে আমি একটা চাকরি যোগাড় করেছি। তোমাদের কোয়ার্টারও আমি দেখে রেখেছি। তিনটে ঘর এবং দুটি বারান্দাওয়ালা একতলা খাপরার চালের বাংলো। একটি বারান্দা ঢাকা; অন্যটি খোলা। রান্নাঘর ও চানঘর আলাদা।

কম্পাউন্ডের মধ্যে কতগুলো আম ও পেয়ারা গাছ আছে। একটি হাস্নুহানার ঝোপ আছে এবং সামনের দরজার দু-পাশে দুটি বোগোনভেলিয়া লতা আছে। মাঝে মাঝে টিয়াপাখি এসে পেয়ারা গাছে বসে; কাঠবিড়ালি দৌড়াদৌড়ি করে পেয়ারার ডালে।

ভাবতে ভাল লাগছে যে, আমার সাইকেলটা তোমাদের বাড়ির দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে, তোমাদের বাড়ির কড়া নাড়ব আমি, আর তুমি এসে হাসিমুখে দরজা খুলবে, আমাকে নিজে হাতে চা করে খাওয়াবে। সে যে আমার কতবড় প্রাপ্তি হবে তা তুমি হয়ত বুঝবে না।

তুমি ও সাধন যদি সুখে থাকো, সুখী হও এবং তাও আবার আমার চোখের সামনেই হও, তাহলে যে আমার কী আনন্দ হবে, তা তুমি ভাবতেও পারো না।

আগামী পয়লা মার্চ সাধনকে এখানে জয়েন করতে হবে।

সাধনের বাড়ির ঠিকানা আমি ভুলে গেছি, তাই তোমাদের বাড়ির ঠিকানায় ওকেও একটি চিঠি ও ওর অ্যাপয়েণ্টমেন্ট লেটার পাঠাচ্ছি। আমার ইচ্ছা, তুমি নিজে হাতে গিয়ে সাধনকে আমার চিঠি ও অ্যাপয়েণ্টমেন্ট লেটারটি দিও।

আশাকরি তোমরা দুজনেই এ চিঠি পেয়ে খুব খুশি হবে।

তোমরা কবে আসছ জানিও।

লাঠিয়ালিয়া স্টেশন এখান থেকে অনেক দূর। আমি গরুর গাড়ি নিয়ে স্টেশনে থাকব। যেদিন তোমাদের নতুন বাড়িতে এসে উঠবে সেদিন তোমরা কি খাবে তা আগে থেকে জানালে আমি রাঁধিয়ে রাখব।

তোমাদের জন্যে একজন লোকও ঠিক করে রাখব, যে রান্নাবান্না এবং অন্যান্য কাজ করতে পারে। আশা করি, তোমাদের এখানে এসে কোন অসুবিধা হবে না, এক নির্জনতা ছাড়া। নতুন বিয়ের পর নির্জনতা খারাপ লাগার কথা নয়। তাই না?

তোমাদের বিয়েটা, আমি যতদূর জানি, শুধু সাধনের চাকরির কারণেই আটকে ছিলো। তাই যতো তাড়াতাড়ি বিয়েটা করে ফেলতে পার, ততই ভালো। না হলেও ক্ষতি নেই, এখানে মৈথিলী ব্রাহ্মণ দিয়ে বিয়ে দিয়ে দেবো। বুঝেছ?

কবে আসছ, কোন ট্রেনে আসছ, পত্রপাঠ জানিও।

চিঠিটা শেষ করে ফেলতে পেরে বেশ খুশি-খুশি লাগতে লাগলো।

মনে হল বেশ একটা বড় রকমের পুণ্যকর্ম করলাম।

তারপর চিঠিটা পেয়ে রুমা কি ভাববে, কি করবে, এসব ভাবতে লাগলাম।

পরের রবিবার ভোর-ভোর রাজিন্দরের ডেরার দিকে রওয়ানা হয়েছিলাম।

পথের সেই সুন্দর উপত্যকায় তখন শীত সরে গিয়ে বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে একটু

www.BanglaBook.org

একটু।

কতো যে ফুল, কতো যে পাখি, কতো যে সবুজের বাহার! চোখ জুড়িয়ে যায় দেখে। ঘাস পাতা গাছের রঙ ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। মাটির গন্ধ বদলে গেছে। শীতের ভোরের ভারী কুয়াশার গন্ধের বদলে এখন বসন্তের আমেজ-ভরা ফুলঝরানো ভোরে মিষ্টি হাওয়ায় কোনো মিশ্র আতরের গন্ধ আলতো হয়ে ভাসছে।

উপত্যকাটির মাঝামাঝি এলে একটা বড় টিলা পড়ে। টিলার নীচ দিয়ে দুটি পাহাড়ি নদী একে অন্যের বুকের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। এইখানে, এই নদীর নুড়িভরা-বুকে দাঁড়িয়ে রাজিন্দর একদিন এক সুরেলা নিস্তব্ধ দুপুরে ওর উদাত্ত গলায় ইকবালের গান শুনিয়েছিল আমায়, 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা, হিন্দুস্তাঁ হামারা হামারা। ম্যায় বুলবুলে হ্যায় উঁসকি, ইয়ে গুলসিঁতা হামারা হামারা।'

গানটা যেন কানে লেগে আছে। রাজিন্দর সত্যিই এই ফুল বাগানের বুলবুলি। ওর মতো করে এই উপত্যকা, এই পাহাড়, এই নদী ভালোবাসে, এমন কেউই নেই।

রাজিন্দরের ডেরায় পৌঁছে শুনলাম যে সে নেই। সে পিয়াসার ড্যামে গেছে।

ওর অনুচর গিরধারী বললো, দিনরাত চৌহান সাব ঐ ড্যামের কাজেই ছোটাছুটি করছে। পাণ্ডেবাবুর কুলি-সর্দার স্ট্রাইক করলো তো রাজিন্দরবাবু হাতে-পায়ে ধরে তাকে কাজ করাতে রাজী করালো। যেখানে যতটুকু অসুবিধা তা দূর করতে সে সব সময় সেখানে দাঁড়িয়ে। চান নেই, খাওয়া নেই, কোনো কোনোদিন রাতেও বাড়ি ফিরতে পারে না নাকি রাজিন্দর। তবে ও বললো, ড্যামের কাজও নাকি এক সপ্তাহের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।

গিরধারী গরম দুধ আর রুটি তরকারি খাওয়ালো।

খেয়ে দেয়ে শুধোলাম, রাজিন্দরের কুত্তাগুলো সব কেমন আছে?

ঈজ্জৎ কোথায় থাকে?

গিরধারী বললো, ঈজ্জৎ তো চলে গেছে।

—চলে গেছে? কেন?

—তা জানি না। একদিন সে রাতের বেলায় এসে হুজৌরকে বললো, কোথাও কারো কাছে পয়সার বদলে কাজ করিনি। আমার এখানে ভাল লাগছে না। যেখানে আসার আমি এমনিতেই আসি, এমনিতেই থাকি।

আমি শুধোলাম, রাতের বেলা, এই জঙ্গলের আনজান পথে কোথায় চলে গেল সে পরদেশী লোক?

গিরধারী বললো, সামনের টিলায় তাকে উঠে যেতে দেখেছিলাম। তারপর তার সাদা পোশাক চাঁদের আলোয় মিশে গেলো। আর তাকে দেখা গেলো না। যাওয়ার আগে সে বললো, কোনোদিন,আসার হলে এমনিতেই আসব। ডাকতে কি মাইনের লোভ দেখাতে হবে না আমায়।

—তোমার হুজৌর কিছু বললেন না?

হুজৌর বললেন, ঠিকই বলেছে ঈজ্জৎ! এ জায়গা তোমার থাকার জায়গা নয়।

আরো কিছুক্ষণ বসে থেকে আমি আবার সেই বুলবুলির গুঁলিস্তা পেরিয়ে বাড়ি ফিরলাম। কিছুদিন হলো তিতিরঝুমায় একটি গুজব সোচ্চার হয়ে উঠেছে। প্রথমে সেটা মৃদু ফিসফিসানির মতো ছিল, কিন্তু এখন সেটা প্রায় চিৎকারে পৌঁছেছে। মাঠে, হাটে, পথের মোড়ে, বড় গাছতলায়, পানের দোকানে, টাঙ্গাওয়ালা একাওয়ালাদের মুখে মুখে সব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সময়ই এই কথাটাই ঘুরছে। পিয়াসা নদীর প্রায়-সমাপ্ত ড্যামে নাকি ফাটল দেখা দিয়েছে। এদিকে ড্যাম প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

এই গুজব কার কাছে কতখানি অর্থবাহী তা বলতে পারব না, তবে এ গুজবে বিন্দুমাত্র সত্যও থেকে থাকে তাহলে এ সত্য রাজিন্দরকে কতখানি বিদ্ধ ও ব্যথিত করবে, তা আমার মতো অন্য কেউই বোধহয় জানবে না।

সব সময় আমি ভয়ে ভয়ে আছি।

রাজিন্দরের সঙ্গে দেখা হয় না অনেকদিন। গত এক মাস ও প্রায় সব সময় ঐ ড্যামের কাছেই রয়েছে। ও কনট্রাক্টর নয়, এঞ্জিনিয়ার নয়, সরকারের কোনো মুখপাত্রও নয় ও, তাই ওর কোনো ভূমিকা থাকার কথা নয় এই বাঁধের নির্মাণকার্যে। অথচ প্রথম থেকে শেষ অবধি ওই-ই সব। তা এখানকার লোকেরা সকলে খুব ভালই জানে। যা কিছু ভাল হয় এখানকার, সে সব কিছুর অনুপ্রেরণা রাজিন্দরেরই।

এদিকে আমিও খুবই ব্যস্ত ছিলাম। নিজের কাজ. তার উপরে নতুন ফ্যাকটরির প্রাথমিক কাজের তদারকিও ছিলো। যতদিন না সাধন এসে কাজ বুঝে নিচ্ছে ততদিন আমাকেই একটু দেখাশোনা করতে হবে। কারণ সাধন আমারই মনোনীত প্রার্থী।

সেদিন দুপুরবেলা খেতে এসেছি ডেরায়। ধক্কনলাল খাবার দিয়েছে। খেতে বসব, এমন সময় টেলিগ্রাম-পিওন সাইকেল ক্রিং ক্রিং করে একটা টেলিগ্রাম দিয়ে গেলো।

খাওয়া ছেড়ে উঠে তাড়াতাড়ি টেলিগ্রামটা খুলে দেখি রুমার টেলিগ্রাম। 'রীচিং টুয়েন্টি সেকেন্ড। মর্নিং অ্যাটেন্ড স্টেশান।'

খাওয়া শেষ করে উঠতে-না-উঠতেই ধক্কনলাল বললো, একেবারে ভুলে গেছিলাম বাবু সকালে পোস্টাফিসে যখন গেছিলাম, তখন তোমার একটা চিঠি নিয়ে এসেছি।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বারান্দার চেয়ারে বসে চিঠিটা খুললাম। সাধনের চিঠি! দেখি, সাধন কি লিখেছে?

কলিকাতা
২৬শে ফেব্রুয়ারী

বেণী,

রুমার মারফৎ তোর চিঠি পেলাম।

তুই বোধহয় সবাইকে তোর নিজের মতই ভাবিস। রুমা আমাকে বিয়ে করবে কি আমি তাকে বিয়ে করব, এটা আমার এবং রুমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

যে উদারতা তোকে মানায়না, সে উদারতা তুই না দেখালেও পারতিস। তোর নিজের চাকরিও তো পিসেমশাইর দেওয়া। তোকে তো আমি আমার উপকার করার জন্যে বলি নি। তাছাড়া আমার উপকার করার জন্যে তুই এ চাকরি যোগাড়ও করিস নি। করেছিস তোর মিথ্যা মহত্ব দেখাবার জন্যে এবং রুমার কাছে নিজেকে বড় করার জন্যে।

রুমার সম্বন্ধে আমার কোন দুর্বলতা নেই। আজ অন্তত নেই। থাকলেও একজনের দয়ায় নির্ভর করে তাকে পেতে চাওয়ার মতো হীন আমি নই।

আমি যদিও এখনও বেকার, তবুও আমি বিশ্বাস করি যে, কারোর দয়ার উপর নির্ভর করে কেউ কোনোদিন বাঁচে না। কখনও বাঁচেনি। আমার সমস্যাটা আমার একার নয়। আমার মতো এবং আমার চেয়ে অনেক ভাল-ভাল ছেলেরাও আমারি মতো অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। তাদের সকলেরই ভবিষ্যৎ সমান অন্ধকার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোর পিসেমশাই বা তুই, তোর কিংবা আমার একটা হিল্লে হয়ত করতে পারেন কিন্তু তাতে অন্যান্য পিসেমশায়হীন লক্ষ-লক্ষ ছেলেদের কোনো উপকার নেই।

তুই হয়ত আমাকে ভালোবাসিস, হয়ত রুমাকে যতখানি ভালোবাসিস তার চেয়ে কম বাসলেও বাসিস, তাই তোকে দুঃখিত করতে চাই না রূঢ় কথা বলে। কিন্তু তোর জানা উচিত যে আমার সমস্যাটা আমার ব্যক্তিগত সমস্যা নয়। এর সমাধান আমার একার চাকরি পাওয়াতে হবে না। কিসে যে হবে তা আমি জানি না। এরকমভাবে বাঁচার কোনো মানে নেই। আমাদের বাপ-ঠাকুরদাদারা সবাই এরকমভাবেই দয়ানির্ভর হয়ে বেঁচে এসেছেন। আমরা অন্যরকম ভাবে বাঁচতে চাই। আমাদের নিজেদের অধিকারেই আমরা বাঁচতে চাই।

জানি না, তোকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারলাম কি না। বোঝালেও তুই বুঝবি কিনা জানি না। তাই সে চেষ্টা না করাই ভালো।

আমাদের পাড়ার নবীন নিয়োগীকে তুই চিনিস। ও বি.এস.সি. পাশ। এবং একটা চাকরি ওর আমার চেয়েও বেশি দরকার। কেন দরকার তা ও নিজেই জানাবে।

নবীনকে আমি পাঠাচ্ছি। সাধন সরকার সেজে ও এ চাকরিটা করবে। পয়লা মার্চের আগেই ও ওখানে পৌঁছবে।

সারা দেশে সকলে, ছোট-বড় প্রত্যেকে, আজ অনেক রকম জাল-জুয়াচুরিই করছে। সে তুলনায় আমার এই জালিয়াতি এমন কিছুই নয়। আশা করি, সাধন সরকার হিসেবে ওকে প্রতিষ্ঠিত করতে তোর অসুবিধে হবে না কোনো।

তোর রুমা তোর কাছে যাবে। রুমা মাসিমাকে সব কথা বলেছে। মাসীমা সব জানেন। এবং পুত্রবধূ বলে ওকে পাবেন জেনে খুশি হয়েছেন। রুমাকে পেয়ে তুইও নিশ্চয়ই খুশি হবি। রুমা এই মুহূর্তে তোকে যতখানি চায়, আমাকে ততখানি চায় না। যদি বা চাইতও, তাহলেও আমার পক্ষে তাকে গ্রহণ করা সম্ভব হত না নানা কারণে।

রুমা একা যাচ্ছে পরশু তোর কাছে। ওকে স্টেশনে নিতে আসিস।

এটুকু বলি শেষে, যে নিজের মূর্খামীতে ভুল করে জীবনে আর যাই করিস, কারো পরম গর্বের জায়গায় হাত দিস না ভুলেও। আমার চাকরি নেই বলে তুই মনে করিস আমার আত্মসম্মানও নেই? আমি তো কারো ঘাড়ে বোঝা হয়ে নেই। নিজেরটা নিজে চালিয়ে নিচ্ছি। যে ভাবেই হোক। আমার কোনো দায়িত্বও যে নেই তাও তুই জানিস। তবে?

তোর মতো ফুলগাছ-ঘেরা কোয়ার্টার, ঠাণ্ডা শরীরের পরাভূত স্ত্রী, পোষা পায়রার চাকরি, আমার জন্যে নয়। এ জীবন অন্য জীবন। আমার জীবনে শুধু আগুনের হলকা। তার মধ্যে আছি, এবং তার মধ্যেই থাকব। এও আর এক রকমের জীবন। এ জীবনের মানে তুই বুঝবি না।

ভাবতে আশ্চর্য লাগছে এই ভেবে, যে রুমা যাকে প্রত্যাখান করেছিল সেই তোরই দেওয়া তু-তু. চাকরি আমি গ্রহণ করে সুখে রুমাকে জড়িয়ে সংসার করব, এমন কথা আমার সম্বন্ধে তুই ভাবলি কি করে? তুই কি পুরুষমানুষ?

আর কিছু লেখার দরকার নেই। তোর রুমা যাচ্ছে। তাকে গ্রহণ করিস। আমার সমস্ত শুভেচ্ছা রইল তোদের প্রতি। সত্যিরে, সত্যি সত্যিই সব আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল!

ইতি তোদের তেলে-ভাজা-ওয়ালা
সাধন সরকার।

www.BanglaBook.org

চিঠিটা পড়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। মনে হলো, কোনো অদৃশ্য ঘাতক যেন আমাকে খুব কয়েক ঘা চাবুক মেরে গেলো। হঠাৎ আমার রাজিন্দরের শীসমহলের সেই সাদা পোশাকের বৃদ্ধর কথা মনে হলো, সেই যেন আমাকে চাবকে গেল এক্ষুনি।

বেরোবার সময় ঠক্কনলালকে গরুরগাড়ি ঠিক করার কথা বলে গেলাম।

ভোরের ট্রেনে যখন রুমা আসছেই তখন তাকে আনতে স্টেশনে যেতেই হবে। রুমা এলেই সব বিস্তারিত শোনা যাবে।

সাধনের চিঠির চাবুকের জ্বালা তখনো মোছেনি মন থেকে, কিন্তু তবুও মনে হলো, মনে হয়ে খুব ভালো লাগলো যে রুমা সত্যিই আসছে। আমার ঘরে, আমার কাছে থাকছে। মুহূর্তের জন্যে এ কথা মনে হয়েও খুব ভালো লাগলো।

সাইকেলে চড়ে খনির কাছাকাছি প্রায় এসেছি, এমন সময় পুব দিকের আকাশে একটা প্রলয়ঙ্কারী আওয়াজ হলো। চমকে চাকিয়ে দেখলাম আকাশ নির্মেঘ, অথচ আওয়াজটা মিথ্যে নয়। পাহাড়ে পাহাড়ে আওয়াজটা অনেকক্ষণ কাঁপল।

কিসের আওয়াজ বোঝা গেলো না।

খনির কাজ সেরে এসে অফিসে বসে বিলিং-রিপোর্ট তৈরি করছি, এটাওয়াতে পাঠাব মালিকের কাছে। এমন সময় আমাদের একজন কনট্রাকটর সাইকেলে চেপে এসেই খবর দিলো, দু-ঘন্টা আগে পিয়াসার পুরো ড্যামটি ভেঙে পড়েছে; অনেক কুলি-কামিন মারা গেছে।

ছোট জায়গা হলে যা হয়, কারখানার মজুররা বললো, আমরা দেখতে যাব এক্ষুনি, সকলেই খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তাদের মধ্যে অনেকেই আবার প্রায় দৌড়তে দৌড়তে ঊর্ধ্বশ্বাসে গেলো, কারণ তাদের অনেকের আত্মীয়স্বজনরা সেখানে কুলি-কামিনের কাজ করছিল।

অফিস বন্ধ করে আমার ডেরার দিকে ফিরছি, এমন সময় পথেই রাজিন্দরের সঙ্গে দেখা।

তাকে চেনা যাচ্ছে না। দেখে মনে হচ্ছে এ রাজিন্দর নয়, যেন তার প্রেতাত্মা। রাজিন্দরের চোখের দিকে তাকাতে পারলাম না আমি। আমার মনে হলো, ড্যামটা যেন আমিই ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছি নিজের হাতে।

কোনো কথা না বলে পাশাপাশি সাইকেল চালিয়ে আমরা আমার ডেরায় এলাম।

রাজিন্দর বারান্দায় বসলো।

ওর চুল উস্কোখুস্কো, মুখ শুকনো। চা পর্যন্ত খেলো না। ও পাগলের মতো বলতে লাগলো, সব ঘুণ ধরে গেছে বেণীবাবু। ঘুণপোকায় আমাদের মেরুদণ্ড খেয়ে গেছে। কিছু করা যাবে না এখানে, কিছুই করা যাবে না।

আমি বললাম, রণধীর পাণ্ডেকে জিগ্যেস করলে না? কেন এমন হলো?

—জিজ্ঞেস করলাম না মানে, শালার গলা টিপে আমি ওখানেই শালাকে মেরে ফেলেছিলাম আর একটু হলে। কিন্তু ও যা বলল, তাতে দেখলাম, অসংখ্য বড়লোক এবং গরিব লোকের গলা টিপে তক্ষুনি মারতে হয়। তেমন জোর তো আমার হাতে নেই বেণীবাবু। তাছাড়া, তা করে লাভই বা কি?

আমি শুধোলাম, কি শুনলে পাণ্ডেবাবুর কাছে?

রাজিন্দর একটু চুপ করে থেকে বললো, শুনলাম কলঙ্কের ইতিহাস, কুকুরের রোজনামচার কথা। জনদরদী নেতা থেকে আরম্ভ করে সরকারি বড়-ছোট অফিসার,

www.BanglaBook.org

কেরাণি, ব্যবসাদার, এবং আরো অনেক বেসরকারি লোককে তার নানাভাবে পেট ভরাতে হয়েছে। এবং সে নিজেও সিমেন্টের সঙ্গে কাদা মিশিয়ে চালিয়েছে।

আশ্চর্য! সবসময় সঙ্গে থাকলাম, অথচ বুঝতে পর্যন্ত পারলাম না কিছু।

ওকে যখন বললাম, শালা! তোমাকে এক্ষুনি গলা টিপে মারব। ও বললো, আমি ব্যবসাদার মানুষ। দু-পয়সা কামাব বলেই এত দিন ধরে এত ঝামেলা করছি। আমি কি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াব? এ ড্যাম ত আমার একার সম্পত্তি নয়, দেশের সম্পত্তি। এ কথাটা যদি দেশের অন্য কেউই না বোঝে, নেতা এবং বড় বড় আমলারাও না বোঝে তবে আমার একার বোঝার দরকার কি?

বললো, অন্য সকলে যদি বিনা মেহনতে, বিনা লগ্নীতে বসে বসে পুকুরচুরি করে তাহলে আমি দিনরাত মেহনত করে কি ঘরের টাকা দেশের কাজের জন্যে গচ্চা দেব? তাছাড়া, এমনি করেই ত এ পর্যন্ত কত কাজ করলাম। সবই উৎরে গেল। এ আমার বদ নসিব, তাই এত তাড়াতাড়ি ভেঙে গেলো।

এই অবধি বলে, রাজিন্দর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলো, তারপর বললো, শুনলে বেণীবাবু, আমার এত স্বপ্নের, এত কল্পনার পিয়াসা ড্যাম আজ ভেঙে গেলো। কত লোকের ট্যাক্সের টাকা, কত লোকের পরিশ্রম, কত লোকের স্বপ্ন সব গুঁড়িয়ে গেলো। নাঃ বেণীবাবু, কিছু করা যাবে না, এখানে কিচ্ছু করা যাবে না। আমি আজই অন্য কোথাও চলে যাবো।

আর কোনো কথা না বলে রাজিন্দর সাইকেলে উঠে চলে গেলো।

আমার দিকে ফিরে পর্যন্ত তাকাল না।

অথচ আমার ওকে আজ কত কথা বলার ছিলো। আমার রুমা আসছে কালে ভোরে। আমার জীবনে কতো বড় একটা পরিবর্তন হতে যাচ্ছে। ঠিক এমন সময় পিয়াসা ড্যাম ভেঙে পড়লো। ভাঙার সময়টা কি অন্য কোনো সময় হলে হতো না?

ড্যাম ভেঙেছে তা আমি এখন কি করবো? কাল আমার রুমা আসছে, এসময়ে আমার এ সব দেশের ও দশের ভাবনা ভাবার সময় নেই।

রাজিন্দর চলে যেতেই আমার দেশ, আমার সমাজ, পিয়াসা ড্যাম, এ সবকিছু বড় বড় চিন্তা আমার মন থেকে উবে গেলো।

আমি ঘর গোছাতে লাগলাম, চতুর চড়ুই পাখির মতো।

তক্ষুনি নোংরা হয়ে-যাওয়া বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, তোয়ালে, এ সব কাচতে দিলাম। বইয়ের তাক গুছিয়ে রাখলাম। রুমা যে ঘরে শোবে সে ঘরে চারপায়া, আলনা, এ সব ঠিকঠাক করে রাখলাম। ও-ঘরের বাথরুমের জানালার একটা কাচ ভাঙা ছিল, সেখানে ময়দার আটা করে কাগজ সাঁটলাম। এখন না করলে আর সময় পাব না, আমার ভোর চারটেয় বেরোতে হবে স্টেশনে যাবার জন্যে।

সব কাজ শেষ করে, কাল ধক্কনলাল রুমার জন্যে বিশেষ কি রান্না করবে না করবে বলে দিয়ে, চান করতে যাব, তখন রাত প্রায় আটটা, এমন সময় বাজীরাও দৌড়তে দৌড়তে এসে খবর দিলো, সত্যানাশ হো গীয়া বাবু, চৌহানসাব জিন্দা নেহি হ্যায়।

তারপর কি করে, কিভাবে পাহাড় পেরিয়ে উপত্যকার পাকদণ্ডী পথে সাইকেল চালিয়ে রাজিন্দরের ডেরায় পৌছলাম, আমি নিজেই জানি না।

তখন কৃষ্ণপক্ষ। আকাশে আলো নেই; তারাদের আলো ছাড়া। দূর থেকে রাজিন্দরের

www.BanglaBook.org

বাড়িটাকে ভূতের বাড়ি মনে হচ্ছিল।

আমি পৌঁছবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উলটো দিকের পথ দিয়ে কোতোয়ালির বড় দারোগাও এসে পৌঁছলো।

শীষমহলের কাঠের চওড়া দরজাটা হাঁ করে খোলা ছিলো। মধ্যে একটা হ্যাজাক জ্বলছিলো। আয়নায় আয়নায় সেই উজ্জ্বল আলো চতুর্দিকে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছিলো।

রাজিন্দর ফরাসের উপর তাকিয়া হেলান দিয়ে, আধশোয়া ভঙ্গীতে পড়েছিল। মাথাটা ডান দিকে কাত-করা।

দারোগার সঙ্গেই ঢুকলাম আমি।

ঢুকেই দেখলাম, রাজিন্দরের চারপাশে সেই কালো কুচকুচে চারটে কুকুরও মরে পড়ে আছে। প্রত্যেকের ফুসফুসের মধ্যে দিয়ে গুলি গেছে। আমীর এবং মালিক, গরিব এবং নোকর চারজনেই পাশাপাশি শুয়ে আছে। চারজনেই রাজিন্দরের শব পাহারা দিচ্ছে।

আয়নাগুলোর দিয়ে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম আমি। কুঁকড়ে গেলাম আমি নিজের চেহারা দেখে।

তারপর ভালো করে তাকাতেই দেখি, আলো-চমকানো আয়নার উপরে আলকাতরা দিয়ে আঙুল বুলিয়ে কি যেন লিখেছে রাজিন্দর। হিন্দীতে বড় বড় করে লিখেছে।

বিরাট ভুঁড়িওয়ালা বড় দারোগা পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে, জোরে জোরে, প্রায় অশিক্ষিতর মতো বানান করে পড়ছিল। 'বাঘের বাচ্চা কোনোদিনও কুকুরের বাচ্চাদের নেতা হয় না। কুকুরের নেতা কুকুররাই হয়। সবসময়।'

দারোগা একটু চুপ করে থাকল, তারপর স্বগতোক্তি করল, দিমাগ খারাব হো গায়া থা।

রাজিন্দর কপালে নল ঠেকিয়ে ট্রিগারটা টেনে দিয়েছিল। সুন্দর মুখময় খয়েরি খয়েরি কি সব থকথকে জিনিস মাখামাখি হয়েছিল। এই আশ্চর্য উপত্যকার, এই গুঁলিস্তার বুলবুলির ঠোঁট দিয়ে রক্ত গড়িয়ে গেছিল; যে ঠোঁট আর কখনও গান গাইবে না।

কিছুক্ষণ পর শীষমহল থেকে ধীরে ধীরে বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

দেখি, সেই থমথমে রাতে অনেক লোক জড়ো হয়েছে, জড়ো হচ্ছে শীষমহলের কাছে। এখানে ওখানে, আশে-পাশের টিলায়, জঙ্গলে, ক্ষেতে, কাছে দূরে, অন্ধকারে বিন্দু বিন্দু আলো কাঁপছে। কূপী বা মশাল বা হারিকেনের আলো।

ওরা চতুর্দিক থেকে চৌহানসাহেবের বাড়ির দিকে ধীরে ধীরে আসছে।

ঐখানে দাঁড়িয়ে, আমার হঠাৎ মনে হলো, আমার চারদিকে, কাছে দূরে অনেকগুলো বাঘের চোখ অন্ধকারে যেন জ্বলজ্বল করছে।

তারা-ভরা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে, হঠাৎ একেবারে হঠাৎই, কী যেন এক শ্বাসরোধকারী যন্ত্রণায় আমার বুক ভেঙে যেতে লাগলো। এই আমি, এই পাত-কুড়োনো, পিসেমশাই-সর্বস্ব, চড়ুই পাখি আমি; সেই অন্ধকারে হু-হু করে কেঁদে উঠলাম।

কবে? রাজিন্দর? কবে? তোমার এই স্বপ্ন সত্যি হবে?

কবে আমরা, এই আসমুদ্র হিমাচলের কোটি কোটি মানুষ বাঘের মতো মাথা উঁচু করে, আত্মসম্মানের গর্দান ফুলিয়ে তোমার এই শীষমহলের আয়নার সামনে দাঁড়াবো।

কবে, রাজিন্দর; কবে?

www.BanglaBook.org

বীজতলি

এবারে গরমটা বেশ বেশিই পড়েছিলো। বর্ষা না নামলে ফসল কি হবে না হবে, কিছুই বলা যায় না। জমি অবশ্য সামান্যই কিন্তু তবু সেটুকুও সামলে-সুমলে না রাখলেও চলে না।

কমলার আত্মসম্মান জ্ঞানটা চিরদিনই টনটনে। সে কারণে তাঁর ছেলে মেয়ের সংখ্যা নিতান্ত কম না-হলেও তাদের কাছে নিজের পেটের কারণে হাত পাততে তাঁর সম্মানে লাগে। কেউ ভালোবেসে কিছু করলে, অন্য কথা।

অবশ্য নিজের প্রয়োজন বলতেও তো তেমন কিছুই নয়। এক-চড়া খান। রাতে একটু খই-দুধ। সামান্য ফলমূল। থান কাপড় আর সায়া ব্লাউজের খরচও তেমন কিছুই নয়। চলে যায় এক রকম করে।

বড় ছেলে অকু প্রায়ই লেখে কটক থেকে "মা এখানেই চলে এসো। মায়ে-ব্যাটায় কষ্টে সৃষ্টে চলে যাবে। জমি ও বাড়ি বেচেবুচে যা পাও তা নিয়ে চলে এসো। আমিও তো বুড়োই হয়ে গেলাম। রানী কেমন ডঙ্কা বাজিয়ে শাঁখা-সিঁদুর নিয়ে চলে গেলো দেখলে ত! কে আগে যায়, কে পরে তা কি কেউ বলতে পারে? পাঁচটা নয়, দশটা নয়; আমার একটাই মা আমার দু মুঠো জুটলে তোমারও জুটবে। চলে এসো আর দেরী না-করে!"

মাটির দাওয়ায় মাদুর পেতে, হাতে অকুর লেখা খোলা চিঠি নিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে অনেক কিছু ভাবেন কমলা। কাঁঠাল গাছ থেকে কাঁঠাল পাতা ঝরে পড়ে। রঙ্গনের ডালে বুলবুলি শিস দেয়। মৌ-টুশকি পাখি টুশকি মেরে মেরে সারা বছর ধরে ফোটা জবাফুলে কাঁপন তুলে মধু খায়। উদাস হয়ে যান কমলা নানা কথা ভাবতে ভাবতে।

স্বামী মুকুন্দ দেশ ভাগ হবার পর কোলকাতায় কিছুদিন ভিখিরির মতো ঘুরে বেড়িয়ে শেষে আসামের এই গোয়ালপাড়া জেলার কুমারগঞ্জে এসেই আস্তানা গেড়েছিলেন। কলকাতা শহরের রুক্ষ স্বার্থপর হৃদয়হীনতার নোনা স্বাদ মুখে নিয়ে। তখন বড় ছেলে

www.BanglaBook.org

অকুর বয়স মাত্র দশ। এবং সবচেয়ে ছোট সন্তান মেয়ে দিবার বয়স মাত্র দুই। কি ভাবে যে ছেলেমেয়েদের নিয়ে এই দুহি মাটির ঘরে দিন-গুজরান করেছিলেন তাঁরা, এখন ভাবলেও অবাক লাগে। নেহাৎ সস্তার দিন ছিল তাই।

মুকুন্দ ছিলেন জমিদার-পুত্র। মুকুন্দ ত চলে গেলেন তিনদিনের জ্বরে। তখন অকুর বয়স মাত্র পনেরো। আসলে, যৌবনের প্রান্তভাগ পর্যন্ত অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে কাটিয়ে এসে দেশভাগের এই দুর্দৈব মুকুন্দ আর সহ্য করতে পারলেন না। এত গ্লানি, অপমান, নিজেদের বিনা দোষে স্বীকার করে নেওয়া ওঁর পক্ষে কষ্টকর ছিল।

গান্ধী, জওহরলাল আর জিন্নার উপরে বড় গভীর রাগ নিয়ে মারা গেছিলেন মুকুন্দ।

মুকুন্দদের দোষ ছিলো অনেকই। তার মধ্যে প্রধানতম দোষ এইই যে, তাঁরা নিজেদের বদলাতে পারেননি। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে নিজেদের শিকড় থেকে সম্পূর্ণ ছিন্ন করতে পারেননি নিজেদের। আফ্রিকান হাতির মতো, নিজেদের স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ছেড়ে এসে আর বাঁচতে পারেননি। পোষমানা-স্বভাব থাকে না কিছু মানুষের। মুকুন্দ সেই জাতের মানুষ ছিলেন।

অকুটাই সবচেয়ে আদুরে ছেলে ছিল কিন্তু সবচেয়ে বেশি কষ্ট করেছে ওই, কমলার সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই পুরো সংসারটাকে দুর্যোগের সাইক্লোনের মধ্যে আড়াল-করা চারাগাছের প্ল্যানটেশানের মতোই বাঁচিয়ে রাখতে। অথচ আজকে অকুকেই ভুলে গেছে সেই সব ভাইবোন, যাদের জন্যে সবেচেয়ে বেশি করেছে সেই। কমলার মাঝে মাঝে মনে হয় অনেকগুলো গাধা মরে বড় পরিবারের বড় এক একটি ছেলে জন্মায়।

সব বেচে-বুচে দিয়ে চলেও যেতেন একদিন হয়ত কমলা কুমারগঞ্জ ছেড়ে। কিন্তু এই পড়ো-পড়ো পোড়ো-বাড়ির মধ্যেই মুকুন্দর স্মৃতি বেঁচে আছে। ঢেঁকিতে পা দিতে দিতে, কলাই-এর ডাল উঠোনে শুকোতে শুকোতে, মুগ আর অড়হড় ডালের বড়ি বসাতে বসাতে এবং আমলকি আর আমের আচার তেলে চারাতে চারাতে মুকুন্দর কথা মনে পড়ে প্রায়ই কমলার। তার ফোটোতে সকালে একটি করে মালা পরান, যে-কোনো ফুলে গাঁথা। কখনও গরমের পূর্ণিমার রাতে, যখন নদীর দিক থেকে জোরে হাওয়া বয় তখন, অথবা ঘন বর্ষার ব্যাঙ আর ঝিঁঝির ডাকে ভারী শোঁ শোঁ হাওয়ার গর্জন-তর্জনের মধ্যে বসে, কমলা, মুকুন্দর প্রিয় রামপ্রসাদী গান গুনগুন করে গান এখনও। মানুষ চলে যায়; তার স্মৃতি পড়ে থাকে। তীব্র আতর-গন্ধী শরীরী কাম নিঃশেষে উড়ে গেছে কিন্তু প্রেম ঠিকই জড়িয়ে আছে যৌবনহীনা কমলার মনে। একদিন যে সব-ইন্দ্রিয়ই পরিতৃপ্ত হয়েছিলো পূর্ণতায় তার স্মৃতি জেগে আছে, থাকবে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। দরাজ-হাতে রাঁধা ইলিশমাছের গন্ধর মতো, প্রথম মৈথুনের আশ্চর্য নিবিড় পরিপ্লুতির সোঁদা সিঁদেল চুরির অবশ-করা যুগলবন্দী অনুভূতির ঐশ্বর্যে অঙ্গাঙ্গী হয়ে।

সব হারায় না; বাকী থাকে কিছু।

অনেকই থাকে হয়ত!

কমলার টিনের তোরঙ্গে একটি বংশ লতিকা আছে।

অকু কটকের এক স-মিলে কাজ করতো। ঢুকেছিল, কুড়ি বছর বয়সে। সমস্ত মাইনে পাঠিয়ে দিতো কমলাকে। নিজে না-খেয়ে থেকে। ফলে যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

www.BanglaBook.org

কাজও চলে যায়। নতুন কাজ নেয় কটকের খুব নামী ঠিকাদার সুরবাবুদের কাঠের গোলায়। বিয়ে করে, পঁয়ত্রিশে।

রানী বড় ভাল মেয়ে ছিলো। নিজেকে অমন করে বঞ্চিত করে কোনো বৌ, দেওর, ননদ, শাশুড়ির ভালো দেখে না আজকাল। রানী মাত্র পাঁচ বছর চরম দারিদ্র্যের মধ্যে সংসার করে রানীর পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। ওদের একমাত্র ছেলে, লংকা। লংকার বয়স এখন পনেরো।

বকু ডালটনগঞ্জে এক গালার ব্যবসাদারের কাছে কাজ করে। বকু আর ছবির এক ছেলে এক মেয়ে।

দকুকে মানুষ করে, বলতে গেলে অকুই। ও নিজেকে সব দিক দিয়ে বঞ্চিত করে যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হয়ে ছোট ভাইকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ না করলে, দকু আজকে পাঁচ-হাজারী মাইনের চাকরি করতে পারতো না দিল্লিতে। পড়াশুনায় দকু অবশ্য খুবই মেধাবী ছিলো চিরদিনই। ও কিন্তু মুকুন্দর হৃদয় পায়নি। মা হিসেবে কমলা একথা জানেন যে, আজকে সবচেয়ে বড়লোক হতে পারে দকু, কিন্তু ছেলেমেয়েদের মধ্যে অমানুষ হয়েছে একমাত্র সেই-ই। মেধা, স্বাচ্ছল্য, যশ কোনো কিছুর সঙ্গেই মনুষ্যত্বের কোনো সাযুজ্য নেই। কমলা নিজের জীবনেই অনেক মেধাবী, ধনী, এবং যশস্বী অমানুষ দেখেছেন। দকুকে উনি মানুষ বলে গণ্যই করেন না। যে-ছেলেকে নিয়ে তাঁর সবচেয়ে বেশি গর্বিত হবার কথা ছিলো, তাকেই তিনি অস্বীকার করেন। দকুও যে তাঁকে অস্বীকার করে শুধু সে কারণেই নয়; দকু তাঁকে এবং অকুকে তাঁদের ন্যায্য মর্যাদা ও সম্মান যদি দিত তাহলেও তিনি স্বীকার করতেন না ওকে। ও যখন পেটে আসে তখন কমলা নিজেও বড় নীচ ও পশুসুলভ মানসিকতার শিকার হয়েছিলেন।

সে কথা যাক।

সে কথা একমাত্র তিনিই জানেন আর জানে সেই পশু। সে এখন বেঁচে আছে কিনা, এবং বেঁচে থাকলেও কোথায় আছে, সে খবর জানেন না কমলা। জানতেও চান না।

এ জীবনে নিজেকে তিনি একবারই নষ্ট করেছিলেন, মিথ্যাচার করেছিলেন একটি মাত্র বার মুকুন্দর সঙ্গে। দকু তাঁর সেই পাপের ফল। পাপের গাছের ফলে পাপের গন্ধ লেগে থাকেই। পাপের ফুল ধরে তাতে। সে ফুল জুঁই-বেলি নয়, ধুতরো অথবা আকন্দ।

ঐ একটি মাত্র সন্তানকেই মুকুন্দর সন্তান বলে মনে হয় না সঙ্গত কারণেই। মুকুন্দ কখনও মেধাবী ছিলেন না। বুদ্ধি এবং দুর্বুদ্ধি দুইই ছিলো না তাঁর। তার মস্তিষ্ক ছিলো তার নায়েব। দীর্ঘ অব্যবহারে মস্তিষ্কের ক্ষমতা লোপ পেয়েছিল। কিন্তু হৃদয় ছিল মানুষটার মস্ত বড়। তাঁর সুদর্শন, সুঠাম শরীরের ছিঁটেফোঁটাও নায়েবের ছিলো না। তার কাম ছিলো প্রবল কিন্তু প্রেম কাকে বলে সে সম্বন্ধে তার ধারণা পর্যন্ত ছিলো না। তাঁদের যে জমিদারী ছিলো একদিন এ কথাও পশ্চিমবঙ্গের মানুযেরা কেউই বিশ্বাস করেননি। উল্টে অপমানই করতেন।

কমলা মানুষ হিসেবে কখনও খারাপ ছিলেন না। অসতী ছিলেন না। কিন্তু ভগবতীও ছিলেন না। নেহাৎ একজন মানুষই ছিলেন। কোনো বিশেষ সময়ে জীবনের কোনো বিশেষ মুহূর্তে কামভাব তাঁর ভালোত্বকে ছাপিয়ে উঠেছিল। আজকে জীবনে অনেক পথ চলে এসে, পড়ন্ত বেলার ফিকে-রোদ্দুরে উঠোনের মাটির দাওয়ায় বসে, গ্রীষ্মশেষের নদী থেকে আসা হাওয়ার মধ্যে ঝরে-পড়া হলুদ-লাল কাঁঠাল পাতার মতো ভেসে যেতে যেতে কমলার মনে হয় যে, তাঁর জীবনটা এক মিশ্রবোধ, মিশ্র সততা, মিশ্র প্রেম, মিশ্র

www.BanglaBook.org

ভালোমন্দের জীবন। হয়ত সকলের জীবনই তাই। অবিমিশ্রতা বোধ হয় মানুষের জীবনে একটি লক্ষ্য, একটি আদর্শ, কখনও কাম্য অথবা লভ্য নয়। সতীত্ব যে কখন গিয়ে গড়িয়ে যায় পরপুরুষের বাহু বন্ধনের উষ্ণতায়; সততা, অবিশ্বাস্য অসততাতে; প্রেম, তীব্র অনীহা ও বিরক্তির অপ্রেমে, ভালোত্ব, খারাপত্বর হোগল-বাদায় তা কোনো মানুষের পক্ষেই আগে বলা বা জানা অসম্ভব। এবং অসম্ভব বলেই আমরা মানুষ, ভগবান নই। এবং ভগবান নই বলেই এত সুখী আমরা। অথবা দুঃখীও। ভাবতেন কমলা।

ভাবেন কমলা। সপ্তাহ দুই পরে অকুর কাছে যাবেন বলে তৈরি হতে হবে কমলাকে। লংকাই আসত তাঁকে নিতে। কিন্তু পরীক্ষার কারণে আসতে পারবে না। এবারে কটক গেলে একেবারে রথযাত্রা অবধিই থেকে আসবেন। অকু পুরীতে নিয়ে যাবে বলেছে। সেই সঙ্গে ধবলগিরি,'উদয়গিরি-খণ্ডগিরি ইত্যাদিও দেখে আসবেন। নতুন কিছু দেখার উৎসাহ আর নেই। এখন শুধুই সময় কাটানো। সময় যতো সুন্দরভাবে কাটানো যায়। জীবনের বেশির ভাগটিতেই মানুষের হাতে সময় থাকে না। সময় যখন দামী থাকে তখন সময় একেবারেই থাকে না। আর সময়ের দাম যখন থাকে না তখনই সময় থাকে অঢেল। কেউই কিনতে আসে না, এমন কি ধার বা দান নিতে পর্যন্ত আসে না। সময়ের রসদ জমতে থাকে, ভারী হতে থাকে, তার পর অবসরের স্বল্প অবকাশে তাকে আঁটানো মুশকিল হয়ে পড়ে। তারপর এক সময়ে কমলার মতো বেশীর ভাগ বিধবা নারী বা বিপত্নীক পুরুষ সেই জমা-সময়ের পাহাড়ের নীচে চাপা পড়ে যান, হারিয়েই যান চিরতরে।

অকু নিজে এসেছিল কটক স্টেশনে কমলাকে নিতে।

ট্রেনের কামরার ভিতরেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল মাকে। বছর দেড়েক পরে দেখলেন কমলা অকুকে। একেবারে বুড়ো-বুড়ো দেখাচ্ছে ওকে। কপালের দু-পাশের চুলে পাক ধরেছে, সামনেটাতে টাক পড়েছে অনেকখানি। পান আর গুণ্ডী গেয়ে খেয়ে দাঁতগুলো কালো। গুড়াখু দিয়ে দাঁত মাজাতে বোধহয় আরও একটু বেশি কালো দেখাচ্ছে।

সাইকেল রিক্সাতে মাল-পত্র চাপিয়ে নিয়ে মাকে নিয়ে অকু চললো বাখরাবাদের দিকে। নদীর পার ছেড়ে ঢালু রাস্তা দিয়ে নেমে রিক্সা এগিয়ে চললো। তারপর দে'জ মেডিকেলের ওষুধের গুদোমের সামনে বাঁক নিয়ে চললো রিক্সা ছায়াচ্ছন্ন শান্তির রাস্তা দিয়ে।

অকুর কাছে, কটকে; বকুর কাছে ডালটনগঞ্জে অথবা নিশির কাছে কৃষ্ণনগরে যেতেও আর অত খারাপ লাগে না। কিন্তু যেতে ইচ্ছে করে না একেবারেই কোলকাতাতে। দিবার কাছে। নিঃশ্বাস নেওয়া যায় না, পথে হাঁটা যায় না, ট্রামে-বাসে চড়া যায় না, বর্ষার ব্রহ্মপুত্রের স্রোতের মতো মানুষজন আর যানবাহনের স্রোত। দিবা আর রাজেনকে তিনি বলেন, বদলী নিয়ে যেখানে হোক চলে যেতে। ছেলেমেয়েগুলো ত অন্ততঃ একটু খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচবে। এই কারণেই, পুজোর সময় বা বড়দিনের ছুটিতে আর কেউ আসুক আর না আসুক দিবা আসে ছেলে মেয়েদের নিয়ে কুমারগঞ্জে, ধুবড়ি হয়ে। রাজেনও আসে। যখন পারে না, ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দেয় দিবার সঙ্গে।

অকু মালপত্র সব নামিয়ে আনল। গন্ধরাজ লেবু দিয়ে আর চিনি দিয়ে মাকে নিজে হাতে শরবৎ করে খাওয়াল। বাইরি বলে, একটি লোক আছে। সেই অকু আর লংকার রান্নাবান্না, দেখাশোনা করে। তবে, মোটামুটি রাঁধে। কমলা এলেই ভালটা-মন্দটা রেঁধে খাওয়ান ছেলে-নাতিকে। ভালো-মন্দ মানে, ছেলের পছন্দের রান্না। লংকাটা তো একেবারে

www.BanglaBook.org

ওড়িয়াই হয়ে গেছে, বাংলাও বলে ওড়িয়া টানে। ওর বিশেষ বিশেষ বাঙালি রান্নায় কোন লোভ নেই। বরং দিদাকে লম্বা ফিরিস্তি শোনায়, কোন দোকানে ভাল বিড়িবড়া পাওয়া যায়, কোথায় ছানা-পোড়, অথব কোথায় এণ্ডুলি পিঠা!

কমলা, রানীর ছবির সামনে এসে একবার দাঁড়ান। স্বগতোক্তির মতো বলেন, ছিঃ! ছবিটাকে কি করেছিস বলতো? একটু পরিষ্কারও করতে পারিস না?

অকু বলে, তার ছেলেই ফিরে তাকায় না মায়ের ছবির দিকে দিনে একবারও। কিছু বললে বলে, আমার মাকে মনেই নেই।

কমলা ব্যথিত মুখে বলেন, তার মনে নাইই বা থাকল অকু, তোর ত আছে।

অকু ম্লান হাসে। বলে, আমারও মনে নেই মা! আটচল্লিশ বছর বয়স হলো তার মধ্যে পাঁচবছর একজন ছিল আমার সঙ্গে। সত্যিই মনে নেই। রানী এখন একটি ছবিই হয়ে গেছে। শুধুই ছবি।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলে, তোমরা অনেক কিছু মনে রাখতে মা। তখন হয়ত মনে রাখার সময়ও ছিলো তোমাদের। আমাদের অত সময় নেই। আমার এক জানোশোনা ওড়িয়া ফিল্ম-ডিরেক্টর একটি ছবি করেছেন। রথযাত্রা নাগাদ রিলিজ হবে। ছবির নাম, "সময় বড্ড বল্‌ববান"। তোমাকে দেখিয়ে দেব ছবিটি। আমরা একেবারেই এক অন্য সময়ে বাস করছি।

ওড়িয়া ছবি, আমি কি বুঝব?

না-বোঝার কি আছে? বাংলা আর ওড়িয়াতে তফাৎ আর কতটুকু? নব্বই ভাগ শিক্ষিত ওড়িয়ারাই বাংলা বলতে পারেন, পড়তে পারেন আর আমরা পারি না। এটা কি গর্বের কথা?

তিনকাল গিয়ে এক কালে ঠেকল, এখন আমি আর গর্ব দিয়ে কি করব বল?

হাসিমুখে শরবৎ-এর গ্লাস নামিয়ে রেখে কমলা বললেন।

ওড়িয়া না হয় তুমি নাইই জানলে, এতদিন কুমারগঞ্জে থাকলে, গোয়ালপাড়ার ভাষা কি অসমীয়াও কি বলতে পারো?

বলতে পারি না; বুঝতে পারি।

এ্যাই তো! এইটেই বাঙালিরা বোঝে না। আমার ওড়িয়া বন্ধুরা কি বলে, জানো মা? বলে, আমরা বাঙালিরা নিজেদের খুব বড় ভাবি। বলে, "বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ধুয়ে আর কতদিন খাবি তোরা?" ঠিকই বলে। ওরা আমাদের সঙ্গে আমাদের ভাষায় কথা বলতে পারে আর আমরা কেন ওদের ভাষায় বলব না? না-বলাটা একধরনের অসম্মান দেখানো। যারা প্রতিবেশীদের ন্যায্য সম্মানটুকুও না দেখায় তারা একধরনের অশিক্ষা ও অসভ্যতাতে ভোগে বলেই আমার বিশ্বাস। লংকার সঙ্গে আমি তো ওড়িয়া মেয়ের বিয়ে দেব বলে ঠিক করেছি। ওড়িশার সংস্কৃতি, সভ্যতা, বাঙালিদের চেয়ে কোনো অংশেই খাটো ত নয়ই বরং বড়ও হতে পারে বলেই আমার মনে হয়। তুমি কি বলো?

কমলা হাসেন। বলেন আমি কি বলব? যা তোরা ভাল বুঝবি তাইই করবি। আমি কি তোদের চেয়ে বেশি বুঝি? তবে লংকার বউকে আমার সঙ্গে অন্তত বাংলাতেই কথা বলতে বলিস। আমি এই বুড়ো বয়সে আর কোন ভাষায় কথা বলব?

অকু বলে, আমি এখন কাজে যাচ্ছি। এ বেলা তুমি আর রাঁধাবাড়ার ঝামেলা কোরো না। কাল সকালে বাজারে যাব। ভেটকি মাছের কাঁটা আনব। আর বড় ট্যাংরা মাছ। ভেটকি মাছর কাঁটা চচ্চড়ী কোরো আর বেগুন-আলু দিয়ে মাখামাখা করে ট্যাংরার ঝাল। কতদিন

www.BanglaBook.org

তোমার হাতের রান্না খাই না।

আনিস। ভালো করে রেঁধে দেব।

তোমার জন্যে পনস আনব। আর ছানা।

পনস কিরে অকু?

ও, পনস মানে এঁচড়, কাঁটাল যাই বলো।

কাঁটাল? সে ত আমিই এনেছি। ভাল চালও এনেছি। ঐ বস্তাতে আছে। তোদের ফেনা-ভাত রেঁধে দেব। ননী গাইয়ের দুধের সর-তোলা ঘি এনেছি, তা দিয়ে খাস। এঁচড়ও রেঁধে দেব।

অকু চলে গেলে চান-টান করে, শাড়ি বদলে, বাইরিকে খবরের কাগজটা আনতে বললেন কমলা। এই একটিই বিলাসিতা আছে, এখনও কমলার। আনন্দবাজার পড়া। এই বিলাসিতাটি ছাড়তে পারেননি।

বাইরি কাগজ নিয়ে এল।

কমলা বললেন, এ কি! এ ত ওড়িয়া কাগজ।

হ্যাঁ। "সমাজ"। কটক থেকেই বেরোয়। এছাড়া অন্য কোনো কাগজ ত রাখে না বাবু।

ও।

পথ দিয়ে ঘণ্টি-বাজিয়ে সাইকেল রিক্সা যাচ্ছে। এই শব্দ ছাড়া আর বিশেষ কোনো শব্দ নেই। জানালার পর্দা একটু ফাঁক করে বিছানাতে বসে পথের দিকে চেয়ে বসে রইলেন কমলা।

ভাবছিলেন, তাঁর ছেলে ওড়িয়া হয়ে গেছে। অন্য ছেলে বিহারি। দকুরা দিল্লিওয়ালা। দকুর বৌ রিনি বাংলা বলতে পারে, কিন্তু পড়তে পারে না। বাচ্চারা পাঞ্জাবীদের মতো সুন্দর চেহারার, সপ্রতিভ। অনর্গলি পাঞ্জাবী বলতে পারে। রিনির বাবা পাঞ্জাব ক্যাডারের আই-এ-এস অফিসার ছিলেন। অনেক পুরুষ তারা পাঞ্জাবে। ইংরেজি আর গুরুমুখী এবং উর্দু-মেশানো হিন্দীতে কথা বলেন ওঁরা। বাড়িতে রবীন্দ্র রচনাবলী আছে বটে এক সেট, কিন্তু কেউ পড়েছেন বলে মনে হয় না।

এমন সময় দরজাতে হুড়ুম-দাড়ুম করে কে যেন ধাক্কা মারতে লাগল। বাইরি দরজার দিকে যেতে যেতে বললো, যাউচি, যাউচি, দুয়ারটা ভাঙি পকাইবে পিলাটা!

লংকা এসেই ঠাকুমাকে জড়িয়ে ধরলো। হাতে রাবড়ির ভাঁড়। বললো, টাইম হেল্লা আসিবাকু? বলেই প্রণাম করলো, হাঁটু গেড়ে বসে, দুটি হাত কমলার দুটি পায়ে রেখে।

এমন করে বাঙালিরা প্রণাম করে না। ভারী নম্র প্রণামের ভঙ্গীটি। ভাল লাগলো কমলার। বললেন, হয়েছে, হয়েছে।

বলেই, চিবুক ধরে নাতিকে ওঠালেন।

লংকা বললো, তম পাঁই রাবড়ি আনিচি। টিক্কে খাইকি দেখিবে?

খাবরে খাব! তুই কি বাংলা ভুলেই গেলি?

আউ কঁড় করিবি?

বউ-টউ ঠিক করে রেখেছিস ত, দেখাস আমাকে একটু। কবে মরে যাব।

হুঃ!

লজ্জা পেয়ে বললো লংকা।

বলল, মু গুট্টে বারুংগা হেল্বা। মোর বাহাঘর হেব্বনি। হেল্লেভি, মু পাঁই গুট্টে বাইয়ানী মিলিব, আউ কঁন?

www.BanglaBook.org

কমলা অবাক চোখে নাতির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। ওর কথার কিছুই বুঝলেন না।

কমলার চোখ নরম হয়ে এলো। তাল-সুপুরীর বন, করমচার গন্ধ, ভাটিয়ালির গানের সুর, হরিসভার মাঠে দোল, দুর্গোৎসব, যাত্রা, সবকিছুর স্মৃতি একসঙ্গে ফিরে এলো। মুকুন্দ খাস বাঙাল ভাষায় কথা বলতেন। দেশ ছেড়ে আসার পরও বলতেন, "আইস্যেন, বস্যেন" বললে যতখানি অন্তরঙ্গতা ফোটে, আসুন-বসুনে কি তা হয়? আমার ভাষা ছাড়ব কেন আমি? পশ্চিম বাংলার ভাষা তো করিচি, খেয়েচি, নুন, নংকা, নেবু, নুচি। ওর মধ্যে আমি নেই। লিখ্য ভাষা সারা বাংলার একই ছিল। তা বলে, কথ্য ভাষা ছাড়ব কেন?

দিন পালটেছে, দেশ পালটেছে, যুগ বদলে গেছে। ছিন্নমূল মানুষগুলো নানা জায়গায় ছড়িয়ে গিয়ে শিকড় পেয়েছে চারা ধানের মতো। তারপর তরতর করে বেড়ে উঠেছে। চারাগাছের গোড়ায় যে মাটিটুকু লেগেছিল একদিন, তার গন্ধটুকু পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই আর। সবই ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সত্যিই! সময় বড় বলবান।

বিকেলে অকু ফিরল হাতে একটি টেলিগ্রাম নিয়ে।

কি করবে বল? এই মাত্র টেলিগ্রাম এল কৃষ্ণনগর থেকে, ধ্রুবর নাকি হার্ট এ্যাটাক হয়েছে। পরশু দিন। আমার ঠিকানায় তোমার নামে পাঠিয়েছে টেলিগ্রামটি নিশি। ও কি জানত?

হ্যাঁ। পোস্টকার্ড সকলকেই দিয়েছিলাম, তোর এখানে আসছি জানিয়ে।

কি করবে বল?

কি করব? তোর এখানে থাকি, তা ঠাকুর চান না। কোলকাতার ট্রেন কখন?

পুরী-হাওড়াও আছে। জগন্নাথেও যেতে পারো। তবে পুরী-হাওড়া তাড়াতাড়ি পৌঁছায়। বোধহয় ভোর সাড়ে পাঁচটাতে। খবর নেব। কোলকাতায় আমি দশ বছর যাইনি।

তবে পুরী-হাওড়ার টিকিটই কেটে দে। কিন্তু ওদের খবর দিবি কি করে?

ওদের খবর দেওয়া যাবে না তবে কোলকাতাতে দিবা-রাজেনদের বাড়িওয়ালাকে ট্রাঙ্ককল করতে হবে। যাতে রাজেন এসে তোমাকে নিয়ে যায় স্টেশন থেকে। কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগর যাবে কি করে?

অনেক লোকাল ট্রেন আছে। তাছাড়া লালগোলা আছে সকাল আটটা কততে যেন।

তাহলে রাজেনকে বলে দেব, তোমাকে কিছু খাইয়ে-দাইয়ে সোজা হাওড়া থেকে শেয়ালদাতে নিয়ে গিয়ে লালগোলায় তুলে দেবে। কৃষ্ণনগরে খবর না দিলে তুমি সেখানেই বা যাবে কি করে? রাজেন কি পৌঁছে দেবে?

চলে যাব। কমলা বললেন। অনেকবার ত গেছি। সাইকেল রিক্সা নিয়ে নেদেরপাড়ার বাড়িতে পৌঁছে যেতে পারব। এখন গিয়ে যে কি দেখব, তা ঠাকুরই জানে!

মদ খাওয়া কমিয়েছে ধ্রুব?

—কোথায়? প্রতি চিঠিতেই ত নিশি দুঃখ করে লেখে। কথা শোনে কে?

—অত চিন্তার কিছু নেই। হার্ট-এ্যাটাক হলেই মানুষ কিছু মরে না। বয়স এখন কত হবে ধ্রুবর? বেয়াল্লিশ তেতাল্লিশ হবে। কিছুই নয়! এত চিন্তা করার কিছু নেই তোমার।

হাওড়া স্টেশনে রাজেন নিতে এসেছিল কমলাকে। সঙ্গে দিবাও এসেছিল মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। হাওড়া স্টেশনের রেস্টুরেন্টেই রুটি, টোস্ট, ভেজিটেবল কাটলেট এসব

www.BanglaBook.org

খাইয়ে দিল ওরা। সঙ্গে সন্দেশও এনেছিল।

কমলা কুমারগঞ্জে থাকলে বাছ-বিচার করেন। কিন্তু বাইরে এসে অতসব চলে না। তাঁর নিজের কারণে অন্যের অসুবিধা হোক, তা তিনি কখনই চাননি। তাছাড়া রাজেনের মাও বিধবা কিন্তু মাছ-মাংস সবই খান। মুকুন্দও কমলাকে বলে গেছিলেন বারবার। কিন্তু মুকুন্দ মুকুন্দর কর্তব্য করেছেন, কমলাও কমলার কর্তব্য করেন। গরিব ঘরের বিধবাদের দায়ে পড়েই একচড়া খেতে হয়। উপায় কি?

জামাইদের মধ্যে, দিবার স্বামী এই রাজেনকে কমলা একেবারেই পছন্দ করেন না। মানুষটার মন বড় ছোট। ওদের বাড়ি ছিল কুমিল্লাতে। কট্টর বাঙাল। পরিবার অতি সাধারণ। ওরাও উদ্বাস্তু। কিন্তু কোলকাতায় বসবাস করে, টালিগঞ্জের ভিতরের দিকে একটি বাড়ি করে ওরা মনে প্রাণে কোলকাতার লোক হয়ে গেছে। ওর সঙ্গে থেকে থেকে দিবাও। বাঙাল ভাষা বলে না। তা নাই-ই বললো, কিন্তু ওরা করতুম, খেতুম, নুন, নঙ্কা, নুচি করে কথা বলে। কোনো বিশেষ হীনমন্যতায় না ভুগলে এমনি হওয়ার কথা নয়। এক ধরনের মানুষ থাকে, এবং তারা সবসময়েই ছিলো; সব দেশেই, যারা ভণ্ড। তারা তাদের অতীতকে, বাঙাল ও গরিব আত্মীয়স্বজনকে অস্বীকার করতে চায়। যারা বাপ-ঠাকুর্দার পরিচয় এবং নিজের নিজের মূল্যকে ছাই-চাপা দিয়ে স্বয়ম্ভু হয়ে উঠতে চায়, মানুষ হিসেবে তাদের মধ্যে ঘৃণা করার মতো অনেক কিছুই দেখেন কমলা।

করতাম, খেতাম, আসতাম, যেতাম, বসুন বললেও কিছু বলার ছিলো না। এরা নিজেদের জোর করে মূল কোলকাত্তাইয়া প্রতিপন্ন করতে গিয়ে নিজেদের অন্যদের কাছে এবং অবশ্যই নিজেদের কাছে নীচু করেন। অথচ, এই হীনমন্যতার কোনো সঙ্গত কারণ কমলা অন্তত খুঁজে পান না।

রাজেনের অবস্থা ভালোই। গাড়ি কিনবে কিনবে শুনছিলেন বছর দুয়েক হলো। কিনে যে ফেলেছে, তা এইবারে জানলেন মেয়ে-জামাই-এর গাড়িতে চেপে। ওঁর খুশি হওয়ারই কথা ছিলো। কিন্তু খুশি হলেন না। কারণ এই জামাই-মেয়ের মনের পরিচয় তিনি বিয়ের পর থেকেই পেয়েছেন ও ক্রমাগত পাচ্ছেন। এক বছরও ভাঁই-ফোঁটার নেমন্তন্ন করে খাওয়ায়নি এরা অকু-বকুকে। অথচ অকু এবং বকুর দুজনের অবস্থাই ওদের চেয়ে অনেক খারাপ হওয়া সত্ত্বেও প্রতিবার পুজো এবং ভাই-ফোঁটাতে যেমন সামর্থ্যে কুলোয় তেমন একটি করে শাড়ি পাঠাতে দুজনেই ভোলে না।

কমলার কাছে চিরদিনই মানুষের দাম, বিদ্যাবুদ্ধি টাকা পয়সাতে নয়। সে মানুষ, মানুষ হিসেবে কেমন, সেই বিচারে। সেই মাপকাঠিতে কমলা এদের বিচার করে মনে মনে দুঃখিত হন।

তাঁর নিজের দিন কোনোরকমে চলেই যায়, কিন্তু একবার বাড়ে রান্নাঘরটি পড়ে যাওয়াতে দিবার কাছেই চিঠি লিখে বলেছিলেন সকলকে জানাতে। অকু পাঁচশো টাকা পাঠিয়েছিল টেলিগ্রাম মানি-অর্ডারে। বকু তিনশ। লোক মারফৎ। কৃষ্ণনগর থেকে ধ্রুব হাজার টাকা পাঠিয়ে লিখেছিল "আরো দরকার হলে কোন সংকোচ না-করে জানাবেন কিন্তু মা।"

দকুকে তিনি ইচ্ছা করেই জানাননি। দকুর প্রকৃত পিতা যেহেতু মুকুন্দ নন, দকুকে তিনি অন্য সন্তানদের সঙ্গে কখনও একাসনে বসাতে পারেননি। দকু এই গোপন সত্য না জেনেও কখনও তাঁকে মায়ের মর্যাদা দেয়নি। নায়েব অনাথ সেনের মতই সে ধূর্ত, ধান্দাবাজ, কামুক ও সফল একজন হৃদয়হীন পাশব মানুষ হয়েছে।

www.BanglaBook.org

দিবা আর রাজেন শিয়ালদাতে এসে তাঁকে ট্রেন ধরিয়ে দিল। টিকিট কাটার সময় বললো, মা টাকাটা দিন। টিকিট কাটব।

অকু ওদের জন্যে ভালো করে প্যাক করে কিলো-দুই ছানা-পোড় সঙ্গে দিয়েছিলো। আলাদা করে নিশিদের জন্যেও। কমলার হঠাৎ কি মনে হওয়ায় ওদেরটা ওদের দিলেন না। দিবা জিগ্যেস করায় বললেন, নিশি টাকা পাঠিয়েছিল অকুর কাছে ছানা-পোড় নিয়ে আসার জন্যে।

অথচ এই মেয়ে-জামাইই সবচেয়ে বেশি যায় কুমারগঞ্জে। তাঁর সীমিত সাধ্যে তিনি যতটুকু করতে পারেন, করেন। দু-তিনবার বন্ধুবান্ধবদেরও সঙ্গে করে নিয়ে গেছিলো ওরা। প্রতিবারই ফেরার সময় ক্ষেতের চাল, ডাল, তরি-তরকারি যতখানি আনতে পারে বস্তা বেঁধে নিয়ে আসে ওরা। ওদের ভাবভঙ্গীর মধ্যে কেমন যেন একটা হা-ভাতে ভাব। যতখানি পারে ততখানি পরের কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায়। সংসারে, নিলে যে দিতেও হয়; এ-কথাটা ওরা জেনেও না-বোঝার ভান করেই থাকে। ওরা বড়লোক হবে না ত কারা হবে!

সকলেই যে টাকা দিয়ে প্রতিদান দিতে পারে তা নয়। কেউ ব্যবহার দিয়ে প্রতিদান দেয়, কেউ ভালোবাসা, আন্তরিকতা দিয়ে। কিন্তু ওদের কোনো প্রতিদানের কথাই মনে পড়ে না। চোখের চামড়া পর্যন্ত পুড়িয়ে ফেলেছে দিবা আর রাজেন। গায়ের চামড়া করেছে গণ্ডারের মতো।

কথায় বলে "জন, জামাই ভাগনা, কভু না হয় আপনা।" জামাইকে আপন ভাবেনও না তিনি। কিন্তু নিজের মেয়ে? স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ, সম্পর্ক-এ বড় আশ্চর্য। একজনের চরিত্রকে রাহুর-কেতুর চন্দ্রগ্রাসের মতো কী করে যে অন্যজন ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলে তা দেখলেও বিশ্বাস হয় না। দম্পতির মধ্যে যার চরিত্র বেশি জোরালো, সে অজানিতে, অসাবধানে ধীরে ধীরে অন্যজনের মতোই হয়ে যায়।

মুকুন্দর কাছে কমলা শুনেছিলেন যে, উদ্ভিদজগতে "অ্যাকুয়ার্ড ক্যারাকটারিস্টিকস" বলে একটি কথা আছে। আনারসের বনে কলাগাছকে পুঁতে রাখলে নাকি কয়েক বছর পরে দেখা যায় কলাগাছের পাতাও চেরা-চেরা হয়ে গেছে। মনুষ্যজগতেও যে, কথাটি কতখানি সত্যি তা নিজের মেয়ে দিবাকে দেখেই শিখেছেন।

আগে এমন ছিলেন না। কিন্তু আজ হয়েছেন। রাজেন আর দিবার জন্যে দেওয়া ছানা-পোড় ওদের না দিয়ে সঙ্গে নিয়ে চলে যাবার মধ্যে অদ্ভুত এক ন্যায়বোধ এবং আনন্দ উপলব্ধি করছেন তিনি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কমলা শিখতে বাধ্য হয়েছেন যে, সংসারে যে যেমন ব্যবহার দেয়, তাকে ঠিক সেই ব্যবহারই ফেরত দিতে হয়। খারাপের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করার মধ্যে কোনো রকম মহত্ত্ব নেই, বরং একরকমের চারিত্রিক দুর্বলতা আছে।

কমলা একসময় অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন। সংসার, জীবন, ঝড়-ঝাপটা, নানারকম ঘাত-প্রতিঘাত তাঁকে অনেক জোর দিয়েছে। এই জোরের শিকড় অন্তরের গভীরে প্রোথিত হয়ে আছে এখন। বাইরের নাড়া বা ঝড় তা উপড়াতে পারবে না।

দিবা, রাজেনরা নিজেদের খুবই বুদ্ধিমান বলে মনে করে এবং চিরদিনই করবে। কিন্তু তারা জানে না এবং কোনোদিনও জানবে না যে, অন্য লোকে তাদের সম্বন্ধে কি ভাবে। এবং ভাববে। কমলা, নিজে গর্ভধারিণী মা হয়েই যদি মেয়ে-জামাই সম্বন্ধে এত কথা ভাবেন, তাহলে অন্যরা কে জানে কি ভাবে?

www.BanglaBook.org

হঠাৎ বড় লজ্জা হল কমলার। ওদের জন্যে। নিজের মনের দৈন্যর জন্যেও কি?

না, তা নয়। যারা সংসারে গাছেরটাও খেতে চায় এবং তলারটাও কুড়োতে চায় সেই ন্যায়-অন্যায় জ্ঞানহীন সুযোগসন্ধানীদের দলে ভিড়বার মতো শিক্ষা তাঁর স্বামীর কাছ থেকে তিনি পাননি। তাতে তাঁর ক্ষতি অনেকই হয়েছে এবং হবে তা তিনি জানেন, কারণ সংসারে রাজেন-দিবারাই দলে ভারী। কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্রও এসে যায় না। যে মানুষ একা ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে জবাবদিহি করতে ভয় পায়, সে মানুষ, মানুষ নয়। সে যত মানী, গুণী, ধনীই হোক না কেন! না, কমলার আজ এসে যায় না কিছুই।

অনেকক্ষণ হলো লালগোলা প্যাসেঞ্জার ছেড়ে দিয়েছে। এই পথে একটি নদী পড়ে। রাণাঘাটের ঠিক পরে, অথবা আগে। ভাল মনে পড়ছে না কমলার। তাঁদের পূর্ববঙ্গের বাপের বাড়ির পেছনে ঠিক এমনই একটি নদী ছিলো। শৈশবে এবং কৈশোরে সখীদের সঙ্গে ঐ নদীত চান করতেন। গুরু চরত পাশের চাপ-চাপ ঘাসে ভরা সবুজ মাঠে। গরুর পিঠে সাদা গো-বক বসে পোকা বেছে খেত। ময়রা, পায়ে ঘুঙুর বেঁধে বাঁকে করে রসগোল্লার পাত্র নিয়ে ঝুমুর ঝুমুর করে যেত, তাঁর কচি, নিষ্পাপ, অনভিজ্ঞ কিশোরী বুকের মধ্যে সেই ঝুনুর-ঝুনুর ধ্বনির এক অনামা বাদ্যযন্ত্রের রোল উঠত। আমের বোলের উড়ন্ত সুগন্ধে রক্তের মধ্যে মসৃণ চিকন উজ্জ্বল সাপের খেলা চলতো। তেঁতুলগাছের আর কদমগাছের কালো ছায়া নামত গভীর হয়ে নদীর নীল নিটোল জলে। বড় ভালোবাসা ছিলো নদীতে আর গাছে, গরুতে আর বকে, সেই চিরন্তন কিশোরী মেয়েটি আর এই কমলার সঙ্গে।

তারপর?

তারপর....

ধ্রুব কেমন আছে কে জানে? ঠাকুর যেন তাকে ভালো করে দেন। স্বামীর মৃত্যুর পর এত আদরযত্ন তাঁকে এই জামাইয়ের মতো আর কেউই করেনি।

আদর, অকু আর বকুও করে। ওঁদের সম্বন্ধে তাঁর বলবার কিছুই নেই। কিন্তু জামাইয়ের আদরের মধ্যে কেমন যেন এক গা-শিরশিরানো ভালো লাগা আছে। যাঁরাই শাশুড়ি হয়েছেন, তাঁরাই তা জানেন। জামাইয়ের আদরের ভালোলাগার সঙ্গে ছেলের আদরের ভালোলাগার কোনো তুলনা চলে না। দুটি একেবারেই অন্যরকম ভালোলাগা। জামাই আদর করলে কেমন এক লজ্জামিশ্রিত গদগদ ভাব জাগে মনে। তাঁদের গাঁয়ের অনু চাটুজ্যের মাথাখারাপ ছেলেটা, কৃষ্ণ সেজে নদীর কদমগাছ তলায় চান সেরে ফেরার পথে যখন কিশোরী, সিক্তবসনা কমলাকে জাপটে ধরে "রাধা রাধা" বলে চুমু খেয়েছিল, তখন যেমন লেগেছিল এ অনেকটা। সেইরকম সুখানুভূতি। যা হিসেবের মধ্যে নয়, যা অভাবনীয়, তেমন কোনো মনোরম মনোহারী প্রশান্তি এ। সংসারে কিছু কিছু শারীরিক সুখানুভূতি, শিরশিরানি ও গভীর মানসিক আনন্দ থাকে, যা একমাত্র মেয়েদেরই জানার কথা। শুধুমাত্র মেয়েরাই তাঁর এ কথার মানে এবং গভীরতা বুঝতে পারবেন।

কমলা জানেন।

ধ্রুব ও নিশির কাছে বেশ কিছুদিন থাকতে হবে। ধ্রুব যতদিন ভালো না হয়ে ওঠে, ততদিন ত বটেই। ধ্রুবর মাও ভারী চমৎকার মানুষ। এরকম পরিবার দেখেই তাঁর আদি পশ্চিমবঙ্গীয়দের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা গাঢ় হয়েছে। রাজেন-দিবারা নকলবাজ। আর এঁরা খাঁটি। যে-কোনো সংস্কৃতিই ভালো তেঁতুলের আচারের মতো অনেকখানি সময় নেয় ভাল হতে। রাতারাতি কোনো সংস্কৃতিতেই মিশে যাওয়া যায় না। যারা রাজেনদের মতো তা করতে চায়, তারা তেলে-জলে মিললে যেমন দেখায় তেমন ভাবে প্রকট হয়ে ভেসে থাকে

www.BanglaBook.org

সকলের চোখের সামনে।

কৃষ্ণনগর থেকে যাবেন ডালটনগঞ্জ। বকু আর ছবির কাছে। পুজোর আগে অবধি থাকতেই হবে। ঐ সময়ে স্বাস্থ্যও খুব ভাল। ডালটনগঞ্জের একটি জার্মান কোম্পানীতে কাজ করে বকু। জঙ্গল থেকে লাক্ষা সংগ্রহ করে কোম্পানীর মুরহু আর রাঁচীর কারখানায় সাপ্লাই দেয়। কোয়ার্টারটি বেশ। চারদিকে দেওয়াল তোলা। ইন্দারাটি ভারী ভাল। বকু তো উদলা গায়ে খাবলা-খাবলা সর্ষের তেল মেখে ইন্দারার পাশে ঝুপুর-ঝুপুর করে বালতি বালতি জল ঢেলে চান করে। ক'টি পেয়ারা গাছ আছে। পেঁপে গাছ। ছবি, মাখনী রোটি আর লিট্টি করে খাওয়ায় ওঁকে। নাতি-নাতনীরা দাদী! দাদী! করে সর্বক্ষণ লাফাবে-ঝাঁপাবে। কটকে গেলে যেমন ওড়িয়া হতে হয়, ওখানে গিয়ে তেমনি হিন্দীতে বিশারদ এবং বিহারী হতে হবে তাঁকে।

বড় নাতী হাত ধরে টেনে বলবে, "চলো দাদী! আজ বেতলা ঘুমকে আয়েঁ। বড়া বড়া দান্তাল হাথ্খী নিকলা।"

—হাথ্খী কি রে? বল হাতি।

—হাতি? হাতি ক্যা চিজ?

ছোট নাতনী মুখ হাঁ করে ইঁদুরের মতো ছোট ছোট দুধ-সাদা দাঁত বেরে করে মুখ হাঁ-করা অবস্থাতেই বলবে "ঈ-ই-ই! দান্তাল হাথ্খীকা দাঁথ।"

ডালটনগঞ্জী কেকরো-মেকরো ভাষায় মহড়া চলবে বেশ কিছুদিন। কিছুটা শিখবেনও। তারপর ট্রেনে উঠেই সব ভুলে যাবেন। তাঁকে নিয়ে সমানে হাসি ঠাট্টা চলবে নাতি-নাতনীদের। তারা বলবে "বাঙ্গালী দাদী তুম একদম আনপড় হ্যায়।"

ছবি বকবে তাদের। বলবে, "ঈ ক্যা? বদতমিজি ঔর তামাশা! দাদী ক্যা তুমলোগোঁকো ইয়ার হোতি হ্যায় ক্যা?"

ছবি, বাংলা বলে ভাঙা ভাঙা। বাংলা পড়তেও পারে না। চারপুরুষ বিহারে। বড় ভাল মেয়ে।

ট্রেনটা দাঁড়াল বীরনগরে। সেগুন গাছের বন। আগে আরও ঘন ছিল। এখন নেই বললেই চলে।

একসময় ছাড়ল ট্রেন। এখন জোরে ছুটছে গাড়ি। দুধারে ধানক্ষেত। বীজতলি করেছে চাষী। বৃষ্টি পেয়ে, সবুজ ধানের চারাগাছের হাওয়ায় দোলাদুলি করছে। ঘনসন্নিবদ্ধ, নিবিড়, প্রেমময়, একাত্ম হয়ে।

চারাগাছগুলো জানে না, চাষী কাকে তুলে কোন ক্ষেতে লাগাবে। অথবা আদৌ লাগাবে কিনা। হয়ত হাটে নিয়ে গিয়ে বেচে দেবে বীজতলির সব চারাই। কোথায় কোথায় চলে যাবে তারা ছাড়াছাড়ি হয়ে। বিভিন্ন ক্রেতা সার দেবে বিভিন্নরকম। জল পাবে কম-বেশি। কোথাও ক্যানাল পাবে, কোথাও ডিজেলের পাম্পে করে জল দেবে কেউ তাদের গোড়ায়, কোথাও বা শুধুই আকাশের ভরসা। তাদের গোড়া নিড়োবে কেউ। কারো বা ধানের দুধ নষ্ট হবে জংলী আগাছা এবং পোকাতে।

জোর হাওয়া বইছিল। দিগন্তের সাঁই-বাবলা, কচিৎ কলা ও আমগাছের দ্বীপের বৃষ্টি ভেজা গন্ধ বয়ে নিয়ে জোরে ছুটে এসে বীজতলির ধানের উপর এলোমেলো চিরুনি বুলেচ্ছিল হাওয়াটা। কমলা জানালা দিয়ে ঐ দিকেই চেয়ে ছিলেন। চেয়ে থাকতে থাকতে বিধুর, উদাস হয়ে এল চোখের দৃষ্টি। তারপর ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে আসতে লাগল তাঁর চোখদুটি, বাইরের বৃষ্টি ভেজা নরম ছলোছলো ধান ক্ষেতেরই মতো।

www.BanglaBook.org

পালসা

হুস করে একটি হলুদ বসন্ত পাখি কেঁদগাছটার সরু ডালে কাঁপন তুলে উড়ে গেলো টুটিলাওয়ার দিকে।

পাখিটি ফিসফিসে বৃষ্টিতে ভিজছিলো এতক্ষণ। ঠোঁট দিয়ে ভিজে পালক পরিষ্কার করছিলো। একটি পাহাড়ে-বাজ কোথা থেকে এসে তার খুব কাছ দিয়ে উড়ে গেলো। তরঙ্গিত হাওয়ায় তার ডানার আঁশটে গন্ধ পেলো হলুদ বসন্ত পাখিটা। ছটফট করে উঠল ও ভয়ে। তারপরই উড়ে গেলো হুস করে!

লাওয়ালঙের পুরানো ভাঙা বাংলোর চৌপাইয়ে শুয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে শ্রাবণের বৃষ্টিভেজা সকালের সুবাস নিচ্ছিলাম। আজকাল এ সমস্ত জায়গা ন্যাশনাল পার্ক হয়ে গেছে। চোরা শিকারিরা ছাড়া, এ জঙ্গলে-পাহাড়ে কেউ ঢোকে না। মাঝে মাঝে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের জীপ গুবরে পোকার মতো দূর দিয়ে গুড়গুড়িয়ে চলে যায়।

গুরবা এবং আমি চুরি করে এখানে এসেছি। ধরা পড়লে নির্ঘাত জেল এবং রাইফেলের লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত হবে। চুরি করে শিকার করা যে নিতান্তই খারাপ তা আমরা জানি। তবু জেনেশুনেই নিরুপায় হয়ে এসেছি। প্রকাশ্যে পারমিট নিয়ে দাবানলের জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে কিছু পাওয়া যায় না জেনেই চুরি করতে হয়। এখন অবশ্য সর্বত্রই ক্লোজড সীজন। ধরা পড়লে আর রক্ষা নেই।

কাল রাতে আমার জ্বর হয়েছিল! এখনো একটু একটু জ্বর আছে।

এখন এই জঙ্গলে পাহাড়ে হাজারীবাগ জেলায় শ্রাবণমাসে রীতিমত ঠাণ্ডা। পরশু মাচায় বসে বৃষ্টিতে খুব ভিজেছি। প্রায় তিন চার ঘন্টা। তাতেই জ্বর হয়েছে। গুরবা ভোর পাঁচটায় উঠে আদা দিয়ে আমাকে এক মগ চা করে দিয়ে পালসা শিকারে বেরিয়েছে। বলেছে, চুপ করে শুয়ে থাকতে। শাসিয়েছে, বাংলোর বাইরে বেরোলে পয়েণ্ট টু টু

www.BanglaBook.org

রাইফেল দিয়ে চুতর চিরে দেবে। ও বলে গেছে যে, বেলা হলে মুন্নী এসে আমাকে বার্লি খাইয়ে যাবে। মুন্নীর বাবা এই জঙ্গলের কেঁদ পাতার ইজারাদার। জঙ্গলের মধ্যেই কিছুটা জায়গা পরিষ্কার করে মাটির দোতলা বাড়ি বানিয়ে সে থাকে। মুন্নীর নাম শুনেছি আমি গুরবার কাছে। এখনো চোখে দেখিনি।

গুরবার বয়স তিরিশ হবে। রাঁচীতে একটি মার্চেন্ট অফিসের কেরানী। যে লোকটা সুগঠিত কাঁধের ওপর রাইফেল ফেলে সকাল থেকে রাত অবধি বনে পাহাড়ে অবলীলাক্রমে ঘুরে বেড়ায়, তাকে প্রায়ান্ধকার অফিসের ডেস্কে, ঘাড় নিচু করে বসে লেজার যোগ দিতে দেখলে কষ্ট হয়। তখন ওকে যত বিমর্ষ দেখায়, সার্কাসের বাঘকেও তত বিমর্ষ দেখায় না। জঙ্গলে-পাহাড়ে এলেই ডিজেল লোকোমোটিভের মতো, ওর ভিতরে একটি বহু অশ্বশক্তিসম্পন্ন জেনারেটের গোঁ গোঁ করতে থাকে। ও যতো বেগ সইতে পারে না, তার চেয়েও অনেক বেশি বেগ ও বয়ে বেড়ায় তখন। লাল-গা কালো-মুখ বুনো কুকুরের মতো ও হন্যে হয়ে ওঠে। নগ্ন হয়ে ঝর্নায় চান করে। মহুয়া কুড়োনো ওঁরাও কিশোরীকে জোর করে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়; পাহাড়ের ওপরের চিতার গুহায় বন্দুক বগলে বিনা দ্বিধায় ঢুকে পড়ে। মানে, নিজের সবগুলি অবদমিত ইচ্ছাকে অনেকগুলি বেগ্‌নি ললিপপের মতো নির্লজ্জ ছেলেমানুষ হয়ে একসঙ্গে চুষে চুষে খায়।

গুরবার একটি অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। যেখানেই ওর সঙ্গে গেছি, দেখেছি, মুহূর্তের মধ্যে খিদমদগারীর লোক জোগাড় হয়ে গেছে। মাথা রাখার ঠাঁই জুটেছে, মোরগা আন্ডা জুটেছে, যত্ন আত্তি হয়েছে, কোনোরকম অসুবিধাই হয়নি। শহরে ইনকামট্যাক্স অফিসার এবং গ্রামে দারোগাসাহেবের যা প্রতিপত্তি, এই ছেলেটার এই বনে পাহাড়ে তার চেয়েও অনেক বেশি প্রতিপত্তি আছে।

দেখতে গুরবা ভালো নয়! মানে, বেশ খারাপ। অনেকটা মাঝারি সাইজের ভাল্লুকের মতো। কালো, গাঁট্টাগোট্টা, সামনের পাটির দুটো দাঁত ভাঙা। চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। একমাথা এলোমেলো কোঁকড়া চুল। কোনোরকম নেশা নেই ওর। পান সিগারেট কিছু খায় না।

বাংলোটা বন বিভাগের নয়। কাঠের এক বড় ঠিকাদার বহুদিন আগে একসময় বানিয়েছিলেন। এখন ভেঙে পড়েছে। বন বিভাগের বাংলোয় থেকে চুরি করে শিকার করা যায় না। এ বাংলোর চারদিকে ঘন শালবন। হাতায়, বড় বড় ঘাস গজিয়েছে। এদিকে ওদিকে কেলাউন্দা ও পুটুসের ঝোপ।

মংলুর বড় খয়েরী-সাদাতে মেশানো কুকুরটা ইঁট-ওঠা বারান্দায় শুয়ে শুয়ে মাঝে মাঝে খচ খচ খচ আওয়াজ করে গা চুলকাচ্ছে। আঠালী লেগেছে মনে হয়। চৌপাইটাতে বড় খটমল। কুটুস কুটুস করে কামড়াচ্ছে। নড়াচড়া করলেই ক্যাঁচ-ক্যোঁচ করে উঠছে। ঘরটা ছুঁচায় ভরতি। রাতে আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা সত্ত্বেও বাস্কেটবলের মতো ছুঁচোগুলো আমাদের কম্বলাবৃত শরীরের উপর লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে।

জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকলাম। তারপর ঘরের ভিতরে তাকালাম।

এক কোণায় গর্ত করে উনুন বানিয়েছে গুরবা। অন্য পাশে ওর চারপাই। কাল বিকেলে দুটো মোরগ মেরেছিলাম আমরা। একগাছা দড়িতে ঝুলিয়ে রেখেছে সে দুটোকে উপর থেকে! মোরগ দুটোর ঠোঁট চুঁইয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়েছে মেঝেতে। রক্ত জমে রয়েছে। ছুঁচো চুপি চুপি এসে সেই রক্ত চাটছে।

www.BanglaBook.org

আমি শুয়ে শুয়েই ধমকে বললাম, এই!

একটি অতর্কিত চিক আওয়াজ করে ছুঁচোটি দৌড়ে গুরবার চৌপাইর মেঝের গর্তে ঢুকে গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রুপোর গয়নার রিনঠিন আওয়াজ শুনলাম বারান্দায়। মেঘলা আকাশেও যে আলোর আভা থাকে, সেই আলোয় দরজার পাশে একটি সুরেলা ছায়াকে সরে যেতে দেখলাম।

মাথা উঁচু করে বললাম, কওন?

মৌটুসী পাখির মতো একটি গলা বাইরের বৃষ্টির সঙ্গে গলা মিলিয়ে ফিসফিসিয়ে বললো, ম্যায় মুন্নী হুঁ।

উঠে বসে বললাম, আও অন্দর আও, শরমাতা কিঁউ।

মুন্নী এসে চৌকাঠে দাঁড়াল।

জল-পাওয়া বোগেনভেলিয়া লতার মতো ঋজু, কমনীয় চেহারা। মাজা-মাজা রঙ, মুখ নাক যে খুব সুন্দর এমন নয়। ঠোঁটের গড়নটাও কেমন অস্বাভাবিক। কিন্তু চোখ দুটিতে ভারী একটি দুষ্টুমিভরা বুদ্ধিদীপ্ত চঞ্চলতা। দু-হাতে ধরে আছে বার্লির এনামেলের গ্লাসটি। একটি সতেজ রুক্ষ বেণী কাঁধ বেয়ে সামনে উরু অবধি পৌঁছেছে! মনে হলো, বেণীটির যেন একটি নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে। তার মধ্যে জঙ্গলের গেরুয়া পথের মতো একটি গতি আছে। যৌবন ও কৈশোরের দুই আঙিনার মাঝের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে মুন্নী।

মুন্নী কথা খুব কম বলে। তাও বেশির ভাগ হঁ-হাঁ দিয়ে সারে। কথা যা বলার তা চোখ দিয়েই বলে।

মুন্নী উবু হয়ে বসে, বেণীটাকে পিঠে ছড়িয়ে দিয়ে উনুনটা জ্বালল। সসপ্যানে বার্লিটা ঢাললো। গরম করলো। গরম হলে, আবার গেলাসে ঢেলে চোখ তুলে আমায় শুধালো, নিম্বু?

এ জঙ্গলে কে আমাকে লেবু এনে দেবে?

বললাম, নিম্বু কাঁহা হিঁয়া?

অমনি মুন্নী ডান হাতটি ওর হাটিয়া থেকে-কেনা সস্তা ছিটের ব্লাউজের মধ্যে সটান ঢুকিয়ে ঠিক ওর গায়ের রঙের একটি ছোট্ট সুডৌল লেবু বের করল। তারপর গুরবার ছুরিতে কেটে বার্লির গেলাসে নিংড়ে দিল। আমি যখন গেলাসটি হাতে নিলাম তখন মনে হলো মুন্নীর বুকের সুগন্ধ ও উষ্ণতার সবটুকু এই পানীয় শুষে নিয়েছে। অত ভালোবেসে কেউ বার্লি খায় তা আমি নিজে না খেলে জানতাম না।

BanglaBook.org

গেলাসটিকে ফেরত দিলাম। মুন্নী হাত বাড়িয়ে নিল। বারান্দার কুকুরটাকে মুন্নীর বিবেক দরজায় পাহারা দিতে ডাকল। একা ঘরে সুয়াতীয়া মেয়ে কী করছে চোরা-শিকারির সঙ্গে?

কুকুরটা ঘরের হাওয়া শুঁকে অপবিত্রতার গন্ধ না পেয়ে দরজার সামনে জোড়া পায়ে বসলো। মুন্নী যেন লজ্জা পেয়ে চুড়ি রিনঠিনিয়ে, বেণী ইনবিনিয়ে হাতের এক ঝটকায় কুকুরটাকে যেতে ইশারা করল। বললো, চল। হঠ।

কুকুরটা হিংসুক প্রতিবেশীর মতো দুঃখিত মুখে ফিরে গেলো।

বাইরে তখনো বৃষ্টি পড়ছিলো।

মুন্নী শুধালো, আপ আভি ক্যায়সি হ্যায়?

আমি বললাম, খাস কুছ খরাব নহী।

মুরুব্বীয়ানার সঙ্গে মুন্নী বললো, শিকার খেলনে আজ বাহার মত যাইয়ে।

www.BanglaBook.org

তারপর আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললো, ম্যায় তব চলে।

তারপর ফিসফিসে বৃষ্টিতে শালবনের ঝরা ফুল পাতা বিছানো গেরুয়া পথের বাঁকে মুন্নীর হলুদ শাড়ি মিলিয়ে গেলো।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই। এই বনে পাহাড়ে বর্ষণসিক্ত আষাঢ় শ্রাবণের দুপুরের যে আমেজ, সে আমেজের তুলনা করি এমন কিছু আমার অভিধানে নেই। এ আমেজ যদি বিক্রি করা যেত, তাহলে প্রতি পল হাজার হাজার টাকায় বিকোত।

সুরেলা দুপুর কাঁপতে কাঁপতে কখন যে ম্লান বর্ষাবিধুর বিকেলে পৌঁছে গেছে টেরও পাইনি। ঘুম দিয়ে শরীরটা বেশ ঝরঝরে ও সুস্থ মনে হচ্ছে। শুয়ে শুয়েই অনেক লোকের গলা এবং তার সঙ্গে গুরবার গলাও শুনতে পেলাম। ওরা বটগাছের নিচ দিয়ে বনদেওতার থান ঘুরে এদিকে আসছে। শালটা জড়িয়ে বারান্দায় বেরিয়ে দেখি এক প্রকাণ্ড শিঙ্গাল শম্বরকে ডালের সঙ্গে বেঁধে কাঁধে তুলে প্রায় দশ বারোজন লোক নিয়ে আসছে, আর গুরবা রাইফেল কাঁধে আগে আগে আসছে।

ওরা কাছে আসতেই গুরবা বললো, কেয়া ইয়ার? দেখা? একদম বিলকুল নরপাঠ্‌ঠা। একদম মস্তিমে হ্যায়।

আমি বললাম, এত বড় জানোয়ার মারলে কেন। জানাজানি হয়ে গেলে যে বিপদ হবে।

গুরবা ধমকে বললো, ছোড়ো। যো হোগা সো হোগা। দিল তো খুশ হো গ্যয়া।

সারাদিন খায়নি গুরবা। রাতে মুরগী রান্নার কথা। মংলুকে ডেকে, বেশি করে চায়ের জল চাপাতে বললো, সবাই খাবে।

বোধহয় হঠাৎ মনে পড়লো ওর। শুধোলো, মুন্নী এসেছিল?

আমি বললাম, এসেছিল, আমায় বুকে-রাখা লেবু চিপে বার্লি খাইয়ে গেছে।

গুরবার চোখ দু'টো জ্বলে উঠলো। সার্চ লাইটের আলোয় রাতে ভাল্লুকের চোখ যেমন জ্বলে। ফিস ফিস করে বললো, মুন্নীর বুক তো নয়, যেন একটি আসকল পাখী, নরম, উষ্ণ আবেশে ধুকপুক করছে। ঐ পাখীকে একবার মুঠিতে ধরবার জন্যে আমি হাজার বার পৃথিবীতে আসতে পারি। তারপর বিড়বিড় করে বললো, "নীগাহ্ যায়ে কাঁহা সীনেসে উঠ কর, হুয়া তো হুসন কি দৌলত গড়ী হুয়ে।" অর্থাৎ চোখ যে সরাতে পারি না ইয়ার, সুন্দরীদের সমস্ত দৌলত তো খুদা এখানেই গড়ে রেখেছেন।

মংলু মুরগীটা ভাল রাঁধতে পারলো না।

গুরবা রাত দশটা অবধি শম্বরের শরীরে থকথকে রক্তে, নাড়ি-ভুঁড়ির বদবুতে, প্যাতপেতে রক্তমাখা চামড়ায় হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াল। হাতে একটি ধারালো ছুরি, পরনে ছোট কালো শর্টস, খালি গা, মাথা ভরা কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল, চওড়া-চওড়া থাবা। মনে হলো একটা কালো বাঘ মাচার নিচে, মাড়িতে বসে মাংস চিবোচ্ছে। একজন অনুচর ধুঁয়ো ছড়ানো হ্যারিকেনটা নিয়ে ওর সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্ছে পিছোচ্ছে।

শম্বরের পিলেটা গুরবা টেনে বার করে দু-হাতে বেলুনের মতো জোরে টিপলো। ভসস শব্দ করে একটা তীব্র দুর্গন্ধ বেরোল। মংলু শম্বরের দাঁত দুটো ফাঁক করে দেখালো, সবুজ সবুজ জাবর কাটা ঘাসে মুখ ভরা রয়েছে। মংলুর কুকুরটা মংলুর ধমক খেয়ে উদার ও নির্লিপ্ত চোখে অন্যদিকে চেয়ে বসে রইলো। কিন্তু উত্তেজনায়, লোভে, অসংযমে ওর লেজটা কাঁপতে থাকলো থর থর করে, মুখ দিয়ে অসংযত একটি কুঁই-কুঁই আওয়াজ বেরোতে লাগলো।

www.BanglaBook.org

শম্বরের চামড়া ছাড়ানো হলো টাঙ্গী দিয়ে। কুপিয়ে কুপিয়ে টেংরী ফাড়া হলো। পুরো গাঁয়ের লোক শালপাতা মুড়িয়ে শিকার নিয়ে গেলো। মংলুও ছুটি নিয়ে চলে গেলো আজকের মতো গাঁয়ে। এই বছরে আবার কবে ওরা মাংস খাবে কে জানে! বড় গরিব ওরা।

সব সারতে সারতে রাত এগারোটা হলো। বিকেল থেকেই আমি খুব ভালো আছি' জ্বর একেবারে নেই। এমন কি গুরবার সঙ্গে মুরগীর ঝোল দিয়ে একটি হাত রুটিও খেয়েছি। আমরা দুজনে বাংলোর বারান্দার হাতল ভাঙা চেয়ার দুটোতে বসে আছি। শালটা জড়িয়েই বসেছি। পাছে আবার ঠাণ্ডা লাগে! খালি গায়ে বসে আছে গুরবা। নির্বিকার। ওর গা দিয়ে শম্বরের রক্তের গন্ধ বেরোচ্ছে।

এখন আকাশটা পরিষ্কার হয়েছে। এক ফালি চাঁদ উঠেছে সীমারীয়ার দিকে আকাশে। বর্ষাসিক্ত বনপাহাড় চাঁদের ঘোলাটে আলোয় ভুতুড়ে ভুতুড়ে দেখাচ্ছে।

আমাদের বাংলো থেকে প্রায় একশ' গজ দূর দিয়ে লাওয়ালঙের পুরানো ভাঙা রাস্তাটি চলে গেছে চার পাশে ঘুরে। এ পথে গাড়ি চলে না। তবে মংলু বলেছিল, আজকাল শহরে সৌখীন বাহাদুর শিকারিরা রাতের শিকারের জন্যে জিপ নিয়ে এই রাস্তায় প্রায়ই ঘোরাঘুরি করে। জীপের যান্ত্রিক গোঙানিতে ওদের ঘুম ভেঙে যায়। তারা নাকি এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। সেদিন, কার মোষের গায়ে গুলি লেগেছিল। জানোয়ার বিচার করে না, মদ্দা-মাদী বিচার করে না, আলোতে চোখ জ্বলে উঠলেই গুলি চালায়। হিংস্র জানোয়ারদের গুলি করে আহত অবস্থায় ফেলে পালায়, খুঁজে বের করে মারবার সাহস রাখে না! গর্ভবতী মাদী হরিণের পেটে গুলি করে জঙ্গলে ফেলে রেখে যায়। গুরবার ভারী রাগ এই শিকারিদের উপর। গুরবা এদের বলে, ভিখারী। বাহাদুরীর ভিখারী। বাহাদুরী অর্জন করার মতো বল ওদের বাহুতে নেই। তবু ওরা বাহাদুরী কুড়োবার জন্যে জীপে করে রাতের পর রাত বন পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়। ড্রয়িংরুমে শিং ও মাথা টাঙাবে বলে যেন-তেন-প্রকারেণ কিছু না কিছু জানোয়ার মারতে চায়। খাটাশ মেরে বলে, বাঘ মেরেছি। যেখানে সেখানে দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো বিপজ্জনক জানোয়ারদের আহত করে দেয়। যার দণ্ড দিতে হয় জঙ্গলের নিরীহ বাসিন্দাদের। গত বছর একটা চিতা এই জঙ্গলে আহত হবার পর থেকে নরখাদক হয়ে গেছে। তখন থেকে এ অঞ্চলায় একটা ত্রাসের রাজত্ব চলছে।

আসলে আমরা সেই চিতাটির খোঁজেই এই জঙ্গলে এসেছি।

চুপচাপ বসে আছি। দূর থেকে খাপু পাখি ডাকছে 'খাপু, খাপু খাপু খাপু খাপু'। বাংলোর পিছনের ঝর্নার শব্দ এই অপার্থিব রাতের ভয়াবহতায় আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঝর ঝর ঝর ঝর করে বয়ে চলেছে ঝর্নাটা। টুটিলাওয়ার দিক থেকে কতগুলো চিতল হরিণ থেকে থেকেই ডেকে উঠছে, টাঁউ, টাঁউ, টাঁউ। সমস্ত সিক্ত বনে-পাহাড়ে সে শব্দ ছড়িয়ে যাচ্ছে কোথায় কোথায়। রাস্তাটা একটি ঘুমন্ত সরীসৃপের মতো শুয়ে রয়েছে নির্জীব হয়ে। মাঝে মাঝে এলোমেলো হাওয়া উঠছে বনে। কত দীর্ঘশ্বাস, কত ফিসফিসানি। এই রকম হাওয়া-বওয়া রাতেই যত কাটনেওয়ালা জানোয়ার শিকারে বের হয়। কারণ, হরিণ ইত্যাদি জানোয়ারেরা তখন তাদের পায়ের শব্দ ও গায়ের গন্ধ বুঝতে পারে না। সময় সময় পাতায় হিস হিস ফিস ফিস শব্দ ওঠে। সেই শব্দের পটভূমিতে সাবধানী পা ফেলে হিংস্র জানোয়ারেরা শিকার ধরে।

আমাদের বাংলোর ঘরের দরজাটা ভাঙা, একটা পাল্লা নেই। তাই দু-জনেই সজাগ হয়ে ঘুমোই ঘুমোবার সময়। হাতের কাছে, গুলিভরা রাইফেল নিয়ে। কাঁটা গাছের বড় বড় ক'টি ডাল কেটে হাঁ-করা দরজার মুখে দিয়ে রাখি শোবার সময়।

www.BanglaBook.org

গুরবাকে শুধোলাম, আর কোনো জানোয়ার দেখলে আজ?

ও বলল, না শুধু শম্বর। ঝুগুকে ঝুগু। তবে সবই মাদী। তাই মারতে পারলাম না। শেষে ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ের মাথায় এই শিঙ্গালটার সঙ্গে দেখা। বেশ দূরে ছিলো। নিশানা নিয়ে মারলাম। শালা একদ্দম গোলি অন্দর—জান বাহার।

গুরবার হাত সত্যি ভাল। আমরা যা শিকার করি তা সবই পালসা। জঙ্গলে জঙ্গলে পায়ে হেঁটে শিকারকেই পালসা বলে! পালসা শিকারে দিনে কি রাতে, গুরবার জানোয়ার চেনার দক্ষতা দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যেতাম। জানোয়ার কত দূরে, কোন ভঙ্গীতে আছে এবং তাকে কোথায় গুলি করলে মোক্ষম মার হবে তা ও একনজরে দেখে বলতে পারত। পালসা শিকার গুরবার জান, পায়ে হেঁটে হেঁটে বনে পাহাড়ে, রাইফেল কাঁধে বেড়াতে পারলে ও আর কিছু চায় না। বেসুরো গলায় মাঝে মাঝে ও গুনগুন করে গায়, চলতে চলতে 'জঙ্গল মেরী মঞ্জিল বন গয়ি—।'

চারিদিকে এখন এমন একটা আদিগন্ত নিস্তব্ধ ভয়াবহতা যে চুপ করে থাকলে মনে হয় এক্ষুণি হয়ত কোনো ভয়াবহ ব্যাপার ঘটতে পারে। এখনি হয়ত নরখাদক চিতাটা এসে আমাদের একজনকে নিয়ে যেতে পারে। গতকাল সকালে আমরা বাংলো থেকে দু-মাইল পুবে গাড়গুলুয়া নালায় চিতাটার পায়ের দাগ আবিষ্কার করেছি ভিজে বালিতে। পিছনের বাঁ পা-টা বেশ টেনে টেনে হাঁটে। নিশ্চয়ই আগে গুলি খেয়ে থাকবে।

আচমকা গুরবা বললো, তোমার একটুতেই জ্বরজারি হচ্ছে, তুমি কি বুড়ো হয়ে গেলে দোস্ত? তাহলে এই বেলা একটা বিয়ে শাদী করে ফেলো।

আমি বললাম, আমায় বিয়ে কচ্ছে কে? তার চেয়ে তুমি বরঞ্চ ঝুলে পড়।

ও বললো, মাথা খারাপ? আমায় তো কেউ বিয়ে করবেই না। তাছাড়া এই বন পাহাড়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেছে অনেকদিন আগে।

মুন্নীকে তুমি ভালবাসো-না বুঝি?

গুরবা চমকে উঠলো।

তারপর ধরা-পড়া ময়নার মতো বললো, ভীষণ, ভীষণ ভালোবাসি। মুন্নীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকার স্বপ্ন দেখি কতোদিন।

আমি বললাম, বুক ত নয়, বুক কম্বল। তোমার ঐ রোমশ বদবু বুকের কাছাকাছি কোনো মেয়ে ঘেঁষবে না।

গুরবা কোনো উত্তর দিলো না। একটুখন চুপ করে থাকল। তারপর বললো, আমার ইচ্ছা করে এমনি জায়গায় একটি কাঠের ছোট দোতলা বাংলো বানাই, সারাজীবন, সারাজীবন এখানে থাকি। সকাল সন্ধ্যা রাইফেল কাঁধে পালসা শিকার করি। খরগোসের সঙ্গে ধানীঘাসের বনে বনে দৌড়ই, প্রজাপতিদের সঙ্গে উড়ি। খাপু পাখিকে নকল করে ডাকাডাকি করি। তারপর দিনশেষে বাংলোয় ফিরে বারান্দায় চুপ করে বসে থেকে, রাতের অন্ধকারে জোনাকি গুনি।

একলা থাকতে ভালো লাগবে না সারাজীবন।

আমি বললাম।

একেবারে একা তো থাকব না। যখন শরীরের মধ্যে কখনো সখনো কাঁকড়াগুলো কিলবিল করবে, বড় বড় দাঁড়ায় আমাকে ঠুকরে ঠুকরে ব্যথিয়ে তুলবে, তখন নিশ্চয়ই কেউ আসবে মুন্নীর মতো। মুন্নীর চুলের গন্ধ আমি ফোটা-কার্তুজের বারুদের গন্ধর মতো ভালোবাসি। কোনো হিমেল শীতের রাতে যখন আর শীত মানবে না, তখন তাকে আমার

www.BanglaBook.org

বুককম্বলে শুইয়ে রাখব। আসকল পাখির মতো তার উষ্ণ সুগন্ধি শরীর নাড়ব চাড়ব, তাকে সারেঙ্গীর মতো বাজাব, তারপর দু-জনের খুশি শেষ হলে তাকে দু-হাতে আকাশে উড়িয়ে দেব। সেও মুক্ত থাকবে, আমিও মুক্ত। কোনোদিন কারো কাছে বোঝার মতো ভারী হবো না; কাউকে বোঝার মত বইবও না।

আমি বললাম, তাহলে মুন্নীকে জোর করে ধরে আনতে হবে।

গুরবা ছিঃ ছিঃ করে উঠলো।

বললো, মুজাক্কর হয়ে তুমি এমন কথা বলছো দোস্ত? জোর করে ধরে আনার মজা কোথায়! তেমন ভালোবাসা তো কড়ি ফেলেই পাওয়া যায়। যেদিন সময় হবে, মুন্নী এমনিই আসবে। চৈত্র মাসে শুকনো শালপাতার আড়ালে আড়ালে মসৃণ চিকন বাদামী শরীরিণী সর্পিণী যেমন আনন্দে হিলহিল করে সাপের কাছে যায়, তেমনি নিঃশব্দে মুন্নী আসবে, এসে আমার খাটে উঠবে, আমার গলা জড়িয়ে ধরবে। তার জন্যে আমি আজীবন অপেক্ষা করে থাকব। যদি তাকে সত্যিকারের ঐকান্তিকতায় চেয়ে থাকি, তবে একদিন না একদিন আমার আসকল পাখিকে জড়িয়ে ধরে আমি ঘুমবোই ঘুমোব।

চাঁদনী রাতে আমি একা একা পালসা শিকার করে বেড়াব, হায়নার হাসি নকল করব, ঘুমন্ত ময়ূরকে তালি দিয়ে উড়িয়ে দেব, বাঘ যেমন করে শম্বরের পিছু নেয় তেমন করে তার পিছু নিয়ে তাকে ভীষণ রকম চমকে দেব। গভীর রাতে চাঁদ-মাখা টিলার উপরে দাঁড়িয়ে আমি একা একা হাসব, হাসব প্রাণ খুলে, আগল খুলে হাসব। উই টিপির পাশে রাতজাগা ক্ষুধার্ত ভাল্লুক অন্ধকারে আমাকে আর একটা ভাল্লুক ভেবে বিরক্ত হয়ে ফিরে যাবে।

এই অবধি বলে চুপ করে গেল গুরবা, তারপর কেমন ধরা গলায় আমায় ফিসফিসিয়ে বললো, আমি বড়ই খারাপ দেখতে, না দোস্ত? আমি জানি, মুন্নী কোনোদিনই আমার মতো ভাল্লুককে ভালোবাসবে না।

এমনভাবে ও বললো কথাটা। আমার মনে হলো এই হতাশ গুরবাকে আমি কোনোদিন চিনি না, জানি না।

ধমকে বললাম, ক্যা ফালতু বকবকাতা হ্যায়?

গুরবা বললো, তুমি আমার বন্ধু, আমাকে ভালোবাসো বলে সত্যি কথাটা বলছ না। কিন্তু আমি জানি, ভাল্লুকের মতো কেন্দুউঞ্জা ঝোপে ঝোপে ও মহুয়ার নিচে নিচে ঘুরে বেড়ালেই আমাকে মানায়। তোমাদের শহরের ফ্লুরোসেন্ট আলোর আর সুবেশ সুন্দর পরিবেশে আমি শীতের দিনের কুনো ব্যাঙের মতো কুঁকড়ে থাকি। যদি কেউ ছোট ভাইটার হোস্টেলের খরচ চালাবার ভার নিত, তাহ'লে আমি আর রাঁচী ফিরতাম না দোস্ত। এখানেই থেকে যেতাম, পালসা খেলতাম, পালসা খেলতাম, শুধু পালসা খেলতাম।

তারপর অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে বসে রইলাম।

আমি বললাম, রাত কাফি হোগ্যায়া, চলো শো যাও।

গুরবা বললো, তুম যাকে শোও ইয়ার। ম্যায় থোড়ী দের তক হিঁয়া বৈঠেগা। ইয়ে রাতসে বড়ী খুশবু নিকল রহি হ্যায়।

কাঁটার বেড়া সরিয়ে নিজের চৌপাইতে শুতে শুতে ভাবলাম, দোস্ত আমার বড় রসিক। ওর নিজের গায়ে বোঁটকা শম্বরের রক্তের গন্ধে আমার বমি উঠছে, আর ও নিজে এই রাতের সুগন্ধে বুঁদ। ব্যাটা ভাল্লুক কোথাকার।

ছুঁচোগুলো সংক্ষিপ্ত চিক চিক আওয়াজ করে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। বাইরের নিস্তব্ধ রাতে শুধু ঝর্নার ঝরঝরানি আর খাপু পাখির ডাক?

www.BanglaBook.org

আমি জানি না, কেন সভ্যতা, সংস্কৃতি, ভদ্রতা এ সব কথাগুলো শুনলেই গুরবা হিক্কাতোলা কুমিরের মতো আঁৎকে ওঠে। ও মনেপ্রাণে জংলী! ওর মতে সভ্য মানুষ মানেই ভণ্ড মানুষ। ওর সব কিছুতেই এমন একটা নগ্ন উচ্ছাস, এমন একটা অনন্ত প্রাচুর্য যে শহুরে জীবনের মাপা হাসি, মাপা চলা, আর পদে পদে বাধানিষেধ বরদাস্ত করতে পারে না। বিশেষ করে এই শহুরে শিকারিদের। যারা ভণ্ডামির পরাকাষ্ঠা দেখায়। ওদের দেখলে গুরবা একটা উপবাসী হায়নার মতন দাঁত কড়মড় করে, খালি হাতেই ছিঁড়ে ফেলতে চায়। এই ব্যাপারে গুরবা বুনোকুকুরের মতো নিষ্ঠুর। অথচ এমন মনের মানুষ আছে বলে আমি জানি না। কাঁচপোকার কষ্টে যে গলে যায়, হরিণেরা খাবের জন্য যে, পাহাড়ের ঢালে ঢালে নিজের পয়সা খরচ করে কুর্থী লাগায়, সরগুজা লাগায়, ঝর্ণার পাশে একটি একটি করে দূর্বা পোঁতে। সেই সব ক্ষেতে গুরবা কিন্তু কখনো শিকার করে না। ও বলে, তা বেইমানির সামিল। কিন্তু একটি শিঙ্গাল হরিণের পেছনে সারাদিন ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যার মুখে যদি সে তাকে রাইফেলের পাল্লায় পায় তবে তার মতো খুশি কেউ হয় না। ও একটা পাগল। যে-বাঘ মারতে তার বেগ পেতে হয় না, সেই মৃত বাঘের পেটে সে লাথি মারে। থুথু ফেলে, বলে, শালা বাঘোয়া নেহি, চুহা হ্যায়! ওর ভিতরে যতখানি উন্মত্ত শক্তি ও সাহস আছে ওর প্রতিপক্ষর কাছ থেকে ও ঠিক ততখানি শক্তি ও সাহস আশা করে। আর সেই একই কারণে হান্টিং-বুট পরা, সুসজ্জিত জীপারোহি শিকারি দেখলে ও বকলেস-ছেঁড়া বুল টেরীয়ারের মতো লাফালাফি করে! জানি না ওর কপালে কী আছে। কোনদিন যে ও এই পাগলামির বলি হবে, ওর ভালোবাসা চরিতার্থতায় এই বনে পাহাড়ে বুড়ো হরিণের মতো প্রচারহীন মৃত্যুর কবলিত হবে, তা আমি জানি না। ওকে নিয়ে আমার বড় ভয়। কারণ কোনোদিন কোনো সুগন্ধি মেয়ে গুরবাকে ভালোবাসবে না। এমন কি মুন্নীও বাসবে না। আমি বাজী ফেলে বলতে পারি। মেয়েরা খোঁটায়-বাঁধা শান্তশিষ্ট পাউডার-মাখা ছেলে চায়। গুরবার মতো দুর্দম, দুর্গন্ধ, দুর্বার ছেলেকে ওরা দূর থেকে শক্তিরূপে পুজো করতে পারে কিন্তু কখনো তাদের কাছে ঘেঁষতে দেয় না। ঘরের সঙ্গে যার বিরোধ, সভ্যতার সঙ্গে যার সংঘর্ষ, স্থবিরতার সঙ্গে যার দুশমনি সে কোনো মেয়ের ভালোবাসা পায় না। মেয়েরা ঐ শহুরে শিকারিদের মতো ভণ্ড। মুন্নী কোনো ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু গুরবা মুন্নীকে যেমন করে ভালোবাসে, তেমন করে আমরা কাউকে কোনোদিনই ভালোবাসতে পারব না।

অনেকক্ষণ পর একবার ঘুম ভাঙল।

বাইরে একটানা ঝিঁঝির ডাক। চাঁদটা মেঘে ঢেকে গেছে আবার।

দেখলাম গুরবা শুতে আসেনি তখনও।

শুয়েই শুয়েই বললাম, নেহী শোওগে কেয়া?

গুরবা বললো, আয়া ইয়ার, আভভি আয়া। কই শিকারি আয়া হ্যায়, জীপকা আওয়াজ মিল রহা হ্যায় দূরসে। পাহাড়মে চক্কর লাগা রহা হ্যায়।

আবার ও বললো, আয়া আয়া, আভভি আয়া।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই।

রাত কত হবে জানি না! হঠাৎ খুব কাছে একটি শটগানের আওয়াজে আচমকা ঘুম ভেঙে গেলো।

ধড়মড়িয়ে চৌপাইয়ে উঠে বসে দেখলাম, গুরবা নেই। এবং দরাজার কাঁটার বেড়াটা আমি শোবার সময় যেমনভাবে সরিয়ে রেখেছিলাম, তেমনভাবেই সরানো রয়েছে।

কম্বলটা চৌপাইতে ফেলে রাইফেলটা হাতে নিয়ে দৌড়ে ঘর থেকে বেরোলাম।

www.BanglaBook.org

বেরিয়েই দেখি পুরানো লাওয়ালঙের রাস্তার উপরে হেডলাইটা জ্বালিয়ে একটি জীপ দাঁড়িয়ে আছে। এঞ্জিনের একটানা ধ্বক ধ্বকধ্বক ধ্বক আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। জীপটার স্টার্ট বন্ধ করা হয়নি। এবং গুরবা নিচু হয়ে রাইফেল হাতে ঐদিকে এগিয়ে চলেছে।

কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে বুঝলাম কিন্তু সেটা কী ব্যাপার হতে পারে সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই মাথায় এলো না। আমিও গুরবাকে ধাওয়া করে ওর পিছু পিছু ঐভাবে এগিয়ে গেলাম। যেখানে শম্বরটার ছাল-ছাড়ানো হয়েছিল এবং কাটাকুটি করা হয়েছিল সেখানে গিয়ে একটি কেলাউন্দা ঝোপের আড়ালে শুয়ে পড়ল গুরবা।

আমিও ওর পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে পড়ে কানে কানে বললাম, ক্যা হুয়া?

গুরবা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, শহরকা শিকারি শিকার খেলনে আঁয়ে হেঁ!

সামনে তাকাতেই দেখি, মংলুর কুকুরটি শম্বরের রক্তে-ভেজা মাটিতে পড়ে রয়েছে। তার উপরে জীপ থেকে ফেলা স্পট-লাইটের আলো এসে পড়েছে। লোভী কুকুরটা নিরিবিলিতে নিশ্চয়ই শম্বরের নাড়িভুড়ি খাচ্ছিল এমন সময় ওরা জীপ থেকে গুলি করেছে। কুকুরটির কান দিয়ে গরম তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। জিভটা দাঁতে কামড়ে আছে। মরে গেছে।

গুরবা আমাকে ফিসফিসিয়ে বললো, শিখলায়গা শালালোগকে।

আমি ওর হাত টেনে বারণ করলাম।

কিন্তু ও শুনলো না।

আলোতে যাতে ওকে দেখা না যায়, এমনিভাবে আলো থেকে সরে বুকে হেঁটে জীপের কাছে এগিয়ে যেতে লাগলো ও।

কী করি? আমিও ওর পিছু নিলাম।

আমরা জীপটির কাছে প্রায় পঁচিশ গজের মধ্যে এসে গেছি! এতক্ষণ জীপের আরোহীরা কী করছে জীপে বসে কে জানে! কাছাকাছি পৌঁছে একটা ঘন পুটুসের ঝোপে আমরা চুপ করে বসে থাকলাম। এদিকটা অন্ধকার। ওরা আলো ফেলে আছে তখনো কুকুরটার উপরে।

ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে যতখানি দেখা যায়, মাথা উঁচু করে দেখতে পেলাম, যে ড্রাইভার ছাড়াও একজন চাপরাশী, স্পটলাইট ফেলে আছে। জীপের হুড নামানো—উইন্ডস্ক্রীন, বনেটের উপর শোয়ানো। সামনে ড্রাইভারের পাশে একটি ফর্সা লম্বা গ্রে-হাউন্ডের মতো ছেলে এবং তার পাশে অ্যাসিট করে শাড়িপরা, চুড়ো-করে চুল বাঁধা একটি লেগহর্ন মুরগীর মতো মেয়ে। পিছনে ককার-স্প্যানিয়েলের মতো ঠোঁট মোটা এলো-মেলো কালো একটি ছেলে। মেয়েটি ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢেলে দিচ্ছে ছেলে দুটিকে।

গ্রে-হাউন্ড ককার-স্প্যানিয়েলকে বললো, আই ডিড নেভার নো দ্যাট ইউ আর সাচ আ গুড শট।

ককার-স্প্যানিয়েল বললো, ওঃ ডোন্ট মেনশন।

মেয়েটি ডিমে-বসা লেগহর্নের মতো কঁকককিয়ে, বাংলায় বললো, তোমরা যাই বলো, চিতাটা কিন্তু বিরাট বড় ছিল।

গ্রে-হাউন্ড তোযামুদি গলায় বললো, নিশ্চয়ই!

মেয়েটি আবার বললো, আচ্ছা কী রকম একটা ব্যাড স্মেল পাচ্চ না তোমরা?

গ্রে-হাউন্ড বললো, নিশ্চয়ই ব্যাটা কোনো হরিণ-ফরিণ মেরে পচিয়ে রেখেছে।

গন্ধটা রক্ত ও শম্বরের নাড়িভুঁড়ির। আমরাও পাচ্ছিলাম। হাওয়াটা ঐদিক থেকেই

www.BanglaBook.org

আসছিল? মংলুর দিশী কুকুরটার মুখ মনে পড়ছিল আমার।

হঠাৎ আমাকে হতবাক করে দিয়ে গুরবা পুটুস ঠেলে উঠে দাঁড়াতে গেলো। ওর খালি গায়ে বোধহয় কোনো পোকা-মাকড় কামড়ে থাকবে। অথবা আর কেন যে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো আমি বুঝলাম না! এবং এক লহমার মধ্যে যা হবার তা হয়ে গেল।

অত কাছে পাতার খসখসানির শব্দ শোনা মাত্র চাপরাশীটি আলো ঘুরিয়ে এদিকে ফেলল। মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, ভাল্লুক! ভাল্লুক! এবং আলোর সঙ্গে সঙ্গে ককার-স্প্যানিয়েলের শটগানও ঘুরল। মাজল থেকে আগুনের হলকা বেরুতে দেখলাম। এবং তক্ষুনি কী একটা চাপা সংক্ষিপ্ত আওয়াজ করে গুরবা প্রায় আমার ঘাড়ের উপরে পুটুসের ডাঁটা-পাতা ভেঙে পড়ে গেল।

গুরবাকে চিত করে দিতেই দেখি একেবারে বুকে গুলি লেগেছে। অত কাছ থেকে ডান বুকে।

ইতিমধ্যে গুলি করার সঙ্গে সঙ্গে জীপ থেকে গ্রে-হাউন্ড চেঁচিয়ে উঠল, উন্ডেড ভাল্লুক, ডেঞ্জারাস! ডেঞ্জারাস! পালাও। পালাও ড্রাইভার। তেজ চলো। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জীপ এগিয়ে গেল। দেখলাম নাম্বার প্লেটের উপর কাদা-লেপা।

যত তাড়াতাড়ি পারি রাইফেল তুলে জীপের টায়ার লক্ষ্য করে গুলি করলাম। কিন্তু বুঝলাম গুলি লাগল না। কারণ জীপটা চলতেই থাকল। কেবল মেয়েটির চীৎকার শুনতে পেলাম। ডাকাত! ডাকাত! জোরে, জোরে চল!

মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু শেষ হয়ে গেল!

গুরবার মুখের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলাম, মংলুর কুকুরের মতো ওর জিভটাও বেরিয়ে এসেছে। দাঁতে জিভটা কামড়ে আছে। কুচকুচে কালো লোমে-ভরা বুকে গরম ঘন রক্ত থকথক করছে।

মানুষের রক্তে কি শম্বরের রক্তের চেয়েও বেশি বদবু?

এখন কী হবে জানি না, আমি কি করব জানি না। মংলু কখন গাঁ-থেকে ফিরবে জানি না। তারপর পুলিশ আসবে, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কর্তারা আসবে। আমারও চোর ওরাও চোর। ওরা মানুষ মেরে পালিয়ে গেল, ওদের কিছু হবে না। আমাদের শম্বর মেরে জেল হবে! কিন্তু হবে। কেউ বাঁচাতে পারবে না।

আমার মনে হলো গুরবা মানুষ না হয়ে যদি সত্যি ভাল্লুক হতো তাহলে ভাল হতো। শম্বরের মতো ওর চামড়া ছাড়িয়ে ওকে টুকরো টুকরো করে টাঙ্গী দিয়ে কেটে কাল দুপুরের আগে শকুন দিয়ে খাইয়ে দিতাম নিশ্চিহ্ন করে। কিন্তু তা হবার নয়। প্রত্যেক মানুষের ঠিকানা থাকে, অতীত থাকে। মরে গেলেও তাকে সেই ঠিকানায় ফিরে যেতে হবেই।

গুরবার তপ্ত রক্তের গন্ধের সঙ্গে পুটুসের উদগ্র গন্ধ মিশে গেল! কোথা থেকে একটি টি-টি পাখি এসে টীটীরটী—টীটীরটী—টীটীরটী করে মাথার উপর চক্কর মেরে বেড়াতে লাগল।

গুরবা পালসা-শিকার বড় ভালোবাসত। হাঁটতে ভালোবাসত। সেই নিস্তব্ধ ভুতুড়ে রাতে টীটীপাখির ডাকে আমার মনে হলো যে, হাজার জন্ম ভিজে-রাতের খুশবুতে দিল-খুশ করার জন্যে, তার মুন্নীর উষ্ণ, বাদামী, আসকাল পাখির মতো বুক, মুঠি ভরে ধরবার জন্যে, এই বনে বনে পালসা খেলার জন্যে গুরবা আবার আসবে, আসবে, আসবে। বারে বারে, ফিরে ফিরে আসবেই জন্ম-জন্মান্তরে সে তার ভালোবাসার বনে বনে পালসা খেলে বেড়াতে।

www.BanglaBook.org

জোয়ার

বোটের সুকান ধরে বসে আছি।

ডেকের উপরের সারেঙের ঘরে বসে নিচের এঞ্জিন ঘরের আওয়াজ শোনা যায় না। ডিজেলে চলা শক্তিমান এঞ্জিন। প্রপেলারটা ঘুরছে একটানা গুট, গুট, গুট-গুট-গুট। পেছনের দু-পাশে জলে ব্যাকওয়াশ চলেছে। দুটি কোণাকুণি ঢেউ বোটের পেছন থেকে উঠে দু'পাশের গরাণ-গোঁয়োর জঙ্গলে গিয়ে পৌঁছচ্ছে।

এখন রাত্তির। কৃষ্ণপক্ষ। আগামীকাল কালিপুজো।

অন্ধকারে সুন্দরবনে এলে বোঝা যায় যে, তারাদেরও আলো আছে। তারাও আলো দেয়। গাছের ছায়ানিবিড় ঘোর কালো জলে এক-একটি তারা এক-একটি সবুজ প্রদীপের মতো জলের আয়নার দপদপ করে। সার্চ লাইটটা জ্বালাতেই হয় না। কেবল বাঁক নেবার সময় মাঝে জ্বেলে নিই। কখনো-সখনো কুমিরের চোখ জলের উপর কাঠের আগুনের মতো জ্বলে ওঠে।

বেশ লাগে। হু-হু করে হাওয়া দিচ্ছে। চোখে মুখে চুলে হাওয়া এসে উথাল পাতাল করছে। ঘন্টায় সাত-আট মাইল চলেছি, এই ছোট বোটের পক্ষে ভালই স্পীড। স্রোতের উল্টো মুখে চলেছি এখন। আমার সাহেবের হুকুম, রাত বারোটা অবধি একটানা চলে একেবারে চামটার খালে গিয়ে নোঙর করতে হবে।

চামটার খালটা আমার বিশেষ পছন্দ নয়। এখানের কোন খালই বা পছন্দ। এঞ্জিনম্যান নটবর আর খালাসী ঘেটো আর অছিমুদ্দী কেউই পছন্দ করে না। আর কেনই বা করবে? প্রতিবছর কত যে মৌলে, বাউলে, জেলে মরছে, বাঘের হাতে তার কি ঠিক আছে এখানে। খালে ঢুকলেই এখানে ঝমটি পোঁতা আছে দেখতে পাওয়া যায়। জলের পাশে সরু ডাল পুঁতে সেই ডালের ডগায় এক ফালি ন্যাকড়া বেঁধে দিয়ে যায় হতভাগ্যদের সঙ্গীরা।

www.BanglaBook.org

সেখানে বাঘে যে মানুষ নিয়েছে সেই সম্বন্ধে অন্য জেলে মৌলে বাউলদের সাবধান করে। জলে নোঙর করা নৌকা থেকে পর্যন্ত নিয়ে গেছে বাঘ কত যে লোককে সাঁতরে এসে তার ইয়ত্তা নেই। ওরা ভয়ে বাঘের নামোচ্চারণ পর্যন্ত করে না। বলে জানোয়ার বড় ভীষণ—ড্যাঙ্গায় পা দিও না মোটে।

আচ্ছা পাগল এই আমার সাহেব।

বড়লোক মাত্রই শখ থাকে জানি। কিন্তু বড়লোক আমার বহু দেখা আছে। এ পর্যন্ত এমন বিদঘুটে শখের সাহেব আমি দেখিনি। মেয়েদের নিয়ে এমন সোঁদরবনের মতো জায়গায় কেউ বেড়াতে আসে?

মেমসাহেব, ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে এলেন।

মেমসাহেবকে আমার বেশ লাগে। এত বড়লোকের বউ এমন সুন্দর ইংরেজিতে কত শত সাহেব মেমের সঙ্গে কথা বলেন অথচ মুখে এমন একটি বাঙালি কমনীয়তা যে কি বলব। কালোরঙা একটি শাল জড়িয়েছেন গায়ে। উদলা ডেকের উপর হেমন্তের আকাশ থেকে হিম পড়ছে।

চেঁচিয়ে বললাম, সাবধানে পা ফেলবেন মেমসাহেব। একে অন্ধকার, তায় হিমে ভেজা আছে ডেক।

মেমসাহেব কাঠের সিঁড়িটা বেয়ে সাবধানে উঠতে উঠতে বললেন, ঠিক আছে।

ডেকে উঠে, উনি আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন?

বললেন, স্যামুয়েল, তুমি বিকেলে চা খেয়েছো তো?

হ্যাঁ মেমসাহেব।

ছোটোবেলায় পাদরীসাহেবদের কাছে লেখাপড়া শিখেছিলাম কিছুদূর। ইংরেজিটা কাজ চালানর মতো বলতে পারি। তাই বহাল করেছেন সাহেব আমায়। অনেক সময় সাহেব নিজে আসেন না। ওঁর সাহেব-সুবো অতিথিদের নিয়ে আমারই নিজের আসতে হয়। ইংরেজি বলতে পারি বলেই মাঝি-মাল্লারা এই স্যামুয়েল সারেঙকে এত খাতির করে। আমার এই 'ছুটী' বোট ছোট হলে কি হয় এর ইজ্জতই আলাদা। মাতলা, গোসাবা, বাসন্তী, হেড়োভাঙ্গার জলে কি সোঁদরবনের খালে-বিলে যেই এই বোট দেখুক না কেন সেই সম্ভ্রম করে, সবাই জানে, এ ইয়াংকি সেনের বোট। এ বোট ভাড়া খাটে না।

আমার সাহেবের রকম-সকম আমেরিকান সাহেবদের মতো বলে তাঁর আড়ালে তাঁকে সবাই অয়ন সেন না বলে ইয়াংকি সেন বলে ডাকে। সাহেব তা জানেন। তবে কে কী বললো, তা নিয়ে মাথা ঘামবেন এমন চরিত্র আমার সাহেবের নয়।

মেমসাহেব সবসময় কী যেন একটা সেন্ট মাখেন। অন্য কেউ হলে জাপটে ধরে সুকানের উপর ফেলে জমিয়ে চুমু খেতাম কিন্তু মেমসাহেবের সম্বন্ধে ওসব কথা মনেও আনা যায় না।

তাছাড়া কেন জানি না, আমার সাহেব-মেমসাহেবকে আমি শ্রদ্ধা করি।

সাহেবও উঠে এলেন। সাদা পায়জামা আর পাঞ্জাবি পরে আছেন। গায়ের রঙ কালো হলে কি হয়, এমন পুরুষ বড় একটা চোখে পড়ে না। তীক্ষ্ণ নাক। উজ্জ্বল চোখ। সব সময় ঝকঝক করে।

ডেক এ উঠেই বললেন, স্যামুয়েল, কোথা দিয়ে চলেছি?

ভরকুণ্ডার খাল স্যার।

www.BanglaBook.org

চামটা কতদূর?

পাঁচ ঘন্টা লাগবে স্যার।

এমন সময় ক্যাবিন থেকে মেমসাহেবের ছোট বোন মিলিদিও উঠে এলেন।

এসেই বললে, এখানেই থাকা যাক না অয়নদা?

সাহেব বিনা দ্বিধায় ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন স্যামুয়েল, এখানেই নোঙর ফেলো। আজ রাতে আমরা এখানেই থাকব।

সামনেই সুবিধে মতো জায়গা দেখে ঘন্টা বাজালাম। নটবর, এঞ্জিন নিউট্রাল করল ঘন্টা শুনে। খালসীরা নোঙর করলো। এঞ্জিন রিভার্স করে নোঙর ঠিক লাগল কিনা দেখে নেওয়া হলো।

এ জায়গাটা আমার ভাল জানা নেই। রাতে এখানে থাকিনি কখনো। শুধু জানি যে, এ ভরকুণ্ডার খাল।.দিনের বেলায় এ খাল বেয়ে বোট চালিয়ে যেতে যেতে কেওড়া গাছের তলায় তলায় হরিণের পাল চরতে দেখেছি। যেখানে নোঙর করলাম, ভাঁটি লাগলে সেখানে ঠিক কতখানি জল থাকবে সেটাই ভাববার কথা। বোটের কোনো প্রান্ত ডাঙ্গায় উঠে গেল ত বাঘও বোটে এসে উঠতে পারে।

সাহেব খালি বলেন, আরে মোটরবোটে উঠে আসবে এতবড় ওভারস্মার্ট সুন্দরবনের বাঘ হয়নি এখনো।

কি জানি বাবা। ভরসাই বা কোথায়? মামা এসে ধরলে ধরবে, আমাকে নটবরকে নয়ত খালাসীদের। বাঘ তো আর ক্যাবিনে ঢুকবে না।

বোট নোঙর করা হয়ে গেলে আর এঞ্জিনের ঝম-ঝমানি রইল না। বোটের খোলে সড় সড়—সিরসির করে জোয়ারের জলে-ভাসা কাঠকুটো লাগছে।

মিলিদিদি বললেন, অয়নদা, কুমির গা ঘষছে না তো বোটের সঙ্গে?

সাহেব বলেন, বিচিত্র নয়। তুমি আছ খবর পেয়েছে বোধহয়।

মিলিদিদি বললেন, However, they don't rub on the wrong side. Do they?

সাহেব কিছু বললেন না।

মেমসাহেব আগেই নিচে গিয়েছিলেন।

আমি সারেঙের ঘর ছেড়ে বোটের পেছনে চলে গেলাম।

মিলিদিদির সঙ্গে সাহেবের এই আদিখ্যেতা আমার ভালো লাগে না। মিলিদিদি মোটে পাত্তা দেন না ওঁকে। সেটা সাহেব নিজেও জানেন। অথচ যেন লাজলজ্জাহীন ব্যোম ভোলানাথ। বুঝতে পাই, তাঁর এই ব্যবহারে মেমসাহেব ও মিলিদিদি দুজনেই বিব্রত বোধ করেন। দুজনেই কোনো কোনো সময় সাহেবকে সমানভাবে ঘৃণা করেন অথচ সাহেব ওঁদের দুজনকেই ঠিক সেই একই পরিমাণ ভালোবাসেন। যদি আমার বুদ্ধি বলে কিছু থেকে থাকে তো পরিষ্কারই বুঝতে পাই যে, মিলিদিদি সাহেবকে ভালোবাসেন কিন্তু সেটা কি ধরনের ভালোবাসা তা ঠাহর করতে পারি না। আমি সারেঙ, জোয়ার-ভাঁটা বুঝি, লগি দিয়ে নদীতে চড়া আছে কিনা ঠাহর করতে পারি কিন্তু এসব বোঝা আমার কর্ম নয়। সাহেব আমার একেবারে পাগলা সাহেব। নিজের জগতে বাস করেন। অবুঝের মতো যা চাইবার নয় তাই চান। মিলিদিদিকে ফিসফিস করে বলেন, মিলি তোমাকে আমি এই রাতের স্তব্ধতার মতো ভালোবাসি।

www.BanglaBook.org

মিলিদিদি মৌরলা মাছের মতো ছিটকে গিয়ে বলেন, দিদিকে বলুন এসব কথা। আমাকে বলবেন না। আমি আপনাকে ভালোবাসি না।

এ-রকম অনেক কথা আমি—হেন স্যামুয়েল সারেঙ আড়ি পেতে শুনেছি। অন্য লোকেদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, সাহেবের জন্যে আমার রীতিমত দুঃখ হয়। মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেছে বোধহয় আজকাল। এর চেয়ে অফিসে যখন থাকেন তখন ভালো থাকেন। অফিস থেকে বেরুলেই অন্ধকারে জোনাকীর আলো জ্বালার মতো মিলিদিদির জন্যে পাগল হয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করতে চান।

যাকগে, মরুকগে। কী হবে আমার মনিবদের কথা ভেবে! নিজের কথা ভাবারই সময় পাই না।

নটবরের কাছে গিয়ে বললাম, বের কর বোতলটা।

নটবর বললো, ওসব ঝামেলি কোরো না স্যামুয়েলদা, সাহেবের মেজাজ গতিক ভালো নয়। একটুখানি চুপ মেরে বসো দিকিনি।

রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে বোটের মাথায় বিছানা পাতলাম আমি। একটুকরো ত্রিপল দিয়ে ছইয়ের মতো বানিয়ে নিলাম। হাওয়া না থাকলে বেশ মশা লাগে। গরমও লাগে। নটবর আর খালাসীরা বোটের পেছনে রান্নাঘরের পাশেই শুয়েছে।

সাহেবদের ক্যাবিনটা এমন কিছু বড় নয়। দুদিকে দুটি বার্থ। রেলের কামরার মতো। একটিতে সাহেবের বিছানা হয়, অন্যটিতে মেমসাহেব ও মিলিদিদির। ক্যাবিনের লাগোয়া বাথরুম। ছোট হলেও সবকিছুই আছে। কমোড আছে, বেসিন আছে, চান করার শাওয়ার আছে। বাথরুমের জন্যে আলাদা একটি মিষ্টি জলের ট্যাঙ্ক লাগানো আছে বোটের মাথায়। নোনা জলে মেমসাহেবরা চান করতে পারেন না। সাবান মাখলে সাবান তুলতে এক ঘন্টা লাগে। সারা গা মাথা চ্যাট চ্যাট করে নুনে।

রাত এখন কত হবে কে জানে? চারিদিকে স্থির নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে টিটিপাখি (সাহেবরা যাকে Did you do it বলেন) বাঁদিকের পাড়ে ডেকে বেড়াচ্ছে। একবার জলের কাছে, আসছে, একবার ফিরে যাচ্ছে। জঙ্গলে নিশ্চয়ই কোনো জানোয়ার দেখে থাকবে।

এখনো জোয়ার দিচ্ছে। রাত বারোটা নাগাদ ভাঁটার জল নামা শুরু হবে। এখানে জোয়ার-ভাঁটার জল আঠারো কুড়ি ফিট ওঠানামা করে। ভাঁটার সময় যেখানে মাটি দেখা যায়, খোলা জায়গা দেখা যায়, কেওড়ার গুলো দেখা যায়—লাল, সবুজ, হলুদ, নানা রঙের নানা কাঁকড়া আর স্যালামাণ্ডারকে যেখানে ঘিনঘিনে কাদায় হাঁটতে দেখা যায়, জোয়ারে সে সবকিছু ডুবে যায়। এমন কি অত উঁচু সাদাবাণী গাছের গোড়াও ডুবে যায়। তখন সমস্ত সুন্দরবনকে মনে হয় একটি বিরাট ভাসমান উদ্ভিদের বন।

ক্যাবিনে মেমসাহেবদের নড়াচড়ার শব্দ শুনছি। চুড়ির রিনঠিন, সিল্ক-শাড়ির খুশির খসখস। সাহেব একবার কাশলেন। কে একজন উঠে বাথরুমে গেলেন। জোরে জোরে দুবার ফ্লাশটা টানলেন। ওটা কাজ করছে না। শব্দটা জলের উপরে নিস্তব্ধ রাতে অনেক দূর গড়িয়ে গেল।

আবার সব চুপচাপ। অনেকক্ষণ। ঘুম আসছে না। সাহেবের গলা পেলাম।

মিলি, ঘুমিয়েছ?

না।

www.BanglaBook.org

দিদি ঘুমিয়েছে?

জানি না।

আমার পাশে এসে শোবে একটু প্লীজ।

না।

এসো না বাবা। পাশে শুলে একটু কী হয়? তোমাকে একটু জড়িয়ে শুয়ে থাকব। তোমার কপালে হাত বুলিয়ে দেব। শোবে না?

না। একেবারে না। আপনি ভীষণ অসভ্য হয়েছেন।

মানে?

আপনি যা বোঝেন।

এমন সময় মেমসাহেবের গলা শুনলাম।

কী হচ্ছে কী? ন্যাকামির একটা সীমা আছে। লজ্জা বলে তোমার কী কিছু আছে?

সাহেব অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় বললেন, লজ্জার কী আছে? এত ভালবাসি, আর পাশে একটু শুতে পারে না? আমি কী বাঘ না ভাল্লুক?

শেষের দিকে আবেগে সাহেবের গলা ভারী হয়ে এলো।

মেমসাহেব আবার ধমকালেন, চুপ করো তো। ঘুমুতে দাও। তোমার ন্যাকামি আর সহ্য হয় না। নেহাৎ সুন্দরবনে জলে কী ডাঙ্গায় নামায় উপায় নেই, নইলে পালিয়ে বাঁচতাম। বললেন, কী বলিস রে মিলি?

পরিবেশ হালকা করার জন্যে মেমসাহেব রসিকতা করলেন।

কিন্তু এই রসিকতা, হালকা হাসির পেছনে কোনো গভীর অভিমান আছে বলে মনে হলো আমার। সেটা সাহেবের না মেমসাহেবের, না মিলিদিদির, বুঝতে পারলাম না।

এমন সময় নটবর উঠে এসে বসলো আমার পাশে।

বললো, স্যামুয়েলদা বড্ড গরম লাগছে মাইরী। চল জালিবোটে গে শুই দুজনায়।

আমি বললাম, মামা চারধারে ঘোরাঘুরি করছে। কী দরকার তোর জালি বোটে শুয়ে? যেখানে শুয়ে আছিস শুয়ে থাক। নইলে আমার কাছে এসেই শো।

নটবর বললো, শালা ঘেটো এমন ঘসর-ঘসর দাদ চুলকোয় যে, ওর পাশে ঘুমায় কার সাধ্যি। পরানটা ভাল লাগতিছে না গো। একটা সিগারেট খাওয়াও দিকিন।

আমার একটা চারমিনার সিগারেটে আগুন ধরিয়ে নটবর গান ধরলো ভাটিয়ালী সুরে, ও সুন্দর জরিনা রে, তোমারে না দেখলে মোর অঙ্গ যায় জ্বলে ...।

আমি ধমকে বললাম তোর সাহস তো কম নয়। সাহেবরা জেগে আছেন।

ও, জিব কেটে থেমে গেল।

নটবর নেমে গেল একতলায়।

জলের কুলকুলানি শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি টেরও পাইনি।

*

রাত কত হবে জানি না। কী এক অজানা অচেনা অস্বস্তিতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো একটু আগে কোনো শব্দ শুনলাম। ঝপ করে জলে কিছু পড়ার শব্দ।

জালিবোটটা বোটের পেছনে বাঁধা ছিল, সেটা বোটের সঙ্গে ধাক্কা খেলে যেমন শব্দ হয় তেমনি। তারপর ভাবলাম হয়ত ভুল শুনলাম।

www.BanglaBook.org

বিছানায় উঠে বসলাম। গাটা ছমছম করতে লাগল। এমন কখনো হয়নি, এতবার এসেছি সুন্দরবনে। অন্ধকারে দু-পাশের জল আর জঙ্গলের প্রভেদ বোঝা যায় না। আকাশে ভোরের শুকতারাটা জ্বলজ্বল করছে দেখলাম। আর কোন পরিবর্তন নেই। কুলকুল করে জল চলেছে। সেই কুলকুলানি শব্দ শোনা যাচ্ছে শুধু।

ভাঁটা শেষ হয়ে জোয়ার শুরু হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ হলো। মনে হলো আবছা কালো ও গাঢ় ধূসরে মেশানো কুমিরের গায়ের মতো অন্ধকার তীর বোট থেকে বেশি দূরে নেই।

কিসের শব্দ শুনলাম বোঝবার চেষ্টা করছি এমন সময় ঘেটো খালাসীর বুকফাটা আর্তনাদ শুনলাম, সাহেব। স্যামুয়েলদা। নটবরকে জানোয়ারে নিলো।

কোনো সারেঙ আমার মাথার মধ্যে টুং-টুং-টুং করে অবিরাম ঘণ্টি বাজাতে লাগলো, কিন্তু আমার মগজের এঞ্জিনম্যান কোনো কাজ করল না। এঞ্জিন স্টার্ট পর্যন্ত করল না।

কী ঘটে গেল বুঝতে বা বোঝবার চেষ্টাও করতে পাচ্ছিলাম না।

যন্ত্রচালিতের মতো এক লাফে সারেঙের ক্যাবিনে উঠে সার্চ-লাইটটা জ্বেলে চতুর্দিকে ঘুরিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম।

প্রথমে কিছুই দেখতে পেলাম না। তারপর আবার ভালো করে ঘুরোতে দেখলাম নটবরের হলদে জামার ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো ড্যাঙ্গার কেওড়ার শুলোয় ছিঁড়ে ছিঁড়ে আটকে আছে। জালিবোটের ভিতরে ওর কাঁথা আর বালিশটা পড়ে আছে। কাদামাখানো বাঘের একটি পায়ের ছাপ এবং কাদার দাগ লেগে আছে কাঁথাটাতে।

ততক্ষণে নিচের ক্যাবিনে সোরগোল পড়ে গেছে।

সাহেব রাইফেল নিয়ে ডেকে উঠে এসেছেন। ঘেটো আর অছিমুদ্দি দুজনেই ডেকে উঠে এসেছে।

কাঁদতে কাঁদতে, ফোঁপাতে ফোঁপাতে ঘেটো যা বলল, তার মর্মার্থ হচ্ছে, নটবর ওদের কথা না শুনে জালিবোটে এক একা শুতে গেছিল সেই প্রথম রাতেই। একটু আগে শব্দ শুনেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসে ঘেটো দেখে যে, বাঘ নটবরকে মুখে করে সাঁতরে চলে যাচ্ছে। ড্যাঙ্গায় উঠে, জঙ্গলের ভিতরে চলে গেল।

যতক্ষণ বাঘকে দেখা গেছে ততক্ষণ ও মুখ দিয়ে আওয়াজ করতে পর্যন্ত পারেনি। কোনো দৈব অভিশাপে ও যেন বোবা হয়েছিল। বাঘ দৃষ্টির আড়ালে যাওয়া মাত্র ও চিৎকার করে উঠেছে।

সাহেব নিরুপায় হয়ে রাইফেল নিয়ে ডেকে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর সাত বছরের পুরানো এঞ্জিনম্যান নটবরকে তিনি বোটে থাকা সত্ত্বেও বাঘে নিয়ে গেলো।

নেবে না? বেশ হয়েছে। হারামজাদাকে বললাম, বাহাদুরী করিস না। তা নয়, বেশি বেশি। অথচ এই অন্ধকারের শেষ রাতে একহাঁটু কাদা ভেঙ্গে শুলো বাঁচিয়ে হ্যাঁতাল আর গরাণের ঝোপে ঢোকা মানে বাঘ যে দেশে নিয়ে গেছে, সেই অদেখা দেশে যাওয়া। তাতে কোন ভুল নেই। পৃথিবীতে এমন কোনো শিকারি জন্মায় নি যে, অমাবস্যার শেষ রাতে সবে ভাঁটি-দেওয়া সুন্দরবনের কাদার মধ্যে সবে মানুষ-নেওয়া বাঘকে অনুসরণ করে হ্যাঁতাল-গরাণের বনে ঢুকতে পারে। সে যদি বাঁচে, তাকে বনবিবিই বাঁচাবেন।

বাবা দক্ষিণ রায়ের উপর বড় ভক্তি ছিল নটবরটার। এঞ্জিন-ঘরের কুলুঙ্গীতে বনবিবির মূর্তি রেখেছিল অছিমুদ্দি। সুন্দরবনে এলেই ওরা পুজো করতো।

কিছুই হলো না। এখন নিরুপায়। সকাল না হওয়া অবধি কিছুই করার নেই। বাসন্তীতে

www.BanglaBook.org

একবার একটি বাঘে-ধরা জেলের মৃতদেহ দেখেছিলাম। আমরা যেমন কৈ-মাছের মাথা চিবিয়ে খাই, তেমনি মাথাটা চিবিয়েছিল। নটবরের মুখটা মনে পড়ল। ভাবতে পারি না। ঈস! নটবর!

কুড়ি-পঁচিশ মিনিট বাদেই আলো ফুটল পুবে। সাহেব সেই যে ডেক এ এসে আমার পাশে চুপ করে বসেছিলেন, কোন কথা বলেননি। কেবল পুবে তাকিয়েছিলেন। কখন আলো ফুটবে সেই আশায়।

আকাশটা ফর্সা হতেই বললেন ঘেটো, জালিবোটে দাঁড় লাগা, আমি একাই যাব।

মিলিদিদি ডেকএ উঠে এসেছেন।

ওঁরা সকলেই ঘটনার অভাবনীয়তায় ও আকস্মিকতায় আমাদের কথা একেবারে ভুলে গেছেন। মিলিদিদি গোলাপী-রঙা একটি সিল্কের নাইটী পরে আছেন। বুকে ও কাঁধে কুঁচি তোলা। ভোরের রোদ্দুর মিলিদিদির চুলে, গ্রীবায়, কাঁধে এসে পড়েছে। মিলিদিদিকে একেবারে বনবিবির মতো দেখাচ্ছে। এক-একবার কোনো দূরদেশী বিষণ্ণ সাদা রাজহাঁসের মতো মনে হচ্ছে।

মিলিদিদি সাহেবের হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, না গেলে হয় না, অয়নদা? নটবর ত বেঁচে নেই। তবে? না গেলে হয় না?

সাহেব উত্তর দিলেন না। নীরবে মাথা নাড়লেন।

মিলিদিদি বললেন, হয় না কেন?

তারপর কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন, খুব হয়। অপানি যদি নটবরের মতো...

বলেই, কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না। সাহেবের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে ঝরঝর করে নীরবে কাঁদতে লাগলেন।

মেমসাহেব কোনো কথা বললেন না। জলভরা চোখে সাহেবের দিকে চেয়ে রইলেন।

সাহেব নিচে চলে গেলেন। পায়জামা পাঞ্জাবি ছেড়ে আসতে।

কেন জানি না, আমার হঠাৎ সাহেবের মতো সাহসী হতে ইচ্ছা করল! ভালবাসায় অধীর, অনিশ্চিত-ভবিষ্যৎ এই দুটি নারীকে দেখে আমি মুহূর্তে নটবরের কথা ভুলে গেলাম। আমি বললাম সাহেব আমিও যাব আপনার সঙ্গে।

সাহেব নিচ থেকেই বললেন, না। তুমি যাবে না। তোমার কিছু হলে বোট চালিয়ে এঁদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবে কে? কেউ যাবে না সঙ্গে। আমি একাই যাব।

সাহেব রাইফেল নিয়ে জালিবোটে উঠতে গেলেন। একবারও ওঁদের দিকে চাইলেন পর্যন্ত না। বোটে উঠবার আগে মিলিদিদি সাহেবকে প্রায় জড়িয়ে ধরে আমাদের সকলের সামনেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

মেমসাহেব কাতর-গলায় বললেন, সোনা, না গেলেই কি নয়? আমার বড় ভয় করছে।

সাহেব মেমসাহেবের কাঁধ চাপড়ে বললেন, কোনো ভয় নেই। নটবরের কথা একবার ভাব লিলি, ছিঃ তোমরা কি হলে বল তো?

সাহেবকে দেখে তখন আমার ভারী গর্ব হলো। মনিবের মতো মনিব বটে। মরদের মতো মরদ। শিকারের পোশাকে আমি আমার সাহেবকে রাজার মতো দেখি। কী করে পারলাম জানি না, আমি সাহেবকে হুকুম করলাম, আপনি একা যেতে পারবেন না। অছিমুদ্দি আপন ক জালিবোট নিয়ে ডাঙ্গায় পৌঁছে দিয়ে আসুক। আপনি আওয়াজ দিলে আবার গিয়ে আপনাকে নিয়ে আসবে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে জোয়ার পুরো হয়ে যাবে।

www.BanglaBook.org

জোয়ার ভরা হলে জঙ্গল থেকে আপনি জালিবোটে এসে একা একা পৌঁছতেই পারবেন না। আমার কথা একবার শুনুন সাহেব, আমি বারবার আপনার কথা শুনে এসেছি।

সাহেব মুখ তুলে আমার চোখের দিকে চাইলেন।

তারপর অছিমুদ্দিকে বললেন, চলরে।

অছিমুদ্দি দাঁড় বেয়ে সাহেবকে ডাঙায় নিয়ে গেল। সাহেব আমাদের চোখের সামনে নামলেন। রাইফেলটা বগলের তলায় ফেলে, খালি পায়ে একহাঁটু কাঁদা ভেঙে ভেঙে যেদিকে নটবরের হলুদ সার্টের টুকরো কেওড়ায় শূলোর উপর দেখা যাচ্ছিল সেদিকে এগিয়ে চললেন। তারপর হ্যাঁতালের ঝোপের আড়ালে কেওড়া গাছের ছায়ায় হারিয়ে গেলেন।

অছিমুদ্দি জালিবোটটাকে নিয়ে বোটে ফিরে এলো।

সেই মুহূর্তে আমাদের বোটের স্টপওয়াচ কে যেন বন্ধ করে দিল। আমরা সবাই কেবল বোবাদৃষ্টিতে জঙ্গলের দিকে চেয়ে রইলাম। অনামা-অজানা মৃত্যুর মর্মান্তিক প্রতীক্ষায়।

ভাল করে রোদ উঠল। রোদের তেজ বাড়ল। কিন্তু মেমসাহেব বা মিলিদি কেউই ডেকে নামলেন না। মিলিদি মাঝে মাঝে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন। সমস্ত বোটের জীবন যেন কার অমোঘ অভিশাপে নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

একঘণ্টা কখন কেটে গেল জানি না।

জোয়ারের জল বাড়ছে, বাড়ছে তো বাড়ছেই, আমার ভয় করতে লাগল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে সাহেব ফিরতে না পারলে জোয়ারের জল সর্বত্র ঢুকে যাবে। এই জলে, শূলো বাঁচিয়ে, হাঙ্গর-কুমিরের দাঁত বাঁচিয়ে, খাল-নালা বাঁচিয়ে সাহেব ফিরে আসতেই আর পারবেন না, যতক্ষণ না সেই বিকেলের দিকে ভাঁটি শেষ হয়। অতএব সাহেবের যে কী হলো কিছুই জানা গেল না। জানা যাবে না।

বড়ই অস্বস্তিতে পড়লাম। জীবনে এমন অস্বস্তিতে কখনো পড়িনি। মেমসাহেবের সামনেই একটা সিগারেট ধরালাম। মাথার ঠিক রাখতে পারছি না।

মেমসাহেব শুধোলেন, জোয়ার পুরো হতে আর কতো দেরী, স্যামুয়েল?

কাঁপা-কাঁপা গলায় বিরসমুখে বললাম, আর আধঘণ্টাখানেক।

কেউ কোনো কেথা বলছে না আর। জোরে জোয়ারের জল ঢুকছে খালগুলোতে। সুঁতী খালে। পার্শে মাছ ধরার আশায় মাছরাঙাগুলো ছোঁ মেরে মেরে পড়ছে সুঁতী খালের মুখে মুখে। একটা কার্লু তীক্ষ্ণ অলুক্ষণে গলায় ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। সমস্ত সমুদ্র উজাড় করে জল ঢুকছে জঙ্গলে। আস্তে আস্তে ভাসিয়ে নিচ্ছে, ভারশূন্য করে দিচ্ছে যেন জঙ্গলকে।

সময় আর কাটছে না। একটি একটি মিনিট কাটছে আর আমাদের ধুকপুকানি বাড়ছে। এমন সময় সমস্ত জল-জঙ্গল কাঁপিয়ে গগনভেদী এক প্রচণ্ড গর্জন শুনলাম, বাঘের। সমস্ত ঝোপঝাড় যেন কেঁপে উঠল মনে হলো, জলে যেন ঢেউ খেলে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি গুলির শব্দ।

রাইফেলের গুলির গুমগুমানি জল বেয়ে কোথায় ছড়িয়ে গেল। তার পরই নিস্তব্ধতাকে আরো বেশি ভয়াবহ বলে মনে হলো। আর কোনো গুলি হলো না, আর কোন শব্দ হলো না।

হঠাৎ অমন আমেজভরা রোদ্দুরটা ঠাণ্ডা মেরে গেল, শীত শীত করতে লাগলো।

www.BanglaBook.org

আরো দশ মিনিট কেটে গেলো।

মেমসাহেবের মুখটি শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে। চোখের কোণে জল শুকিয়ে আছে। ফিসফিস করে মেমসাহেব মিলিদিকে বললেন, তুই এত খারাপ কেন রে মিলি? অয়নদা তেকে এমন করে ভালবাসে আর তুই এমন নিষ্ঠুরতা করিস।

আমি?

মিলিদিদি জলভরা চোখ বড় বড় করে শুধোলেন।

মেমসাহেব আবার বললেন, তুই যে অমন করিস, আজ যদি তোর অয়নদা আর না ফেরে।

মিলিদিদি মেমসাহেবের মুখ চাপা দিয়ে বললেন, ওরকম করে বোলো না দিদি, বোলো না দিদি।

তারপর ফিসফিসে গলায় বললেন, কেন নিষ্ঠুরতা করি, তা কি তুমি জানো না।

মেমসাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, জানি।

কিন্তু তুইই বা আমাকে এত ছোট ভাবিস কেন? তার ভালোবাসা যদি একজনকে দিয়েই ফুরিয়ে না গিয়ে থাকে, তাহলে তুই তাকে ভালোবাসলে আমার অভিযোগ কিসের?

মিলিদিদি ধরা গলায় বললেন, দিদি লোকে বলবে, তোমার সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। যে অয়নদা তোমার, তাকে আমি কেড়ে নিয়েছি।

মেমসাহেব স্বগতোক্তির মতো বললেন, তোর অয়নদাকে কেউ কেড়ে নেবে, এ ভয় আমার নেই। সে এই জোয়ারের মতই গতিস্মান। সে নিজে যখন চলে, তার চারপাশের সব কিছুকে সে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তাকে কেড়ে নেবে, এমন শক্তিমতি এখনো জন্মায়নি কেউ।

তারপর একটু হেসে বললেন, আমাকে একটা কথা দিবি মিলি?

কি দিদি?

ফিরে আসুক তোর অয়নদা, শুধু ফিরে আসুক। সে যা চাইবে তাই দিবি, তাই করবি। আমাকে যদি সত্যিকারের ভালোবাসিস, কখনো তাকে দুঃখ দিয়ে ফিরাবি না। কখনো না। কথা দে মিলি, কথা দে।

মিলিদিদিও যেন ভুলে গেছেন যে আমরা সকলেই আশেপাশে আছি।

মিলিদিদি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমি কি চাই না দিদি? কিন্তু লোকে আমাকে খারাপ বলবে। লোকে আমাকে বুঝবে না।

মেমসাহেব বললেন, কাঁদলে হবে না মিলি। কথা দিতে হবে। কথা দে আমাকে।'

বলতে বলতে মেমসাহেব মিলিদির হাত ধরে বললেন, লোকের কথা দিয়ে কী করব বল? আমাদের এই তিনজনের জগতে আমরা তিনজনেই সুখী হব। সুখী থাকতে চাই। সে কেবল ফিরে আসুক। ফিরে আসুক। অয়নদাকে আর কখনো দুঃখ দিস না মিলি।

অছিমুদ্দি উদ্বিগ্ন গলায় বললো, গতিক তো সুবিধের লাগতিছে না গো স্যামুয়েলদা। জোয়ার ত ভরে গেল! সাহেব তো এলেন না।

তক্ষুণি আমাদের সকলেরই মনে সেই পুরোনো ভয়টা উঁকি দিল! জিভটা নুন নুন করতে লাগল।

এমনি সময়ে হঠাৎ বোট থেকে প্রায় দেড়শ দুশো গজ দূরে উজোনে, যেখানে ডাঙা খুব উঁচু, কতগুলো সাদাবাণী গাছের ভিড়, যেখানটা জোয়ারে ডোবেনি, ডোবে না কখনো,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেখান থেকে সাহেবের তীক্ষ্ণ স্বর শুনলাম, স্যামুয়েল, স্যামুয়েল, বোট খুলে এখানে নিয়ে এস।

দেখলাম সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। কাঁধে নটবরের ফর্সা, রোগা আধখানা রক্তাক্ত শরীর নিয়ে। একহাতে মৃতদেহটাকে ধরে আছেন, অন্য হাতে রাইফেল।

যত তাড়াতাড়ি পারি নোঙর তুলে, এঞ্জিনে স্টার্ট দিলাম।

জোয়ারের খুব টান। কালিপুজোর জোয়ার। গুট-গুট-গুট-গুট করে বোট এগিয়ে চললো।

সাহেবের কাছে পৌঁছে যতখানি পারি বাঁয়ে ভিড়িয়ে নোঙর করলাম বোট। অছিমুদ্দিই এঞ্জিনম্যান এবং খালাসী দুইয়ের কাজ করছে।

সমস্ত বোটে একটা খুশির জোয়ার বয়ে গেল।

নটবরের উলঙ্গ আধখানা মৃত শরীরের বীভৎস দৃশ্য কোনদিন দেখব বলে ভাবিনি।

মেমসাহেব ও মিলিদিদি দৌড়ে নিচে চলে গেলেন।

জালি বোটে করে সাহেব উঠে এলেন নটবরকে নিয়ে।

অছিমুদ্দি বোটটা বেঁধে রাখল।

সাহেব উঠেই আমাকে বললেন, যত জোরে পার এই জোয়ার ধরে চলে চল। যত তাড়াতাড়ি মসজিদবাড়ি পৌঁছনো যায়। দেরী হলে লাশ পচে যাবে। নটবরকে আমার পাশে বোটের ছাদে শুইয়ে ওর কাঁথাটা দিয়ে ঢেকে দিলাম। তারপর সুকান ধরে বসলাম।

সাহেব বললেন, বাঘটা তখনো নটবরের উপরেই বসে ছিল, আমাকে দেখা মাত্র চার্জ করল। মারতে অসুবিধা হয়নি।

এঞ্জিন টপগীয়ারে গেলে, সুকান ধরে বসে থাকলাম।

জোয়ারে ভেসে চলেছি।

আমার হঠাৎ মনে হলো এ জোয়ার রোজকার জোয়ার নয়। এই এক জোয়ারে অনেক কিছুই ভাসিয়ে নিয়ে গেল। এই জোয়ারেই ভেসে মসজিদ বাড়ি পৌঁছব। নটবরের বাড়ি।

সাহেব নিচে চলে গেলেন। ডেকে পায়ের কাদা ও গায়ের রক্ত ধুতে।

কেবিনে নেমেই, এই নিথর নিঃস্তব্ধ মৃত্যুর পরিবেশ বদলাবার জন্যে জোরে জোরে বললেন, মিলি, আমি মরিনি। বেঁচে এলাম আজ। আমাকে একটা চুমু খাবে?

মিলিদি বললেন, সবসময় এসব কথা ভালো লাগে না।

মেমসাহেব ঝাঁঝিয়ে উঠে বললেন, ন্যাকামির একটা সীমা থাকা উচিত। সবসময় তোমার ন্যাকামি ভালো লাগে না।

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না।

সাহেব অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, আচ্ছা, বাবা আচ্ছা।

আমি ভাবলাম, এই জোয়ার সাধারণ জোয়ার নয়।

এ জোয়ারে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি, জ্ঞান-গম্মি সব ভেসে গেলো।

ভাবলাম, নটবরের মতো সাহেবও আমার মরে গেলেই ভাল হত।

ভাবলাম, যাকগে, নটবরের ডবকা বউটার চোখের জলের জোয়ারে অন্তত কোনো ফাঁকি থাকবে না। অন্তত আশা করা যায়। সে জোয়ার এখন কী দিয়ে বাঁধি, তাই ভাবছি।

www.BanglaBook.org

প্রান্তিক

মিস্টার হোড় বললেন, ব্রিলিয়াণ্ট, সত্যিই ব্রিলিয়াণ্ট।

আসলে একা মিস্টার হোড়ই নন, ইনকাম ট্যাক্সেও এমন লোক নেই যিনি সুকল্যাণ সেনের প্রশংসা না-করেন। পণ্ডিত অনেকে হতে পারেন; আছেনও হয়ত বা, কিন্তু ভালো অ্যাডভোকেট সকলে হতে পারেন না। ইচ্ছে করলেই ভালো অ্যাডভোকেট হওয়া যায় বলে অশোক জানে না। মা,তো নাই-ই।

নইলে, এত বড় একটা কুড়ি লাখ টাকার ক্যাশক্রেডিটের কেস কেমন সুন্দরভাবে গুছিয়ে আর্গুমেন্ট করছেন। অ্যাপলেট ট্রাইব্যুনালের বাঘা-বাঘা মেম্বাররা পর্যন্ত মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছেন। যেমন সুন্দর চেহারা, মিষ্টি করে কথা বলা, তেমনি ক্ষুরধার বুদ্ধি। একেবারে রাজযোটক মিল হয়েছে একটি লোকের মধ্যে। সকলে ব্রিলিয়াণ্ট এমনি বলে না!

দ্বিতীয় দিনের শুনানী যখন শেষ হলো, তখন মিস্টার হোড় বললেন, ব্রিলিয়াণ্ট। অশোক বললো, মুখে ব্রিলিয়াণ্ট বললে হবে না, কেসে যদি সত্যিই জেতেন, তা হলে দশ হাজার টাকা ফী দিতে হবে সেন সাহেবকে।

দশ হাজার? চমকে উঠলেন হোড়।

অশোক কেটে কেটে বললো, হ্যাঁ, দশ হাজার। উনি তাই চেয়েছেন। কেন? কেস জিতলে, আপনার মালিকের কত ট্যাক্স রিলিফ হবে? কত লাখ টাকা? তা তো জানেন।

মিস্টার হোড় হেসে বললেন, আজ্ঞে না, সে কথা আর বলতে!

তবে? অশোক শুধোল।

না। তবে কিছু না, মানে, দশ হাজার একটু বেশি মনে হচ্ছে, এই আর কি?

তৃতীয় দিনের শুনানী আরম্ভ হলো। অশোক জুনিয়ার কাউন্সেল। টেবিলের উপর উপুড় করে বই সাজিয়ে রেখে একটি একটি করে অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফটের গোলার মতো সিনিয়ার সুকল্যাণ সেনকে যোগান দিচ্ছে। আর দেখতে দেখতে ডিপার্টমেণ্টাল

www.BanglaBook.org

রিপ্রেজেনটেটিভের যুক্তির জঙ্গী বিমানগুলি ভূতলশায়ী হয়ে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে। মিস্টার হোড়ের উত্তেজনা বাড়ছে! মাঝে মাঝেই কোর্ট-রুম থেকে বাইরে গিয়ে সিগারেট খেয়ে আসছেন।

বহুমূল্য আংটি-পরা দু-হাতের তেলোয় সাঁতরাগাছির ওলের মতো মুখখানি রেখে, শ্মশানে রাজা হরিশচন্দ্র যেমন বিবাগীর মতো মুখ করে বসেছিলেন, মুখে তেমনি একটি কৈবল্য ভাব ফুটিয়ে বসে আছেন। আর মাঝে মাঝে মুলতানি গরুর মতো জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছেন।

লোকটাকে দেখে প্রথম দিন থেকেই মনে হয়েছে, লোকটা একটা ঘুঘু। অ্যাপেলেন্টের কর্মচারীই নয় হয়ত। হয়ত কনট্রাক্ট করেছে কেস জিতিয়ে দেবার জন্যে। তারপর পাকা রেসুড়ে যেমন ঘোড়া বুঝে জান লড়ায়, তেমনি সুকল্যাণ সেনকে খুঁজে বের করে সেই ঘোড়ায় বাজি লাগিয়েছে। জিতলে বাজি মাৎ। হারলেই বা কি? ওর থোড়াই গ্যাঁট থেকে কিছু খরচ হচ্ছে। লোকটার অতি-বিনয় দেখেই মনে হয়, লোকটা দালাল। নয় খুনে।

এদিকে আর্গুমেন্ট প্রায় শেষ হয়ে এলো। সেন সাহেব সামিংআপ করছেন! মেম্বারেরা হাইলি ইম্প্রেসড। অ্যাপারেণ্টলি। যেমন চমৎকার পেপার-বুক করা হয়েছিল তেমনি খেটেছিলেন সেন সাহেব কেসটিতে। অশোকও কম খাটেনি। এতদিনের শ্রম এক্ষুণি পুরস্কৃত হবে। একটি বড় কেস তৈরি করা কি সোজা কাজ? কতবার অ্যাডজোর্নমেন্ট নেওয়া হলো, কত কাগজ যোগাড় করতে হলো, শয়ে শয়ে পাতা ডিকটেশান, শয়ে শয়ে পাতা টাইপ, তারপর তৈরি হলো পেপার-বুক। একটি বড় কেসের শুনানী শেষ হতে হয়ত দু'তিন মাসের অক্লান্ত পরিশ্রম। সেই সব রাতগুলোর কথা ভাবে অশোক। টেবিলে রাশীকৃত বই ছড়িয়ে বসে আছে। দেওয়াল ঘড়িটা একলা টিকটিক করছে। অফিসের সবাই যথাসময়ে চলে গেছে। ও একা একা বসে বসে পাতা হাতড়াচ্ছে, নোট নিচ্ছে, ভাবছে।

ও অনেকদিন ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেছে, মানুষ কি কখনো টাকার জন্য এত পরিশ্রম করতে পারে? ওর দৃঢ় ধারণা, টাকার জন্যে বা নিজের জন্যে কোনো মানুষই কিছুই করতে পারে না। অশোক যা কিছু করে সবই জেদের জন্যে, মজার জন্যে। একটি ভাল ইনস্যুয়িং বল ফেলে কোনো দুঁদে ব্যাটসম্যানকে আউট করার মধ্যে যে আত্মতৃপ্তি পেয়েছে ও, একটি কেস ভালভাবে জিতে ও ঠিক তেমনি আনন্দ পেয়েছে। ওর ঠাসবুনুনি যুক্তি, সুন্দর ডেলিভারী এবং গুডহিউমারের বিপক্ষে ওর প্রতিপক্ষ যখন উল্টে-দেওয়া তেলাপোকার মতো আইনের যুক্তির পিচ্ছিল মেঝেতে হাত-পা ছুঁড়েছে তখন ওর খুব ভাল লেগেছে কিংবা কোনো অভদ্র, কুজাত প্রতিপক্ষ ওর সওয়ালের মুখে যখন গুড়ের হাঁড়িতে-পড়া নেংটি ইঁদুরের মতো যন্ত্রণায় জবজব করেছে তখনো ওর খুব ভালো লেগেছে। শুধুই টাকার জন্যে ও অন্তত কিছু করতে পারতো না জীবনে। এ পর্যন্ত পারেনি। অথচ মুশকিল হচ্ছে, টাকারও প্রয়োজন। সে প্রয়োজনটা আবার বেশি করে মাথা-চাড়া দিয়ে ওঠে, যখনি চোখের সামনে দেখতে পায় ওর চেয়ে সর্ববিচারে নিকৃষ্ট অনেক লোক যেন-তেন-প্রকারেণ পকেট ভর্তি টাকা রোজগার করে হাজারীবাগী টাঁড়ের ট্যারা ষাঁড়ের মতো শিং উঁচিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই সব দুর্বিনীত ঘেয়ো কুকুরগুলিকে দেখলে ওরও বড়লোক হতে ইচ্ছে করে। ওরও টাকা রোজগার করতে ইচ্ছে করে। ভাগ্যিস, সেই যেন-তেন-প্রকারেণ রোজগারের ইচ্ছাকে ও সবসময়ে অবদমিত করে রাখে। অথচ ও বুঝতে পায়, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতো টাকা দিয়েই কেবলমাত্র ঐ শ্রেণীর টাকাওয়ালা লোককে শায়েস্তা করা যায়। ও অনেক কিছু বোঝে। সেই বোঝা যে ভুল তা বোঝে। তারপর সব কিছু ভুলে যেতে পেরে তৃপ্তি পায়।

www.BanglaBook.org

অবশ্য টাকা ছাড়াও অনেক কিছু দুশ্চিন্তার আছে। এসব চিন্তা ছাড়াও তার মনকে পীড়িত করার মতো অনেক চিন্তা মাথার মধ্যে দপদপ করে। নীরেন, অশোকের স্ত্রী জুলির সেই কলেজে পড়া বন্ধু। কালো ঘোড়ার মতো চকচকে চেহারা। উল্টো করে ফেরানো চুল। অশোক জানে, যে অশোক বাড়ি না থাকলে সে আসে যায়। মাঝে মাঝে জুলি তার সঙ্গে বাইরেও দেখা করে। কোনো রেস্তোরাঁতে খায়। নীরেনদের একটি কটেজ আছে গঙ্গার ধারে। শ্রীরামপুরে, সেখানেও যায়। সব জানে অশোক। অথচ জুলির চোখ চেয়ে বিশ্বাস করতে পারে না যে সে অসৎ। ওর চোখে চাইলে মনে হয়, ও বড় যন্ত্রণা পাচ্ছে। কিন্তু যন্ত্রণা ছাড়া বিশ্বাসঘাতকতার কোনো চিহ্ন জুলির চোখে দেখেনি কখনো। জুলি ওকে ভালোবাসে এবং অশোকের প্রতি সমস্ত ব্যাপারেই জুলি সৎ। কেবল যেদিন নীরেনের সঙ্গে জুলির দেখা হয়, সেদিন রাতে জুলির চোখের কালো মণি দুটি মৌটুসী পাখির মতো স্পন্দিত হতে থাকে। ওর বুকের যন্ত্রণাটা চোখে এসে বাসা বাঁধে। জুলির প্রতি সমবেদনাও হয় অথচ ওকে ক্ষমা করতেও ইচ্ছে করে না। কিন্তু ক্ষমা ও করে দেয় কারণ ওর বিশ্বাসে এখনো ফাটল ধরায়নি জুলি। সুস্থ মেলামেশার যে সীমা ও মনে মনে এঁকে রেখেছে, সেই প্রান্তসীমা জুলি কখনো লঙ্ঘন করে গেছে বলে মনে হয়নি ওর।

আর্গুমেন্ট শেষ করে সেন সাহেব বসে পড়লেন। একটি ছাই রঙা স্যুট পরেছিলেন সেদিন। ওডিকোলন মাখানো সাদা রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন, তারপর ফিসফিস করে অশোককে বললেন, কেমন বুঝলে?

বোঝবার তো কিছু নেই স্যার। জিত। জিত হয়ে গেছে।

মিস্টার হোড়, একটু নড়ে চড়ে বসে রথের মেলার আহ্লাদির স্বামীর মতো মাথা নাড়লেন।

সেন সাহেব বললেন, না-আঁচালে বিশ্বাস নেই। দেখো কি হয়।

ফ্যানটা চিড়িক চিড়িক করে ঘুরতে লাগলো। কোর্টরুমের জানলা দিয়ে অশোক দেখলো, আমগাছের ডালে একটি কাক গদ-গদ গলায় একটি সাদা-গলা মেয়ে-কাককে কি যেন বলছে।

মেম্বাররা উঠে গেলেন।

সেন সাহেব বললেন, আমি চলি অশোক। হাইকোর্টে একটা ম্যাটার আছে। হবে না বোধহয়, তবুও একবার যাওয়া দরকার।

সেন সাহেব চলে গেলেন তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে।

মিস্টার হোড় অশোককে ডাকলেন।

কেমন বুঝলেন স্যার?

অশোক চটে উঠলো। বললো, দেখুন, আপনাকে রানিং-কমেন্টারি দিতে পারব না। শুনলেন তো সবই।

মিস্টার হোড়, মুখে ক্ষমার হাসি এনে বললেন, আহা! চটবেন না স্যার।

আসুন এদিকে একবার আসুন।

বারান্দার কোণায় ডেকে নিয়ে মিস্টার হোড়, তাঁর ঢোলা, ঝলঝলে টেরিলিনের স্যুটের পকেট থেকে তাড়া তাড়া ঘামে-ভেজা একশো টাকার নোট বের করে দিতে লাগলেন।

অশোক তার স্যুটের এ-পকেট ও-পকেটে নোটগুলি ভরে রাখতে রাখতে কাঁপা-কাঁপা গলায় বললো, কি ব্যাপার?

মিস্টার হোড় বললেন, সেন সাহেবের। আট আছে। মানে, আট হাজার। ট্রাইব্যুনালের অর্ডার পেলে আর দু হাজার দেবো। ওঁকে বলবেন।

www.BanglaBook.org

অশোক নিজের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যাপাসিটিতে এই কেস রিপ্রেজেন্ট করছে না। করছে, তার অফিসের হয়ে। এই কেসের জন্যে তার অফিসকে মিস্টার হোড় কত টাকা দেবেন তা অশোক জানে না। সে, মাস গেলে মাইনে পায়। তা ছাড়া অন্য কিছু পায় না। অশোক ভাবলো, মুখ ফুটে মিস্টার হোড়কে বলেই ফেলে কথাটা। বলে, যে সিনিয়রকে ফী দিলেন, জুনিয়ারকে কিছু দেবেন না? বলি বলি করেও বলতে পারলো না কথাটা অশোক। অশোকও এ কেসে কম খাটেনি। ওর বাড়িতেই পিসতুতো বোনের বিয়ে হলো। অথচ ও গত সাত দিন সকাল আটটা থেকে রাত এগারোটা অবধি এই কেস নিয়েই ডুবে থেকেছে। অশোকের খুব ইচ্ছা করলো, বলে, একবার বলে।

এ সব লোক মুখ ফুটে না-বললে দেবে না। কোনো দিনও দেয়নি।

কিন্তু মিস্টার হোড় সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছেন। পিছনে ফিরে তাকাচ্ছেনও না। অশোক সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে রইলো। ভাবল, মুখ ফেরালেই বলবে। মিস্টার হোড় হঠাৎ মুখ ফেরালেন। হাত নেড়ে বললেন, সেন সাহেবকে বলবেন। রসিদ চাই না।

অশোক নিজের কথা কিছুই বলতে পারলো না। মিস্টার হোড়ের কথার উত্তরে মাথা নোয়ালো।

তারপর, বেয়ারাদের বিস্ফারিত চোখের সামনে সিঁড়ি বেয়ে নেমে, গাড়ির দরজা খুললো। দরজা খুলে ভিতরে বসলো। অফিসের গাড়ি। ও নিজেই চালায়। বড় গরম লাগতে লাগলো অশোকের।

গাড়িটা তেতে আগুন হয়ে গেছে। স্যুটটা ঘামে জবজব করছে। সকালে বাড়ি থেকে বেরুবার সময় গায়ে পাউডার দিয়েছিল। বুঝতে পারছে, গেঞ্জির ভিতরে গলে গলে পিঠ-চুঁইয়ে ঘামের সঙ্গে পড়ছে। মোজা-জুতো-মোড়া পায়ের পাতা দুটি জ্বালা করছে।

গাড়িটা স্টার্ট করলো। গীয়ার দিতে গিয়ে বাঁ হাতটা বাঁ পকেটে লাগলো। অনেকগুলো টাকাতে পকেটটা ভারী হয়ে আছে।

গুরুসদয় রোডের ট্রাইব্যুনাল অফিস থেকে ধর্মতলা স্ট্রিটে সুকল্যাণ সেনের এয়ারকন্ডিশানড চেম্বারে পৌঁছতে সময় লাগবে না বেশি। কিন্তু অশোককে পৌঁছতেই হবে। কতক্ষণ পরের বোঝা বয়ে বেড়াবে এমন করে? রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন না? কি যে বলেছিলেন? মনে পড়ল না অশোকের। শুধু মনে পড়লো, বলেছিলেন টাকা জিনিসটা ভালো নয়।

আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে পার্ক স্ট্রিটের কাছাকাছি এসে পৌঁছলো। লাল আলোতে দাঁড়ালো। ডান দিকে একটি রেডিও-রেফ্রিজারেটরের দোকান। অশোক একবার তাকালো।

আজও অফিসে বেরুবার সময় জুলি বলেছিল, হায়ার-পারচেজে একটা রেফ্রিজারেটর কেনো না গো? একদিন বাজার করে, কতদিন রাখা যায়। কোকোকোলা রেখে দেওয়া যায় কিনে। কেউ এলে দেওয়া যায়। আরো কত কি রাখা যায়। তুমি বেশ কিপ্টে আছ, যাই বলো বাবা।

অশোক মনে মনে হাসে। কিপ্টেই বটে। কিপ্টে নিশ্চয়ই। কিন্তু সে কেবল নিজের বেলায়। অন্য কারো জন্যে কিছু করবার বেলায় সে কিপ্টে নয়, কোনোদিনও ছিলো না। যাক, টাকা হাতে না-থাকলে কি কেউ মন দেখাতে পারে? আজকালকার মন তো অন্য কিছু দিয়ে দেখানো যায় না।

আসলে জুলির অনেক শখ আছে। অশোকেরও কি নেই? এটা করবে, সেটা করবে, পুজোর সময় দূ—রে কোথাও বেড়াতে যাবে। আরো কত কি, কত কি করবে...। কত কিছু

www.BanglaBook.org

ভাবে। দুজনে মিলে অনেক কিছু ভাবে। একটা ফ্রিজের দাম কতো? আড়াই তিন হাজার?

অশোকের পকেটে এখন নগদ আট হাজার টাকা। সুকল্যাণ সেন কখনো মিস্টার হোড়কে শুধোবেন না, উনি কত টাকা দিয়েছেন। মিস্টার হোড় কখনো সুকল্যাণ সেনের ঘরে ঢোকার সাহস পাবেন না। ওসব লোকের একটা জন্মগত হীনমন্যতা থাকে। ওঁরা অনেক কিছু করতে পারেন হয়ত। আবার অনেক কিছু করতে পারেনও না।

অশোক ভাবলো, যদি দু হাজার টাকা রেখে দিয়ে বাকী ছ হাজার সেন সাহেবকে দিয়ে বলে, মিস্টার হোড় মাত্র ছ হাজারই দিলেন।

সেন সাহেব নিশ্চয়ই কিছু বুঝতে পারবেন না। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি, সেন সাহেব নিজেও কি সত্যি ভেবেছিলেন যে ওরা সত্যি সত্যিই এক কথায় এতগুলো টাকা দেবেন?

পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে আবার দাঁড়াতে হলো। ভীষণ গরম লাগছে। গাড়ির আয়নাটা ঘুরিয়ে দিয়ে অশোক নিজের মুখটা দেখলো। এমন করে কাছ থেকে ও নিজেকে অনেক দিন দেখেনি। ঘামে চুলগুলো ভিজে গেছে, কপালে শুয়ে রয়েছে, নাকটা লালচে দেখাচ্ছে। দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছে গাল বেয়ে। অশোক আয়নার দিকে চেয়ে বললো, এই যে, উনি মাত্র ছ'হাজার দিলেন। অশোক পুলকিত হয়ে দেখলো, ওর মুখে কোনোরকম ভাবান্তর হলো না। আর একবার মহড়া দিয়ে নিলো। ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প নাট্যরূপ দিয়ে ওরা নাটক করত। অনেকে বলত, অশোক খুব ভাল অভিনেতা। ও নাকি খুব ন্যাচারাল অভিনয় করে। আজ অশোকের মনে হলো, ওরা ঠিকই বলতো।

দুটি ড্রেনপাইপ-পরা ছেলে বই-খাতা হাতে নিয়ে রাস্তা পেরুচ্ছিল বোধহয় সেইন্টজেভিয়ার্সে পড়ে।

একজন বললো, বল? তাই না?

অন্যজন বললো, আরে, সব, সব। আজকাল চুরি না-করে উপায় আছে? ইটস আ ভিসাস সার্কল।

ট্রাফিক লাইটটা হলুদ হলো। অশোকের মনে হলো একটা হলুদ বৃত্ত ওর চোখের সামনে ঘুরছে। ভিসাস সার্কলের রঙ কি হলুদ হয়?

কাকেই বা জিজ্ঞেস করবে?

নিজের উপর রাগ হলো।

জোরে গাড়ি চালিয়ে দিলো। অ্যাকসিলারেটরে যতো জোরে পারে চাপ দিল। মনে মনে বললো, শালা! এত দ্বিধা কিসের? আমি কি খাটিনি নাকি? সিনিয়র পাবে, আর জুনিয়রকে কিছুই দেবে না? কেন না? না কেন? তারপর অশোক মনস্থির করে ফেললো।

ওর ভীষণ ঘাম হতে লাগলো।

দেখতে দেখতে কখন ধর্মতলা স্ট্রিটে পৌঁছে গেলো। লিফটে উঠে উপরে গেলো। ডান পকেটে দু হাজার টাকা আলাদা করে রেখেছে। ও থার্ড ফ্লোরে পৌঁছেই ল্যাভাটরীতে গিয়ে আলাদা করে ফেলেছে, বাঁ পকেটে ছ হাজার।

বড় বড় পা ফেলে বেশ সপ্রতিভভাবে সেন সাহেবের চেম্বারের স্যুইং-ডোর খুলে ঢুকলো অশোক। দরজাটা বলে উঠলো, কিঁয়াচ-কাঁও।

চমকে এবং একটু ভয় পেয়ে মুখ তুলে চাইলো অশোক।

সেন সাহেব কোটটা খুলে ফেলেছেন কিন্তু একটি ফিকে হলদে-রঙা হাফহাতা সোয়েটার পরে বসে আছেন। ঘরে এয়ার-কন্ডিশনার চলছে বলে।

www.BanglaBook.org

অশোকের আবার সব গোলমাল হয়ে গেলো। সেন সাহেবের সোয়েটারের সমস্ত হলুদ রঙ একটি হলুদ বৃত্ত হয়ে ঘুরতে লাগলো ওর চোখের সামনে।

কি হলো? বোসো?

বেয়ারা, দুটি কোকাকোলা নিয়ে ঘরে ঢুকলো সঙ্গে সঙ্গে।

এ কি? দুটি কেন? আপনি কি জানতেন আমি আসব?

তোমার হাবভাব দেখেই কোর্টে বুঝেছিলাম, মক্কেল তোমায় আজ কিছু টাকা দেবে। এতটুকুই না বুঝলাম তো কিসের ওকালতি করি? দাও। এনেছ নাকি কিছু?

অশোক খুব তাড়াতাড়ি তোতলাবার মতো করে বলে উঠলো, মানে, ওর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেলো, দিলেন, মানে সব নয়। আট হাজার। আট হাজার টাকা।

সেন সাহেব বললেন, মোটে আট হাজার?

অশোক আবার বললো, হ্যাঁ।

সেন সাহেব একটু চুপ করে থেকে বললেন, তোমাকে কিছু দিল?

অশোক লজ্জার সঙ্গে মাথা নাড়ল। নেতিবাচক।

হুঁ। সেন সাহেব স্বগতোক্তি করলেন।

অশোক দু পকেটে একসঙ্গে হাত গলিয়ে টাকাগুলো বের করে টেবিলে রাখলো, বললো, গুনে নিন।

ভারমুক্ত হলো ও। একটি দীর্ঘশ্বাস পড়লো।

সেন সাহেব টাকাগুলো একটি একটি করে গুনে নিলেন। অশোক ভাবল, উনি হয়ত বলবেন, নাও হে! এই পাঁচশো আমিই তোমাকে দিলাম। কিংবা নিদেনপক্ষে একশো টাকার নোট?

না। সেরকম কিছুই ঘটলো না। সেন সাহেব টাকাগুলো নিয়ে আয়রনসেফে তুলে রাখলেন। প্রত্যেকটি নোট।

এক চুমুকে কোকাকোলা শেষ করে অশোক বললো, আমি তাহলে আসি?

যাবে? আচ্ছা এসো।

কেন জানে না, অশোকের খুব ভালো লাগতে লাগলো। খুব হালকা লাগতে লাগলো। ওর খুব খুশি খুশি লাগতে লাগলো। নীচের পানের দোকানে এসে দাঁড়ালো অশোক, বললো, এক প্যাকেট ভালো ফিল্টার-টিপড সিগারেট দাও তো ভাই।

দোকানে একটি বড় আয়না টাঙানো ছিলো। প্রায় ফুলসাইজ। ভালো করে চোখ তুলে চাইলো। দেখলো, ক্লান্তিমাখা ওর দিনান্তের মুখটি ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য, পাংশু হয়ে আছে। হতাশায় হিম হয়ে আছে।

সিগারেটের প্যাকেটটি হাত বাড়িয়ে নিতে নিতে অশোক ভাবলো, ও অভিনেতা নয়, কোনোদিনও ছিলো না। যারা ওর অভিনয়ের প্রশংসা করে বেড়াতো এতদিন, তারা অভিনয়ের কিছুই বোঝে না। আস্তে আস্তে হেঁটে, ভাবতে ভাবতে, ও পথটুকু পেরুলো।

অশোকের মনে হলো যেন সততার সুন্দর ঘর পার হয়ে এসে সততা ও অসততার দুই ঘরের মধ্যবর্তী চৌকাঠে পা দিয়ে ও দাঁড়িয়ে আছে। অজানিতে, এতদিন দাঁড়িয়ে থেকেছে। কিন্তু কতদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে, তা ও জানে না। অশোকের মতোই, জুলি এবং ওদের চারপাশের ওরা যাদের চেনে জানে, সকলেই বোধহয় অনুক্ষণ এই চৌকাঠে পা দিয়েই দাঁড়িয়ে আছে।

যে কোনো অসতর্ক মুহূর্তে ওদের মধ্যে যে-কেউ অসততার ঘরে পা ফেলতে পারে। এ কথা মনে হবার সঙ্গেই সঙ্গে ভয়ে অশোকের শরীর থরথর করে কেঁপে উঠলো।

www.BanglaBook.org

পহেলি পেয়ার

হাঁটা পথে মাইল তিনেক পড়ত। পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘণ্টার পথ। টাঙ্গায় গেলে, পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট।

মাঝে মাঝে যেতাম। পাশের বাড়ির ভোমরা-ভাবীর জন্যে সুর্মা কিনতে, কি আতর কিনতে। কখনো বা যেতাম বানারসী মঘাই পান খেতে।

সন্ধ্যেবেলা পুরো জায়গাটার চেহারাই পালটে যেত। গোঁফে আতর মেখে, ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি পরে সাদা ঘোড়ায়-টানা একলা এক্কা চালিয়ে কতশত নবাবেরা আসতেন। নানারকম নবাব। সবাই আসতেন।

দোতলা বাড়িগুলোর মহলে মহলে ঝাড়লণ্ঠন জ্বলত, জর্দার খুশবু, সারেঙ্গীর গজের গুমরানি, অশান্ত ঘোড়ার পা ঠোকার আওয়াজ এবং তার সঙ্গে মাঝে মাঝে বারান্দায় হঠাৎ দেখা-দেওয়া দু-একজন সুগন্ধি শরীরিণী। কেয়া ফুলের গন্ধ যাদের চুলে, জিনপরীর মায়া যাদের চোখে, পান খেয়ে ঢোক গিললে যাদের ফর্সা, স্বচ্ছ গলায় নীল উপশিরারা লাল হয়ে যায়, সেই সব কতশত নাম-জানা না-জানা সুন্দরীদের; গায়িকাদের।

এরা কেউ সকাল বেলায় গায় না। আশ্চর্য। সমস্ত মহল্লা ঘুমিয়ে থাকে সকালে। বাসি ফুলের স্মৃতি নিয়ে। ফরাসে ইতস্তত তাকিয়া ছড়ানো থাকে। ক্লান্ত সারেঙ্গী গা খুলে শুয়ে থাকে। জানলা দিয়ে কোন ভিমরুলে মাছি এসে তারে তারে নেচে বেড়ায়, অলস হাওয়ায়। পিড়িঙ পিড়িঙ করে একলা ঘরে সুর চমকায়। বাঈজীর পেলব গা ঘেঁষে শুয়ে-থাকা কাবুলি বেড়ালটি, হয়ত ঘুম ভেঙে এসে ম্যায়ফিলের ঘরে হাই তুলে বলে, 'মিয়াঁও মিয়াঁও, মুঝে কুছ তো পিয়াও।'

অথচ যেমনি পাঁচটা বাজে, পাথরে পাথরে রোদের উষ্ণতাটা থাকে শুধু, রোদের পরশ যখন মুছে যায়, পথে পথে টাঙাগুলো যখন মাতালের মতো টলতে টলতে ঝুমঝুমি বাজিয়ে

www.BanglaBook.org

চলে তখন চার দিকে একটা ব্যস্ততা পড়ে যায়।

বিকেল থাকতে থাকতে মুজাব্বর বাগানে ঢোকে ফুল তুলতে। আমাদের মছিন্দার বাড়িতে। মুজাব্বর আমাদের খিদমদগার রহমানের ভাইপো। আমি তখন কলেজে পড়ি। গরমের ছুটিতে মছিন্দাতে গেছি। ঠাকুমা আছেন শুধু! বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরে পূজা দেন, গঙ্গায় স্নান করেন এবং আমাকে ভালোটা মন্দটা রেঁধে খাওয়ান।

পড়াশুনা করতে চাই। নিজেকে বার বার শাসন করি; বকি, কিন্তু দুপুর থেকে যেই ঝুরঝুর করে গাছের পাতায় পাতায় হাওয়া দেয়, শুকনো পাতা ওড়ে, টিয়া পাখির ঝাঁক ট্যা ট্যা ট্যা করে তীক্ষ্ণ সুর ছড়িয়ে গঙ্গার দিক থেকে উড়ে আসে, মনটা উদাস উদাস লাগে! পথ বেয়ে মছিন্দার পথে ভাড়ার-টাঙা টুঙটুঙিয়ে চলে। পড়া হয় না।

বারান্দার চেয়ারে বসে মুজাব্বরের প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে থাকি।

রোজ মুজাব্বর ফুল তোলে। শুধু গোলাপ। লাল গোলাপ! কাঁটা মুড়িয়ে ডাঁটা ভাঙে। তারপর ঝুলি ভরে চলে যায় মীর্জাপুরে বাঈজীপাড়ায়। ঘরে ঘরে ফুল দেয় ও। ওকে রোজ দেখি আর হিংসা হয়। ঠাকুমা ঘরের ইজিচেয়ারে বসে গুনগুনিয়ে অতুলপ্রসাদের গান করেন 'আমার বাগানে এত ফুল...'। আমি মুজাব্বরের জগতের কথা ভাবি আর আর কৌতূহলে কাঁদি। মুজাব্বর আমার চেয়ে বয়সে সামান্যই বড় হবে, অথচ পৃথিবীর ও কত জানে, শোনে, কত বোঝে। সকালে ও যখন আমাকে পথ দেখিয়ে দূরে তিতির মারতে নিয়ে যায় তখন ওকে আমার কাছের মানুষ বলে মনে হয়। কিন্তু যেই বিকেল হয়ে আসে, হাসনুহানার গন্ধ হাওয়ার সঙ্গে মিশে বুকের মধ্যে মোচড় দিতে থাকে, অমনি ও যেন হঠাৎ অনেক দূরে চলে যায়। ও যেন মুহূর্তের মধ্যে অনেক বড় হয়ে যায়। আমার গুরুজন হয়ে ওঠে। ও যে জগতে প্রবেশ করে, সে জগতের চৌকাঠ মাড়ানোর কোনো উপায় নেই আমার। সেই মুহূর্তে প্রতিদিন মুজাব্বরকে আমার বড় হিংসে হয়।

একদিন ওকে বলেই ফেললাম। কিন্তু প্রথমে ও কিছুতেই রাজী হলো না। বললো, গুণ্ডা বদমাস আছে। মীর্জাপুর খতরনাগ জায়গা। এক-মানুষ লম্বা লাঠি নিয়ে লোকে পথে-ঘাটে চলাফেরা করে। তুমি কি করতে যাবে? তাছাড়া, ঠাকুমা জানলে কেলেঙ্কারী হবে। আমার চাকরি তো যাবেই, কাকার চাকরিটাও যাবে।

কিন্তু আমি ওর প্রায় পা ধরতে বাকি রাখলাম। শেষকালে আমায় নাছোড়বান্দা দেখে ও বললো, আচ্ছা চলো। কাল চলো।

মুজাব্বর যে সময়ে যায় তেমনি আগে চলে গেলো। ওর নির্দেশ মতো যথাসময়ে পানের দোকানটির সামনে এসে দাঁড়ালাম। দোকান-জোড়া আয়না। নানা লোকে পান কিনছে। মিঠি-মিঠি বলছে। লক্ষ্ণৌর লোকের মতো মীর্জাপুরের লোকদেরও বড় মিঠি জবান। আয়নায় নিজের মুখের ছায়া পড়তেই দেখলাম, চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পাবার আগে যেমন লাগে, তেমন লাগছে। কান গরম। এমন সময়ে মুজাব্বর এলো। এবং মনে হলো, ওই যেন প্রশ্নপত্র। ও আসতেই ভয়টা প্রায় উবে গেলো। রইল শুধু কৌতূহল।

এগোতে এগোতে মুজাব্বর বললো, টাকা এনেছ?

টাকা কিসের?

টাকা না তো, তারা কি তোমার সুরত দেখে গান শোনাবে?

এটা সত্যিই ভাবিনি। বললাম, সঙ্গে দশ টাকার একটা নোট আছে। ঠাকুমা জন্মদিনে

www.BanglaBook.org

দিয়েছিলেন।

ও হাসলো। বললো ঠিক আছে। দশ টাকায় শুধু মুখ দেখতে পাবে। গান শোনা হবে না।

খুবই মনক্ষুণ্ণ হলাম। তখন আর কিছু করার নেই।

যে সব লোক ও-পথে আসছিল, যাচ্ছিল, তারা আমায় দেখে অবাক হচ্ছিল। দু-একজন কি সব মন্তব্য-টন্তব্যও করলো। হেসে উঠলো। মুজাব্বর আমাকে নিয়ে একটি বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেলো। দোতলায় উঠে গেলো। চকমিলানো বাড়ি। ভিতরে চাতাল। তার চার পাশে দোতলা ঘোরানো বারান্দা। কোনো ঘরের দরজা বন্ধ, কোনো ঘরের দরজা খোলা। কয়েকটি ঘর থেকে সারেঙ্গীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, গান শোনা যাচ্ছে।

মুজাব্বর বললো, সব ঘরে ঢুকে কি করবে? সবাইকে দেখলে ভাল লাগবে না। যাকে দেখলে ভাল লাগবে তার ঘরেই নিয়ে যাব। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম। ও যে-যে ঘরে মেহেমান এসেছেন সে-সে ঘরে ফুল দিয়ে এল।

তারপর আমায় নিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে পাশের বাড়িতে পৌঁছে সটান দোতলায় উঠে একটি ঘরে ঢুকে পড়লো। ঘর মানে, ফ্ল্যাটের মতো। একটির বেশি ঘর আছে, মধ্যে একটুখানি প্যাসেজ। সেই প্যাসেজ পেরিয়ে গিয়েই একটি বিরাট ঘরে গিয়ে পৌঁছলাম। পৌঁছেই, থমকে দাঁড়ালাম।

ধবধবে ফরাশ পাতা। মোটা গদীর উপর। দেওয়ালে হেলানো-ভাবে টাঙানো আয়না। আয়নার নীচে সারি দেওয়া দুধ-সাদা তাকিয়া একটার পর একটা সাজানো। মাথার উপর থেকে ঝাড় লণ্ঠন ঝুলছে।

একটি ছিপছিপে মেয়ে আমাদের দিকে পিছন ফিরে জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়েছিল। ফুল-সাজানো বেণীটি পিঠ থেকে টান টান হয়ে ঝুলে ছিল নীচে। জানলা দিয়ে কিছু দেখছিল বোধ হয়। ঘাড় না ফিরিয়েই শুধোলো, কৌন?

—ম্যায় মুজাব্বর।

—মেহমান নেহী আঁয়ে হেঁ, তো ম্যায় ফুলোঁসে ক্যা কঁরু?

মুজাব্বর আবার সংকোচের সঙ্গে ডাকল, বাঈ!

এবার মেয়েটি ঘুরে দাঁড়াল। আমার মনে হলো ঝাড়লণ্ঠনের আলো ম্লান হয়ে এলো। তার দু-চোখ ঠিকরে এত আলো বেরুচ্ছিলো যে তাতে আমার চোখের সামনের সব কিছু ম্লান হয়ে গেলো। অবাক হলাম। আমি যেমন বিস্ময়-বিমুগ্ধ চোখে ওর দিকে চেয়ে ছিলাম, ও-ও তেমনি চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে।

ওর পক্ষে অবাক হওয়া স্বাভাবিক। আমার বাপ-ঠাকুর্দা কেউ কোনো দিন বাঈজী-বাড়ি যায়নি। তাদের সে পাপ অথবা পুণ্যের কোনো ছাপ হয়ত আমার চেহারায় ছিলো। তাছাড়া আমি তাজমহল দেখবার চোখ নিয়ে তার কাছে গেছিলাম, মুরগীর মাংস খাবার চোখ নিয়ে যাইনি! ও হয়ত এই নিপট-আনাড়ির চোখে এমন কিছু আবেদন দেখেছিল যার জন্যে ও অবাক হয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো।

এসে মুজাব্বরকে শুধোলো, এ কে রে?

মুজাব্বর অপরাধীর মতো বললো, আমার চাচার মনিবের ছেলে। গান ভালোবাসে খুব। তাই আপনার গান শুনতে এলো। বারণ করেছিলাম। কিছুতেই শুনল না। কিন্তু ওর টাকা নেই। মানে, মাত্র দশ টাকা আছে।

www.BanglaBook.org

মেয়েটি টুগুা প্রপাতের মতো ঝরঝরিয়ে হেসে উঠলো। শ্বেতা দাঁতে আর নখে হীরের আলো চমকাল। বেণী থেকে একটি বেলফুল খসে পড়লো হাসির দমকে।

হাসতে হাসতে বললো, আয়া মেরী মেহমান।

তারপর কৌতুকের চোখে শুধোলো, কিতনা উমর হোগী আপ কি?

বললাম, কুড়ি বছর। ও বলল, ম্যায় ভি বিশ সালকি। মগর, কিতনা ফারাক।

তারপর মেয়েটি হঠাৎ আত্মীয়তার সুরে বললো, আইয়ে আইয়ে, তসরিফ রাখিয়ে, আপকি পুরী তারিফ তো মুঝে বাৎলাইয়ে?

বেশ কেটে কেটে আমার নাম বললাম। সত্যি নাম গোপন করলাম না। আমার বেশ রাগ হচ্ছিল। ও ভেবেছে কি? দেখতে না হয় সুন্দরীই, গানও না হয় ভালোই গায়, রাজা-রাজড়া লোক না হয় ওর পায়ের কাছে মাথা কোটেই, তা বলে আমাকে অমন নস্যাৎ করার কি আছে জানি না।

আমি বললাম, গান শোনার মতো আমার টাকা নেই। শুধু দেখতে এসেছি। এবার মেয়েটি হাসতে হাসতে, কাঁপতে কাঁপতে একটি বেলজিয়ান দেওয়াল-আয়নার মতো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে ফরাশের উপর ছড়িয়ে পড়ল।

বসে কুর্নিশ করে বললো, আদাব! আদাব! বড়ী মেহেরবানি আপকি।

বসবার জন্যে জোর করাতে বসলাম, সংকোচের সঙ্গে ফরাশের উপর।

মুজাব্বর দাঁড়িয়ে রইলো।

মেয়েটি তেমনি অবাক চোখে আবার শুধোলো, আপ খুদ গানা গাতেঁ হেঁ?

বললাম, থোড়া বহত।

বড়ী খুশীকি বাত।

ম্যায় গানা শুনাউঙ্গী আপকো, জরুর শুনাউঙ্গী, মগর আপকোভি গানা শুনানা পড়েগা।

চমকে উঠলাম, বললাম, আমি বাথরুমে গাই নইলে, একা একা গাই। ম্যায়ফিলে গাইবার উপযুক্ত গান জানি না।

সে নাছোড়বান্দা।

বললো, এই ঘরও আপনার বাথরুম মনে করে নিন না কেন?

মহা মুশকিলে পড়লাম। গান শুনতে এসে মহা ফ্যাসাদে ফাঁসলাম।

বাঈজী চাকরকে ডেকে পান আনতে বললো, এবং অন্য চাকরকে বললো, দরজা বন্ধ করতে। মুজাব্বর বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়াচ্ছিল, অবাক ও-ও কম হয়নি। হঠাৎ আমার কি মনে হলো, মুজাব্বরকে বললাম, তোমার থলিতে আজ কত গোলাপ আছে? ও বলল, তা না হলেও দশ টাকার হবে।

বললাম, তোমার সব গোলাপ আজ আমি কিনে নিলাম। ও অবাক হয়ে গোলাপের থলি উপুড় করে ফরাশে ঢেলে দিল এবং বাঈজী নির্বাকে আমার দিকে চেয়ে রইলো।

বাঈজী হাততালি দিলো এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন মন্ত্রবলে সারেঙ্গীওয়ালা হারমোনিয়মওয়ালা এবং তবলচি এসে উদয় হলো। বাঈজী আমার আরো কাছে সরে বসলো। অত কাছে থেকে ও বয়সে মা-ঠাকুমা-দিদি ছাড়া আর কোনো মেয়েকে দেখিনি। আজও আমার চোখে সে সৌন্দর্যের সংজ্ঞা হয়ে আছে। সরু কোমর, কবুতরী বুক, এবং বুদ্ধিদীপ্ত চঞ্চল চাউনির মুখ।

অনেক সুন্দরী আজ অবধি দেখলাম কিন্তু অমনটি আর দেখলাম না।

www.BanglaBook.org

সারেঙ্গীওয়ালার গজের টানে টানে কত কি অব্যক্ত বেদনা, কথা, গান সব বাজতে লাগলো। ঠুংরির ঠাট কাঠঠোকরার মতো স্মৃতি ঠোকরাতে লাগলো। ও পিছনের আয়নায় একবার নিজের চেহারার দিকে বিমুগ্ধ নয়নে চাইলো। তারপর শরৎ-সকালের মতো চোখ মেলে আমার চোখে চাইলো। আমার মনে হলো এ চাহনি জাদুর খেপলা-জাল ছোঁড়া চাহনি নয়। ও যেন নিজে বাঁধা পড়ে গেছে! হয়ত আমার অভাবনীয় সারল্যে, আমার সাবলীল স্পর্ধায় ও নিজেকে পুষ্পিত করে নিয়েছে। সেই মুহূর্তে ওর নকল আমিকে ছাপিয়ে ওর আসল-আমি ওর উপরে আধিপত্য বিস্তার করে ফেলেছে। আঁট-করে চুল বাঁধা নার্সারী ক্লাসের ছটফটে মেয়ে তার ক্লাসের সহপাঠীর দিকে যেমন স্বর্গীয় চোখে চায়, সেই সুগন্ধি সন্ধ্যায় জহর বাঈ আমার দিকে তেমনি চোখে চেয়ে রইলো।

আমাকে প্রায় ধমকে বললো, অব শুরু কিজীয়ে।

আমি আগে না!

না আপনি আগে। আবদার করে মাথা নাড়লো।

বুড়ো সারেঙ্গীওয়ালা বললো, অব শুরু কিজীয়ে।

কী গান গাইব ভেবে পেলাম না। হঠাৎ মনে এলো মীর্জা গালিবের চারটি লাইন—তাতে সুর বসিয়ে গেয়ে দিলাম—

"বুঢ়া না মান্ গালিব
যো দুনিয়া বুঢ়া কহে,
অ্যায়সাভি কোঈ হ্যায়
কে সবহি ভালা কহে যিসে।"

কেন জানি না, ওর চোখে চেয়ে আমার মনে হয়েছিলো সমস্ত পৃথিবী ওকে খারাপ আখ্যা দিয়ে ওর এই কুড়ি বছরের মনটাকে একেবারে দুখিয়ে রেখেছে। ও যে ভালো না, ওর যে কিছুই ভালো নেই, মনে হল সে বিষয়ে ও নিঃসন্দেহ হয়ে গেছে। তাই মনে হল গালিবের কথায় ওকে বলি যে, এখনো সব ফুরোয়নি, আশা আছে, এখনো ভালো লাগা আছে, এত বড় পৃথিবীতে এখনো ভালো লাগার ভালোবাসার অনেক কিছু আছে। শরীরের স্বর্গ পেরিয়েও আরো অনেক মহত্তর স্বর্গ আছে। কাজেই অমন কান্না কান্না চোখে চাইবার কিছুই হয়নি।

কি হল জানি না, কি করলাম জানি না কেমন গান গাইলাম জানি না। কিন্তু জহরের কানে সে গান কি কথা বয়ে নিয়ে গেল তা ওই জানে!

গান শেষ হলে ও কোনো কথা বলল না, কেবল মুখ নিচু করে নীরবে আমাকে বার বার আদাব জানাল। দু চোখ বেয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরতে লাগল।

ঠিক এই রকম হবে তা ভাবিনি। আমি গান শুনে ভালো লাগায় কাঁদতে এসেছিলাম। গান শুনিয়ে কাউকে ব্যথায় কাঁদাতে চাইনি।

জহর ওর নরম হাতে আমার হাত ধরল। চোখের দিকে চেয়ে দেখলাম, সেই সব গর্ব-কৌতুক-মজাক কিছুই আর নেই চোখে। জল-ভরা চোখে অন্য কি যেন আছে। যার নাম জানি না।

ফিসফিসে গলায় জহর বলল, ভাইসাব আপকি তহ্‌জিব, আপকি একলাক, ঔর আপকি তমদ্দুন কী ঈজ্জত কিয়া যায় অ্যায়সি কুছভি হামারা পাস হ্যায় নেহি। ম্যায় মাফি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাগুতী হুঁ।...

এইটুকু বলেই ও ঘর ছেড়ে সোজা উঠে ভিতরের ঘরে গিয়ে দুয়ার বন্ধ করলো।

আমি বোকার মতো বসে থাকলাম। বসে বসে ভাবতে লাগলাম।

ও যা বললো, সে কথাগুলো আমার কানে টুণ্ডি পাখির শীষের মতো বাজছিল। ভাই সাহেব, তোমার সংস্কৃতি, তোমার উদারতা, তোমার ব্যবহারের ইজ্জত দেব এমন কিছু আমার নেই। আমায় তুমি ক্ষমা করো।

আর এলোই না ঘর থেকে জহর বাঈ।

অনেকক্ষণ বসে থেকে চলে এলাম মুজাব্বরকে নিয়ে।

ভালো মন্দ জানি না। জানি, জহর মানে বিষ। আমার বিশ বছর। জহরের বিষ বছর। আগেকার দিনের সুন্দরী রাজকুমারীদের মতো আংটির বিষ চুষে মরে যায় না কেন জহর? কি দরকার এমন করে কাঁদার? এক শরীরের জ্বালা কি অন্য শরীরের জ্বালা দিয়েই নিবৃত্ত করতে হয়? এর কি কোনো অন্য পথ নেই?

জানি না। আর কতটুকুই বা জানি। মুজাব্বরকে রোজ জিগগেস করি। জহরকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে। একবার ওর কাছে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু মুজাব্বর বলেছে, জহর গুণ্ডাদের বলে রেখেছে, আর কোনোদিন আমাকে ও পাড়ায় নিয়ে গেলে মুজাব্বরকে জানে খতম্ করে দেবে। জানি না কেন? ওর কথা মনে হলেই মনটা মুচড়ে মুচড়ে ওঠে।

বিরহী নদীতে বিকেলে জেলেরা মাছ ধরে। মাছ কিনতে গেছি। সেদিন মাছ পাওয়া যায়নি। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। পা চালিয়ে মছিন্দার দিকে ফিরছি। জায়গাটা ভালো নয়। উল্টোদিক থেকে একটি ফিটন গাড়ি আসছে। একটি কুচকুচে কালো ঘোড়ায়-টানা। মাথায় বাক্স-তোরঙ্গ বাঁধা। কোচোয়ানের পাশে একটি গুণ্ডা মত লোক বসে, মাথায় পাগড়ি।

আমার পাশ দিয়ে যাবার সময়ে হঠাৎ একটা পুরুষ কণ্ঠ বলল, বাবুজী!

থমকে দাঁড়ালাম।

কোচোয়ানের পাশের লোকটিকে চেনা চেনা লাগল। চিনতে পারলাম। এ সেই সারেঙ্গীওয়ালা।

ফিটনের দরজা খুলে হেসে একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, মীর্জা গালিব, কাঁহা চলতে হেঁ?

দেখি জহর। হাসছে। আজকে ও সাজেনি একটুও। সাধারণ শাড়ি। সুন্দর টিকোলো নাকে হীরের নাকছাবি। ফিনফিনে ফিঙের মতো রেশমী চুল। বিকেলের বিষণ্ণ হাওয়ায় অলক উড়ছে।

শুধোলাম, কোথায় যাচ্ছ?

জহরের মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, ও যেন এই মুহূর্তে আমাকেই ভীষণভাবে খুঁজছিলো।

হেসে বলল, কোথায় আর যাব? এক জাহান্নম থেকে অন্য জাহান্নমে।

ওকে দেখে, এবং ওর বলার ভঙ্গী দেখে আমার ভীষণ কষ্ট হলো। হঠাৎ বলে ফেললাম, তোমাকে আমি যদি যেতে না দিই? যদি আমাদের বাড়ি নিয়ে যাই?

ও ভীষণ চমকে উঠে আমার ঠোঁটে ডান হাতের তর্জনী ছুঁইয়ে বললো, চুপ বিলকুল,

www.BanglaBook.org

চুপ, অ্যায়সা বাত কভি না কহনা, কভি না শোচনা।

কিছুক্ষণ চুপ করে ফিটনের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর বললাম, তুমি তো চলে যাবেই, চলো না একটু বিরহীর ধারে বসবে?

পরমুহূর্তে মনে পড়লো এ জায়গা ভালো নয়। বললাম, না না, এ জায়গা খারাপ।

ও নামতে নামতে হাসল, বললো, আমি যেখানে থাকি তার চেয়েও?

আমরা দুজনে গিয়ে বিরহীর পাশের আমলকি তলায় বসলাম। গঙ্গা থেকে তোড়ে জল ঢুকছে বিরহীতে। একটি একলা মাছরাঙা শেষ বিকেলে মেহেন্দী রঙা জলে ছোঁ মেরে মেরে বেড়াচ্ছে।

বললাম, তোমার গান শুনতে গেলাম, সেদিন গান শোনালে না তো!

আমার গান শুনে আর কি করবে? ও তো সকলকেই শোনাই। যে পয়সা দেয়, তাকেই শোনাই। তাছাড়া, শুধু গলাই কি গান গায়?

আর যে ফুল দেয়? শুধু লাল ফুল?

ও বিষণ্ণ হাসলো, বললো, তাকে কি দেব?

বললাম, তোমাকে গান শোনালাম, ফুল দিলাম, তুমি আমাকে কিছুই দিলে না।

ও মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে ফিরে বললো, কিছুই দিইনি? ঠিক জানো?

আমি মাথা নাড়লাম।

গঙ্গার দিক থেকে এক ঝাঁক রেড-হেডেড পোচার্ড অস্তগামী সূর্যকে পিছনে ফেলে ডানা শনশনিয়ে দূরের বিলের দিকে উড়ে গেলো। আমরা চুপ করে অনেকক্ষণ পাশাপাশি বসে রইলাম। দেখতে দেখতে বিরহীর জলের মেহেন্দীতে সন্ধ্যের জাম-রঙা বেগুনি ছায়া পড়লো।

জহর উঠল, বললো, চলি।

ধীরে ধীরে গাড়ি অবধি গেলাম দুজনে। দরজা খুলে দিলাম, ফিটনে উঠে বসলো ও।

—আবার কবে দেখা হবে?

—জানি না, কোনোদিন আর নাও হতে পারে।

—আমাকে কিছু দিয়ে যাও জহর, যাতে তোমাকে মনে রাখি।

কোচোয়ান জিভ আর তালু দিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ করে ঘোড়াকে এগোতে বললো, পা দিয়ে ঘণ্টা বাজালো। জহরের বিদায়ের ঘণ্টা। চাকা গড়াতে লাগলো।

আমি সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম, আবার বললাম, কিছুই দিয়ে গেলে না জহর? আমাকে তুমি কিছুই দিলে না।

জহর এবার হাতের ইশারায় কাছে আসতে বললো। ওর আরো কাছে সরে গেলাম, ওর খোলা চুলে চন্দনের গন্ধ পেলাম, ও আমার কানে কানে বললো, তুমি এখনো ছোট আছ। যা তোমাকে দিয়েছি, তার দাম আরো বড় হলে বুঝতে পারবে।

তবু অধৈর্য হয়ে বললাম, বলো না তা কি জহর? বলো না?

জহর, কান্নার মতো হাসল।

তারপর দরজায়-রাখা আমার হাতের উপর ওর হাতটা ছুঁইয়ে বললো, পহেলি পেয়ার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নবীন মুহুরী

সামনে খেরোর খাতাটা খোলা ছিলো। খতিয়ান। জাবদা থেকে পোস্টিং দেখছিলেন নবীন মুহুরী। রেওয়া মিলছে না।

বেলা যায় যায়। পাটগুদামের পাশের প্রেসিং-মেশিনে পাটের বেল বাঁধাই হচ্ছিলো। তার একটানা আওয়াজ ভেসে আসছিলো। বয়েল গাড়ির ছেড়ে-দেওয়া বলদেরা পট-পট করে ঘাস ছিঁড়ে খাচ্ছিলো। মাঝে মাঝে ওরা জানালার পাশে-বসা নবীন মুহুরীর দিকে বড় বড় কান পত-পত করে নেড়ে, চোখ তুলে তাকাচ্ছিলো।

গরুগুলোর চোখের দিকে, কাছ থেকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নবীন মুহুরী হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। তাঁর দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী শৈলবালার গরুর মতো চোখ। গরুর মতো বড় বড় বোকা বোকা বিষণ্ণ চোখ। গায়েও একটা গরু-গরু গন্ধ।

শৈলবালার সন্তানাদি নেই। শৈলবালা বন্ধ্যা।

অন্যমনস্কতার মধ্যে নবীন মুহুরী খাতা ছেড়ে উঠলেন, চটিটা পায়ে গলালেন, তারপর নস্যির কৌটোটা হাতে নিয়ে গদীঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক টিপ নস্যি, আবেশে নাসারন্ধ্রে ভরতে ভরতে উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকালেন। আকাশ, এ সময়ে পরিষ্কারই থাকে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে, হিমালয়ের বরফাবৃত অবয়ব দেখা যায়।

দূরের অফিস ঘরে নতুন ছোকরা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট মাথা নিচু করে কাজ করছে। কলকাতা থেকে চালান এসেছে হরিপদ দাস। হরিপদ আসা ইস্তক নবীন মুহুরীর কদর যেন রাতারাতি কমে গেছে। হঠাৎই যেন নগেন সাহার কাছে এতদিনের মুহুরীর সমস্ত দাম ফুরিয়ে গেছে। নগেন সাহা এখন বড়লোক। নগেন সাহা ভুলে গেছে, যখন সে সাইকেলের পিছনে "মেস্তা" ও "তোষা" পাটের নমুনা নিয়ে মহাজনদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াত, সে সব দিনগুলোর কথা। অকৃতজ্ঞ, বেইমান নগেন সা। আজ চল্লিশ বছর চাকরির পর তাঁর মাইনে বেড়ে হয়েছে একশ সাতানব্বুই টাকা। তাতেই কথা কত! তাতেই কথার তোড়ে বিস্তর বান।

www.BanglaBook.org

"বুড়ো-হাবড়া দিয়ে চলবে না। আমার ফি-মাসে রেওয়া-মিল চাই," ইত্যাদি ইত্যাদি।

কত বাঘা-বাঘা মুহুরীকে এই নবীন মুহুরী একসময় ঘোল খাইয়েছে। একটিপ নস্যি নাকে গুঁজে, কলমটা দোয়াতে একবার চুবিয়ে নিয়ে খাতা খুলে বসেই নবীন মুহুরীর মাথায় যাত্রার অর্কেস্ট্রা বেজে উঠেছে। যত কঠিন সমস্যাই হোক না কেন, এক নিমেষে তার সমাধান হয়ে গেছে।

তাই আজ এই বুড়ো বয়সে এই ছোকরার হাতে হেনস্থা আর সহ্য হয় না।

দূর থেকে হরিপদ অ্যাকাউন্ট্যান্টের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নবীন মুহুরীর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো। হরিপদর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

হরিপদ ছোকরা ওস্তাদ আছে। গিয়ে পৌঁছতেই সকলের সামনে ঝাঁঝাল গলায় বললো, কি হলো? মুহুরী মশাই? এ মাসের ট্রায়াল-ব্যালান্স, মানে আপনাদের রেওয়া, মিললো?

নবীন, উত্তরে কিছু না বলে দুর্বোধ্য বোবা চাউনিতে হরিপদর দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, মিলবে, সবই মিলবে। এতদিন, এতবছর এত রেওয়া মিলিয়ে এলাম, আর আজ হঠাৎ না-মেলার তো কোন কারণ দেখছি না। সময় হলেই মিলবে। এখনো সময় হয়নি।

তারপর একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে নবীন বললেন, আচ্ছা দাসবাবু, "নাজাই" মানে কী বলুন তো?

হরিপদ কলম থামিয়ে চশমাটা খুলে বললো, নাজাই?

আজ্ঞে হ্যাঁ, নাজাই। দাঁতে, ঠোঁট কামড়ে বললেন নবীন মুহুরী।

হরিপদ বললো, আমি বড় ফার্মে আর্টিকেলড ছিলাম। আপনাদের এই সব বাংলা খাতার টার্মস আমি জানব কোত্থেকে? বাঙালিদের ব্যবসা তো দু'পয়সার ব্যবসা।

নবীন একটু হাসলেন। কারবারীদের মধ্যেও অনেকে নড়ে-চড়ে বসলো। কেউ বা কান খাড়া করে ওঁদের কথাবার্তা শুনতে লাগলো।

হরিপদ চুপ করে থাকাতে, নবীন মুহুরী বললেন, তাহলে জানেন না বলছেন?

এ আবার জানার কি আছে? আপনি সময় নষ্ট না করে আপনার বাংলা খাতার ট্রায়ালটা মিলিয়ে ফেলুন গিয়ে। সোমবারে ধুবড়ি থেকে অডিটরেরা আসবে।

আচ্ছা। যাই। বলে, নবীন মুহুরী হরিপদের দিকে একটি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হেনে আবার টায়ার সোলের চটি ফট-ফটিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে খোলা জাবদার সামনে বসে পড়লেন।

নিকেলের সরু ফ্রেমের চশমাটা তীক্ষ্ণ নাকের সামনের দিকে অনেকটা নেমে এলো। নাকের পাটা দুটো ফুলে উঠলো। নবীন মুহুরী দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, শালার চাটার অ্যাকাউন্ট।

ওদিকে নবীন চলে যেতেই, ও-ঘরে কারবারীদের মধ্যে ফিস-ফাস শুরু হলো। কেউ কেউ নিচু গলায় বললো, বাবা, নবীনবাবু কি আজকের মুহুরী? ওর সঙ্গে আজকালকার বাবুরা পারবেন?

হরিপদ, যোগা সাহাকে শুধোলো, জানেন নাকি সা মশায়? নাজাই মানে?

নাজাই মানে জানব না কেন? নাজাই মানে অনাদায়ী টাকা, যা আর ফেরৎ পাওয়া যাবে না, যা খরচার খাতায় লিখে দিতে হয়।

হরিপদ বললো, ও ব্যাড ডেট?

—তাই হবে। আপনাদের ব্যাড ডেট, আমাদের নাজাই।

হোপলেস। এ জন্যেই বাঙালিদের ব্যবসা হয় না। কতগুলো অথর্ব পার্ট-টাইম মুহুরী রেখেছে বরাবর, যারা নিজেদের হাতের লেখার কায়দা আর এই সব টার্মিনোলজি নিয়ে

www.BanglaBook.org

অ্যাকাউন্টস ব্যাপারটাকে একেবারে পার্সোনাল নলেজের ইডিয়টিক লেভেলে রেখে দিয়েছে এতদিন। নতুন কিছু জানার ইচ্ছা নেই, শেখার ইচ্ছা নেই। নতুন কিছু কেউ করতে গেলেই বড় বড় পা নিয়ে তার পথ জুড়ে কী করে দাঁড়াতে হয় তাই শিখেছে শুধু।

সত্যিই হোপলেস এরা।

যোগা সা বললো, তা যাই বলুন, নবীনদা আমাদের মুহুরী ভাল। কত বড় বড় খতিয়ান আর জাবদা তিনি চোখের নিমেষে যোগ করে দিয়েছেন। কত বড় বড় গুণ এবং ভাগ। খাতায় হাত ছোঁওয়াতেন না। মুখে আওয়াজ করতেন না। চশমার ফাঁক দিয়ে একবার দেখতেন শুধু আর সঙ্গে সঙ্গে যোগফল লিখে ফেলতেন নীচে। তখন কত কাজ ছিল, সব তো একা হাতে সামলেছেন। আমি জানি, নগেন সার নতুন খাতায় দশ রিম করে কাগজ লাগত। গঙ্গাধর নদী বেয়ে পাকিস্তান থেকে তখন পাট আসত। তখন কি রবরবা! নতুন খাতায় শালুর মলাট লাগত। "শ্রীশ্রীশ্রী গণেশায় নমঃ" লিখে পয়লা বৈশাখ গদীঘরে নবীন যখন খাতার সামনে জোড়াসনে বসে চশমা-নাকে কলম হাতে হালখাতা করতেন তখন দেখার মতো জিনিস ছিলো। আপনারা হয়তো অনেক লেখাপড়া করেছেন হরিপদবাবু কিন্তু তা বলে নবীন মুহুরীকে এমন হেলাফেলা করবেন না।

আমাকে বাবু বলবেন না। সাহেব বলবেন।

কেন? আপনার বাবা ফেলু দাস আমাদের হাটে বরাবর কাটা-কাপড় বেচতে আসতেন। তখনো তিনি লোহার কারবারে বড়লোক হননি। তখন তাঁকে তো আমরা বাবুই বলতাম।

তা হোক। তিনি বাবু হলেও আমাকে বাবু বলবেন না। দাস সাহেব বলবেন?

দাস সাহেব আবার কি? তার চেয়ে হরিপদ সাহেব ভাল শোনায়। হরিপদ সাহেব বলব?

বেশ! তাই বলবেন।

গুড়ের হাঁড়িতে-পড়া কালো নেংটি ইঁদুরের মতো চেহারা। সোনার ফ্রেমের চশমা-পরা। গোলাপী টেরিলিনের শার্ট গায়ে। পচা গরমেও তাই পরে-থাকা হরিপদ দাস একবার নিষ্ঠুর হাসলো। ওর চোখে মুখে একটা নিষ্ঠুর ভাব ছড়িয়ে গেলো। তারপর, গলা খাঁকড়ে নিয়ে বললো, আপনি জানেন না সা মশায়, আপনাদের নবীন মুহুরীদের এখন সাড়ে সাতশ টাকায় কিনতে পাওয়া যায়। মাত্র সাড়ে সাতশ টাকা।

যোগেন সা বললো, হরিপদ সাহেব, কী যে বলেন বুঝি না।

বুঝিয়ে দিচ্ছি। বলে, হরিপদ চেয়ার ছেড়ে উঠে তার পাশের আলমারিটা খুলে একটা সবুজ বাক্সর মতো জিনিস বের করলো। তারপর বাক্সটা তার টেবিলের উপর রাখলো। বললো, বুঝলেন সা মশাই, এটা আজ সকালেই এসেছে। হাতে যোগ করার কোনোই দরকার নেই। এ মেশিন জার্মানীতে তৈরি। বলুন দেখি, মুখে মুখেই বলুন, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার হিসেব, আমি টক্কা-টরে, টরে-টক্কা করে আপনাকে যোগফল বলে দিচ্ছি। এর নাম "অ্যাডিং মেশিন"। আজকের দিনে সামনের খেরোখাতা খুলে লম্বা লম্বা যোগ করার মধ্যে কোনো বাহাদুরী নেই। খালি অ্যাডিং মেসিন কেন? আরো কতরকম মেসিন বেরিয়েছে আজকাল।

যোগেন সা হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল হরিপদর কথা শুনে।

বললো, আপনারা কি নবীনদাকে ছাড়িয়ে দেবেন না কি?

হরিপদ হাসলো, বললো, না, না, ছাড়িয়ে দেওয়া হবে কেন? এতদিনের লোক। ওঁকে রেখে দেওয়া হবে পুরনো, অব্যবহৃত আসবাবেরই মতো। ওঁরা অ্যান্টিক হয়ে গেছেন। অ্যান্টিক। তবে ওঁকে বলে দেবেন যে, আমার সঙ্গে যেন না লাগতে আসেন। আমি জানি,

www.BanglaBook.org

আপনার যাওয়া-আসা, মেলামেশা আছে ওঁর সঙ্গে।

॥ ২ ॥

যোগা সা কথাটা জানাতে বিন্দুমাত্র দেরী করেনি নবীন মুহুরীকে।

নবীন মুহুরী কুঁজো হয়ে খাতার সামনে বসেছিলেন। কথাটা শুনে সোজা হয়ে বসলেন।

বললেন, বলো কি যোগেন? এই কথা বলেছে, বলেছে আমার চটি-ধুতি-চশমা আমার ফতুয়া আমার এত বছরের সমস্ত অভিজ্ঞতার যোগফল সুদ্ধু আমার দাম সাড়ে সাতশ টাকা? যন্ত্রটা তুমি নিজের চোখে দেখেছ? সত্যিই কি কোটি কোটি টাকার যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ সব আজকাল চাবি টিপে হয়ে যাচ্ছে? এও কি সম্ভব?

যোগেন বললো, আপনি আর ও ছোকরার পিছনে ফুট কাটবেন না নবীনদা। যন্ত্রটা আজব বটে। এতটুকু একটা বাক্স। আপনার মতো হাজারটা মাথার অঙ্ক কষে ফেলেছে এক নিমিষে। ওকে সমীহ্ করবেন একটু। হরিপদ সাহেবকে।

নবীন মুহুরীর গলায় হঠাৎ রাগের ভাব এলো।

বললেন, কেন? আমার চাকরি খাবে?

না, না চাকরি খাবে না। এত দিনের লোক, সে বলেছে আপনাকে রেখে দেওয়া হবে। ছাড়ানো হবে না। আপনার চ্যাটাং-চ্যাটাং কথা একটু কম বলবেন। আপনার জন্যে সত্যি আমার ভয় করছে নবীনদা।

নবীন মুহুরী এক দুর্জ্ঞেয় হাসি হাসলেন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে, চাদরটা কাঁধে ফেলে, ছাতাটা হাতে নিয়ে বললেন, চল, বাড়ির দিকে যাবে তো?

যোগেন সা বললো, না নবীনদা, আমি একটু হাটে যাব। চলুন হাট অবধি একসঙ্গে যাই।

নবীন মুহুরী ছাতাটা বগলে নিয়ে, চাদরটা কাঁধে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, চলো।

সন্ধে হতে দেরী নেই। হাট প্রায় ভাঙ্গো-ভাঙ্গো। খড়ের গন্ধ, গোবরের গন্ধ, পাঁঠা-মুরগীর গায়ের গন্ধ, বাহেদের ঘামের গন্ধ আর ধুলো আর কড়া দিশী বিড়ির উগ্র গন্ধে হাটের হাওয়া ভারী হয়ে আছে। এখন হাটের গুঞ্জরণ প্রায় ক্ষীণ হয়ে এসেছে। পথের পাশে ঘুঘু ডাকছে। বেতবনে বিদায়ী রোদ্দুর তার গায়ে লেগেছে কুঁচফলের মতো। কৃষ্ণচূড়ার নীচে একদল চড়াই ঝাঁপাঝাঁপি করছে।

মুখ নীচু করে নবীন মুহুরী হেঁটে চলেছেন একা একা।

সামনের বাঁকটা ঘুরেই পাঠশালাটা চোখে পড়লো নবীনের।

মাটির বারান্দাটা ধসে গেছে। এখন পাঠশালায় কেউ পড়ে না। গঞ্জের ওদিকে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল হয়েছে। মাটির বারান্দায় একটা লাল কুকুর পা দিয়ে মাটি খুঁড়ে একটা গর্ত বানাচ্ছে। রাতে শোবে বলে।

কুকুরটিকে দেখেই নবীনের মাথায় রক্ত চড়ে গেলো। দৌড়ে গিয়ে ছাতার বাঁটের এক ঘা কষালেন কুকুরটার মাথায়।

কুকুরটা কেঁউ-কেঁউ-কেঁউ-উ উ করে লেজ গুটিয়ে পালালো। নবীন, পাঠশালার বারান্দায় একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন একটু। খুঁটিগুলো নড়বড়ে হয়ে গেছে, উই লেগেছে। জানালাগুলো খোলা। হা-হা করছে। ঘরের মধ্যে টিনের চালের নিচে চামচিকেরা বাসা বেঁধেছে।

নবীন অনেকক্ষণ একা একা পাঠশালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলেন। নবীন যেন শুনতে

www.BanglaBook.org

পেলেন, পণ্ডিতমশায় নামতা শেখাচ্ছেন এক উনিশ উনিশ, দুই উনিশ আটত্রিশ, তিন উনিশ সাতান্ন, চার উনিশ ছিয়াত্তর।

পাঠশালার ঘর যেন গমগম করছে পোড়োদের সম্মিলিত গলার আওয়াজে।

এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অনেক পুরোনো কথা মনে পড়ে গেলো নবীন মুহুরীর। যেদিন যোগ করতে শিখেছিলেন, যেদিন প্রথম ধারাপাত মুখস্থ করেছিলেন, যেদিন পড়েছিলেন শুভঙ্করের আর্যা, সে সব দিনের কথা।

ভাবতে ভাবতে নবীন মুহুরী কেমন আনমনা হয়ে পড়লেন।

হুঁশ হলো যখন একটা শেয়াল পাঠশালার পাশ দিয়ে দৌড়ে গেল নদীর দিকে।

বারান্দা থেকে নেমে আবার বাড়িমুখো হাঁটতে লাগলেন। চতুর্দশীর চাঁদ উঠে গেছে। ঝিঁঝি ডাকছিল পাতায় পাতায়। আমবাগানে জোনাকির ঝাঁক প্রথম জ্যোৎস্নায় জ্বলছে-নিবছে। হাঁটতে হাঁটতে নবীন মুহুরীর মনে পড়লো, হরিপদ দাস বলেছে, তাঁকে রেখে দেওয়া হবে। তিনি পুরনো লোক। পুরনো হাতল-ভাঙা চেয়ারের মতো, চাবি হারিয়ে যাওয়া পুরোনো সিন্দুকের মতো, তাঁর সব প্রয়োজনীয়তাই ফুরিয়ে গেছে, তবু তাকে দয়াপরবশে রেখে দেওয়া হবে।

নিজের মনে একবার হাসলেন নবীন।

বাড়ি পৌঁছতেই শৈলবালা বললেন, শরীর খারাপ?

নবীন বললেন, না।

॥ ৩ ॥

সে রাতে নবীন মুহুরী একেবারেই ঘুমোতে পারলেন না। সারা রাত মাথার মধ্যে সেই অদেখা সবুজ মেসিনের টক্কা-টরে টরে-টক্কা শব্দ শুনতে লাগলেন। সেই অদেখা ছোট সবুজ যন্ত্রটা নবীন মুহুরীর সমস্ত জীবনের গর্ব একেবারে ধূলিসাৎ করে দিলো।

খাটের উপরে জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছিলো। শৈলবালা নবীনের পাশে শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। শৈল বন্ধ্যা। তার মুখে চাপা কষ্ট। শৈলর মুখের উপর চাঁদের আলো এসে পড়েছে। বাইরের মাঠে বনতুলসী ঝোপের কাছে রাতচরা পাখিটা চিরিপ চিরিপ চিরিপ করে জ্যোৎস্নায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

শৈলবালার ঘুমন্ত মুখের দিকে কাছ থেকে চাইলেন নবীন মুহুরী। হঠাৎ তার মনে হলো, এতদিন যেন তিনি ছোটবউয়ের বুকের কষ্টটা কখনো বুঝতে পারেননি, আজ এই নির্জন নিঝুম রাতে ছোট বউয়ের কষ্টটা এসে এই প্রথম নবীন মুহুরীর বুকে বাসা বাঁধল।

নিজের মধ্যে নিজে নিঃশেষে ফুরিয়ে গেলে কেমন লাগে, জানলেন।

নবীন মুহুরী অনেকক্ষণ খাটের উপর জোড়াসনে বসে বাইরের জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাতে চেয়ে রইলেন। বসে বসে ঝিঁঝিদের ঝিঁঝির-ঝিঁঝির একটানা সুর শুনতে লাগলেন। নবীন মুহুরীর মনে হলো, রাতের ঝিঁঝিরা যেন পৃথিবীতে এই শেষবারের মতো শুভঙ্করের আর্যা মুখস্থ বলছে। শেষবারের মতো তাঁকে ছোটবেলার সব নামতা শোনাচ্ছে।

ধীরে ধীরে খাট থেকে নেমে, জানালায় এসে দাঁড়ালেন। এই জানালাতে দাঁড়িয়ে অন্ধকার রাতেও হিমালয়ের সাদা উত্তুঙ্গ মাথাগুলো দেখা যায়। আশ্চর্য! আজ এই জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাতে নবীন মুহুরী ভালো করে তাকিয়েও কিছুতেই হিমালয়কে দেখতে পেলেন না।

নবীন ভাবলেন, হিমালয় খুব বুড়ো হয়ে গেছে বলে বোধহয় কোনো হরিপদ দাস তাঁকেও নাজাই খাতে লিখে দিয়েছে।

www.BanglaBook.org

স্বর

দূর থেকে সমুদ্র দেখা যাচ্ছিলো। যুবক সকালের চোখ ঝলসানো রোদে নীল জলরাশি সাদা ফেনার ভেঙে-পড়া গুঁড়ো সমেত প্রচণ্ড শব্দে আছড়ে পড়ছে বেদুইন মেয়ের বুকের রঙের মতো বাদামী বেলাভূমিতে।

সাইকেল রিকশাটা ক্যাঁচোর-ক্যাঁচোর করে চলছিলো। এখানে ট্যাক্সি পাওয়া যায় না বললেই হয়। অরু তার দশ বছরের ছেলে দীপের পাশে বসে রিকশা করে হোটেলের দিকে চলছিলো।

দীপের স্কুল খুলে যাবে ক'দিন পর। রেল স্ট্রাইকের জন্যে এর আগে বেরোনো সম্ভব হয়নি। কারোরই নয়। ট্রেনে জায়গাই পাওয়া যায় না। তবুও আসতে হয়েছে অরুর। কারণ দীপকে ও কথা দিয়েছিল যে, পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে পারলে তোমাকে পুরীতে নিয়ে যাবো। সোনালি আসতে পারেনি, ওর সেজদির বড় মেয়ের বিয়ে পড়ে গেছে। অতএব একাই আসতে হয়েছে অরুর ছেলেকে নিয়ে।

ছেলের সঙ্গে এর আগে অরু কখনও বেরোয়নি একা একা। বেরিয়ে বেশ ভালো লাগছে। ওর দশ বছরের ছেলের মধ্যে ও রীতিমত একজন প্রাপ্তবয়স্ক ও বিজ্ঞ লোকের ছবি দেখেতে পাচ্ছে। ওর সাধারণ জ্ঞান, ওর সমস্ত বিষয়ে ঔৎসুক্য অরুকে রীতিমত চমৎকৃত করেছে। সোনালি আসতে পারেনি বলে ওর এখন একটুও খারাপ লাগছে না।

হোটেলটি বেশ ভালো। হাওয়ার হলের পাশেই একটি ঘর পেয়েছে অরু। কলকাতা থেকে চিঠি লিখে, টাকা পাঠিয়ে এসেছিলো। ঘরটিও ভালো। ডাবলবেড খাট। পুরনো দিনের অদ্ভুত আকৃতির পাখা একটি। ঘরের কোণায় লেখার টেবল। ড্রেসিং টেবিল, লাগোয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাথরুম। সবচেয়ে যা ভালো লেগেছে অরুর, তা সমুদ্রমুখী এক ফালি ছোট্ট বারান্দা। সারা দিন রাত তাতে বসেই বই পড়ে, চা খেয়ে, আলসেমি করে

www.BanglaBook.org

কাটিয়ে দেবে ঠিক করলো ও।

দীপ বললো, বাবা, তুমি আমার সঙ্গে সমুদ্রে চান করবে না?

অরু বললো, না বাবা।

কেন? চলো না চান করব দুজনে।

অরু বললো, আমি তোমার সঙ্গে যাবো, তুমি নুলিয়ার সঙ্গে চান কোরো, আমি বসে থাকবো।

অরু মনে মনে বললো, ও টিপিক্যাল বাঙালি। এসব দৌড়ঝাঁপ, সুখী শরীরকে অকারণ এত কষ্ট দেওয়ার পক্ষপাতী নয় ও। তাছাড়া পায়জামা বা আন্ডারওয়্যার পরিহিত অনেক বঙ্গ-পুরুষকে ও নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনে বড় বড় ঢেউয়ের থাবড়া খেয়ে বালির মধ্যে পড়ে কালো কুমড়োর মতো অথবা ফ্যাকাশে চিচিঙ্গার মতো গড়াগড়ি যেতে দেখেছে। তাছাড়া ঐ নুলিয়াদের হাতে হাত রেখে এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে 'এই কুমীর তোর জলে নেমেছি' খেলার দিন তার চলে গেছে বলেই অরু বিশ্বাস করে। এই অহেতুক ও উপায়হীন পরহস্ত-নির্ভরতা তার মোটেই বরদাস্ত হয় না।

এক সকালে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পর দীপের সঙ্গে সমুদ্রের ধারে তাকে যেতেই হলো। দীপ একটা কালো সুইমিং-ট্রাঙ্ক পরেছে। সোনালি কিনে দিয়েছে ওকে। ওর সুগঠিত ছোট্ট পেলব শরীরে সুন্দর মানিয়েছে পোশাকটা। দেখলেও ভালো লাগে। নিজেদের জীবনে যা পাওয়া হয়নি, ছেলেমেয়েদের তা দিতে পেরে, সেই সব ছোট-ছোট আপাতমূল্যহীন অথচ দারুন দামী পাওয়া, রথের মেলায় পাঁপর ভাজার মতো, বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে একখানা ময়ূরকণ্ঠী ঘুড়ির মতো, গরমের ছুটিতে পুরী বেড়ানোর মতো, এসব টুকরো টুকরো সুখ তার একমাত্র ছেলেকে দিতে পেরে অরু খুশি। দীপের আজ সকালের অনাবিল আনন্দের হাসিমুখের সুখ, তারু তার জীবনের অনেক বড় বড় সুখের সঙ্গে সহজে বিনিময় করতে পারে।

ওরা প্রায় সমুদ্রের কাছে পৌঁছে গেছে। দূর থেকে মাদুরে ছাওয়া ঘরগুলো দেখা যাচ্ছে। কারা যেন হলুদ আর লাল ডোরা টানা চেরিলিনের তাঁবু খাটিয়েছে বালিতে। হু-হু করে বালি উড়ছে, জলের কণা উড়ছে, ভেজা তটভূমিতে দাঁড়িয়ে-থাকা স্নানরতা মেয়েদের ভিজে চুল উড়ছে। চিৎকার-চেঁচামেচি, উল্টে-পড়া ভেসে-যাওয়া সব মিলে সমুদ্রের ধারে কেমন একটা মেলা-মেলা আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

আনন্দ ও খুশি বড় ছোঁয়াচে। অরু ভাবলো। এই মুহূর্তে ওরও ইচ্ছে করছে দীপের সঙ্গে হাত ধরে ও-ও নেমে পড়ে জলে, আছাড় খায়, উল্টে যায়, নিজের অপদস্থ অবস্থায় নিজেই হো হো করে হেসে ওঠে। নিজেকে স্বেচ্ছায় অপদস্থ করে নিজে যা অনাবিল আনন্দ পাওয়া যায়, তার তুলনা নেই।

হঠাৎ দীপ বললো, বাবা, রাজীব।

অরু শুধালো, রাজীব কে?

বাঃ আমাদের সঙ্গে পড়ে যে! আমার ক্লাসে। খুব ভাল সাঁতার কাটে।

অরু ঐদিকে তাকালো। দেখলো, সেই লাল-হলুদ ডোরা কাটা তাঁবুর সামনে একজন দারুণ ফিগারের দীর্ঘাঙ্গী শ্যামলা-রঙা ভদ্র-মহিলা হালকা গোলাপী সাঁতার কাটার পোশাকে দাঁড়িয়ে আছেন দীপের সমবয়সী একটি ছেলের হাত ধরে। তাঁবুর পাশেই অ্যালুমিনিয়ামের ফোল্ডিং চেয়ারে বসে একজন অত্যন্ত স্থূল ভদ্রলোক পা ছড়িয়ে বীয়ার

www.BanglaBook.org

খাচ্ছেন।

অরুর বুকের মধ্যে সী-গালের আর্তস্বরের মতো কি এক ব্যথাতুর স্বর হঠাৎ বেজে উঠলো।

রাজীব দীপকে দেখে দৌড়ে এলো। তারপর ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলো। অরু বুঝতে পারলো যে ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোক রাজীবের মা ও বাবা।

সমুদ্রের গর্জনে কথাগুলো শোনা যাচ্ছিলো না। কথাগুলো হাওয়ায় উড়ন্ত জলবিন্দুর সঙ্গে উড়ে যাচ্ছিল। তবু অরু অনুমানে বুঝতে পারল, ভদ্রমহিলা বলছেন, ও তুমিই দীপ, তুমিই ফার্স্ট বয়? তারপর বললেন কার সঙ্গে এসেছ? বাবা? মা আসেননি? ও...!

তারপর রাজীব দীপকে নিয়ে তার বাবার কাছে গেলো। রাজীবের বাঙালি বাবা বাংলা বলেন না। ইংরেজিতে দীপকে বললেন, আই সী! য়্যু আর দা ফার্স্ট বয়, আই হ্যাভ বীন হিয়ারিং অ্যাবাউট।

যদিও রাজীবের বাবা-মা প্রায় সাহেব-মেম, তবুও কথাগুলো শুনে অরুর ভালো লাগলো। ছেলে ভালো হলে, বাবার যে কতখানি ভালো লাগতে পারে, সে কথা জীবনে এই প্রথমবার জানলো অরু। পরমুহূর্তেই আবার খুব অপদস্থ লাগলো নিজেকে। কারণ সেই মুহূর্ত থেকে সে শুধু দীপের বাবা হয়েই রইলো। তার নিজের আর কোনো পরিচয় রইলো না। দীপ তার বন্ধুর বাবা-মার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিলো না, তাই অরু বোকার মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো।

ও ভাবলো, ওঁরা নিজেরা আলাপ করলে করবেন। ওর কি গরজ?

দীপও আলাপ করিয়ে দিলো না, ওঁরাও আলাপ করলেন না নিজে থেকে। অনেকক্ষণ সময় কেটে গেলো। এখন সেই প্রথম অস্বস্তিটা চলে গেছে।

অরুণাভ রায় কলকাতার বিখ্যাত অধ্যাপক, বালির মধ্যে পা ছড়িয়ে বসে শুধুমাত্র দশ বছরের দীপের বাবায় পর্যবসিত হয়ে বার্ট্রান্ড রাসেলের জীবনী পড়তে লাগলো। তার চোখের সামনে, কানের সামনে একটা দারুণ শব্দ-বর্ণ-গন্ধর সমারোহ বয়ে যেতে থাকলো, দুলতে থাকলো, ভাসতে লাগলো, উৎক্ষিপ্ত হতে লাগলো, কিন্তু ও চোখ তুলে তা দেখলো না।

কারণ ও ভয় পেয়েছিলো।

তখন থেকেই বুকের মধ্যে সী-গালের আর্তস্বরের মতো এক করুণ স্বর শুনতে পাচ্ছিলো ও। রাজীবের মাকে প্রথম দেখা দেখেই ওর ভালো লেগেছিলো। তাই ও ভয় পেয়েছিলো। অরুর বুকে সেই মুহূর্তে যে স্বর বাজছিলো তা সমস্ত বিবাহিত নারী ও পুরুষের বুকেই বাজে। বিশেষ করে, যখন তাঁরা একা থাকেন খাঁচার মধ্যে বন্ধ পাখি যেমন দূরের বনের দিগন্তে উড়ে-যাওয়া পাখিকে দেখে দুঃখে মরে, তেমন এক দুঃখে, অস্বস্তিতে অরুর বুক ভরে গেলো।

কিছুক্ষণ পর নুলিয়ার হাত ধরে দীপ ফিরে এলো। অরু উঠে দাঁড়ালো।

দীপ খুশীর গলায় বললো, এই বাবা! তুমি রাগ করেছে বেশিক্ষণ চান করলাম বলে?

অরু অন্যমনস্কভাবে বললো, না। তারপর উঠে পড়ে বললো, চলো ফিরি।

দু'দিন এমনিই কাটল। অরু চান করেনি একদিনও। দীপ করেছে রোজ দু-বেলা। হোটেলের লাউঞ্জে, সামনের লনে, খাবার ঘরে বারবার অরুর দেখা হয়ে গেছে রাজীবের

www.BanglaBook.org

মায়ের সঙ্গে। মুখোমুখি হয়েছে, চোখাচোখি হয়েছে; কিন্তু কথা হয়নি কখনও।

দীপ আলাপ করিয়ে দেয়নি।

সেদিন দুপুরবেলা লাঞ্চের সময় ম্যাকারেল মাছের ফ্রাই খেতে গিয়ে দীপের গলায় কাঁটা লাগলো। অরু ওকে বারবার বলেছিলো হাত দিয়ে খেতে, পরে ফিঙ্গার বোলএ হাত ধুয়ে নিলেই চলত। কিন্তু ওদের টেবিলের অনতিদূরে মা-বাবার সঙ্গে খেতে বসা রাজীব যেহেতু সবসময় কাঁটা-চামচ দিয়ে খাচ্ছে, অল্পবয়সী দীপও তাই সাহেব হবার লোভ সামলাতে পারেনি।

কাঁটা বেশ ভালই বিঁধেছিল। স্টুয়ার্ড দৌড়ে এলেন। বেয়ারারা দাঁড়িয়ে রইলো। শুকনো ভাত, কলা, পাঁউরুটি ইত্যাদি নানা কিছু খাইয়ে দীপের গলা থেকে কাঁটা নামানোর চেষ্টা করা হতে লাগলো কিন্তু কাঁটা গেল না। অরু বোকার মতো বসে থাকল দর্শকের মতো। সময় সময় মেয়েদের প্রয়োজন বড় বেশি অনুভূত হয়। বাবারা কত অসহায়, এমন এমন সময়ে তা বোঝা যায়।

অরু একদৃষ্টে নিরুপায়ভাবে দীপের যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে চেয়ে ছিলো। কি করবে বুঝে উঠতে পারছিলো না। শুকনো ভাত রুটি কলা খেয়ে খেয়ে বেচারার পেট ফুলে উঠলো, কিন্তু কাঁটা নামল না।

এমন সময় ওঁদের টেবিল ছেড়ে রাজীবের মা উঠে এলেন এই টেবিলের কাছে।

এসে, লাজুক হাসি হাসলেন অরুণাভর দিকে চেয়ে। অরুও লাজুক হাসি হাসলো। বললো, কি ঝামেলা দেখুন তো!

ভদ্রমহিলা বললেন, ঠিক হয়ে যাবে। পরক্ষণেই মুখ ঘুরিয়ে বললেন, ছেলের মা সঙ্গে না-থাকলে কত অসুবিধা দেখছেন তো! আপনারা তো এমনিতে বুঝতেই পারেন না! তারপর অরুর কাছ থেকে উত্তরের অপেক্ষা না-করেই উনি দীপকে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। অরুর ঘর খাওয়ার ঘরের লাগোয়া, সে ঘরেই দীপকে নিয়ে ঢুকলেন উনি।

অরু কি করবে বুঝতে পারছিল না। রাজীব আর তার সবসময় ইংরেজি-বলা বাবা বসে বসে আইসক্রীম খাচ্ছিলেন। এ সময় পেছনে যাওয়া ভালো দেখাবে না। বিশেষ করে ভদ্রমহিলা যখন দায়িত্ব নিয়েইছেন। অরু চুপচাপ বসে আইসক্রীম খেলো।

রাজীব আর তার বাবা উঠে চলে যাওয়ার পর অরু উঠলো, উঠে আস্তে আস্তে ওর ঘরের দরজায় দাঁড়ালো।

ভিতর থেকে রাজীবের মা বললেন, আসুন, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

অরু ভিতরে ঢুকে বললো, কেমন আছে দীপ?

উনি হাসলেন। বললেন কাঁটা বেরিয়েছে, কিন্তু ন্যাচারালী, জায়গাটা খুবই টেন্ডার আছে। ঘুমিয়ে পড়েছে ও। এখুনি ঘুমোল।

তারপর একটু থেমে বললেন, আপনি কি করবেন? ঘুমোবেন?

অরুর কলকাতায় ঘুমোবার অভ্যেস না-থাকলেও ভালো-মন্দ খাওয়ার পর এখানে রোজই ঘুমোয়।

বললো, নাঃ। দুপুরে ঘুমিয়ে কি হবে?

উনি বললেন, তবে চলুন, লাউঞ্জে বসে গল্প করি। রাজীব আর রাজীবের বাবা নাক ডাকার কমপিটিশন লাগিয়েছেন এতক্ষণ। আমি দুপুরে ঘুমোতে পারি না।

তারপরই বললেন, দীপের মা ঘুমোন? দুপুরে?

www.BanglaBook.org

অরু বলল, না। ও তো চাকরি করে একটা। ঘুমুবে কি করে?

তাই বুঝি! বললেন রাজীবের মা।

তারপর বললেন, ছেলের জন্যে আপনার খুব গর্ব? না? দীপ তো ওদের স্কুলের রীতিমত লেজেন্ড। সকলে ওকে এক নামে চেনে। বাবার মতো বুদ্ধি পেয়েছে বুঝি?

অরু লজ্জিত হলো। বললো, না না। আমি কখনও পড়াশুনায় ভালো ছিলাম না।

তবে কি মা ব্রিলিয়াণ্ট?

অরু বললো, না। তেমন তো শুনিনি। তবে বুদ্ধিমতী।

এমন সময় অরু ও রাজীবের মার সামনে দিয়ে একটি জার্মান দম্পতি জড়াজড়ি করে খাওয়ার হলে গিয়ে ঢুকলো। বালিতে ওদের গা-হাত-পা ছড়ে গেছে। নাক-গাল লাল হয়ে গেছে রোদে পুড়ে। ওদের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় রাজীবের মাকে ওরা হাত তুলে উইশ করল। রাজীবের মা-ও হাত তুললেন।

ওরা চলে গেলে রাজীবের মা ওদের দিকে চেয়ে হাসলেন।

বললেন, বেশ আছে ওরা।

অরু বলল, ভারী লাইভলি কাপল। হানিমুনে এসেছে বুঝি?

রাজীবের মা বললেন, ওদের বিয়েই হয়নি। একজন অস্ট্রিয়া থেকে আর অন্যজন স্টেটস থেকে এসেছে। দমদম এয়ারপোর্টে দুজনের সঙ্গে দুজনের আলাপ। দুজনেই কোণারক দেখতে যাচ্ছে বলে ওরা ঠিক করলো কোণারক দেখে এসে মন্দিরের ভাস্কর্যগুলো যাতে ভুলে না যায় তার জন্যে দুজনে দিনকয় একঘরে থাকবে। অতএব থাকলো।

অরু রীতিমত আত্মবিস্মৃত হয়ে বললো, বাঃ, বেশ মজা তো! বলেই, লজ্জা পেলো।

রাজীবের মা ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিলেন। ভদ্রমহিলার শরীর, ফিগার, চোখ দুটি সবই দারুণ। একবার চাইলে চোখ ফেরানো যায় না। আজ দুপুরে মহিলা একটি ম্যাক্সি পরে আছেন। স্লীভলেস। সারা গা ছাপিয়ে একটি মিষ্টি গন্ধ উঠছে। হয়তো বিদেশী সাবানের, হয়তো বিদেশী পারফ্যুমের। জানে না অরু।

ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই আবার সেই ভয়টা ওর বুকের ভিতরে হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে এলো। এতক্ষণ সে বুঝি রোদে গা শুকুচ্ছিল।

তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে অরু সমুদ্রের দিকে তাকালো। সমুদ্রই ভালো। সমুদ্রর কোনো চাওয়া নেই। কারো সঙ্গে মিলিত হবার কোনো কামনা নেই। কোনো নদ বা নদীর মতো তাকে কোনো সঙ্গমের প্রতীক্ষায় রইতে হয় না। সে নিজেতেই নিজে সম্পূর্ণ। তার পরিপূরকের প্রয়োজন নেই কোনো।

হঠাৎ রাজীবের মা বললেন, আপনাদের কতদিন বিয়ে হয়েছে?

অরু যেন ঘুম ভেঙে বললো, বারো বছর, এক যুগ। তারপর বললো, আপনাদের?

চোদ্দ বছর। এক যুগ দু'বছর। তারপর একটু থেমে বললেন, জীবনটা বড় একঘেয়ে লাগে। তাই না? দীপের মাও নিশ্চয়ই একথা বলেন?

অরু বললো, না। ও আশ্চর্য মেয়ে। ওর অদ্ভুত মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা আছে। ও কখনও একঘেয়েমির অভিযোগ করে না। অদ্ভুত স্বভাব ওর।

রাজীবের মা বললেন, তাহলে বাহাদুরীটা বলতে হবে আপনার। আপনিই একঘেয়েমির হাত থেকে তাঁকে বাঁচিয়েছেন হয়তো।

www.BanglaBook.org

অরু অপরাধীর গলায় বললো, না না। তা না।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললো, আমার কিন্তু একঘেয়ে লাগে। কি মনে হয় জানেন, মনে হয় খাঁচার মধ্যে আছি। রোজ সকালে জীবনের ভাঁড়ার খুলে দুজনে দুজনকে মেপে মেপে রসদ বের করে দিই। একদিনের মতো। পরদিন আবার সমান মাপে বের করি। বেশিও নয়, কমও নয়। কোনোদিনই ঘাটতি পড়ে না কিছুই। উপচেও পড়ে না। একেবারে টায়-টায় সাবধানীর সংসার করি আমরা। এ জীবনে কোনো হঠাৎ-পাওয়া নেই। কোনো আবিষ্কার নেই, অপ্রত্যাশিতর সম্ভাবনা নেই। এখানে দুজনে দুজনের প্রতি কর্তব্য করি। হাসিমুখে। ভাঁড়ার থেকে যা পাচ্ছি, যা প্রতিদিন পাই, তার চেয়ে বেশি কিছু পাওনা ছিল বলে কখনো মনেও হয় না। আসলে এই ভরন্ত রুদ্ধ ভাঁড়ারের মধ্যে বাস করে নেংটি ইঁদুরের মতো আমরা একদিন নিজের অজান্তেই শুকিয়ে মরে যাবো। নাকের সামনে তালা ঝুলবে ভাঁড়ারের, মস্তিষ্কের মধ্যে ফসলের গন্ধ, বেহিসাবের খুশি, খোলা জানালার রোদ, মুক্তির নীল আকাশ, এই সবই স্বপ্ন। কিন্তু এমনি ভাবেই শেষ হয়ে যাবো একদিন। বাঘ-বন্দীর ঘরে।

এতখানি একসঙ্গে বলে ফেলে, অরু লজ্জিত হলো।

বললো, দেখলেন তো; ছেলে পড়িয়ে পড়িয়ে কেমন বক্তৃতাবাজী শিখেছি। আপনি শুনছেন কি না তা না-জেনেই একতরফা বলে গেলাম।

রাজীবের মা বললেন, শুনেছি। আমি সমুদ্রের দিকে চেয়ে শুনছিলাম।

বলেই বললেন, সমুদ্র আপনার ভালো লাগে?

অরু এতক্ষণে ওর স্বাভাবিকতায় ফিরে এসেছে। অপরিচিতির সংকোচের খোলস ছেড়ে ও বাইরে এসেছে।

ও বললো, লাগে না।

কেন? বলে চোখ তুলে চাইলেন ভদ্রমহিলা।

কারণ, সমুদ্রের মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই। সমুদ্র বড় আদিম, বড় উলঙ্গ। সমুদ্র কিছু লুকোতে জানে না। তাছাড়া, সমুদ্র বড় একঘেয়েও। কোনো আদিম পুরুষের একাকিত্বের একটানা গোঙানীর মতো মনে হয় সমুদ্রের আওয়াজ। আমার অস্বস্তি লাগে।

উনি বললেন, আমারও ভালো লাগে না। তবে সম্পূর্ণ অন্য কারণে। কারণটা হলো, সমুদ্র বড্ড বড়। সমুদ্রের মতো কাউকে নিয়ে, এত বিরাট ও প্রবল কাউকে নিয়ে ঘর বাঁধা যায় না। এমন কি ঐ বিদেশী ছেলেমেয়েদের মতো ক্ষণিকের ঘরও বাঁধা যায় না। আমার মনে হয়, কোনো মেয়েরই ভালো লাগে না সমুদ্রকে; মনে মনে।

এমন সময় ঐ বিদেশী ছেলেমেয়ে দুটি খাওয়া শেষ করে গলা জড়িয়ে ওদের সামনে দিয়ে নিজেদের এয়ারকন্ডিশান্ড ঘরের দিকে চলে গেলো।

রাজীবের মা হঠাৎ বললেন, উঠি, কেমন? আপনি রেস্ট করুন। আমিও যাই স্বামী-পুত্রের দেখাশোনা করি গিয়ে একটু।

অরু উঠে দাঁড়িয়েছিল। তারপর রাজীবের মা চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ বসে থাকলো বারান্দার ইজিচেয়ারে।

কতক্ষণ বসে ছিলো ও জানে না। যখন ওর ঘুম ভাঙলো, দেখলো বেলা পড়ে গেছে। দীপ ইজিচেয়ারের হাতলের উপর বসে ওর গা ঘেঁষে। সমুদ্রের উপর একঝাঁক সী-গাল ওড়াউড়ি করছে। পাখিগুলোর ঘর আছে। সমুদ্রের ঘর নেই। পাখিগুলো অন্ধকার হলেই

www.BanglaBook.org

সঙ্গিনীর বুকের উত্তাপে ফিরে যাবে ওদের ঘরে। সমুদ্র যেখানে ছিলো, সেখানেই থাকবে। সমুদ্রর যাওয়ার মতো কোন গন্তব্য নেই; অন্য কোন শরীর নেই।

দীপ বললো, বাবা হাঁটতে যাব, চলো।

অরু বলল, চলো।

পুরী হাওড়া এক্সপ্রেসটা পুরী স্টেশনে দাঁড়িয়েছিলো।

আজ রাজীবরা ফিরে যাচ্ছে।

দীপ বলেছিল, বাবা চলো না, রাজীবদের সঙ্গে দেখা করে আসি একবার। ট্রেন কি ছেড়ে গেছে?

অরু খুশি হলো, দীপ একথা বললো শুনে। তারপর ছেলের হাত ধরে তাড়াতাড়ি একটা রিকশা নিয়ে স্টেশনে পৌঁছে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে এ-সি-সি কোচের দিকে এগিয়ে গিয়ে সবুজ জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। ট্রেনটা এখুনি ছেড়ে দেবে।

জানলায় রাজীবের সঙ্গে রাজীবের মাও গাল লাগিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রাজীবের সঙ্গে উনিও হাত নাড়ছিলেন। আজ ভদ্রমহিলা একটা হলুদ আর কালো মেশানো সিল্ক শাড়ি পরেছিলেন। সবুজ কাচের আড়ালে কেমন রহস্যময়ী মনে হচ্ছিল ওঁকে। ভিতরের কোনো কথাই বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছিলো না। চোখ-মুখের অভিব্যক্তি দেখা যাচ্ছিলো শুধু।

দীপ আর দীপের বাবা, রাজীব আর রাজীবের মায়ের দিকে চেয়েছিল। জানলার কাচটা ঠাণ্ডা। কিরকম যেন একটা গন্ধ বাতানুকুল গাড়িতে।

বেলা পড়ে গেছিলো। জানলার কাচের মধ্যে হঠাৎ অরু কেমন ভাঁড়ার-ভাঁড়ার গন্ধ পেলো। অরু তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল। বাইরে নীল আকাশে তখনও রোদ ছিলো। সমুদ্র থেকে জোর হাওয়া আসছিল নোনা গন্ধ বয়ে। এখানে সাদা নরম সী-গাল নেই।

সেই হঠাৎ-শোনা বুকের মধ্যের স্বরটা হারিয়ে গেছে। বরাবরের মতো।

একটা কালো দাঁড়কাক ডাকছিলো কর্কশ গলায় লাইনের পাশে বসে।

দীপ বললো, বাবা, ওরা কখন কলকাতা পৌঁছবে?

অরুর নাকে আবার ভাঁড়ারের গন্ধটা ফিরে এলো।

অরু বললো, অন্ধকারেই।

তারপরই নিজেকে শুধরে বললো, অন্ধকার থাকতে থাকতেই।

www.BanglaBook.org

মুন্নীর বন্ধুদের জন্য

এমনিতেই কয়েকদিন হলো এক চাপা টেনশনে ভুগছি। মুন্নীর হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবে দিন দশেকের মধ্যে। আগেও বেরুতে পারে। সবই তো তাঁদের মর্জির উপরে নির্ভরশীল। তার উপরে যতীনের চিন্তা।

কাল রাতে শুতে গেছিলাম বড়ই চিন্তিত মনে।

যতীন পি. জি. হাসপাতালে পড়ে আছে সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়ে। প্যারালিসিস হয়ে গেছে সারা শরীর। অথচ মাথাটা কাজ করছে।

আমি অফিসের কাজে বারাউনি গেছিলাম। ফিরে এসে, খবর শুনে, যখন দেখতে গেলাম, তখন ওর কথা বন্ধ হয়ে গেছে।

জানি না, ওর সঙ্গে আর কথা হবে কি না!

যতীনের গালে হাত ছুঁইয়ে বললাম, তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ওঠ যতীন। আমরা আবার এবারে নন্দাদেবী একসপিডিশান করছি। মণ্টুদা বলেছেন, অন্যদিক দিয়ে উঠবো, যেদিক দিয়ে কেউই ওঠেনি।

যতীনের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, তারপরই জলে ভরে এলো।

মনে হলো, ও বুঝি তুষার-শুভ্র নন্দাদেবী আর কলুষহীন নীল আকাশ দেখতে পেলো হাসপাতালের রৌরবের মধ্যে শুয়ে।

কথা বন্ধ হয়ে গেছে। মাথাটা এপাশ ওপাশ করতে লাগলো। কিছুই বলতে পারলো না।

আমি আর সেখানে মিছিমিছি দাঁড়ালাম না। মনটা ভীষণই খারাপ হয়ে গেলো। গত চল্লিশ বছরের বন্ধুত্ব। কলেজের বন্ধু আমরা। কত সুখ, কত দুঃখ, মান-অভিমান; কত অনুষঙ্গর স্মৃতি।

www.BanglaBook.org

রাত তখন প্রায় দুটো। ফোনটা বাজছিল বসার ঘরে। মুন্নী দড়াম করে দরজা খুলে দৌড়ে গিয়ে ফোন ধরলো। তারপর আমাদের ঘরের দিকে এলো। রিমা ততক্ষণে দরজা খুলে ওদিকেই যাচ্ছিলো। গভীর রাতের ফোনের আওয়াজে সকলেরই আতঙ্ক হয়।

মুন্নী বললো, নুটুদা। যতীনকাকুর ছেলে।

আমি দৌড়ে গিয়ে ফোন ধরলাম। বললাম, কী রে! কি খবর?

আমি জোতির্ময়, মণিকাকু।

গলা শুনেই বুঝলাম নুটুনুটু। যতীন তার একামাত্র ছেলের নানান নাম দিয়েছিল ভালোবেসে। খুব ছেলেবেলাতে ডাকতো নুটুনুটু বলে। তারপর ডাকতো হাবলা বলে। যতীনের স্ত্রী নীপা এখনও সেই নামেই ডাকে। তারও পর নুটুবাবু। এবং ইদানীং বলতো নেটকু।

বল রে। আমি বললাম।

কিন্তু রাত তিনটেতে ও কী বলতে পারে, তা বুঝতেই পেলাম।

রোজই সকালে ওদের বাড়িতে ফোন করে ওর সঙ্গে এবং নীপার সঙ্গে কথা বলতাম, যতীনের খবর নিতাম। করবার বিশেষ কিছু তো ছিল না। দেখা করার বারণ ছিল! যতীনের তিন ভাই, শ্বশুরবাড়ির সবাই, ক্লাবের ছেলেরা, ওর সহকর্মীরা সকলেই নিয়মিত যেতেন।

আমার এবং যতীনের অন্য একাধিক বন্ধুদেরও এতোদিন বয়স অনুপাতে নুটুনুটুকে একটু ইম্যাচিওরড বলেই মনে হতো। সচ্ছল বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। একটু বেশি বয়সের সন্তান। আদরে আদরেই হয়তো ওরকম হয়েছে।

কিন্তু আজ হঠাৎ এ কার গলা শুনলাম? স্মার্ট, ভাবাবেগহীন, কাটা-কাটা উচ্চারণে নুটুনুটু বলল, শোনো মণিকাকা, তোমার শরীর এখন কেমন আছে?

ভালো ভালো। তোর বাবা কেমন আছে তাই বল?

শোনো, উত্তেজিত হয়ো না, আমি জানি, তোমার শরীর ভালো নেই। বাবা রাত একটা পঞ্চাশে চলে গেলো। এখন তুমি শুয়ে পড়ো। হাসপাতাল থেকে বাবাকে নিয়ে বাড়িতে আসতে আসতে আমাদের হয়তো এক-দেড় ঘণ্টা হবে। কেওড়াতলায় বেরোতে বেরোতে বারোটা। আমরা এখন হাসপাতালেই আছি। তুমি সময়মতো উঠে, চা-জলখাবার খেয়েটেয়ে, ধীরে সুস্থে বাড়িতেই এসো। কোনোই তাড়া কোরো না। বুঝেছো। আমি এবার ছাড়ি। অনেককে ফোন করতে হবে।

আমি কিছু বলার আগেই ও ফোন ছেড়ে দিল। ওকে আমি কী সমবেদনা জানাব? সান্ত্বনা দেব? ওই ওর ব্যক্তিত্বর সাবালকত্বে আমাকে সান্ত্বনা দিলো।

খবরটাতে স্তম্ভিত এবং নুটুনুটুর হঠাৎ পরিবর্তনে যুগপৎ চমৎকৃত হয়ে রইলাম।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে বাথরুমে গেলাম। ভাবছিলাম, যতীন আমাকে নেপাল হিমালয়ে সাক্ষাৎ মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছিল একবার, নিজের প্রাণ বিপন্ন করে। ধস আমাকে নিয়ে খাদেই ফেলে দিচ্ছিলো, যদি না যতীন ধাক্কা মেরে চকিতে আমাকে শুইয়ে ফেলে আমার জ্যাকেট ধরে টেনে, পাশে সরাত।

তখনও আমার নিজের দম ছিলো না একটুও।

মৃত্যু ব্যাপারটা এতোদিন পুরোপুরিই পরাশ্রিত ছিলো।

অমুকের দাদু মারা গেছেন, তমুকের ভাই, অন্য কারো জামাইবাবু। শুনতাম, শ্মশানেও যেতাম। কিন্তু মৃত্যু যে মানুষখেকো বাঘের মতো আমাদের নিজস্ব নিভৃত চত্বরেও এমন

www.BanglaBook.org

নিঃশব্দ পায়ে ঢুকে-পড়বে কোনোদিন, আমাদেরই আপন, বড় কাছের কাউকে মুখে করে নিয়ে যাবে, তা যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না।

রিমা বললো, এত রাতে কোথায় যাবে? ট্যাক্সিও তো পাবে না। শরীরও তো ভাল নেই। যতুদা তো আর নেই! এখন তাড়া করে কি লাভ? আমার নিজের হাত-পা ছেড়ে যাচ্ছে। ভাবতেও পারছি না যে যতুদা নেই! তুমি আমার কাছেই থাকো।

তুমি মুন্নীর সঙ্গে শুয়ে থাকো ওঘরে গিয়ে। আমাকে যেতেই হবে। এই খবর না জানলে, অন্য কথা ছিল। নুটুনটু একা। না গেলে চলে।

বলেই, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে, বেরিয়ে পড়লাম।

ট্যাক্সি নেই। কলকাতা বম্বে নয় যে, সারা রাত সারা দিন ট্যাক্সি পাওয়া যাবে। সার্কুলার রোড আর আমাদের পথের মোড়ে এসে পৌঁছলাম হাঁটতে হাঁটতে। দেখি, পুলিশের একটি ঝকঝকে ভ্যান মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট্ট ভ্যান। তাতে সুবেশ সুদর্শন একজন অফিসার এবং তাঁর পাশে ড্রাইভার।

গাড়িতে অন্য কোনো পুলিশ নেই। আমি এগিয়ে গিয়ে ঐ অফিসারকে অনুরোধ করলাম, আমার ছেলেবেলার এক বন্ধু একটু আগে পি.জি. হাসপাতালে মারা গেছেন। আপনারা ঐদিকে গেলে, একটু এগিয়ে যেতাম।

পুলিশ অফিসার আমার স্পর্ধা দেখে একটু অবাক চোখে তাকালেন। তারপর নৈর্ব্যক্তিক গলাতে বললেন, দেখছেন না, আমরা ডিউটিতে আছি? ওঃ। আমি বললাম। বিলেত-ফেরত ভন্টুদার কাছে শোনা, লন্ডনের পুলিশদের সৌজন্য ও কর্তব্যজ্ঞানের কথা মনে পড়ে গেলো আমার।

মোড়েই দাঁড়িয়ে রইলাম, যদি শেয়ালদার দিক থেকে কোনো ট্যাক্সি আসে, সেই অপেক্ষাতে। ট্রাম-বাস চলার সময় হয়নি এখনও।

একটু পরেই একটি ট্রাক এলো। পুলিশ অফিসার দরজা খুলে লাফিয়ে নামলেন। ট্রাকটি গতি কম করলো, কিন্তু দাঁড়াল না। ড্রাইভারের বাঁ-পাশে বসা লোকটি তার হাত বের করলো জানালা দিয়ে। তারপরই চলে গেলো ট্রাকটি। পরক্ষণেই শিক্ষিত, সুদর্শন, কর্তব্যপরায়ণ ভদ্রলোকের পুলিশ ছেলে, নিচু হয়ে, পথ থেকে সর্দারজীর অবজ্ঞা-অবহেলা এবং ঘৃণাতে ছুঁড়ে দেওয়া দশ টাকার নোটটি তুলে নিয়ে পকেটে রেখে সামনের সীটে উঠে বসলেন। ডানদিকের সীটে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলাম। কিন্তু অফিসারের কোনো ভাবান্তর হল না। "লজ্জা, মান, ভয়, তিন থাকতে নয়।" বীরের মতো ঘুষ নিলেন অফিসার।

ট্যাক্সি এলো না। কিন্তু একটু পরে ঐ রকম আরেকটি ভ্যান এলো। তাতেও ঐ রকমই দুজনে-বসা। সঙ্গে আর কেউই নেই। ঐ ভ্যানটি আসতেই আগের ভ্যানটি সামনে এগিয়ে গেলো অন্য জায়গাতে "কর্তব্য" করতে।

পরের ভ্যানটি আগের ভ্যানের জায়গাতে এসে দাঁড়াল।

নির্লজ্জ, মান-অপমান বোধহীন কলকাতাবাসী আমি আবারও ঐ ভ্যানের অফিসারকে অনুরোধ করলাম। একই অনুরোধ। আমার ছেলেবেলার এক বন্ধু মারা গেছেন একটু আগে। আপনারা কি পি. জি. হাসপাতালের দিকে যাবেন? গেলে, একটু এগিয়ে যেতাম।

একই উত্তর পেলাম। তবে এবারে নৈর্ব্যক্তিকতার সঙ্গে নয়, বিরক্তির সঙ্গে।

অফিসার বললেন, আমরা এখানে "ডিউটি" করতে এসেছি। আপনি কি মনে করেন

www.BanglaBook.org

যে পুলিশের কাজ মাঝরাতে আলতু-ফালতু লোককে লিফট দেওয়া? ভিখিরিদের মতো বন্ধু-ফন্ধু মরে যাওয়ার গল্প, ওরকম সকলেই বানিয়ে বলে।

না, না, আমি লিফট তো চাইনি। আপনারা যদি ঐদিকে যেতেন তাহলে একটু এগিয়ে যেতে পারতাম। আপনাদের ভ্যানও তো দেখছি ফাঁকাই। তাই...

আমরা ডিউটি করছি।

ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে তিনটে বেজে গেছে। ঠিক করলাম হেঁটেই এগোই। সামনে গিয়ে যদি কোথাও ট্যাক্সি পাই তো ভালো, নইলে হেঁটেই যাবো। আর কী করার!

যতীনের সঙ্গে পাশাপাশি পর্বতে-উপত্যকায় বনে-জঙ্গলে দিনে রাতে কত বছর কত হেঁটেছি! ওই চলে গেলো! ওর কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছবার জন্যে না-হয় মাইল তিনেক হাঁটলামই।

ঠিক এমন সময়ে দূরে একটা হেডলাইট দেখা গেলো। ট্যাক্সি? না, ট্রাক। ট্রাক দেখেই অফিসার লাফিয়ে নামলেন। ইনিও সুদর্শন। তবে গায়ের রঙ কালো। চমৎকার ছাঁট এর চমৎকার ইস্ত্রি-করা পশ্চিমবঙ্গর পুলিশি জামা-কাপড়। এই ট্রাকটিও গতি কমালো, নোট ছুঁড়ে দিল শিক্ষিত, ভদ্রলোক, কর্তব্যপালনকারী সম্ভ্রান্ত সরকারী কর্মচারী ভিখিরির দিকে।

ট্রাকটি চলে গেলে, অফিসার ভ্যানে উঠে পড়ে, সার্কুলার রোড ধরে পি জি.-র দিকেই এগিয়ে গেলেন। নতুন জলায় মাছ ধরতে।

দশ টাকার নোটগুলো যেখানে ফেলেছিল, ঋজু, মেহনত-করে-খাওয়া, কম-কথা-বলা সর্দারজীরা এবং যেখান থেকে "বুদ্ধিজীবী" "ভদ্রলোক" "শিক্ষিত" বাঙালি পুলিশ অফিসারেরা সেই অসম্মানের নোট কুড়িয়ে নিয়েছিলেন, সেখানে পিচিক করে থুথু ফেলে, আমি হাঁটা দিলাম পি. জি. হসপিটালের দিকে, অন্ধকার "তিলোত্তমা", "কল্লোলিনী" কলকাতা শহরের নিশুতি রাতে।

মনে মনে বললাম, যতীন, আমি আসছি, আমি আসছি। দেরিটা ক্ষমা করে দিস। আমি আসছি। আমরা আসছি যতীন, আমরা আসছি।

॥ ২ ॥

যতীনের কাজও হয়ে গেল গতকাল। এখন শুধু স্মৃতিটা আছে। এখনই মুশকিল। চলতে-ফিরতে, একা থাকতে, বাসের জানালায় বসে, অফিসের কাজের ফাঁকে ফাঁকে কেবলই যতীনের কথা মনে পড়ে। ওর হাসি, রসিকতা, ওর রাগ, সবকিছুর কথাই।

ভড় সাহেব ডেকে বললেন, বারাউনি যেতে হবে পরশুই। এবারে মাস-খানেকের জন্যে।

রিমা বারবার করে বলেছিল যে, মুন্নীর রেজাল্ট বেরুবে অগাস্টের গোড়াতেই। সেই সময়ে যেন কলকাতার বাইরে না থাকি। মার্কশিট আনতে হবে স্কুল থেকে। প্রত্যেক কলেজে পরীক্ষা দিতে হবে। মার্কশিট দেখালে, তবেই ফর্ম দেবে। নইলে কোনো কলেজই দেবে না। প্রেসিডেন্সি, যাদবপুর, সেন্ট জেভিয়ার্স, লরেটো, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজেই পরীক্ষা দিয়ে রাখতে হবে। কোথায় পাওয়া যাবে কে জানে! জয়েন্ট-এন্ট্রান্স-এর ফর্ম পেতেও মার্কশিট লাগবে। মার্কশিট হাতে পেয়েই জেরক্স করতে হবে গণ্ডা গণ্ডা। তারপর শুরু হবে দৌড়োদৌড়ি। তারও পর কোথাও ভর্তি হতে পারলে তারপর বই কেনা, অ্যাডমিশান ফি, ইত্যাদি ইত্যাদি। মুন্নীর স্বাস্থ্য একটু দুর্বল। ও একা এত ধকল সইতে

www.BanglaBook.org

পারবে না।

ভড় সাহেবকে একথা বলতেই উনি বললেন, সবসময়ই আপনাদের অজুহাত। অফিসারদেরও এরকম মেন্টালিটি আনথিংকেবেল। কাজ করতে চান না একটুও। আপনাদের মতো ইনএফিসিয়েন্ট আনউইলিং বাঙালিদের জন্যেই কলকাতা শহরটা, পুরো পশ্চিমবঙ্গটাই অন্যদের দখলে চলে গেল। উ্য শুড বী অ্যাশেমড অব ইওরসেলভস।

আমার গা জ্বলে উঠলো। ভড় সাহেবেরে কাজ এবং কুকাজের সব খবরই আমি রাখি। অত বক্তৃতা ভালো লাগে না।

বললাম, স্যার আমার একটিই সন্তান। এবং তার পুরো ভবিষ্যতের প্রশ্ন এটা। ভালো কলেজে, নিজের বিষয় নিয়ে ভর্তি হতেই যদি না পারে, তাহলে ভবিষ্যৎটাই যে নষ্ট হয়ে যাবে। আজকাল কী ছেলে, কী মেয়ে, স্বাবলম্বী না হলে তো তাকে না খেয়েই থাকতে হবে। রোজগেরে মেয়ে ছাড়া তো কেউ বিয়েও করতে চায় না আজকাল। আপনি যদি অগাস্টের প্রথম দুটি সপ্তাহ আমাকে কলকাতায় থাকতে না দেন, তবে স্যার আমি ছুটির দরখাস্তই করে দিচ্ছি।

বড়সাহেব পান চিবুতে চিবুতে বললেন, দরখাস্ত করা মানেই যে ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেলো, তা তো নয়! ছুটিই যদি দিতে পারতাম আপনাকে, তাহলে এতো কথা কিসের ছিলো? আপনি ছাড়া আর কেউ তো নেই মিস্টার রায়! এদিকে অডিটরেরা অ্যাকাউন্টস ফাইনালাইজ করবেন। দিল্লিতে যাবেন অগাস্টের ন-দশ তারিখ, এমনই কথা আছে।

তারপরই বললেন, আপনার বাবার এবং শ্বশুরবাড়ির ফ্যামিলিতে ভ্যাগাবণ্ড লোকের কি কোনো অভাব আছে? পশ্চিমবঙ্গে চাকরি বা কাজ আছে কটা লোকের মশাই? এইটেই তো একটা মস্ত অ্যাডভান্টেজ। তাদের কাউকে ফিট করে দিয়ে চলে যান।

তেমন কেউই যে নেই।

আমি মিনমিন করে বললাম।

বলেন কি মিস্টার রায়? আপনি তো দারুণ লোকি মশায়! বাঙালির বাড়িতে ভ্যাগাবণ্ড নেই, সকলেরই কাজ আছে; এতো অসম্ভাবনীয় ব্যাপার! সাংবাদিকদের বলতে হবে, আপনাকে ইন্টারভ্যু করে কাগজে রিপোর্ট করতে।

চুপ করে রইলাম। ভাবছিলাম যে, ভ্যাগাবণ্ড কেউ নেই এও যেমন সত্যি তেমন যৌথ পরিবারের নিরাপত্তা, অদৃশ্য কিন্তু দৃঢ়মূল বীমা, জনবল, এ সবও তো নেই! নেই অনেক কিছুই। ভালোবাসা নেই, বিশ্রাম নেই; মমত্ববোধ নেই।

না মিস্টার রায়, আই অ্যাম সরি। এ নিয়ে আমাকে আর কোনোরকম পেড়াপিড়িই করবেন না। বেশি চাপাচাপি করলে আপনার ফ্যামিলিতে আপনাকেই ভ্যাগাবণ্ড হয়ে যেতে হবে। এই বয়সে, এই কোয়ালিফিকেশানে; আপনি এই চাকরিটি খোয়ালে আর কোথাওই কি চাকরি পাবেন?

কি? চুপ করে রইলেন কেন? বলুন? পাবেন কি?

মাথা নাড়লাম।

ভাবলাম, আমার চাকরি অবশ্যই খেতে পারেন কিন্তু একজন ক্লাস-ফোরের চাকরি খান দেখি। সেদিনই তো "শালা-বাঞ্চোত" বলে গেল ঘেরাও করে দেবে। কি করতে পারেন আপনি তাদের?

ভাবলাম, কিন্তু বলতে পারলাম না।

www.BanglaBook.org

আমি পারবো না যে, সে কথা ভড় সাহেব জানেন বলেই তো এমন অমানুষের মতো ব্যবহার করতে পারেন। এতো করেও তো কোটি কোটি টাকা লস। স্টেট গভর্নমেন্টেরই তো কম্পানি! আর লসটা যে কেন হয়, কী করে হয়; তাও তো আমরা জানি। অথচ দোষ হয়; আমাদেরই। এই ছাতার পেটি অফিসারদের!

বাড়িতে এসে কথাটা রিমাকে বলতেই, সে তো হাঁউমাঁউ করে উঠলো।

মুন্নী গম্ভীর হয়ে গেলো।

মুন্নী, স্কুল ফাইন্যালেও তিনটে লেটার পেয়েছিলো। এগ্রিগেটে বিরাশী পার্সেন্টি নম্বর পেয়েছিল। আমি নিজে স্কুল ফাইন্যালে ফর্টি-টু পার্সেন্টি নম্বর পেয়েছিলাম। অ্যাডিশনাল ম্যাথস এ পেয়েছিলাম পনেরো। এক নম্বরও যোগ হয়নি এগ্রিগেটে। আমার মেয়ে এমন ভালো হয়েছে পড়াশুনোয় তার সব কৃতিত্ব তার এবং রিমারই। মেয়েই রিমার জীবন-রস, জীবন; জীবনী। মেয়েই তার বর্তমান, মেয়েই ভবিষ্যৎ। গত পনেরো বছরে দাম্পত্য বলে কিছুমাত্রই ছিলো না আমাদের এই ছোট্ট সংসারে। তার স্থান নিয়েছিলো অপত্য। ঘোর অপত্য।

মা ও মেয়ের মুড দেখে আমি বললাম, চাকরিটা চলে গেলে খাবো কি বলো? অফিসের নগেনকে বলে যাবো। ওকে নিয়ে তুমিই মুন্নীকে সঙ্গে করে, না হয় ট্যাক্সি করেই যেও সব জায়গাতে। যেতে যদি হয়ই আমাকে, বেশি টাকা দিয়ে যাব ব্যাঙ্ক থেকে তুলে।

তুমি স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার পরও এক কণা সাহায্য করোনি। মেয়েটা জন্ডিস থেকে এই সেদিন উঠল। মুন্নীর বিলিরুবিন কতো হয়েছিল গত মাসে তা কি তুমি জান না? তুমি তো নিজের শরীর নিয়েই ব্যতিব্যস্ত সবসময়ে। মেয়ে-বৌ-এর কথা জানার বা শোনার সময় কোথায় তোমার?

আমি হঠাৎই উত্তেজিত হয়ে বললাম, আমাকে একটু ফোন করে দিলেই আমি পালিয়ে আসব বারাউনি থেকে। ওভারনাইট জার্নি। তাতে চাকরি গেলে যাবে। রেজাল্ট তো আগে বেরোক। মার্কশিটটা তো জোগাড় করো। কাবে জেরক্স করে ফেলো। সেই সময়ে চাকরি গেলে যাবে। ব্যানার্জিদার ফাঁকা গ্যারাজটা ভাড়া নিয়ে ওখানে আলুর চপ আর ঘুগনীর দোকান দেবো। এই ছাতার চাকরির চেয়ে স্বাধীন ব্যবসা অনেক ভালো। "বাণিজ্যে বসতেঃ লক্ষ্মী।" হ্যাঁ! ভারী তো মাইনে, তার আবার এতো কতা আর এতো হ্যাপা।

যা খুশি তাই করতে পারো। করবার মুরোদ থাকলে আগেই করতে পারতে। এর চেয়ে খারাপ থাকা তো যায়ই না! তবে আর ভয় দেখাচ্ছো কি? নতুন করে ভয় পাওয়ার তো কিছু নেই। টেলিফোনটাই শুধু খুলে নিয়ে যাবে, অফিসের ফোন বলে। আর বেশি অসুবিধের কিসের? তিনটে পায়রার খোপের মতো ঘর। নিজেরা তো এই করেই কাটিয়ে দিলাম জীবনটা। মেয়েটা যেন মানুষের মতো বাঁচতে পারে, ভাল থাকে, ভাল খায়, ভাল ছেলেকে বিয়ে করে এ ছাড়া আমার আর চাইবার কি আছে? ভগবানকে সবসময়েই বলি, মেয়েটা পায়ে দাঁড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন মরে যাই। তোমার সাতশো টাকা পেনশানে তো দুজনের চলবেও না। সঞ্চয়ও তো অনেকই করেছো! আর যা বাজারের অবস্থা! তুমি যখন রিটায়ার করবে, তখন টাকা তো কাগজই হয়ে যাবে। ঠোঙার কাগজ।

আমি কিছু বললাম না। বললেই প্রেসার উঠে যায়। অবশ্য, না বললেও যায়।

যে সব কথা ভুলে থাকতে চাই, ভুলে যেতে চাই সেই সব কথাই যে কেন রিমা বার বার তোলে!

www.BanglaBook.org

॥ ৩ ॥

বারাউনিতে এলে এমনিতে ভালো লাগে। গেস্ট-হাউসটা নিরিবিলি জায়গাতে। বাগান-টাগানও আছে। খাওয়া-দাওয়াও মন্দ নয়। তবে বাইরে থাকার জন্যে যদি একটা অ্যালাউন্স থাকতো। তবে আরও ভাল হতো। কম্পানির ড্রাইভাররাও আউট-স্টেশান অ্যালাউন্স পায়।

নামেই আমি অফিসার। ওভারটাইম আর এই সব নিয়ে একজন বেয়ারা বা ড্রাইভারও আমার চেয়ে বেশি রোজগার করে। কে ভাবে আমাদের কথা! মধ্যবিত্তদের আর কটা ভোট! আমরা না খেয়ে মরলেই বা কী যায় আসে!

সকালে উঠে, কাগজ খুলেই চোখ কপালে উঠলো। হায়ার সেকেন্ডারির রেজাল্ট আগামীকাল বেরুবে। মানে, স্কুল খুলে যাবে। মাত্র চল্লিশ পার্সেন্ট পাশ করেছে। বারো হাজার নশো ছেলেমেয়ের রেজাল্ট ইনকমপ্লিট। পরশু জানতে পাবে রেজাল্ট, ছেলে-মেয়েরা; যার যার স্কুল থেকে।

খবরটা পড়ার পর থেকেই টেনশান বাড়তে থাকলো ভিতরে ভিতরে।

মুন্নী আমার মেয়ে খুবই ভালো। শুধু ভালো যে তাই নয়, অত্যন্তই সিরিয়াস। পাশ করবে এবং ফার্স্ট ডিভিশানও পাবে। কিন্তু কটা লেটার পাবে? এগ্রিগেটে কতো পাবে? সেইটেই দেখার।

তারপর ইন্টারভ্যু কেমন হয়? কোন কলেজে? কী কম্বিনেশান পায়? চিন্তা তো আছে! শুনি নাকি যে, যাদবপুরের অধ্যাপকমণ্ডলী খুব ভালো। এমনকি সেখানের অফিসের কর্মচারীদের ব্যবহারও চমৎকার। এরকমটি নাকি দেখা যায় না আজকাল কোথাওই।

এ সব খোঁজ-খবর এনেছে মুন্নীই।

রিমার দিদির মেয়ে ঝুমা, প্রেসিডেন্সিতে পড়ে। তাই মুন্নীরও শখ। প্রেসিডেন্সির একটা আলাদা গ্ল্যামার আছে। ও বলে। আছে কি না কে জানে!

পোলিটিকাল সায়েন্স-এর অধ্যাপক প্রশান্ত রায় (পি. আর.) নাকি এক লিভিং লেজেন্ড। হবেন হয়তো। কিন্তু আমি ভাবতাম, প্রেসিডেন্সি, বাড়ি থেকে অনেক দূরেও হবে, তদুপরি সে অঞ্চলে তো হাঙ্গামা লেগে থাকে প্রায় রোজই আজকাল। আমারও ইচ্ছে, মুন্নী যাদবপুরেই পড়ুক।

ভাবলাম, আজকে অফিসে রাত দশটা অবধি থাকবো। আগামীকালও। কাজ যতদূর পারি এগিয়ে রাখতে হবে। পরশু বিকেলের দিকেই ফোন করবো বাড়িতে। পরশু বিকেলের আগে স্কুলে রেজাল্ট আসবেও না। কিন্তু বারোহাজার নশো ছেলেমেয়ের রেজাল্ট ইনকমপ্লিট? কমপ্লিট না করে রেজাল্ট বের করলেনই বা কেন? কে জবাব দেবে? প্রশ্নই বা করবে কে? কাকে করবে? এই অচলায়তনে?

"দ্যা কিং ক্যান ডু নো রং।"

এখন তো সরকারই রাজা!

॥ ৪ ॥

ফোন করবো করবো ভাবছি। ভেবেছিলাম চারটেতে করব। আমার পক্ষে পার্সোনাল কল করতে এখান থেকে কোনোই অসুবিধে নেই। কিন্তু আমি ফোন করার আগেই

www.BanglaBook.org

কলকাতা থেকে ফোন এসে গেলো।

নিশ্চয়ই ডেসপারেট হয়ে করেছে রিমা। আমার বাড়ির ফোনে এস-টি-ডি ফেসিলিটিই নেই। অফিসের দেওয়া ফোন তো! অন্য কোথাও থেকে করেছে নিশ্চয়ই।

হ্যালো।

আমি বলছি।

রিমা বললো।

বলো। কি হয়েছে? কোথা থেকে বলছো?

টাবলুর বাড়ি থেকে। মুন্নীর রেজাল্ট ইনকমপ্লিট।

ইনকমপ্লিট?

ঠিক এই আশঙ্কাই করছিলাম পরশু থেকে আর মনে মনে উইশফুল থিংকিং করে যাচ্ছিলাম যে, ঐ বারো হাজার নশোর মধ্যে আমার মেয়ে থাকবে না।

আমরা প্রত্যেকেই স্বার্থপর। নিজের পায়ে জুতোর চাপ না পড়লে আমাদের যায় আসে না কিছুই। মুন্নীর রেজাল্টটা কমপ্লিট থাকলে যেত-আসত না কিছু আমারও। আমি যে বাঙালি! বুদ্ধিজীবী।

কবে পাবে?

মানে, কমপ্লিট রেজাল্ট কবে পাবে?

নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম।

স্কুল থেকে তো হেডমিস্ট্রেস বললেন, পরশুর মধ্যে।

তবে আর কি? পরশুই আমিই ফোন করবো বিকেলে। চিন্তা কোরো না।

চিন্তা করবো না? মার্কশিট না পেলে যে, কোনো কলেজ ফর্মই দেবে না।

আরে মার্কশিট তো পেয়েই যাবে পরশু। চিন্তা করছো কেন? মিছে চিন্তা কোরো না। মার্কশিটের জন্যে অ্যাপ্লাই করেছে মুন্নী?

হ্যাঁ। তা তো করেছেই। স্কুল থেকেই সব করে দিয়েছে।

তবে তো ঠিকই আছে। পরশু ফোন করবো আমি। ছাড়ছি। তোমার প্রেসার কেমন আছে?

খুবই বেড়ে গেছে। ডঃ মিত্রকে ডাকিতে হয়েছিল। দুশো যাট হয়ে গেছে প্রেসার।

চমৎকার! শুয়ে থাকো। উত্তেজিত হয়ো না। সময়মতো ওষুধ খেও।

ফোনটা ছেড়ে দেবার পরই আমার মাথা দপদপ করতে লাগলো। কী করব? করার কি আছে? কোথায় যেন পড়েছিলাম, "There is no point in trying to do something when there is nothing to be done."

মুন্নীকে নিয়ে আমাদের দুজনের কতই না জল্পনা কল্পনা! আই. এ. এস. হবে, না, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট? অধ্যাপনা করবে, না ব্যাঙ্কের চাকরি করবে? বিদেশে পড়তে যাবে কি? মুন্নীর নিজের ইচ্ছা গ্র্যাজুয়েশন-এর পর G.R.E. ও TOEFEL দিয়ে আমেরিকার কোনো ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পড়বে। S.A.T এ বসে হায়ার সেকেন্ডারির পরই বাইরে যাবার ওর কোনো ইচ্ছে নেই।

রিমা বলে, তোকে যেতে দিতে পারি মুন্নী, যদি ফিরে আসবি কথা দিয়ে যাস।

মুন্নী হাসতে হাসতে বলে, ফিরব না কেন? স্বদেশের মতো কি আর বিদেশ? সকলেই যদি ভালো-থাকা, ভালো-পরা, বড়-গাড়ি চড়ার জন্যে বিদেশে চলে যায় তবে দেশের কি

www.BanglaBook.org

হবে? আমরা সকলে মিলে যদি দেশে থেকে, দেশের অবস্থা ফেরাবার চেষ্টা না করি তবে দেশের অবস্থার উন্নতি কি কোনোদিনই হবে?

আমার খুব গর্ব আমার মেয়ে মুন্নীকে নিয়ে। কারণ, পড়াশুনাতে ভালো অনেক ছেলেমেয়েই হয়, কিন্তু ওর মধ্যে সমকাল, স্বদেশ, স্বপরিচয়, স্ব-জাতি, ইত্যাদি সম্বন্ধে এমন এক উৎসাহ ও গভীর ভাবনা-চিন্তা দেখি যে, খুব কম ছেলেমেয়েদের মধ্যেই তা দেখতে পাই। আমার মেয়ে বলে বলছি না, মুন্নী একটি এক্সট্রা-অর্ডিনারি মেয়ে। তবে একটাই দোষ। সব ব্যাপারেই ওভার-সিরিয়াস।

আমার তো ইচ্ছেই করে না মুন্নীর বিয়ের কথা ভাবতে। একটা মাত্র মেয়ে। একমাত্র সন্তান। সেও পরের ঘরে চলে গেলে, আমরা বাঁচব কি নিয়ে? মাঝে মাঝে ভাবি, কোনো ভাল, বিদ্বান ছেলেকে জামাই করব। সে এসে, আমাদের কাছেই থাকবে অথবা আমার মেয়ে-জামাইয়ের কাছে গিয়ে। আজকাল তো এমন কতই হয়।

কে জানে। মুন্নী কি হবে জীবনে? কী করবে, কেমন জামাই হবে আমাদের? কবে হবে?

বৃদ্ধ বয়সে আমার আর রিমার জীবন অনেকখানিই নির্ভর করবে মুন্নী আর মুন্নীর স্বামীর উপরে। এ কথাটা ভাবতে লজ্জা হয়, ভয় হয়; আবার ভালোও লাগে।

ওরা হয়তো অন্য অনেকের মতো হবে না।

অন্যরকম হবে।

॥ ৫ ॥

অপারেটরকে বলতেই দু'মিনিটের মধ্যে কলকাতার লাইন পেয়ে গেলাম।

মুন্নীই ধরলো।

কী রে! খবর? পেয়েছিস মার্কশীট?

না।

কেন রে?

তুমি মায়ের সঙ্গে কথা বলো। মা আসছে। মায়ের শরীর ভালো নেই।

হ্যালো।

রিমা বললো।

বলো কি হল? তোমার কি হয়েছে?

আমার কথা পরে।

কেন?

মধুমিতা সেকেন্ড ডিভিশন পেয়েছে।

সে কে?

আঃ। জয়িতার মেয়ে। চেন না যেন!

সে তো দারুণই ভালো মেয়ে! স্কুল ফাইন্যালে তো আটাত্তর পার্সেন্ট নম্বর পেয়েছিল না?

হ্যাঁ। তা পেলে কী হয়? খাতা কি আর দেখেছে! খাতা দেখলে কি এমন হয়? না, হতে পারে? গজেনদার ছেলে রমু, তিনটি সাবজেক্টে চল্লিশের ঘরে নম্বর পেয়েছে, সেও সেভেন্টি-ফাইভ পার্সেন্ট নম্বর পেয়েছিল স্কুল-ফাইন্যালে। প্রেসিডেন্সিতে পড়বে বলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তৈরি হয়ে বসেছিল ছেলে।

কিন্তু মুন্নীর মার্কশিট কি বলছে?

আরে পেলে তো! তাহলে আর বলছি কি? আজ স্কুল থেকে চ্যাটার্জিবাবু গেছিলেন বোর্ডের অফিসে খোঁজ করতে। তিনি জেনে এসেছেন যে, ছাব্বিশ তারিখে আবারও গিয়ে খোঁজ করতে হবে। তখন জানাবেন ওঁরা।

তার মানে?

অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে, প্রায় রিমাকেই ধমকে বললাম আমি।

মানে, আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন? এডুকেশান মিনিস্টারকে জিজ্ঞেস করো, এডুকেশান সেক্রেটারিকে জিজ্ঞেস করো।

আমি কি তাঁদের চিনি?

যাঁরা চেনেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করো, খুঁজে বের করো। এখানে চলে এস আজকেই রাতের গাড়িতে। কত ছেলেমেয়ের বাবারা কত কী করছেন আর তুমি ওখানে বসে বসে ঘুমুচ্ছো আর মাঝে মাঝে দয়া করে ফোন করছো। আমার কিছু ভাল লাগে না-আ-আ-আ-।

বলেই, কেঁদে ফেললো রিমা।

মেয়েদের এই অবুঝপনা আমার সত্যিই সহ্য হয় না। অথচ সহ্য না করেও কোনো উপায় নেই।

বললাম, দ্যাখো রিমা, আজেবাজে চিন্তার একটা সীমা আছে। বোর্ডের দোষে মার্কশিট পাওয়া যাবে না সময়ে, আর সে জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছেলেমেয়েদের ফর্ম দেবে না, তাদের কেরিয়ার নষ্ট হয়ে যাবে; তা কি হয়? এ কি জঙ্গলের রাজত্ব নাকি? যত্ত সব নাই-চিন্তা।

তারপরে বললাম, শনিবারে ফোন করবো। সতের তারিখে। দ্যাখো। তার মধ্যে পেয়ে যাবে মার্কশিট ঠিকই।

তুমি আসবে না?

রিমা আলটিমেটাম দিলো।

এখন গিয়ে করবোটা কি?

মেয়ের মতিগতি আমার কিন্তু ভালো ঠেকছে না। দিনরাত দরজা বন্ধ করে বসে আছে ঘরে। কথা বলছে না কারো সঙ্গে। বন্ধুরা ফোন করলেও ধরছে না। ছাব্বিশ তারিখের আগে তো সব কলেজের অ্যাডমিশানই ক্লোজড হয়ে যাবে। যদি তার আগেও মার্কশিট দেয় তবুও মেয়ের যা অবস্থা! তাকে আমি একা সামলাতে পারবো না। তুমি তাড়াতাড়ি চলে এস। কিছু একটা করে বসলে? ও যা সেনসিটিভ, ইনট্রোভার্ট। তোমার পায়ে পড়ি।

তুমি বড়ই অবঝুপনা করছ রিমা। মুন্নী মার্কশিট পেলেই আমি চলে আসবো। নগেনকে জানিও। ও টেলেক্স করে দেবে আমাকে এখানে। সঙ্গে সঙ্গে দিনে রাতের যে গাড়ি পাবো তাতেই চলে আসবো। আমি কি এখানে শখ করতে এসেছি? অডিটরের ছেলেরা সবাই এখানে এসে বসে রয়েছে বহুদিন হলো। অডিট-ফার্মের পার্টনার কাল আসছেন। আমার পক্ষে এক্ষুনি যাওয়া অসম্ভব।

মেয়ে কিন্তু অস্বাভাবিক ব্যবহার করেছ। কিছু করে না বসে! আবারও বলছি। আমার একেবারেই ভালো লাগছে না।

www.BanglaBook.org

যেমন মা, তেমন তো মেয়ে হবে! মুন্নীকে ডাকো। আমি কথা বলবো। কী করে বসবে আবার?

কে জানে! কত ভাল ছেলে-মেয়ে সুইসাইড করে বসে!

মুন্নী ফোনে এলো।

কি রে? কী পাগলামি করছিস তুই? তোর দোষটা কী? তুই যে মাত্র দু'ঘন্টা ঘুমিয়েছিস পরীক্ষার আগে তা কি আর আমরা জানি না? তোর মার্কস দেখিস, খুবই ভালো হবে। দেখিস। কোনো ব্যাপারই নেই।

থমথমে গলায় মুন্নী বললো, বাবা। খাতা দেখাই হচ্ছে না বোধহয়। হলে, ময়না, চিরদীপ, শকুন্তলাদের মার্কস এরকম হত না। কিছুতেই সম্ভব নয়। ইমপসিবল।

খাতা রিভিউ করতে চেয়ে অ্যাপ্লিকেশান করতে বল ওদের।

হুঁ। তুমি তো জানো না। মিতাদি—চারবছর এম. এ. পাশ করে চাকরি করছে, এখনও বি.এর খাতা Review করে ওঠার সময় পাননি তাঁরা। হুঃ।

আরে যাই হোক, খাতাই দেখে না, তা কি হয়? কত ফ্যাকটারস আছে। তুই আমি কি ওঁদের সব খবরই জানি? কেন, যে কী হয়।

কী হবে, কেন?

মুন্নী বললো।

যে ছেলেমেয়ে প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হয় তাদের মধ্যে অনেকে অত খারাপ রেজাল্ট করে কি করে? নিশ্চয়ই পড়াশুনা করে না। আগে যে ভাল ছিলো, পরে সে খারাপ হয়ে যায়, আড্ডাবাজী করে, ইউনিয়নবাজী করে। অন্যের কথা ভাবিস না। নিজের কথা ভাব। তাছাড়া ধর, যদি তোর রেজাল্ট খারাপও হয়, তবুও তাতে কী হবে? জলে পড়বি কি? আমরা তো আছি। S.A.T এ বসবি। সেখানে তো আর অন্যায় হবে না। চলে যাবি STATES-এ।

মুন্নী বললো, নিজের দেশে, নিজের রাজ্যে এমন করে অন্যায় ঘটবে বলে, মানুষ এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন, এমন ক্রিমিনাল, নেগলিজেন্ট হয়ে গেছে বলে, স্বদেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে ন্যায় খুঁজব আমি? না, তা কেন! এখানেই থাকব এবং ঐ মানুষগুলোকে শিক্ষা দেব।

অধৈর্য হোস না মা। যৌবনের সহজ ধর্মই অধৈর্য হওয়া। দ্যাখ, জাত হিসেবে আমরা চিরদিনই ঢিলে-ঢালা, কাজে-ঢিলা, তা বলে ভুলে যাস না যে অন্যেরা বলে "What Bengal thinks today India thinks to-morrow." এও ভুলে যাস না যে, আমরাও একদিন যুবক ছিলাম।

তা ভুলিনি। কিন্তু তোমরা যদি যৌবনের দায়িত্ব-কর্তব্য ঠিকভাবে পালন করতে, যদি দেশের মধ্যে সবরকম অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে, তবে দেশের অবস্থা আজ এমন হত না বাবা। আমরা ছেড়ে দেবো না কাউকেই। তুমি দেখো, দরকার হলে নকশাল আন্দোলনের মতো নতুন আন্দোলন গড়ে তুলে এদের আমরা গুলি করে মারবো। রক্তে স্নান করিয়ে দিয়ে দায়িত্ব-কর্তব্য কাকে বলে এঁদের শেখাব তা নতুন করে।

মুন্নীর কথা শুনে আমার হাত-পা ছেড়ে যাবার যোগাড় হলো।

মুন্নী, তুই মা, ক্যালি-ফস সিক্স-এক্সটা খাচ্ছিস তো নিয়মমত? একটা কাজ করিস। এক শিশি টুয়েলভ-এক্সও আনিয়ে নিস মুন্নী।

আমার বুকের মধ্যেটা ধড়ফড় করছিল।

www.BanglaBook.org

তার দরকার নেই বাবা।

ক্যালি-ফস টুয়েলভ এক্সেও ঘুম আসবে না আমার।

কোনো চিন্তা করিস না মুন্নী। তোর মায়ের কথা ভাব। তোর মায়ের কথা। এটা একটা পাসিং-ফেইজ। কত ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দেয়, সে কথা ভাব তো একবার। বোর্ডের ডিফিকাল্টির কথাও ভাব একবার।

ভেবেছি, আরও একটু দেরি করে রেজাল্ট বের করলেন না কেন বোর্ড? কে, বারণ করেছিল? কেন ইনকমপ্লিট রেজাল্ট বের করলেন? কেন সরকার, সমস্ত কলেজে এখনও ইনস্ট্রাকশান পাঠাচ্ছেন না এই ব্যাপারে?

কিসের ইনস্ট্রাকশান?

যে, যে-সব পরীক্ষার্থী মার্কশিট দেরি করে পাবে, তাদেরও ফর্ম দিতে হবে। পরীক্ষা দিতে দেওয়া হবে ভর্তির জন্যে এবং তার আগে সব আসন ভর্তি করা হবে না।

আরে, দেবে রে দেবে। আমার না হয় কোনোই ক্ষমতা নেই। ক্ষমতাশালী বাবা-মাও তো কম নেই পশ্চিমবঙ্গে। তাঁরা কি আর হাত-পা গুটিয়ে বসে আছেন? দৌড়োদৌড়ি করছেন তাঁরা। তাদের মাধ্যমে সেক্রেটারি, মিনিস্টার, জজসাহেব, অ্যাডভোকেট জেনারেল, মায় চিফ মিনিস্টারের লেভেল পর্যন্ত তদ্বির অবশ্যই পৌঁছে গেছে। তাঁদের সকলের চেষ্টার বেনিফিট তোরাও পাবি, সকলে মানে আমার মতো সাধারণ ক্ষমতাহীন বাবা-মা যেসব ছাত্র-ছাত্রীদের; তারাও।

ছাই পাবে। যাদের খুঁটির জোর আছে তারা পাশও করবে, অ্যাডমিশন পাবে। সবই তো তাদেরই জন্যে।

আমি কবে যাবো জানাস। মার্কশিট পেলেই নগেনকে বলিস, টেলেক্স...

ও পাশে রিসিভারটা নামিয়ে রাখার শব্দ হলো। একটু শব্দ করেই।

দুঃখ পেলাম। এরকম তো ছিল না মুন্নী আগে। ভারী অসভ্য হয়েছে তো! সহবতই যদি না শিখল, তবে পড়াশুনোতে কে কত ভালো তা দিয়ে কি হবে? শিক্ষা আর পরীক্ষার রেজাল্ট তো সমার্থক নয়!

সত্যি ভারী রাগ হলো মুন্নীর উপরে।

আমি রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

BanglaBook.org

॥ ৬ ॥

পাঁড়েজী, এখানকার চীফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট বললেন, বড়ী দেড়তক বাঁতে চলা। কুছ গড়বর-সড়বর হো গ্যয়ী ক্যা?

বললাম, তেমন কিছু নয়। তবে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার রেজাল্ট ইনকমপ্লিট। বারো হাজার নশো ছাত্র-ছাত্রী এখনও মার্কশিট হাতে পায়নি। যারা মার্কশিট পায়নি তাদের সব কলেজই ফিরিয়ে দিচ্ছে। অ্যাডমিশান টেস্টেই বসতে দিচ্ছে না। ফর্ম দিচ্ছে না। বোধহয় যাদবপুরই একমাত্র ব্যতিক্রম। মার্কশিট পেতে পেতে ভর্তি হবারই সময় পার হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। চাপে পড়ে, এখন যা-তা নম্বর দিয়ে মার্কশিট ভরানো হবে বলে আশঙ্কা করছেন অনেকেই। অনেক ভালো ছেলে-মেয়ের মার্কস দেখে এমন আশঙ্কাও করা হচ্ছে যে, খাতা দেখাতে বা ট্যাবুলেশানে হয়তো কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। অথবা খাতা হয়তো ভালোভাবে দেখাই হয়নি।

www.BanglaBook.org

পাঁড়েজী, হাসলেন। বললেন, আপলোগোকাঁ বংগালকা হালত আভি অ্যায়সা হুয়া হ্যায়? বড়া দুখকি বাত। হামারা পিতাজী নে কেলকাটা য়ুনিভার্সিটিকি স্টুডেন্ট থে। উও জমানা দুসরা থা। ক্যা নাম থা!

একটু চুপ করে থেকে আমাকে চুপ দেখে বললেন, আচ্ছা নীলুবাবু আপনাদের এই কলকাতাতেই না পাঁচ পয়সা ট্রাম ভাড়া বাড়ার জন্যে আন্দোলন হয়েছিল; গুলি চলেছিল, ট্রাম পুড়েছিল। আর এমন একটা সাংঘাতিক ব্যাপারে কেউ কোনো প্রতিবাদ করছেন না? বিদ্রোহী, রেভল্যুশানারী বাঙালিদের কি এই অবস্থা হয়েছে এখন? যাঁরা তখন আন্দোলন করেছিলেন তাঁরা এখন কোথায়?

কী বলব পাঁড়েজীকে?

কথাটা অপমানজনক হলেও সত্যি তো বটেই।

বললাম, জানি না পাঁড়েজী। গদীর এমনই কিছু গুণ আছে, হয়তো ক্ষমতারও যে; তা মানুষের বিবেককে মেরে ফেলে, তার জায়গাতে ক্ষমতা, আরো ক্ষমতার লোভ ভরে দেয়। অন্ধ, কানা, চলচ্ছক্তিহীন হয়ে যায় বিপ্লবী। পরম তৃপ্ত। নিজেদের কোনোরকম দোষ-ক্রটিই আর তাদের চোখে পড়ে না।

স্টুডেন্টরা বিপ্লব করুক। প্রতিবাদ করুক। বাবা-মায়েরা সকলে মিলে পথে নামুন আপনারা সকলে মিলে! আমাদের পটনা হলে দেখতেন। বিহারও আপনাদের শেখাবে এখন।

আমি মাথা নাড়লাম। মুখে কিছু বললাম না।

মুন্নী কি নুটুনুটু, এরা সব অন্য প্রজন্মর ছেলে-মেয়ে। ওদের বুঝতে পারি বলে মনে হয় বটে আমাদের, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারি যে, আসলে আদৌ বুঝি না। ওরা অনেক চুপচাপ, কিন্তু অনেক বেশি জেদী। "চলবে না, চলবে না" আর "গুঁড়িয়ে ফেলো, ভেঙে ফেলো" দেখে দেখে আর শুনে শুনে ওরা ক্লান্ত। কৃত্রিম কণ্ঠস্বরে ক্লান্ত। মুখোশে ক্লান্ত। ওরা অন্য কিছু করতে চায়, যা ভান বা ভণ্ডামি; যা সৎ, যা সত্য, যা প্রবল; এমন কিছু। মুখোশগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিতে চায় ওরা।

॥ ৭ ॥

তবে বোর্ডের অফিসে শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত আমাদের সঙ্গে খুবই ভালো ব্যবহার করলেন। তবে তিনি যতই করুন, কম্প্যুটারই তো সব গোলমালের মূলে। এরকম অব্যবস্থার জন্য যারা দায়ী তাদের খুঁজে বের করে শাস্তি কি দেওয়া যায় না? ছেলেমেয়েদের মা বাবাদের কী অবস্থা! কত ছেলেমেয়ে কলেজে ঢুকতেই পারবে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইনস্ট্রাকশন দেওয়া কেন হচ্ছে না বাবা?

আরও তিনটি দিন কেটে গেল। কোনো ফোন নেই। নগেনের টেলেক্সও এলো না। আজ সপ্তম দিন। আজ সকাল থেকেই মনটা বড় উচাটন হয়েছিলো। অফিসে এসেই পাঁড়েজীকে বললামও। সবই বললাম খুলে। উনি বললেন, আমি ম্যানেজ করে নেবো এদিকটা। একমাত্র সন্তানের মামলা, না গিয়ে কী করবেন? আপনি কলকাতাতে পৌঁছেই একটি ছুটির দরখাস্ত দেবেন ওখানে। মেডিক্যাল সার্টিফিকেট আমি এখান থেকেই করিয়ে দেব। ডাক্তারের নির্দেশেই আপনাকে চলে যেতে হয়েছে এমন কথাই বলব, আমার কাছে কেউ জানতে চাইলে।

www.BanglaBook.org

খুবই ছোট লাগল নিজেকে। এমন তঞ্চকতা করিনি কখনও আগে। এও তো এক ধরনের নীচতা, শঠতা; মিথ্যাচার, কর্তব্যহীনতা। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের, সিসটেম-এর বিবেকহীনতাই যে এর মূলে? আমি ন্যায্য কারণে ছুটি চাইলে এবং তা দিলে আমার তো মিথ্যাচার করতে হতো না!

ভাবছিলাম, নিজেদের জীবনের অনেক এবং অনেকরকম সমস্যারই সমাধান করা যায় না কিন্তু সন্তানদের সমস্যার সমাধান না করতে পারলে মা-বাবা হিসেবে বড়ই অসহায় বোধ করতে হয়। যেখানে ওদের কিছুমাত্রই দোষ নেই অথচ মুষ্টিমেয় মানুষের অভাবনীয় দায়িত্বজ্ঞানহীনতাতে এমন ক্যালাস ঘটনা ঘটতে পারে এবং শুধু ঘটতে পারে যে তাই নয়, তার পরেও তাদের নির্লজ্জ "could not careless" attitude সত্যিই জ্বালা ধরিয়ে দেয় মনে।

জানি না। আর. ভাবতে পারি না। যেসব ছেলেমেয়ের ফল অসম্পূর্ণ আছে তাদের বাবা-মায়েরাই শুধু জানবেন আজ আমার মনের মধ্যে কী হচ্ছে। অসহায়, খুঁটির জোর না-থাকা, সাধারণ বাবা-মায়েদের কথা শুধুমাত্র তাঁরাই জানেন, জানবেন।

॥ ৮ ॥

আজ নবম দিন। ফোন করেছি রোজই। রোজই খারাপ খবর। মুন্নীর ফোন আসছে না। রিমার প্রেসার আরও বেড়ে গেছে। ডঃ মিত্র একেবারে শয্যাশায়ী থাকতে বলেছেন।

অথচ এ সবের কিছুর জন্যেই আমাদের কারোই অপরাধ নেই। কোর্টে কেস করে দেওয়া উচিত প্রচণ্ড ক্ষতিপূরণ চেয়ে, ইংজাংশান চেয়ে। সমস্ত ছেলেমেয়েদের মার্কশিট তাদের হাতে না-আসা অবধি সব কলেজ ভর্তি বন্ধ রাখবে, এই দাবিতে। কিন্তু কেস কে করবে? প্রতিটি কাগজে সংসদ আর বিধানসভায় জুতো ছোঁড়াছুঁড়ির খবর। কিন্তু মুন্নীদের ব্যাপারটা একটা খবরই নয়।

ধন্য নব্য সাংবাদিকতা! ধন্য খবরের কাগজের মালিক আর সম্পাদকেরা!

ধন্য! ধন্য! ধন্য!

॥ ৯ ॥

ট্রেনটা, ফর-আ-চেঞ্জ-সকালে সময়মতোই পৌঁছল হাওড়াতে। আমার বগিটা ছিলো প্ল্যাটফর্মের পেছনের দিকে। ট্যাক্সির যা লম্বা লাইন দেখলাম, তাতে বুঝলাম একঘণ্টা কম করেও লাগবে। বেশিও লাগতে পারে। প্রাইভেট ট্যাক্সি এবং পুলিশকে টাকা-দেওয়া হলুদ-কালো ট্যাক্সিও সামনেই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু যে টাকা তারা চায়, তা দেওয়ার সামর্থ্য আমার নেই।

পুলিশ সবই জানে। দমদম এয়ারপোর্টে, হাওড়া স্টেশানে রোজই এই ছবি। আমরাও সব জানি। বছরের পর বছর ধরে এই চলছে। কিন্তু গণ্ডারের চামড়ার আমরা একদিনও এক মুহূর্তের জন্যেও সমবেত হয়ে পুলিশদের কলার ধরে বলতে পারিনি যে, ওহে জনগণের সেবক, শুনুন। আমাদেরই পয়সায় মাইনে পান, আমাদের দেখাশোনার দায়িত্বেই বহাল আছেন আপনারা। সেবা যাকে বলে, তাই করুন। বলতে পারি না, ওহে এম.এল.এ. এখন কিছু করুন। পয়সা তো অনেকই বানালেন এবারে কাজ কিছু করুন।

কিন্তু কে করবে? কে বলবে? "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে

www.BanglaBook.org

যেন তৃণসম দহে।" আমাদের যে সময়ই নেই! আমরাও যে অন্য নানাবিধ ধান্দাতে নিজেদের পকেট ভারী করার মতলবে সদাই ঘুরি। আজ আমার সত্যিই সময় নেই। আমি এও জানি যে, পরের বার যখন হাওড়া স্টেশনে এসে নামব তখনও আমার সময় থাকবে না। অন্য কারোই থাকে না। প্রতিকার করবেটা কে? বা কারা? আমরা যে কুকুর-বেড়াল হয়ে গেছি। মুন্নী আর তার বন্ধুরা হয়তো করতে পারে। কিন্তু কবে? কী করে? এই দেশ, এই রাজ্য তো ওদেরই মতো আমাদেরও। আমাদেরও কি করণীয় নেই কিছুমাত্র?

মনে মনে আমি বলি, করবে করবে। মুন্নীরা আর ওদের বন্ধুরাই করবে। চলবে না এই নৈরাজ্য আর বেশিদিন। তোমারে বধিবে যারা, গোকুলে বাড়িছে তারা।

বাসেই উঠে বসলাম, হেঁটে এসে। ছোট্ট একটি ওভারনাইটার ছিল সঙ্গে।

মোড়ে নেমে, বাড়ির কাছাকাছি এসে দূর থেকে দেখি, গলিতে চার-পাঁচটি প্রাইভেট গাড়ি।

মনটা আনন্দে ভরে গেল। নিশ্চয়ই মার্কশীট পেয়েছে মুন্নী। হয়তো দারুণ ভাল ফল হয়েছে।

ওই গাড়িটা কার? ভড় সাহেবের না? তাই তো। ঐ গাড়িটা দেখেই আমার সন্দেহ হলো। উনি কেন? মুন্নীর মার্কশিট পাওয়ার আনন্দে, তার দুর্দান্ত ফল করার আনন্দের উৎসবে তো তাঁর আসার কথা নয়! তিনি কোনোদিনও আসেননি আমার এই দীনাবাসে। তাছাড়া, আমি এখন ঢুকবই বা কি করে? উনি যতক্ষণ আছেন, ঢুকতেও যে পারব না। মেডিক্যাল সার্টিফিকেট তো নিয়ে এসেছেন পাঁড়েজী। এখন পাঠাতেই যা দেরী।

আসলে, ভড়সাহেব মানুষটিকে যতখানি খারাপ ভাবি, ততখানি খারাপ হয়তো নন। আমি আসতে পারিনি, ওঁরই জন্যে; তাই হয়তো মেক-আপ করার জন্যে এসেছেন।

বাঃ। ইটস ভেরী নাইস অফ হিম।

এতোজনে এসে পড়েছেন আমার পাখির-বাসায় আর শুভদিনে খালি হাতে বাড়ি ঢুকব? যখনই ঢুকি না কেন। ময়রার দোকানে ফিরে গেলাম। পকেটে একটিই একশো টাকার নোট ছিল।

বললাম, মতি, ভাল সন্দেশ দাও, একেবারে ভোর-রাতে বানানো।

মেয়ের গর্বে আমি যে গর্বিত এই কথাটা আমার মুখে-চোখে চাপা ছিলো না।

মতি আমার মুখে তাকাল একবার তারপর আমার বাড়ির দিকেও তাকাল।

তাকিয়েই বলল, মুখ নীচু করে; সকালে এতো মিষ্টি নিচ্ছেন যে নীলুদা?

আরে মুন্নী, তাকে তো তুমি চেনোই না, আমার মেয়ে গো! তার যে আজ রেজাল্ট বেরিয়েছে। খবর পেয়ে এসেছেন সবাই। মিষ্টিমুখ তো করাতেই হয়!

মতি আমার দুচোখে তার দুচোখের মণি ফেলে চেয়ে রইলো ফ্যাল ফ্যাল করে।

তারপর, একটু গলা খাঁকরে বলল, নীলুদা, এখন ঠিক তেমন ভাল মিষ্টি নেই। মানে, কারখানা থেকে আসেনি। তবে এসে যাবে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই। আপনি টাকাটা রাখুন বরং। মিষ্টি এলেই আমি ফটককে দিয়েই আপনার ওখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি। "মুন্নী তো আমাদেরও কেউ হয়, না কি? আজকেরটা না হয়...এমনিই। টাকা দেবেন না। আমিই..."

আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। শুধু আমি, একাই নই, আমাদের পাড়ার লোকও যে মুন্নীকে নিয়ে এতোখানি গর্বিত, তা আগে জানিনি।

আবেগে আমার গলার কাছে দলা পাকিয়ে এলো।

একগাল হেসে বললাম, ঠিক আছে। পাঠিয়েই দিও। থ্যাঙ্ক উ্য।

www.BanglaBook.org

সিঁড়ি থেকে নামতে নামতে দাঁড়িয়ে পড়ে বললাম, একদিন ঘনিষ্ঠদের ডেকে ডাল-ভাত খাওয়াব মতি। সেদিন তোমাকেও বলব। ফটকেকেও। আসতে হবে কিন্তু। কোনো কথাই শুনব না।

মতি সেইরকমই কাঠ-কাঠ গলাতে বললো, নিশ্চয়ই দাদা। বলবেন, অবশ্যই আসব।

আমি ওর দোকান থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে এগোলাম। এবারে দেখলাম, বাড়ির সামনে যেন একটা জটলা মতোও হয়েছে। একজন দু'জন করে লোক ফোঁটা ফোঁটা ঘামেরই মতো সেখানে জমছে, জমছেই...আমাকে দেখেই ওরা এদিকেই, মানে আমার দিকেই এগিয়ে আসতে লাগলো।

॥ ১০ ॥

দোকান ফাঁকা, হতেই, মতি নীচু গলাতে বললো, ফটকে, মদনাকে এই টাকা দিয়ে আসিস। সাদা পদ্ম আর রজনীগন্ধা রেডি করে রাখবে। লাশ-কাটা ঘর থেকে বডি বাড়িতে ফিরে এলেই ...

লাশ-কাটা ঘর?

ফটকে বললো।

আপনি পাগল হয়েছেন বাবু! গেছেন কখনও সেখানে? উঃ বাবা! সেখানে একবার ঢুকলে ক'দিন পর ফেরৎ যাবে তা বডি তা কে জানে! ফুলে-ফেঁপে ঢোল হয়ে কাটা-ছেঁড়া শরীরটা যখন ফেরৎ পাওয়া যায় তখন আর বাড়িতে তাকে আনাই যায় না! মা-বাবা দেখবে ঐ দশা! ফুলের মতো মেয়ের? সোজাই শ্মশানে নে-যাওয়া ভাল। হ্যাঁ। তবে যদি কেউ জানাশোনা থাকে পুলিশে, রাইটার্সে, সেক্রেটারি, মন্ত্রী, তাড়াতাড়ি হতেও পারে। নইলে, কোনো চান্সই নেই।

নীলুদা বোধহয় যখন ট্রেনে চেপেছে খবর গেছে তার পরে নিশ্চয়ই। বেচারা জানেন না কিছুই। হায় ভগবান!

মতি স্বগতোক্তি করলো।

মেয়েটা এসবের কিছু তো জানতো না। মানে যে, তাকে কাটাকুটি করা হবে। মরেও যে মুক্তি নেই এখানে, শান্তি নেই, শ্মশানেও যে কত নোংরা, কী জঘন্য পরিবেশ, ভিখিরি, মস্তান, শ্মশানের বাবুদের, পুরুতের ধমকানি, তা ও বেচারা জানবে কী করে! গত মাসেই তো কাকাকে পোড়ালাম না বাবু? সেসব জানলে, ও মেয়ে মরতেই চাইত না। তাছাড়া মরলি, মরলি, তো শিরা কেটে! ঈসস! কী বীভৎস!

মতি বললো, হয়তো মার্কশিটও পাবে, হয়তো ছাব্বিশ তারিখের আগেই পাবে কিন্তু তার কী হবে? সব তো শেষ হয়ে গেলো। চিন্তায় চিন্তায় মেয়েটা শেষ হয়ে গেলো।

মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় কি জানেন বাবু?

মতি বললো, কি?

রসগোল্লার জালের জ্বলন্ত চ্যালাকাঠ একখানা বের করে নে গিয়ে যারা ইজন্যে দায়ী, সি শালাদের মুখের মধ্যে পুরে দিই।

চুপ কর। কথা ভালো লাগছে না এখন।

মতি অন্যমনস্কভাবে বললো।

তারপর মনে মনেই বললো, ক'জনের মুখে জ্বলন্ত চ্যালাকাঠ ঢোকাবি রে তুই ফটকে? ওরা যে রাবণের গুষ্টি! রাবণের গুষ্টি!

www.BanglaBook.org

সগর রাজা

দিদি, জামাইবাবু গেলেন কোথায়? এখনও এলেন না তো। তিনটে বাজতে চললো। শরীর ভেঙে যাবে যে! খাবেন কখন?

প্রথমা বললেন, তোর জামাইবাবুর শরীর পাথরে তৈরি। যম ভাঙলেও ভাঙতে পারে, সে ভাঙার পাত্র নয়।

রিটায়ার্ড মানুষ, সারাদিন করেন কী? বলছিলে তো বেরিয়েছেন সেই সকাল পাঁচটাতে!

হ্যাঁ। একটা ডিম-এর পোচ আর এক কাপ চা খেয়ে বেরিয়ে যান। আর ফেরার কোনওই ঠিক নেই।

কী করবেন এত টাকা? এখন প্রয়োজনটা কী?

টাকার জন্যে করেন না, যা করেন বরং গ্যাঁটের কড়ি খরচ করেই করেন।

সোশ্যাল ওয়ার্ক? মিশনারিজ অফ চ্যারিটিজ-এর ব্রাঞ্চ আছে বুঝি?

না। তা নয়। তবে অন্য কিছু। ওয়ান-ম্যান-টুসি। ওয়ান-ম্যান মিশান।

কী যে হেঁয়ালি করো দিদি! বুঝি না আমি! তুমি বলো না কিছু? ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান বলে।

বলে, কী হবে! চিরদিনই তো ওই রকমই।

মনে হচ্ছে, তোমার খুব রাগ।

কার উপরে?

জামাইবাবুর উপরে।

অনুরাগ তো কোনওদিনও ছিলো না।

তা বলে, বিরাগ ছিলো বলেও তো জানিনি।

না। তাও বলতে পারি না।

www.BanglaBook.org

তবে?

দ্বিতীয়া বললো।

বলবো, এক ধরনের উদাসীনতা ছিলো। না ছিল অনুরাগ; না বিরাগ।

প্রথমা বললো।

তবে? রিটায়ার্ড করেছেন সাত বছর হলো। শালিখ এত ভাল হয়েছে, স্টেটসএ এত বড় চাকরি করছে। ফিঙের বিয়ে দিলে জামশেদপুরে। ব্রিলিয়ান্ট জামাই। তোমাদের তো এখন ইটারনাল হানিমুনই করার কথা।

হানিমুন যারা করে তারা বিয়ের পরদিন থেকেই করে। তোদেরই মতো। সময়ে শুরু না করলে আর হানিমুন করা যায় না।

বিয়ের পর পূর্ণচন্দ্রে বেড়াতে গেলেই কি আর মধুচন্দ্রিমা হয় দিদি! বিয়ের পরে পরে ও বলত, "মানিব্যাগে মানি নেই, হানিমুনে হানি।"

ক'বছর যেন হলো তোদের?

দেখতে দেখতে ন'বছর।

দশ বছরে পার্টি দিবি না?

কিসের পার্টি? মারামারির? ভুল বোঝাবুঝির?

আহা! সকলেই যেন তোর জামাইবাবুর মতো বেরসিক?

সকলেই সমান দিদি। কারও রাগ দেখা যায়, আর কারও রাগ অন্তঃসলিলা, এই যা!

বলিস কি রে! বিজনকে দেখে তো বোঝা যায় না। এমন ভালমানুষ ছেলে। মুখে রা'টি নেই।

পরের বরকে কে আর কবে বুঝেছে বলো দিদি।

গুর্জরি তো অন্য কথা বলে।

কে গুর্জরি?

পাশের বাড়ির। আমাদের নেবার। তোরই মতো বয়সী হবে।

কী বলেন তিনি?

সে বলে, পরের বরকে বোঝা যত সোজা নিজের বরকে বোঝা তার চেয়ে অনেকই বেশি কঠিন!

ম্যাদামারা, অফিস করেই ফুরিয়ে-যাওয়া স্বামী হলে অন্য কথা। তবে রিয়্যাল এনার্জেটিক, সাকসেসফুল পুরুষ হলে, সে অন্যের স্বামীই হোক, কী ব্যাচেলর, তাদের বোঝার চেষ্টাতেও আলাদা উন্মাদনা আছে।

দ্বিতীয়া বললো।

যা বলেছ দিদি!

বাবা! দিতু, তোর মধ্যে যে এমন আগ্নেয়গিরি ছিল, তা তো আগে আদৌ জানতে পারিনি আমরা কেউই।

জানবে কী করে। আগ্নেয়গিরি মাত্রই হাজার হাজার বছর ঘুমোয়। কুম্ভকর্ণের বাবা সব। তার জ্বালামুখের জ্বালা যখন চরমে ওঠে তখনই না সে জেগে উঠে ভিতরের লোহা পাথর সব গলিয়ে উৎসারিত, উৎক্ষিপ্ত করে।

তোমাদের এই চিত্তরঞ্জন জায়গাটি কিন্তু ভারী সুন্দর হয়ে গেছে। দেখলেও ভাল লাগে। কী করে এমনটি হলো বল তো?

www.BanglaBook.org

ভালো করে চোখ চেয়ে দেখেছিস কি সৌন্দর্যের কারণটা কী?

চোখ না চেয়েও বলতে পারি। আগে ছোট্ট "ডি" টাইপ না "ই" টাইপ কোয়ার্টারে থাকতে তোমরা। এখন নিজেদের কী সুন্দর বাংলো।

সেটা তো হলো শুধু আমাদের বাংলোর কথা। তুই তো পুরো চিত্তরঞ্জনের সৌন্দর্যের কথাই বলছিস। তাই তো?

বোধহয় তাই-ই! আজ সকালে ট্রেন থেকে নেমেই মনে হলো তোমাদের এখানে যেন কোনও বিপ্লব ঘটে গেছে। নীরব কোনও বিপ্লব। লাল শালুর ব্যানার নিয়ে শোভাযাত্রা হয়নি, অন্য কোনও ব্যানার নিয়েও নয়; লাঠি বা গুলিও চলেনি। অথচ এখানে অবশ্যই ঘটেছে কিছু।

বলেই বললো, আমি কিন্তু খুব রাগ করেছি, জামাইবাবু তার একমাত্র শালীকে স্টেশানে নিতে আসেননি বলে!

দ্বিতীয়া বললো।

হুঁ। রাগ তো হওয়ারই কথা। তবে একমাত্র শালী বলেই হয়তো যায়নি।

প্রথমা হাসছিলেন।

বললেন, বলেছিস ঠিকই। বিপ্লব একটা ঘটেছে। কিন্তু সেটা কী তা বল দেখি। কিসের বিপ্লব?

দাঁড়াও। এখুনি বলতে পারবো না। ভাবতে দাও। একদিন সময় দাও, ভেবে বলবো।

বিশ্রাম করবি না? ঘুমুবি নাকি একটু? খাওয়ার পরে গড়াস না একটু ছুটির দিনে?

দুপুরে? নাঃ বাবা। মুটিয়ে যাব। তুমি কি দুপুরে ঘুমোও নাকি আজকাল?

আমি? হ্যাঁ ঘুমোই।

সত্যি! তোমার কী সুন্দর ফিগার ছিল দিদি। যখন গীতবিতান থেকে ফিরতে, পাড়ার মোড়ে রতনদাদারা ধ্বপাধ্বপ পড়ে যেত তোমাকে দেখে।

আমাদের সময়টাই অন্যরকম ছিলো। কত ভদ্র-সভ্য ছিলো মানুষ। রূপগুণের অ্যাডমিরেশানের রকমটাও অনেক আলাদা ছিলো। অন্যকে 'পেড়ে' না ফেলে নিজেরাই পড়ে যেত! বল?

যাই বলো, তুমি সত্যিই কিন্তু ভীষণ মুটিয়ে যাচ্ছ। হচ্ছিল তোমার ফিগারের কথা। কোন কথাতে চলে এলে!

হেসে ফেললেন প্রথমা।

বললেন, হ্যাঁ। বলতে চেয়েছিলাম যে, যতদিন দেখার লোক থাকে, তোর দিকে অ্যাডমায়ারিং চোখে চেয়ে দেখার লোক; আশা থাকে, ভবিষ্যৎ থাকে, ততদিন ফিগার-টিগারের মতো এই সব বাহুল্য নিয়ে মেতে থাকাটা শোভা পায়। এখন আমার ফিগার কেমন তার চেয়েও অনেক বড় কথা আমার কাছে, আমার বাত আছে কি নেই? আর্থরাইটিস, রিউম্যাটিজম; ডায়াবেটিস আছে কি নেই? ব্লাড প্রেসার ফ্লাকচুয়েট করে, কি করে না! তাছাড়া, আমার শরীরের দিকে আর কোনও পুরুষই তো উৎসুক চোখে তাকায় না, ফিগার ভাল রেখে লাভ কী?

তোমার সঙ্গে কথা বলাই মুশকিল। পুরুষেরা তো অধিকাংশই শুয়োর, নয়তো গাধা। ওরা আবার সৌন্দর্যর আসল পূজারী কবে থেকে হলো!

তুই তাহলে আসল পুরুষ দেখিসনি।

www.BanglaBook.org

নকলের সঙ্গে দিন কাটাই, নক্কালদের ভিড়ে আসল দেখার সময় হলো কোথায়?

তোর সঙ্গে কথা বলাই মুশকিল। আমার বয়সে এসে পৌঁছো, আমার কথা বুঝবি। কেমন ফালতু ফালতু লাগবে নিজেকে। আর কারওই কোন প্রয়োজনে তো লাগবি না। ছেলের তোকে দরকার হবে না, বৌমাই তার সব। মেয়েরও তোকে দরকার হবে না, জামাইই তার সব হবে। তাদের ভবিষ্যৎ, তাদের Spouse এর কেরিয়ার, তাদের উন্নতি, তাদের ছেলে-মেয়ের স্কুলিং, তাদের সেকেন্ড জেনারেশনের ভবিষ্যৎ নিয়েই তারা চব্বিশ ঘণ্টা ব্যতিব্যস্ত থাকবে। একটা সময়ে, আমাদের জীবনে যে ওদের চিন্তাটাই আমাদের সব কিছু ছিলো; সর্বস্ব, ওরা ছাড়া আমাদের অন্য কোনও অস্তিত্ব ছিলো না, এই কথাটা যখন ছেলেমেয়েরা অবলীলায় ভুলে যাবে, তখন খুবই রাগ হবে নিজেদের উপরে। মুর্খ বলে মনে হবে। কিন্তু এখন করার আর কী আছে বল? ওদের ভালই তো আমাদের ভালো। এই কথা বুঝিয়ে মনকে চোখ ঠারি। কিন্তু ওদের ভালোটা যে আমাদের ভালো নয়, সে-কথাটাও প্রাঞ্জলভাবে বুঝতে পাই।

দুপুরে ঘুমোও? তুমি? রোজ?

রাতে যে ঘুম হয় না?

কেন?

আমার বয়সে পৌঁছো, জানবি। সারা রাতই প্রায় জেগে থাকি। হাই তুলি। নানা কথা ভাবি। শালিখ আর ফিঙের ছেলেবেলার কথা মনে হয়। তোর জামাইবাবুর প্রথম যৌবনের কথা। মানুষটার আমাকে ছাড়া এক মুহূর্ত চলত না। এখন ওর আমাকে শারীরিক ভাবে তো নয়ই, মানসিক ভাবেও আর কোনও প্রয়োজন নেই। নিজের জগতে বুঁদ হয়ে থাকে।

আমার কিন্তু এবারে রাগ হয়ে যাচ্ছে দিদি!

হঠাৎ? কেন? কার উপরে?

জামাইবাবুর উপরে? এসেছি প্রায় আট ঘণ্টা। তিনি তো জানেন যে, আমি আসবো।

জানে বইকি। সেই তো স্টেশানে পাঠালো আমাকে। নিজে বাজার করেছে সাত-সকালে উঠে। আশ্চর্য! তুই কী কী খেতে ভালবাসিস সব এত বছর পরেও মনে করে রেখেছে কিন্তু। আমি ভুলে গেছি যদিও।

সত্যি? যেমন?

খেলি তো! যেমন চিংড়ি মাছ, যেমন ভেটকি মাছের কাঁটা-চচ্চড়ি, যেমন ধোকার ডালনা, যেমন ছানার পায়েস।

সত্যি! মনে রেখেছেন জামাইবাবু!

দেখলাম তো যে, রেখেছে।

কিন্তু গেছেন কোথায় তাও কি বলে যাননি? তোমাকে কোনওদিনও কি বলে যান না?

নাঃ। তবে সম্ভবত কচি ব্যানার্জীর বাড়িতে গেছে। বন-মহোৎসবের পরে।

ও হ্যাঁ, এখন তো অরণ্য সপ্তাহ, না কী যে চলছে কলকাতায়। মোড়ে মোড়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হোর্ডিং দেখি।

শহরের মোড়ের হোর্ডিং-এ অরণ্য সপ্তাহ?

হ্যাঁ। নইলে ভোটাররা জানবেন কেমন করে?

কিন্তু কচি ব্যানার্জীর বাড়িতে কী? কে তিনি?

তাঁর স্ত্রীর বয়স কম। শরীরের বাঁধুনি ভাল। লাস্যময়ী। চাইনিজ রাঁধেন ভালো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জামাইবাবু কী চাইনিজ খাবেন ওঁর বাড়িতে?

হেসে বললো, দ্বিতীয়া।

কী কী খাবেন অথবা খাবেন না তা আমি কী করে বলবো! কিছুমাত্র নাও খেতে পারেন। চোখে দেখার সুখও তো একটা মস্ত বড় সুখ, না, কি? দর্শনের সুখও কী বড় কম হলো এই বয়সে! একটু কথা বলার, একটু কাছে থাকার...

আহা! সে সুখ তো সব বয়সেরই।

মনের মতো মানুষ যে সব সময়েই অন্য মন খুঁজে বেড়ায়।

কিন্তু তুমি মানা করো না?

মানা? কেন, মানা করবো কেন?

আমার মধ্যে, আমার শরীর-মনে কত অপূর্ণতা। তা নিয়েই তো মানুষটা চাঁদমুখ করে জীবন কাটিয়ে গেলো। বিধাতা যদি আমাদের "পূর্ণা" করেই সৃষ্টি করতেন তবেও তো না হয় অন্য কথা ছিলো। অপূর্ণতাই তো নারী ও পুরুষের জীবনের সার কথা; অমোঘ নিয়ম। পরিপূরক হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টাই তো সারা জীবনের সাধনা। পূর্ণতা তো ব্যতিক্রম! একটা Concept মাত্র। কথার কথা। বাংলাতে বললে 'সংজ্ঞা' বা 'আদর্শও' বলা যেতে পারে।

সুন্দর বলেছ দিদি। এমন করে তো ভাবিনি কখনও।

॥ ২ ॥

ওদের খাওয়া হয়ে গেছিলো অনেকক্ষণ। প্রথমা এবারে একটু শোবেন। প্রতি রবিবার দুপুরে রেডিওর নাটক শোনেন। ভাল বাংলা ছবি থাকলে বিকেলে দেখেন। উত্তমকুমারের ছবি থাকলে তো দেখেনই!

একটা হাই তুলে প্রথমা বললেন, আমি তাহলে গিয়ে শুই একটু?

শোও।

তুই কী করবি?

ভাবছি। যা গরম!

তোদের এয়ারকণ্ডিশানড ঘরে থাকা অভ্যেস। পুজো থেকে দোল অবধিই এখানে ভাল সময়। তবে এখন গুমোট হয়ে আছে তাই। বৃষ্টি হলেই দেখবি প্লেজেন্ট হয়ে যাবে।

BanglaBook.org

ওটা কী গাছ দিদি?

কোনটা?

ঐ যে।

ওটা, কেসিয়া নডুসা।

একটি বইয়ে পড়েছিলাম কেসিয়া নডুলাস।

জানি না। লেখক নুডলস খেতে খেতে লিখেছিলেন হয়তো। অমন নাম তো শুনিনি। নিশ্চয়ই ভুল লিখেছিলেন। সর্বজ্ঞ তো কেউই নন। তবে আমার তো সবই শোনা বিদ্যে। তোর জামাইবাবু এলে ঠিক বলতে পারবেন।

তোমার ইন্টারেস্ট নেই গাছ-গাছালিতে?

আছে। অত বড় বড় গাছ নয়। আমার শ্রাবস, ফার্নস, অর্কিডস, সাকুলেন্টস, ব্রমেলিয়াডস এসব ভালো লাগে।

এমন সময়ে কাঁকুড়ের পথে একটি সাইকেলের টায়ারের কিররররর, আওয়াজ শোনা গেলো। তারপর গেটটা খোলার আওয়াজ। সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে জামাইবাবু

www.BanglaBook.org

ঢুকলেন।

দ্বিতীয়াকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন, গিরিজাপ্রসন্ন, এই যে অদ্বিতীয়া। কী খুশি যে হলাম। তোমার ওল্ড ফ্লেমকে মনে পড়লো তাহলে! বাবাঃ, আমার একটা মাত্র শালী। দুদিন না দেখতে পেলেই বুকের মধ্যেটা কেমন করে ওঠে।

ঢং করবেন না। ন বছর পরে। তাও আমাকেই আসতে হলো।

বুড়ো মানুষকে ক্ষমা করে দিও।

দ্বিতীয়া দাঁড়িয়ে উঠে বললো, বুড়ো বলে তো মনে হচ্ছে না একটুও। দিদিই বরং বুড়িয়ে গেছে।

আহা বেচারা! ওর যে কত স্যাক্রিফাইস। ছেলে মেয়েকে শরীরের সৌন্দর্য দিয়েছে, রক্ত মাংস; মনের ভালোবাসা; এমন হনুমানের মতো স্বামীর অত্যাচার সহ্য করেছে সারাটা জীবন। কিন্তু কই? আমি তো আমার বৌকে ইয়াংই দেখি। সেই ফুলশয্যার রাতেরই মতো। আসলে, সেই সালঙ্কারা চেহারাটা, সেই সুগন্ধি স্মৃতিটাই জ্বলজ্বল করে কিনা।

সাইকেলটা রেখে এসে প্রেমের কথাগুলো বললে হত না! যত্ত ঢং।

প্রথমা বললেন।

গিরিজাপ্রসন্ন গ্যারাজের মধ্যে সাইকেলটা ঢুকিয়ে রাখলেন।

দ্বিতীয়া দেখেছিলো যে একটা স্কুটারও আছে। গাড়ি বিক্রি করে দিয়েছেন সম্ভবত ফিঙের বিয়ের সময়ে। অবস্থা পড়ে গেলে, রিটায়ার করলে, অধিকাংশ মানুষেরই মনে নানারকম কমপ্লেক্স জাগে। দিদি জামাইবাবুকে ব্যতিক্রম বলে মনে হলো দ্বিতীয়ার।

খাবে তো? নাকি, মণি খাইয়ে দিয়েছে?

কোন মণি? নয়নমণি? না ফণী রায়ের মণি?

ঢং। যেন জানো না!

ও। বাঁড়ুজ্যের বউয়ের কথা বলছ? পরশমণি?

আজ্ঞে।

কিন্তু আমার যে ছোঁওয়াবার মতো আর কিছুমাত্রই নেই যে সোনা করব ছুঁইয়ে! তা, কী আর খাওয়াবে সে?

আপনি নাটকের দলে নাম লেখান না কেন জামাইবাবু?

কেউ যে ডাকল না। সারাটা জীবন তো মহড়াই দিয়ে চলেছি।

কী খেয়ে এসেছ তার বাড়িতে?

প্রথমা জিগ্যেস করলেন।

কেন? ডাল-ভাত, রুটি-মাংস।

দেখেছ ডার্লিং অদ্বিতীয়া। তোমার দিদির কী রসজ্ঞান! যদি খাওয়াবেই, পরশমণি, নয়নমণিই; তবে ওই সব সাদামাটা ডাল-ভাত-মাংসের ছাঁট কোন দুঃখে খেতে যাব। আমি কী ডালমেশিয়ান কুকুর? না স্পিৎজ? খাওয়াবেই যদি তো...

তুমি কী বলো, ডার্লিং?

তুমি যদি কোনওদিন কোন পরপুরুষকে কিছু খাওয়াবে বলে মনস্থ করো তবে কী তুমি ডাল-ভাত ছাড়া অন্য কিছু খাওয়াবার কথা ভাববে, না ভাববে না?

দ্বিতীয়া হেসে ফেললো।

বললো, চলুন হাত ধুয়ে নিন। আমি আগে খেতে চাইনি। দিদিই বললো যে, আপনার ফেরার কোনওই ঠিক নেই।

www.BanglaBook.org

যথার্থই যে পুরুষ, তার ফেরার কোনওদিনই ঠিক থাকে না। উলিসীস থেকে শক্তি চাটুজ্যে থেকে গিরিজাপ্রসন্ন সেন পর্যন্ত। তবে তোমার মতো কেউ যদি রোজ বসে থাকত তবে যখনই ফিরতে বলতে, কাঁটায় কাঁটায় ঠিক তখনই ফিরে আসতাম।

শুনছ। আমার শরীরটা ভাল লাগছে না। সম্ভবত প্রেসারটা বেড়েছে।

প্রথমা বললেন।

শালী জামাইবাবু একসঙ্গে হলে দিদিমাত্রেরই প্রেসার বাড়ে। ওষুধটা খেয়েছ তো?

হ্যাঁ।

আজকে ডাবল-ডোজ খেলে পারতে।

দ্বিতীয়া, আমি শুতে চললাম রে। তোর জামাইবাবুকে খাওয়াস।

॥ ৩ ॥

বিকেলে গিরিজাপ্রসন্ন দ্বিতীয়াকে নিয়ে হাঁটতে বেরোলেন।

দুপুরে জোর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আবহাওয়া সত্যিই প্লেজেন্ট হয়ে গেছে। জামাইবাবুর লম্বা-চওড়া শক্তসমর্থ চেহারা এখনও সেরকমই আছে। ষাটবছর বয়স অবধিও টেনিস খেলেছেন। শুনেছে, অনেকেরই কাছে যে, টেনিস এমনই একটা খেলা, যা মৃত্যুদিন অবধিও খেলা যায়। কেন ছেড়ে দিলেন, কে জানে! গিরিজাপ্রসন্নর সবই ভালো, শুধু নামটি ছাড়া। বড় সেকেলে নাম।

দ্বিতীয়া বললো, জামাইবাবু, সত্যিই বলুন তো ওই মণি বা মণিদের, যাদেরকার কথা বলছিল দিদি, তিনি বা তাঁরা কি সত্যিই আপনার হার্ট-থ্রব। পুরুষেরা পঁয়ষট্টিতে কেমন হন, মানে কেমন আকার ধারণ করেন সেটা জেনে রাখলে, আমার বরকে ওই বয়সে বোঝা সহজ হয়ে যেত।

ডার্লিং! পুরুষেরা তো কুকুর নয় যে, সবাই একইরকম হবে। একইরকম হয় কুকুর, শুয়োর, গাধা এই সব প্রাণী। তাদের মধ্যে আবার এক্কেক প্রজাতি একেকরকম। ল্যাব্রাডর গান-ডগ আর ডালমেশিয়ান যেমন একইরকম হবে না, তেমন রামচন্দ্র যে শিকার-করা বন্য বরাহর মাংস খেতেন, সেই ফলমূল-খাওয়া, বরাহ আর বস্তির নোংরা-খেকো শুয়োরে তফাত অবশ্যই ছিল। এবং থাকবে।

আঃ! বলুন না, সত্যিই মণি বলে কেউ আছেন? আপনার?

একজন নয় গো ডার্লিং। আমার অনেক মণি। আমি মণিময়। এই দেখো সামনেই তিন তিনটে আকাশমণি। এ ওর মুখে চেয়ে আছে।

দ্বিতীয়া চোখ তুলে দেখলো, তিনটি সুন্দর গাছ। বড় গাছ।

বাঃ। এদের নাম বুঝি আকাশমণি?

হ্যাঁ। অন্য নামও আছে। রবীন্দ্রনাথ নাম দিয়েছিলেন অগ্নিশিখা। আফ্রিকাতে বলে, আফ্রিকান টিউলিপ।

দ্বিতীয়া লক্ষ করছিল যে, গিরিজাপ্রসন্ন হেঁটে যাচ্ছেন আর দুপাশের অগণ্য মানুষ তাঁকে নমস্কার করছে। কেউ বলছে, নমস্তে সেন সাব, কেউ বলছে, নমস্কার স্যার, কেউ বলছে, ভালো তো গিরিজাদা? কেউ বা সাইকেল, স্কুটার, মোটর-সাইকেল অথবা গাড়িও থামিয়ে, হাত বাড়িয়ে হাতে হাত রেখে কথা বলছেন। কেউ হ্যান্ডশেক করছেন। এই যে এত মানুষের, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ভালবাসা, এটা কিন্তু ভয়মিশ্রিত ভালবাসা নয়। নিখাদ ভালবাসা। সম্পূর্ণই স্বার্থহীন। এক ধরনের সম্ভ্রমও মেশানো আছে এই

www.BanglaBook.org

ভালোবাসাতে তা বুঝতে পারছিলো দ্বিতীয়া, কিন্তু সেটা কী কারণে যে, তা বুঝতে পারছিলো না।

আপনি কি ইলেকশানে দাঁড়াবেন? জামাইবাবু?

গিরিজাপ্রসন্ন হাসলেন।

বললেন, দাঁড়ালে তো আমিই বত্রিশ-পাটি বিগলিত করে সকলের কাছে ভোট ভিক্ষা চাইতাম! আমাকে দেখে কি তাই মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে না কি যে, আমি অলরেডি ইলেক্টেড।

তা অবশ্য ঠিক।

পরনে ধুতি পাঞ্জাবি, গায়ে কাবলি জুতো। ধুতি পরা তো ভুলেই গেছে বাঙালিরা!

ভারী সুন্দর দেখছিল দ্বিতীয়া তার জামাইবাবুকে। এই বয়সেও লম্বা-চওড়া, ঋজু চেহারা, চওড়া কব্জি, এক মাথা কোঁকড়া চুল, সল্ট অ্যান্ড পেপার; কব্জিতে-বাঁধা একটি চমৎকার ঘড়ি। বাবা, দিদির বিয়ের সময়ে এক মক্কেলকে দিয়ে সুইজারল্যান্ড থেকে আনিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এটা...

এটা সেই ঘড়ি?

না গো শালী। শ্বশুরমশায়ের দেওয়া ঘড়ি আমি নিজে শ্বশুর হওয়ার পর জামাইকে দিয়ে দিয়েছি।

এটা কী ঘড়ি?

এটা টাইটান। আমাদের দেশেই এত সব ভাল জিনিস হচ্ছে এখন, মিছিমিছি বিদেশির প্রয়োজনই বা কী?

একজন মিস্ত্রিগোছের মানুষ উল্টোদিক থেকে আসছিলেন, সাইকেল চড়ে। সাইকেল থেকে নেমেই ভক্তিভরে মাথা নিচু করে প্রণাম করে তিনি খুশির হাসি হেসে বললেন, নমস্কার গাছবাবু। দশটার মধ্যে আটটাই বেঁচেছে। বড়ও হয়েছে অনেক। তিন বছরের মধ্যে ছায়া দেবে। একদিন গিয়ে দেখে আসবেন। সেদিন দুমুঠো ডালভাতও খেয়ে আসবেন আমাদের বাড়ি। গাঁয়ের সকলের অনুরোধ।

যেমনভাবে লাগিয়েছিলাম, তেমনভাবেই করেই লাগানো আছে তো! নাকি তুলে এদিক ওদিক করেছ?

না, না। কী যে বলেন। এক বছরের মধ্যেই এমন চেহারা হবে কেউ ভাবেনি। এ গাছের বাড় তো মেয়েছেলের বাড়ের চেয়েও বেশি। কী সুন্দর যে দেখতে লাগে। কী বলবো! বড়বাবু একটা নামও দিয়ে দিয়েছেন।

বাঃ। চমৎকার। কিন্তু বড়বাবু মানে?

লেদ-শপ-এর বড়বাবু। তাঁরও বাড়ি তো আমাদের গ্রামেই।

তা কিসের নাম দিয়েছেন উনি?

কেন? ওই গাছেদের কুঞ্জর। নাম দিয়েছেন 'গিরিজা-কুঞ্জ'। আমরা প্ল্যান্টে সকলে মিলে চাঁদা তোলা আরম্ভ করেছি যে যেমন দিতে পারে।

কিসের জন্য?

'গিরিজা-কুঞ্জে' পার্কের মতো বেঞ্চ লাগাব গোল করে ন'খানি। লোহার ফ্রেমের উপরে মোটা কাঠের তক্তা লাগানো থাকবে। বিজা কিংবা শালকাঠেরও। শক্তও হবে রোদ, বৃষ্টিতে নষ্টও হবে না শিগগিরি।

বিজা কাঠ কী? দ্বিতীয়া শুধোলো।

www.BanglaBook.org

হ্যাঁরে বাবু। ওই গাছের কাঠ দিয়েই গরুর গাড়ির চাকা হয়। তবেই বোঝো!

যখন করবো, আপনার সঙ্গে পরামর্শ করেই করবো। সাদা রঙ করে দেবো সব বেঞ্চে।

মানুষটি চলে গেলে, দ্বিতীয়া বললো, কী গাছ জামাইবাবু?

সোনাঝুরি। তবে সোনাঝুরি লাগাবার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিলো না। সোনাঝুরি দেখতে ভালো যদিও কিন্তু ইউক্যালিপটাস, সোনাঝুরি এসবে মাটি খারাপ করে দেয়। তাছাড়া একোলজির পক্ষেও ভালো নয়। গাছে কীটপতঙ্গ হয় না, পাখি বসে না, বাসা করে না, পাখির সঙ্গে আরও অনেক কিছুরই যোগাযোগ আছে। যদি জঙ্গলে হতো তো তোমাকে বোঝাতে পারতাম। এই শহরে তো সাপ নেই, ময়ূর নেই, ঈগল নেই, বেজি নেই, অনেক কিছু নেই। তবু, যেখানে যেটুকু পারি, করি। কী ভালো যে লাগে শালী, তোমাকে কী বলবো!

দিদি আজই দুপুরবেলাতে বলছিলো, গাছ, মেয়েদের কাছে, পুরুষেরই মতো।

হয়তো। আর পুরুষের কাছে; মায়ের মতো। আমার এই ইডিপাস কমপ্লেক্সটি কিন্তু আছে। এবং এর জন্য গর্বিত। গাছই আমার প্রাণ; আমার প্রেমিকা। বাঁড়ুজ্যের বউমণি আমাকে কী খাওয়াবে, কতটুকু খাওয়াবে, আমি যে মণিময় দ্বিতীয়া! প্রতি পথের পাশে পাশে আমার মণিরা দিনে রাতে আমার প্রতীক্ষাতে থাকে। কোনও-কোনওদিন শ্রাবণের প্রবল বর্ষণের মধ্যে টোকা মাথায় দিয়ে সাইকেলে চেপে আমি ওদের দেখতে বেরোই। আঃ। কত রকমের সাবানই যে আছে ওদের স্টকে! একেকজনের গায়ে একেকরকম গন্ধ। আর বৃষ্টির পরে তা যেন খোলতাই হয় আরও।

কখনও আবার মাঝরাতে বেরোই। চৈত্র-পূর্ণিমাতে বা দোল পূর্ণিমাতে। মাঘী পূর্ণিমাতেও আসি। কখনও ঘোর অমাবস্যাতে। প্রেমিকার প্রেমও রূপই তো আর ফ্যাল্না নয়। বলো?

হুঁ।

দ্বিতীয়া বললো, অস্ফুটে।

ওদের মধ্যে অধিকাংশই আমার চেয়ে বয়সে বড়, কেউ-বা ছোট, অনেকই ছোট। কারও সঙ্গে আমার মা-মাসীর সম্পর্ক, কারও সঙ্গে শাশুড়ির, কারও সঙ্গে স্ত্রীর, কারও সঙ্গে শালীর, কারও সঙ্গে ছেলের; কারও সঙ্গে মেয়ের।

বলেই বললেন, ভেটকু আর মলিকে সঙ্গে নিয়ে এলে না কেন দ্বিতীয়া? ওদের গাছ চেনাতাম। গাছ যারা শিশুবয়স থেকে চিনতে শেখে, ভালবাসতে শেখে; তাদের ভালবাসা ডাইহার্ড হয়। এখন আমাদের বাঁচা মরার সঙ্গে, পৃথিবীর বাঁচা মরার সঙ্গে, গাছেদের বাঁচা মরার প্রশ্ন জড়িয়ে-মড়িয়ে গেছে। মানে, ওরা বাঁচলে, তবেই আমরা বাঁচব; এই পৃথিবী বাঁচবে।

বাঃ। কী সুন্দর গন্ধ। কী উঁচু গাছ রে বাবা।

দ্বিতীয়া বললো।

হ্যাঁ।

কী গাছ এটা?

হাসতে হাসতে শিশুর মতো বললেন গিরিজাপ্রসন্ন, আরে! কনকচাঁপা। ছেলেবেলাতে পড়েছ মনে নেই, "তার গোঁফ জোড়াটি পাকা, মাথায় কনকচাঁপা"। সেই কনকচাঁপা। বেচারি একা—একাই কাটিয়ে দিল সারাটা জীবন নির্মলকাকুর মতো। কিছুদিন হলো তার একটিকে এনে লাগিয়েছি আমি। তবে বড় অসমবয়সী হয়ে যাবে এ প্রেম। তবু তো হবে।

www.BanglaBook.org

প্রেম প্রেমই! শেষবেলাতে এলেও এলো! তুমি নবোকভ-এর 'লোলিতা' পড়েছ?

ওঃ। পড়েছি। সিকেনিং।

আরেকবার পড়ো। তুমি বলছ কী! ইংরেজির ছাত্রী ছিলে তুমি! আমি তো রেলগাড়ির এঞ্জিন বানানো এঞ্জিনীয়ার। ইংরেজি ভাষাটাকে নিয়ে, নিখিল ব্যানার্জি যেমন করে সেতার বাজাতেন, তেমন করেই বাজিয়েছেন নবোকভ। আমার অবশ্য বইটির কথা মনে এলো অসমবয়সী প্রেমেরই কথাতেই। শারীরিক প্রেম।

প্রেমের পরিণতি কী শরীরই? জামাইবাবু?

নির্ভর করে। হতেও পারে, নাও হতে পারে। পাত্র-পাত্রীর উপরেই সব নির্ভর করে। আমার যে এই গাছেদের সঙ্গে প্রেম, এর মধ্যেও শরীর আছে কিন্তু।

হেসে ফেললো দ্বিতীয়া, গিরিজাপ্রসন্নর কথা শুনে।

বললো, গাছেদের শরীর?

হ্যাঁ। তাকিয়ে দেখো। যে-কোনও গাছেদের দিকে তাকিয়ে দেখো। দেখো, যেখানে, দুটি ডাল বাইফার্কেট করেছে। সেখানে নজর করে দেখো, কী দেখছ?

কী?

দুটি উরু নয় কি? উরুসন্ধি আর জঘন? উল্টোদিক দিয়ে দেখো, মানে, আপসাইড ডাউন করে। কি? নয় কি?

সত্যিই তো!

স্তম্ভিত হয়ে বললো, দ্বিতীয়া! আশ্চর্য। কত হাজার গাছ দেখলাম, কখনও নজর করে দেখিনি। সত্যি! আপনি হয় পারভার্ট নয় জিনিয়াস।

জিনিয়াস-এর সঙ্গে পারভার্সিটির মিল অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়। তবে, আমি দুটোর একটিও নই।

চোখে যা পড়ে, তাই কি আমরা দেখি, না দেখতে শিখেছি? চোখ তো সকলকেই দিয়েছেন বিধাতা, দেখবার চোখ ক'জনকে দিয়েছেন বলো?

তা ঠিক।

এদিকে-ওদিকে চেয়ে নিজের মনে স্বগতোক্তির মতো বললো দ্বিতীয়া।

তারপর বললো, আপনি কিন্তু বেশ অসভ্য আছেন।

মেয়েরা যে-পুরুষকে ভালোবাসে তাকে পাগল বলে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন। আর আমি বলছি, অসভ্যও বলে।

গিরিজাপ্রসন্ন বললেন।

অসভ্য!

বললো, দ্বিতীয়া। দ্বিতীয়বার।

এটা কী গাছ?

কুর্চি। আমার নাতনি হলে তার নাম রাখব কুর্চি।

আর নাতি হলে?

শিমুল।

আর ছেলের ঘরে নাতি হলে? শালিখ তো শুনেছি আমেরিকার মেয়ে বিয়ে করবে।

তাতে কী। করুক না। যার যা খুশি করুক। যার যার জীবন তার তার। যে যাতে খুশি হয়।

মেমসাহেব রাগ করবে না দিশী নাম রাখলে?

www.BanglaBook.org

বিদিশি নামেই রাখব। ছেলে হলে রাখব। জ্যাকারান্ডা। জ্যাকারান্ডার ফুল দেখেছ কখনও। এই ক'দিন আগেই ফোটা শেষ হলো। গরমের শুরু থেকে ফুটবে আবার। ফিকে বেগুনি। আমার বিয়ের সময়ে তোমার কি বয়স ছিলো? ক্লাস নাইনে পড়তে না তখন তুমি?

হুঁ।

ঠিক সেই বয়সী মেয়েদের শেষ রাতের স্বপ্নর মতো হালকা, নরম আলতো বেগুনিরঙা হয় জ্যাকারান্ডার ফুল।

দ্বিতীয়বার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো, গিরিজাপ্রসন্নর রোম্যান্টিকতায়।

ভাবলো, এমন জামাইবাবুর সঙ্গ থেকে যে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে এতটা কাল, সেটা তারই মন্দভাগ্য।

আর মেয়ে হলে?

মেয়ে হলে তার নাম রাখব, পনসাটিয়া।

ঈশশ। নামগুলো শুনে আমারই ইচ্ছে করছে আমার আরও একটি ছেলে বা মেয়ে হোক।

একেবারে না। দুটিই যথেষ্ট। আমার এই সুন্দর দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে শুধুমাত্র গাছ বাড়ানো আর সন্তান কমানোর উপরেই। সবাইকে বলবে, বুঝেছ? শিক্ষিত-অশিক্ষিত গরিব-বড়লোক, সব্বাইকে। বুঝিয়ে বলবে। টাইম ইজ রানিং-আউট।

যে গাছেদের ঊরু ও জঘন আছে, তাদের শরীরের গড়ন তো মেয়েদের শরীরেরই মতো। গাছেরা কি সকলেই মেয়ে?

না, তা কেন। অনেক গাছ আছে, তাদের শরীরের গড়ন অমন নয়।

যেমন?

একটা বই-এর কথা পড়েছি, 'দ্যা সিক্রেট লাইফ অফ প্ল্যান্টিস'। অসাধারণ বই।

কোথায় পাব?

তা জানি না।

তারপর বললেন ডালপালা সমান্তরালে ছড়ায় কিন্তু নীচের দিকে, অথচ যারা ঊর্ধ্ববাহু সন্ন্যিসীর মতো, যেমন শিমূল, বাওবাব, শাল, পপলার, পাইন, স্প্রুস, সিডার। অধিকাংশ কনিফারাস গাছই বোধহয় পুরুষ। শীতে জমে-যাওয়া পুরুষের কাছে মেয়েরা কিসের জন্যে যাবে? তাই বোধহয় শীতের দেশের পুরুষ গাছেরা বরফের গোঁফদাড়ি নিয়ে শীতে ঠকঠক করে কাঁপে।

আমার এই থিওরি কাউকে বোলো না কিন্তু। বটানিস্টরা শুনলে ঠাট্টা করবেন আমাকে নিয়ে। ভালোবাসা ছাড়া, আমার আর তো কোনও গুণ নেই। বটানির কিছুই জানি না আমি।

হাসলো দ্বিতীয়া, গিরিজাপ্রসন্নর কথা শুনে।

গিরিজাপ্রসন্ন দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, ওই যে চারটে অমলতাস গাছ দেখছ...

অমলতাস? কী সুন্দর নাম।

হ্যাঁ। সংস্কৃত সাহিত্যে ওই নামেই আছে এই গাছ। হলুদ হলুদ ফুল ফোটে, মেয়েদের কানের ঝুমকোর মতো। বুঝলে শালী, আমরা ইংরেজিই শিখেছি, কিন্তু শিক্ষিত হইনি। তুমি যে-কোনও শিক্ষিত মানুষকে একটি গাছ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করো, এটা কী গাছ? উত্তরে কী বলবেন তিনি জানো?

কী?

বলবেন গাছ। কী গাছ আবার কী? গাছ! কী পাখি আবার কী? পাখি!

www.BanglaBook.org

শহরের মানুষ, কী করে গাছ চিনবেন?

দ্বিতীয়া বললো।

এটা বাজে কথা।

গ্রামের মানুষও অনেকেই চেনেন না, আবার শহরের মানুষের মধ্যে কেউ কেউ চেনেন। আমাদের শিক্ষাটাতে ম্যাট-ফিনিশ লেগেছে। গ্লসি করতে হবে তাকে। দীপ্তিমান করতে হবে শিক্ষাকে।

বলুন, কী বলছিলেন অমলতাসের কথা?

ওইখানে একটা ছাইয়ের গাদা ছিল আগে, জানো? ওই যে বস্তিটা দেখছ, বস্তীর যতো ছাই-পাঁশ সব ওখানেই ফেলতো এনে ওরা। আমি চারটি অমলতাস এনে লাগালাম। দেখো, পাঁচ বছরে কতো বড় হয়েছে। ওদের বাড়তে দেখে নিজেরাই জঞ্জাল আর ছাই ফেলা বন্ধ করলো। এখন ওই গাছগুলিরই নীচে বস্তির যুবক-যুবতীরা একে অন্যকে প্রেম নিবেদন করছে। শিশুরা বিকেলে খেলে। বৃদ্ধরা সন্ধ্যের পরে এসে স্মৃতিমন্থন করে।

বলেই, বললেন, আমাদের শ্মশানগুলোকে গাছে গাছে সবুজ করে দিতে ইচ্ছে হয় আমার।

গিরিজাপ্রসন্ন যেন ঋগ্বেদে বর্ণিত সেই অরণ্যস্তবের মধ্যে সশরীরে প্রবেশ করে গেলেন।

স্তব্ধ হয়ে লক্ষ্য করলো দ্বিতীয়া।

বাড়ি যাবেন না?

চলো। আমি ভাবি, আমার তো মোটে এক ছেলে এক মেয়ে। আমি যেদিন মরব, সেদিন এই চিত্তরঞ্জনের কত গাছই যে কাঁদবে আমার জন্যে। যে হাজার হাজার শিশু—যুবক—বৃদ্ধর মধ্যে গাছেদের জন্যে এই ভালোবাসা, আমাদের পৃথিবীর জন্যে এই দরদ সঞ্চারিত করতে পেরেছি, তারাও কাঁদবে। ভাবতেও যে কী ভালো লাগে শালী, তোমাকে কী বলবো।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, এ কিন্তু নার্সিসিজম নয়, এ ভালোবাসা আমাকে নয়, এই এদের সকলকে, যারা এমন মণিহার পরিয়েছে আমায়। এই ভালবাসাই আমার একমাত্র উত্তরাধিকার! আমার যে সহস্র সহস্র সন্তান। সগররাজা আমি!

এখন চাঁদ উঠেছে বৃষ্টি-ধোওয়া আকাশে। পশ্চিমাকাশে সন্ধ্যাতারা জ্বলজ্বল করছে। সমানে মানুষজন নমস্কার করতে করতে, উইশ করতে করতে চলেছেন দু পাশ থেকে, গিরিজাপ্রসন্নকে। স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসায়।

দ্বিতীয়ার খবুই গর্ব হচ্ছিলো ওর একমাত্র জামাইবাবুর পাশে পাশে হাঁটতে।

কত মানুষ, কত রকমের উত্তরাধিকার রেখে যান। কিন্তু কী দারুণভাবে বাঁচছেন, বাঁচলেন জামাইবাবু। কী গভীর আত্মতৃপ্তিতে, স্বার্থগন্ধহীন আনন্দে। পরের, পরের, পরের, তারও পরের প্রজন্মের জন্যে, তাঁর অগণ্য সন্তানদের জন্যে, এই পৃথিবীকে সুন্দর করার জন্যে!

আশ্চর্য!

www.BanglaBook.org

পাক্কিটাডাও চোকরা

রিং-টাং চা বাগানের ম্যানেজার গিলিগান উদোম হয়ে বাথরুমের লাগোয়া ঘরে দুটি পা ইজিচেয়ারে লম্বা কাঠের হাতলে তুলে দিয়ে বসেছিলো। আর গিলিগানের খিদমদগার, ব্যক্তিগত বেয়ারা অনামা, ইতালিয়ান জলপাই-তেল মাখাচ্ছিলো তার সাঁতরাগাছির ওল-এর মতো শরীরে।

পার্সেলে, ডেইলী টেলিগ্রাফের বাণ্ডিল, আর্মি-নেভি স্টোরস-এর প্রি-ক্রিসমাস ক্যাটালগ, সব এসেছে আজ। কবে পার্সেল আসে সেই অপেক্ষায় হাঁ করে থাকে লালমুখো সাহেবরা।

কাগজ মেলে বসে, গিলিগান্ গভীর মনোযোগের সঙ্গে "হোম"-এর খবর পড়ছিলো আর অনামা, সাহেবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, প্রতি রোমকূপে রোমকূপে মালিশ করে, পরতে পরতে তেল বসাচ্ছিলো তার শরীরে।

একটু পরেই অন্য বেয়ারারা কেরোসিনের টিনে গরম জল বয়ে নিয়ে এসে বাথ-টাবে ঢেলে দেবে। জল গরম হচ্ছে বাংলোর পিছনে বাবুর্চিখানার সামনের নিমগাছতলায়। একটি পেল্লায় কাঠের উনুনে।

ভাল করে চান করার পর বাথটাব থেকে বেরোলে, অনামা তাকে তোয়ালে দিয়ে মুছে জামাকাপড় পরিয়ে দেবে। তারপর সার সার ফুলের টব-বসানো চওড়া বারান্দায় সাদা-রঙা বেতের চেয়ারে বসে আজ বীয়ার খাবে গিলিগান ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার ম্যাক-আর্থারের সঙ্গে।

ম্যাক-আর্থার স্কটসম্যান। কয়েকদিনের ছুটিতে জঙ্গল ছেড়ে এসেছে। গিলিগানরা জংলী সাহেবদের বলে "জাংগল-ওয়ালা!" যারা ব্যবসা করে বা বানিয়া, সেই সব সাহেবদেরও ছোট চোখে দেখে আর্মির এবং সিভিল সার্ভিস-এর সাহেবরা। ওদের ঠাট্টা

www.BanglaBook.org

করে বলে "বক্সওয়ালা"।

কোলকাতার মিসেস উড, মেমসাহেবদের জন্যে জামাকাপড় বানিয়ে লোক মারফত পাঠাতেন সাহেবদের বাংলোতে বাংলোতে। লোকগুলো তাদের বাক্স বিছিয়ে বসতো বারান্দায়। সেই থেকেই বানিয়াদের নাম হয়েছে "বক্স-ওয়ালা"।

গিলিগানের একজোড়া ঝুপড়ি নস্যিরঙা পুরুষ্টু গোঁফ ছিলো। ম্যাক-আর্থারের মুখময় রূপোলী-রঙা দাড়ি গোঁফ। জাংগল-ওয়ালারা হাজামৎদের সেবা থেকে বঞ্চিত ছিলো বলেই দাড়ি কামানো বা গোঁফ ছাঁটার বিলাসিতা বিশেষ থাকতো না। বাঘ, হরিণ, ভাল্লুক, বুনো মোষ আর বাইসনের চামড়াতে মোড়া থাকতো তাদের বাংলো। হাতীর দাঁত ও পাও থাকতো। প্রত্যেক ফরেস্ট বাংলোর একটি ঘর তাদের জন্যে রিজার্ভ করা থাকতো তখনকার দিনে।

স্কটল্যান্ডের উৎসব "হ্যাগেস"। হ্যাগেস-এর সময়ে কার্ড পাঠাতো ম্যাক আর্থার সব সাহেবদের লেখা থাকতো "উ্য আর ইনভাইটেড টু সী দ্যা হ্যাগেস"। স্কটিশ-কিল্ট পরে ধুমসো সাহেবরা নাচানাচি করতো। স্কটিশ ব্যান্ড বাজাতো। তা দেখে এবং শুনে, আমাদের মত নেটিভরা ধন্য বোধ করতো নিজেদের। খিদমদগারীর মধ্যে পরের পদসেবা ও পদলেহনের মধ্যে পরম আত্মসম্মানজ্ঞানহীনতার মধ্যেও বেঁচে থাকার তালিম আমরা বহু বছর আগেই নিয়েছিলাম। শুধুই তাইই নয়, এই আত্মাবমাননার মধ্যে আমরা চিরদিন এক পরম শ্লাঘাও বোধ করে এসেছি।

মাঝে মাঝেই বাংলোতে বড়া-খানার আয়োজন হত। অনেক সাহেব-মেম আসতেন ঘোড়ায় চড়ে। তখন গাড়ি সবে এসেছে ভারতবর্ষে; তবে ঐরকম জংলী জায়গার সাহেবদের কাছে মোটর গাড়ি ছিলো না। মোটর চলার মত রাস্তাও তখনও বিশেষ হয়নি। হুইস্কি বইতো জলের মতো। তারপর ডিনার সার্ভড্ হলে তার সঙ্গে শেরী আর পোর্ট। ডিনারের পর লীডিং-লেডি অন্যান্য মেমসাহেবদের নিয়ে বসবার ঘরে বসতেন। সাহেবরা খাবার ঘরে গুলতানি করতেন। তারপর সকলে বসবার ঘরে এলে, যে সবচেয়ে বাঘা সাহেব তার মেমসাহেব বলতেন, এবার আমরা উঠবো।

তাঁরা চলে গেলে তবেই অন্যরা যেতে পারতেন। প্রোটোকোল এইরকমই ছিলো।

তখনকার দিনে ঐসব জংলী জায়গায় খুব কম মেমসাহেবই আসতেন। ব্যাচেলার সাহেবদের বাংলোর আউট-হাউসে একজন করে নেটিভ রক্ষিতা থাকতো। গিলিগানেরও ছিলো। অনামারই বউ সে। নাম কুজাতা। সেই আউট-হাউসকে বলা হত "বিবিখানা"।

সাহেব, রাতে অনামার নিজেরই স্ত্রীকে সম্ভোগ করবে বলে ভাল করে সাহেবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে জলপাই-তেল লাগিয়েছিল অনামা। আলেকজান্ডার এমনি এমনি বলে যাননি; "সত্যিই সেলুকাস। বিচিত্র এ দেশ।"

ঘুঘুডাকা, ছায়াঢাকা, পাতা-ফিসফিস দুপুরে অনামা তার বউ কুজাতার কাছে যেতো। বৌকে আদর করতে করতে শুধোতো, তোকে কে বেশী আনন্দ দেয়? সাহেব, না আমি? সাহেব কী আমার থেকেও ভালো!

অনামার নির্লোম বুকে মাথা নামিয়ে হারামজাদী মার্জারীর মতো কুজাতা বলতো মিটিমিটি হেসে, দুজনে দুরকম। দুজন পুরুষ কখনও একরকম হয় নাকি? কুজাতা বলতো, সাহেবের গায়ে পচা টক-দইয়ের গন্ধ। আরও বলতো, নস্যিরঙা চুলের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সাহেবের পুরুষাঙ্গটি দেখলেই তার নাকি বুনো-বেজীর কথা মনে হতো। মস্ত একটা

www.BanglaBook.org

বেজী।

অনামা বলতো, আর আমারটা?

তোরটা দিশী সাপ। বাদামী সাপ। ফণা নেই, ছোবল নেই। হেলে সাপ। এলেবেলে।

অনামা গর্বে আনন্দে সাহেবের বেজীর স্তুতিতে হি-হি করে দাঁত বের করে হেসে বলতো তাইই ত বেজীর হাতে মরলো সাপ এ জন্যে। বল? সাপ কি পারে বেজীর সঙ্গে কখনও?

গিলিগানের ঔরসে কুজাতার গর্ভে যে ছেলেটি জন্মেছিল তার বয়স এখন বারো। তার রঙ সাহেবদেরই মতো। চুলও নস্যিরঙা। বড় হলে সেও হয়তো বেজী পুষবে একটা। যে বেজী খেলে বেড়াবে যুবতীদের পেলব কোমল ঊরুমূলের দূর্বাঘাসে।

গিলিগান সাহেবের দয়ার শরীর। ক্লাবে ছেলেটাকে একটা কাজও জুটিয়ে দিয়েছেন। অদ্ভুত কাজ। একমাত্র এদেশে এবং হয়ত আফ্রিকার কোনো জায়গায় এই চাকরিতে বহাল হয় ছোঁড়ারা। ছোঁড়ার ডেজিগনেশান "পাক্কি টাডাও চোকরা।"

সাহেবরা যখন ক্লাবের লনে বসে গল্প করেন, পান করেন, খানদান; তখন নানারকম পাখি এসে তাঁদের বিরক্ত করে। যদিও মস্ত মস্ত রঙিন সব গার্ডেন-আমব্রেলা পোঁতা থাকে। তবুও। ফিস-ফ্রাই নিয়ে বেয়ারা আসছে, হঠাৎ হয়ত কাকে-চিলে ছোঁ মেরে ফ্রাই হাওয়া করে দিলো। পড়ে রইলো শুধু আলুভাজা।

এই ছোঁড়াদের কাজই ছিলো পাখি-তাড়িয়ে বেড়ানো। লালরঙা শর্টস আর নীলরঙা শার্ট পরে হাতে ডাণ্ডা নিয়ে তাদের বাপেদের রক্ষা করতো পাখি-জনিত বিরক্তি থেকে। তাই-ই নাম ছিলো, "পাক্কি টাডাও চোকরা।"

ছোঁড়া, মাইনে পেত পাঁচ টাকা। ছোঁড়া তার মা-বাপের হদিস জানতো না। জন্মের পরই অন্য বাগানের কুলি-লাইনে তাকে চালান করে দিয়েছিলো গিলিগান। ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, টাইফয়েড, কালাজ্বর, সাপ, বিছে—ওসব কিছুর হাত থেকেই যখন বেঁচে উঠলো ছোঁড়া, ভক্ত পেল্লাদের মতো, তখন দয়ালু বে-বাপ তাকে ক্লাবে এই চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিলো।

BanglaBook.org

॥ ২ ॥

ক্লাবে এক বুড়ো বেয়ারা ছিলো। যারা অল্প বয়সেই আত্মসম্মান খোয়ায় জীবনে, তারা বুড়ো হলে বেজন্মা শেয়ালের মতো হয়ে ওঠে। সেই বিহারী বুড়ো আর বাঙালি ক্যাশিয়ারবাবু মিলে পরামর্শ করে একদিন ছোঁড়াকে বলল : তোর বাপ কে? তা তুই জানিস?

"পাক্কি টাডাও চোকরা" বলল, আমার বাপ পল্টনে আছে। যুদ্ধ করছে পেশোয়ারে। মাও গেছে বাপের সঙ্গে।

তোর মুণ্ডু। সে যুদ্ধ করছে, "বিবিখানায়"। তোর মায়ের সঙ্গে। অন্যরকম যুদ্ধ। ঐ দ্যাখ, তোর বাপ। ঐ যে গিলিগান সাহেব।

গিলিগানের পাশে উইক-এন্ডে গলফ খেলতে-আসা পুলিশ সাহেব রবার্টসন বসেছিলেন। ছোঁড়ার মাথা গুলিয়ে গেলো। কোনটা তার বাপ বুঝতে পারলো না। বুড়ো বেয়ারা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, গুঁফো গিলিগান।

www.BanglaBook.org

কথাটা শুনে ছোঁড়ার মাথায় আগুন জ্বলে উঠলো। কিন্তু কি করবে বুঝতে পারলো না। ভাবতে লাগলো। ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়লো সে রাতে। ভেবে কুল পেলো না।

শুধু পাখিই নয়। ক্লাবের এলাকার মধ্যে যা-কিছু ঢুকে পড়ে, সবই তাড়াতে হয় ছোকরাকে। ভুটান পাহাড় থেকে কখনও হাতীর দল নেমে আসে। বাঘ বা চিতার তাড়া খেয়ে দৌড়ে আসে বার্কিংডিয়ার। অথবা মাদী শম্বর; বাচ্চা নিয়ে। ছোকরা, কাক তাড়ায়, চিল তাড়ায়, ছাতারে তাড়ায়, সাপ তাড়ায়, বেজী তাড়ায়; শুধু নিজের বে-বাপকে তাড়াতে পারে না। দৌড়ে বেড়ায় ছোঁড়া। তার লাল শর্টস আর নীল শার্টে রোদের মধ্যে তাকে একটা মস্ত রঙীন পাখি বলে মনে হয়। পাখির মত উড়ে বেড়ায় "পাক্কি টাডাও চোকরা।"

হ্যারো-ইটনে পড়া সাহেবরা যাকিছুই করে তার মধ্যে একটা ক্লাস থাকে। ক্লাব খুব পছন্দ করে তারা। রঙচঙে ছাতার নীচে বসে, ঝলমলে পোষাক পরে, হলদে বুড়বুড়ি-ওঠা বীয়ার খেতে খেতে তাদের ঔরসের টুকরো-টাকরাদের রোদে ঝকমক করতে দেখে খুব খুশী হয় তারা। "পাক্কি টাডাও চোকরার" গতিস্মানতার মধ্যে এই হতভাগা দেশের অনেক দুঃখ গ্লানি এবং আত্মসম্মানজ্ঞানহীনতা প্রস্তরীভূত হয়ে থাকে। তাজমহলের এবং কোনারকের গর্বের মতই পাক্কি টাডাও চোকরাদের অপমানের ও লজ্জার ইতিহাস পাশাপাশি লেখা থাকার কথা। যদি এই দেশে কখনও সৎ ও স্বাধীন ইতিহাস লেখা হয় ভবিষ্যতে। দেশের ইতিহাস।

এক সন্ধ্যায় গিলিগান বাংলোয় বারান্দায় বসে হুইস্কি-পানি খাচ্ছিলো। পায়ের কাছে শুয়ে-থাকা তার অ্যালসেসিয়ান কুকুর হঠাৎ ঘাউ-ঘাউ করে উঠলো। সাহেব চমকে চেয়ে দেখলেন বাঙালি ক্যাশিয়ারবাবু।

বাবু, হুমড়ি খেয়ে পড়লেন সাহেবের পায়ে। কুকুরটার প্রায়েই এসে পড়লো তাঁর মাথাটা। কুকুরটা, মানুষটাকে সারমেয়রও অধম ভেবে লজ্জা পেলো। পা সরিয়ে নিলো।

কোঈ হ্যায়?

সাহেব বললেন।

তারপরও বললেন, কোঈ হ্যায়?

ডেক্কোটো কেয়া মাংতা বাবু? হোয়াটস দ্যা ম্যাটার?

বাবু, সাহেবের পা দু হাতে জড়িয়ে ধরে বললো, ইওর লাইফ ইজ ইন ডেনজার স্যার। 'পাক্কি টাডাও চোকরা' সাহেবকে খুন করবে বলে মতলব করেছে।

গিলিগান অনামাকে শুনিয়ে, গলা তুলে বললো : কিন্তু কেন? হোয়াই?

বাবু বললো, তা জানি না সাহেব। কিন্তু জানি যে, খুন সে করবেই।

তার পাখি তাড়ানো ডাণ্ডার মধ্যে সরু ছুঁচোলো লোহার শিক ভরে নিয়ে একদিন সে আপনার বুকে ঢুকিয়ে বুক এঁফোড়-ওফোঁড় করে দেবে।

গিলিগান বললো, বাবু উ্যা ইন্ডিয়ানস আর আনগ্রেটফুলস।

বাবু ফিসফিস করে কি যেন বললেন সাহেবকে।

সাহেব সব খিদমদগার, বেয়ারাদের চলে যেতে বললেন। এলাকা ফাঁকা হলে মীরজাফরের জাতের একজন মানুষ ফিসফিস করে অনেক কথা বললেন, সাহেবের কানে।

গিলিগান রেগে আরও লাল হয়ে গেলেন। তক্ষুনি পুলিশের রবার্টসনের কাছে একটি চিঠি পাঠালেন ঘোড়সওয়ার দিয়ে। ব্যাপারটা ত সোজা নয়। রাজাকে মারার ষড়যন্ত্র, অর্থাৎ বিদ্রোহ। রিং-টাং এর ইতিহাস থেকে ছোঁড়ার অস্তিত্ব, ছোঁড়ার নাম মুছে ফেলতে হবে।

www.BanglaBook.org

এক্ষুনি।

বাবু হাতজোড় করে দাঁড়িয়েই ছিলেন। কুকুরটাও বসলো। কিন্তু বাবু দাঁড়িয়েই থাকলেন।

এবার গিলিগান একটু কাশলেন। বললেন, ন্যাউ টেল মী। হোয়াটস দ্য ডীল। ডোন্ট টেল মী দ্যাট উ্য হ্যাভ কাম হিয়ার টু ওয়ার্ন মী উইদাউট এনি মোটিভ।

বাবু হাত কচলালেন। নাঃ। বাবুর বিশেষ বড় কিছু চাইবার ছিলো না। না, না, সেরকম বড় কিছুই নয়।

আসলে এ ঘটনা যে সময়ে ঘটেছিল, সেই সময়ের শিক্ষিত, স্বাধীন অধিকাংশ মানুষ; নিজেদের আজ যতখানি নীচে নামাতে পারেন, ততখানি নীচে নামিয়ে আনতে পারতেন না। ক্যাশিয়ারবাবুরা ত ছিলেনই। চিরদিনই ছিলেন। কিন্তু উঁচুতলার অধিকাংশ মানুষেরাই তখনও মানুষই ছিলেন। কুকুর কিংবা চড়ুই পাখি হয়ে ওঠেন নি।

বাবু বললেন, হাত-কচলে; পঞ্চাশ টাকা মাইনে বাড়াতে হবে। আর এক্সটেনশান চাই আরও দু'বছর।

সাহেব ক্লাবের অনারারী সেক্রেটারী। রিং-টাং-এ তার যে ক্ষমতা, তার সঙ্গে যে-কোনো দেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার তুলনা করা চলে।

সাহেব এক মুহূর্ত কি ভাবলেন।

তারপর বললেন, ডান।

॥ ৩ ॥

বাবু চলে গেলেন। গিলিগান হাঁক ছাড়লেন, বললেন, কোঈ হ্যায়? এক বড়া পেগ। হুইস্কি এন্ড পানি।

অনামা দৌড়ে গেল হুকুম তামিল করতে। তার বৌ তখন বিবিখানায় চান করে উঠে রুহ-খস আতর মাখছিলো সারা শরীরে ঘষে ঘষে। গিলিগান আতরের গন্ধ বড় ভালোবাসেন।

একটা ব্রেইন-ফিভার পাখি বাইরের অন্ধকারে চমকে চমকে ডাকছিলো। গিলিগান একবার বাইরের অন্ধকারে তাকালেন। এমন অন্ধকার, যেন মনে হয় মুখে থাপ্পড় মারছে। এমন অন্ধকারেই বাবুদের মুখ লুকোতে সুবিধে হয়।

তারপর হুইস্কির গ্লাস তুলে নিয়ে গিলিগান ভাবতে লাগলেন যে, ভারতে ব্রিটিশ-রাজ তার নিজের জোরে টিকে নেই। কখনওই ছিলো না। এই ক্যাশিয়ার বাবুদের মতো লোকগুলোই, যে ক্ষমতা তাদের নয়, সেই ক্ষমতা নির্লজ্জের মত, আত্মসম্মানজ্ঞান-হীনতায় তুলে দিয়েছে শাসকদের হাতে। চাবুক হাতে করে এদের সামনে দাঁড়ালেই হলো। চাবুক মারা পর্যন্ত অপেক্ষা করার মত সময়েরও দরকার নেই এদের। হাওয়াতে সপাং-সপাং শব্দ শুনেই কেঁই-কেঁই করে কুকুরের মতো পায়ে পড়ে। এরা। এই মহান ভারতের মানুষ।

হুইস্কিতে একটা চুমুক দিয়ে নিরুচ্চারে গিলিগান বললেন ঃ "গড সেভ দ্যা কিং"।

॥ ৪ ॥

গিলিগান-এর এবং কুজাতার জারজ সন্তান লাল টুকটুকে ছেলেটা ক্লাবের প্যান্ট্রির মেঝেতে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলো। ক্যাশিয়ারবাবুর সঙ্গে আসা চারজন ঘোড়সওয়ার পুলিশ ওকে

www.BanglaBook.org

পেটে লাথি মেরে ঘুম থেকে তুললো। ক্লাবের ক্যাশবাক্স থেকে একশো টাকা চুরি গেছে। টাকাটা দেওয়ালে ঝোলানো ছোঁড়ার জামার পকেট থেকেই বেরুলো। হাতে-নাতে চোর ধরা পড়লো। এখনকার মতো তখনও আইন একটা প্রচণ্ড তামাশাই ছিল।

তখন অবশ্য দিনকাল, রীতি-নীতি অন্যরকম ছিলো। আজকের দিনের গিলিগান আর ক্যাশিয়ারবাবুরা নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে এ ধরনের অনেক নতুন অস্ত্র প্রয়োগ করেন। তখনকার দিনের ব্যাপার-স্যাপার বড় সোজাসুজি এবং ক্রুড ছিলো। ভণ্ডামি কম ছিলো অনেক। অস্ত্রশস্ত্রও আজকালকার মতো এত বিধ্বংসী ও কুটিল ছিলো না। ইনকাম-ট্যাক্স, কাস্টমস, ফেরা অ্যাক্ট ইত্যাদি কত অস্ত্র আছে এখন দিশি স্বৈরাচারীদের হাতে। দিশি স্বৈরাচারী? ইয়েস!

ছোঁড়াকে হাত-কড়া পরিয়ে ঘোড়ার পিঠে পিছমোড়া করে বেঁধে সদরে নিয়ে গেলো। ঘোড়সওয়ার পুলিশেরা।

ওরা চলে যেতেই, ক্যাশিয়ারবাবু একটা একশো টাকার নোট বুড়ো বেয়ারাকে দিয়ে বললো, তুমি পঞ্চাশ নিয়ে আমাকে পঞ্চাশ দিও।

চারদিন পর এস-পি রবার্টসন ছোঁড়াটাকে এক নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলো।

বললো, যাঃ তোর ছুটি। রবার্টসনরা আর পুলিশের ইনফর্মার এবং দালালরা তখনও ছিলো। এখনও আছে। একই ট্র্যাডিশান সমানে চলেছে। বদলায়নি কিছুই।

কোমরে-বাঁধা হোলস্টার থেকে আস্তে করে ওয়েবলি-স্কটের রিভলবারটা বের করে নির্ভুল নিশানায় "পাক্কি টাডাও চোকরার" হৃদয় যাতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় তেমন করে একটি গুলি করলো রবার্টসন। ছোঁড়া এই দেশের সোঁদা-গন্ধ মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। দমকে দমকে রক্ত বেরুতে থাকলো টুকটুকে মুখটি থেকে। কাৎরাতে কাৎরাতে ছোঁড়া বললো "আঃ, মা! আঃ, বাবা!

মরার সময় ওর মনে হলো যে, এই দেশটা শুধু গিলিগানের নয়, ক্যাশিয়ারবাবুর নয়; বুড়ো বেয়ারাটারও নয়। দেশটা তার, তার কুজাতা মায়ের, তার অনামা বাবার এবং কোটি কোটি মানুষের, যারা এখনও কুম্ভকর্ণের মত ঘুমিয়ে আছে; সারমেয়র মত লেজ নাড়ছে। যতদিন ওরা গিলিগানদের মদত জোগাবে, ততদিন গিলিগানরাই মসনদে বসে থাকবে। বংশপরম্পরায়। পুলিশ ডায়রীতে লেখা হলো, যেমন পরে বহুবার হয়েছে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ। ডায়রীতে লেখা হলো, "শট, হোয়াইল ট্রায়িং টু এস্কেপ ফ্রম পোলিস কাস্টোডি"।

রিভলবারের আওয়াজে নির্জন জঙ্গলের মধ্যে শয়ে-শয়ে পাখি উল্লাসে কাকলিমুখর হয়ে উঠলো পাক্কি টাডাও চোকরাটির মৃত্যুতে। যে পাখীদের সে তাড়িয়ে বেড়াতো, সেই ছোট্ট ছোট্ট পাখি, ছোট্ট সুখের সব পাখিরা সবাই আনন্দে মাতলো।

রিভলবারটি হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে রবার্টসন নিরুচ্চারে বললো, "গড সেভ দ্যা কিং।"

www.BanglaBook.org

পরীক্ষা

বৌদি! দাদাবাবুর ফোন!

রেখা উত্তেজিত গলায় অরাকে ডাকলো।

দিল্লি থেকে?

শোবার ঘর থেকে শুধোলো অরা।

তারপর বললো, দাঁড়া। দাঁড়া। আসছি। তোর সবতাতেই তাড়া।

অরা এসে ফোন ধরলো।

বললো, অরা বলছি। কালকে এলে না কেন? খবরও পাঠালে না কোনো!

আর বোলো না। চাড্ডার ইরেসপনসিবিলিটির জন্যে। একটা টেলেক্সও পাঠাতে পারতো। আমি কি জানি যে জানায়নি!

অফিস থেকে গাড়িও পাঠিয়েছিলো তোমার জন্যে। ড্রাইভার ফিরে এসে আমার উপর হম্বিতম্বি!

কী করবো!

কালকে আসছো তো?

না। কাল তো নয়ই, আরও ক'দিন থাকতে হবে। চেয়ারম্যান এসে গেছেন।

কী যে করো না! মেয়েটার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা আরম্ভ তিন দিন পরে আর মেয়ের বাবা...

তুমি তো জানোই যে আমি অপদার্থ বাবা।

শিমূল, দায়িত্ব তুমি চিরদিনই এমনি করেই এড়িয়ে গেলে। মেয়েকে নিয়ে কিন্তু বড়ই দুশ্চিন্তাতে পড়েছি, কী যে করছে, তা কী বলবো!

কী করছে? কুঁচ?

www.BanglaBook.org

রাত দেড়টাতে শুচ্ছে আর ভোর সাড়ে তিনটেতে চারটেতে উঠে পড়ছে আবার। এমনিই করে আসছে গত এক মাস। কলকাতায় থেকেও তো তুমি কত খোঁজ রাখো মেয়ের।

আমি চুপ করেই রইলাম। অপরাধী লাগছিলো নিজেকে। এ কথা সত্যিই যে অনেকই দায়িত্ব-কর্তব্য আমি করি না এই সংসারে।

বললাম, অসুখে পড়ে যাবে যে!

যাবেই তো! পরীক্ষাই দিতে পারবে না।

অরা বললো, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত গলায়।

আমি বললাম, নার্ভাস-ব্রেকডাউন হয়ে যাবে।

যেতে পারে।

দাও তো একটু।

কাকে?

আহা কুঁচকে।

দিচ্ছি, পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগের রাতেও আসতে পারবে না তুমি?

না। আগের রাতে পারছি না কিছুতেই। তবে বুধবার রাতে ফিরবো। প্লেনে।

বাবা। বুধবার। বৃহস্পতিবার, আর শুক্রবার বাংলা পরীক্ষা। ইংলিশ মিডিয়ামের ছেলেমেয়েদের ঐ দু-দিন তো সবচেয়ে বেশি চিন্তা। নাও কুঁচ-এর সঙ্গে কথা বলো।

তারপর গলা চড়িয়ে বললো, কুঁ-উ-উ-চ। বাবা ফোন করেছেন দিল্লি থেকে।

কুঁচ এসে ফোন ধরলো। বললো, কী হলো আবার! আমি পড়ছি যে!

পড়ছো তো জানিই। কেমন আছো?

বাবাসুলভ দরদ ফুটিয়ে বললাম, আমি।

জানোই তো ভালোই আছি। খারাপ থাকলে কি খবর পেতে না?

মায়ের কথা শুনছো না কেন? মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমুলে অসুখে পড়বে যে!

মা কি আমার হয়ে পরীক্ষা দেবে? এত বড়ো কোর্স! দুবার অন্তত রিভাইস না করলে পরীক্ষাতে লিখবো কি করে? এখানে তো আর সেমিস্টারে সেমিস্টারে পরীক্ষা হয় না। দশ বছরে যা পড়েছি তা তো তিন ঘণ্টায় উগরে দিতে হবে। যেমন পরীক্ষার সিসটেম তেমনই তো হবে।

তা বলে, তিন ঘণ্টা ঘুমুবে?

ঠিক আছে। ছাড়ছি আমি।

মাকে দাও একটু।

মা। নাও। বলেই, চটি ফটফটিয়ে আমার 'ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট' মেয়ে চলে গেলো।

বলো। অরা বললো, রিসিভার নিয়ে।

ওকে ফসফোমিনটা রেগুলারলি খাওয়াচ্ছো তো?

কনসার্নড গলায় শুধোলাম আমি।

না। বন্ধ করে দিয়েছি। ভীষণ গরম পড়ে গেছে।

ক্যালিফস সিক্স এক্স? রাতে দু-চামচ করে মিল্ক অব ম্যাগনেসিয়া? পেটটা এই সময় পরিষ্কার রাখা খুবই দরকার।

দিচ্ছি। দিচ্ছি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অরার স্বরে অনেকদিনের জমা ক্লান্তি ঝরে পড়লো। একটু অসহায়তাও। মায়েরাই তো আসল পরীক্ষার্থী। তবে আমার পরিবারে অরাই একমাত্র পুরুষ। যত দায়দায়িত্ব সবই ওর। আমি একটা অপদার্থ। মেয়েও বললে চলে আমাকে। অনেকই ব্যাপারে। আমি এরকমই।

রাতে কি খাবে বাড়িতে? ফিরে?

না, না। প্লেনেই খেয়ে আসবো।

কোথায় উঠেছো? মেরিডিয়েনে?

না। এবার মৌরীয়া-শেরাটনে উঠেছি। চেয়ারম্যান এসেছেন তো! উনিও ওখানে উঠেছেন। তাই আমাকেও।

ঐ ক্যারাকটারলেস লোকটার সঙ্গে?

কী করবো! চাকরি তো!

বেশি ড্রিঙ্কট্রিঙ্ক করছো না তো!

আরে না না। তোমার ঐ এক চিন্তা। কুঁচকে বুঝিয়ে বলো। নার্ভাস-ব্রেকডাউন না হয়ে যায়। ওরা রক্ত-মাংসের মানুষ নয়। ইস্পাত দিয়ে তৈরি। জন্মক্ষণ থেকেই কেরিয়ারিস্ট; রোবোট। কুঁচরা আমাদের চেয়ে অনেকই বেশি শক্ত, সেলফ-কনফিডেন্ট!

আচ্ছা ছাড়ছি তা হলে। কোনো প্রয়োজন হলে হোটেলের ফোন নাম্বার রেখে দাও। অবশ্য চ্যাটার্জিকে একটা খবর দিলেও হবে।

ঠিক আছে। একটা ক্লান্তির হাই তুলে বললো, অরা।

॥ ২ ॥

ফোনটা ছেড়ে দিয়ে চান করতে গেলাম।

ঠাণ্ডাগরম জলের ধারার নিচে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, দিনকাল কত্ত বদলে গেছে!

এখনকার বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়েদের জন্যে কতই না চিন্তা করেন। আসলে আমরাই হচ্ছি, মানে, যাদের বয়স পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই, লাস্ট জেনারেশান, যাদের শাঁখের করাতের মতো আগের প্রজন্ম এবং পরের প্রজন্মর মানুষেরা দু'দিক দিয়েই কেটে গেছেন ও যাবে। আমাদের বাবা-মায়েদের প্রতি আমাদের এখনও যতখানি চিন্তাভাবনা, দরদ, কর্তব্যবোধ আছে তার ছিঁটেফোটাও বোধ হয় আমাদের ছেলেমেয়েদের থাকবে না আমাদের প্রতি। তবু, আমরা ছেলেমেয়ে, তাদের কেরিয়ার, তাদের ভবিষ্যৎ ছাড়া কিছু মাত্র চিন্তা করতে পারিনি। যদিও ওরা আমাদের হয়তো পুরোপুরিই ভুলে যাবে।

আমি যখন স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিই ঠিক তখনই আমাদের কলিন রোডের ছোট্ট দোতলা বাড়িতে বড়দিদির বিয়ে। আমার জ্যাঠামশায়ের বড় মেয়ে। জ্যাঠামশাই অল্প বয়সে মারা গেছিলেন তাই সব দায়িত্ব ছিলো বাবার। দূরাগত আত্মীয়স্বজনেরা, আমার ঠাকুমা যাঁদের বলতেন "নাওরি-ঝিওরি", বিয়ের অনেকদিন আগে থেকেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। শোবার জায়গা নেই বাড়িতে, পড়ার জায়গা তো নেইই! ছাদের সিঁড়িতে বা কাজের লোকদের উগ্র বিড়ির গন্ধ-ভরা ঘরে বসে পড়েছি। পরীক্ষার দিনও ঠাকুরের কাছ থেকে যা রান্না হয়েছে তাই একটু চেয়ে খেয়ে আট নম্বর বাস ধরে জগবন্ধু ইনস্টিট্যুশানে পরীক্ষা দিতে গেছি। বাবা অথবা মায়ের সেই সময় আমার কথা ভাবার সময়টুকু পর্যন্ত ছিলো না। তাঁদের প্রজন্ম বিশ্বাস করতেন "সার্ভিস বিফোর সেলফ"-এ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভালো হবার হলে, ছেলেমেয়ে ভালো হবেই। আর না হবার হলে নয়। এমনই এক ধারণা ছিলো ওঁদের। তবে আমার পরীক্ষার অল্প কিছুদিন আগে বাবা হঠাৎই বিবেকদংশনে তাড়িত হয়ে আমার জন্যে তিনজন মাস্টারমশাই রেখে দিয়েছিলেন। ইংরিজি, অঙ্ক এবং ম্যাথস-এর জন্যে। কিন্তু ততদিনে গোড়াই উইপোকাতে খেয়ে গেছে। উপরে বারিসিঞ্চন করে লাভ ছিলো না কিছু।

আমার মেয়ে কুঁচ প্রথম থেকেই পড়াশুনাতে ভালো। ব্রিলিয়ান্টই বলা চলে। তার ভালো স্কুল এবং তার মায়ের অতন্দ্র মনোযোগে তার খারাপ হওয়ার উপায়ও বোধ হয় ছিলো না। কিন্তু সবচেয়ে যা বড় কথা, তা হচ্ছে ওর নিজের ভালো হওয়ার তাগিদ এবং ভেতরের জেদ। যা আমার ছিলো না। আমাদের স্কুল থেকে শেখার ইচ্ছে যাদের ছিলোও তাদেরও শেখার তেমন উপায় ছিলো না।

কিন্তু এ কথাও ঠিক যে আমাদের সময়ে একজন মানুষের জীবনে পড়াশোনাটাই জীবনের একমাত্র বিবেচ্য বস্তু ছিলো না। স্বভাব, চরিত্র, তান্যর উপকারে আসার গুণও ছোট করে দেখা হতো না। পড়াশোনায় ভালো হওয়াই জীবনের একমাত্র উৎকর্ষ এ কথা একমাত্র প্রণিধানযোগ্য সত্য বলে কখনওই বিবেচিত হতো না। বাবা-মায়েদের কাছেও নয়। আমাদের কাছে তো নয়ই! আমাদের শৈশব ও কৈশোরকে আমরা পুরোপুরিই উপভোগ করেছি। পড়াশোনাতে তেমন ভালো ছিলাম না বলে, কোনো খেদ ছিলো না আমাদের মনে। ঐ সময়ে যে-সব ছাত্ররা শুধুমাত্র পড়াশোনাতেই ভালো ছিল তারা পরবর্তী জীবনে অধিকাংশই হারিয়ে গেছে। পড়াশোনাতে ভালো হওয়া ছাড়াও জীবনে "কিছু" হয়ে উঠতে গেলে যে-সব গুণের দরকার হয়, তা হয়তো তাদের ছিলো না। কিন্তু কুঁচদের প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে পড়াশোনাতে বিশেষ ভালো না হতে পারলে পৃথিবীর সব দরজাই তাদের জন্যে বন্ধ। আমাদের সময়ে কেউ ইচ্ছে করলে ভ্যাগাবন্ডও থাকতে পারতো। প্রত্যেক পরিবারই যৌথ পরিবার ছিলো। তখনও মুদ্রাস্ফীতি, আত্মসুখ, বহুবিধ ভোগ্যদ্রব্য এবং পেশাদার রাজনীতির দৈত্যরা বোতল ছেড়ে বেরিয়ে এমন ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধায়নি। যৌথ পরিবারের বীমার ছাতার তলাতে কারো পক্ষেই বাঁচা অসম্ভব ছিলো না তখন। পাগল, হাবা, বোকা, বেকার কাউকেই তার পরিবার সেদিন ফেলে দিতো না। কিন্তু আমার মেয়ে কুঁচেরা যে-প্রজন্মর মানুষ সেই প্রজন্মে বাঁচা ও মরার মধ্যে কোনো "বাফার-জোন" বা মধ্যবর্তী এলাকা নেই। নিরুপদ্রব শান্তিতে যেমন তেমন করে নিজেদের খুশিমতো বাঁচার কোনো উপায়ও নেই ওদের আর। হয় খুব ভালো হও, নয় একেবারেই হারিয়ে যাও। মুছে যাও। কঠিন, জেদী না হয়ে ওদের বাঁচারই উপায় নেই।

আমরা আমাদেরই মতো ছিলাম। কুঁচরা কুঁচেদের মতো। কোন প্রজন্ম অপেক্ষাকৃত ভালো তা বিচার করার সময়ও এখনও আসেনি। কিন্তু আমাদের ছেলেমেয়েদের আমরা প্রগাঢ় বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করি। ওদের জন্যে প্রায়শঃই গর্বিত এবং ক্বচিৎ লজ্জিতও বোধ করি। বড় ভয় হয় যে, ওরা বড় হলে, বিয়ে করলে, আমাদের মতো নিটোল অথচ পার্থক্য-জরজর দাম্পত্য জীবনের দুঃখ এবং সুখ উভয় থেকেই ওরা বঞ্চিত হবে। ওদের জীবনে হয়তো সুখ থাকবে। অথবা দুঃখ। সুখেদুঃখে মেশানো এমন ইন্টারেস্টিং মিশ্র জীবনে ওরা হয়তো বিশ্বাসই করবে না। শুধুই সুখ অথবা শুধুই দুঃখ যে বড়ই ক্লান্তিকর এবং অসহনীয় এই কথাটাই হয়তো ওরা বিশ্বাস করবে না। এবং করবে না বলেই, বড় চিন্তা হয় ওদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

www.BanglaBook.org

ভারি খারাপ লাগছিলো মেয়েটার পরীক্ষার সময়েও থাকতে পারলাম না বলে। বাবা হিসেবে, ওর জন্যে আমার কিছু করা উচিত ছিলো। ওর মা এত কিছু করছেন। কিন্তু কী করতে পারি আমি! তবে এটুকু বলবো, নিজেকেই বলবো যে, একজন আধুনিক মোটামুটি শিক্ষিত বাবা হিসেবে ওদের সঙ্গে প্রায় সব বিষয়েই মতের অমিল থাকলেও ওদের একটি সম্পূর্ণ অন্য এবং ব্যতিক্রমী প্রজন্মর সদস্য হিসেবে মর্যাদা, সহানুভূতি ও মমতার সঙ্গে সবসময়েই আমি বোঝার চেষ্টা করি। ওরা আমাদের মতো নরম, অভিমানী, অন্যের প্রতি কনসিডারেট হলে ওরা যে ধনে-প্রাণেই মারা যাবে সে কথা বুঝেই ওদের বড় হয়ে ওঠার প্রকৃতি নিয়ে আর কোনোরকম খুঁতখুঁতানি রাখি না।

তা ছাড়া, অরার যেমন কুঁচ, আজকালকার সব ছেলেমেয়েরাই বোধ হয় তাদের মায়েদেরই ছেলেমেয়ে!

আমাদের সময়ে বাবারা সবসময়ই দূরের মানুষ ছিলেন। আমরাও তাই হয়ে গেছি। তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। আমরা, বাবা হিসেবে ছেলেমেয়েদের মাঝে-মধ্যে চিড়িয়াখানা, বা ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালে নিয়ে যেতে পারি বা ছুটিতে কোথাও বেড়াতে। কখনও সখনও চাইনীজ খাওয়াতে বা সাঁতার কাটাতেও নিয়ে যেতে পারি কিন্তু ওদের হৃদয়ের মর্মস্থলে আমরা শতচেষ্টাতেও পৌঁছতে পারি না।

তিন্নি ঘোষ, পুনপুন সেন, জ্যোতি খেতান বা পিংকি মালহোত্রার সঙ্গে আমার মেয়ে কুঁচ-এর মানসিকতা রুচি বা অরুচি, তৃষ্ণা বা বিতৃষ্ণা একই সুরে বাঁধা হলেও লক্ষ করি যে, ওরা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব। আমাদের বয়স যখন ওদের মতো ছিলো তখন আমাদের কারোরই ঐ রকম ঋজু এবং স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠেনি আদৌ। তাই অবাক বিস্ময়ে আমি ওদের দূর থেকে সম্ভ্রমের চোখে দেখি। ওদের জেদ, জীবনের যুদ্ধে লড়বার জন্যে এই অল্প বয়স থেকেই প্রাণপণ চেষ্টা, আমাকে মুগ্ধ যেমন করে, তেমন দুঃখিতও যে করে না, তাও নয়। ওদের এত কম বয়স থেকেই এমন প্রতিযোগিতার ঊষর জীবনে দীক্ষিত করার মূলে যে আমাদের প্রজন্মর অশেষ দায়িত্ব এবং কর্তব্যজ্ঞানহীনতাই দায়ী, সে সম্বন্ধে কোনোই সংশয় নেই আমার।

বাথরুমের টেলিফোনটা বেজে উঠলো। কতক্ষণ যে নিজের ভাবনায় নিজে বুঁদ হয়েছিলাম তার হুঁশ ছিলো না।

চেয়ারম্যান বললেন, শিমুল, প্লীজ কাম টু মাই রুম। সামবডি হ্যাজ সেন্ট মী আ বটল অফ রয়্যাল-স্যালুট। জারা "পী-পা"কে 'হায়াট রিজেন্সীমে' চলেঙ্গে খানাকে লিয়ে। পাঁচ মিনিটমে আ যাও। ডোন্ট বী আ অ্যান আন-সোশ্যাল অ্যানিমাল।

চেয়ারম্যানের অনুরোধ! হিজ উইশ ইজ আ কম্যান্ড টু মী। আমরা পাঁচপুরুষের চাকর। পা-চাটাটা আমাদের অতি সহজেই আসে। সাদা, কালো বাদামী; বেতো, ফুলো, নুলো; কোনো পায়েই আমাদের বিতৃষ্ণা নেই।

বললাম, ইয়েস স্যার!

জামা-কাপড় পরতে পরতে ভাবছিলাম, গিয়ে হ্যাঃ হ্যাঃ হিঃ হিঃ করতে হবে। অতি স্থূল সব রসিকতা শুনতে হবে। প্রথম দু-তিন মিনিট খাঁটি অক্সোনিয়ান অ্যাকসেন্টে ইংরেজি শুনতে হবে কিন্তু তারপরই অকৃত্রিম হরিয়ানা অ্যাকসেন্ট জবর-দখল নেবে চেয়ারম্যানের জিভের। এই হচ্ছে শ্রীশিমুল বোসের সাফল্যের চূড়ান্ত রূপ। আমাদের মতো মানুষদেরই কষ্টার্জিত আয়ের উপর ট্যাক্স দেওয়া সঞ্চয় যে-সব জাতীয় লগ্নিতে থাকে সেইসব জাতীয়

www.BanglaBook.org

লগ্নির টাকা মেরে যে-সব মানুষ ক্যাডিলাক লিমুজিন চড়ে এবং রয়্যাল-স্যালুট হুইস্কি খায় তাদের পায়ে তেল দিয়েই হ্যাঃ! হ্যাঃ! হিঃ! হিঃ! করে আমাদের সংসার প্রতিপালন করতে হবে। দিস ইজ আওয়ার লট।

আমি ঘেন্নার সঙ্গে রয়্যাল-স্যালুট হুইস্কি খেতে খেতে ভাবছিলাম, কুঁচদের জীবনের মানে, সার্থকতার ব্যাখ্যা কি কিছু অন্যরকম হবে না? যদি নাই হয়, তাহলে, আমরা কী রাখার মতো রেখে যাবো ছেলে-মেয়েদের জন্যে? আমিও কি "বাবা" ডাকের যোগ্য? আসল উত্তরাধিকার যে ব্যাঙ্কের টাকা নয়, সম্পত্তি নয়, তা চরিত্রর শুদ্ধতা, সুস্থ সামাজিক ব্যবস্থা, মানুষের মতো মাথা উঁচু করে বাঁচার অধিকার; এ কথা তো আমরা নিজেরাই বুঝিনি। কাউকে বোঝাবারও চেষ্টা করিনি। এই উত্তরাধিকার কুঁচদের দেবার জন্যেও বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিনি। তাই আমাদের ছেলেমেয়েদের জীবন হয়তো কুকুর-বেড়ালের জীবনেরও অধম হবে।

॥ ৩ ॥

প্রথম পরীক্ষার দিন, সোমবার সকালে ঠিক সাতটাতে কলকাতাতে-ফোন করলাম। কুঁচকে বললাম, অল দ্যা বেস্ট কুঁচ।

সে হেসে বললো, থ্যাঙ্ক উ্য বাবা।

খুব গর্ব হলো আমার ওর সপ্রতিভতা ও সাহস দেখে। ওদের তুলনাতে আমরা সত্যিই ম্যাদামারা ছিলাম। নার্ভাস, আত্মবিশ্বাসহীন।

রাতেও আবার ফোন করেছিলাম। শুধোলাম, পরীক্ষা কেমন হলো কুঁচ?

মেয়ে মনোসীলেবল-এ বললো, ঠিআছে!

বুঝলাম যে, ভালো পরীক্ষা দিয়েছে। ওদের ভোকাব্যুলারির রকমই এমন।

॥ ৪ ॥

ফ্লাইট অনেক ডিলেড ছিলো। বাড়ি ফিরলাম গভীর রাতে। তারা, এক নম্বর পরীক্ষার্থী, ঘুমিয়ে পড়েছিলো। দু নম্বর পরীক্ষার্থী কুঁচই এসে দরজা খুললো। কুঁচ তখনও পড়ছিলো। হাউসকোট পরা। দু-দিকে দুটি কাঠো বেণী ঝুলছে। বড় রোগা হয়ে গেছে মেয়েটা আমার এই ক'দিনে। চোখের কোণে কালি জমেছে।

বসবার ঘরের দেওয়াল-ঘড়িতে দেখলাম বারোটা বাজে।

বললাম, তুমি শোবে না কুঁচ?

শোবো। পড়া হলে। দুটোর সময়ে।

কাল কী পরীক্ষা?

বাংলা।

উঠবে কখন আবার?

চারটেতে।

এলার্ম দিয়ে রেখেছো?

হ্যাঁ।

তুমি অসুখে পড়ে যাবে কুঁচ। পরীক্ষাই দিতে পারবে না। তুমি যদি ফেল কর তাহলে

www.BanglaBook.org

তোমাকে সোনার মেডেল দেবো আমি।

ঠিক আছে। কিন্তু খারাপ রেজাল্ট করলেও তুমি কি আমাকে পরে প্রেসিডেন্সীতে ভর্তি করতে পারবে বাবা? নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছি তা দেখতে পাবে? তুমি রিটায়ার করার পরও কি আমাকে এমন সুখে রাখতে পারবে বাবা?

অসহায় বাবা, আমি মুখ নামিয়ে নিলাম। এত রাতে একজন অন্তঃসারশূন্য বাবার পক্ষে এই অন্তঃসারশূন্য দেশ ও সমাজের প্রেক্ষিতে এমন সাংঘাতিক সব প্রশ্নর জবাব দেওয়া সম্ভব ছিলো না।

কুঁচ বসবার ঘরের তীব্র আলোর মধ্যে আমার চোখের গভীরতম প্রদেশে তার চোখ রেখে তার ঘরে চলে গেলো। নিজের ঘরে পৌঁছনোর পূর্ব মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, যেসব কথার কোনো মানে হয় না, সে সব কথা বলো কেন বাবা?

চান-টান করে পায়জামা পাঞ্জাবি পরে আমি শুয়ে পড়লাম। কলকাতায় বেশ গরম পড়ে গেছে।

আমার, কুঁচ, অঙ্ক করার সময় কানে হেড-ফোন লাগিয়ে ওয়াকম্যানে ইংরিজি গান শোনে। তাতে নাকি "কনসেনট্রেশান" ভালো হয়। ওদের রকমসকমই আলাদা! বাংলা গান সে ভালোবাসে না। বাংলা বই পড়ে না। ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিকের কোনো খোঁজ রাখে না অথচ বাখ, বীটোভেন, মোৎজার্ট, মেন্ডলহেনসন তাদের হীরো। রক, পপ, জ্যাজই তাদের ক্রেইজ। ওরা ওদেরই মতো। আমাদের মতো একেবারেই নয়।

আমাদের ছেলেবেলায় পড়াশুনা না করার জন্যে বকুনি শুনতে হয়েছে কিন্তু বেশি পড়ার জন্যে কখনও শুনতে হয়নি। ওরা এক আশ্চর্য প্রজন্ম। ওদের পুরোপুরি বোঝা আমাদের পক্ষে অসাধ্য। ওরা এত বেশি শক্ত এবং জেদী আমাদের তুলনাতে যে, ওদের ভাঙার চেয়ে নিজেদের ভাঙা অনেকই সোজা।

প্রায় একটা বাজে এখন। এপাশ ওপাশ করছিলাম। নানা কথা ভাবতে ভাবতে। ঘুম আসছিলো না। রাতের ফ্লাইটে ফিরলে আমার ঘুম আসতে দেরি হয়। জেট-ল্যাগ হয়।

অরার সঙ্গেই শোয় কুঁচ, অরার ঘরে। যদিও পড়াশোনা করে তার নিজেরই ঘরে। অনেক রাত অবধি আমার আলো জ্বালিয়ে পড়াশুনা করার অভ্যেস। সেই কারণে কুঁচ আসার পর থেকেই অরা কুঁচকে নিয়ে আলাদা ঘরে শোয় রাতে। সপ্তাহে দু একদিন রাত গভীর হলে বা শেষ রাতে, আমার ঘরে আসে। এখন তো বানপ্রস্থে যাবার সময়ই এগিয়ে এলো।

নিশুতি রাতে হঠাৎ আমার বাহুর সঙ্গে অন্য নরম বাহুর ছোঁয়া লেগে ঘুম ভেঙে গেলো। ঘুম ভাঙতেই বুঝতে পেলাম যে-আমার পাশে শুয়ে আছে, সে আমার স্ত্রী অরা নয়, আমার মেয়ে কুঁচ।

যে-মেয়েকে রোজ রাতে শোওয়ার আগে শতবার একটি "আব্বা" দিয়ে যাবার জন্যে ডাকলেও সে হেসে চলে যায়। বলে, কাল সকালে। আর সকালে ডাকলে, দুষ্টুমির হাসি হেসে বলে, রাতে দেবো। সে মেয়েই কী না বিনা আমন্ত্রণে আমার পাশে এসে চুপিসাড়ে শুয়েছে মাঝ রাতে! অবাক কাণ্ড!

ফিসফিসে গলায় আমি বললাম, কী রে, কুঁচ?

কুঁচ উত্তর দিলো না কোনো।

অন্ধকারে তার মুখে আমার বাঁ হাতের আঙুলগুলি বুলাতেই দেখি তার দু-চোখ বেয়ে

www.BanglaBook.org

অঝোরে জল ঝরছে।

আমি উঠে বসে বললাম, এ কী! কি হয়েছে কুঁচ?

কথা না বলে, হঠাৎই চাপা কান্নায় ভেঙে পড়লো কুঁচ। তারপরই আমার দিকে পাশ ফিরে আমরা গলা জড়িয়ে ধরে অস্ফুটে বললো, বাবা!

সেই মুহূর্তটিতে কী যে ঘটে গেলো এই অপদার্থ, কর্তব্যজ্ঞানহীন, মেরুদণ্ডহীন শিমূল বোসের মধ্যে; একজন বাবার মধ্যে! যে-অপত্যস্নেহ প্রকাশ ক্ষেত্রের অভাবে, সময়ের অভাবে, বাঁধ-বাঁধা নদীর ফেনিলোচ্ছ্বাসেরই মতো নীরবে গর্জন করছিলো এত বছর আমার নির্জন ঊষর বুকের মধ্যে, তাই সহসা বাঁধ ভেঙে কুঁচের প্রতি এতদিনের পুঞ্জীভূত অপ্রকাশিত অভিমানকে ঠেলে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো এক মুহূর্তে। নিঃশব্দে আমার চোখ ভেসে যেতে লাগলো জলে। মায়ের মৃত্যুর পরে এমন করে কখনও কাঁদিনি। বুকের মধ্যে এয়ার-বাসের এঞ্জিন চালু হলো। হঠাৎ।

মধ্যবয়স্ক শিমূল বোস, এই আমি, আমার চোখের ধারার মধ্যে দিয়ে আমার অপদার্থতার গ্লানিকে মাড়িয়ে গিয়ে আশ্চর্য সুন্দর শিহরিত এক উত্তরণে পৌঁছোলাম।

কুঁচ বললো, আমার বড় ভয় করছে বাবা! আমি বাংলাতে ফেল করবো।

আমার খুব আনন্দ হলো এ কথা জেনে যে, কুঁচ আমার অতি-মানবী নয়। ও আমারই মতো সাধারণ। ভয় বলে কোনো ব্যাপার তারও অভিধানে তাহলে আছে!

আমি ওকে দু বাহু দিয়ে জড়িয়ে রইলাম।

বললাম, তোমাকে তো বলেইছি আমি যে, ফেল করলে সোনার মেডেল দেবো।

কুঁচ কথা বলছিলো না। ওর চোখ দিয়ে সমানে জল বইছিলো।

ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আমি ভাবছিলাম যে, আমি ওকে মিথ্যে স্তোক দিচ্ছি। ওকে যেমন করে হোক ভালো রেজাল্ট করতেই হবে। এই নিষ্ঠুর নখদন্তময় পৃথিবীতে ওকে সারা জীবনের নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। হয়তো ওর বন্ধুদের বাবাদেরও কারো নেই। আমার অসহায়তায় যেমন আমার কষ্ট হতে লাগলো, তেমনই আমার মেয়ে যে ভয় পেয়ে তার বাবার ঘরে উঠে এসেছে, তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছে, এই ভাবনাটাই এক দারুণ অনভ্যস্ত শ্লাঘাতে আমাকে ভরে দিলো। আমি জানলাম যে, মানুষ হিসেবে আমি ব্যর্থ হতে পারি, নিজের জীবনে যা হতে চেয়েছিলাম, তা না হয়ে উঠতে পারি; কিন্তু আমি একজন সার্থক বাবা।

এই সার্থকতাটুকুই বা বড় কম কী!

কুঁচ এবারে বললো, আমি পরীক্ষা দেবো না বাবা।

আমি বিছানা থেকে নেমে গিয়ে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম। যাতে অরার ঘুম না ভেঙে যায়। এখন "ফাদারিং টাইম"। বিপন্ন-কন্যা কুঁচ এখন শুধুই আমার একার। পিতাপুত্রীর এই কথোপকথনে মায়ের কোনোই ভূমিকা নেই। এমন এমন গর্বময় মুহূর্ত আজকালকার বাবাদের জীবনে বড় বেশি আসে না।

আমি বললাম, কোন পরীক্ষার কথা বলছিস রে কুঁচ?

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা! আবার কোন পরীক্ষা। কাল-পরশু বাংলা আছে।

ওঃ। এই পরীক্ষা! স্কুল ফাইন্যাল? তা নাইই বা দিলি!

দেবো না? তুমি...

ও পরীক্ষা না দিলেও চলবে। কিন্তু অন্য সব পরীক্ষা?

www.BanglaBook.org

কি? হিস্ট্রী, জিওগ্রাফী?

না, নারে। প্রতিদিনকার পরীক্ষারে মা। বক্সার জো-লুই কি বলেছিলেন একবার জানিস?

কি?

বলেছিলেন, "ইউ ক্যান রান বাট উ্য ক্যানট হাইড"। পরীক্ষারই আরেক নাম যে জীবন মা! তুই পালাবি কোথায়? এই যে আমি দিল্লিতে গেছিলাম, তাও তো একটি পরীক্ষাই দিতে! তোর বড়মামা যে এত বড়ো সার্জন, রোজ সকালে যে তিনি এতগুলো করে অপারেশান করেন, প্রত্যেকটি রোগীর অপারেশানই তাঁর এক একটি পরীক্ষা। তোর মা সকাল থেকে রাত অবধি আমরা কী খাব, কী পরে অফিস এবং স্কুলে যাব, তোর পড়াশুনা আমার কাজ এই সব এবং আরো কত ভাবনা নিয়ে থাকেন তাই প্রত্যেকটি দিনই সকাল থেকে রাত তাঁরও তো পরীক্ষা! রোজকার পরীক্ষা। ড্রাইভার কাউলেশ্বর সিং যে রোজ সকাল সাড়ে আটটাতে এসে গ্যারাজ থেকে গাড়ি বার করে এবং রাত সাড়ে আটটাতে গাড়ি ঢোকায় এই বারো ঘণ্টা তারও পরীক্ষা। একটি অ্যাকসিডেন্ট হলেই তার নিজের কাছেই সে ফেল। তোর ভালোমানুষ 'স্যার', তোর অঙ্কের মাস্টারমশাই, যিনি তোকে এত যত্ন করে পড়ান; তাঁর পরীক্ষাও যে তোর পরীক্ষার সঙ্গে জড়ানো। প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষাই তাঁর পরীক্ষা। কারণ তাঁর বিবেক আছে, দায়িত্ব-কর্তব্যজ্ঞান আছে। কালকের এই বাংলা পরীক্ষা তুই না দিতে চাস, তো দিস না। কিন্তু হার-জিতটা বড় কথা নয়। পরীক্ষাতে বসাটাই সবচেয়ে বড় কথা। তোর রমেশকাকা যে রোজ সকালে শামলা-গায়ে হাইকোর্টে যান তিনি কি প্রত্যেকটি মামলাতেই যেতেন? হয়তো হারেন অনেক মামলাই। কিন্তু যে মামলাতে জিতবেন তারই শুধু ব্রিফ নেবেন আর যাতে হারবেন তার ব্রিফ নেবেন না, এমন ডিসিশান নিলে তো কোনোদিনই উনি বড় উকিল হতে পারতেন না। তোর গাডলুকাকা, যে কিছুই না করে হেসে খেলে জীবনটা কাটিয়ে গেলো, আমাদের ঠাট্টা করে, "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ"-এ বিশ্বাস করে, তার জীবনেও প্রত্যেকটি দিনই পরীক্ষা। পাছে, সে চাকরি নিতে বাধ্য হয়, তার বোহেমিয়ান জীবনের ইতি ঘটে; এই তো তার সর্বক্ষণের ভয়। তোর স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষা এইবার না দিতে চাস তো দিস না। কিন্তু জীবনের পরীক্ষাকে যারা এড়িয়ে যেতে চায় তারা যে মানুষই নয় রে মা। এ জীবনের প্রত্যেকটি ঘণ্টা, প্রত্যেকটি পদক্ষেপের আরেক নামই যে পরীক্ষা!

টেবিলের উপরের টাইমপিসটার রেডিয়াম দেওয়া কাঁটাগুলি তখন রাত দুটো দেখাচ্ছিলো। টিকটিক শব্দ করে সেই মধ্যরাতের নৈঃশব্দকে ফুটো করে যাচ্ছিলো ঘড়িটা।

কুঁচ একটি খুব বড় দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

বড় বেশি কথা বলে ফেললাম কি? যাত্রাদলের নায়কের মতো? মেয়ের কাছে "বাবা" হওয়ার সুযোগ পেয়ে কি "ওভার-ডু" করলাম?

কুঁচ আরেকটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমাকে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেই বললো, তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরো বাবা!

আমি ওকে জড়িয়ে ধরে ওর গালে একটি চুমু খেয়ে বললাম, আজকে ভোরে উঠবে না তুমি। আমার কাছে শুয়ে থাকো। যেমন পারবে, তেমনই দেবে পরীক্ষা। ভুলে কিছুই যাওনি তুমি। সবই মাথায় ধরা আছে। প্রশ্নপত্র পেলেই দেখবে কলমের মুখে তরতর করে শব্দ আসছে। এ সব পরীক্ষা তো খেলার পরীক্ষা! এমন অনেক পরীক্ষা দেবার পরই তো আসল পরীক্ষাতে বসতে হবে তোমাকে। জীবনের পরীক্ষা।

www.BanglaBook.org

কুঁচ আমার কানের মধ্যে গরম নিঃশ্বাস ঢেলে নিয়ে বললো ; "ব্যাটল অফ লাইফ।"

বললাম, হ্যাঁ মা। ব্যাটল অফ লাইফ। তার জন্যে অ্যাডমিট কার্ড, আগে থেকে ঠিক করা পরীক্ষাকেন্দ্র; কিছুই থাকবে না। কোথায়, কখন, কার সঙ্গে যে সেই যুদ্ধ লড়তে হবে তা আগে থেকে কিছুই জানা যাবে না। অথচ লড়তে হবে ঘণ্টায় ঘণ্টায়।

সে-পরীক্ষার প্রায় সব পেপারই "আন্‌সীন"।

এতক্ষণ কুঁচের সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হয়ে ছিলো। এবারে ওর শরীরের সব মাংসপেশী ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে এলো। নিজেকে, নিজের ভয়কে সে নিঃশর্তে সমর্পণ করলো তার বাবার বুকে।

কুঁচ আবার বললো, বাবা। তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরো।

হ্যাঁ রে মা। ধরেছি জড়িয়ে।

আমি বললাম।

কুঁচের চোখের জল শুকিয়ে গেছিলো ততক্ষণে। কিন্তু আমার দু চোখ আরো সিক্ত হলো।

কিণ্ডারগার্টেন ক্লাস থেকে অরাই কুঁচের পড়াশোনার সব দায়িত্ব বহন করেছিলো। আমি কিছুই করিনি। আমার মেয়ে এতদিন আধো-চেনাই ছিলো আমার কাছে। মনে মনে বললাম, শিমূল বোস, ভাগ্যিস তোমার মেয়ের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা চলছিলো। ভাগ্যিস বাংলা পরীক্ষার আগের রাতে সে ভয় পেয়েছিলো। তাই তুমিও আজ হঠাৎ এক মস্ত পরীক্ষাতে পাস করে গেলে!

টাইমপিস আর পাখার শব্দে শুক্লপক্ষর চাঁদের আলো-মাখা কলকাতার রাতের দুধলি অন্ধকার চারদিকে চারিয়ে যাচ্ছিলো। ফুলের গন্ধ আসছিলো সেনদের বাড়ির বাগান থেকে। গভীর আনন্দে, আমি আমার মেয়েকে বুকে জড়িয়ে শুয়ে রইলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিড়াল

এ ঘরটার অবস্থা শোচনীয়। মাঝে মাঝেই দেওয়াল থেকে পলেস্তারার চাপড়া খসে পড়ে। বর্ষার দিনে পশ্চিমের দেওয়াল জুড়ে ড্যাম্প, ভেজা ভেজা স্যাঁতসেতে সব সময়। শীতের দিনে রুখু উত্তুরে বাতাস পাশের নতুন ওঠা মাল্টিস্টোরিড বাড়ি হয়ে গোঁত্তা মেরে ঢুকে পড়ে পশ্চিমের জানালা দিয়ে।

পঁচিশ বছর আগেও শোচনীয় ছিলো। এখন অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। এই ঘরেই ঘোষ অ্যান্ড দাশগুপ্ত কোম্পানির ক্যাশিয়ার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, বিল ক্লার্ক ও টাইপিস্টদের বসার জায়গা। বছর পনেরো আগে এ-ঘরে সিনিয়ার পার্টনার ঘোষ সাহেব বসতেন। পাশেই তাঁর বাথরুম ছিলো।

তারপর সব বদলে গেছে। ঘর পাল্টাপাল্টি হয়েছে।

মেসিনে নতুন করে কার্বন চাপালেন খেয়ালবাবু। বড় সাহেব হাতের লেখা ড্রাফট-এর উপর ছোট্ট করে লিখে দিয়েছেন, ওয়ান প্লাস থ্রি, অন লার্জ প্যাড।

কার্বনটা চাপাতে চাপাতে, আড়চোখে হাতঘড়িটা দেখলেন একবার উনি। সাড়ে সাতটা বাজে। আজ মনোর মাকে নিয়ে গায়নাকোলজিস্টের কাছে যাওয়ার কথা ছিলো।

এমন সময় ছোকরা বিল ক্লার্ক সমীরণ একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, খেয়ালদা, আজ সাহেবদের কাছে একজন লোক এসেছিলেন। তাঁর কাছে শুনলাম আজকাল বিদেশে একরকম কাগজ বের হয়েছে তাতে কপি করার জন্যে কার্বন পেপারের আর দরকারই হচ্ছে না। নিচে রেখে টাইপ করলে এমনিতেই কপি হয়ে যাচ্ছে।

খেয়ালবাবু হাত থামিয়ে বললেন, বলো কি? সত্যি?

সত্যি নয় তো মিথ্যা! তবে, তবুও টাইপিস্টদের দরকার হচ্ছে। কিন্তু ফোটো-কপি বা জেরোক্স মেশিনের এদেশে যদি তেমন চল হয় তবে টাইপিস্টরা তো সব না-খেয়েই মরবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খেয়ালবাবুর বুকটা ধক্ করে উঠলো। খেয়ালবাবু ম্যাট্রিক পাশ। জোতদার ছিলেন। দেশ ভাগের পর তাই টাইপ শিখে এই লতায়-পাতায়-আত্মীয়র অফিসে ঢুকেছিলেন। পুরোনো লতায় আর জোর নেই। ছিঁড়ে গেছে অনেক জায়গাতেই।

সমীরণকে ধমক দিয়ে বললেন, হ্যাঁ। সকলেই যেন জেরোক্স আর ফোটোকপি বসাচ্ছে। তাহলে তো আর কথাই ছিলো না। ওসব বিদেশেই চলে। যে দেশে এত লোক বেকার, সে দেশে চলবে না।

সমীরণ সিগারেটে বড় একটা টান দিয়ে বললো, তা কুকুর বেড়ালের মতো মানুষ পায়দা হলে আর বেকারত্ব ঘুচবে কী করে?

সে যাই-ই হোক।

বলেই খেয়ালবাবু কথাটা ঘুরিয়ে নিলেন, কারণ সমীরণের এই জেনারাল স্টেটমেন্টে ওঁর প্রতি একটা কটাক্ষ ছিলো। খেয়ালবাবুর ছেলে মেয়ে ছয়। অবশ্য একটি নেই। আর বড় মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। এক ছেলে চাকরি করছে। বাকী তিনজন।

বললেন, ওসব বসাতে পয়সাও তো লাগে। ওসব বড় কোম্পানিই বসাতে পারে। টাটা-বিড়লারা। তোমার এই ছাতার ঘোষ অ্যান্ড দাশগুপ্তের এত টাকা কোথায়? মাসের দশ-বারো তারিখের আগে তো মায়নাই হয় না কোনোদিন, তার আবার ফোটোকপি!

উষ্মার সঙ্গেই বললেন কথাটা খেয়ালবাবু।

বলেই, ঘাবড়ে গেলেন।

ঐ সমীরণ ছোকরা, দাশগুপ্ত সাহেবের কীরকম যেন আত্মীয় হয়। যদিও মাখামাখি নেই। রাজা-প্রজারই সম্পর্ক। কিন্তু তবুও ছোকরা কুচুটে আছে। যদি বলে দেয়?

তারপর আবার বললেন, বসায়ও যদি কোম্পানি, তাহলেও আমাদের জীবদ্দশায় বসাবে না।

সমীরণ অনেকক্ষণ একদৃষ্টে খেয়ালবাবুর দিকে চেয়ে রইলো।

তারপর হেঁয়ালী করে, সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে বললো, কে বলতে পারে?

॥ ২ ॥

খেয়ালবাবুর ভালো নাম দ্বিজা রায়। আদি বাড়ি, বরেন্দ্রভূমি। পাবনা জেলায়। ছোটখাট জোতদারী ছিলো একটা চলন বিলের কাছাকাছি। ছোটবেলায় মাথায় কাঁসার জামবাটি উপুড় করে গামছা দিয়ে কষে বেঁধে নিয়ে হেলমেটের কাজ চালিয়ে কত চিতাবাঘ মেরেছেন। চলন বিলে পাখি শিকার। খাওয়া-দাওয়া। দোল-দুর্গোৎসব। তখন একটা টইটম্বুর ভুঁড়িও ছিল। জমিদারী আছে এবং থাকবে এই শাশ্বত বিশ্বাসে ভুঁড়িটাকে বর্ধমান হতে বাধা দেননি। কিন্তু হঠাৎ দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ায় সর্বনাশ হয়েছিল।

জোতদারী চলে গেছিল; ভুঁড়িটা রয়ে গেছিল।

এই গল্প, খেয়ালদা সকলকে বেশ রসিয়েই করেন, মানে, আগে করতেন। আজকাল রসের গল্প করার মতো মন বা শারীরিক অবস্থা আর তাঁর নেই। আগের তুলনায়, অনেক কষ্টে থাকেন এবং এই কষ্টতেই অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও রসবোধ এবং রসিকতা করার ক্ষমতা তাঁর অনাবিল ছিলো বহুদিন।

একসময় নামকরা খেয়ালী ছিলেন তিনি। তাঁর গলায় ধ্রুপদ ধামারও যাঁরা শুনতেন,

www.BanglaBook.org

তাঁরাও মুগ্ধ হতেন। তবে খেয়ালেই তাঁর নাম বেশি ছিল। অফিসের সহকর্মীরা এবং অন্যান্য জানাশোনা অনেকেই বলতেন যে, খেয়ালদা গান ছেড়ে না-দিলে কী হতেন আর কী হতেন না; তা বলা মুশকিল। বয়সে তিনি বড়ে গোলামের চেয়ে ছোট এবং আমীর খাঁর চেয়ে বড় ছিলেন। প্রাচুর্য, অবকাশ, ভাবনাবিহীন এবং ক্লেশহীন আয়ের জগৎ থেকে হঠাৎই নির্বাসিত হয়েছিলেন। এই ঘোষ অ্যান্ড দাশগুপ্তের টাইপিস্টের চাকরিটা পেয়ে মরতে মরতেই বেঁচে গেছিলেন। সে কারণেই, এই পঁচিশ বছর কোনোক্রমে বেঁচে আছেন এখনও না-মরে। অতিকষ্টে সংসার প্রতিপালনের গ্লানিতে ন্যুব্জ হয়ে না-পড়লে খেয়ালদা গান-বাজনার জগতে সত্যিই হয়ত একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হতেন।

খেয়ালবাবু ঘড়িটা আর একবার দেখলেন, তারপর বেয়ারা হিতেনকে বললেন, ছোট সাহেবকে একবার জিগ্যেস করে আয় আর কোনো কাজ বাঁকি আছে কী না। এই, হিতেন!

খেয়ালবাবু বাঙালত্ব প্রায় বিসর্জন দিয়েছেন কিন্তু এখনও উত্তরবঙ্গের, বিশেষ করে পাবনা জেলার এই চন্দ্রবিন্দুর প্রতি পক্ষপাতিত্বকে বিসর্জন দিতে পারেননি।

হিতেন একটু পরে ফিরে এসে বললো, আছে বাঁকি। আজ গঁাদাধরবাঁবু আঁসেন নিঁ তোঁ!

খেয়ালবাবু দাঁত কিড়মিড় করলেন।

হিতেনটা বহুদিনের লোক। সমানে ইয়ার্কি করে ওঁর সঙ্গে।

গদাধর, এ অফিসের পার্টটাইম স্টেনোগ্রাফার। সরকারি অফিসে কাজ করে, সেখানে মাইনে, প্লাস ডি-এ, পি-এফ, গ্র্যাচুইটি; পেনশান। কাজের বেলা কিছুই নয়। এদিকে সন্ধের পর এখানে ঘন্টা দেড়-দুই ঘুরে গিয়েও মন্দ হয় না।

খেয়ালবাবু প্রায়ই ভাবেন যে, জীবনে একটা বেসিক মিস্টেক হয়ে গেছে। মাঝবয়সে চাকরিতেই যখন ঢুকতে হলো তখন সরকারি চাকরির চেষ্টা করাই উচিত ছিলো। কিন্তু ফর্ম্যাল এডুকেশন যে তেমন ছিলো না। তখন তো মধ্যবিত্তরাই বি-এ—এম-এ পাশ করত কেরানী হবার জন্যে। জমিদারের ছাওয়াল! কেউ আবার চাকরির জন্যে পড়াশুনা করত? যাই-ই হোক, খেয়ালবাবু ভাবতেন, যে, এদেশে সরকারি কেরানীর মতো সুখের চাকরি বোধহয় আর কোথাওই নেই!

ম্যাটারটা টাইপ করা শেষ করে সবে একটা বিড়ি ধরিয়েছেন। তাঁর রঙচটা "সাইমা" হাতঘড়িটাতে তখন পৌনে আটটা বেজে গেছে। এমন সময় হিতেন এসে বললো, খেয়ালবাবু; তলব।

আধ-ফোঁকা বিড়িটা তাড়াতাড়ি অ্যাশট্রের ওপর ব্যালান্স করে রেখে তিনি দৌড়ে করিডর পেরিয়ে ওঘরে গেলেন। তারপর ঘর পেরিয়ে ছোটসাহেবের চেম্বারে। দু দুটো এয়ার কন্ডিশনার চলছে দুপাশে। ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার জোগাড়। ছোটসাহেব সত্যিই সাহেব মানুষ।

ছোটসাহেবের সামনে স্যুট পরা এক ভদ্রলোক বসেছিলেন!

খেয়ালবাবুকে ছোটসাহেব হাত দেখিয়ে বসতে বললেন।

ভদ্রলোক ছোট একটা পকেট-ক্যালকুলেটর বের করে কী সব অঙ্ক কষছিলেন। হঠাৎ মুখ তুলে বললেন, নো প্রবলেম।

নো প্রবলেম? ছোটসাহেব উজ্জ্বলমুখে শুধোলেন ভদ্রলোককে।

আই সেইড সো। গো অ্যাহেড। ভদ্রলোক বললেন।

ছোটসাহেব দাঁড়িয়ে উঠে ভদ্রলোকের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন।

www.BanglaBook.org

বললেন, ইট্স আ ডীল দেন।

ইয়া! ডীল।

ভদ্রলোক বললেন।

তারপর দুজনেই বেরিয়ে গেলেন। বোধহয় ভদ্রলোককে লিফট পর্যন্ত পৌঁছে দিতে গেলেন ছোটসাহেব।

খেয়ালবাবু ভাবছিলেন যে, এত ঠাণ্ডায় মানুষ বসে থাকে কী করে? হারেম-টারেম আছে বোধহয় ছোটসাহেবের, নয়ত রোজ আন্ডেকা রোশান হালুয়া এবং বিরিয়ানি পোলাউ খান। তাও তো ছোটসাহেবের বয়স চল্লিশ-টল্লিশ হবে। কিন্তু বড় সাহেব? বড় সাহেব তো তাঁর নিজের চেয়েও অনেক বড় হবেন বয়সে। কিন্তু তাঁর ঘর যেন আরও ঠাণ্ডা। ষাট বছরের লোকের পক্ষে চেহারাটা যথেষ্ট ইয়াং রেখেছেন বলতে হবে। সিলভার-টনিকে জরা-ভরা আতুরেরাও নবীন হয়ে ওঠে বোধহয়। খেয়ালবাবুও হতেন। জোতদারী থাকলে।

এমন সময় ছোটসাহেব দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন।

খেয়ালবাবু উঠে দাঁড়ালেন। যেমন করে খেয়ালবাবুকে দেখে চরের মুসলমান প্রজারা, হিন্দু প্রজারা উঠে দাঁড়াতো! আজকে দেশে জাতিভেদ প্রথা উঠে গেছে! শিডিউলড কাস্ট আর শিডিউলড ট্রাইবরা কত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু নতুন জাতিভেদ তৈরি হয়ে গেছে, যার শিকড় চলে গেছে অনেক গভীরে। যেখানে উঁচু নিচু সব জাত একাসনে। ছোটসাহেব বড় সাহেব এখন ব্রাহ্মণ, এবং খেয়ালবাবু, সমীরণ, হিতেনরা সব ছোট জাত। এক দলদের দেখে অন্যদের তখনও উঠে দাঁড়াতে হত; এখনও হয়। খেয়ালবাবু যে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তো দাঁড়িয়েই রইলেন।

ছোটসাহেব বড় অন্যমনস্ক। এই তো সেদিন হায়দ্রাবাদে বেলে-ভিস্তাতে দশ হাজারী ম্যানেজমেন্ট কোর্স শেষ করে এলেন। তারপর থেকে অফিস মডার্নাইজেশান, খরচ-কমানো, সিমপ্লিফিকেশান অফ অপারেশান্স, টাইম-ম্যানেজমেন্ট এসব নিয়ে বুঁদ হয়ে আছেন। মাথায় যে কত শত ক্রিয়েটিভ ভাবনা ঘুরছে, তা বলার নয়।

অনেকক্ষণ পর ছোটসাহেবের খেয়াল হলো। বললেন, বসুন বসুন। একটা ডিকটেশান নিনতো।

খেয়ালদা খাতাটা বাগিয়ে ধরলেন। তিনি তো আর স্টেনোগ্রাফার নন, তবু। পেনসিলটাও ঠিক-ঠাক করে নিলেন।

ছোটসাহেব বললেন, দ্যা এজেন্ট, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ। হাইকোর্ট ব্রাঞ্চ।

খেয়ালবাবু হাইকোর্টে এসে পেন্সিল ভেঙে ফেললেন। পটাং করে আওয়াজ করে শীষটা তিন টুকরো হয়ে গেলো।

সব বাঙালেরই হাইকোর্টের নামেই হয়তো ভীতি থাকে।

ছোটসাহেব বললেন, ওয়ার্থলেস।

খেয়ালবাবু বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে বাঁ চোখের অঞ্জনীটাকে একটু ঘষে নিলেন। কুট কুট করছে বড়।

ছোটসাহেব বললেন, একদিনও কি একটু কাজটা চালিয়ে নিতে পারেন না? আপনারা সব আউট-ডেটেড্ ইউসলেস হয়ে গেছেন। একেবারে ফসিল। যান। বাড়ি যান।

খেয়ালবাবু আগে আগে ছেলেমানুষ অবস্থায় উত্তেজিত হতেন। শনৈঃ শনৈঃ জেনেছেন

www.BanglaBook.org

যে, বেসরকারি অফিসে উত্তেজনা মানে ব্লাডপ্রেসার বৃদ্ধি, মালিকের কু-দৃষ্টি এবং বরখাস্ত। যেসব সরকারি, আধা-সরকারি ও ব্যাঙ্ক-ইনসিওরেন্স ও বড় বড় মার্চেন্ট অফিসের কর্মচারীরা মিছিল করে লাল শালুর ওপর বক্তৃতা লিখে ডালহাউসী-চৌরঙ্গী গমগম করে ফেলে, তারা যা মাইনে ও সুযোগ সুবিধা পায়, তা পেলেও খেয়ালবাবু বর্তে যেতেন। তার উপর খেয়ালবাবু জানেন যে, তাদের চেয়ে কাজও চারগুণ বেশি করেন খেয়ালবাবু। ঐসব মিছিলকারী মানুষগুলো, মদনার, মানে খেয়ালবাবুর নকশাল ছেলের ভাষায় ছিলো, পাতি বুর্জোয়া।

ছোটসাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে খেয়ালবাবু ভাবছিলেন, ঐ মদনারাই ওষুধ ছিলো এদেশের। সব অসুখের ওষুধ। মদনার কথা মনে হলো খেয়ালবাবুর। মদনাকে একটা রাজনৈতিক দলের ছেলেরা প্রায় তার বাড়ির উপরেই কুড়িজন মিলে রেকটামে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে মেরেছিলো। আত্মীয় স্বজন, অফিসের প্রায় পনেরোজন লোক রক্ত দিয়েও মদনাকে বাঁচাতে পারেননি। ওখানে স্টিচ থাকে না। রক্ত, সকলের রক্তই, বেরিয়ে গেছিল। মাঝে মাঝে অফিসফেরতা লাস্ট ট্রাম কী বাসের জানালায় হাত রেখে বসে, হাই তুলতে তুলতে শ্যামবাজারের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ মদনার মুখটা ভেসে ওঠে। ওকে যখন মারে ঐ ছেলেগুলো, তখন ওর বয়স ষোলো।

আটটা ষোলো। সমীরণ বললো।

খেয়ালবাবু তাড়াতাড়ি মেসিনটা গোছগাছ করে রাখলেন, ছাতাটা কোণা থেকে তুলে রাবারের জুতোটা দেওয়ালে হেলান দিয়ে কসরৎ করে পরতে লাগলেন। জুতোটা একজন তাঁকে দান করেছে। এক সাইজ ছোটো। একটু কষ্ট করে পরতে-খুলতে হয়। হলেও, এই বাজারে কুড়িটা টাকা বাঁচানো! চাট্টিখানি কথা নয়।

বেরিয়ে যেতে যেতেই কী মনে হওয়ায়, হিতেনকে বললেন, যা, বড়সাহেব ছোটসাহেব দুজনকেই জিগ্যেস করে আয় বাড়ি যাব কী না।

হিতেন এক দৌড়ে চলে গিয়েই ফিরে এলো। বললো, যেতে পারেন। তবে কাল সকাল সকাল আসবেন।

সকাল সকাল মানে, কখন?

হিতেন বলল, ন'টার মধ্যে।

আজ বিকেল থেকে নিচের ব্যস্ত পথের গাড়ি, বাস, ট্রামের যন্ত্রমর্মর ছাপিয়েও মেঘের গুড়গুড় শোনা যাচ্ছিল। কাগজে লিখেছিল, রাতের দিকে ঝড়-বৃষ্টি হবে।

দুগগা দুগগা বলে খেয়ালবাবু সিঁড়ি দিয়ে তরতরিয়ে নামতে লাগলেন। লিফটের জন্যে অপেক্ষা করার তর তাঁর সইলো না।

ট্রামের বাঁদিকে একটা জানালার পাশে বসার জায়গা পেয়ে বসতেই হঠাৎ খেয়ালবাবুর ছোটসাহেবের মুখে শোনা "ফসিল" কথাটা মনে পড়লো। ফসিল এর মানে জানেন না খেয়ালবাবু। কথাটা তাঁকে ভাবিয়ে তুললো। বাড়ি গিয়েই তাঁর পার্ট-ওয়ান পড়া মেয়েকে জিগ্যেস করতে হবে। ও না জানলে, বাড়িতে বহু পুরানো একটা ইংরেজি থেকে বাংলা ডিকশনারী আছে, সেটাকে খুঁজে বের করে দেখতে হবে।

এখনও বৃষ্টি নামেনি। তবে অদূরে কোথাও হচ্ছিল। হাওয়াটা বেশ ঠাণ্ডা। গা-শিরশিরে হাওয়ায় বসে ফসিল কথাটার এবং ছোটসাহেবের মুখ বিকৃতি করে সে কথা বলার ভঙ্গীটির কথাও হঠাৎ মনে পড়ে গিয়ে খেয়ালবাবুর শীত শীত করতে লাগলো। এখনও

www.BanglaBook.org

তিনটে ছেলে মেয়ের দায়িত্ব। দুটি মেয়ের বিয়ে বাকি। নিজের শরীরেও আর দেয় না।

শ্যামবাজারের মোড় থেকেও অনেক দূরে মধ্যমগ্রামের মোড় থেকে যে রাস্তাটি বাদুর দিকে চলে গেছে সেই রাস্তায় খেয়ালবাবুর বাড়ি। অফিস থেকে লোন নিয়ে উনিশশো পঞ্চাশে টালির ছাদে ছ্যাঁচা বাঁশের উপর চুনবালির পলেস্তারা দিয়ে তিনখানি ঘর করে নিয়েছিলেন। একটা ছোট্ট পুকুর। মাঝে মধ্যে গলায় দড়ি বেঁধে কাউঠা রাখেন তাতে। পালা-পার্বনে অতিথি কুটুম এলে দড়ি ধরে তুলে উপুড় করে কেটে খাওয়ান। একটা টিউবওয়েল, পেঁপে গাছ, নারকোল গাছ, একটা লিচু, দুটো আম এবং একটা কাঁঠাল। যজ্ঞি ডুমুরও আছে একটা। রঙ্গনের ঝাড়, টগর আর হাসনুহানা।

মনোরমার ভারী গাছ-গাছালির শখ। বাড়ি, গাড়ি, শাড়ি-গয়নার শখ তো এজন্মে মিটলো না! তাইই শুধু গাছের শখটা মিটিয়েছেন বছর বছর রথের মেলায় শেয়ালদার সামনে থেকে চারা কিনে এনে।

বাড়ি যখন ঢুকলেন খেয়ালবাবু, তখন রাত প্রায় সাড়ে ন'টা। লণ্ঠনের আলোতে ডুরে শাড়ি পরা মেয়ে রমা পড়াশুনা শেষ করে বালিশের ওয়াড় রিপু করছিলো। ছোটটা ঘুমিয়ে পড়েছে। মেজ ছেলে আড্ডা মারতে বেরিয়েছে। ফেরেনি এখনো। বারাসতের মোড়ের করুণাময়ী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে গিয়ে রোজ সন্ধেবেলা আড্ডা না মারলেই নয়। ইংরেজি তো দূরের কথা, বাংলাতেও একটা চিঠি লিখতে পারে না; অথচ জানে না এমন বিষয় নেই। জনতা সরকার কেন ভেঙে যাবেই, ইন্দিরার আসল দোষ কি, কেম্পেস কী করলে ওয়ার্লড কাপে আরো গোল দিতে পারত, অথবা শত্রুঘ্ন সিনহার ক' ভাই বোন এ সমস্তই তার জানা।

পুকুরে ডুব দিতে দিতে খেয়ালবাবু বললেন, হারামজাদা! সব হারামজাদা! অকৃতজ্ঞর ঝাড়। বড় ছেলে খগেনের চাকরি বড় সাহেবকে ধরে করে তিনিই করে দিয়েছিলেন। এখন মাইনে পায় তাঁর দু গুণ। কিন্তু পেলে কী হয়। হাত-কাট্টি পেট-কাট্টি ব্লাউজপরা বউ নিয়ে সে আলাদা হয়ে গেছে। সংসারে আধলা দিয়েও সাহায্য করে না। মাঝে মাঝে খেয়ালবাবুর সন্দেহ হয় যে, এরা সব তাঁর নিজেরই ছেলে কী না। মেয়েগুলোর তবু একটু টান আছে। বড় মেয়েটির তো আছেই। কিন্তু এই বাজারে সকলেরই টানাটানি। টান থাকলেও দেখাতে পারে না।

কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি পেতে মাটির মেঝেতে খেতে দিলেন মনোরমা খেয়ালবাবুকে। মেয়ে রমা পাশে বসল হাতপাখা নিয়ে। পুকুর পাড়ে ব্যাঙ ডাকছে। জোনাকী জ্বলছে দূরের বাঁশ ঝাড়ে। লম্ফর শিখাটা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে হাওয়ায়। ছায়া নাচছে দেওয়ালে। খেয়ালবাবুর সরু সরু হাত দুটোকে মোটা শক্ত সমর্থ মনে হচ্ছে ছায়াতে। খেয়ালবাবু ভাবলেন, সত্যি হাতদুটো এমন হলে, কী ভালোই না হত!

মনোরমা স্বগতোক্তি করলেন, বৃষ্টির দেখা নেই। সন্ধ্যার দিকে দু এক ফোঁটা চিড়বিড়িয়ে পড়েছিল। ব্যসস।

মুসুরির ডালে একটা কাঁচা লঙ্কা ডলে নিয়ে লাল লাল ভাত মাখলেন খেয়ালবাবু। দাঁতে কাঁকর লাগল একটা কট করে। কুমড়োর সঙ্গে খেশুনের ঘ্যাঁট পাটপুতা দিয়ে কাঁঠালের বিচির লোত-লোত তরকারি একটা।

জল খেলেন কোঁত কোঁত করে। রমা জল ভরে দিল ঘটি করে গ্লাসে। একটা তেলাপোকা উড়ে এলো পাতের দিকে। মনোরমা ধরতে গেলেন। রমাও। তাড়াতাড়িতে

www.BanglaBook.org

রমার হাতে লেগে গ্লাসটা উল্টে পাতে পড়লো। কুমড়োর ঘ্যাঁট, মুসুরির ডাল, পাতাপুতার তরকারি জলে ভেসে গেল।

মনোরমা ঠাস করে মেয়ের গালে চড় লাগালেন।

এমন সময় বেড়ার ধার থেকে কে যেন ডাকলো, রমা।

খেয়ালবাবু উৎকর্ণ হলেন। মনোরমা ইশারায় মেয়েকে যেতে বললেন। রমা উঠে গেলো।

মনোরমাও উঠে রান্না ঘরের কোণা থেকে একটা কাসুন্দির শিশি বার করে নিয়ে এলেন। নিচে একটু তলানি পড়েছিল। তাই দিলেন ঢেলে, খেয়ালবাবুর পাতে, ঝাঁকিয়ে নিয়ে। জলে ভেজা ভাতে-ডালে একটু স্বাদ হলো।

খেয়ালবাবু নরম ভাত খেতে খেতে বললেন, ছেলেটাকে তুমিও তাহলে প্রশ্রয় দিচ্ছো?

প্রশ্রয়ের কী আছে? মেয়েকে কি তুমি ভালো বিয়ে দিতে পারবে? ওরা কত বড়লোক! ঝন্টু বলেছে টালিগুলোর ওপরে টার-ফেল্ট না কী যেন বিছিয়ে দেবে। বর্ষা এসে গেছে। সারা রাত তো সব ক'টা ঘরেই জল পড়ে। সমস্ত রাত তো ঘটি বাটি পেতে আর খাট সরিয়ে সরিয়ে জেগেই কাটাতে হয়। তোমার কি? সারাদিন অফিসে থাকো। কাপের পর কাপ ভালো চা খাও আর মাঝরাতে এসে আমার উপর মেজাজ করো।

হুঁ।

খেয়ালবাবু বললেন।

তারপর বললেন, তুমি কি ভাবছ, ঝন্টু বিয়ে করবে? ওরা মজা লুটতে আসে। বিয়ে করার সময় ঝন্টু ঠিক জাত মিলিয়েই বিয়ে করবে! বিয়েতে কত কী দান পাবে। রেডিও, টেলিভিশান, স্কুটার। তুমি কি বুঝবে ওসব শয়তান ছেলেদের কারবার।

মনোরমা ঠোঁটে আঙুল দেখিয়ে বললেন, চুপ! শুনতে পাবে।

এমন সময় রমা এসে রান্নাঘরে ঢুকলো। রমার হাতে একটা বিরাট দেড়-কেজি সাইজের ইলিশ। রুপোলী আঁশগুলো লম্ফর আলোয় চকচক করে উঠলো।

খেয়ালবাবুর গলায় ভাত আটকে গেলো। কাঁচা ইলিশের গন্ধটা যে কী মিষ্টি! কাঁচা লঙ্কা কালো-জিরে দিয়ে ঝোল? না, না, সর্ষে-বাটা দিয়ে। না কি দই ইলিশ? ভাজা-মাছ, আর মাছ-ভাজা তেল দিয়ে কাঁচা লঙ্কা পেঁয়াজ দিয়ে একথালা ভাত খেতে পারেন খেয়ালবাবু। ইলিশের মাথা দিয়ে কচুর শাক? সঙ্গে, একটু ছোলা?।

মনোরমা বললেন, কে দিলো?

রমা গর্বের সঙ্গে বললো, ও।

গর্বে, রমার নাকের পাটা ফুলে উঠলো।

খেয়ালবাবু বললেন, ওরে, ডাক ঝন্টুকে। ওকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখলি কেন?

ঝন্টু হাসনুহানার ঝোপের পাশ দিয়ে এসে রান্নাঘরের সামনে দাঁড়ালো।

মনোরমা বললেন, এত বড় মাছ, কোথায় পেলে বাবা?

ঝন্টু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো, গেছিলাম রাণাঘাটে গুড় কিনতে মহাজনের গদীতে। সাড়ে তিনটের পর লালগোলা প্যাসেঞ্জার এলো। নিয়ে এলাম লালগোলার ইলিশ। টাটকা মাছ। বরফ দেওয়া নয়।

খেয়ালবাবু বললেন, কত করে নিলো বাবা?

আঠারো টাকা। ঝন্টু বললো।

www.BanglaBook.org

আঠারো টাকা? এই মাছটা? আতঙ্কিত গলায় বললেন খেয়ালবাবু।

ঝন্টু হাসলো। বললো, না মাছটার দাম ছাব্বিশ টাকা। আঠারো টাকা কেজি।

ছাব্বিশ টাকা। উস। কইস কীরে তুই! ইতো চিন্তা করনও যায় না।

বলেই, স্তম্ভিত হয়ে গেলেন খেয়ালবাবু।

রমা বললো, মা আমি আসছি একটু।

মনোরমা বললেন, বেশি দেরী করিস না।

আচ্ছা! বলে, রমা চলে গেল ঝন্টুর সঙ্গে।

খেয়ালবাবু বুঝলেন এখন ওরা অন্ধকারে পুকুরধারে গিয়ে কাঁঠাল তলার নিচের অন্ধকারে শান বাঁধানো জায়গাটায় বসবে। তারপর...

হঠাৎ ইলিশটার গা দিয়ে একটা বিজাতীয় অপমানকর গন্ধ বেরোল বলে মনে হলো।

মনোরমা অস্ফুটে বললেন, তেল আছে একরত্তি? সাঁতলিয়ে যে রাখব, তারও উপায় নেই।

তারপর নিজেই গেলেন পাশের বাড়ির পরেশের মার কাছে একটু তেল ধার করতে।

খেয়ালবাবুর খাওয়া শেষ হবার আগেই ফিরে এলেন মনোরমা! বললেন, ছোটলোক।

কে? খেয়ালবাবু শুধোলেন।

ঐ যে! পরেশের মা।

কেন? খেয়ালবাবু ঘটির জল নিয়ে রান্নাঘরের পাশে আঁচাতে আঁচাতে শুধোলেন।

মনোরমা বললেন, বললো, "আমার ঘরে অমন ডাগর মেয়ে থাকলে আমারও ইলিশ খাওয়ার ভাগ্য হতো রে মনো রোজ রোজ।"

খেয়ালবাবু চটে গেলেন ভীষণ। বললেন, তুমি কিছু বললে না? ছেড়ে দিলে?

মনোরমা অনেকক্ষণ খেয়ালবাবুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। আঁচলটা খসে গেছিল মাথা থেকে। চোখের নীচে গভীর কালি। ক্লান্তি, বড়ই ক্লান্তি চোখেমুখে, যেন কাজল পরিয়ে দিয়েছে কেউ কচি কলাপাতায় নতুন কাজল তুলে।

কী বলবো?

খেয়ালবাবু একটুক্ষণ স্ত্রীর মুখে দিকে চেয়ে থেকে, জবাব দিলেন না।

বললেন, মাছটা আগে কেটো না। মেজ-ছোট ফিরে এসে দেখুক। এত বড় মাছ কত বছর চোখে দেখেনি। তারপর সুর টেনে বললেন, আ-ঠারো টাকা কেজি? কত বছর বড় মাছের দোকানে যাই না। কিন্তু ইলিশের দোকানে তো ভিড়ও কম থাকে না! আঠারো টাকা কেজির মাছ কেনার লোকও তো দেখি কম নেই।

মনোরমা ঠেস দিয়ে বললেন, থাকবে না কেন? সবাই তো আর তোমার মতো বড়লোক নয়!

তারপর খেয়ালবাবুর হাতে আরেক গ্লাস জল এগিয়ে দিয়ে একটু মৌরী দিলেন।

জলটা খেয়ে নিয়ে মৌরী মুখে ফেলে খেয়ালবাবু বললেন, এখন এত রাতে এই এতবড় মাছটা কাটাকুটি করে সাঁতলানোও তো কম ঝামেলার নয়। রমাও তো সময় বুঝে চলে গেলো।

মনোরমা জ্বলন্ত চোখে তাকালেন খেয়ালবাবুর দিকে।

খেয়ালবাবু বুঝলেন যে, যার কারণে এত বড় ইলিশ, তাকেই হেনস্থা করাটা ঠিক হলো না।

www.BanglaBook.org

ঘরে এসে খেয়ালবাবু খাটে শুয়ে পড়লেন। ঠিক শোয়া নয়, তাকিয়া হেলান দিয়ে আধশোয়া। শালকাঠের তক্তপোশ। পাশাপাশি দুটি। একটিতে উনি শোন, অন্যটিতে মেজ। মনোরমা রমাকে ও ছোটকে নিয়ে পাশের ঘরে শোন। দেওয়ালে সাদা কাপড়ের উপর লালা সুতোয় লেখা ঃ "গড ইজ গুড"। "অনেস্টি ইজ দা বেস্ট পলিসি"। ঘরের কোণে একটা টেবিল কভার। বড় মেয়ে বিয়ের আগে বুনেছিল। তার উপর পরমহংসদেব এবং বড় মেয়ে-জামাই-এর একটা ফটো। বড় ছেলে ও বৌমার ফটোও ছিলো। কিন্তু ওরা আলাদা হয়ে যাওয়ার পর মনোরমা টিনের ট্রাঙ্কে ভরে ফেলেছেন ওদের ফটোটা।

বাইরে একটা বিড়াল ডাকছিলো। একটা হুলো। ব্যাঙও ডাকছিল ক্রমাগত। একবার মেঘ গর্জন হল। বিদ্যুৎ চমকালো হঠাৎ। তারপরই ঝোড়ো হাওয়া দিলো। নারকোল গাছের আর আম কাঁঠালের পাতায় ঝরনার মতো ঝর ঝর শব্দ উঠল। লাল-হলুদ রঙা কাঁঠাল পাতা ঝরে পড়ল বাতাসে।

রান্নাঘর থেকে ইলিশ মাছের রক্তের গন্ধ আসছিলো। বেড়ালটাও বোধহয় গন্ধটা পেয়ে থাকবে। রান্নাঘরের আশেপাশে ওঁয়াও! ওঁয়াও! করে বেড়াচ্ছিলো বেড়ালটা। টুপটাপ করে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হলো। মনোরমা ডাকলেন ছোটকে। বললেন, দ্যাখ তো রমা কোথায়? বৃষ্টিতে বাইরে কেন? ওদের এসে মধ্যের ঘরে বসতে বলনা কেন?

তারপর কী ভেবে বললেন, তোর এই অন্ধকারে কাঁঠালতলায় যাওয়ার দরকার নেই। প্রথম বৃষ্টি। সাপ খোপ থাকবে। তুই নারকোল গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে দিদি বলে ডাক।

দূরের কোনো বাড়িতে ট্রানজিস্টর রেডিও বাজছে। পাশের বাড়িতে কেউ টিউবওয়েলে কিচ কিচ করে জল তুলছে। ব্যাঙের ডাক। বৃষ্টির শব্দ।

ছোট ডাকলো, দিদি। অ্যাই দিদি—ই-ই-ই।

মনোরমা বললেন, পাড়া মাথায় করছিস কেন? বল, মা খেতে ডাকছে।

খেয়ালবাবুর হঠাৎ মনে হলো রেডিওতে কে যেন বিলমপদ আস্থাইতে মন্থরগতিতে আলাপ করছে। আরাম লাগলো খেয়ালবাবুর। একটি বিড়ি ধরিয়ে ঐ বিলমপদ আস্থাইতে ভাসমান হয়ে, ইলিশের গায়ের গন্ধে বুঁদ হয়ে খেয়ালবাবু আধো-ঘুমে, আধো-জাগরণে বড় সুখের মধ্যে ভাসতে ভাসতে কোন গন্ধর্বলোকের দিকে যেন এগোতে লাগলেন। কতক্ষণ এমন ঘোরের মধ্যে ছিলেন, জানেন না, হঠাৎ গায়ক যেন দরবারী রাগের তারানা গেয়ে সমস্ত ঘুমন্ত গ্রামীণ রাতকে চমকে দিলেন।

হঠাৎ খেয়ালবাবু দেখতে পেলেন বেড়ালটাকে।

একটা কালো বেড়াল।

বাইরে ওয়াঁও ওয়াঁও করে ডাকছিলো। কালো বেড়াল বড় অলুক্ষণে। বারাকপুরে ইছামতীর ধারে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ির উঠোনে কে যেন একটা কালো বেড়ালের হাড় পুঁতে দেওয়ায় তারা নির্বংশ হয়েছিল। একবার ভাবলেন, বেড়ালটাকে লাঠি মেরে তাড়ান। তারপর ভাবলেন, ইলিশ মাছ সাঁতলানোর গন্ধে তাঁরই এমন নেশা নেশা লাগছে, আর বেড়ালটার দোষ কি? বেড়াল তো শুধু কাঁটাই পাবে, তিনি তো মাছ খাবেন। গাদা-ভাজা, কোলের ঝোল। ডিম থাকলে, ডিম ভাজা। ডিম না থাকলে মাছটায় কেমন তেল হবে ভাবছিলেন খেয়ালবাবু।

ততক্ষণে দরবারীর তারানা জমে গেছিল। খেয়ালবাবু টিপটিপে বৃষ্টি আর মৃদু মৃদু হাওয়ায় হাসনুহানার গন্ধে ঘুমিয়ে পড়লেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

॥ ৩ ॥

অফিসে এসেই দেখেন হিতেন এবং জমাদার তাঁদের ঘর ঝাড়পোছ করছে ভালো করে সকালে। সমীরণও আছে।

খেয়ালবাবু বললেন, কী ব্যাপার?

সমীরণ চুপ করে রইলো। বললো, মেশিন বসবে এখানে কাল।

খেয়ালবাবুর বুকটা ছ্যাঁত করে উঠলো। বললেন, কী মেশিন?

ফোটো-কপি। সমীরণ বললো।

ফোটো-কপি? খেয়ালবাবু আস্তে আস্তে বললেন।

কাজ শেষ করে হিতেন টাইপ মেশিনটা বের করে দিলো। খেয়ালবাবুর সেদিন বিশেষই নরম গলায় বললেন, ছোটসাহেব বা বড়সাহেব এলেই খবর দিস।

ছোটসাহেব এসে গেছিলেন আগেই। চেম্বারটা কাঠের। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। আছেন কী-নেই! বড় সাহেব এলেন। কিন্তু কোনো সাহেবই খেয়ালবাবুকে ডাকলেন না। খেয়ালবাবু কপির কাজ যা ছিল অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে করতে লাগলেন।

বিকেলের দিকে সমীরণকে একবার ছোটসাহেব ডেকেছিলেন। তার ঘর থেকে প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে বেরোল সমীরণ। মুখটা গম্ভীর।

খেয়ালবাবু বললেন, হিতেন এক কাপ চা খাওয়া বাবা।

চা-টা অফিসের ক্যান্টিনেই হয়। ফ্রি! এই চা-টা ভালো লাগে খেয়ালবাবুর। বাড়ির চা মুখে দিতে পারেন না।

সমীরণ হঠাৎ গায়ে পড়ে বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো করে চা খাওয়া হিতেন, খেয়ালবাবুকে। তারপর বললো, ভেজিটেবল চপ খাবেন খেয়ালদা?

খেয়ালবাবু অবাক হলেন। সমীরণ গত তিন বছরে কখনও কিছু খাওয়ায়নি খেয়ালদাকে। যার ফেরত দেবার ক্ষমতা নেই কিছু, তাকে কে আর খাতির করে?

কী ব্যাপার সমীরণ?

সমীরণ লজ্জা পেলো। বললো, না আমি আনতে দেবো ভাবছিলাম, আপনিও যদি খান, তাইই।

না থাক। আজ আর খাবো না। কাল খাবো।

আজ বাড়িতে মনোরমা ভালো করে মাছ রান্না করবেন। সকালে শুধু ডাল আর বেগুনভাজা দিয়ে খেয়ে এসেছেন খেয়ালবাবু। আজ রাতের খাওয়াটা তিনি ভেজিটেবল চপ খেয়ে নষ্ট করতে রাজী নন। ক্যাশিয়ার মদনবাবু অন্য দিন কাজকর্মের ফাঁকে মালিকদের শ্রাদ্ধ করেন। তিনি ব্যাচেলর। একটা মেসে থাকেন। কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগেন। মালিকদের শ্রাদ্ধ না করলে তাঁর কোষ্ঠকাঠিন্য বাড়ে। কিন্তু মদনবাবু আজ একেবারেই চুপচাপ। মাঝে মাঝে খেয়ালবাবুর দিকে তাকাচ্ছেন কিন্তু চোখে চোখ রাখতে পারছেন না।

অন্য টাইপিস্ট হরেন কী যেন একটা কনফিডেনশিয়াল চিঠি টাইপ করে সাহেবদের ঘরে নিয়ে গেলো। খেয়ালবাবু অবাক হলেন। কারণ, কনফিডেনশিয়াল ম্যাটারস সাহেবরা ওঁকে ছাড়া কাউকেই দেন না সচরাচর।

সেদিন সন্ধ্যা ছ-টা বাজতে না বাজতে হিতেন এসে বললো, খেয়ালদা, আর কোনো কাজ বাকি নেই। বড়সাহেব আপনাকে চলে যেতে বললেন, আর যাওয়ার সময় ছোট

www.BanglaBook.org

সাহেবের সঙ্গে দেখা করে যাবেন একবার।

খেয়ালবাবু অবাক হলেন হিতেনের ব্যবহারে। গত দশ বছরেও জয়েন করার দু বছর পর থেকেও ও কখনও খেয়ালবাবুর সঙ্গে কথা বলার সময় বাঁকি কে "বাকি" বলেনি।

খেয়ালবাবু জুতোটায় পা গলালেন দেয়ালে হেলান দিয়ে, কষ্ট করে। ছাতাটা এ ঘরেই রাখলেন। তারপর ছোটসাহেবের ঘরে গেলেন।

ছোটসাহেবের ঘরে কালকের ভদ্রলোক বসেছিলেন। আজ একটা অন্য টাই। টেবলে ইন্ডিয়া কিংস-এর প্যাকেট। মুখে গর্বিত ও কৃতী একটা ভাব।

ছোটসাহেব বললেন, খেয়ালবাবু আপনিই এখানে একমাত্র সুপার-অ্যানুয়েটেড। আমরা কাল একটা ফোটো-কপি মেশিন বসাচ্ছি। অনেকই দাম। মেইনটেনান্স-এর খরচও অনেক। এই বাজারে আপনাকে রেখেও আপনার চেয়ে অনেক কমপিটেন্ট মেকানিক্যাল সাবস্টিটিউট মেইনটেন করা বেশ মুশকিল! আমরা জানি যে, আপনার দুই মেয়ের বিয়ে এখনও বাকি। যখন মেয়ের বিয়ের ঠিক হবে তখন জানাবেন। উই উইল সী, হোয়াট ক্যান উই ডু বাউট ইট। তবে একজনের বিয়েই।

তারপর একটু থেমে বললেন, আপনি অনেকদিন এখানে কাজ করেছেন, এবং উই আর থ্যাঙ্কফুল টু উ্য। সেই জন্যেই হঠাৎ 'না' করার আগে আমরা একটু ভেবে দেখছি। আপনাকে আগে থাকতে বলে রাখা দরকার বলেই বলে রাখলাম।

তারপরেই বললেন, এখন আপনি আসুন। মামা আজ তাড়াতাড়ি চলে গেছেন। পরে সময় করে একদিন ওঁর সঙ্গে দেখা করে নেবেন।

খেয়ালবাবু তাকিয়ে দেখলেন বড়সাহেবের ঘরখানি।

খেয়ালবাবু নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে ও ঘরের সহকর্মীদের মুখে তাকাতেই বুঝতে পারলেন যে, ওঁরা আগেই খবরটা জানতেন। এবং জানতেন বলেই, সকলেই অস্বাভাবিক আজ। সকলেই গম্ভীর।

খেয়ালবাবু কথা বলতে পারলেন না প্রায় কারো সঙ্গেই। চোখটা বোধহয় ভিজে এসেছিল। বললেন, চলি।

অন্য সকলেই, মদনবাবু, সমীরণ, হিতেন প্রায় সমস্বরে বলে উঠলো, যাওয়া নেই আসুন। কাল থেকে আর অত সকালে আসবেন না! এগারোটা নাগাদই আসবেন।

মনে হলো যেন ওরাই খেয়ালবাবুর মালিক।

খেয়ালবাবু যাওয়ার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে সমীরণকে শুধোলেন, আচ্ছা সমীরণ, সুপার অ্যানুয়েটেড কথাটার মানে কি?

সমীরণ বলল, যাদের রিটায়ারমেন্টের বয়স হয়ে গেছে। পঞ্চান্ন বছর বা আটান্ন বছর কোথাও কোথাও।

খেয়ালবাবু কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন। মদনবাবু বললেন, চাকরি তো যায়নি রে এখনও বাবা! এখন থেকেই এত ভাবনা কিসের?

খেয়ালবাবু ভাবছিলেন যে গত পঁচিশ বছর সকাল ন'টা থেকে রাত আটটা অবধি রোজ কাজ করেছেন তিনিও। কিন্তু তখন সময়ের দাম ছিলো না কোনোই। এখনই হঠাৎ বড় দামী হয়ে গেছে সময়।

মুখে কিছু বললেন না। বলবেনই বা কাকে?

লিফটের সামনেই সেই টাই-পরা ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা।

www.BanglaBook.org

খেয়ালবাবু ভক্তি ভরে তাঁকেই নমস্কার করলেন। বললেন, স্যার আপনি?

ভদ্রলোক বাঁ হাতের টাইয়ের নটটা ঠিক করতে করতে বললেন, আমি ফোটোকপি মেশিন নিয়েই ডিল করি।

খেয়ালবাবু বললেন, ব্যাপারটা কী যদি জানতাম স্যার। জিনিসটা কেমন দেখতে? আমিও তো টাইপিস্টই! ফোটো-কপি মেশিনটা কী ব্যাপার, যার জন্যে বহু টাইপিস্টের চাকরি চলে যাবে? বড় জানতে ইচ্ছে করে।

ভদ্রলোক হাসলেন ইডিয়ট খেয়ালবাবুর কথা শুনে। এই ওল্ড আইডিয়াজ-এর লোকগুলোই দেশটাকে খেলো। তারপর হাঁটুটা দেওয়ালে ঠেকিয়ে, তার ওপর ব্রিফকেসটা রেখে; এক কপি লিটারেচার খেয়ালবাবুর হাতে দিলেন।

সুন্দর ঝকঝকে ছাপা, চকচকে কাগজের পাতলা বইটা নিয়ে খেয়ালবাবু পাঞ্জাবির পকেটে রাখলেন।

বাড়ি যখন পৌঁছলেন সেদিন, দেখলেন যে, তাঁর নিজের স্ত্রী ছেলেরা, মেয়ে কেউই তাঁকে ঐ সময় বাড়িতে আশা করে না বলে তাঁর হঠাৎ না বলে কয়ে সন্ধে লাগতে না লাগতে ফিরে আসাতে অনেকেরই বিলক্ষণ অসুবিধা হলো। খেয়ালবাবু অপরাধী বোধ করলেন নিজেকে।

মনোরমা বললেন, কি? ইলিশ মাছের লোভেই এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে?

খেয়ালবাবু জবাব দিলেন না।

রমা সাজগোজ করে ঝণ্টুর সঙ্গে বেরিয়ে গেল, বারাসতে নতুন সিনেমা হল হয়েছে সরমা, সেখানে সিনেমা দেখতে। সাইকেল-রিকশা করে গেল ওরা। পাশে পাশে ঝণ্টুর দুই বন্ধু সাইকেল চালিয়ে গেলো।

খেয়ালবাবু মুখ তুলে তাকাতে, মনোরমা বললেন, তোমার সু পুত্রর জন্যেই ঝণ্টু সঙ্গে বডিগার্ড নিলো। মেজ বলেছে, ও নাকি প্যাঁদাবে ঝণ্টুকে। এমন প্যাঁদান প্যাঁদাবে যে, হাড়গোড় ভেঙে দেবে।

খেয়ালবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

বললেন, ঝণ্টুর বডিগার্ডরা কী করবে খালি হাতে? একটা লাঠিও তো নেই।

মনোরমা হাসলেন। বললেন, তোমাদের যুগ চলে গেছে। লাঠি রাখে না ওরা কেউ আজকাল। কোমরের তলায় লুকানো পিস্তল-রিভলবার গোঁজা থাকে। চাইলে, স্টেনগান ব্রেনগানও পাবে। এখন গুণ্ডামি একটা মস্ত ব্যবসা। টাকা দাও না তুমি? কাকে খতম করে দিতে হবে তা জানলেই খেলা আরম্ভ হবে। এখন এসব ছেলেখেলা। নিজের হাতের জোর বা বুকের সাহসের দাম এখন এক আধলাও নয়।

জানি। খেয়ালবাবু বললেন, মানুষের দাম নেই, যন্ত্রের আছে।

মনোরমা ঠাট্টা করে বললেন, এখুনি কি খাবে?

খেয়ালবাবু লজ্জিত হলেন।

বললেন, না না। শরীরটা খারাপ তাইই তাড়াতাড়ি এলাম।

তারপর দেখলেন ঘড়িতে সাতটা বেজেছে।

পুকুরে ডুব দিতে দিতে খেয়ালবাবু ভাবছিলেন তাঁর চাকরিটা এখনও যায়নি। চাকরি থাকতেই তাঁর যা সমাদর সংসারের সকলের কাছে, চাকরিটা না থাকলে কী যে হবে? তখন কি ঝণ্টুর দেওয়া অসম্মানের ভাত-ডাল ও বউছেলে-মেয়ের শীতল উপেক্ষার

www.BanglaBook.org

কাঁথায় নিজেকে মুড়ে রেখেই জীবনটা কাটবে?

বিড়ালটা ডাকল ওঁয়াও। খেয়ালবাবুর গলা জলে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে দেখলেন।

ঘাটের সিঁড়িতে বসে আছে কালো বেড়ালটা। অন্ধকারে বাঘের মতো জ্বলছে চোখ দুটো!

খেয়ালবাবু বললেন, শালা! বলেই দুহাত দিয়ে জল ছিটোলেন। কালো বেড়ালটা কালো অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো। নারকোল গাছের পাতা সমেত ডাল ঝরে পড়ল ঝুপ করে, জলের মধ্যে। সাঁতরে গিয়ে ডাঙায় তুললেন সেটাকে। শুকুলে, ঝাঁটা হবে।

চান সেরে এসে লুঙি পরে উদলা গায়ে খাটের উপর উঠে লণ্ঠনটাকে কাছে নিয়ে বসলেন। ফোটো-কপি মেশিনের সেই ঝকঝকে কাগজটা সন্তর্পণে খুললেন। বাসে আসার সময় সাহস করে খুলতে পারেননি। খুব সাবধানে পাতাটা উল্টোলেন। পাতা উল্টোতেই খেয়ালবাবুর হৃদপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেল।

একটা বিড়াল।

কালো বিড়ালের ছবি। বিরাট মেশিনটার উপরে বসে আছে কালো বিড়ালটা।

তাড়াতাড়ি বন্ধ করে ফেললেন কাগজটা। বিড়ালটা জানালার পাশেই ছিলো। ডেকে উঠল, ম্যাঁও করে। তারপর জানালা দিয়ে উঁকি মারলো ওঁর দিকে। খেয়ালবাবুর হাত-পা অবশ হয়ে গেলো। বিড়ালটাকে যে তাড়াবেন তেমন গায়ের জোর ও গলার জোরও পেলেন না। আস্তে আস্তে কাগজটা রেখে শুয়ে পড়লেন। লণ্ঠনটা কমিয়ে রাখলেন।

আধো-অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে দু-হাতের আঙুলগুলোকে চোখের সামনে তুললেন উনি। এই আঙুলগুলোই চাবি টিপে টিপে তাঁকে এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছে। তার ছেলেরা, বড় মেজ ছোট, মেয়েরা সকলে এই আঙুলের রোজগারেই মানুষ। দিনের শেষে বড় ব্যথা করে আঙুলগুলো। মাঝে গরম জল করে সেঁক দিতেন। বাতের মতো হয়েছে ইদানীং।

মনোরমার কথা মনে পড়লো। আজকাল গায়ের জোর তামাদি হয়ে গেছে।

এখন যন্ত্রর জোরটাই জোর। এই আঙুলগুলোও বেকার হয়ে গেছে একেবারে!

বিড়ালটা আবার ডাকল, ওঁয়াও।

খেয়ালবাবু চোখ বুঁজলেন। বাইরে থেকে হাসনুহানার গন্ধ আসছিল। বৃষ্টির পর পুকুর পাড় থেকে সোঁদা গন্ধ।

কালো বিড়ালটা আবারও ডাকল। তারপর বিড়ালটা চারদিক থেকে ডাকতে ডাকতে এসে তাঁর মস্তিষ্কের কোষে কোষে সেই অলুক্ষণে ডাক ভরে দিল।

বিড়ালটা ক্রমান্বয়ে ডেকেই চলেছিলো।

www.BanglaBook.org

চুনাওট এবং ইতোয়ারিন

ইতোয়ারিনকে দূর থেকে দেখতে পেয়েই খুব জোরে দৌড়ে যাচ্ছিলো উদ্বিগ্ন মুঙ্গলি তার মোটা সস্তা নোংরা লাল শাড়িটা ফুলে ফুলে উঠছিলো জোলো হাওয়ায়। কালো মেঘে আকাশ আদিগন্ত ঢেকে ছিলো। জুগগি পাহাড়ের ওপার থেকে বৃষ্টি-ভেজা হাওয়া ছুটে আসছিলো দমকে দমকে দূরাগত বৃষ্টির ছাঁট বয়ে। এক ঝাঁক সাদা বক দূরের হোন্দা বাঁধের জলা থেকে উড়ে আসছিলো সাদা কুন্দ ফুলের মালারই মতো দুলতে দুলতে।

এখানেও বৃষ্টি আসছে। মোরব্বা ক্ষেতের মধ্যে মাথা উঁচিয়ে পাটকিলে-রঙা একটা ধাড়ি খরগোশ দ্রুত দৌড়ে গেলো মুঙ্গলির পায়ে পায়ে। ভিজে হাওয়ায়, নিমের ফুলের গন্ধ ভাসছে। একটা মস্ত গহুমন সাপ ধীরে ধীরে ঢুকে গেলো উই-ঢিবির পাশের ইঁদুরের গর্তে। একবার নাক তুলে গন্ধ নিলো ষোড়শী মুঙ্গলী জোলো হাওয়ায়। নিমফলের, খরগোশের এবং সাপের।

সুরাতিয়া দিদিদের ক্ষেতের বেড়ার এ-পাশের কদমবনে কদমফুল ভরে রয়েছে। তার গন্ধও ছিলো হাওয়াতে। নানা রকম মিশ্র গন্ধ। ঝিম ধরে আসে তাতে।

একদিন ঐ কদমবনের নিচে মুঙ্গলি কোড়ুয়া চাচার ব্যাটা পুনোয়ার সঙ্গে রাধা-কৃষ্ণ খেলেছিলো গত বছরের আগের বছর। হঠাৎই মনে পড়ে গেলো ওর। এক ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাতে গিয়ে পুনোয়া পড়ে যাচ্ছিল বার বার। আর মুঙ্গলির কী হাসি!

সেই পুনোয়া গত বছর এমনই এক বর্ষার দিনে জুগগি পাহাড়ে মূল কুড়োতে গিয়ে গহুমন সাপের কামড়ে মারা গেছিলো। মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়েছিলো। নীল হয়ে গেছিলো সারা শরীর। মনে পড়তেই, মনটা খারাপ হয়ে গেলো মুঙ্গলির। ওদের জীবন এবং মরণ এমনই! কোনো জোয়ার-ভাঁটা নেই। মানুষ-মানুষীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই আছে শুধু। একচল্লিশ বছর দেশ স্বাধীন হয়েছে অথচ দেশের অধিকাংশ মানুষই এই মুঙ্গলিদের মানুষের-মর্যাদা দিলো না।

www.BanglaBook.org

অনেকদিন আসে না মুঙ্গলি এদিকটাতে। এই অবাধ্য অসভ্য ইতোয়ারিনটাই তাকে ছুটিয়ে নিয়ে এলো ভুল করে, ভুল পথে; আজ এই ভেজা দুপুরে। এদিকে এলেই পুনোয়ার কথা মনে পড়ে যায়। আর মন খারাপ করে।

পিচের রাস্তা ধরে নিপাসিরা থেকে খুব জোরে পর পর তিন-চারটে ট্রাক ও একটা বাস সারি বেঁধে দৌড়ে আসছিলো। ইতোয়ারিন তো কিছুই বোঝে না। বুদ্ধু একটা। যদি চাপা পড়ে মরে! সেই ভয়েই দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলেছে মুঙ্গলি। তার আঁচল এই দৌড়ে সরে যাওয়াতে তার নবীন পেলব মসৃণ স্তন দুটির বৃন্তে ভিজে হাওয়া সুড়সুড়ি দিচ্ছে। কিন্তু শাড়ি সামলাবার সময়ও আর নেই। ট্রাকগুলো আর বাসটা এসে পড়লো বলে! ইতোয়ারিনও উদোম টাঁড়টা পেরিয়ে গিয়ে প্রায় পিচ রাস্তায় ওঠার মুখে। সর্বনাশ হবে এখুনি।

প্রথম ট্রাকটার নিচে প্রায় পড়ে পড়ে ইতোয়ারিন, ঠিক এমনই সময়ে রাস্তার পাশের চাপ-চাপ নরম সবুজ ঘাসের ঢাল-এর মধ্যে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েই মুঙ্গলি জাপটে ধরলো ইতোয়ারিনকে। তারপর দুজনে মিলে জড়ামড়ি করে গড়াতে গড়াতে ঢাল গড়িয়ে নেমে এলো উদোম টাঁড়ে। হাঁটু গেড়ে বসে ইতোয়ারিনকে তার দু-ঊরুর মধ্যে চেপে ধরে দু'হাতে ওর দু'কান ধরে আচ্ছা করে মুলে দিয়ে বললো, "ট্রাকোয়াকা নিচে যা কর অ্যাইসেহি এক রোজ মরেগি তু!"

ইতোয়ারিন ঘুচুক-ঘুচুক, ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে আওয়াজ করলো মুঙ্গলির কথার জবাবে। সোহাগ জানালো। মাদী শুয়োরের সোহাগের রকমই আলাদা।

বেলুনের মতো পটাং করে ফেটে যাবি একদিন, তা বলে দিলাম।

আবার স্বগতোক্তি করলো মুঙ্গলি। রাগের ও অনুযোগের গলায়।

কোনো উত্তর না দিয়ে ইতোয়ারিন ওর হেঁড়ে মাথাটা মুঙ্গলির ঊরুতে শুধু একবার ঘষে দিলো আদরে।

মুঙ্গলি উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চল হঠ।

বলে, বস্তির দিকে রওয়ানা হলো। ইতোরিয়ান চলতে লাগলো ওর পায়ে পায়ে। বড় রাস্তা থেকে একটু ডান দিকেই লালমাটির কর্দমাক্ত কাঁচা রাস্তা বেয়ে কিছুটা গেলেই ভাঙ্গী বস্তী। মানে, ধাঙ্গরদের বস্তী। বস্তীর লাগোয়া একটি তালাও। বর্ষার জল পেয়ে তিন ধার থেকে লালমাটি ধুয়ে এসে পড়েছে সেই তালাওতে। বছরের এই সময়টাতে যেই চান করুক সেখানে, মানুষ অথবা শুয়োর; তার গায়ের রঙ লাল হয়ে যায়। এই তালাওটিই ভাঙ্গী বস্তীর প্রাণ।

তালাওর তিনপাশে জলের উপরে ঝুঁকে পড়েছে ঝাঁটি জঙ্গল এবং পুটুসের ঝাড়। কটুগন্ধ গাঢ় কমলা-রঙা ফুল এসেছে পুটুসের ঝাড়ে ঝাড়ে। পাড়টা উঠে গেছে তিনদিকে, উঁচু হয়ে। তারপর জুগ্‌গি পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে মিশেছে সেই চড়াই।

এক সময়ে ঘন শালের বন ছিলো এই চড়াইয়েই। সে বন গিয়ে মিশে গেছিলো জুগগি পাহাড়ের বনের সঙ্গে। ওঁরাও মুণ্ডারা তখনকার দিনে জেঠ-শিকারের পরবে ভালুক কুটরা অথবা হরিণ শিকার করতো। কখনও কখনও শিয়াল, সাপ অথবা খরগোসও। মুঙ্গলি তখন শিশু ছিলো। তবু স্পষ্ট মনে আছে।

জঙ্গল এখন আর নেই। কেটে সব সাফ করে দিয়েছে ঠিকাদারেরা। ভাঙ্গী বস্তীর কাছের দুই বস্তীর লোকেরাও। বাড়ি বানাবার জন্যে। জ্বালানী কাঠের জন্যে। মুঙ্গলিরা নিজেরাও কেটেছে কিছু। এখন কিছু বুনো পলাশ, যাদের প্রাণশক্তি আর বাড় এই ভাঙ্গী বস্তীর শুয়োদেরই মতো; ঝাঁটি জঙ্গল এবং পুটুসই শুধু আছে।

www.BanglaBook.org

দু-একটি খরগোস, বুনো শুয়োর এবং কিছু বটের তিতির ওরই মধ্যে ইতিউতি ঘোরাঘুরি করে। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে অথবা বৃষ্টির ঠিক পরে এক আশ্চর্য নরম-হলুদ আলোয় বন-প্রান্তর ভরে যায় এবং সূর্য পাহাড়ের ওপাশে ডুবে যাওয়ার ক্ষণটিতে, মাথা তুলে, গলার শির-ঝুলিয়ে বার বার ডেকে তারা জানান দেয় যে, তারা এখনও আছে।

বড় রাস্তাটা পিচের। মাঝে মাঝেই গড়হির অথবা নিপাসিরার দিকে মার্সিডিস ট্রাক এবং সার্ভিসের বাস চলে যায় জেঠ-শিকারীর তীর-খাওয়া বড়কা দাঁতাল-শুয়োরের মতো প্রচণ্ড জোরে গোঁ-গোঁ শব্দ করতে করতে।

রাস্তাটা ব্রিটিশদের আমলে বানানো। তখন অবশ্য পিচ ছিলো না। লাল মাটির রাস্তাই ছিলো। কিন্তু পোক্ত ছিল। বর্ষায় ভাঙতো না। চুরি হতো না তখন সরকারী কাজে। মুঙ্গলি শুনেছিলো, তার নানার কাছে।

রাস্তাটার দু'পাশে বড় বড় অনেক প্রাচীন গাছ ছিলো। মেহগনি শিশু, নানারকম কেসিয়া। কিছু জ্যাকারাণ্ডাও। সাহেবরাই লাগিয়ে গেছিলো।

শুধু আশে-পাশের বনের পাহাড়ের গাছ কেটেই মানুষের ক্ষিদে মেটেনি। এখন পথপাশের বড় বড় গাছগুলোর গা থেকে পুরু ছালও তারা তুলে নিচ্ছে। তাই দিয়েই ফুলবাগ শহর আর গড়হির আর নিপাসিরা বাজারের হালুইকরেরা উনুন ধরায়। মানুষের মতো আগ্রাসী ক্ষিদে খুব কম জানোয়ারেরই আছে। শুয়োরের ক্ষিদেও হার মানে এই ক্ষিদের কাছে।

কোনোরকম বাছবিচার না করে শুয়োরগুলো সব কিছুই খায়। মানুষের ময়লা থেকে, যা কিছুই মাটি কুড়িয়ে পায়। আর ওদের অন্য কাজ বংশ বৃদ্ধি করা। রাক্ষসের মতো সর্বক্ষণ খাওয়া আর রমণ করাই হলো শুয়োরদের একমাত্র কাজ।

বড় রাস্তার বাঁদিকে মুসলমানদের মস্ত বস্তী আছে একটি। মাইল খানেক দূরে। ডানদিকেও আরেকটি আছে। গিরিয়া পাহাড়ের নিচে।

ভাঙ্গী বস্তী থেকে পিচ রাস্তায় উঠলেই কয়েকটি দোকান। একটি পুরোনো পিপ্পল গাছের নিচে দোকানগুলো গজিয়ে উঠেছে। একটি মুদিখানা, পানবিড়ির দোকান; একটি চায়ের দোকান। তার সামনে শালকাঠের তক্তা দিয়ে খুঁটি পুঁতে বেঞ্চিমতো বানানো। বৃষ্টিতে, রোদে ফেটে-ফুটে গেছে। তার উপরে চা খেতে খেতে আড্ডা মারে ভাঙ্গী বস্তীর মানুষে এবং ঐ দুই বস্তীর মানুষেও।

ঐ দোকানগুলোরই উল্টোদিকে টাড়ের মধ্যে দিয়ে লালমাটির পায়ে-চলা পথ চলে গেছে এঁকে বেঁকে। সেখানে কাহারদের বস্তী আছে। এই পিপ্পল গাছের উল্টোদিকে কাহার বস্তীতে যাবার পথেই শুক্কুরবারে শুক্কুরবারে হাট বসে। হাটের নাম জুগগি হাট। শুঁড়িখানা আছে। হাটের দিনে ঢালাও মহুয়া খায় মুঙ্গলিদের বস্তীর সকলে শালপাতার দোনায়। সারা সপ্তাহের রোজগার ওখানেই চলে যায়।

আগে হাট বসতো রবিবারে রবিবারে। তবে শুক্কুরবারে "জুম্মা বার" বলে এবং এই এলাকা মুসলমান-প্রধান বলে গরিষ্ঠদের সুবিধার জন্যে রবিবারের বদলে আজকাল শুক্কুরবারেই হাট বসে। পঞ্চায়েত তাই ঠিক করে দিয়েছে।

ভাঙ্গী বস্তির ভগলু আর ফুলবাগের দিকের মুসলমান বস্তীর গিয়াসুদ্দিনের বয়স হয়েছে প্রায় সত্তরের মতো। দুজনেই ব্রিটিশের হয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে লড়াই করেছিলো। গিয়াসুদ্দিন লড়াই করেছিলো বার্মাতে আর ভগলু মধ্যপ্রাচ্যে। যদিও তারা আলাদা আলাদা রেজিমেন্টে ছিলো কিন্তু এখন অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু হয়ে গেছে। যুদ্ধে যখন যোগ দেয় তখন দুজনেই কিছুদিন একসঙ্গে ছিলো রাণীক্ষেত ক্যান্টনমেন্টে। শিকারের দোস্তী, যুদ্ধের দোস্তী,

www.BanglaBook.org

একবার হলে, জীবনভর তা অটুটই থাকে।

চায়ের দোকানের আড্ডাতে বীরহানগরের প্রাইমারী স্কুলের মাস্টারও সাইকেল নিয়ে আসে। থাকে বীরহানগরেই। ফুলবাগের পথে। এখান থেকে প্রায় পাঁচ মাইল পথ। বয়স হবে মাস্টারের কুড়ি-একুশ। সবে বি. এ. পাশ করেছে। অনেক খবরাখবর রাখে সে। চেহারাটিও ভারী সুন্দর। জাতে সে ভূমিহার। কিন্তু তার স্বভাবের জন্যে এ অঞ্চলের মুসলমান, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, চামার, ভোগতা, কোলহো, ওঁরাও মুণ্ডা সকলেই ভালোবাসে তাকে। মুঙ্গলিও ভালোবাসে। মাস্টারকে দেখলেই মুঙ্গলির বুকটা ধ্বকধ্বক করে ওঠে। সারা শরীরে একটা অনামা ব্যাখ্যাহীন রিকিঝিকি ওঠে। এমনি আর কাউকে দেখলেই হয় না। তেমন রিকিঝিকির কথা শুধু মুঙ্গলির বয়সী মেয়েরাই জানে।

সেদিন বিকেলবেলা বীরহানগরের নবীন মাস্টার, নাম তার সরজু, প্রবীণ ভগলু আর গিয়াসুদ্দিনের সঙ্গে বসে চায়ের দোকানের সামনে আড্ডা মারছিলো। দুপুরে খুব বৃষ্টি হয়ে যাবার পর এখন আকাশ পরিষ্কার। সন্ধ্যে হতে দেরী আছে এখনও ঘণ্টাখানেক। মাস্টার নবীন বলেই এমন অনেক কিছুর খোঁজ রাখে, যা প্রবীণেরা আদৌ জানে না। আবার এই দুই প্রবীণ তাদের অভিজ্ঞতার ভাঁড়ারে এতো কিছুই জমিয়ে রেখেছে, যে নবীন মাস্টার হাঁ করে তাদের কথা শোনে। যৌবনের বিকল্প বার্ধক্য নয়। বার্ধক্যের বিকল্পও নয় যৌবন। যাদের শেখার ইচ্ছা ও মন আছে তারা একে অন্যের কাছে অনেকই শিখতে পারে।

সকলেই এক ভাঁড় করে চা খাবার পর ভগলু বুড়ো গিয়াসুদ্দিন বুড়োকে বিড়ি এগিয়ে দিয়ে বলে, বোলো ইয়ার।

॥ ২ ॥

ইতোয়ারিন মুঙ্গলির বড় আদরের মাদী শুয়োর। রবিবারে জন্মেছিলো তাই তার নাম দিয়েছিলো মুঙ্গলি, ইতোয়ারিন। ইতোয়ারিনের চার ভাই-বোন ছিলো। তারা সবাই বিক্রি হয়ে গেছে জুগগির হাটে। এইবার পাল খাওয়াবে মুঙ্গলি ইতোয়ারিনকে। এক পাল বাচ্চা। সম্পত্তি বাড়বে মুঙ্গলির। বাচ্চাগুলোকে বেচে দেবে জুগগির হাটিয়াতে কিন্তু মুঙ্গলিকে বেচবে না।

মুঙ্গলি রোজ দিনশেষের আবছা অন্ধকারে, নিজে যখন তালাওতে চান করতে নামে, তখন ইতোয়ারিনকেও চান করায় নিজে হাতে। জলে নেমেই আশ্চর্য কায়দাতে সাঁতার কেটে তালাওর গভীরে চলে যায় ইতোয়ারিন্। মুঙ্গলিও সাঁতরে গিয়ে তার পিঠে চড়ে। দুই অরমিতা কুমারীর এই এক খেলা। একজন নারী। একজন শুয়োরী। শুয়োরী হলেও ইতোয়ারিনকে সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে মুঙ্গলি। পোষা পাখির মতো। তারপর রাতে কাঁচামাটির সোঁদা-গন্ধ ঘরে ইতোয়ারিনকে কোলবালিশ করে মুঙ্গলি শুয়ে থাকে। মুঙ্গলির বাবা ঝড়ু ওকে বুকে খুব। কিন্তু শেষমেষ থেমে যায়। মা-মরা মেয়ে। তাছাড়া মুঙ্গলিও বা আর কতদিন থাকবে ঝড়ুর কাছে? মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। আগেকার দিন হলে তো আট-ন' বছরেই বিয়ে হতো। তারপর গওনা হলে শ্বশুরবাড়ি যেতো। দিন পাল্টে গেছে। প্রতিদিনই পাল্টাচ্ছে দিন। তবু এবারে তার বিয়ে-থার কথা ভাবতে হবে। ভাবে ঝড়ু।

মুঙ্গলিও কাণাঘুষোর এসব কথা শোনে। গা-শিরশির করে বিয়ের কথায়, অনামা ভালো লাগায়। জীবনের এখনও অনেকেই বাকি আছে। অনেক ভালো লাগা বাকি আছে এখনও। দারিদ্র্যই শেষ কথা নয়। দরিদ্রদেরও বড়লোকী থাকে। এ সব কথা শুনে মুঙ্গলির কেবলই সরজু মাস্টারের কথা মনে হয়। ওর বিয়ের কথা তাই উঠলে মনখারাপও লাগে।

www.BanglaBook.org

সরজুকেও তো মুঙ্গলি কোনোদিনও পাবে না।

মাইল সাতেক দূরের শহরের ফুলবাগ মিন্যুসিপ্যালিটির জমাদার মতির ছেলেকে ঝড়ুর পছন্দ। মতি, ঝড়ুর বন্ধুও বটে। অনেক দিনেরই বন্ধু। মতির ছেলে জগনু এ বছরই মতি রিটায়ার করলে মতির জায়গায় চাকরি পাবে। কাজটা যদিও বাজে। এখনও খাটা-পায়খানা আছে অনেকই ফুলবাগ শহরে। নামেই শহর। ব্রিটিশদের সময়ে যেমন ছিলো তা থেকেও অনেক ঘনবসতিপূর্ণ এবং নোংরা হয়ে গেছে। উন্নতি কিছুই হয়নি। অবনতিই হয়েছে। তবু ঝড়ু ভাবে, মরদের কাজের আবার খারাপ ভালো কি? যার যা কাজ। নিজেকে বোঝায় ওই সব বলে। তাছাড়া কজন মানুষই বা কাজ পায়? পাঁচ বছর বাদ বাদ ভোটের আগের বক্তৃতা তো অনেকই শুনলো। লাশকাটা ঘরের ডোমেদের কাজের থেকে তো এ কাজ অনেকগুণেই ভালো। সারাদিন খাটা-খাটনি করে দুটি মকাই বা বজরার রুটি আর হিং-দেওয়া খেসারির ডাল গরম-গরম খেতে যদি পায় মুঙ্গলির ভাবী স্বামী এবং মুঙ্গলি, তাই তো অনেক পাওয়া। বেশি লোভ নেই ঝড়ুর। তার মেয়ে মুঙ্গলি যে রাজরাণী হবে এমন আশা করে না সে।

॥ ৩ ॥

দুপুরবেলা।

এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে।

মাটি থেকে সোঁদা সোঁদা গন্ধ উঠছে।

মুঙ্গলি ইতোয়ারিনকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ঈদগার দিকে চলে গেছিলো। সারা বছর এই পুরো অঞ্চলটা ফাঁকাই পড়ে থাকে। দুই সম্প্রদায়েরই ভিখিরী, নেশা-ভাঙ্গ করনেওয়ালারা হিন্দু, এবং মুসলমানদের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে, গরু ছাগল চরে বেড়ায়। তবে শিশুকাল থেকে মুঙ্গলি দেখে আসছে যে ঈদের আগে ও জায়গাটার চেহারাই যেন পাল্টে যায়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়। ঝাঁট দেওয়া হয়। সাজানোও হয়। সাদা চাদর পাতা হয় তিনদিকে দেওয়াল-ঘেরা জায়গাতে। ইমাম সাহেব অথবা মোল্লা সাহেবের জন্যে উঁচু পাটাতন বাঁধা হয়। ভাঙ্গী বস্তীর ডানদিক-বাঁদিকের দুটি গাঁয়ের মুসলমানেরা নতুন জামা পরে টুপি মাথায় চড়িয়ে ঈদের নামাজ পড়তে আসে ঈদগাতে।

যখন ছোটো ছিল, একবার মুঙ্গলি তার বাবা ঝড়ুর সঙ্গে অনেকদিন আগে এসে বাবার হাত ধরে বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখেছিলো ঈদের নামাজ পড়া। বড় হবার পর আর এদিকে আসে না ঈদের দিনে। বস্তীর বড় মেয়েরা বারণ করে দিয়েছে। কোনো মেয়েরাই আসে না হিন্দু বস্তীর। মুসলমান মেয়েরাও আসে না। ওদের ধর্মে মেয়েদের অন্যরকম চোখে দেখা হয়।

প্রতি বছরই ঈদের দিনে সন্ধেবেলায় গিয়াসুদ্দিন-নানা টিফিন-ক্যারিয়ারে করে বিরিয়ানি-পোলাউ, মুরগীর চাঁব আর ফিরনি নিয়ে আসে তার বন্ধু ভগলু নানার জন্যে। জাফরান দেওয়া বিরিয়ানির স্বাদ প্রতি বছরই পেয়ে আসছে মুঙ্গলি আর ঝড়ু, ভগলু নানার দয়ায়। বড় সোহাগভরে চেটেপুটে খায় ঝড়ু, ভগলু নানা আর ও। গিয়াসুদ্দিন নানাও ওদের আনন্দ দেখে খুশি হয় খুব। বিরিয়ানিতে যে জাফরান দেয় তা নাকি আসে কাশ্মীরের উপত্যকা থেকে।

ঈদগার ওপাশে একটি ছোটো মসজিদ আছে। মোল্লা রমজান হাজী থাকেন সেখানে। প্রতিদিন কাক ডাকারও আগে মসজিদে নামাজ পড়েন রমজান হাজী। তারপর দিনে রাতে, বিভিন্ন প্রহরে। ওদের নামাজের ভাষা বোঝে না মুঙ্গলি অথবা মুঙ্গলিদের বস্তীর অন্য কেউই।

www.BanglaBook.org

ভাষাটা উর্দু বোধ হয় নয়। হিন্দুস্থানের ভাষা নয়। গিয়াসুদ্দীন চাচারাও পুরো বোঝে কিনা তা জানে না। তবে শুনতে বেশ লাগে। আল্লার প্রশংসা থাকে কি সেই সব নামাজে? কে জানে? ইদানীং মসজিদের সবদিকে লাউডস্পীকারও লেগেছে। ফুলবাগ, নিপাসিয়া, গড়হি সব জায়গার মসজিদেই। আজানের সময় বহু দূর দূর থেকে শোনা যায় তা মাইকের জন্যে। জুগগি পাহাড়ের পাদদেশে ধাক্কা মেরে আওয়াজ হা-হা করে ফিরে আসে।

পিপ্পল গাছের নিচের চায়ের দোকানে সেদিনও আড্ডা হচ্ছিলো। গিয়াসুদ্দিন চাচা আসেনি সেদিন। সরজু মাস্টার বললো, বুঝলে ভগলু নানা, শোনা যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের পয়সাওয়ালা সব দেশ থেকে নাকি প্রচুর টাকা আসছে ভারতবর্ষে। আরবদের স্বপ্ন নাকি সমস্ত পৃথিবীকেই একটি মাত্র ইসলামিক রাষ্ট্র করে তোলা। প্লেন যারা ছিনতাই করলো সেদিন সেই গেরিলারা বলেছিলো না!

পাকিস্তান কি এই অঢেল টাকার লোভেই ইসলামিক রাষ্ট্র হয়ে গেলো? বাংলাদেশও কি তাই হবে?

ব্যাপারটা ভালো নয়।

বললো, ভগলু নানা।

ভারতবর্ষকেও ইসলামিক রাস্ট্র করে তোলার চক্রান্ত চলছে চারদিকে। বিদেশী রাষ্ট্রদের মদত তো আছেই। চোখ কান খুলে না রাখলে একদিন বড়ই বিপদ হবে।

সরজু মাস্টার বললো।

তা কেন হবে। আর হবেই বা কি করে? ভগলু চাচা বলেছিলো অবিশ্বাসের গলায়। হিন্দুস্থানের মধ্যেই পাকিস্তান হবে?

মুঙ্গলির বাবা ঝড়ুও সেদিন চা খেতে গেছিলো। তাই জিগ্গেসও করেছিলো ভগলু নানাকে। ঝড়ু, গাঁওয়ার সোজা লোক। লেখাপড়াও জানে না ও, নিজেই বললো ধ্যাত। তাও কখনও হয়। যেমন এখন আছি সকলে মিলেমিশে তেমনই থাকবো চিরদিন।

সরজু মাস্টার বলেছিল, সবই হতে পারে।

ছোকরা সরজু মাস্টারের কথাটা কারোরই ভালো লাগেনি।

॥ ৪ ॥

ঈদগার চারপাশে বড় বড় গাছ। বেশিই তেঁতুল। পথের পাশে পিপ্পল ছাড়াও একটা বড় নিমগাছ আছে। কিন্তু ঈদের নামাজ, গিয়াসুদ্দিন চাচারা কখনই ছায়াতে পড়ে না। যেখানে একটুও ছায়া পড়ে না সেখানেই সার সার করে হাঁটু গেড়ে বসে সকলে নামাজ পড়ে। সাদা নতুন কাপড় বিছিয়ে নেয় নিচে।

নামাজ পড়তে কিন্তু হিন্দুদের পুজো-টুজোর মতো আদৌ সময় লাগে না বেশি! নামাজের তিনটি ভাগ আছে। মুঙ্গলি তো শুনেছেই, দেখেওছে দূর থেকে শিশুকালে। বড় বড় জায়গাতে ইমাম এবং ছোট ছোট জায়গাতে মোল্লা সাহেব কোরাণ থেকে কিছু পড়ে শোনান। তাকে বলে "খুটবা"। প্রত্যেকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে তা শোনেন। তাতে মিনিট পাঁচেক সময় যায় বড় জোর। তার পরেই সকলে একসঙ্গে দু'হাত তুলে "দুয়া" মাঙ্গেন। এক মিনিট, কী দু মিনিট! তারপর নামাজ শেষ হয়ে যায়।

তারপর হিন্দুদের দশেরার মতো প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে কোলাকুলি করেন। এই বিরাদরী দারুণই ভালো। হাসিমুখে একে অন্যকে বলে "ঈদ মুবারক"। প্রত্যেকের বাড়িতেই সেদিন ভালোমন্দ খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত থাকে। যার যেমন অবস্থা। কানে

www.BanglaBook.org

থাকে, তুলোয়-মাখানো আতর।

মেয়েরা কেউই আসে না নামাজে। মেয়েরা সব কিছু থেকেই বাদ। এইটা ভেবেই ভারী খারাপ লাগে মুঙ্গলীর। মুসলমানদের কাছে মেয়েরা মানুষ বলেই গণ্য নয় না কি? পরদা আর বোরখার মধ্যেই থাকে কি আজীবন? দাসীবৃত্তি ছাড়া অন্য কোন অধিকার কি মেয়েদের নেই? বাইরের পৃথিবী পুরোপুরিই বন্ধ কি ওদের কাছে? বেচারারা! যেহেতু ঐ দু বস্তীর বড় মেয়েরা বাইরে একেবারেই আসে না, ওদের সুখ-দুঃখের কথা জানারও উপায় নেই কোনো মুঙ্গলিদের।

মুঙ্গলি ভাবে, ভাগ্যিস মুঙ্গলী, ভাঙ্গী ছাড়া অন্য গাঁয়ে জন্মায়নি। জন্মালে ও আত্মহত্যা করতো। ওর স্বাধীনতাকে বড়ই ভালোবাসে মুঙ্গলি। প্রাণ গেলেও এই স্বাধীনতা, এই ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়ানো, এই বৃষ্টিতে ভেজা, জুগগি পাহাড়ের পায়ের কাছে বসে রোদ পোয়ানো, সেজে-গুজে হাটে যাওয়া, শুক্কুরবারে শুক্কুরবারে; দুর্গাপুজো দেখতে যাওয়া ফুলবাগ শহরে, ঝুমরী-গিলাতে দশেরার মেলাতে গিয়ে গরম জিলাবি খাওয়া আর কাঁচের চুরি কেনা; এসব কিছুকেই ও কখনই ছাড়বে না।

মেয়েদের পায়ের নিচে দাবিয়ে রেখে পুরুষদের যে "বিরাদরী" তার প্রতি মুঙ্গলির অন্তত কোনো শ্রদ্ধা নেই। কোটি কোটি এমন সব মেয়েদের জন্যে দুঃখে মুঙ্গলির বুক ফেটে জল আসে।

এলো-মেলো পায়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ানো মুঙ্গলি হঠাৎ চোখ তুলে দেখলো আকাশ আবারও কালো করে আসছে।

মুঙ্গলি বললো, চল্‌রে ইতোয়ারিন। ঘর লওট যাব।

ইতোয়ারিন্ সায় দিলো!

বললো, ঘোঁৎ ঘোঁৎ!

॥ ৫ ॥

আজ ঈদ।

ট্রাকে করে বাসে করে, দলে দলে মানুষেরা আসছে দুদিক থেকে ঈদগাতে। অনেকগুলো মাইক লাগানো হয়েছে। পথের পাশে দোকান বসেছে অনেক। মেলার মতো দেখাচ্ছে দূর থেকে পুরো জায়গাটা। দোকানে নানারকম মিষ্টি বিক্রি হচ্ছে। ফল, মোরগা, আণ্ডা বকরীর বাজার বসেছিল গতকাল। গরু কাটা হয়েছে দু গ্রামেই। পিঁজরাপোলের গরু নয়। নধর গরু।

পুলিশ এসেছে এক ট্রাক। পাছে, নামাজ পড়ার সময়ে নামাজীদের কোনোরকম অসুবিধে হয়, তাই। প্রতিবারই আসে নামাজ পড়ার ঘন্টাখানেক আগে। নামাজ পড়া শেষ হলে আবার ফিরে যায় কোতোয়ালিতে। পথের দোকানে চা-পান খেয়ে। চলে-যাওয়া তাদের উঁচু গলার গাল-গল্প চলন্ত-ট্রাক থেকে উড়ে আসে ভাঙ্গী বস্তীর মানুষদের কানে।

মুঙ্গলির বাবা ঝড়ু সকালেই বলে গেছিলো; বাড়ি ঘর সব পরিষ্কার করে রাখতে। ঝড়ু গেছে এক বোঝা শালপাতার দোনা নিয়ে ফুলবাগ শহরে বেচতে। ভাঙ্গী বস্তী নামেই ভাঙ্গী বস্তী। আজকাল ধাঙ্গড়ের কাজ করে খুব কম মানুষই। সাহেবী "সিসটেম" "কমোড" হয়ে গিয়ে ধাঙ্গড়দের প্রয়োজন কমে গেছে। শহরের মানুষেরা নিজেরাই বা তাদের বাড়ির কাজের লোকেরাই কমোড পরিষ্কার করে নিতে পারে। এসিড পাওয়া যায় বোতলে। কমোড পরিষ্কার করার। বাজারে নানা রকম ব্রাশ কিনতে পাওয়া যায় লম্বা-বেঁটে হাতলওয়ালা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাড়ি ঘর পরিষ্কার করতে বলে গেছে বাবা, কারণ কাল নাকি ফুলবাগ শহর থেকে মেহমান আসবে। তার ভাবী শ্বশুর।

শ্বশুর কেন? মুঙ্গলি নিজেকে শুধিয়েছিলো। সেই মতি না ফতির ছেলে যে, সে নিজে আসবে না কেন? যার সঙ্গে মুঙ্গলির সারাজীবন দুঃখে-সুখে ঘর করতে হতে পারে তাকে একবার চোখের দেখাও দেখবে না পর্যন্ত নিজে বিয়ের আগে? মুঙ্গলির কি কোনো ইচ্ছে-অনিচ্ছে নেই? বাবা কি তাকেও পরাধীন করে দিলো?

আর মাস্টার? সরজু মাস্টার। কত কী জানে শোনে সে! একদিন মাস্টারের সঙ্গে একাই আলাপ করবে মুঙ্গলি। ঠিক করেছে মনে মনে। অনেক কথা বলবে তাকে। পলাশ বনে বসন্তদিনে একা একা চড়া-বেলায় ঘুরতে ঘুরতে কী বলবে তার মহড়াও দিয়েছে অনেকবার। কিন্তু বলা হয়নি কোনো দিনও। ধাঙ্গড় বলে কি চিরদিন এই সমাজেই থাকতে হবে মুঙ্গলিকে? ভারী রাগ হয় মুঙ্গলীর একথা ভেবেই। মাস্টারের মুখটা কেবলই বার বার মনে আসে। চান করার সময়ে, ঘুম আসবার আগে, স্বপ্নের মধ্যে, বৃষ্টির মধ্যে, জুগগি পাহাড়ের ঢালে ঝাঁটি-জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাক-ভেজা ভিজতে ভিজতে।

একটা বড় দীর্ঘশ্বাস পড়ে মুঙ্গলির। ও জানে যে এ স্বপ্নও ওর অনেক স্বপ্নরই মতো সত্যি হবে না। মুঙ্গলি এও জানে যে, প্রত্যেক মেয়ের মনের মধ্যে যে-মানুষ থাকে তার সঙ্গে ঘর করার বরাত ভারতের সাধারণ মেয়েদের হয় না। কী হিন্দুর! কী মুসলমানের!

বাবা বলেছে, শুয়োরের মাংস নিয়ে আসবে গামারিয়ার হাট থেকে। আর ছোলার ডাল। আটাও আনবে কলে-পেষা। কাল ভালো করে রাঁধতে হবে মুঙ্গলিকে। ফুলবাগের মতি না ফতি, হবু শ্বশুর না ফসুর; তার জন্যে।

ইতোয়ারিনকে মুঙ্গলি বস্তীর অন্য শুয়োরের সঙ্গে কোনোদিনই মিশতে দেয়নি। সে যে তার পোষা প্রাণী। তার সখী। আজেবাজে জিনিসও খেতে দেয় না। ওরা যা খায়, তার থেকেই একটু দেয়। তাছাড়া, জঙ্গল পাহাড়ে বা মাঠে এইজন্যেই তো সঙ্গে করে নিয়ে ফেরে রোজই যাতে ইতোয়ারিন, মূল খুঁড়ে খেতে পারে। মহুয়ার সময় মহুয়া, আমলকির সময়ে আমলকি, আমের সময় জংলী আম।

তেঁতুল একেবারেই খেতে পারে না বেটি। মুখে দিলেই মুখ যা ভ্যাটকায়! হেসে বাঁচে না মুঙ্গলি দেখে!

মোরব্বার দড়ি দিয়ে সামনের খোঁটাতে ইতোয়ারিনকে সকাল থেকে ভালো করে বেঁধে রেখে যত্ন করে উঠোন নিকোচ্ছিলো মোষের গোবর দিয়ে মুঙ্গলি। ঠিক সেই সময়ই ঈদগা থেকে মাইকগুলো সব একসঙ্গে গমগম করে উঠলো। মোল্লা সাহেবের গলা! এ তো "খুটবা" নয়। এ তো বড় উত্তেজিত ক্রুদ্ধ গলা। তার উপরে বিজাতীয় ভাষা। মরুভূমির গন্ধ আছে এই ভাষায়। কী ভাষা কে জানে? নামাজের এই অংশকেই তো "খুটবা" বলে। এর পরেই "দুয়া" মাঙ্গার কথা। তারপরই নামাজ শেষ!

মাইকের আওয়াজ গমগম করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছিলো। "খুটবা" শুনতে শুনতেই হঠাৎ মাইকে একটা প্রচণ্ড শোরগোল উঠলো। সেই শোরগোল, বিরক্ত ক্রুদ্ধ জনরব হয়ে অসংখ্য মাইকের মধ্যে দিয়ে অনেক জোরে ভেসে এলো এদিকে।

পাশের ঘরের সুরাতিয়া দিদি চেঁচিয়ে বললো, আররে। এ মুঙ্গলি! ইতনি হল্লাগুল্লা কওন চি কি?

মুঙ্গলির উঠোন নিকোনোর সামান্যই তখনও বাকি ছিল। তার হাতে গোবর।

বিরক্তির গলায় বললো, সে কওন জানে, কওন চি কি?

www.BanglaBook.org

সুরাতিয়া দিদি বোধহয় ঘরের বাইরে গিয়ে শিমুলগাছটার নিচে কালো পাথরের স্তুপের উপরে গিয়ে উঠে দাঁড়ালো, ব্যাপার কি তা ভালো করে দেখবার জন্যে গলা লম্বা করে। তার গলার অপস্রিয়মাণ আওয়াজেই বুঝলো মুঙ্গলি। শিমুলতলিটা উঁচু। ওখান থেকে পিচ রাস্তা, মসজিদ আর ঈদ্‌গা সবই দেখা যায়।

পরক্ষণেই, সুরাতিয়া দিদির আতঙ্কগ্রস্ত চিৎকার শোনা গেলো, পুলিশোয়াকে মার দেল হো। পাথল ফেকতা হ্যায় ঢেরসা উনলোগোনে সব্বে মিলকর।

কাহে লা?

মুঙ্গলি শুধোলো আরও বিরক্তি কিন্তু উদাসীনতারই সঙ্গে, ঘর নিকোনো শেষ করতে করতে।

ঘরের মধ্যে থেকেই শুধোলো। সামান্য কাজ তখনও বাকি ছিলো।

ম্যায় জানু ক্যায়সি?

উত্তেজিত গলায় সুরাতিয়া দিদি বললো।

এবার গোবর-হাতেই মুঙ্গলি বাইরে এসে শিমুলতলিতে সুরাতিয়া দিদির পাশে দাঁড়ালো। দেখলো, নামাজীরা ফটাফট পাথর মারছে পুলিশদের। পুলিশদের মধ্যে দুজন পড়ে গেলো। অনেক পুলিশেরই মাথা ফেটে রক্ত বেরোচ্ছে। লাল রক্ত। ফিনকি দিয়ে। তখন একজন পুলিশ রাইফেল ভীড়ের দিকে তুলে গুলি করলো। গুড়ুম করে শব্দ হলো।

সুরাতিয়া দিদি অত্যন্ত ভীত এবং আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বললো, ভাগ ভাগ। জলদি ঘর ভাগ যা, মুঙ্গলি।

বলতে বলতেই সুরাতিয়া দিদিও দৌড়তে দৌড়তে নামলো নিচে। মুঙ্গলি কিন্তু তখনও দাঁড়িয়েই ছিলো। পুলিশের সঙ্গে জনতার মারামারি কখনও দেখেনি আগে।

ততক্ষণে বস্তীর মেয়েদের মধ্যে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। মরদরা কেউই নেই এখন বস্তীতে। একমাত্র বুড়ো রিটায়ার্ড বউ-মরা নিঃসন্তান ফৌজী ভগলু নানা তার ঘরের সামনে মাটির দাওয়াতে বসে তখন দাড়ি বানাচ্ছিলো মুখের সামনে আয়না ধরে। সেও গুলির শব্দ শুনে দৌড়ে এসে মুঙ্গলির পাশে দাঁড়ালো।

এমন সময় হঠাৎ মুঙ্গলি দেখলো, ইতোয়ারিন ঐ ভীড়ের মধ্যে থেকে ভীষণ ভয় পেয়ে দৌড়ে আসছে লাফাতে লাফাতে ভাঙ্গী বস্তীর দিকে। ইতোয়ারিন যে কখন মোরব্বার দড়ি ছিঁড়ে ওদিকে চলে গেছিলো, টেরই পায়নি মুঙ্গলি। অন্যেও না। ঈদের নামাজের জন্যে অনেকেই দোকান-পাট বসেছিলো ওখানে আজ। কিন্তু দড়িটা ছিঁড়েই বা গেল কি করে? মোরব্বা, মানে সিসাল-এর দড়ি।

মুঙ্গলি ভাবলো, সাধে কি আর মুসলমানেরা শুয়োরকে হারাম বলে! শুধু হারামই নয়, ইতোয়ারিন একটি নিমকহারামও বটে। এতো তাকে যত্ন করে রাখে তবুও খাবার লোভে গেলো! হারামজাদী!

জলদি আ। জলদি আ। আ। আজ তোর টেংরি তোড়ব।

চরম বিরক্তিতে চেঁচিয়ে উঠলো ক্রুদ্ধ হতচকিত মুঙ্গলি। যদি পুলিশের গুলি বা পাথর লাগে ইতোয়ারিনের গায়ে, এই ভয়ে ও সিঁটিয়ে ছিলো।

টেংরি ভাঙার ভয়ের চেয়েও রাইফেলের গুলির শব্দে অনেক বেশি ভয় পেয়ে ইতোয়ারিন প্রাণপণে থপথপ করে দৌড়ে আসছিলো। পুলিশদের উপরে শয়ে শয়ে পাথর পড়ছিলো তখন। নামাজ বন্ধ হয়ে গেছিলো। এবারে আবারও গুলির শব্দ হলো পরপর কয়েকবার। পাথর-বৃষ্টির মধ্যে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে গুলি করছে পুলিশরা।

www.BanglaBook.org

ইতোয়ারিন বস্তীতে না পৌঁছনো অবধি মুঙ্গলি অপেক্ষা করছিলো। এমন সময় নামাজীদের ভীড়ের মধ্যে থেকে কয়েকজন আঙুল তুলে দেখালো ইতোয়ারিন আর মুঙ্গলির দিকে। এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই একদল মানুষ পাগলের মতো দৌড়ে এলো ইতোয়ারিনের পিছু পিছু।

এক গালের দাড়ি কামানো, অন্য গালে সাবান নিয়ে ভগলু নানা আতঙ্কগ্রস্ত গলায় বললো, ভাগ বেটি। ভাগ যা সব্বে বস্তী ছোড়কর। তুরন্ত। ভাগ সুরাতিয়া! ভাগ মুঙ্গলি! সব্বে ভাগ।

কিন্তু অত তাড়াতাড়ি কি পালানো যায়?

যৎসামান্য সম্বল, তা সে যতো সামান্যই হোক না কেন, তা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া অত সোজা নয়। মেয়েদের পক্ষে তো নয়ই। মুঙ্গলি প্রথমে নিজেদের ঘরের দিকে দৌড়ে এলো। কিন্তু নিজেদের ঘরে ঢুকতে-না ঢুকতেই একটি তীব্র আর্তচিৎকার শুনলো ভগলু নানার। কী হলো দেখতে না পারলেও বুঝলো যে সাংঘাতিক কিছু ঘটে গেলো। পরক্ষণেই রে-রে-রে করে শয়ে শয়ে নামাজীরা ভাঙ্গী বস্তীর ঘরে ঘরে ঢুকে পড়লো। পালাতে, মেয়েরা একজনও পারলো না।

মুঙ্গলির উপরে অনেকগুলো দাড়ি-গোঁফওয়ালা পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধ-ভরা রাগী, কামার্ত, কুৎসিত মুখ নেমে এলো। নেমে এলো অনেকগুলো হাত ওর সারা শরীরের আনাচে-কানাচে। সরজু মাস্টারের মুখটা হঠাৎ ভেসে উঠলো একবার এক ঝলক চোখের সামনে। তারপর মুহূর্তেই তার শাড়িখানি ফালাফালা করে ছিঁড়ে তাকে মাটির মেঝেতে চিৎ করে শুইয়ে ফেললো মানুষগুলো।

সুরাতিয়া দিদি তীব্র চিৎকার করে ককিয়ে কেঁদে উঠলো, বললো, হায় রাম!

সুরাতিয়া দিদির বয়স হবে তিরিশ। ছেলেমেয়ে নেই কোনো। প্রতি ঘর থেকেই বিভিন্ন বয়সী নারীর আর্ত চিৎকারে পুরো বস্তী খানখান হয়ে গেলো। তালাও-এর জল ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। বাইরে থেকে শিশুদের আর্তনাদ।

তীব্র, তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে যেতে যেতে মুঙ্গলি শুনলো একজন নামাজী ওকে বলছে, "হারাম ভেজিন থী নামাজ মে শালী! হারামজাদী!"

দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে-যাওয়া একটি অবলা অবোধ যুবতী শুয়োরী ইতোয়ারিনের উপরেই যে একটি বিশ্বব্যাপী ব্যাপ্ত প্রাচীন ধর্মের পুরো সম্মান নির্ভরশীল ছিলো, এই জটিল এবং অবিশ্বাস্য কথাটি মুঙ্গলির মোটা মাথায় কিছুতেই ঢুকছিলো না।

হতভম্ব, স্তব্ধ হয়ে গেছিলো ও।

॥ ৬ ॥

জ্ঞান যখন ফিরলো মুঙ্গলির, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। রাত নেমে এসেছে। তার বাবা তখনও ফেরেনি। বস্তীর অন্য পুরুষেরা যদিও ফিরে এসেছে। বস্তীর বেশির ভাগ ঘরই আগুনে পুড়ে গেছে। মুঙ্গলিদের ঘরও। তার ভাবী শ্বশুর না ফসুর, মতি না ফতির আসা হলো না।

চোখ মেলে দেখলো মুঙ্গলি, যে, জুগগি পাহাড়ের নিচে ঝাঁটি-জঙ্গল-ভরা জমিতে শুয়ে আছে সে আরও অনেকের সঙ্গে। দুই পা রক্তে ভেজা। ভেজা শাড়ি। গায়ে অনেক জ্বর, বড় ব্যথা। ধাইমা তাকে কী সব জড়ি-বুটি করছেন। ধাইমাকে মানুষগুলো ছোঁয়নি। সাদা চুলের অশীতিপর বুড়ী।

www.BanglaBook.org

ভগলু নানার উদার বুকটা কসাই-এর গরু-কাটা ছুরি দিয়ে এফোঁড় করে দিয়ে গেছে ওরা। তার ওপর অন্য একজন পেটে একটা ছুরি ঢুকিয়ে মোচড় দিয়ে নাড়িভুঁড়ি সব বের করে দিয়েছে। শিমুলতলিতে শকুন পড়েছে ভগলু নানার উপরে। শেয়ালে-শকুনে ঠুকরে খাচ্ছে সেই মৃতদেহ।

পুরুষেরা ছিলো না বলেই প্রাণে বেঁচে গেছে। যদিও মানে মরে গেছে মেয়েরা। চতুর্দশীর রাত আজ। আলো আছে। সদরে লাশ-কাটা ঘরে যখন ভগলু নানাকে নিয়ে যেতে আসবে পুলিশ তখন তার লাশের বোধহয় আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। বস্তীর ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে দশ-বারোজনকে ঐভাবেই কুপিয়ে কেটেছে ওরা।

শকুন বসে আছে চাঁদভাসি আকাশের পটভূমিতে জুগণি পাহাড়ের ঢালে পলাশবনের ডালেও। চারধারে কান্না, বিলাপ আর আর্তনাদ।

মুঙ্গলির বাবা ফিরলো হাতে শুয়োরের মাংস আর ছোলার ডাল নিয়ে ফুলবাগ থেকে হেঁটে। যানবাহন সব বন্ধ।

মুঙ্গলি শুনতে পেলো, সরজু মাস্টার কথা বলছে দূরে পুরুষদের জটলার মধ্যে বসে। তার গলা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে মুঙ্গলি বড় কষ্ট হতে লাগল ওর। বড় কষ্ট। পুজোয় লাগার আগেই দলিত, পিষ্ট, গলিত হয়ে গেলো ফুল।

দশরথ চাচা বললো, মুঙ্গলি শুনলো, শুয়োর ওদের কাছে "হারাম"। মুঙ্গলির ইতোয়ারিন যদি ঘুরতে ঘুরতে ওখানে না যেতো...।

শুয়োরও তো ঈশ্বরের সৃষ্টি! মুঙ্গলি তা ইতোয়ারিনকে ইচ্ছে করে পাঠায়নি। সে গেলেও তো লাথ মেরে তাকে তাড়িয়েও দিতে পারতো ওরা। তাহলেই তো মামলা মিটে যেতো।

সরজু মাস্টার বললো।

না তা তাড়ায়নি। ওদের ধর্মে আঘাত লেগেছিলো বলে...। হঠাৎ গিয়ে পড়া শুয়োরীর মতো একটা বদবু, সুরতহারাম মাদী জানোয়ার ওতগুলো সুস্থ স্বাভাবিক এবং অসংখ্য শিক্ষিত মানুষকেও পাগল করে দিলো। পুলিশদের না মেরে, সকলে পাথর মেরে ইতোয়ারিনকেও না-হয় মেরেই ফেলতো। মুঙ্গলি না-হয় কাঁদতো খুবই। আর কী হতো? তাছাড়া পুলিশদেরই বা মারলো কেন?

কোনো যুক্তি...কোনো যুক্তি কি?

পুলিশদের মারলো, পুলিশেরা শুয়োরটাকে অ্যারেস্ট করেনি বলে। আটকায়নি বলে। ওদের ধারণা, পুলিশেরা চক্রান্ত করেই নাকি নামাজের মধ্যে শুয়োর ঢুকিয়ে দিয়েছিলো। এ চক্রান্তের মধ্যে ভাঙ্গী বস্তীর মানুষেরাও ছিলো।

দশরথ চাচা বললো।

সরজু মাস্টার বললো, ক্যা বাৎ!

দশরথ চাচা বললো, ইতোয়ারিনকে তো মুঙ্গলি বেঁধেই রেখেছিলো। ঈদের নামাজ তো আর ঈদগাতে এই প্রথম বারই হলো না! এতো বছর ধরে হচ্ছে। কোনোদিনও এমন ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটেনি। ওরা ভাবলো কি করে যে, চক্রান্ত ছিলো এর পেছনে? এতো বদমেজাজ কিসের ওদের? ভাবে কি ওরা নিজেদের? মানুষ এমন অন্ধও হতে পারে? গিয়াসুদ্দিন চাচার মতো মানুষও তো সেখানেও ছিলো! সেও কি বোঝাতে পারলো না? এমন অবুঝপনা! ভাবা যায় না। সত্যিই ভাবা যায় না।

গিয়াসুদ্দিন চাচা পুলিশের গুলিতে মারা গেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কে বললো?

সমস্বরে অনেকেই বলে উঠলো অবিশ্বাসের গলায়।

সরজু মাস্টার বললো হ্যাঁ, তাই।

ইসস! তাই?

স্তব্ধ হয়ে গেলো সকলে।

হ্যাঁ। পুলিশেরা তো আর দেখে দেখে গুলি করেনি।

দশরথ চাচা বললো, নিজেদের প্রাণ বাঁচাতেই করেছিলো।

সরজু মাস্টার বললো, ভগলু নানা যেমন ওদের ছুরিতে ফালা-ফালা হয়ে গেছে তেমন গিয়াসুদ্দিন চাচাও পুলিশের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা কতগুলো মাথামোটা ধর্মান্ধ লোকই চিরদিন লাগিয়ে এসেছে। কী হিন্দু, কী মুসলমান! আর তাতে মারা গেছে চিরদিনই ভগলু নানা আর গিয়াসুদ্দিন চাচাদের মতো ভালো, বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ, যুক্তিসম্পন্ন, বুদ্ধিমান, হৃদয়বান মানুষেরাই। এই হচ্ছে এই সবের নতীজা।

ওরে! এসব আলোচনা আস্তে করো। কে শুনে ফেলবে। তারপর পুলিশ এসে আমাদেরই ধরবে। গরিবের সহায় তো কেউই নেই।

ওদের মধ্যে থেকেই কে একজন বললো। অন্ধকারে তাকে ঠিক ঠাহর হলো না।

ঝড়ু বললো, আবার যদি ওরা আমাদের কোতল করার জন্যে ফিরে আসে? কি হবে?

দশরথ বললো, আবারও যদি আসে তবে আমরা তো আর মেয়ে নই, এসেই দেখুক না। আসোয়া, তীরধনুকগুলো? এসেই দেখুক। মেয়েদের একা পেয়ে যারা এমন করে যেতে পারে সেই মানুষগুলো কি মানুষ?

সব আছে হাতের কাছেই।

আসোয়া বলল।

দোষটা তো আসলে এই ভোটের কাঙাল বদমাশগুলোরই! বেয়াল্লিশটা বছর চলে গেছে। এখনও মুখ বুঁজে থাকবো? ফিরে এসেই দেখুক না তারা!

সরজু মাস্টার বললো ঠিক বলেছো। স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে বাস করেও ন্যায্য কথা যদি না বলার সাহস থাকে তবে ঐ শিমুলগাছে গলায় দড়ি দিয়ে-ঝুলেই পড়ো ঝড়ু চাচা। প্রত্যেক অন্যায়েরই একটা সীমারেখা থাকে। সেই সীমান্তে অন্যায়কে যদি আটকাতে না পারি আমরা তবে আর কোনোদিনও সেই অন্যায়কে আটকাতে পারবে না। এমনিতেই অনেকই দেরী হয়ে গেছে।

ঝড়ু বললো, রিলিফ আসবে না সদর থেকে? এই বস্তীর জন্যে?

দশরথ বললো, এসেছো তো।

কে যেন বললো, এ বস্তীর জন্যে কিছুই আসেনি। রিলিফ-টিলিফ ঐ দুই বড় বস্তীরও জন্যে। পাঁচ ট্রাক খাবার-দাবার। এয়ার-কন্ডিশনড গাড়ি করে সামনে পিঁ-পিঁ পাঁ-পাঁ করে ঢেঁড়া বাজানো এসকর্ট কার নিয়ে কালো মতো বদবু এম. এল. এ. ধবধবে সাদা পোশাক পরে এসে ঐ দুই বস্তীতেই ঘুরে গেছেন; আশ্বাস দিয়ে গেছেন যে কোনো ব্যাপারেই কোনো চিন্তার দরকার নেই। পুলিশের যে কোতোয়াল ঈদগাতে ডিউটিতে ছিলো তাকে ইতিমধ্যেই বরখাস্ত করা হয়েছে এবং শূয়োরের যে মালিক, একটি মেয়ে ধাঙ্গী বস্তীর মুঙ্গলি, তার শুয়োর শুদ্ধ তাকে গ্রেপ্তার করা হবে। হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত জজসাহেবকে দিয়ে এই শুয়োরঘটিত চক্রান্তর গোড়া ধরে টান দেবার জন্যে বিচারবিভাগীয় তদন্তও করানো হবে। ট্রাক-ট্রাক ওষুধও এসেছে। লঙ্গরখানাও খোলা

www.BanglaBook.org

হয়েছে। গুলিতে আহতদের অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে গিয়ে সদরের হাসপাতালে ভর্তিও করা হয়ে গেছে। মারা গেছে ন'জন। তার মধ্যে ন'জনই পুলিশের। আহত দশ। তার মধ্যে পুলিশের ছ'জন আর চারজন নামাজী।

মুঙ্গলিকে অ্যারেস্ট করবে। এম. এল. এ-র মতে মুঙ্গলিই এই দাঙ্গা বাধাবার মূলে। সত্যিই এস. পি. নিজেই আসছেন অনেক ভ্যান পুলিশ সঙ্গে নিয়ে সদর থেকে। গাগারির পুলিশ চৌকি নামাজীরা ইতিমধ্যেই আক্রমণ করে পুড়িয়ে দিয়েছে। অনেক পুলিশ মরেছে নাকি সেখানে।

পুলিশ, হাতে রাইফেল নিয়েও মরে গেলো? রাইফেল হাতে নিয়ে পাথর খেয়ে কি করে মানুষ মরে তা জানি না। এ আমাদের মহান ভারতবর্ষেই সম্ভব।

আররে! হিন্দুস্থানের পুলিশের রাইফেলের ট্রিগার থাকে রাজনৈতিক নেতাদের আঙুলে। পুলিশেরা সব পুতুল। বহু জন্মের অনেক পাপ থাকলে তবেই কোনো ভদ্রলোক মহান ভারতীয় গণতন্ত্রে পুলিশের চাকরি করতে আসেন। পুলিশের চাকরিতে ঢোকার পর অবশ্য অনেকেই আর ভদ্রলোক থাকেই না।

রিলিফ আসেনি।

কেন আসবে?

ওখানে এলো আর এই গ্রাম কি দোষ করলো?

আসোয়া শুধোলো।

এত দুঃখেও সরজুমাস্টার হেসে ফেলে বললো, সে সব কোনো কারণই নয় আসোয়া। ওরাও মানুষ, আমরাও মানুষ।

তবে?

ঝড়ু বললো হতবাক হয়ে, তবে এই তফাতটা কেন? কিসের জন্যে?

হাঃ! চুনাওটতো এসে গেলো! আর কত দেরী? ঐ দুটি বস্তী মিলিয়ে যে পুরো ছটি হাজার ভোট! আর ঝড়ু চাচা, তোমাদের এখানে মাত্র তিনশো ভোট। শুয়োরদেরও যদি ভোট থাকতো তা ধরেও। আর সেই ভোটের প্রত্যেকটি তো তোষণ-নীতির কারণে গদীতে-আসীন দলগুলোই পেয়ে আসছে চিরদিনই। গদী রাখতে হলে কোনো গদী-লোভীরই মুসলমানদের সলিড ভোটগুলি না পেলে চলে না এই কাঁরডারি জেলাতে। তোমাদের জন্যে কাদের মাথাব্যথা আছে বলো? এখন ইতোয়ারিনের মতো শুয়োরীরাই এই দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তারাই এখানে দাঙ্গা বাধায়, ভোট আনে; অথবা ভাঙায়। রাজা-উজির বানায়।

মুঙ্গলি তার কানের কাছে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ শুনলো একটা। হাত বাড়িয়ে গাঁ ছুলো ইতোয়ারিনের।

ইতোয়ারিনও তো জাতে মেয়েই! বে-ইজ্জৎ হওয়ার ভয়ে, সেও বুঝি তখনও থরথর করে কাঁপছিলো।

মুঙ্গলি তার হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরলো ইতোয়ারিনের মুঙ্গলির মাথার উপরে কালো আকাশের পটভূমিতে বাজে-পোড়া একটা শিমুলের ডালে ডালে শকুনগুলো অন্ধকারে অন্ধকারতর পিণ্ডর মতো বসে ছিলো সার-সার সবুজ নীল তারাদের পটভূমিতে।

তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যে, তারাই বোধহয় এ দেশের হতভাগ্য মানুষদের শেষ অভিভাবক।

www.BanglaBook.org

টাটা

এখন সকাল সাড়ে আটটা।

হরেনবাবু রোজকার মতো বাইরের ঘরের হাল ফ্যাশানের আসবাবের মধ্যে একমাত্র বেমানান আসবাবের মতো বসে বসে দৈনিক কাগজের বড় হরফে ছাপা প্রথম পাতার নাম থেকে শুরু করে শেষপাতার "প্রিন্টেড অ্যান্ড পাবলিশড বাই" পর্যন্ত পড়ছেন।

সময় এখন পাথরের মতো ভারী। নড়তে চায় না। চোখও আর দেখতে চায় না। অনেকই তো দেখল!

রুরু, হরেনবাবুর নাতি। সাদা শর্টস সাদা শার্ট আর টাই পরে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে যাচ্ছে। হরেনবাবু যখন অফিস যেতেন, তখনও তাঁর অত তাড়া ও টেনশান ছিলো না।

আট বছরের রুরুর জীবনে একটুও অবকাশ নেই। ওঁদের আট বছর বয়সে ওঁরা শিশুই ছিলেন। খেলতেন, দুষ্টুমি করতেন, হুটোপুটি করতেন, গ্রামের মাঠে দৌড়োদৌড়ি করে বাতাবী লেবু দিয়ে ফুটবল খেলে ঘর্মাক্ত হয়ে বাড়ি ফিরে শাঁখ-বাজানো সন্ধেবেলায় পড়তে বসতেন, সামনে লণ্ঠন নিয়ে। তাঁরা পিঠোপিঠি এত ভাইবোন ছিলেন যে, বাড়িটি ছিলো একটি অশান্তি নিকেতন। অথচ সেই আপাত-অশান্তির মধ্যেই এক আশ্চর্য শান্তি নিহিত ছিলো, অনিয়মানুবর্তিতার মধ্যে এক অলিখিত নিয়মানুবর্তিতা। ঠাকুমা দিদিমার মুখে মুখে রামায়ণ, মহাভারত, জাতক ইত্যাদির গল্প শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছিলো। তাঁদের জীবনে প্রাচুর্য ছিলো না, কিন্তু সুখ ছিলো; এত আরাম ছিলো না, কিন্তু আনন্দ ছিলো অসীম।

রুরু বললো, "টা-টা" দাদু।

বলেই বললো, দাদু তোমার লুঙিটা, পায়ের কাছে ছিঁড়ে গেছে।

রুরুর মা দময়ন্তী, তাড়া দিয়ে বললো, কথা পরে হবে, বাবা নেমে গেছেন। ড্রাইভার হর্ন দিচ্ছে। যত কথা ঠিক তোমার স্কুলের যাওয়ার সময়।

www.BanglaBook.org

হরেনবাবু নাতির প্রশ্নর উত্তর দিয়ে তার অমূল্য সময়ের অপব্যবহার না করা সত্ত্বেও, লজ্জিত হলেন। বোকা-বোকা মুখে নাতির দিকে তাকিয়েই টেপড মেসেজের মত বললেন, "টা-টা দাদু।"

দময়ন্তীও তৈরি হয়েই বেরিয়েছে। মার্কেটে কাজ আছে। জয়ন্ত ছেলেকে নামিয়ে, স্ত্রীকে নামিয়ে, তারপর অফিস যাবে। মার্কেটে কাজ সেরে ছেলেকে স্কুল থেকে নিয়ে, খাওয়ার সময় ফিরে আসবে দময়ন্তী একেবারে।

ওরা চলে যেতেই হরেনবাবুর মনে এলো কথাটা। এই 'টা-টা" কথাটা।

কথাটার মানে কি?

ওরা যখন ছোট ছিলেন তখন মা কি বাবাকে প্রণাম করে অথবা কুলুঙ্গীর দেবতাকে প্রণাম করেই বাড়ির বাইরে বেরোতেন। মা যদি কাজে ব্যস্ত থাকতেন তাহলে নিদেনপক্ষে দূর থেকেই হাঁক ছাড়তেন "মা যাচ্ছি"। মাও দূর থেকেই জবাব দিতেন, "যাওয়া নেই বাবা, এসো।" কোনোদিন সময় থাকলে কাছে এসে হয়ত আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছিয়ে দিতেন। চিবুকে হাত ছোঁওয়াতেন। বঙ্গভূমে তখন আঁচল দিয়ে সন্তানের মুখ মুছোনোটা অসভ্যতা বলে গণ্য হতো না। "ব্যাড ম্যানারস" বলেও নয়।

যাইই হোক, "টা-টা" কথাটার মানেটা যে কি, তা তাঁকে জানতেই হবে।

পরশু হিতেন ফোন করেছিল। বাতের ব্যথাটা নাকি খুবই বেড়েছে। অ্যাকুপাংচার করবে। রাজগীরেও গেছিল গত পুজোর সময়। হিতেনের লাইব্রেরিতে অনেক বই পত্র আছে। একদিন হিতেনের বাড়ি গিয়ে ডিক্সনারিগুলো ভাল করে খুঁটিয়ে দেখবে, "টা-টা" কথাটার মানে খুঁজে পাওয়া যায় কী না!

বেশ আছে হিতেন। রমা গত হয়েছে পাঁচ বছর হলো। একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়েছে দিল্লির এক প্রবাসী পরিবারে। জামাই আই-এ-এস। পাঞ্জাব ক্যাডারের। মেয়ে জামাই ওদের দেখাশুনা করে খুবই। প্রতি পুজোয় ওদের কাছে গিয়েই কাটিয়ে আসেন হিতেন। তবে জামাই এবং নাতি-নাতনীরা কেউই বাংলা পড়তে বা লিখতে পারে না। ওরা সকলেই ইংরেজিতে চিঠি লেখে হিতেনকে। "মাই ডিয়ার ড্যাডুভাই" বলে। ওদের দোষ নেই। ওরা তো প্রবাসী। তাঁর কোলকাতাবাসী নাতি একটু তাইই লেখে। হরেনবাবু আজকাল লক্ষ্য করেন যে, শিক্ষিত সচ্ছল বাঙালি পরিবারের মাতৃভাষা ইংরেজিই। ছেলে জয়ন্ত এবং বৌমা দময়ন্তী প্রতি চারটি কথাতে একটি করে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে। বোরড, হেল, কনফিউজড, ফ্রাসট্রেটিং, ইনটেন্স, রিলিজিয়াসলী, ওয়েল-অফফ, কুডনট কেয়ারলেস, এবং আরো হাজার কথা এখন বাংলা হয়ে গেছে। বাংলা সাহিত্যে এখন কোনো কিছুই লেখা হচ্ছে না বলে, ওরা ইংরেজি পেপারব্যাক ছাড়া কিছুই পড়ে না। হরেনবাবুরা পড়েছিলেন ছাত্রাবস্থায় যে, যে-কোনো ভাষাই সমৃদ্ধ হয় বিদেশী শব্দ চয়ন করে। আনন্দেরই কথা। বাংলা ভাষা, বাঙালি জাতি, এত সমৃদ্ধ হয়েছে। এবং হচ্ছে।

নীহারবালা এলেন। বাড়িতে বৌ ছেলে না থাকলেই নিজেরা একটু খোলামেলা বোধ করেন। ছেলের নির্দেশে বিয়ের পরদিন থেকেই দময়ন্তীকে নীহার "তুই" বলে ডাকেন। বৌমা আর মেয়েতে তফাৎ না-রাখার কারণে। দময়ন্তীও নীহারকে এবং হরেনবাবুকে বাবা মা এবং "তুমি" বলেই ডাকে। হরেনবাবু তুই-তোকারি না করতে পেরে "তুমি" তে এসেই রফা করেছেন।

নীহার এসে এক কাপ চা নিয়ে সোফায় বসলেন। বসতে যেতেই, একটু চা চলকে পড়লো সোফার উপর।

এই রে! ভয়ার্ত কণ্ঠে নীহার বললেন।

www.BanglaBook.org

কি হলো? বলে মুখের সামনে থেকে কাগজ সরিয়ে হরেনবাবু তাকালেন।

সর্বনাশ হয়েছে! দমু পনেরো দিন হলো নতুন কভার বানিয়েছে সোফার। পালিশ করিয়েছে ফার্নিচার। এর চেয়ে বড় সর্বনাশের কথা ভাবাই যায় না। সামনের শনিবার রাতে পার্টি আছে। এ-বাড়িতে প্রথম পার্টি। জয়ন্তর অফিসের বস এবং কয়েকজন ডিস্টিংগুইশড কাপলসকে বলবে ঠিক করেছে দমুরা। ঠিক এই সময়ই এমন দুর্ঘটনা।

নীহার আঁচল দিয়ে তাড়াতাড়ি দাগটা মুছে ফেল্যার চেষ্টা করলেন। তাতে দাগটা আরও স্পষ্ট হলো। নীহারের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেলো।

হরেনবাবু দাঁত চিবিয়ে বললেন, যেমন স্বভাব! কেষ্টর সঙ্গে রান্নাঘরে পা ছড়িয়ে বসে কলাই-করা গ্লাসে চা খেলেই তো পারো। দরকার কি মেমসাহেব হওয়ার? ছেলে বউ সাহেব মেমসাহেব বলে; কি তুমিও মেমসাহেব হলে?

মেমসাহেব!

কথাটা পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে নীহারের বুক ঠেলে কান্না এলো। চায়ের কাপ সেন্টার টেবলের কাচের উপর সাবধানে নামিয়ে রেখে আঁচল দিয়ে চোখের কোণ মুছলেন। মুখে কোনো কথা বললেন না।

হরেনবাবুর কাগজ পড়া শেষ হলে, নীহার বললেন, কী বলব?

কাকে?

অন্যমনস্ক গলায় হরেনবাবু বললেন।

দমুকে। দাগটাতো উঠবে না।

হরেনবাবু এদিক ওদিক চেয়ে নিয়ে ধারে-কাছে কেষ্ট আছে কি নেই তা দেখে নিয়ে বললেন, বিড়ালটা আছে, না চলে গেছে?

বিড়াল?

হ্যাঁ হ্যাঁ বিড়াল।

ও! আছে। আছে। রোজই তো গ্রিলের ফাঁক দিয়ে আসে। কালকে দুপুরবেলায় রান্নাঘরে জিইয়ে-রাখা মাগুর মাছ নিয়ে গেছে দুটো।

বাঁচা গেছে। দমুকে বলো যে, সোফায় বিড়ালেই ইয়ে করেছে।

মিথ্যা কথা বলব? নীহার অসহায়ের মতো বললেন।

হ্যাঁ। তাই-ই বলবে। তেমন প্রয়োজনে মিথ্যা বলে না কে?

নীহার বললেন, ছিঃ।

হরেনবাবুর স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন। চুলের সামনের দিকে পাক ধরেছে! তারই মধ্যে এক চিলতে রক্ত-নদীর মতো সিঁদুরে সিঁথি জ্বলজ্বল করছে। উঠেও গেছে চুল। কপালে বলিরেখা। চশমার কাচের আড়ালে দুটি বড় ক্লান্ত চোখ। সবে রান্নাঘর থেকে এলেন। শাড়িতে হলুদের ছোপ।

হরেনবাবু কিছু বলতে গেলেন নীহারকে।

কিন্তু কিছু বলার আগেই নীহার ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন।

হরেনবাবু খবরের কাগজটা ফেলে দিলেন! ভাবলেন, নীহারের পাশে গিয়ে বসেন একবার। জড়িয়ে ধরে, আদর করে, কান্না থামান, অনেক অনেক আগেকার দিনের মতো। কিন্তু উঠতে পারলেন না। স্থির হয়ে বসে রইলেন। দোষ তো তাঁরই! সারা জীবন ধরে ছেলে-মেয়ে মানুষ করে সর্বস্বান্ত হয়ে, শেষ বয়সে আটশ টাকা পেনসান সম্বল করে বাঁচবেন কি করে? যতদিন কোয়ার্টারে ছিলেন, তো ছিলেনই। কিন্তু ঐ টাকায় কোলকাতা শহরে দুজন মধ্যবিত্ত মানুষের থাকা-খাওয়া অসম্ভব। দমু অনেকবারই বলেছে যে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শান্তিনিকেতনে ওর বাপের বাড়িতে গিয়ে, ওর মা-বাবার সঙ্গে নিরিবিলিতে থাকতে। কিন্তু যেতে পারেননি। জীবনে নিজেও কম রোজগার করেননি, কম খরচও করেননি। টাকার দাম ছিলো তখন। তবে শেষ জীবনে ছেলে-বৌ-এর সংসারে এমন কুকুর বিড়ালের মতো বাঁচা ছাড়া অন্য কোনো ভাবে বাঁচার উপায়ই তাঁদের নেই। শরীরেও আর জোর নেই যে, নতুন কিছু করেন।

নীহার চোখ মুছে বললেন, "নবনীড়ে" গিয়ে থাকব ভেবেছিলাম; বেশ করেছেন ওঁরা, জানো! শচীন চৌধুরীর স্ত্রী সীতা চৌধুরী, এবং আরও অনেকে মিলে। ওখানে থাকার কথাটা দমুকে বলেও ছিলাম একদিন। দমু বললো, দাঁড়াও, তোমার ছেলেকে এক্ষুনি বলছি। ছিঃ ছিঃ একি কথা মা! এমনি করেই কি এমন আইডিয়াল ছেলে-বৌকে সম্মান দিতে হয়? "নবনীড়ের" কমিটিতে আমার জানাও আছেন কেউ কেউ। তাঁরা কী ভাববেন? জয়ন্ত আর দময়ন্তী নিজেদের মা-বাবা শ্বশুর-শাশুড়ীকে একেবারেই ফেলে দিল? তোমরা কি ডেস্টিচ্যুটস? কোন অন্যায় বা খারাপ ব্যবহার করেছি আমরা তোমাদের সঙ্গে? জয়ন্তকে বললে ও কিন্তু রাগে একেবারে "হিস্টিরিক" হয়ে যাবে। তাই, বলছি না এখন। ছিঃ ছিঃ! এমন করেই কি ছেলের ভাল ব্যবহারের প্রতিদান দিতে হয় মা?

হরেনবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন।

তারপর বললেন, তাই বললো? দমু? তোমাকে?

হুঁ।

নিরুপায় হরেনবাবু নীহারকে ক্ষণিকের জন্যে খুশি করার জন্যে বললেন, শাড়িটা ছেড়ে নাও। চলো একটু বেড়িয়ে আসি।

কোথায়? তাছাড়া আমার কত কাজ বাকি আছে এখনও। ছানা কাটতে হবে, কুটনো কাটা বাকি। দমু, নারকোল-কুচি-দেওয়া মুগের ডাল করতে বলে গেছে। রুরু এবং তার মা দুজনেই খুব ভালোবাসে। এখন যাওয়ার উপায় নেই।

হরেনবাবু চটে উঠলেন। বললেন, কে কি ভালোবাসে তা তো মুখস্থ। আমি যে কতদিন হল ভাপা-ইলিশ করতে বলছি, তার কি হলো? বর্ষা তো শেষ হয়ে এলো। আমি বুঝি আর মানুষ নই?

ভাপা-ইলিশ? ইলিশ মাছ দমু পছন্দ করে না। বলে, তেলওয়ালা মাছ। ফ্যাট আছে। তার উপর দুর্গন্ধ। আগে আগে কখনও ইলিশ রাঁধলে খেয়ে উঠে, সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে হাতে ওডিকোলন মাখত দমু।

ওডিকোলন! সে তো জ্বর হলে, জলে-গুলিয়ে মাথায় পট্টি দেবার জন্যে।

হরেনবাবু বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন।

তুমি কোন যুগে বাস করো? চান করে উঠে শরীরের নানা জায়গায় ওডিকোলন মাখে দমু। জতুও মাখে। তবে পেছনে।

পেছনে? মানে? হরেনবাবু উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলেন।

পেছনে মানে, ছাপুতে।

ছাপুতে? আমার ছেলে? কিন্তু ছাপুতে কেন?

অফিসে অনেকক্ষণ চেয়ারে বসে থাকে বলে পেছনে দাগ হয়ে যায়, দড়কচ্চা মেরে যায়। দ্যাখোনি হাসপাতালের রোগীদের ওডিকোলন মাখায়, যাতে বেডসোর না হয় সে জন্যে!

হুঁ। হরেনবাবু বললেন, তা দেখেছি। কিন্তু সারাজীবন ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসের তক্তাতে আর অফিসের কাঠের চেয়ারে বসে বসে জয়ন্তবাবুর বাবা কেরানী হরেনবাবুর ছাপু যে

www.BanglaBook.org

বেবুনের ছাপুই হয়ে গেল তা বুঝি...আর...

বেবুনের ছাপু? বেবুন কি? নীহার অবাক গলায় শুধোলেন।

আঃ। তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। এমন অশিক্ষিত! তোমাদের পুরো পরিবারটাই অশিক্ষিত। কিছুই বলার নেই।

এই কথাটি বিয়ের পরে কমপক্ষে পনেরো লক্ষ বার শুনেছেনে নীহার। তাই রাগ করলেন না। অনেক বছর হলোই করেন না।

আবারও বললেন, বেবুন কি?

চিড়িয়াখানাতে দেখোনি? আফ্রিকার বেবুন। মাকাল ফলের মতো লাল টুকটুকে ছাপু।

নীহার ঐ অবস্থাতেও হেসে উঠলেন ফিক করে।

বললেন, এমন অসভ্য না! চিরকালের অসভ্য! কালো মোষের মতো চেহারা, তার আবার...

এমন সময় কলিং বেল বাজল। নীহার তাড়াতাড়ি ভিতরে গেলেন। হরেনবাবুও। জতু-দমুর স্ট্রিক্ট ইনস্ট্রাকশান আছে যে, দরজা খুলবে শুধুই কেষ্ট। কেষ্টর জন্য চাঁদনী থেকে বেয়ারার উনিফর্ম আনিয়ে রেখেছে ওরা। বেল বাজলেই, তার ছেঁড়া হাফ প্যান্ট ও ঘেমো গেঞ্জির উপরেই সাদা ধবধবে পোশাক পরে গিয়ে ও দরজা খোলে। স্লিপ এগিয়ে দেয়। বলে, সাহেব মেমসাহেব বাড়ি নেই।

উইদাউট অ্যাপয়েন্টমেন্ট বড় কেউ একটা আসেও না। ভ্যাগাবন্ডরা ছাড়া না-বলে কয়ে কেউ কারো বাড়ি এমনিতেই আসে না!

বাইরে কে এল না এল তা নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা নেই। কারণ তাঁদের নিজেদের কাছে এখন আর কেউই আসে না। বন্ধুরা হয় কোলকাতা, নয় পৃথিবী ছেড়েই চলে গেছে। যারা আছে, তারা প্রায় সকলেই চলচ্ছক্তিহীন। একমাত্র হিতেনেরই গাড়ি আছে, তারই কিঞ্চিৎ মবিলিটি আছে।

কিন্তু সে কখনও আসে না! তাঁরাই যান।

নীহার এবং হরেনবাবু ভিতরে চলে গেলেন। কেষ্ট দরজা খুলতে গেলো। এই পোশাকে আসল কেষ্টকে চেনাই যায় না।

॥ ২ ॥

সেই শনিবার সকাল থেকেই তুমুল বৃষ্টি। পথে-ঘাটে জল থৈ-থৈ। জতু আজ নিজে বাজারে গেছে। রাতে অনেকেই খাবে। রুরুকে, বাজার-ফিরতি দমুর বোনের বাড়ি নামিয়ে দিয়ে আসবে। আজ রুরুর ছুটি। তাই "ডে-স্পেন্ড" করবে সে মাসির বাড়িতে। রুরুর সামনে মদ খাওয়া দমু একদম পছন্দ করে না। সেটাও একটা কারণ। আজ তো বাড়িতে পার্টি।

রুরু যাওয়ার সময় কাছে এসেছিল। বলেছিল টা-টা দাদু ভাই।

—টা-টা দাদু।

দমুর সঙ্গে জতু গড়িয়াহাটের দিকে যাচ্ছিলো। আজ ড্রাইভারের ছুটি। বললে, ডিউটিতে যে থাকে না তা নয়, কিন্তু ওভারটাইম দিতে হয়। নতুন এম-ডি, এক্সিক্যুটিভদের এইসব ব্যাপারেও চোখ রাখেন। লোকটা মীন। হান্ড্রেড পার্সেন্ট অনেস্ট। ডুবিয়ে ছেড়ে দেবে সকলকে। তাকে এবং জয়েন্ট এম-ডিকে খেতে বলেছে জতু। সঙ্গে সাহিত্যিক সুশোভন ঘোষাল ফিল্ম ডিরেক্টর গজেন চাকী এবং নাট্যকার অনির্বাণ চট্টখণ্ডীকে। ওর বাড়িতে যে বিখ্যাত লোকদের আনাগোনা আছে এবং ও যে কোম্পানির কাজ ছাড়াও আরও কিছু জানে এবং ও যে ভারসেটাইল্ তা বুঝবেন ওঁরা। দমু ওর বান্ধবী সুরূপাকেও

www.BanglaBook.org

বলেছে। ওর স্বামী অতি সামান্য একটি চাকরি করে। এই পার্টিতে তাকে ডাকা যায় না। কিন্তু সুরূপার রূপ চোখ-ধাঁধানো। যে-কোনো পুরুষই মূর্ছা যাবে। শরীরের অন্যান্য সমস্ত স্থানে যা যা থাকার তা বিশেষ পরিমাণেই থাকায় তার মস্তিষ্কে ধূসর-পদার্থ শূন্য। সে কারণেই, মেয়ে হয়েও দমু ওকে ভয় পায় না। এম-ডি'র নাকি একটু ছুক-ছুক রোগ আছে। এমনিতে জয়ন্ত কিছুতেই কাবু করতে পারছে না নতুন এম-ডি কে। যদি দমু সুরূপাকে দিয়ে করতে পারে। দমু যতটুকু জানে সুরূপাকে, তাতে সুরূপা উইল নট সে "নো" টু এনী গেম।

দমু বললো, রুরুকে আগে নামিয়ে দাও শেলীর বাড়িতে।

ঠিক আছে। বলে, জতু গাড়ি ঘুরিয়ে নিল।

কী কী কিনতে হবে লিস্ট করেছো তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ সব করা আছে। এখন চলো। কিনব আবার কি? ভেটকি মাছ আর তপসে মাছ। এ ছাড়া হুইস্কি, জিন। এক বোতল সিনজানো নিতে হবে। মিসেস সেন খুব ভালোবাসেন। সুরূপার জন্যে রাম নিতে হবে।

মেয়েরা রাম খায় কখনও শুনিনি। জতু বলল। রাম তো ঘোড়াদের খাওয়ায়, রেস শুরু হবার আগে।

দমু বললো, শী ইজ আ রাইডার।

আর খাবার-দাবার; কী করলে মেনু?

তুমিও যেমন! মণিদীপাকে বলে দিয়েছি ক্যালকাটা ক্লাব থেকে ও স্মোকড হিলশা আনিয়ে ড্রাইভারকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবে। পয়সা আমিই দেব। বলে দিয়েছি, বিলের অ্যামাউন্টটা সেট করে রাখতে। তোমার এমবারসমেন্টের কোনো কারণ নেই।

বলেই, বললো, ও ভালো কথা, ক্যালকাটা ক্লাবের মেম্বারশিপের কি করলে?

জতু বিরক্তি-মাখানো গলায় বললো, থামো তো! কাঁকুলিয়ার টেনিস ক্লাবেই এখনও হল না। অ্যাপ্লিকেশন তো করেই দিয়েছি। করলেই কি হবে না কি। কত বছর হাঁ করে থাকতে হবে এখন। তাছাড়া যদি কখনও হইও, তাহলেও কি লেজ গজাবে?

দমু রাগটা চেপে বললো, গ্রেপস আর সাওয়ার। তোমায় নিলে তো হবে! সেই জন্যেই তো অনির্বাণকে আজ খেতে বলে দিয়েছি। ওর সঙ্গে অনেক কমিটি মেম্বারের ওঠা-বসা আছে। শখের থিয়েটারে অনির্বাণ ওদের হেল্প-টেল্প করে। দেখি। তোমার তো কোনো চেষ্টা নেই কোনো ব্যাপারেই! তুমি শিগ্গির, ওরা আসার আগে অ্যাম্বার থেকে যা যা বলে দেব, তা তা নিয়ে আসবে। বাড়িতে রাঁধবে কে। কেষ্ট? না তোমার গেঁয়ো মা! আমি ইকেবানায় স্পেশ্যালিস্ট। রান্না, আমার জন্যে নয়! সবাই সব পারে না।

জতুর বিবেকটা এখনও পুরোপুরি ঘুমায়নি। মাঝে মাঝে মরা-সাপের রিফ্লেক্স অ্যাকশানের মতো হঠাৎই চমকে চমকে ওঠে। ও বললো, হোয়াট ইজ দিস? আমার মা-বাবার সম্বন্ধে এরকম কথা বলবে না। রোজ কার হাতের রান্না খাও? একটা, মিনিমাম রেসপেক্ট! ছিঃ!

আহা! ঢং করো না। বলে ভ্রূভঙ্গি করে তাকালো দমু জতুর দিকে।

বললো, নিজেই সবসময় যা-তা বলো না? "সাকারস" 'ইউসলেস ওল্ড ফুলস"! মরলেই বাঁচি। তাহলেই ঘাটশিলার জমিটাতে একটা ছোট্ট বাংলো বানিয়ে ফেলা যায়। বলো না?

ঘাটশিলার জমির কথাতে জতুর সম্বিৎ ফিরলো।

বললো, আর ঘাটশিলা! সে জমি জয়তীকে উইল করে যাবে বাবা। একমাত্র মেয়ে।

তুমিও তো একমাত্রই ছেলে!

www.BanglaBook.org

ছাড়ো। তবে, এও বলছি, তাই-ই যদি করে বাবা, এতই আনগ্রেটফুল হয়; তবে বাবার মৃত্যুর পর মাকে পত্রপাঠ জয়তীর কাছেই পাঠিয়ে দেবো। শী কানট ইট দ্যা কেক অ্যান্ড হ্যাভ ইট ট্যু।

॥ ৩ ॥

অঝোরে বৃষ্টি পড়ছিল। হরেনবাবু জানালার কাছে বসেছিলেন। নীহারকে বলেছিলেন আরও এক কাপ চা দিতে। এখনও কোনো কোনোদিন একটু বিলাসিতা করতে ইচ্ছে করে। অনেক কথা ভাবছিলেন হরেনবাবু। ছোটোবেলার কথা। চাকরিতে ঢোকার দিনের কথা। তাঁর ইংরেজ মালিকদের কথা। স্বদেশী আন্দোলন। মাদক-বর্জন। খদ্দর পরা। তাঁর কত মেধাবী বন্ধুরা জীবনে ভেসে গেছে নোঙর-ছেঁড়া নৌকোর মতো এই আন্দোলনে। কতজন প্রাণ দিয়েছে, মান দিয়েছে। মূর্খ চূড়ামণিরা সব। ভাবছিলেন, যেদিন দেশ স্বাধীন হলো, উনিশশ সাতচল্লিশের পনেরোই আগস্টের কথাও। কত কথা।

ইংরেজদের তাড়িয়ে দেবার পর আজকে পুরো দেশটাই ফ্রী-স্কুল স্ট্রিটের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কালচারকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। এর চেয়ে যে খাঁটি ইংরেজ কালচারও অনেক ভালো ছিলো। আর বাঙালিদের নিজেদেরও ভালো বলতে কি কিছুই ছিলো না। সব, সমস্ত জীবনটাই নিজের চোখের সামনে কেমন লণ্ড-ভণ্ড ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেলো।

ভাবতে ভাবতে উদাস হয়ে গেলেন হরেনবাবু।

জতু পড়াশোনায় মেধাবী ছিলো। ভালো রেজাল্ট করে, ভালো চাকরি পেয়েছিলো। কিন্তু মনুষ্যত্ব কি শুধু মেধাবী হয়েই অর্জন করা যায়? ছিঃ ছিঃ! তাঁর ছেলে! নীহারের ছেলে! ভাবতে পারেন না তিনি। নিরুপায়। অসহায়। তাঁর বা নীহারের কোনো পূর্বপুরুষদের চরিত্র এবং স্বভাব বোধহয় এরকম ছিলো। একেই বলে জিন। জিন-এর প্রভাব। এক জীবনের হিসেবে সব কিছু মেলে না।

তবুও উনি খুবই রীজেনেবেল। মাঝে মাঝে ভাবেন, হয়ত জতুরও একটা পয়েন্ট আছে। হরেনবাবুর বাবা বলতেন, "ওলওয়েজ ট্রাই ট্যু এপ্রিসিয়েট দ্যা আদার ম্যানস পয়েন্ট অফ ভিউ"।

চেষ্টা করেন। হরেনবাবু এখনও অ্যাপ্রিসিয়েট করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু...

নীহার ঘরে এলেন। শোবার ঘরে। এ ঘরে নীহার রুরুকে নিয়ে শোন রাতে। হরেনবাবু শোন বসবার ঘরের সোফাতে। আর মেঝেতে কেষ্ট। হরেনবাবুর জামা-কাপড় ইত্যাদি অবশ্য সব এই ঘরেই থাকে।

নীহারকে বললেন, কী রাঁধছ আজ?

যা রাঁধতে বলেছে দমু!

ওবেলা ভালো মন্দ আছে। এবেলা খিচুড়ি।

আঃ! খিচুড়ি? দমুটার বুদ্ধি আছে। আজ তো খিচুড়িরই দিন!

কী ডালের খিচুড়ি?

মুসুর ডালের।

দুসস। তার চেয়ে মুগের ডালের করো। সোনা মুগের। নারকোল কুচি দিয়ে, ভালো করে ঘি ঢেলে, আর ডালটা ছাড়বার আগে বেশ ব্রাউন করে ভেজে নেবে। আমার মা যেমন করতেন।

নীহার অবাক হয়ে হরেনবাবুর দিকে চেয়ে থাকলেন। তাঁর দৃষ্টিতে একাধারে বেদনা ক্ষোভ এবং হরেনবাবুর এই খাদ্য-রসিকতার প্রতি এক তীব্র ঘৃণা মাখামাখি হয়ে গেলো।

বললেন, সারা জীবনে অনেকই তো খেলে। অনেক রকম করেই খেলে। জিভের

www.BanglaBook.org

লালসা কি এখনও গেলো না?

হরেনবাবু একটু রসিকতা করতে চাইলেন। বললেন, আর সবই তো গেছে, এটা না হয় থাকলই। আর ক'টা দিনই বা!

আবার বললেন, তাহলে মুগের ডালেই করছ! সোনা মুগের?

নীহার উঠে দাঁড়িয়ে নৈর্ব্যক্তিক গলায় বললেন, বাড়ির কর্ত্রী যা রাঁধতে বলেছেন, তাই-ই রাঁধতে হবে। তোমার মতো স্বামীর হাতে পড়েছিলাম, তাই মৃত্যুর দিন অবধিও গোলামী করতে হলো। বিয়ের পর দিন থেকে তোমার মায়ের, ছেলের বিয়ের পরদিন থেকে ছেলের বৌ-এর। কত তো পরিবার দেখি। সেখানে বাবা-মা সত্যিই বাবা-মার সম্মান পায়। আর আমরা যেন চাকর-ঝি! আর ভালো লাগে না গো। চলো, আমরা একসঙ্গে যা হোক করে মরি।—

মরি? মানে?

মরি, মানে মরি।

ছিঃ মরবে কি? আত্মহত্যা করে কাপুরুষেরা।

—ছিঃ মরবে...কী আমার বীরপুরুষ!

বলেই, নীহার খালি-কাপটা তুলে নিয়ে চলে গেলেন।

না। আত্মহত্যা করবেন কেন? সুখের দিনে ভগবানকে তো ধন্যবাদ দেননি একদিনও। আজ দুঃখের দিনেই বা তাঁকে অভিশাপ দিতে যাবেন কেন? সমস্ত কিছুই প্রি-কন্ডিশানড। এই হেনস্থা তাঁর কপালে ছিলো। ছিলো বলেই, মাথা পেতে নেওয়া উচিত। তবে নীহার যাই-ই বলুক, ওঁদের কোনো কোনো বন্ধু-বান্ধবের অবস্থা ওঁদের থেকেও অনেক খারাপ। তা তিনি নিজের চোখে দেখেছেন। তাঁদের মাথার উপর তাও তো ছাদ আছে। খিদের সময় খেতে পান। যা সামান্য কাজ তাঁকে ও নীহারকে করতে হয়, সে তো আনন্দেরই কাজ। ছেলে-বৌ এর জন্য, নাতির জন্য করা, কী করা নাকি? মেয়েরা, ইন জেনারেল; বড় মীন হয়। এই নীহারই তাঁর মনটাকে আস্তে আস্তে বিষিয়ে দিচ্ছেন ছেলে-বৌ এর বিরুদ্ধে।

হরেনবাবু ঠিক করলেন, এ সব মনখারাপের কথা ভাবার চেয়ে ভালো খাওয়ার কথা মনে করবেন এখন। মন খারাপ ভাবটাই চলে যাবে। এমন বর্ষার দিনে মুড়ি-তেলেভাজা, অথবা কালোজিরে-শুকনোলঙ্কা দিয়ে মুড়িভাজা পেলে কেমন হত এখন? সঙ্গে আদা দারচিনি দেওয়া গোরখপুরী চা? ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচুর শাক। নয় তো পুঁই-ডাঁটা আর কুমড়ো দিয়ে ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে চচ্চড়ি। তেল-তেল; ঝাল-ঝাল। উঃ কত্তদিন খাননি। এবং ইলিশ, সর্ষে-কাঁচা-লঙ্কা দিয়ে, নয় তো দই-ইলিশ। অথবা পাৎলা করে কালোজিরে-কাঁচালঙ্কা দিয়ে ঝোল। না না, এমন বর্ষার দিনে তা ভালো লাগবে না। তার চেয়ে রাতের বেলা মুগের ডালের ভুনি খিচুড়ি। কিসমিস, বাদাম দিয়ে কষে খাঁটি গাওয়া ঘি ঢেলে। সঙ্গে শুকনো লঙ্কা ভাজা, পেঁয়াজী, ডিমভাজা, কুমড়ো ভাজা, পাতলা করে কেটে; শাপলা ভাজা, তপসে মাছ ভাজা, মৌরলা বা পুঁটি মাছ ভাজা। নয়ত ভেতরটা নরম-রাখা কাঁচা পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কার পুর দেওয়া ওমলেট। আর কড়কড়ে লাল করে আলুভাজা!

হঠাৎই হরেনবাবুর মনে পড়লো কথাটা। টা-টা!

টা-টা কথাটার মানে কি? মানে কি বিদায়? এ কি, কাউকে, কিছুকে ছেড়ে যাওয়ার সময়কার সম্ভাষণ? কোনো গভীর ভালো লাগাকে, কোনো বিশ্বাস, জীবনযাত্রা, মূল্যবোধকে বিদায় জানানো? বিদায় জানানো, শৈশব থেকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা জীবনের কোনো অবিচ্ছেদ্য অংশকে? রক্তপাতহীন নিঃশব্দ অঙ্গচ্ছেদের যন্ত্রণার শব্দর নামই কি এই

www.BanglaBook.org

টা-টা!

নাঃ!

কথাটার মানে হরেনবাবুকে জানতেই হবে।

॥ ৪ ॥

নীহারকে শুধু রসগোল্লার পায়েসই রাঁধতে বলেছিল দমু। নীহারের এই রান্নাটির বিশেষ সুখ্যাতি করে পুত্রবধূ। দুপুরেই রেঁধে ফ্রিজে ঢুকিয়ে রেখেছিলেন উনি।

বিকেলে চারটে নাগাদ নীহার যখন চা করে কেষ্টকে দিয়ে জত্তু-দমুর ঘরে পাঠিয়েছেন সেই সময় দমু দরজা খুলে চায়ের কাপটা নিয়ে বাইরে এসে একেবারে নীহারের সঙ্গেই খাওয়ার টেবিলে বসলো। এমন সুমতি, সচরাচর হয় না দমুর। সে দুপুরে না বেরোলে; এই সময় ঘরে শুয়ে শুয়ে ইংরেজি বই পড়ে। বাংলা বই ওর দু-চক্ষের বিষ। ও বলে, বাংলাভাষায় "কিসসুই" লেখা হয়নি গত তিরিশ বছরে, "হসসেও না"। যত্ত সব ট্র্যাশ! রুরুকেও বাংলা বই বিশেষ পড়তে দেয় না। বাড়িতেও ওর সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলে। নীহার নেহাত ইংরেজি বলতে পারেন না, তাই! আজকাল পাড়ায় পাড়ায় বাংলা বইয়ের লাইব্রেরিও নেই আগেকার মতো যে, কোনো বই আনিয়ে পড়বেন। তবে নাতির পাল্লায় পড়ে একটা ইংরেজি কথা মেমসাহেবদের মতোই বলতে হয় তাঁকে। রুরু স্কুল থেকে এসে দরজায় বেল দিলেই নীহারই গিয়ে খোলেন। সময়টা জানা আছে তার। ঐ সময় অন্য কেউও আসে না। ওকে খেতে টেতে দেন। দরজা খুলেই রুরু বলে "হাই" দিদা। জবাবে, নীহারকেও "হাই" বলতে হয়। না হলে, নাতি ছাড়ে না। বলিয়েই ছাড়ে। নীহার বলেন, "হাই রুরু"! বলেই দিদা আর নাতি দুজনেই হেসে ওঠেন একসঙ্গে। রুরুটাই একমাত্র খুশির হাওয়া এই দমবন্ধ বাড়িতে। শিশুরা ভগবানের মতো। ওদের মনে কোনো কালিমা লেগে থাকে না। ওরা কাউকে আঘাত দিতে জানে না। শুধুই ভালোবাসতে জানে।

দমু বললো, চায়ে চুমুক দিতে দিতে; দেখো মা, আজ তোমার রসগোল্লার পায়েসের কী সুখ্যাতি হয়। সকলে, ভাল বলবে তোমার রান্নাকে।

নীহারের এ সব শোনার অভ্যেস নেই।

উনি বুঝলেন, এর পরই কোনো অনুরোধ বা আদেশ আসবে দমুর কাছ থেকে।

দমু বল, ও বলছিলো যে তোমরা, মানে তুমি আর বাবা আজ ন'টার শোতে সিনেমা দেখে এসো। চার্লি চ্যাপলিনের "মডার্ণ টাইমস" হচ্ছে; ও বলেও দিয়েছে। কারখানার একজন মেকানিক টিকিট কেটে দিয়ে যাবে একটু পরই। তবে, তোমরা বিকেল পাঁচটা-টাচটা নাগাদই বেরিয়ে পোড়ো দুজনে; বেড়িয়ে-টেড়িয়ে পার্ক স্ট্রিটে চাইনীজ খেয়ে নিয়ে চলে যেও সিনেমাতে।

নীহার অবাক হয়ে, কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে; ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না। রেস্তোরাঁতে গিয়ে চাইনীজ খাননি তা নয়, কিন্তু ওঁরা দুজনে? একা একা? তাছাড়া, ন'টার শোতে ইংরেজি ছবি!

দমু বললো, বাবাকেও বলেই এসো মা। তোমরা তৈরিও হয়ে নাও। এরপর বাড়িতে নানারকম লোক, নানা ঝামেলা, তোমাদের ভালো লাগবে না থাকতে। দেখো না, রুরুকেও পাঠিয়ে দিলাম।

নীহার একটু কাশলেন। বললেন, সে জন্য নয়। তোর বাবার চোখের ছানি তো প্রায় পেকে এসেছে। রাতে যে উনি কিছুই দেখেন না। তাছাড়া...

তাছাড়ার কিছুই নেই। তোমার ছেলে ট্যাক্সি-ভাড়া, টাকা সব দিয়ে দেবে। তোমাদের

www.BanglaBook.org

কোনো অসুবিধে হবে না। গাড়ি তো আজ ছাড়তে পারবে না। গাড়ির অনেক কাজ।

নীহার কথার মধ্যে কথা বলেন না। তাছাড়া, তোর বাবার পেটটা বেশ নরম হয়েছে। দুপুরে খিচুড়ি খেয়ে। স্বভাব তো জানিস। কোনো সংযমই নেই। এত বেশি খেলেন।

দমু মনে মনে বললো, বেশি খাওয়ার কথা আর বলতে হবে না। দুধটা, খইটা, গুড়টা, এটা ওটা তো আছেই, তারপর কোয়ানটিটি! বাড়ি সুদ্ধু সকলে যা না-খায়, উনি একাই তা খান। সংসার যে চালায়; সেই-ই জানে!

মুখে বললো, বাবার পেট কি খুব বেশি আপসেট করেছে?

হ্যাঁ। তা, খাবার পর থেকে বার চারেক তো গেছেনই!

দমুকে বেশ চিন্তান্বিত দেখালো।

বললো, দাঁড়াও তোমার ছেলেকে বলে আসি। প্রবলেম হবে। রিয়াল প্রবলেম।

চায়ের কাপ হাতে নিয়েই দমু শোবার ঘরে উঠে গেলো। একটু পরে গেঞ্জী-পাজামা পরে জতু বেরিয়ে এসে নীহারকে বললো, বাবার কখনও আক্কেল হবে না। একটা দিনের তো ব্যাপার। ঠিক এই দিনটিতেই যতো ঝামেলা বাধাল। আমার কিছু ভাল লাগে না।

চেঁচামেচি শুনে হরেনবাবু ধুতিটা বাঁধতে বাঁধতে উঠে এলেন। বললেন, কি হলরে জতু? কি হয়েছে?

না। তোমাদের জন্য সিনেমার টিকিট কেটে, চাইনীজ খাওয়ার বন্দোবস্ত করে, এখন শুনি; তুমি পেট-আপসেট করে বসে আছো।

হরেনবাবু কিছুক্ষণ ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিলেন।

বললেন, আগে জানলে; আমরাও হিতেনের বাড়ি চলে যেতাম। আজ না হয় সেখানে থেকেও আসতে পারতাম। আগে তো বলিস নি। আমার শরীরটা যে সত্যিই বড় খারাপ করেছে রে।

দমু শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সব শুনলো। এবং যখন বুঝল যে, হরেনবাবুর পক্ষে সত্যিই যাওয়া সম্ভব নয়, তখন আবার ঘরের ভিতরে চলে গেলো। হরেনবাবুও বাথরুমে গেলেন!

হরেনবাবু যখন বেরোলেন তখন দমু একটা পাটভাঙ্গা পায়জামা নিয়ে এসে হরেনবাবুর সামনে দাঁড়ালো। বললো, দেখো তো বাবা, এটা তোমার হয় নাকি? বাবা শান্তিনিকেতন থেকে গতবার এসে, ভুলে ফেলে গেছিলো।

হরেনবাবু অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন দমুর দিকে।

কি হবে মা?

জতু বললো, এটা তোমার হয় কী না পরে দেখো। দশজন গণ্যমান্য লোকের সামনে তো আর লুঙি পরে ঘুরতে পারবে না।

অসহায় গলায় হরেনবাবু বললেন, আমি পারি না রে জতু। পায়জামা পরলে আমার দমবন্ধ লাগে। তোর মা কত রাগ করেছে বিয়ের পর পর, বলেছে অসভ্যর মতো লাগে; কিন্তু যার যা অভ্যেস। কোনোদিনও পারিনি, পারব না। তাছাড়া বার বার বাথরুমে যেতে...

দমু বিরক্তির সঙ্গে বললো, ফারসট ক্লাশ!

তারপর কেষ্টকে ডেকে ডিসপেনসারিতে ওষুধ আনতে পাঠিয়ে, বসবার ঘরে মার্কেট থেকে আনা ফুল নিয়ে বসে ফুল সাজাতে বসল বিভিন্ন ফুলদানীতে।

রাগ-চাপা গলায় কেষ্টকে বললো, তাড়াতাড়ি আসবি। অনেক কাজ আছে।

নীহার জতুকে বললেন, গণ্যমান্য লোকদের সামনে আমরা বেরোবই বা কেন রে? ঘরের মধ্যে বসে থাকলেই হবে।

www.BanglaBook.org

ঘরে বসে কি বোবা হয়ে থাকবে? ঘরে থাকলে অতিথিরা জিগগেস করবে না, ওঁরা কারা? আর জিগগেস করলে তখন তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতেই হবে।

যারা আলাপ করবার যোগ্য নয়, তাদের সঙ্গে আলাপ করাবিই বা কেন? যোগ্য মা-বাবা হলেও না-হয় কথা ছিলো।

নীহার মাঝ থেকে বললেন।

আঃ। জতু বললো, মা! এটা মান-অভিমানের ব্যাপার নয়। বাড়িতে পার্টি হবে। যাঁরা আসবেন তাঁরা মেয়ে-পুরুষ সকলেই মদ খাবেন। উপরতলার লোকেরা তাই-ই খায়। এতো আর আমাদের ভূতি সরকার বাই লেনের বাড়ি নয়। আমিও কেরানীগিরি করি না। তোমাদের বোঝাব কি করে? এটা রেয়াজ নয়। বাড়িতে পার্টি হলে, তোমরা থাকলে তোমাদেরই অসুবিধা। নাচবে, গাইবে, হৈ হল্লা হবে। পার্টি হলে বুড়োবুড়ি আন্ডা-বাচ্চাদের থাকতে নেই।

অসুবিধা, তা যদি সকালে বলতিস, তাহলে কত জায়গাই তো যেতে পারতাম। রাস্তায় জল জমেছে। তোর বাবা চোখে দেখেন না রাতে। তারপর শরীর খারাপ। ঈসস তোদের কি বিপদেই ফেললাম বলত!

দমু পরিবেশটা হাল্কা করার জন্যে জতুকে বললো, অত টেন্স হচ্ছো কেন? বাবার শরীর খারাপ হবে এ তো আর তুমি জানতে না।

জতু রেগে বললো, তুমিই তো মাকে দিয়ে রসগোল্লার পায়েস রাঁধবার জন্যে মাকে আটকে রাখলে। মা-বাবা বিন্দু পিসিমার বাড়ি সকালেই চলে যেতে পারত। ওঁদের কি দোষ?

নীহার বললো, আহা দোষ-গুণের কথা হচ্ছে না। আমরা এমন করে থাকব দেখিস যে, কেউ বুঝতেও পারবে না যে, আমরা আছি। কেউই বুঝতে পারবে না। না-থাকার মতই থাকব। মাত্র কয়েকটা তো ঘন্টা!

দমু বললো, কারো কোন দোষ নেই মা, সবই আমার দোষ। তোমার ছেলের অফিসের বড়সাহেবরা এসে ড্রিঙ্ক করে, খেয়ে নেচে গিয়ে তোমার ছেলের প্রমোশনের রাস্তা পাকা করবেন এই চেষ্টা করছি, এইটেই আমার অপরাধ।

নীহার বললেন, আহা! দমু,আবার ওসব কথা কেন? থাক না। দোষ তো আমাদেরই! সত্যিই এমন বে-আক্কেলে বাবা-মা নিয়ে যে কতরকমের ফ্যাসাদেই আজকাল পড়তে হয় তোদের বুঝি।

জতু পাজামা গুটিয়ে গাড়ির কাচ-মোছা হলুদ কাপড় বের করে নানা সাইজের কাঁচের গ্লাস মুছতে লাগল। বসার ঘরের একটা কোণাতে বার সেটআপ করতে লাগল। ড্রাইভার ক্রেটে করে সোডা আর কাম্পা-কোলা, লিমকা, ফান্টা এসব এনে নামিয়ে রেখে কেষ্টর সঙ্গে সব ফ্রিজে ঢোকাতে লাগল।

দমুর ফুল সাজানো হলে সে বললো, আমি এবার গাটা ধুয়ে নেব, না তুমি যাবে? তুমিই যাও। এয়ার-কন্ডিশানড ঘর থাকে, তাহলে চান করে এত ঘামতে হয় না। সে সব তো আর নেই! আমি পরে যাব। তুমি করে নাও।

নীহারের দিকে ফিরে বললো, জানো তো মা, তোমার ছেলের প্রোমোশন হলে বিরাট ফ্ল্যাট পাবে এবারে। তিনটে এয়ার-কন্ডিশানড বেডরুম। কুক। তবে, একটা মুশকিল হবে। কোম্পানির ফ্ল্যাটে মা-বাবাকে থাকতে দেবে না।

দেবে না?

আতঙ্কিত গলায় বললেন নীহার। কেন দেবে না?

কোম্পানির ফ্ল্যাটে কোম্পানি থেকে এনটারটেইন করার খরচা দেবে, কতরকম লোক

www.BanglaBook.org

আসবে। পার্টি লেগেই থাকবে। সেই সব কারণেই এমন নিয়মকানুন।

আর রুরু? রুরুর কি হবে?

রুরুকে ডুন স্কুলে কি আজমীরে পাঠিয়ে দেবো। বাবা মায়ের আদরে আদরেইত সব স্পয়েল্ট হয়ে যায়। মানুষ হতে হবে তো! বাঙালি হয়ে থাকলে তো আর চলবে না। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, পড়নি, ছোটোবেলায়? "রেখেছো বাঙালি করে মানুষ করো নি, সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী!" একেই বলে জিনিয়াস। সেই কবে বলে গেছেন কথাটা আর আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। পাঞ্জাবীদের দেখো না? কী স্মার্ট, কী ডেয়ারিং। মাড়োয়ারীরাও আজকাল খুব মডার্ন হয়ে উঠেছে। আগের মতো আর নেই। কলকাতা শহরের মালিক তো এখন তারাই। খাটে, পয়সা রোজগার করে। বাঙালি যত্ত, সব তো এখন ডেলি-প্যাসেঞ্জার! নতুন যুগ এসেছে মা। এখন অনেক প্র্যাকটিকাল, প্র্যাগমাটিক হতে হবে।

নীহার শেষ কথা দুটোর মানে বুঝলেন না।

জতুর যখন উন্নতি হবে, তখন আমাদের কি হবে দমু?

দমু হাসলো। বললো, ছেলের উন্নতির কথাতে কোনো মায়ের মুখ শুকোয়, এমনটি আর দেখিনি। না বলে বলল, অবনতি হবে।

কেষ্ট ফিরলো ওষুধ নিয়ে। নীহার ওষুধ খাওয়াতে গেলেন হরেনবাবুকে। হরেনবাবু খুব ঘামছিলেন।

এত ঘামছো কেন? আজ তো গরম একেবারেই নেই। বরং ঠাণ্ডা লাগছে আমার।

হরেনবাবু, এক সময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ হরেন্দ্রনাথ, মিচিগান অ্যান্ড ম্যাকআইভরের টি ডিপার্টমেন্টের ছোটবাবু একেবারে ভয়ার্ত কেঁচোর মতো বললেন, জানি না নীহার। আমার বুকের কাছে বড় যন্ত্রণা হচ্ছে। বাঁ দিকে।

সে কি? জতুকে বলি!

না, না! তুমি কি পাগল হলে? এই সময়? সব ঠিক হয়ে যাবে। বাড়িতে লেবু থাকলে লেবু-নুন দিয়ে সরবৎ করে দাও একটু।

নীহার সরবৎ করার জন্যে ফ্রিজ থেকে লেবু বার করতে গেলেন।

দমু বলল, দেখো মা! লেবু নষ্ট কোরো না। অনেকেই জিন খাবে লেবু দিয়ে। লাইম জুস কর্ডিয়ালে অনেকের আবার অম্বল হয়।

জিন? জিন কিরে দমু? জিন-পরী?

দমু, অশিক্ষিত শাশুড়ির অজ্ঞতায় হেসে গড়িয়ে পড়ল।

বলল, সে জিন নয় মা। এ অন্য জিন। ঈসস তোমাকে নিয়ে আর পারি না।

সাড়ে ছ'টা বেজে যেতেই বাড়িতে টেনসান বাড়তে লাগলো। কেষ্ট উর্দিটুর্দি পরে সাহেব হয়ে গেলো। সবক'টা আলো জ্বালানো হল। পৌনে সাতটার সময় দমুও রেডি। দারুণ এক জমকালো সম্বলপুরী সিল্ক পরেছে দমু। এমন একটা শাড়ির খুব শখ ছিলো নীহারের যৌবনে। অনেক শখই অপূর্ণ থেকেছে; তার মধ্যে এও একটা।

সাতটা বাজতেই নীহারকে ঘরে ঢুকিয়ে দিলো জতু। মুখ ঢুকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কি বাবা? তুমি যে একেবারে শুয়ে পড়লে? এই বয়সে কেন যে লোভীর মত খাও একগাদা। ফুড হ্যাবিটস চেঞ্জ না করলে এই বাঙালি জাতের কিসসু হবে না।

॥ ৫ ॥

ঘরের মধ্যে অন্ধকার। কিন্তু ঘরের বাইরে বসবার ঘরে এখন অনেক আলো। আলো ঝলমল করছে। স্টিরীওতে ইংরেজি কি সব গান চাপাল ওরা।

www.BanglaBook.org

নীহার ফিসফিস করে বললো, কেমন লাগছে এখন? বুকের ব্যথাটা?

ফারস্ট ক্লাস। ফারস্ট ক্লাস আছি। হরেনবাবু বললেন।

এবং সঙ্গে সঙ্গে দরজা একটু ফাঁক হয়েছে দেখতে পেয়েই জতু প্রায় ছুটে এসে বাইরে থেকে হুড়কো তুলে দিতে দিতে, মিথ্যা রাগের গলায় দমুকে বললো, আশ্চর্য! কুকুরটাকে ঢুকিয়ে রেখেছ, দরজাটাও বন্ধ করোনি?

বাইরে থেকে হুড়কো-বন্ধ অন্ধকার ঘরে বন্দী, অভিশপ্তা গর্ভধারিণী, অবিশ্বাসে, আঘাতে নিথর হয়ে, তাঁর স্বয়ম্ভূ সন্তানের মঙ্গল কামনায় নিঃশব্দ, নিশ্চল হয়ে রইলেন।

চারদিকে চাপ চাপ অন্ধকার। অন্ধকারে সময়ও নড়ে না। টেবিল ঘড়িটা শুধু টিক-টিক করছিলো।

নীহার হরেনবাবুর কাছে এলেন। পাশে বসলেন। গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন, হরেনবাবু খুবই ঘামছেন। ফিসফিস করে তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে নীহার শুধোলেন, এখন কেমন লাগছে?

গলা দিয়ে একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরুল।

তারপর খুবই কষ্টের সঙ্গে বললেন, চমৎকার নীরু; চমৎকার!

অনেক অনেক বছর পর নীহার তাঁর নিজের চিবুকটি বড় সোহাগে, বড় দুঃখে বড় গভীর প্রেমে তাঁর স্বামীর ঘাম-ভেজা বুকের উপর ছুঁইয়েই ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কেঁদে উঠেই, দু-হাত দিয়ে নিজের কণ্ঠরোধ করলেন।

অনেকক্ষণ সময় কেটে গেলো। সময়কে হুড়কো বন্ধ করে রাখা যায় না কোনো ঘরেই। তার চলা অবিরত; অবাধ।

বাইরে বসবার ঘরে বোধহয় আলো একেবারে কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। একদল মডার্ন, প্র্যাকটিক্যাল, প্র্যাগম্যাটিক মানুষ-হওয়া বাঙালি খুব জোরে ইংরেজি গান বাজিয়ে এ দেশ থেকে যারা ইংরেজদের বিতাড়িত করেছিল একদিন নিজেদের চারিত্রিক দৃঢ়তায়, তাদেরই ন্যক্কারজনক প্রেতাত্মাদের মতো কোমরে কোমরে জড়িয়ে নাচানাচি করছিল।

হঠাৎ বাজনা থামিয়ে কে যেন গান ধরল, "কে সারা সারা, হোয়াটেভার উইল বী, উইল বী!"

সকলে গলা মিলিয়ে গাইল, "হোয়াটেভার উইল বী, উইল বী!"

হরেনবাবু ততক্ষণে এক স্বপ্নময় আলোর দেশে পৌঁছে গেছেন।

সেখানে সবে বৃষ্টি থেমেছে। বৃষ্টি-ভেজা বাদামী-সাদা দল-ছাড়া বক ডানা ঝাড়ছে হরিসভার পুকুরপাড়ের পাশের জারুল গাছের নরম সবুজ ডালে বসে। বাতাবী ফুলের গন্ধের সঙ্গে বৃষ্টিভেজা সোঁদা মাটির গন্ধ মিশে গেছে।

সন্ধে হয়ে যাবে একটু পরেই!

তিস্তা থেকে আসা ঘোঘট নদীর ক্যানালের পাশের চাপ চাপ সবুজ ঘাসের মাঠ পেরিয়ে দূরের দুগ্ধ-ফেননিভ মেঘপুঞ্জ ছাড়িয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার সিঁদুরে রেখা ঝিলিক মারছে উত্তরের দিগন্তে। ফুলমণি গরু ডেকে উঠল হাম্বা-আ-আ করে। বিদায়ের নীরব সুর বাজছে সমস্ত বিধুর প্রকৃতিতে। শহরের হাটে দুধ-বিক্রী করে, কমলা রঙা হালকা-রোদের চাদর গায়ে জড়িয়ে আসন্ন সন্ধ্যার ভয়ে ভীত, দুটি মুসলমান ছেলে জীবনদায়ী দুধ-ফুরোনো কালো মাটির হাঁড়ি বাজিয়ে দিনান্তবেলার গান গাইতে গাইতে দ্রুত, ত্রস্ত পায়ে চলে যাচ্ছে বাঁশবন আর বেতঝাড়ের মধ্যে দিয়ে যেদিকে শংকামারীর শ্মশান। সিঁদুর-লাল আঁকাবাঁকা পথে।

www.BanglaBook.org

স্বামী হওয়া

মহুয়া মিলন থেকে আসা ট্রেনটা টৌরী স্টেশনে ঢুকছিলো।

স্মিতা এবং আমি নীচু প্ল্যাটফর্মের উপরে দাঁড়িয়েছিলাম। আজ হাটবার। খুব ভিড় প্ল্যাটফর্মে। নানা জায়গা থেকে হাট করতে এসেছিলো ওরাঁও-মুণ্ডা, ভোগতা-কোলহোরা।

সুমন স্যুটকেশটা হাতে করে নামলো। নেমেই দৌড়ে এলো আমাদের দিকে।

এসে, স্মিতাকে বললো, কেমন আছো বউদি?

স্মিতা বললো, কেমন করে ভালো থাকি বলো? তুমি এত্তদিন কাছে ছিলে না।

সুমন হাসলো। আমিও হাসলাম।

এর পর সুমন আমাকে বললো, রোলস রয়েসটা এনেছো তো?

এনেছি।

তবে, চলো।

স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে আমার লজঝড়ে অস্টিন গাড়িটার পিছনের দরজা খুলে সুমন উঠে বসলো। পাশে স্মিতা। আমি ড্রাইভিং সীটে আসীন হলাম।

বসন্তের দিন। হু-হু করে হাওয়া আসছিলো। পড়ন্ত রোদ্দুর সেগুন গাছের বড় বড় হাতির কানের মতো পাতার পেছনে পড়াতে, সিঁদুরে-রঙা দেখাচ্ছিলো পাতাগুলোকে। মহুয়ার গন্ধ ভাসছিলো। ঠোঁট-মুখ চড় চড় করছিলো রুখু বাতাসে।

স্মিতা বললো, তারপর? মা-বাবা বিয়ের কথা কী বললেন?

সুমন বললো, ধ্যুত। সে মা-বাবাই জানেন।

আহা! লজ্জায় যেন মরে গেলে তুমি।

ওকে গালে টুশকি মেরে বললো, স্মিতা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি লাতেহারের দিকে মোড় নিলাম। কিন্তু লাতেহারে যাবো না।

চাঁন্দোয়ারই এক প্রান্তে আমার কোয়ার্টার। সুমনেরও। পাশাপাশি। সরকারি চাকরিতে এই রকম জঙ্গুলে জায়গায় যেমন কোয়ার্টার হতে পারে, তেমনই।

কোয়ার্টারে পৌঁছে গাড়িটা খাপরার চালের একচালা গ্যারেজে ঢুকিয়ে দিলাম।

স্মিতা সুমনকে বললো, তোমার বাহন ছোটুয়াকে বলে দিয়েছি কাল ভোরে চলে আসতে। আজ সকালেও একবার এসে ঘর-দোর ধুয়ে-মুছে গেছে। চানুকে টুল পেতে সামনে বসিয়ে রেখেছিলাম সব সময়। পাছে কিছু খোয়া যায় তোমার।

সুমন উত্তেজিত হয়ে বললো, চানু কোথায়? চানু?

ততক্ষণে সুমনের গলা পেয়ে চানু টাল-মাটাল পায়ে দৌড়ে এলো বুধাই-এর মায়ের হেপাজত থেকে সাড়া পেয়ে। বললো, সুমন কাকু, তোমার সঙ্গে আড়ি।

সুমন স্যুটকেশটা নামিয়ে রেখেই চানুকে এক ঝটকায় কোলে তুলে নিয়ে বললো, তা হলে আমি মরেই যাব। তোমার সঙ্গে আড়ি করে কী আমি বাঁচতে পারি? তোমার মা-বাবা পারলেও বা পারতে পারে। আমি কখনও পারবো না।

চানু অত বোঝে না। চার বছর বয়স তার মোটে। সে বললো, আড়ি, আড়ি, আড়ি।

স্মিতা, সুমন এবং আমিও হেসে উঠলাম।

স্মিতা বললো সুমনকে, জামা কাপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে নাও। দুপুরে খেয়েছিলে কোথায়?

দুপুরে আবার কোথায় খাবো? যা হতচ্ছাড়া লাইন। এ সব জঙ্গলের জায়গা তোমাদের মতো কবি-কবি লোকের পক্ষেই ভালো লাগার। সাতসকালে বাড়কাকানাতে খাওয়ার খেয়েছিলাম। পথে ম্যাকলাস্কিগঞ্জে চা, কার্নি মেমসাহেবের দোকানের আলুর চপ। কালাপাত্তি জর্দা দেওয়া পান। গোটা আষ্টেক। সারা পথে।

স্মিতা বিরক্তির গলায় বললো, তাই-ই। ঠোঁট দুটোর অবস্থা দেখেছ কী হয়েছে! এখানের গরমে-ফাটা লাল মাটির মতো।

সুমন বললো, কথা না বলে, শিগগিরি খেতে দাও তো!

আমি আমার ঘরে গেলাম। আমার প্রিয় ইজিচেয়ারটাতে বসলাম। আমার সাম্রাজ্যে। আমার বই, বইয়ের আলমারি; পড়াগুড়া। ছুটির দিনে গেঞ্জি আর পাজামা পরে সারা দিন বই পড়েই কাটে আমার। আমি বড় কুঁড়ে লোক। স্মার্ট, এনার্জেটিক, সামাজিক বলতে যে সব গুণ বোঝানো হয় তার কোনো গুণই আমার নেই। আক্ষেপও নেই, না-থাকার জন্যে।

তবে চাঁদোয়া-টোরীতে সরকারি কাজে বদলি হয়ে এসে পড়ার পরই বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। স্মিতার জন্যে। আমি তো সারাদিন কাজকর্ম নিয়ে থাকব। অবসর সময় বই পড়ব। কিন্তু আমার চেয়ে দশ বছরের ছোট; সম্বন্ধ করে বিয়ে করা স্ত্রী স্মিতা? তার সময় কী করে কাটবে? ভাগ্যিস চানু হয়েছিল। এখানে যখন আসি তখন চানুর বয়স পনেরো মাস। তবুও একটা নরম খেলনা ছিল স্মিতার। যে খেলনাকে খাইয়ে-দাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে, চোখ রাঙিয়ে ওর সময় কেটে যেত।

সময় তবুও কাটতো কী না জানি না, যদি সুমন এখানে বদলি হয়ে না আসত। বয়সে সুমন আর স্মিতা সমানই হবে। পাশের কোয়ার্টারে ও একা এসে উঠলো। প্রথম প্রথম হাত পুড়িয়ে খাওয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু অভ্যেস ছিলো না রান্না করার। অচিরে স্মিতার সঙ্গে ওর একটা সখ্যতা গড়ে উঠলো। যদিও বউদি বলে ডাকত সুমন স্মিতাকে কিন্তু ওরা যে

www.BanglaBook.org

কত বড় বন্ধু একে অন্যের তা আমার মতো কেউই জানত না। সুমনকে পেয়ে স্মিতার যতো ছেলেমানুষী শখ ছিল সব মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগলো। পলাশ গাছে উঠে ফুল পাড়ত স্মিতা কোমরে শাড়ি জড়িয়ে সুমনের সঙ্গে। কুরুর পথে আমঝরিয়ার বাংলোয় মুনলাইট পিকনিক করতো। লাতেহারের কাছে বহু বছর আগে পরিত্যক্ত কলিয়ারির আশেপাশে ঘুরে ঘুরে শীতের দুপুরে ছেলেমানুষী প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ চালাতো।

কখনও আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যেত ওরা পীড়াপীড়ি করে। আমি না-গেলে নিজেরাই যেত। আমিও নিশ্চিন্ত মনে কলকেতে ডালটানগঞ্জের সাপ্লায়ারের দেওয়া অম্বুরী তামাক সেজে গড়গড়ার নল হাতে একটা বই নিয়ে আরাম করে ইজিচেয়ারে বসতাম। ওদের সঙ্গে যেতে যে হলো না, এ কথা ভেবে আশ্বস্ত হতাম।

খাওয়ার টেবিলে ডাক দিলো স্মিতা। আমিও এসে বসলাম। শিঙাড়া বানিয়েছে ও। ক্ষীরের পুলি। লাতেহারের পণ্ডিতজির দোকান থেকে শেওই আর কালাজামুন আনিয়েছে।

গবগব করে খেতে খেতে সুমন বললো, আরো দাও, আরো দাও বউদি। তুমি এমন কিপটে হয়ে গেলে কী করে এক মাসের মধ্যে?

স্মিতা কপট রাগের সঙ্গে বললো, কিপটে আমি? মালখাঁনগরের বোসের ঘরের মেয়ে। ঐসব পাবে না আমার কাছে।

সুমন আমাকে বললো, দেখছো রবিদা। ঐ শুরু হলো। সর্বক্ষণ এমন এনিমি-ক্যাম্পে থেকে থেকে আমার হাওড়া জেলার ওরিজিনালিটিটাই মাঠে মারা গেলো। বাড়ি গিয়ে ভাত খেতে বসে পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা ছাড়া খেতে পারি না দেখে মা আর দিদির তো চক্ষুস্থির। তোমাদের গল্প করতাম সব সময়। দিদিমা বললেন, সুমন তোকে শেযে ঐ রেফিউজিগুলোর আদিখ্যেতায় পেলো। ছিঃ ছিঃ।

কি বললে?

স্মিতা এবার সত্যিই বোধ হয় রেগে উঠলো।

সুমন বললো, আহা রাগছ কেন, কী বললাম তাই-ই শোন। আমি বললাম, বাঙালদের মন খুব ভালো হয় দিদিমা। খোলামেলা জায়গায় থাকতো তো, আকাশ-জোড়া মাঠ, আদিগন্ত নদী, কতো মাছ, কতো ঘি, কতো কী...।

দিদিমা বললেন, থাক, থাক। সব রেফিউজিই জমিদার ছেল। ওসব গল্প আমাকে আর শোনাসনি। বহু শুনেছি।

বলেই, সুমন হাসতে লাগলো।

ও ছেলেমানুষ। ওর মনে কোনে জটিলতা নেই। কিন্তু ও একথাটা না বললেই ভালো করতো। সকলেরই জমিদারি বা সচ্ছল অবস্থা না-থাকলেও যাদের ছিলো, এ রকম কথা শুনলে তাদের বড়ই লাগে।

এখন বোধ হয় লাগে না আর। প্রথম প্রথম লাগতো। এখন ব্যথার স্থান অবশ হয়ে গেছে। ক্ষত হয়েছে পুরোনো।

আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম।...

...বরিশালে আমাদের দোতলা বাড়ির চওড়া বারান্দায় পূর্ণিমার রাতে বসে আছি ইজিচেয়ারে। থামের ছায়াগুলো পড়েছে বারান্দাতে কালো হয়ে। দীঘির পাড়ের সার সার নারকোলগাছের পাতায় চাঁদের আলো চকচক করছে। সেরেস্তার দরজা জানালা বন্ধ। কুন্দনলালজী তাঁর ঘরের সামনে চৌপায়ার বসে দিলরুবাতে বাহারে সুর তুলছেন। গ্রামের

www.BanglaBook.org

লক্ষ্মীরা সন্ধ্যারতি শেষ করে শাঁখ বাজাচ্ছে। বাতাসে নারকোল পাতার নড়াচড়ার শব্দ। আরো কত কী গাছ! জামরুল গাছ, আমবাগান, লিচু গাছ, জলপাই গাছ, নিচে হাসনুহানা কাঠটগরের ঝোপ। পাশে পাশে হরেক রকমের চাঁপা। আমার দোতলা ঘরের জানালা অবধি উঠে এসেছে একটা কনকচাঁপার গাছ। গাড়ি ঢোকার পথের পাশে ছিলো ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরার সারি।

আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেছিলাম।

স্মিতা বললো, কী হলো? তোমার চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো!

সুমন বললো, রবিদাদা রাগ করলে নাকি?

আমি হাসলাম। বললাম, না রে পাগল।

স্মিতা সুমনকে বললো, আর দুটো শিঙাড়া খাবে?

সুমন বললো, দাও। কত্তোদিন পর তোমার হাতের খাবার খাচ্ছি।

তারপর বললো, আসলে, কলকাতায় গিয়ে তোমাদের গল্প, বিশেষ করে বউদির গল্প সকলের কাছে এতই করেছি, যে তোমাদের সকলেই হিংসে করতে আরম্ভ করেছে। বউদিকে তো বেশি করে!

স্মিতা চায়ের কাপটা মুখের কাছে ধরে ছিলো। দেখলাম, কাপের উপর ওর দুটি টানাটানা কালো চোখ সুমনের ঐ কথার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠেই নিথর হয়ে গেলো।

চা খাওয়ার পর আমি আমার ঘরে ফিরে গেলাম।

সুমন চানুকে কাঁধে করে স্মিতার সঙ্গে ওর কোয়ার্টারে গেলো। স্মিতা সব গুছিয়ে গাছিয়ে দিয়ে আসবে। অগোছালো, একা-লোকের সংসার।

যাওয়ার সময় স্মিতা বলে গেল, বুধাই-এর মাকে যে একটু পরে এসে যেন চানুকে নিয়ে যায়। খাওয়ার সময় হয়ে যাবে চানুর।

ওরা দুজনে যখন ফিরলো সুমনের কোয়ার্টার থেকে তখন রাত গভীর। আমি এডওয়ার্ড জোস্টিং-এর লেখা হাওয়াই-এর ইতিহাস পড়ছিলাম। ইতিহাস পড়তে পড়তে হাজার বছরের ব্যবধান এত সামান্য মনে হয় যে ঘণ্টার খবর রাখতে তখন আর ইচ্ছে করে না।

দুপুরেই রান্না সেরে রেখেছিলো স্মিতা। বুধাই-এর মা গরম করে দিলো খাওয়ার দাওয়ার।

স্মিতা খাবার সাজিয়ে ও এগিয়ে দিতে দিতে বললো, দ্যাখো! সুমন কত কী এনেছে আমাদের জন্যে। এইটা আমার শাড়ি। বলেই, চেয়ারের উপর থেকে শাড়িটা তুলে দু হাতে মেলে ধরে দেখালো। তারপর বললো, এরকম একটাও শাড়ি তুমি আমাকে দাওনি।

আমি বললাম, এ তো দারুণ দামী শাড়ি।

সুমন বললো, বউদি কি আমার কম দামী?

স্মিতা আবার আমাকে বললো, এই যে! তোমার পাঞ্জাবি ও পায়জামা। এই চানুর জামা-প্যান্ট।

আমি রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললাম করেছো কি সুমন, এই রকম নকশা-কাটা চিকনের পাঞ্জাবি কি আমাকে মানায়? এ তো ছেলেমানুষদের জন্যে।

সুমন বলল, আপনি তো প্রায় তিন বছর কলকাতায় যান না। এখন তো এই-ই ক্রেজ। ঘাটের মড়ারা পর্যন্ত পরছে আর আপনি তো কিশলয় এখনও।

স্মিতা নরম গলায় বললো, এই যে শুনছ; দ্যাখো।

www.BanglaBook.org

আমি বললাম, কি?

অ্যাই দ্যাখো, আমার জন্যে আরো কী এনেছে?

বলেই, ছোট দুটো প্যাকেট খুলে আমার দিকে এগিয়ে দিলো। দেখি, একজোড়া বেদানার দানার মতো রুবির দুল আর একটা ইন্টিমেট পারফ্যুম। ছোট্ট।

আমি সুমনকে বকলাম। বললাম, তুমি একটা স্পেন্ডথ্রিপ্ট হয়ে গেছো। দিস ইজ ভেরি ব্যাড। সারা জীবন পড়ে আছে সামনে। বিয়ে করবে দুদিন পর। এমন বেহিসাবীর মতো খরচ করে কেউ?

স্মিতা বললো, দ্যাখো না, বেশি বেশি বড়লোক হয়েছেন!

সুমন বললো, বড়লোকদের জন্যে বড়লোকি না করলে কী চলে?

খেতে খেতে আমি ভাবছিলাম, সুমন বেশ সুন্দর সপ্রতিভ কথা বলে, যা আমি কখনোই পারিনি। পারবো না। স্মিতার যে ওকে এত ভালো লাগে তার কারণ অনেক। চিঠিও নিশ্চয়ই ভালোই লেখে। আমার তো এক লাইন লিখতেই গায়ে জ্বর আসে। আমাকে অবশ্য কখনও লেখেনি ও অফিসিয়াল ব্যাপারের চিঠি ছাড়া। তবে স্মিতাকে প্রায় তিন-চারটে করে চিঠি লিখত প্রতি সপ্তাহে। যতদিন ছিলো না এখানে। এখানে ডাক পিওন চিঠি বিলি করে না। আমার অফিসের পিওন ছেদীলাল মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে ডাক নিয়ে আসে রোজ। ভারি ভারি চিঠি আসত পুরু খামে। সুমনের সুন্দর হাতের লেখায় স্মিতার নাম লেখা থাকত। কোনোদিন ছেদীলালা পোস্ট অফিস যেতে দেরি করলে বুধাই-এর মাকে পাঠাতো স্মিতা আমাকে মনে করিয়ে দিতে, চিঠি আনার জন্যে।

যে ক'দিন সুমন ছিলো না, লক্ষ্য করলাম স্মিতা কেমন মনমরা হয়ে থাকত। বেলা পড়ে এলে, গা-টা ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে, শালজঙ্গল ও পাহাড়ের দিকে চেয়ে, স্মিতা বাইরের সিঁড়ির উপর বসে থাকত। শেষ বিকেলের আলোর মতো নরম হয়ে আসত ওর মুখের ভাব সুমনের চিঠি পড়তে পড়তে। ঘর থেকে আমি ডাকতাম ওকে, ও শুনতে পেতো না। কোথায়, যেন কত দূরে চলে যেত ও মনে মনে।

॥ ২ ॥

সুমন শিগগিরি কলকাতা যাবে। ওর বিয়ে ঠিক করেছেন মা-বাবা। সকালে রাঁচি গেছে ও নতুন স্কুটার ডেলিভারী নিতে।

অফিস থেকে ফিরছিলাম হেঁটেই। আমাদের অফিসটা কোয়ার্টারের কাছেই। দু ফার্লং মতো। অফিস যাতায়াতের জন্যে গাড়ি কখনোই নিই না এক বর্ষাবাদলের দিন ছাড়া। আকাশে তখনও আলো আছে। জঙ্গল থেকে শালফুলের গন্ধ ভেসে আসছে হাওয়ায়। তার সঙ্গে মহুয়া এবং করৌঞ্জের গন্ধ। পথের পাশে, জঙ্গলের শাড়ির পাড়ে ফুলদাওয়াই-এর লাল ঝাড়ে মিনি-লঙ্কার মতো লাল ফুল এসেছে। মাঝে মাঝে কিশোরীর নরম স্বপ্নের মতো ফিকে ফিকে বেগুনী জীরহুলের ঝোপ।

লাতেহারের দিক থেকে একটা ট্রাক জোরে চলে গেল চাঁদোয়ার দিকে। লাল ধুলো উড়ল, মেঘ হল ধুলোর; তারপর আলতো হয়ে ভাসতে ভাসতে পথের দু-পাশের পাতায় গাছে ফিসফিস করে চেপে বসলো।

মিশিরজি আসছিলেন সাইকেল নিয়ে বস্তির দিক থেকে। দেহাতী খদ্দরের নীল পাঞ্জাবি আর ধুতি পরে। হাওয়াতে তাঁর টিকি উড়ছিলো। দূর থেকেই আমাকে দেখে বললেন,

www.BanglaBook.org

পররনাম বাবু।

আমি বললাম, প্রণাম।

হিন্দীটা আমি তখনও যথেষ্ট রপ্ত করতে পারিনি। সেদিকে সুমন পটু। পানের দোকানের সামনে সাইকেল ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে জর্দা-পান খেতে খেতে ওর সময়বয়সী স্থানীয় ছেলেদের সঙ্গে এমন ঠোঁট মিলিয়ে হিন্দীতে গল্প করে অথবা হিন্দী সিনেমার গান গায় যে, কে বলবে ও স্থানীয় লোক নয়! সব মানুষকে আপন করে নেওয়ার একটা আশ্চর্য সহজাত ক্ষমতা আছে সুমনের। ওর মধ্যে অনেক কিছু ভালো জিনিসই আছে যা আমার মধ্যে নেই।

মিশিরজি, সাইকেলের টায়ারে কিরকির শব্দ করে নামলেন।

বললেন, হালচাল সব ঠিক্কে বা?

আমি বললাম, ঠিক্কেই হ্যায়।

সুমনবাবু কি কোলকাত্তাসে শাদী করিয়ে আস্‌লেন এবার?

আমি অবাক হয়ে বললাম, না তো!

মিশিরজী অবাক হয়ে বললেন, আভভি যাত্তে দেখা উনকা স্কুটারমে। পিছুমে কই খাবসুরত আওরত থী। বড়ী প্যায়ার সে সুম্মনবাবুকা পাক্কড়কে বেঠী হুয়ী থী।

আমি অবাক হলাম। বললাম, নেহী তো। বিয়ে তো করেনি।

তাজ্জুব কি বাত। তব সুমনবাবুকা সাথমে উও ক'ওন থী?

আমার মুখ ফসকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, মেরা বিবি ভি হোনে শকতি। দুজনের মধ্যে খুব দোস্তী।

মিশিরজী বললেন, অজীব আদমী হ্যায় আপ বড়াবাবু। দোস্তী উর পেয়ার কখনও এক হয়? আর মরদ ঔর আওরতের মধ্যে কি দোস্তী হয় বড়াবাবু? খালি পেয়ারই হোবে।

তারপরই হো হো করে হেসে বললেন, আপ বড়ী হিউমারাস আদমী হেঁ। নেহী তো, নিজের ধরম-পত্নী কি বারেমে অ্যায়সী মজাক কেউ করতে পারে কভভী?

আমার মুখ থেকে প্রায় বেরিয়ে এসেছিল যে, মজাক করিনি আমি।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে গেলো, স্মিতা সব সময় আমাকে বলে, তুমি খুব বোকা। কোথায় কী বলতে হয় জানো না।

সত্যিই বড় বোকা আমি।

বাড়ি ফিরেই জানতে পেলাম যে, সত্যিই আমি মজাকী করিনি। রাঁচি থেকে নতুন স্কুটার ডেলিভারী নিয়ে এসেই সুমন তার বউদিকে পিছনে চড়িয়ে টোড়ী থেকে বাঘড়া মোড়ে যে পথটা চলে গেছে তার মাঝামাঝি জায়গায় গভীর জঙ্গলের মাঝে "বড়হা-দেও" এর থানে পুজো চড়াতে গেছে।

চানুটা কান্নাকাটি করছিলো। আমাকে বললো, বল খেলতে। আমি এসব পারি না। তবুও, চা টা খেয়ে বুধাই-এর মাকে বাড়ির কাজ করতে বলে আদর্শ বাবার মতো চানুর সঙ্গে ওর লাল রবারের বল নিয়ে কোয়ার্টারের পিছনের মাঠে বল খেলতে লাগলাম।

আমার মন পড়েছিল হাওয়াই-এর রাজা কামেহামেহার রাজত্বে। অন্যমনস্ক থাকায় অচিরে বলটা লাফাতে লাফাতে কুঁয়োর গিয়ে পড়লো। বালতি নামিয়ে অনেক চেষ্টা করেও উঠোতে পারলাম না বলটাকে। চানু কাঁদতে কাঁদতে বললো, সুমনকাকা তুলে দিয়েছিলো, তুমি পারলে না। তুমি কিচ্ছু পারো না, বাবা।

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বললাম, সুমনকাকা এসেই তুলে দেবে।

www.BanglaBook.org

তারপর চানুকে আবার বুধাই-এর মার জিম্মাতে দিয়ে আমি আমার ইজিচেয়ারে শায়িত হয়ে রাজা কামেহামেহার কাছে ফিরে গেলাম।

ওদের ফিরতে বেশ রাত হলো। স্মিতার শাড়ি এলোমেলো, ধুলোলাগা বিস্রস্ত চুল। খোঁপায় দলিত জংলী ফুল আর মুখে কী এক গভীর আনন্দের ছাপ।

সুমন বললো, স্কুটারটা খারাপ হয়ে গেছিল বাঘের জঙ্গলে। কী ভয় যে করছিলো, কী বলব। বাঘের জন্যে নয়, পরস্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এত রাত হলো বলে।

আমি বললাম, ফাজিল।

চানু বললো, এক্ষুনি আমার বল তুলে দাও সুমনকাকু। বাবাটা কিচ্ছু পারে না। বল পড়ে গেছে কুঁয়োর মধ্যে।

সুমন ঐ অন্ধকারেই টর্চ হাতে করে কুঁয়ো পাড়ে গিয়ে চানুর বল তুলে নিয়ে এলো। তারপর রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে চলে গেলো।

সে রাতে স্মিতাকে আদর করতে যেতেই ও বললো, আজ থাক লক্ষ্মীটি। আজ ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

ওর সুন্দর, ছিপছিপে, এলানো শরীর, গভীর নিঃশ্বাস, ওর বুকের ভাঁজে সুমনের দেওয়া ইন্টিমেট পারফ্যুমের গন্ধ সব মিলেমিশে ওকে বিয়ের রাতের স্মিতার মতো মনে হচ্ছিলো।

আমি আর কিছু বলার আগেই স্মিতা ঘুমিয়ে পড়লো। চাঁদের আলোর একফালি জানালা দিয়ে বিছানায় এসে পড়েছিলো। স্মিতার মুখে বড় প্রশান্তি দেখলাম। খুব, খুব, খুউব আদর খাওয়ার পর, আদরে পরম পরিতৃপ্ত হবার পর মেয়েদের মুখে যেমন দেখা যায়।

আমার ঘুম আসছিলো না। মিশিরজীর দাঁতগুলো ফাঁক ফাঁক। পান খেয়ে খেয়ে কালো হয়ে গেছে সেগুলো। গায়ে দেহাতী ঘামের পুরুষালী গন্ধ। হঠাৎ মিশিরজির উপর খুব রাগ হলো আমার। তাই ইজিচেয়ারে শুয়ে টেবিল-লাইট জ্বালিয়ে রাতের অন্ধকারে প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে হাওয়াই-এর রাজা কামেহামেহা ও রানী কাহমানুর কাছে ফিরে গেলাম। খুব প্রশান্তি।

ইতিহাসের মতন আনন্দের, শান্তির আর কিছুই নেই।

পরদিন চা খেতে খেতে স্মিতা বললো, সুমনের বিয়ের কথা লিখে আবার চিঠি দিয়েছেন ওর বাবা। কাল-পরশু ওর এক কাকা আসবেন রাঁচি হয়ে, ওর কাছে ঐ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করতে। আমি কিন্তু খেতে বলে দিয়েছি তাঁকে। যেদিন আসবেন, সেদিন রাতে।

আমি বললাম, বেশ করেছো। না বললেই অন্যায় করতে।

॥ ৩ ॥

সুমনের কাকার চেহারাটা আমার একটুও ভালো লাগলো না। ভদ্রলোক ট্রেন থেকে নেমেই সকালের বাসে এসে নাকি এখানের নানা লোকের সঙ্গে দেখা করেছেন। সুমনের কাছে যখন অফিসে এসে পৌঁছন, তখন বিকেল চারটে। রাতে যখন খেতে এলেন আমাদের বাড়ি, তখনই তাঁকে দেখলাম। অশিক্ষিত বড়লোকদের চোখেমুখে যেমন একটা উদ্ধত নোংরা ভাব থাকে, এই ভদ্রলোকের মুখেও তেমন। বালিতে থাকেন। লোহা-লক্কড়ের ব্যবসা করেন। কালোয়ার ভদ্রলোক কেবল স্মিতাকে লক্ষ্য করছিলেন। বেশ অভব্যভাবে।

আমার মনে হলো, উনি আসলে সুমনের বিয়ের কারণে আসেননি। এসেছেন স্মিতাকে

www.BanglaBook.org

দেখতে।

খেতে খেতে অসম্মান ও অপমানে আমার কান লাল হয়ে উঠলো।

সেই রাতেই আমি প্রথম স্মিতাকে কথাটা বললাম। না বলে, পারলাম না। মিশিরজীর কথা বললাম। সুমনের কাকার কথা বললাম। বললাম, ছোট জায়গা, অশিক্ষিত অনুদার সব লোকের বাস। বাড়ির বাইরে একটু বুঝে শুনে চলাফেরা করতে।

স্মিতা চুপ করে আমার কথা শুনলো। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু কিছুই বললো না।

আমি বললাম, তোমার ব্যবহারে সুমনকে যদি তোমার স্বামী বা প্রেমিক বলে ভুল করে বাইরের লোকে তাহলে আমার পক্ষে তা কী খুব সম্মানের হয়?

স্মিতা রেগে উঠল। বলল, আচ্ছা! তুমি কী? স্কুটারে বসলে যে চালায় তাকে না জড়িয়ে ধরে কেউ বসতে পারে?

তারপর বললেন, মিশিরজি বা কে কী বললো, তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। তুমি কী বলো সেইটেই বড় কথা।

আমি বললাম, আমি কি কখনও কিছু বলেছি? কিন্তু নিজের সম্মানের কারণে না বলেও তো উপায় দেখছি না এখন। তোমাকে যদি লোকে খারাপ বলে, তা কি আমার ভালো লাগবে?

স্মিতা বললো, নিজের মনের কথাও যে ঐ, তাতো বললেই পারো। অনেকদিন আগে বললেই পারতে। নিজের কথা অন্যের মুখের বলে চালাচ্ছো কেন?

আমি স্মিতার কথায় ব্যথিত হলাম। কিছু না বলে, ইজিচেয়ারে, আমার নিরুপদ্রব রাজত্বে ফিরে গেলাম।

তার ক'দিন পরেই সুমনের খুব জ্বর হলো। আমি বলেছিলাম ও আমাদের বাড়িতেই এসে থাকুক। ছেলেমানুষ, বিদেশে বেহুঁশ অবস্থায় একা বাড়িতে থাকবে কি করে? তা ছাড়া, ক'দিন পরেই ওর বিয়ে। কী অসুখ থেকে কোন অসুখে গড়ায় তা কে বলতে পারে?

স্মিতা জেদ ধরে বলেছিলো, না। আমাদের বাড়িতে ও মোটেই থাকবে না।

বলেছিলাম, তাহলে ওর সেবা-শুশ্রূষা করো। রাতে না-হয় আমিই গিয়ে থাকবো। তুমিও থাকতে পারো ইচ্ছে করলে।

স্মিতা বললো, থাক, এত ঔদার্য নাই-ই বা দেখলে। তোমার মিশিরজীরা কী তাহলে চুপ করে থাকবে?

সারাদিন স্মিতাই দেখাশোনা করলো। রাতে আমিই গেলাম সুমনের বাড়ি। ওর শোবার ঘরে ক্যাম্পখাট পেতে, থার্মোমিটার, ওষুধ, ওডিকোলন সব ঠিকঠাক করে দিয়ে গেল স্মিতা।

নতুন জায়গায় ঘুম আসছিলো না আমার। অনেকক্ষণ জেগে বসে বসে সিগারেট খেলাম। তারপর পাশের ঘরে গেলাম। সুমন তখন ঘুমোচ্ছিল। পাশের ঘরে টেবিলে একটা চিঠি পড়েছিলো। ইনল্যান্ড লেটারে লেখা। সুমনের নামের। সুমনের মার লেখা চিঠি।

কেন জানি না, ঐ নিস্তব্ধ রাতে, ঝিঁঝির ডাকের মধ্যে আমার মন বললো, এই চিঠির ভিতরে এমন কিছু আছে যা স্মিতা ও সুমনের সম্পর্ক নিয়ে লেখা। টেবিল-লাইটের সামনে চিঠির ভিতরে আঙুল দিয়ে চিঠিটা গোল করে ধরে পড়তে লাগলাম চিঠিটা। যতটুকু পড়তে পারলাম তাই-ই যথেষ্ট ছিল।

www.BanglaBook.org

সুমনের মা লিখেছেন, সুমনের কাকার চিঠিতে জানতে পেরেছেন তিনি যে, সুমন একটি ডাইনির পাল্লায় পড়েছে। এক ভেড়ুয়ার বউ সে। সুমন জানে না যে, সুমনের কত বড় সর্বনাশ সেই মেয়ে করছে ও করতে চলেছে। সুমন ছেলেমানুষ। মেয়েদের পক্ষে কী করা সম্ভব আর কী অসম্ভব সে সম্বন্ধে ওর কোনো ধারণাই নেই। সুমনের ভাবী শ্বশুরবাড়ির লোকেদের কোনো আত্মীয়ের কাঠের ব্যবসা আছে লাতেহারে। তাঁরাও খোঁজ নিয়ে জেনেছেন যে, সুমনের কাকা যা জানিয়েছেন, তা সত্যি। পাত্রীপক্ষ বেঁকে বসেছে যে, ঐ বজ্জাত স্ত্রীলোকের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ না-করলে এবং বিয়ের পরেই ওখান থেকে ট্রান্সফার নিয়ে চলে আসার চেষ্টা না-করলে এ বিয়ে হবে না। এত সুন্দরী ও বড়লোকের মেয়েও আর পাওয়া যাবে না। তাদের দেয় পণের টাকাতেই সুমনের বোন মিনুর বিয়ে হয়ে যাবে। যদি সুমনের তার বাবা, মা, বোন তাদের পারিবারিক ঐতিহ্য এবং তার নিজের সম্বন্ধেও কোনো মমত্ব থাকে তাহলে ঐ রেফিউজি ডাইনির সঙ্গে সব সম্পর্ক এক্ষুনি ত্যাগ করতে হবে। সুমনের ট্রান্সফারের জন্যে অথবা সেই ডাইনির ভেড়া স্বামীর ট্রান্সফারের জন্যে পাটনাতে তাঁরা মুরুব্বি লাগিয়েছেন। সুমনের সমস্ত ভবিষ্যৎ ও তার কচি মাথা ঐ ডাইনি কাঁচা চিবিয়ে খাচ্ছে। অমন ছেনাল মেয়েছেলের কথা ওঁরা জন্মে শোনেননি।

বড় ভুল হয়ে গেছিলো আমার। হাওয়াই-এর ইতিহাসটা বাড়িতে রেখে এসেছিলাম। আমার ঘুম হবে না। কামেহামেহার সঙ্গে থাকলেই ভালো করতাম।

পরে মনে হলো, এ চিঠিটা স্মিতাকে দেখানো উচিত। আমার মতো স্বামী বলে কী আমার চোখের সামনে যা নয় তাই করে বেড়াবে। ওদের মধ্যে সম্পর্ক কতদূর গড়িয়েছে তা কে জানে? এই সম্পর্কে সুমনের উৎসাহই বেশি ছিলো, না স্মিতার নিজের, তা ভগবানই জানেন। এ সংসারে ভালোমানুষীর শাস্তি এইভাবেই পেতে হয়। ভালোমানুষ মানেই বোকা মানুষ। যে নিজের জরু-গরু শক্ত হাতে পাহারা দিয়ে রাখতে না-পারে, তার মান-সম্মান এমনি করেই ধুলোয় লুটোয়। বড় বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন এই পৃথিবী, এই মেয়েছেলের জাত। এরা কার ছেলে কখন কোলে করে বড় করে, তা আমার মতো ভেড়া স্বামীর জানার কথা নয়।

দা ল্যাম্ব। ভেড়া। সত্যি সত্যিই আমি একটা ভেড়া!

॥ ৪ ॥

সুমনের জ্বর যেদিন ছাড়লো সেদিনও লিকুইডের উপর রাখলো স্মিতা ওকে। পরদিন সুমন যা যা খেতে ভালোবাসে সুজির খিচুড়ি, মুচমুচে বেগুনী, কড়কড়ে করে আলুভাজা, হট-কেসে ভরে খাওয়ার নিয়ে গিয়ে খাইয়ে এলো স্মিতা।

জ্বর ভালো হতেই সুমন একদিন বললো, রোজ রোজ আমাদের বাড়ি এসে খাওয়া-দাওয়া করতে ওর অসুবিধা হয়। এবার থেকে ছোটুয়াই রেঁধে-বেড়ে দেবে ওকে। তা ছাড়া, সাতদিন পরে তো ও চলেই যাচ্ছে। বললো, স্মিতার কষ্ট এবার শেষ হবে।

সুমনের বিয়েতে সুমন আমাদের কাউকেই কলকাতায় যেতে বললো না। আমাদের নামে, ওদের বাড়ি থেকে কোনো কার্ডও এলো না। সুমনই একটা কার্ডে কালো কালি দিয়ে আমাদের নাম লিখে পাঠিয়ে দিলো ছোটুয়ার হাতে।

স্মিতা আমাকে বললো, বিয়ে করতে যাচ্ছেন, ভারী লজ্জা হয়েছে বাবুর। বিয়ে যেন আর কেউ করে না। নিজে হাতে কার্ড দিতে লজ্জা!

www.BanglaBook.org

সুমন যেদিন যায়, রাঁচি হয়ে গেল ও। আমরা বাস স্ট্যান্ডে ওকে তুলে দিয়ে এলাম। চানু বললো, কাকীমাকে নিয়ে এসো কিন্তু সুমনকাকু। আমরা খুব বল খেলব।

স্মিতা হেসে বললো, তোমার ঘর ফুল দিয়ে সাজিয়ে রাখবো, স্টেশনে তোমাদের আনতে যাব আমরা। সেদিন তোমার বাড়িতে রান্নাবান্নার পাট রেখো না। আমাদের বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া করবে, থাকবে সারা দিন।

সুমন জবাব দিলো না কোনো।

শুধু বললো, চলি।

বাসটা ছেড়ে দিলো।

সুমন চলে যাওয়ার পরই আমাদের বাড়িতে আশ্চর্য এক বিষাদ নেমে এলো। সুমন, এর আগেও অনেকবার ছুটিতে গেছে। কিন্তু এবারের যাওয়াটা অন্যরকম। যে সুমন বাসে উঠে চলে গেলো সেই সুমন আর ফিরবে না এই টৌড়িতে। আমি সে কথা জানতাম। স্মিতাও জানতো। যদিও ভিন্নভাবে।

এবারে গিয়ে অবধি একটাও চিঠি দিলো না সুমন স্মিতাকে। আমাকে না জানিয়ে ছেদীলালকে পোস্টাপিসে পাঠাতো স্মিতা চিঠির খোঁজে। স্মিতার মানসিক কষ্ট দেখে আমি এক পরম পরিতৃপ্তি পেতাম। যে, নিজে কাউকে আঘাত দিতে শেখেনি, দুঃখ দিতে জানেনি, তার অদেয় আঘাত ও দুঃখে যে অন্যজনকে অন্য কোণ থেকে এসে বাজছে, এই জানাটা জেনে ভারী ভালো লাগছিল আমার।

মনে মনে বললাম, শাস্তি সকলকেই পেতে হয়। তোমাকেও পেতে হবে স্মিতা।

স্মিতা আমার সঙ্গে কোনোদিনও সুমনের এই হঠাৎ পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করেনি। সুমনের সঙ্গেও করেছিল বলে জানি না। করলেও তা আমার জানার কথা নয়। ওদের সম্পর্কটা গভীর ছিলো বলেই, সুমনের হঠাৎ পরিবর্তনের আঘাতটা স্বাভাবিক কারণেই বড় গভীরভাবে বেজেছিল ওর বুকে।

এ কথা বুঝতাম।

স্মিতা মুখ বুজে সংসারের সব কর্তব্যই করতো। আমাকে খেতে দিত। জামা-কাপড় এগিয়ে দিতো। লেখাপড়ার টেবিল গুছিয়ে রাখতো। শোওয়ার সময় মশারি গুঁজে দিতো। তারপর নিজে বারান্দায় গিয়ে বসে থাকতো।

মাঝরাতে উঠে বাথরুমে যেতে গিয়েও দেখতাম স্মিতা বারান্দায় বসে আছে অন্ধকারে।

বলতাম, শোবে না?

পরে। অস্ফুটে বলত ও।

শুধোতাম, মশা কামড়াচ্ছে না?

ও বলতো, নাঃ।

আমি মনে মনে বলতাম, পোড়ো, নিজের কৃতকর্মের আগুনে পুড়ে মরো নিজে।

ব্যাটারীতে-চলা একটা রেকর্ড প্লেয়ার ছিলো আমাদের বাড়িতে। বিয়ের সময় কে যেন দিয়েছিলো। তাতে ঐ সময় একটা গান প্রায়ই চাপাত স্মিতা। রবিঠাকুরের গান "মোরা ভোরের বেলায় ফুল তুলেছি দুলেছি দোলায়, বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি বকুলের তলায়..." ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রথম লাইন পুরনো সেই দিনের কথা...

রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে আমার কোনো আসক্তি নেই। খুব বেশি শুনিও নি। কিন্তু ঐ গানটার মধ্যে একটা চাপা দুঃখ ছিলো। সেটা আমার অসহ্য লাগতো।

একদিন স্মিতা সন্ধ্যাবেলায় পাণ্ডে সাহেবের বাড়িতে গিয়েছিলো চানুকে নিয়ে তাঁর

www.BanglaBook.org

মেয়ের জন্মদিনে। সেই সময় তাক থেকে বই নামাতে গিয়ে আমার হাতের ধাক্কা লেগে রেকর্ডটা মেঝেয় পড়ে ভেঙে গেলো।

আমি কি অবচেতন মনে রেকর্ডটাকে ভাঙতেই চেয়েছিলাম? জানি না।

বুধাই-এর মা শব্দ শুনে দৌড়ে এলো। আমি বললাম, বই নামাতে গিয়ে পড়ে গেলো। এগুলো তুলে রাখো। বউদি এলে দেখে যে কী করবে, বউদিই জানে।

স্মিতা ফিরে এসে শুনল। ও ভাঙা টুকরোগুলোকে ফেলে না-দিয়ে যত্ন করে তুলে রাখলো। আমাকে কিছুই বললো না। জবাবদিহিও চাইলো না।

"আরেকটি বার আয়রে সখা প্রাণের মাঝে আয়,
মোরা সুখের দুখের কথা কব প্রাণ জুড়াবে তায়"...।

খেতে দাও বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। কখনওই চেঁচাই না আমি। কিন্তু সে রাতে চেঁচালাম। কি জানি, কেন?

স্মিতা আমাকে খেতে দিলো। চানুকে খাওয়ালো।

আমি বললাম, খাবে না?

নিরুত্তাপ নৈর্ব্যক্তিক গলায় বললো, তোমরা খাও। এই-ই তো খেলাম। খিদে নেই। পরে খাবো।

আমি বুঝতে পারছিলাম স্মিতা আমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে।

বুধাই-এর মা বলল, তুমি বিমার পড়বে, মাঈজী। কিছুই খাওয়া-দাওয়া করছো না তুমি!

স্মিতা ওকে ধমকে বললো, তুমি চুপ করো তো! অনেক খাই।

আমি আঁচাতে আঁচাতে ভাবছিলাম সুমন চলে যাবার পরে সত্যিই অনেক রোগা হয়ে গেছে স্মিতা। কিন্তু কী বলবো, কেমন করে বলবো, ভেবে পেলাম না।

শুধু বললাম, নিজের শরীরের অযত্ন করলে নিজেই ঠকবে।

স্মিতা আমার কথার কোনো জবাব দিলো না। আমার হাতে লবঙ্গ দিলো। রোজ যেমন দেয়। তারপর আমার সামনে থেকে নিঃশব্দে চলে গেলো।

॥ ৫ ॥

কাল সুমনরা আসবে।

স্মিতা আর আমি দুজনেই গাড়ি নিয়ে রাঁচী গিয়ে ফিরায়েলালের দোকান থেকে সুমন আর সুমনের স্ত্রী অলকার জন্যে আমাদের সাধ্যাতীত প্রেজেন্ট কিনে এনেছি। ফুলের অর্ডার দিয়ে এসেছি। কাল সকালের বাসে টাটকা মাছ, ফুল, রাবড়ি, সন্দেশ সব নিয়ে আসবে বলে বাসের ড্রাইভারকে টাকা এবং বকশিসও দিয়ে এসেছি।

স্মিতার ভাই নেই। আমারও নেই। বেশ ভাইয়ের বিয়ে, ভাইয়ের বিয়ে মনে হচ্ছে আমাদের।

ভোর পাঁচটা থেকে উঠে পড়েছে স্মিতা। এ'কদিনে, অনেক রোগা হয়ে গেছে ও সত্যিই। কিন্তু চেহারাটা যেন আরও সুন্দর হয়েছে। চোখ দুটি আরও বড় বড়, কালো, কাজল টানা। বিরহ, মানুষকে সুন্দর করে। চোখের সামনেই দেখছি।

অন্যান্য রান্না করতে না-করতেই মাছ এসে গেলো। দই-মাছ করেছে, কাতলা মাছের। খুব ভালোবাসে সুমন। মুড়িঘন্ট। মাছের টক। মুরগীর কারি। পোলাউ। সঙ্গে তো মিষ্টি ও রাবড়ি আছেই। রাতের জন্য আরও বিশেষ বিশেষ পদ। ফিশ-রোল।

www.BanglaBook.org

আমি অফিসে একবার বুড়ি-ছুঁয়েই চলে এসেছি। অফিসে সুমনের সব সহকর্মীরাও উৎসুক হয়ে কখন ওরা এসে পৌঁছায় তার প্রতীক্ষায় ছিলো। আমার এখানেই চলে আসতে বলেছি সকলকে সুমনের "বড়ে-ভাইয়া" হিসেবে। ওদের সকলের জন্যে মিষ্টি-টিষ্টিও এনে রেখেছি। বউ দেখে মিষ্টিমুখ করে যাবে বলে।

স্মিতা রান্না-বান্না এগিয়ে নিয়েই সুমনের কোয়ার্টারে গেল ফুলশয্যার ঘর সাজাতে। নিজের আলমারী খুলে নতুন ডাবল-বেডশীট, বেডকভার, ডানলোপিলোর বালিশ, মায় আমার সাধের কোলবালিশটিকে পর্যন্ত ধোপাবাড়ির ওয়াড়-টোয়াড় পরিয়ে ভদ্রস্থ করে নিয়ে চলে গেছে।

এমনই ভাব যে, সুমন নতুন বউ এর সঙ্গে শোবে না তো যেন স্মিতার সঙ্গেই শোবে।

মেয়েদের ভালোবাসার রকমটাই অদ্ভুত!

যে সময়ে ওদের আসবার কথা, সে সময়ে ওরা এলো না। আমি দুবার খোঁজ নিলাম অফিসে কোন ফোন এসেছে কি না রাঁচী থেকে তা জানার জন্যে। রাঁচী এক্সপ্রেস ভোরেই পৌঁছয়। রাঁচী থেকে আসা সব বাসও চলে গেলো।

দুপুরের খাওয়ার-দাওয়ার সব তৈরি, এমন সময় আমাদের অফিসের চৌধুরী এসে বললো যে, সুমন চিঠি লিখেছে যে, প্লেনে আসছে কোলকাতা থেকে। এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা আসবে এখানে। বিকেল বিকেল পৌঁছবে। রাঁচীর মেইন রোডের "কোয়ালিটি"তে লাঞ্চ করে। ও আমাকে কিছুই জানায়নি শুনে চৌধুরীও খুব অবাক হল।

স্মিতাকে জানালাম। বললাম, চলো, তাহলে বসে থেকে আর লাভ কী হবে? আমরা খেয়েই নিই।

স্মিতা আমাকে খেতে দিলো। কিন্তু নিজে খেলো না। বললো, সারাদিন রান্নাঘরে ছিলাম, গা-বমি-বমি লাগছে।

স্মিতা এই খবর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। ওর আনত চোখে বড় ব্যথা দেখলাম।

সন্ধের মুখে মুখে সুমন আর অলকা এলো ট্যাক্সিতে করে। সঙ্গে কোয়ালিটীর খাবারের প্যাকেট। রাঁচীর কোয়ালিটী থেকে তন্দুরী চিকেন আর নান নিয়ে এসেছে রাতের খাওয়ার জন্যে।

এ খবরটা আমি আর স্মিতাকে দিলাম না।

ওরা যেহেতু আমাদের বাড়িতে এলোই না, অফিসের সকলে ওখানেই গেলো।

বুধাই-এর মা এবং আমি নিজে মিষ্টি-টিষ্টি সব বয়ে নিয়ে গেলাম ওর কোয়ার্টারে। সুমনের দাদা হিসাবে সকলকে যত্ন-আত্তি করলাম।

সকলে বললো, বউদি কোথায়? ভাবিজী কোথায়?

আমি বললাম, আসছে।

তারপর আমি নিজেই স্মিতাকে নিতে এলাম। দেখলাম, স্মিতা চান করে সুমনের কোলকাতা থেকে আনা সেই সুন্দর লাল আর কালো সিল্কের শাড়িটা পরেছে। কানে সুমনের দেওয়া বেদানার মত রুবির দুল। গায়ে সুমনেরই ইন্টিমেট পারফ্যুমের গন্ধ।

আমি বললাম, চলো স্মিতা।

স্মিতা বললো, সুমনের স্ত্রী কেমন দেখলে?

আমি বললাম, দেখিনি এখনও।

চানু আগেই বুধাই-এর মায়ের সঙ্গে চলে গিয়েছিলো। আমি আর স্মিতা এগোলাম।

আমাদের দেখে সুমন উঠে দাঁড়াল। স্ত্রীকে বলল, এই যে রবিদা আর বউদি।

www.BanglaBook.org

সুমনের স্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে আমাকে নমস্কার করল। স্মিতার দিকে ফিরেও তাকাল না।

সুমন, ঠাণ্ডা নৈর্ব্যক্তিক গলায় বললো, বউদি! কেমন হয়েছে আমার বউ?

স্মিতা মুখ নীচু করে বললো, ভালো, খুব ভালো।

বলেই বললো, তোমরা খেতে, রাতে আমাদের ওখানে যাবে তো?

অলকা কাঠ কাঠ গলায় সুমনের দিকে তাকিয়ে বললো, রাতের খাওয়ার তো নিয়ে এসেছি রাঁচী থেকে। কষ্ট করার কী দরকার ওঁদের।

স্মিতা কিছুই বলতে পারলো না।

আমি বললাম, তোমরা যা ভালো মনে করো, করবে।

অফিসের সহকর্মীরা হই হই করে উঠলো। বললো, ইয়ার্কি নাকি? দাদা বউদি কাল রাঁচী থেকে বাজার করে আনলেন, সারা দিন ধরে রান্না করলেন বউদি, আর তোমরা খাবে না মানে? এ কেমন কথা?

অলকা আমাকে বললো, তাহলে এখানেই যদি পাঠিয়ে দ্যান। আমরা বড় টায়ার্ড!

চানু কিছুক্ষণ সুমনের কোলের কাছে ঘেঁষাঘেঁষি করে বুঝলো যে, সুমনের উপর তার যে নিরুঙ্কুশ দাবি ছিল তা আর নেই। শাড়ি-পরা একজন নতুন মহিলা এখন তার সুমনকাকুর অনেকখানি নিয়ে নিয়েছে। সুমনকাকু বল খেললো না, তাকে কাঁধে চড়ালো না, তাকে তেমন আদরও করল না দেখে, সে তার মায়ের আঁচলের কাছে সরে গেলো। শিশুরা আদর যেমন বোঝে, অনাদরও।

স্মিতা সুমনকে বললো, তাহলে তাই-ই হবে। খাওয়ার সব এখানেই পাঠিয়ে দেবো। ক'টায় পাঠাবো? ন'টা নাগাদ?

সুমন এই প্রথমবার চোখ তুলে তাকালো। স্মিতাকে দেখলো। ওর ভালোবাসায় মোড়া-শাড়িতে, ওর আদরে দেওয়া রুবির দুল-পরা স্মিতা। কিন্তু স্মিতা যে খুব রোগা হয়ে গেছে তাও নিশ্চয়ই ওর চোখে পড়ল। সুমনের চোখ দুটি এত আনন্দের মাঝেও হঠাৎ ব্যথায় যেন নিষ্প্রভ হয়ে উঠল। এক মুহূর্ত স্মিতার মুখে তাকিয়ে থেকেই চোখ নামিয়ে বললো, আচ্ছা বউদি! ন'টার সময়ই পাঠিও।

সঙ্গে সঙ্গে সুমনের স্ত্রী সুমনের দিকে তাকালো।

স্মিতা চানুকে নিয়ে, পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরে গেলো। আমি রয়ে গেলাম, তক্ষুণি চলে গেলে খারাপ দেখাতো। চেনা-জানা এত লোক চারপাশে।

কত লোক কত কথা বলছিলো, রসিকতা, হাসি ঠাট্টা। ওদের শোবার ঘর ভারী সুন্দর করে সাজানো হয়েছে একথা সকলেই বললো।

অলকা কোনো মহিলাকে জিজ্ঞেস করলো, কে সাজালেন শোওয়ার ঘর?

তিনি বললেন, রবিদাদার স্ত্রী, স্মিতা বৌদি।

অলকা বললো, তাই-ই বুঝি?

অতিথিরা একে একে প্রায় সকলেই চলে গেলেন। বুধাই-এর মা আর ছোটুয়া যতক্ষণ না ওদের খাওয়ার নিয়ে এলো ততক্ষণ আমাকে থাকতেই হলো। বুধাই-এর মা এসে বললো বউদির শরীর খারাপ। সারাদিন রান্নাঘরে ধকল গেছে। বাড়ি গিয়েই শুয়ে পড়েছিল। এই খাবার-দাবার কোনোরকমে বেড়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়েছে।

তারপর বুধাই-এর মা সুমনের দিকে তাকিয়ে বললো, বউদি আসতে পারলো না।

সুমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলো কথাটা শুনে।

www.BanglaBook.org

অলকা আমাকে বললো, আপনি তাহলে যান ওঁর কাছে। শরীর খারাপ যখন।

আমি বললাম, আপনারা একা একা খাবেন?

চৌধুরী বললো, আরে দাদা ওরা তো এখন একাই থাকতে চাইছে। দেখছেন না, আমাদের সকলকে কীভাবে তাড়িয়ে দিচ্ছে!

আমি হাসলাম। হাসতে হয় বলে। তারপর বললাম, আচ্ছা! তোমরা ভালো করে খেও।

দু-একজন কৌতূহলী, অত্যুৎসাহী মহিলা বাসরে বর-বউকে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য রয়ে গেলেন।

সুমন দরজা অবধি এলো একা একা। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আমাকে কী যেন বলবে বলবে করলো, তারপর বললো না। শুধু বললো, আচ্ছা রবিদা।

আমি যখন বাড়ি ফিরলাম, তখন রাত দশটা বাজে। চানু ঘুমিয়ে পড়েছে। বুধাই-এর মা একা বসে আছে খাওয়ার ঘরে, মোড়া পেতে, দেওয়ালে মাথা দিয়ে।

বুধাই-এর মা বললো, দাদাবাবু আপনি খাবেন না?

বউদি খেয়েছেন?

বউদির শরীর ভালো না। শুয়ে রয়েছেন।

আমি বললাম, আমাকে এক গ্লাস জল দাও বুধাই-এর মা। আমিও খাবো না। শরীর ভালো নেই।

বুধাই-এর মা জল এনে দিয়ে হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেললো একটা।

আমি চমকে উঠে তাকালাম তার দিকে। তার চোখেও দেখলাম বড় ব্যথা।

বললাম, তুমি খেয়ে, শুয়ে পড়ো বুধাই-এর মা।

বুধাই-এর মা বললো, আমারও খিদে নেই একদম।

শোওয়ার ঘরে গিয়ে দেখি স্মিতা সেখানে নেই। পাশের ঘরে ঢুকলাম। দেখি, চানুর পাশে স্মিতা উপুড় হয়ে সন্ধেবেলার সেই লাল-কালো সিল্কের শাড়িটা পরেই শুয়ে আছে। ওর হালকা ছিপছিপে সুন্দর গড়নে চানুর পাশে অল্পবয়সী ওকে, চানুর মা বলে মনেই হচ্ছিলো না।

আমি কাঠখোট্টা লোক। বুঝি কম, জানি কম। কিন্তু কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে-পড়া আমার চেয়ে দশ বছরের ছোট আমার ছেলেমানুষ স্ত্রীর দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম দরজায় দাঁড়িয়ে।

তারপর ঘরে ফিরে গিয়ে জামা-কাপড় ছেড়ে পায়জামা-গেঞ্জি পরে আমি ইজিচেয়ারে শুলাম।

অন্ধকার রাতে তারারা সমুজ্জ্বল। জঙ্গলের দিক থেকে মিশ্র গন্ধ আসছে হাওয়ায় ভেসে। শিয়াল ডাকছে লাতেহারের দিকের রাস্তা থেকে। গোঁ গোঁ করে মাঝে মধ্যে দুটি একটি মার্সিডিস ডিজেল ট্রাক যাচ্ছে দূরের পথে বেয়ে। আজ বাইরেও রাত বড় বিধুর। রাতের পাখিরা একে অন্যের সঙ্গে কথা বলছে। ঝিঁঝির একটানা ঝিনঝিনি রবের ঘুমপাড়ানি সুর ভেসে আসছে জঙ্গলের দিকে থেকে।

ইজিচেয়ারে শুয়ে আমি কত কী ভাবছিলাম। এমন সময় ঘরে একটা মৃদু খসখস শব্দ হলো। পারফ্যুমের গন্ধে ঘরটা ভরে গেলো। স্মিতা কথা না-বলে সোজা এসে আমার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

আমার মধ্যে যে খারাপ মানুষটা বাস করে সে বললো, আঘাত দাও ওকে। এমন শিক্ষা দাও যে, জীবনে যেন এমন আর না করে! ওর প্রতি এক তীব্র ঘৃণা ও অনীহাতে আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মন ভরে উঠলো। ভীষণ নিষ্ঠুর হয়ে উঠলো আমার মধ্যের সেই আমিত্বময় সাধারণ স্বামী।

কান্নার বেগ কমলে, আমি বললাম, কী হলো।

ও বললো, আমার জন্যে আজ তোমার এত লোকের সামনে...; আমার জন্যেই। আমি জানি।

আমি চুপ করে রইলাম।

আমাকে তুমি শাস্তি দাও।

কিসের শাস্তি?

ভুলের শাস্তি।

আমি বললাম, ব্যাঙ্গাত্মক স্বরে, ভালোবেসেছিলে বলে অনুতাপ হচ্ছে?

স্মিতা এবার মুখ তুললো। আমার পায়ের কাছে হাঁটু-গেড়ে বসে বললো, আমার যে বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে ভালোবাসা...

আমি বললাম, আমিই কি বললাম? বললাম, আমার কী এমন রূপ-গুণ আছে যাতে তোমার শরীর ও মনে চিরদিন একা আমি সর্বেসর্বা হয়ে থাকতে পারি? বিশ্বসংসারে একজন স্বামীরও কী আছে?

তারপর একটু চুপ করে থেকে ওর মাথায় হাত রেখে বললাম, আমার ভাগে যা পড়েছিলো তাই-ই তো যথেষ্ট ছিলো। সেই ভাগের ঘরে কোনো শূন্যতা তো কখনও অনুভব করিনি স্মিতা! সত্যিই করিনি।

স্মিতা অবাক হয়ে তাকিয়েছিলো তার বোকা, অগোছালো ভুলোমনের স্বামীর দিকে।

দূরের ঝাঁটি জঙ্গল ভরা মহুয়াটাড়ে চমকে চমকে রাত চরা টি-টি পাখিরা ডেকে ফিরছিলো। হাওয়া দিয়েছিল বনে বনে। কারা যেন ফিসফিস করছিল বাইরে!

ভাবছিলাম, এই মুহূর্তে তার একজন মানুষ সুমন, তার নব-পরিণীতা স্ত্রীকে বুকে নিয়ে শুয়ে আছে। স্মিতারই ভালোবাসার হাতে-পাতা বিছানাতে।

সুমন এখন কী ভাবছে কে জানে? কিন্তু যদি স্মিতার কথা সুমন একবারও ভাবে তাহলে আমার মতো সুখী এ মুহূর্তে আর কেউই হবে না।

অনেক বছর আগে, বিয়ের রাতে যজ্ঞের ধোঁয়ার মধ্যে বসে যেসব সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলাম তার বেশিরই মানে বুঝিনি। সেদিন, আমি আমার নিজস্ব কোনো যোগ্যতা ব্যতিরেকেই স্বামী হয়েছিলাম স্মিতার, শুধুমাত্র বিয়ে করেই।

স্মিতা কাঁদছিলো নিঃশব্দে। আমার বুক ভিজে যাচ্ছিলো ওর চোখের জলে। কিন্তু ভীষণ ভালোও লাগছিলো।

স্মৃতিতে হঠাৎই বউভাতের রাতটা ফিরে এলো। তখন মা বেঁচে ছিলেন। জ্যাঠামণি, রতনমামা। স্মিতার বাবাও। আরো কেউ কেউ। আজ যাঁরা নেই।

আমার পুরোনো বন্ধুরা, কত আনন্দ, কল্পনা সে-রাতে ; সুগন্ধ, সানাই..........।

স্মিতার মাথায় হাত রেখে বসে থাকতে থাকতে আমার হঠাৎ মনে হলো যে, যে-আমি টোপর মাথায় দিয়ে সমারোহে গিয়ে স্মিতাকে একদিন তার পরিবারের শিকড়সুদ্ধু উপড়ে এনেছিলাম, তার সঙ্গে যে-মানুষটা তার স্ত্রীর সুখে-দুঃখে জড়াজড়ি করে অনেক অবিশ্বাস ও সন্দেহ পায়ে মাড়িয়ে বিবাহিত জীবনের কোনো বিশেষ বিলম্বিত মুহূর্তে সত্যিই স্বামী হয়ে উঠলাম, তাদের দুজনের মধ্যে বিস্তরই ব্যবধান।

"বর হওয়া" আর "স্বামী হওয়া" বোধহয় এক নয়।

www.BanglaBook.org

প্রবেশ

বৌদি, ফোন!

সরমা বাথরুমের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললো।

বিরক্ত সুমি, শাওয়ারের কলটা বন্ধ করে উৎকর্ণ হয়ে বললো, চান করার সময়ও একটু শান্তি নেই তোমাদের জন্যে। কে ফোন করেছে এই অসময়ে?

বীণাদিদি।

ও বীণাদিদি? ধরতে বলো, ধরতে বলো। আমি আসছি এক্ষুনি। বলেই, দরজার হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখা ছাড়া-হাউসকোটটাই জল ভেজা নগ্ন শরীরে জড়িয়ে ভিজে বাথরুম-স্লীপার পায়ে গলিয়ে বাথরুমের দরজা খুলে প্রায় দৌড়ে এলো ড্রইংরুমে।

অনেকদিনের পুরনো কাজের লোক সরমা বললো, আস্তে, আস্তে! পড়ে যাবে যে!

তারপরই বললো, দেখেছো! সারা ঘর জলময় করে দিলে গা! কার্পেটটাও ভিজিয়ে দিলে। নিজেই আছাড় খেয়ে মরবে যে! ফেরার পথে।

সুমি ফোনের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে সরমা বাথরুমের দরজা থেকে বেডরুম, বেডরুম থেকে ড্রইংরুমের সুমির ভিজে গা-গড়ানো জল মুছতে লাগলো বিড় বিড় করতে করতে, বিরক্তির সঙ্গে।

হ্যালো। বীণাদি? বলো, আমি সুমি।

ওপাশ থেকে কি বলা হলো তা সরমা শুনতে পেলো না। তবে লক্ষ্য করলো যে, সুমিতার চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

দেখা হয়েছিলো? কি বললেন? সত্যি? আমি ভাবতেই পারছি না।...কবে?...এই শনিবার? না না অশেষ তো বলছিল সুমন ইতিমধ্যেই নেমন্তন্ন খাইয়ে দিয়েছে। ...বাঃ... না কেন? অশেষের বন্ধুর সুদীপের ছেলের জন্যে, আর কেন? সবিতাদির থ্রুতে আলাপ হলো,

www.BanglaBook.org

আর দ্যাখো কেমন ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেলো।...কি বলছো? হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি অশেষকে এক্ষুনি ফোন করছি। না না, আমাদের কোনো গাফিলতি হবে না। ওকে তো এখন দিনে দশ ঘন্টা পড়াচ্ছি। তারপর মিস্টার হবসন-এর কাছে কোচিং নিতে যাচ্ছে।...হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি যাও। না, না। কী যে বলো! কোনোই অসুবিধাই হয়নি আমার। চান তো এই পঁচিশ বছরে বহু হাজার বার করেছি, বেঁচে থাকলে আরও বহু হাজার বার করবো। তুমি যা করলে বীণাদি, কী বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাবো, বলতে পারছি না। হ্যাঁ হ্যাঁ। অশেষকে বলবো মেঘুদাকে ফোন করতে।

সুমিতার স্বামী একটি এককালীন ব্রিটিশ এবং অধুনা মারোয়াড়ি মালিকাধীন "ফেরা" কোম্পানীর বড় অফিসার। সে সবে লাঞ্চ রুমে ঢুকেছিল। এমন সময় পি.এস. মিস. নাগবেকার দৌড়তে দৌড়তে এসে বললো, স্যার, ইটস ভেরী আর্জেন্ট। মিসেস বোস ইজ অন ইওর পার্সোনাল ফোন। প্লীজ টেক দ্যা কল। অশেষ কার্পেটের উপরে বসানো চেয়ার সজোরে ঠেলে উঠে দাঁড়ালো।

কথাকটি বলেই, মিস নাগবেকার, মহিলা পি. এসদের জন্যে নির্দিষ্ট লাঞ্চরুমের দিকে চলে গেলেন। এখন লাঞ্চ টাইম শুরু হয়ে গেছে। পি বি এক্সও বন্ধ।

চ্যাটার্জী টাইয়ের নট ঢিলে করতে করতে অশেষের দিকে চেয়ে বললো, তাও গার্ল-ফ্রেন্ডের ফোন হলে বোঝা যেত। বৌ-এর ফোন পেয়ে এখনও এত দৌড়াদৌড়ি?

লাঞ্চ রুম থেকে দৌড়ে বেরিয়ে যেতে যেতে অশেষ বললো, ব্যাপার আছে। এসে বলব।

সরমা বিরক্ত গলায় বললো, তোমার শরীরের আর চুল-গড়ানো জলে যে ঘর ভেসে গেল গো বৌদি। কত আর নাই-কাজ করব আমি?

করো! করো! লক্ষ্মী সরমা! চাঁদুর বোধহয় হয়ে যাবে সেন্ট-ফেজিয়ার্স-এ।

ছেন্ট ফেজিয়ার্স কি গো?

আঃ। এখন বিরক্ত করো না। তোমার দাদা আসছেন ফোনে। বলেই, মুখ ঘুরিয়ে সরমাকে বললো, কাউকে বোলো না কিন্তু।

মুখ বিকৃত করে গুল-দেওয়া কেলে-মাড়ি আর দাঁত বের করে সরমা বললো, আমার বয়েই গেছে কাউকে বলতে। তাছাড়া, ছেন্টেরও আমি কিছু বুঝি না, ফেজিয়াসেরও নয়।

অশেষ হাঁফাচ্ছিল। একটু ভুঁড়ি হয়ে গেছে। খেলাধুলো সব গেছে, তার উপর নিত্যনৈমিত্তিক পার্টি তো লেগেই আছে। মালিকরা মদ সিগারেট ছোঁন না কিন্তু তাদের চাকরির এটা এখন অঙ্গ। উপরতলার সমাজে ঘোরা-ফেরা কাজ-কারবার করতে হলে মদ না-খেলে চলে না। দেশ বদলে গেছে। সময় বদলে গেছে। এখন প্র্যাকটিক্যাল প্রাগম্যাটিক না-হলে বেঁচে থাকা মুশকিল। এই নব্য নগরসভ্যতার র‍্যাটরেস-এ ওরা সকলেই সামিল হয়েছে।

হাঁফাতে হাঁফাতে অশেষ বললো, বলো সুমি? বীণাদি...কী বললে? হয়ে যাবে? সেন্ট ফেজিয়ার্স এ? সত্যি? ও মাই! মাই। আই উইল গেট ড্রাঙ্ক টুনাইট। তুমি একটি সুইটী পাঈ ডার্লিং। আমি আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবো। চাঁদু কোথায়?

পড়ছে।

কি পড়ছে?

এখন সামস করছে।

ভেরী গুড। তুমি কি করছ?

চান করছিলাম।

www.BanglaBook.org

আঃ ডার্লিং। যাও যাও ভালো করে চান করো আজকে। উই উইল বীট ইট আপ টুনাইট! ছাড়ছি!...কি বলছ? কাউকে বলবো না? চ্যাটার্জীকেও না? কেন? কি? ওর বোনপোও চেষ্টা করছে? সেন্ট ফেজিয়ার্স-এই? মাই গুডনেস। থ্রু দ্যা সেম সোর্স? সত্যি! ভাগ্যিস বললে। না না। পাগল। আর বলি!

ফোন ছেড়ে দিয়ে লিফটের বোতাম টিপল অশেষ। ফোন ধরতে আসার সময় উত্তেজনায় লিফট ডাকার জন্যে অপেক্ষা করার তর সয়নি।

লাঞ্চ রুমে ততক্ষণে অনেকে এসে গেছেন। মকবুল বেয়ারা সুপ্যও সার্ভ করে দিয়েছে। চ্যাটার্জী উল্টোদিকের চেয়ারে বসেছিলো। স্যুপ-স্পুন দিয়ে স্যুপ মুখে তুলে বলল, হলোটা কি?

অশেষ বললো, চ্যাটার্জীর চোখে চোখ রেখে, ডাহা মিথ্যে কথা। তেমন কিছু নয়। না। সুমিতার এক ফার্স্ট কাজিনের ফার্স্ট প্রেগনান্সী। বেলেভিউতে অ্যাডমিশন নিয়েছিলো। এক্ষুনি খবর এসেছে যে, ছেলে হয়েছে।

ওঃ। চ্যাটার্জী বললো। তারপর বললো, বাপ-মায়ের অশান্তির শুরু হল। আই রিয়্যালি পিটী দ্যা প্যারেন্টস।

কেন? এ আবার কি কথা?

বাঃ। ছেলে হতে আর কি মুশকিল। ইজিয়েস্ট ব্যাপারই তো সেটা। এই মুহূর্ত থেকে স্কুলের অ্যাডমিশান নিয়ে ভেবে মাথার চুল পেকে যাবে। আমার একবছরের বড় দাদার বিয়ে হয়ছে দশ বছর। নিউ আলিপুরে থাকে। কোনো ইস্যুই হলো না এই ভয়ে চার বছর। পাঁচ বছরের মাথায় প্রিন্স অফ্ ওয়েলস এলেন কিন্তু তাকে এখন স্কুলে ভর্তি করতে জুলপী পেকে গেছে। শুধু তার নয়, আমাদের সকলেরই। দেখি, একটা সোর্স আছে, তাকে ধরেছি। তোমার ছেলের কি হলো? হলো কিছু?

নাঃ। স্কুলে ভর্তি করার কোন সোর্স না-থাকলে ছেলেমেয়েকে পৃথিবীতে এনে ভাসিয়ে দিয়ে লাভই বা কি?

আমার দাদা-বৌদিও তো তাইই বলে।

কথাটা ভুল বলে না। সকলেই তো আর তোমার মতো ওয়েল-অফফ নয় যে, ছেলেকে ডুন-স্কুল বা আজমীরে বা গোয়ালিয়রে পাঠাবে? সকলের শ্বশুরমশাই তো আর ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট নয়।

যোগেশদা মানে যোগেশ ঘোষ, চিফ-এঞ্জিনিয়ার, পূব-বাংলার কোথায় যেন বাড়ি ছিলো, খ্যাঁক করে হেসে উঠলেন বিদ্রূপের গলায়।

হাসছেন যে?

চ্যাটার্জী ও অশেষ দুজনেই একসঙ্গে জিগ্যেস করলো।

তোমরা, ভাইডিরা কোন ইস্কুলে পড়ছিলা?

অশেষ এবং চ্যাটার্জী মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো একবার। অশেষ বলল, দ্যাটস ইরেলিভেন্ট। আমাদের সময় আর এখনকার সময় এক নয়।

ক্যান, আমাগো পোলারা কি ল্যাজ লইয়া জন্মাইতেছে?

যোগেশদা সেই মুষ্টিমেয় বাঙালদের একজন যিনি আজও বাঙাল বলে গর্ব বোধ করেন। পুব বাংলার ভাষায় কথা বলেন। বলেন, যাই কও আর তাই কও "আইসেন বইস্যেন" কইলে যতডা ভালোবাসার গন্ধ পাওন যায়, তোমাগো "আসুন বসুনে" তার

www.BanglaBook.org

ছিটাফোঁটাও নাই।

মানুষটি বহু বছর ইংল্যান্ডেও ছিলেন যৌবনে। ইংরেজি বলেন সাহেবদেরই মতো অথচ বাংলা বলবেন, ইচ্ছে করে এমন করে। ওরা বুঝতে পারে না বললে বলেন, হেইডাই তো ভাষা আমার। বাঙাল হইয়া, "করলুম" "খেলুম" "মরলুম" "জ্বললুম" কইর‍্যা জাত খোওয়াইতে পারুম না। আমি হইতাছি গিয়্যা লাস্ট অফ দ্যা মোহিকানস। বোঝলা না।

অশেষ অথবা চ্যাটার্জীর পাঁচ গ্রেড উপরে আছেন। ওঁর লেভেলের অন্য অফিসারেরা অশেষদের লেভেলের অফিসারদের সঙ্গে মেলামেশা বিশেষ করেন না। অত্যন্ত ফর্ম্যাল হয়ে থাকেন। লোকে বলে, আর এক বছরের মধ্যেই বোর্ডে যাবেন উনি। অথচ মানুষটা এমন কাঠখোট্টা বাঙালই রয়ে গেলেন। একটুও আধুনিক অথবা সাহেব হতে পারলেন না। এখনও বাড়িতে লুঙি পরেন, শুঁটকি মাছ খান। ভাবা যায় না।

চ্যাটার্জী বললো, ল্যাজ নিয়ে জন্মায় না কিন্তু আজকালকার দিনকাল কতো কম্পিটিটিভ। ভালো স্কুলিং না-হলে জীবনে কোথায় হারিয়ে যাবে ছেলে তার ঠিক আছে? ইংলিশ-মিডিয়াম ভালো স্কুলে না-পড়লে কি কমপিট করতে পারবে কারো সঙ্গেই? অমানুষই হয়ে থাকবে।

আমার প্রশ্নডার জবাব কিন্তু পাই নাই। তোমরা কিন্তু কও নাই এখনও আমারে, তোমরা কোন স্কুলে পড়ছিলা।

চ্যাটার্জীর বাড়ি বর্ধমান জেলার এক অজ গ্রামে। বর্ধমানেরই একটি স্কুলে সে পড়াশুনা করেছিলো। ছাত্র ভালো ছিল। তার বড়মামার মেজশালার সলিসিটর ফার্মে ঢুকে ল এবং অ্যাটর্নিশিপ পাশ করেছিল কলকাতায় এসে। মীর্জাপুরের অন্ধকার মেস-এ থাকতো। ল পরীক্ষাতেও দ্বিতীয় হয়েছিলো। এই কোম্পানির ও এখন ল অফিসার। চাকরিতে ঢুকে কোম্পানি-সেক্রেটারিশিপটাও পাশ করে নিয়েছে। চেয়ারম্যান নাকি হায়ার লেভেলে কোনো লোককে বলেওছেন যে সেক্রেটারি, গজদার সাহেব রিটায়ার করলে চ্যাটার্জীই সেক্রেটারী হবে। হয়ত বছর পাঁচেক লাগবে আর এবং তারপর বোর্ডে যাবে। আজ আ ম্যাটার অফ কোর্স। আর অশেষদের বাড়ি ছিল খুলনাতে। দেশভাগের পর তারা বাবা কলকাতায় ভবানীপুরে শালাদের বাড়ি এসে ওঠেন। ওঁরা কলকাতারই বাসিন্দা হয়েছিলেন দু-পুরুষ হলো। ছেলেবেলার সেই অসম্মানের দিনগুলোর কথা কখনও ভুলতে পারে না। মিত্র ইনস্টিট্যুশানে জায়গা না পেয়ে সে ভর্তি হয়েছিল গিয়ে হরাধন ইনস্টিট্যুশানে। নিজেরও বড় হবার, পায়ে দাঁড়াবার খুব একটা জেদ ছিলো। ভালো রেজাল্ট করে প্রেসিডেন্সীতে ঢুকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করবার পর কলকাতায়ই বসবাসকারী বাবার এক বাল্যবন্ধুর চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সী ফার্ম-এ ঢুকে সে পরীক্ষা পাশ করে। পরে কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্সীও করে। ওর বাবা ছিলেন জমিদারী সেরেস্তার মুহুরী। ধুতির উপর হাফ-হাতাওয়ালা ফতুয়া পরতেন। পানজর্দা খেতেন, তাও বেশি নয়। এবং নস্যি। এ ছাড়া নেশাও ছিলো না কোনো।

অশেষের পাইপ আর হুইস্কি।

ওদের দুজনের স্কুলের কথা শোনার পর যোগেশদা বললেন, তমাগো কথা তো কনফেস করলা। এহনে আমার কথাডা কই? দ্যাশ ছাইড়া আসনের পর বাবায় তো আমারে দিল এক স্কুলে ভর্তি করাইয়া। কুমুদিনি পার্কের আপোজিটে। পাঁচ টাকা মাইনা ছিলরে ভাই। কোন স্কুল কও দেহি? দুর্গাপতি ইনস্টিট্যুশান। মানষে কইত আমাগো সময়ে "যার নাই কোনো গতি হে যায় দুর্গাপতি"। কিন্তু কইলে কি হয়? যহন তোমাগো ছেট

www.BanglaBook.org

ফেজিয়ার্সে ভর্তি হওনের লইগ্যা গ্যালাম, ফাদার গেফার, কলেজের প্রিফেক্ট, স্কুলের নাম শুইনা কইলেন কি জানো? যা কইলেন তা শুইন্যা তো আমার ভিরমী লাগনের যোগাড়।

কি?

কইলেন, দ্যাটস আ ভেরী গুড স্কুল। সো মেনী গুড স্টুডেন্টস কেম ফ্রম দ্যাট স্কুল। ডক্টর হিতেশ চক্রবর্তী। শুনছো নাম? আরে এহনে, আমাগো পশ্চিম বাংলার ডাইরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসেস, হেই দুর্গাপতিরই ছাত্র। ভেরী হ্যান্ডসাম মানুষ রে ভাই; আর আরও জুনিয়ার, ঐ তোমাগো ফুটবলার? মুনী গোস্বামী? হেও তো। আরও কত্ত পোলায়! স্কুল-ফুল সব বোগাস রে ভাই, আসলে হইতাছে ইন্ডিভিজুয়াল। বাড়িতে মা-বাপের ইন্টারেস্ট যদি থাহে আর পোলার নিজের মগজে যদি মাল এট্টু থাহে তাহলে স্যা উপরে উইঠা আইবই আইব। তারে ঠেকায় কোন হালায়? তাই যদি না হইতরে ভাই, তাইলে তো হক্কল ভালো ভালো স্কুল-কলেজের হক্কল পোলায়ই লাইফে ক্যাটার কইর‍্যা থুইত! লাইফে তাদের মধ্যে কয়জন ভাইস্যা গেছে আর আমরাই বা কয়জন আছি কও দেহি একবার?

চ্যাটার্জী বললো, যোগেশদা আপনি বুঝছেন না। দিনকাল সত্যিই বদলে গেছে! আমাদের ছেলেবেলার দিন কি আর আছে। এখন একটি ভালো স্কুলে ছেলের অ্যাডমিশান না-করাতে পারলে তার জীবন অন্ধকার।

অশেষ বললো, সমাজে স্ট্যাটাস থাকে না। বন্ধু-বান্ধবের ছেলেমেয়েরা মিশবেই না আমাদের সঙ্গে।

তরে একটা হনুমান ছাড়া আর কিছুও কওন যায় না। ভাইবা দ্যাখ, ঠাণ্ডা মাথায়। ভালো স্কুলে, ভালো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে এডুকেশান দ্যায় যে তায় সন্দেহ নাই কিন্তু হেই শিক্ষা লইতে পারে কয়ডা পোলায়? যারে কয় রিসেপটিভিটি, তাইই যদি না থাহে, তয় সে পোলার লবডংকা অইব। আরে তোমরা যা কইতাছ তাই যদি হওনের কথা ছিলো তাইলে তো শুদা বড়লোকের পোলারাই লাট-বেলাট হইত জানো। লাইফে কি তাই দ্যাখস নাকি? চারধারে চক্ষু মেইলা দ্যাখসও না নাকি তোরা?

আপনার ছেলে, যে এখন স্টেটস-এ আছে সে কোথায় পড়েছিল?

হেডার মাথাটা তো তার বাপের মতো ভালো ছিলো। হেডারে দিছিলাম নরেন্দ্রপুরে। বৌদিই লইয়া গিয়া দিয়া আইছিল। তারপর প্রেসিডেন্সী। বরাবর তো স্কলারশিপ লইয়াই পড়ছে।

তাইই বলুন। সকলের ছেলেরাই তো ব্রিলিয়ান্ট হয় না। যাদের মগজ শার্প নয় তারা কি জীবনে বড় হবার চেষ্টা করবে না?

ইডিয়টের মতো কথা কইতাছো তোমরা। কোনো পোলার মগজই পাঁচ বছরে শার্প থাহে না। মগজরে পরিষ্কার করনের, ধার দ্যাওনের তো তহনই আরম্ভ। তোমাগো লইয়া সত্যিই পারন যায় না।

লাঞ্চের পর নিজের নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে চ্যাটার্জী আর অশেষ বলল, বাঙালকে নিয়ে সত্যি পারা যায় না। কোন যুগে যে বাস করেন যোগেশদা। বড় জ্ঞান দেন সব সময়।

চ্যাটার্জী বললো, বাংলাদেশের কোন জায়গার বাঙাল উনি। কে জানে? আমি তো বাংলাদেশের গায়ের গন্ধ মুছে ফেলেছি।

যাইই বলিস, বাঙাল তুইও যদিও, তবু তুই যোগেশদার মতো গ্রস নোস। তোর মধ্যে

www.BanglaBook.org

রিফাইনমেন্ট আছে। বাঙাল ওরিজিনাল হলে, বড় ইগো থাকে তাদের। কি বল?

অন্যমনস্ক-গলা অশেষ হঠাৎ নামিয়ে বললো, হয়ত। ওর বাবার কথা মনে পড়ে গেলো। বাবারও ইগো ছিলো। ভেঙে যেতে রাজি ছিলেন, কখনই মচকাতে নয়। গত বছর বাবা মারা গেলেন ভবানীপুরের সেই গলির বাড়িতে। শেষ দিকটাতে বাবাকে বড়ই অবহেলা করেছিল অশেষ। এই দিনকালে, ইচ্ছে থাকলেও পারা যায় না।

॥ ২ ॥

চাঁদুর বয়স পাঁচ। সে পাশের ঘরে শোয়। হালকা নীল কট। ডনাল্ড ডাক আর ডলফিনদের রঙিন ছবি আঁকা তাতে। ছোট্ট বইয়ের আলমারী। পড়ার টেবিল। নীলরঙা টাইলস-এর বাথরুম। জামাকাপড় রাখার ছোট্ট নীলরঙা আলমারি। রঙিন টি ভি-র পর্দায় সুখী পরিবার এবং দারুণ সুন্দর অভ্যন্তরের যেমন দৃশ্য দেখা যায় ঠিক তেমনি করেই অশেষের ফ্ল্যাট সাজানো। মাঝেমাঝে অশেষের মনে হয় যে, তার সব বন্ধু-বান্ধবের ফ্ল্যাট বা বাড়ি কম বেশি একই রকম করে সাজানো। জীবনযাত্রায় বড় একঘেয়েমি। সকলেরই একই আশা আকাঙ্ক্ষা, শুক্র শনিবার রাতে এর তার বাড়ি পার্টি। রবিবার সকালে ক্লাবে গিয়ে বীয়ার বা জিন বা ভডকা খাওয়া। অবস্থাপন্ন সমস্ত-মানুষই বোধ হয় এই একইরকম ভাবে বাঁচছে। বিশেষত্ব কিছু নেই।

হালকা-হলুদ রঙের সিল্কের নাইটি পরে চাঁপা-ফুল রঙের কম্বলের নিচে শুয়ে বেডরুমের নীল আলোর সুইচটাও নিবিয়ে দিল সুমিতা। হাই তুললো একটা। বললো, আজ ওসব থাক বুঝেছো। ভারী ঘুম পাচ্ছে।

ঠিক আছে। আসলে এরকমই হয়। কি হবে? কি হবে করে এতদিন তুমি কীইড-আপ হয়েছিলে তো! আজ যখন বীণাদির কাছ থেকে খবরটা পেলে তখনই ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছো। যাইই হোক, অলস ওয়েল দ্যাট এন্ডস ওয়েল।

দাঁড়াও অ্যাডমিশনটা হোক আগে। না আঁচালে বিশ্বাস নেই। কাউকেই বোলো না কিন্তু তুমি। কেউ জানলেই, ভাংচি দেবে।

হুঁ। বীণাদি আর কি বললেন?

বললেন যে, টেস্ট কিন্তু নেবে।

নেবে? আতঙ্কিত গলায় বললো অশেষ।

বলেই, উঠে বসল বিছানাতে। সে কী? তাহলে আর করলেন কী বীণাদি?

হ্যাঁ। প্রদীপ রুদ্র না কি তাইই বলেছেন ওঁকে। টেস্ট-এ রীজনেবলি ভালো করা চাই।

মাই গুডনেস। আমি তো ভেবেছিলাম সেন্ট লরেন্স, ক্যালকাটা বয়েস স্কুল, ডন-বসকো এবং পাঠভবনেও আর চেষ্টা করার দরকার নেই। এখন তো দেখছি ঢিলে দিলে একটুও চলবে না।

না। সুমিতা বললো। গলায় কান্নার সুর লাগলো ওর। ওর দিকে সহানুভূতির চোখে চেয়ে অশেষ বললো, অ্যাডমিশন টেস্ট যে ছেলের, না আমাদেরই তাই-ই বোঝা দুষ্কর। দ্যাখো, নিজেদের সব পরীক্ষা, সব বিপদ ধীরে ধীরে প্রায় কাটিয়েই উঠেছি বলা চলে। যখন ভেবেছিলাম, সুখের জীবন শুরু হবে ঠিক তখনই মনে হচ্ছে দুখের জীবনের আরম্ভ হল। অথচ আমাদের দুজনেরই এই সুখ অথবা দুখের উপরে কিছুমাত্রও হাত নেই। ছেলে মানুষ না-হলে, ছেলের বউ ভালো না হলে ওদের নিয়ে যা অশান্তি তা তো আমরা অ্যাভয়েড করলেই পারতাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছিঃ। কী যে বলো। তুমি কি বলছ চাঁদু না থাকলেই ভালো হতো। খুশি হতাম আমরা? অমন করে বোলো না।

কী বলতে চাইছি বুঝছো না তুমি সুমি!

ব্রাণ্ডি খাবে নাকি একটা? ছেলের চিন্তা তো আছেই। আমার তোমাকে দেখেও কম চিন্তা হচ্ছে না।

সুমিতা অস্ফুটে কী যেন বললো, বোঝা গেল না।

পাশের ফ্লাটে টিবড়েওয়ালারা ভি সি আর-এ কোনো ইংরেজি ছবি দেখছে। রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। গমগম করছে আওয়াজ। একটুও কনসিডারেশন নেই। একজন মানুষেরও কনসিডারেশন নেই অন্যর প্রতি। পথের মোড়ে ট্রাফিক কনস্টেবল এক মুহূর্ত না-থাকলেই এই সময়টার, এই যুগের, চরিত্রটা যেন আয়নায় ফুটে ওঠে।

চাঁদুরা যে কেমন করে বাঁচবে এই যুগে! বড়ই কষ্ট ওদের কপালে।

অশেষ উঠে গিয়ে ড্রয়িংরুমের বাতি জ্বেলে সুমিতার জন্যে একটি কনিয়াক আর ওর জন্যে একটি হুইস্কি ঢেলে, সেলার বন্ধ করে, বাতি নিবিয়ে দিলো। চাঁদুর ঘরের ফুট-লাইটটা জ্বলছে। মৃদু আলোতে আভাসিত হয়ে আছে ঘর। পায়ে পায়ে এগিয়ে গ্লাসদুটো হাতে নিয়েই একবার ছেলের বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। পাশ ফিরে দুটি হাত জড়ো করে ঘুমের মধ্যে ছেলেটা কী যেন প্রার্থনা করছে। প্রার্থনা করছে কি ও, ওর বাবামায়েরই মতো, যেন সেন্ট জেভিয়ার্স-এ অ্যাডমিশনটা হয়ে যায়?

পাঁচ বছরের শিশু! এই স্কুলের অ্যাডমিশানের পরীক্ষাতেও ধরাধরি করে, কানেকশনস বের করে তাকে পার করাতে হবে। যদি ভর্তি হয়ও, স্কুল-লীভিং পরীক্ষায় যদি ভালো না করতে পারে তখন আবার তার এক পরীক্ষা কলেজে অ্যাডমিশানের। তারও পর কেরিয়ারের পরীক্ষা। ততদিন কি বাঁচবে অশেষ? যা হেকটিক লাইফ লীড করতে হয় ওকে। আজ বম্বে কাল মাদ্রাজ, পরশু ব্যাঙ্গালোর তরশু দিল্লি। আগে আগে বেশ একটা ফিলিং অফ ইমপরট্যান্স হতো। আজকাল বড় ক্লান্তি লাগে। ভালো লাগে না একেবারেই। তারপর চাকরিতে ঢুকেও তো প্রত্যেক মুহূর্তেই পরীক্ষা। ল্যাং-মারামারি। ইঁদুরের মতো কাটাকাটি একে অন্যকে। পাঁচ বছর বয়স থেকে পরীক্ষার শুরু হলো চাঁদুর। চলবে মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত। জীবন মানেই পরীক্ষা। এই জীবন চাঁদুদের বড়ই সংগ্রামের, খেয়োখেয়ির, বড় দ্বেষ, ঈর্ষা, বড়ই রেষারেষির হবে। চাঁদুর ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে ভাবছিলো অশেষ এই পৃথিবীতে কেন যে আনল ও আর সুমিতা বেচারীকে। শিশুর শৈশব নেই, কিশোরের কৈশোর নেই, যুবকের যৌবন নেই, প্রৌঢ়র বানপ্রস্থ নেই। প্রতিটি মুহূর্ত টেনশানের, প্রতিযোগিতার। অথচ এই প্রতিযোগিতা কিসের জন্যে? ভালো চাকরি, ভালো রোজগার, স্ট্যাটাস, ভালো ফ্ল্যাট, গাড়ি, ফোন, ফ্রিজ, ভি সি আর। শুধু এইটুকু পাওয়ার জন্যেই কি একজন মানুষকে পৃথিবীতে আনা? এই প্রতিযোগিতাতে ছিন্নভিন্নই যদি হতে থাকে সবসময় তবে ওরা বাঁচবেটা কখন?

জীবন মানে শুধু কি এই? এইই সব?

বেডরুমে এসে নীল লাইটটা জ্বেলে সুমিতাকে কনিয়াকটি দিয়ে নিজে গাল্প করল একবারে অনেকখানি হুইস্কি।

সুমিতা সচরাচর ড্রিঙ্ক করে না। ক'দিন হলো কেমন যেন হয়ে গেছে। বিছানায় উঠে বসে সেও চুমুক দিলো।

ওকে অন্যমনস্ক করার জন্যে অশেষ বললো, বিকেলে কি করলে?

www.BanglaBook.org

ও। বলিনি তোমাকে বুঝি? চাঁদুকে মিস্টার হবসন-এর স্কুলে নামিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রসদনে গেছিলাম। শ্যামলদার সেই প্লে দেখতে। শ্যামলদা ইংরেজিতেই বললেন। কী দারুণ ইংরেজি বলেন! উনি কি ইংল্যান্ডের "হ্যারোতে" পড়াশুনা করেছিলেন? না 'ইটন্' এ?

চুপ করে রইলো অশেষ কিছুক্ষণ। তারপর নিজের কানে আশ্চর্য শোনালেও কথাটা বললো সুমিতাকে। বললো, যোগেশদার কাছে শুনেছি, উনি নাকি বালীগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুলে পড়েছিলেন।

সে কি? লা-মার্টস বা সেন্ট জেভিয়ার্সেও নয়।

নয়। ওসব স্কুলে বড়লোকের ছেলেরাই পড়তে যায়। শ্যামলদার বাবা তো খুব অল্পবয়সেই মারা যান। শিশুকালে তাঁর মা অনেকই কষ্ট করেই ওঁকে বড় করেছিলেন। জানো তুমি, যোগেশদা হয়ত ঠিকই বলেন। বালীগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুল অবশ্য খুবই ভালো স্কুল, কিন্তু ইংলিশ মিডিয়াম তো নয়। মানুষ যদি নিজেকে বড় করতে চায় যোগেশদার ভাষায়, তার মধ্যে যদি নেওয়ার ক্ষমতা, মানে রিসেভটিভিটি থাকে, তাহলে সেই সব ব্যক্তি নিজেদের গুণে একদিন প্রতিষ্ঠানের চেয়েও অনেক বড় হয়ে ওঠেন। আমি সুগতর কাছে শুনেছি যে, শ্যামলদা নাকি রেডিওর বি বি সি স্টেশান শুনে শুনেই অমন ইংরেজি উচ্চারণ রপ্ত করেছিলেন। সত্যি কী না জানি না অবশ্য। যে বড় হবেই, তাকে তার পরিবেশ, অনুষঙ্গ, চারপাশের বিরূপতা কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারে না হয়ত।

সকলেই তো আর শ্যামলদার মতো ওরকম বড় হবার ক্ষমতা নিয়ে আসে না। আমাদের চাঁদু তো সাধারণ। আমি তুমিও তো সাধারণই। তাইই ইচ্ছে করে, ছেলেকে একটি ভালো স্কুলে দিই। তুমি যখন অ্যাফোর্ড করতে পারো। তাছাড়া, ভালো স্কুলিং-এর দাম তো আছে একটা।

নিশ্চয়ই আছে! তবে, সত্যিই হয়ত বাবা-মায়ের শাসন এবং ছেলের নিজের বড় হওয়ার তাগিদটাই আসল। স্কুলের চেয়ে, সেটা অনেকই বড় ব্যাপার।

হঠাৎই ওরা দুজনে চমকে উঠলো, দ্রুত কিন্তু লঘু পায়ে পাশের ঘর থেকে চাঁদুকে দৌড়ে আসতে শুনে। স্লিপিং-স্যুট পরে চাঁদু তার ছোট্ট চটি-ফট-ফট করে দৌড়ে এলো ও ঘরে। সুমিতা লাফিয়ে উঠলো বিছানা ছেড়ে। আতঙ্কিত গলায় বলল, কি হয়েছে বাবা? ভয় পেয়েছো? স্বপ্ন দেখেছো?

দেওয়ালের কোয়ার্টজ ক্লক-এর দিকে চেয়ে দেখলো অশেষ রাত বারোটা বেজে কুড়ি।

চাঁদু সে কথার উত্তর না দিয়ে বললো, মাম্মী, "সিজর্স" বানানে ক'টা এস? ক'টা এস?

অশেষ বললো, চারটে।

তাই? তাইইত! আমি তো ঠিকই জানি। সেন্ট ফেজিয়ার্সের সাদা ড্রেস-পরা ফাদার যে বললেন, আমি ভুল বলেছি!

তুমি স্বপ্ন দেখছিলে?

না বাবা। আমি অ্যাডমিশান টেস্ট দিচ্ছিলাম। চাঁদুর ঘুম-ভাঙা আতঙ্কিত মুখের দিকে চেয়ে সুমিতার দু-চোখ সমবেদনায়, অসহায়তায়, ক্রোধে, হতাশায় জ্বলে উঠেই পরমুহূর্তে জলে ভরে গেলো মুখ ফিরিয়ে নিলো ও জানালার দিকে।

অশেষ চাঁদুকে কোলে তুলে ওদের বেডরুমের বাথরুমে নিয়ে গিয়ে ওর ঘাড়ে, কানের পেছনে এবং হাঁটুতে গোড়ালিতে জল দিলো। স্নায়ু সব ঠাণ্ডা হয় অমন করলে। ওর মা বলতেন। মাও এখন ভবানীপুরেই থাকেন সুরেশের সঙ্গে। বড় কষ্টেই থাকেন। কিছু টাকা দেয় অশেষ। জানে যে, তা কিছুই নয়, কিন্তু আর পারে না। ওদের লাইফ-স্টাইল যে বদলে

www.BanglaBook.org

গেছে।

চাঁদু অশেষের গলা জড়িয়ে ধরে বললো, বাবা! আমার ভয় করছে।

কোনো ভয় নেই। আমি আছি না? অশেষ বললো। ঠিক এমনি করে মাও বলতেন ওকে ছোটবেলায়। মায়ের কাছে একমাসের উপর যেতে পারেনি।

মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেলো।

চাঁদুকে বললো, পারবে, তুমি ঠিক পারবে টেস্টে। দেখো তুমি। এখন চলো ঘুমোবে। লাইক আ গুড বয়। তুমি হাঁদা জ্যাঠার মত বাঘ শিকার করবে বলো না? টিসুম। টিসুম। তবে? ভয় পাবে কেন? চাঁদু ঘোরের মধ্যে বললো, তা হলে ফাদার যে বললেন, না। সিজরর্স-এ একটা এস।

ফাদার জানে না বাবা।

তা হয় না। চাঁদু বললো।

চাঁদুকে শুইয়ে, গায়ে ওর হালকা নীলরঙা কম্বলটা চাপিয়ে মশারি গুঁজে কপালে একটা চুমু দিয়ে অশেষ বললো, গুড নাইট বাবা! ঘুমোও এবারে!

বেডরুমে ফিরে এসে দেখলো সুমিতা এক করুণ অসহায় ভঙ্গীতে শুয়ে আছে। ওর হাতের কনিয়াকের গ্লাস ঢেলে কম্বল ভিজে গেছে। অশেষ কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকলো, সুমি।

সাড়া নেই কোনো। অজ্ঞান হয়ে গেছে চাঁদুর মা।

অশেষ তাড়াতাড়ি ওর নাড়ি দেখলো। তারপর ডাঃ ভৌমিককে ফোন করল। এই মালটিস্টোরিড বাড়িরই দশতলায় থাকেন উনি। তারপর সারভেন্টস কোয়ার্টারের বেল টিপল। ডাঃ ভৌমিক এলেন স্লিপিং স্যুটের উপর ড্রেসিংগাউন চাপিয়েই। সরমাও এলো প্রায় একই সময়ে। ডাঃ ভৌমিকের ব্যাগটা নিয়ে বেডরুমে এলো অশেষ, সরমা আর ডাঃ ভৌমিকের সঙ্গে।

পরীক্ষা করতে করতেই জ্ঞান ফিরে এল সুমিতার, কিন্তু জ্ঞান আসার আগে ঘোরের মধ্যেই সুমিতা বললো, বীলিভ মী ফাদার, হী নোজ এভরিথিং। বীলিভ মী। ও নার্ভাস হয়েই ভুল বলেছে। সত্যিই কিন্তু ও জানে। ও কি অ্যাডমিশান পাবে না ফাদার?

ডাঃ ভৌমিক বুঝলেন।

অশেষকে বললেন, কবে?

পরশু থেকে আরম্ভ। পর পর সেন্ট-লরেন্স, ডন-বসকো, ক্যালকাটা বয়েজ, লা-মার্টস, সেন্ট-ফেজিয়ার্স।

হুঁ। বলেই, সুমিতার প্রেসার মাপলেন। তারপর নিজের ব্যাগ থেকে দুটি পাঁচ মিলিগ্রামের ক্যাম্পোজ বের করে দিয়ে বললেন, জল দিয়ে গিলে শুয়ে পড়ুন। কাল ঠিক হয়ে যাবেন।

ডাঃ ভৌমিকের দারুণ প্র্যাকটিস। মানুষও নাকি অমায়িক। চারখানা গাড়ি। লোকে পেছনে পেছনে দৌড়ে বেড়ায়। অশেষ শুনেছে যে, ওঁর বাবাও অত্যন্ত বড় ডাক্তার ছিলেন। উনিও নাকি বিদেশে গিয়ে অনেক ডিগ্রী নিয়ে এসেছেন। আজই প্রথম বিপদে পড়ে ডাকল ওঁকে। নইলে ওদের ডাক্তার, ডাঃ সেন।

ডাঃ ভৌমিক লিফট-এর সামনে দাঁড়িয়ে লিফট-এর বোতাম টিপে বললেন, মিসেসের নার্ভাস ব্রেকডাউন মতো হয়েছে। নাথিং টু ওয়ারী বাউট। প্রেসক্রিপশান তো লিখে দিয়েই গেলাম একটা। ওষুধ আনিয়ে কাল সকাল থেকেই দিতে আরম্ভ করবেন।

www.BanglaBook.org

লিফটের দরজা বোধহয় কেউ খুলে রেখে দিয়েছে। মালটিস্টোরিড বাড়ির চাকর-আয়ারা রাতে যা খুশি তাই করে। ডাঃ ভৌমিক কিছুক্ষণ মুখ নিচু করে লিফটের অপেক্ষায় থেকে হঠাৎ বললেন, আমি জানি না মিস্টার বোস কলকাতায় আমরা এত বড়লোক বাঙালি আছি, বাঙালী গভর্নমেন্ট আমাদের, আমরা সকলে মিলে কি আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্যে ক'টি ভালো স্কুলও তৈরি করতে পারি না? কলকাতায় তো বটেই, সমস্ত মফস্বল শহরেও?

স্কুল তো কতই আছে? কিন্তু স্কুলের মতো স্কুল কোথায়। মানে, যেখানে ভালো পড়াশোনা হয়, ইংলিশ মিডিয়ামে।

অশেষ বললো।

যে সব স্কুল আছে বাংলা-মিডিয়ামের, তাদেরও কি আমরা আধুনিক ও ভালো করে তুলতে পারতাম না? ইংরেজি শিখতে বাহাদুরীটা কি লাগে? নিউমার্কেটের ফলওয়ালারাও তো ইংরেজি বলে। ইংরেজি শেখার চেয়েও বড় শিক্ষা চরিত্র গঠন। যে সাহেবরা আমাদের বাবাদের শোষণ করেছিলেন, তাদের পোশাক, কমোড, হুইস্কি আর পাইপই নিলাম আমরা, চরিত্রটাই ফেলে দিলাম। তখনকার ইংরেজদের গুণও ছিল অনেক। কী বলেন?

আপনি কোন স্কুলে পড়েছিলেন ডাক্তার ভৌমিক?

আমি? বাংলাদেশের পাবনার এক অখ্যাত গাঁয়ের স্কুলে।

আপনার বাবা তো এম আর সি পি, এফ আর সি এস ছিলেন, তাই না?

ডাঃ ভৌমিক একবার তাকালেন অশেষের চোখে মুখ তুলে। বললেন, কে বলেছে আপনাকে। ভুল শুনেছেন। আমার বাবা এম বিও ছিলেন না, পুরোনো দিনের এল এম এফ ছিলেন। কিন্তু ডাক্তার ছিলেন ধন্বন্তরী।

স্যরি। আমি আপনার সঙ্গে আপনার বাবার কোয়ালিফিকেশান গুলিয়ে ফেলেছিলাম।

নিচে দরজা বন্ধ করার আওয়াজ হলো। কারো দয়া হল বোধহয়।

লিফটটা এসে গেলো। অশেষ, ভদ্রতা করে লিফট-এর গেট খুলে দিলো। ডাঃ ভৌমিক বললেন, না, সেটাও ভুল শুনেছেন। আমি নিজেই একজন এম বি বি এস ডাক্তার।

আপনার ফীসটা?

হাসলেন ডাঃ ভৌমিক। বললেন, আমি পুরনো দিনের লোক, প্রতিবেশীকে আত্মীয় বলেই জেনেছি ছোটবেলা থেকে।

লিফট-এর মধ্যে মুখ নিচু করে গেটের ভিতরের দিকটা টানতে টানতে বললেন, বোস সাহেব, স্কুল এবং ডিগ্রীর সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক নেই বোধহয়। হয়ত আয়েরও নেই। ওড়িশা থেকে আসা ভালো কাজ জানা কলের মিস্ত্রী, বিহার বা ইউ পি থেকে আসা পানের দোকানদার, এঁরা সবাইই কিন্তু মার্কেন্টাইল ফার্মের অনেকেই বাঙালি অফিসারের চেয়ে বেশি রোজগার করেন। একমাত্র ছেলেকে নিয়ে কি করতে চান আপনারা তাইই ভালো করে ভেবে ঠিক করুন। কলকাতার ভালো ভালো স্কুলে যেসব ছেলেমেয়ে পড়ার সুযোগ পায় বা পেয়েছে, পরবর্তী জীবনে তারা কি সকলেই কেউ-কেটা হয়েছে? সো-কলড খারাপ স্কুলের ছেলেমেয়েদের কাছে হেরে, তারা কখনও গেছে কি যায়নি তাই নিয়েও একটি সার্ভে করার সময় বোধহয় এসেছে। একমাত্র সন্তানকে কি করে তুলতে চান তাই ভাবুন ভালো করে দুজনে। পরীক্ষা আপনাদেরই।

অশেষ লিফটের বোতাম টিপে রেখে দাঁড় করিয়ে দিল লিফটিকে। কাকুতি-ভরা গলায় বললো, কী করতে বলেন, আপনি আমাদের, ডক্টর ভৌমিক?

www.BanglaBook.org

কিছুই বলি না। ছেলেকে শিক্ষিত করে তুলুন। জীবিকার সঙ্গে শিক্ষার কোনো বিরোধ যেমন নেই, তেমন কোনো কানেকশানও নেই। যা-কিছু করেই একজন মানুষ জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। এমনকি যদি কড়াইশুঁটি কি কচুরির দোকানও দেয়। আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে, যাঁরা টাই-পরে গাড়ি-চড়ে অফিসে গিয়ে অন্যের বেশি মাইনের চাকর হয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন তাঁরাই শুধু শিক্ষিত আর অন্যরা সবাইই অশিক্ষিত? ছেলেটাকে শিশুকাল থেকেই কতগুলো প্রি-ডিটার্মিনড আইডিয়াজ-এর চাকর করে তুলবেন না। ওদের মানুষ করে তুলুন। ভালো স্কুলে অ্যাডমিশন হলে ভালো, কিন্তু, তা না হলে যে তার জীবন বৃথা হয়ে যাবে এমন মনে করার মতো মূর্খতা কিন্তু আর নেই। ফটফট করে ইংরেজি ফুটোলেই সে শিক্ষিত, সে জীবিকায় সফল হবে, তার কোনো মানেই নেই। তাছাড়া জীবিকার জন্যে তো জীবন নয়, জীবনের জন্যেই জীবিকা।

অশেষের হাতের আঙুল আপনা থেকেই ঢিলে হয়ে এলো। লিফটটা উঠে গেলো উপরে। ওর মনে হলো, ডাঃ ভৌমিক যেন ওকে নিচেই ফেলে রেখে নিজে অনেক উঁচুতে চলে গেলেন।

সরমাও তার কোয়ার্টারে যেতে দরজা বন্ধ করে ফিরে এসে অশেষ আর একটা হুইস্কি ঢেলে বেডরুমে গিয়ে দেখল সুমিতার নিঃশ্বাস গাঢ় হয়ে গেছে। দশ মিলিগ্রাম ক্যাম্পোজ পড়াতে ঘুমে এলিয়ে পড়েছে ও।

গ্লাসটি হাতে নিয়ে দরজা খুলে ও বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে কলকাতায় গতকাল থেকে। উল্টোদিকের চোদ্দতলা মালটিস্টোরিড বাড়িটির কিছু কিছু ফ্ল্যাটে তখনও আলো জ্বলছে। ঐ সমস্ত ক'টি ফ্ল্যাটেও কি পাঁচ বছরের শিশুরা জীবন ও জীবিকার প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্যে কাঁচির ইংরেজি প্রতিশব্দ বানানে কটি "এস" আছে তা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত? না, তাদের মা-বাবারা ভালো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে তাদের ভর্তি করতে না-পারায় চিন্তাতে সুমিতারই মতো নার্ভাস ব্রেকডাউনে ভেঙে পড়েছেন আলো-জ্বালা বেডরুমগুলিতে?

অশেষের চোখে হঠাৎই বাঙাল, খাঁটি, সোজা কথার মানুষ যোগেশদার মুখটি ভেসে উঠল। এক ঢোকে হুইস্কিটা শেষ করে দিল ও। ওর মনে হল এই মুহূর্তে ওদের মতো অনেক দম্পতিই শুধু নন, ওদের নয়নমণি চাঁদুদের মত কিছু শিশুই শুধু নয়, পুরো বাঙালি জাতটাই বোধহয় একধরনের নার্ভাস ডেবিলিটিতে ভুগছে। ক্যাম্পোজ খেয়ে ঘুমোলে সেই জড়তা হয়ত শুধু বাড়বেই। যা দরকার তা জেগে থাকার, দু-চোখ খুলে রাখার। সবাই যা করে, যা ভাবে, তা না-করে নিজের পরিবেশ ও নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিতে ঠাণ্ডা মাথায় বোধহয় একটু ভাবা দরকার। ভালো চাকরী আর বেশি মাইনেই যে তাদের অনেক আদরে-আনা সন্তানের জীবনের একমাত্র গন্তব্য নয়, এ কথাটা হঠাৎই মনে হল ওর। ভালো থাকা, ভালো-পরার, ভি সি আর আর পয়সার চক্করে ফেঁসে, গরিব বাঙালিদের যা কিছুই গর্ব করার ছিল, একদিন তার সবই বুঝি খোয়াতে বসেছে তারা।

সুমিতা কাল যা বলে বলুক, সকালে কোনো বাঙালি স্কুলে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করাবে চাঁদুকে। তারপর সেই স্কুল যাতে তার সন্তানকে যথার্থ শিক্ষিত করে তুলতে পারে সে জন্যে নিজে তো বটেই, চ্যাটার্জী, যোগেশদা, ডাঃ ভৌমিক এবং অগণ্য বাঙালিদের কাছে সাহায্য চাইবে অশেষ। সরকারের উপর সব দিক দিয়ে চাপের সৃষ্টি করবে। কেরালাও তো কম্যুনিস্ট। কিন্তু শিক্ষিতের হার সেখানে কত বেশি! অশিক্ষিত বেকার মানুষ বাড়লে ভোট পেতে সুবিধে নিশ্চয়ই হয়, কিন্তু রাজ্যের কি হয়, তা ওঁদের বোঝার সময় এসেছে। এই

www.BanglaBook.org

জাতটিকে এমন ঘোরতর স্নায়বিক দৌর্বল্য থেকে টেনে তোলাটা শুধুমাত্র তার নিজের ছেলেকে অতি স্বল্প সংখ্যক অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেদের স্কুলে পড়িয়ে তথাকথিত-শিক্ষিত করে তোলার স্বার্থপর ইচ্ছে থেকে অনেকই বড় ব্যাপার।

চাঁদু ডাকল, বাবা। ^

তাড়াতাড়ি ঘরে গেল অশেষ বারান্দা থেকে।

অ্যামেরিকার প্রেসিডেন্টের নাম কি বাবা? ডনাল্ড ডাক?

না বাবা। রনাল্ড রিগ্যান। কিন্তু এসব তোমার আর মুখস্থ করতে হবে না। "শিশু ভোলানাথ" পড়াব আমি কাল তোমাকে, অবনঠাকুরের "রাজকাহিনী", বিভূতিভূষণের "পথের পাঁচালী" পড়ে শোনাব; দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের "ঠাকুরমার ঝুলি", সুনির্মল বসুর "ছন্দের টুং-টাং"। কাল থেকেই দেখবে পড়াশোনাটা কত আনন্দের। কত মজার। আজ ঘুমিয়ে পড়ো লক্ষ্মী সোনা। সিজর্স-এর এস নিয়ে আর ভাবতে হবে না তোমাকে। কাঁচি আমাদের অনেক ভালো। রাতারাতি এক অদৃশ্য কাঁচি দিয়ে তোমাকে এই মিথ্যে কষ্টর থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক সুন্দর দিশি জগতে ফিরিয়ে আনব আমি। ঘুমোও তুমি। আমার আদরের ধন। তোমার স্বপ্নে, পরীরা আসুক। শুকসারি, সুয়োরানী, দুয়োরানী। ফ্যান্টম আর সাদা-পোশাকের ফাদাররা নাইই বা এলেন।

বাবা। আমার সঙ্গে শোবে তুমি?

নিশ্চয়ই শোব।

অশেষ বলল।

চাঁদুর পাশে শুয়ে, ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলো একদা ব্রিটিশ, অধুনা মাড়োয়ারী কম্পানির ইংরেজি-ফুটোনো চাকর। ওর বুকের মধ্যে ছেলেবেলার সব বোধ ফিরে এল। কানে এল, গ্রামের রাত-পাখির শীতার্ত স্বর, নদীর উপরের হাওয়ার হু হু শব্দ। নাকে এল, প্রথম ভোরের খেজুরের রসের গন্ধ, পাকা ধান আর নদীর কুয়াশার গন্ধর সঙ্গে ভেসে। বড় বড় কই মাছের ধনেপাতা-ফুলকপি দিয়ে রাঁধা ঝোলের গন্ধ। বাঙালিয়ানার গন্ধ। ঘুমন্ত চাঁদুকে বুকে জড়িয়ে অশেষ বলল, তোকে আমি শিশুকাল থেকেই এই অপমানের অসম্মানের জগৎ থেকে বাঁচাব। শিশুকাল থেকে এই হিউমিলিয়েশানের মধ্যে বাঁচতে হলে, তুই অমানুষই হয়ে যাবি। তোকে জবরদস্ত বাঙালি করে তুলব। দেখি, তুই ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে টক্কর দিতে পারিস কি পারিস না জীবনে! বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, স্যার আশুতোষ, বিধান রায়, সত্যজিৎ রায় এবং অনেকেই যদি ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে না-পড়েও বড় হতে পেরে থাকেন তো তুইই বা পারবি না কেন? তোকে আমি আমার মত এয়ার-কন্ডিশানড অফিসের স্যুট-পরা ফ্যাকাশে পুতুল করব না, রক্ত-মাংসর বিবেকসমৃদ্ধ মানুষ করে তুলব। যেমন অনেক মানুষের দরকার এই মুহূর্তে, এই হতভাগ্য রাজ্যে। এই দেশে।

দেখিস, চাঁদু।

বাবা! দেখিস তুই!

www.BanglaBook.org

বাদাম পাহাড়ের যাত্রী

বাংরিপোসির বাংলোর অন্ধকার বারান্দাতে পাশাপাশি ওরা দুজনে বসেছিলো। লোডশেডিং হয়ে গেছে। কলকাতা থেকে বিকেল বিকেল এসে পৌঁছেছে এখানে।

সরোজ বলল, দুসস শালা। লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাতেও চাঁদ হাপিস।

আকাশ বোধহয় ওর কথা শুনেই রেগে গেল। এতক্ষণ মেঘ ছিল, এবার বৃষ্টিও নামলো। দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়লো। মাটি থেকে গন্ধ উঠল সোঁদা। সোঁদা হঠাৎই।

এবং প্রায় সেই সঙ্গেই একেবারে ওদের গায়ের পাশেই এক লম্বা ছায়ামূর্তি দেখে ওরা দুজনে একই সঙ্গে চমকে উঠলো।

ভদ্রলোক কখন এলেন, কিসে করে এলেন, কিছুই বোঝা গেলো না। তাঁর পায়ের আওয়াজ পর্যন্ত পায়নি ওরা। যেন ভুঁই-ফোঁড়।

কাঁধে একটা ছোট্ট ব্যাগ। হাতে টর্চ। বোধহয় হেঁটে এসেছেন, দূরে কোথাও বাস বা ট্রাক থেকে নেমে। লম্বা সৌম্য চেহারা; মাথাভর্তি কাঁচা-পাকা চুল। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। ওদের দুজনের প্রায় কানের কাছে দাঁড়িয়েই চড়া-গলায় ভদ্রলোক বললেন, চৌকিদার কোথায়?

সরোজ, মূর্তিটি ভূত-টুত নয়, সে সম্বন্ধে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হয়ে আশ্বস্ত হল।

বললো, চৌকিদারের ঘর ওইদিকে।

ঘর বুঝি খালি নেই?

তা জানি না। আমরা দুজন তো একঘরেই আছি। অন্য ঘরের কথা চৌকিদারই বলতে পারবে। ওর ঘর ঐদিকে। বলে, ঘরটা আঙুল দিয়ে দেখালো সরোজ।

ও।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে হেঁটে চৌকিদারের ঘরের দিকে চললেন

www.BanglaBook.org

ভদ্রলোক।

বিমল স্বগতোক্তি করল, কানে বেশ কম শোনে রে। একটু হেলপ কর, সরোজ, পার্টিকে।

সরোজ উঠে, চৌকিদারের ঘরের দিকে গেলো।

ইতিমধ্যে অঝোরে বৃষ্টি নামল। যে বিশাল ঝুরি ছড়ানো গাছটা বাংলোর ডানপাশে একেবারে পঞ্চবটীর মতো ছেয়ে আছে তার উড়াল পাতা উথাল-পাতাল করে একটু পরেই যেন প্রলয় এল সশরীরে। যেমন বৃষ্টি, তেমনই ঝোড়ো হাওয়া।

বিমল বিরক্ত হয়ে ঘরে গিয়ে বসল গা বাঁচাবার জন্যে। বছরের এই সময়ে এরকম থার্ডক্লাস ব্যাপার হবে জানলে, কোলকাতা থেকে ওরা দুজন বেরুতই না। তাস খেলত ছুটিতে।

সরোজ ফিরল অনেকক্ষণ পরে। বললো, পুরো ব্যাপারটাই কেমন হেঁয়ালি ঠেকছে।

কেন?

পার্টি নাকি আসছে বারিপাদা থেকে বাসে। বললো, কাল যাবে সিমলিপালে। সেখান থেকে বড়াইপানি।

বিমল বললো, বড়াইপানি? সেটা আবার কি ব্যাপার?

কী ঘোড়ার ডিম ফলস-মলস আছে নাকি। যত্ত সব!

বিমল আবার বললো, কিন্তু জিপ ছাড়া এ পার্টি যাবে কি করে? সিমলিপাল ন্যাশনাল পার্কে বাস বা গাড়ি নিয়ে যাওয়া মুশকিল। আমি তো ন্যাশনাল পার্ক-ফার্কের খোঁজখবর একটু আধটু রাখি।

সরোজ বললো, সেই কথাই তো বলছিলাম পার্টিকে। এখানে একজন অথরিটি বসে আছে। ইচ্ছে করলে কনসালট করতে পারেন।

বিমল একটু ফুলে উঠে বললো, তা শুনে কি বললো?

কিছুই বললো না। শুনতে পেলো কি না তাই বা কে জানে? মরুকগে যাক।

দুজনেই চুপ করে বাইরের ঝড়-বৃষ্টির আওয়াজ শুনল কিছুক্ষণ।

সরোজ বলল, কেচাইন করল মাইরি। কী দুযযোগ।

বিমল কথা ঘুরিয়ে বলল, পার্টি রাতে খাওয়া-দাওয়ার কি করবে? এ বাংলোতে তো খাওয়া-দাওয়ার কোনো বন্দোবস্তই নেই। বলেছিস সে কথা। খিচুড়ি খেতে বল না। আমাদের জন্যে তো হচ্ছেই। ভাগাভাগি করে খেয়ে নেওয়া যাবে। ওর কাছ থেকে গোটা পাঁচেক না হলেও গোটা তিনেক টাকা মিল বাবদ নিয়েও নেওয়া যাবে।

সরোজ বলল, গুরু! তোমার আগেই ভেবেছি সে কথা। বলা হয়ে গেছে অলরেডি। বলল, "খাব। কিন্তু দাম নিতে হবে।" ক্যালানে। বিনি-পয়সায় খাওয়াচ্ছে কে?

বলল, সাড়ে সাতা টাকা দেবে।

সাড়ে সাত টাকা? এক থালা খিচুড়ি আলু ভাজা আর ডিমভাজার জন্যে? বড়লোকি দেখাচ্ছে?

তোর-আমার কি। দেবে, দেবে। সরোজ বলল, লোকটা ছিটেল আছে। ভালোই হয়েছে। খাদ্য খিচুড়ি, শালার খাদকও খিচুড়ি।

সরোজ বারান্দা থেকে নেমে, ভালো করে উঁকি ঝুঁকি মেরে বলল, একটু একটু করে মেঘ কাটছে। এমন চললে, এক ঘন্টার মধ্যে আকাশ কিলিয়াড় হয়ে যাবে মনে হয়। চল, চান টান করে আমরা তৈরি হয়ে নিই। লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাতে এমন জায়গায় এসে একটু

www.BanglaBook.org

জংগল-লাইফ এনজয় না করলে এলাম কি করতে?

বিমল বললো, চলো, বরাত ভালো থাকলে আজ হাতিও দেখা যেতে পরে। বুঝলি। কাল তো হলো না।

সরোজ বললো, সত্যিই কি দেখতে চাও তুমি গুরু? কিছু কিছু জিনিস আছে, যেমন ধরো, পরীক্ষার রেজাল্ট, বুনো-হাতি, এইসব আমি কিন্তু নিজের চোখে দেখার কোনোদিনই পক্ষপাতী নই।

ওরা চান-টান করে গাড়িতে উঠে রাম-এর বোতল, জলের বোতল আর দুটো গ্লাস নিয়ে যখন বেরোলো, তখন রাত প্রায় আটটা। আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে গেছে। চৌকিদারকে বলে গেলো যে সাড়ে-ন'টা নাগাদ ফিরবে। খিচুড়ি যেন রেডি রাখে। সঙ্গে ডিমভাজা।

বিমল বললো, চল, বাংরিপোসির ঘাট পেরিয়ে বিসোই অবধিই ঘুরে আসি। ঠাণ্ডায় রামটা জমবে ভালো।

হাতি-ফাতি সত্যিই বেরোবে নাতো রে?

চল না তুই। আমি তো আছি। তোর ভয় কি?

তাই-ই তো! ওয়াইলড লাইফের মাস্তানের কথা ভুলেই গেছিলাম। তুইতো W.W.F. এর মেম্বারও। পালামৌর জঙ্গলের অথরিটি। F.R.G.S. হওয়ার জন্যে চেষ্টা চালাচ্ছিস বিস্তরই। সেটা হলে কি হবে র‍্যা! ন্যাজ গজাবে?

মেলা ভচর-ভচর করিসনি। যা বুঝিসনি তা নিয়ে কপচাসনি। এখন বাণিজ্য আছে মাত্র দুটি।

কি কি?

রাজনীতি আর ওয়ালড লাইফ এর এক্সপার্ট। বুঝেছিস!

তাই?

ইয়েস।

বাংলোর গেট থেকে একটু যেতে-না-যেতেই দেখা গেল ঝকঝকে চাঁদের আলোতে একটি প্রকাণ্ড দাঁতাল হাতি এসে রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দু-পাশের ক্ষেত-জাগানিয়া লোকেরা হুঃ হাঃ করে চেঁচিয়ে, পটকা ফাটিয়ে কানে তালা লাগাবার উপক্রম করল। তাতে হাতিটা ভীষণ চটে গিয়ে ওদের গাড়ির দিকেই দৌড়ে এল শুঁড় তুলে।

সরোজ তাড়াতাড়ি হেডলাইট ডিপারে দিয়ে বিমলকে জিজ্ঞেস করলো, কী করব গুরু? শিগগিরি বলো।

তারপর গুরুকে একেবারেই নির্বাক দেখে, ব্যাক গীয়ারে ফেলে বাংলোর গেটের মধ্যে নিয়ে এল গাড়িকে গাঁ-গাঁ করে।

হাতিটা গেটের মুখ অবধি এসে বাঁ দিকের জঙ্গলে ঝোপ-ঝাড় ভেঙে চলে গেলো।

সরোজ ফিসফিস করে তুতলে শুধোল, একলা মা মা-মানেই তো রো-রোগইলিফ্যান্ট? কিরে বিমলে?

বিমল গাড়িটা বাংলোর হাতার মধ্যে ঢুকেছে কি না ভালো করে দেখে নিয়ে বলল, ন-ন-নট নে-নেসেসারিলি!

তারপরই বললো, অত্ত ভয় পাওয়ার কি ছেল?

বাইরে আর না গিয়ে, ওরা ফিরে এল বাংলোতেই। বাংলোর বারান্দায় বসে রাম খেতে

www.BanglaBook.org

খেতে বিমল সরোজকে হাতির বিষয় জ্ঞান দিচ্ছিল।

বেশ কিছুক্ষণ পর তাদের হঠাৎ সেই ভদ্রলোকের কথা মনে হলো।

বিমল বললো, সেই ছিটেল পার্টি কোথায় গেল র‍্যা? কী যে মিসস করল তা নিজেই জানে না!

সরোজ বলল, ছেড়ে দে। কানে খুবই কম শোনে। বড্ড চেঁচিয়ে কথা বলতে হয়। নইলে, সঙ্গেই নিয়ে যেতুম।

সরোজ বললো, ভর সন্ধেতে ঘুমোচ্ছে নাকি? দ্যাখ, মেয়ে-ফেয়ে যোগাড় করে ফেলেছে হয়ত! হেভি় চালু বলতে হবে। ঘর ছেড়ে যে বেরুচ্ছেই না র‍্যা।

তারপর দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, অ্যাই যে স্যার! যাবেন নাকি? ওয়াইল্ড ইলিফ্যান্ট দেখতে?

বিমল বলল, মুখ্যু। ইলিফ্যান্ট নয়; এলিফ্যান্ট।

সরোজ বলল, বুঝবে তো। তাহলেই হল!

ভিতর থেকে কোনো সাড়াই দিল না কেউ।

সরোজ স্বগতোক্তি করল, কোথায় ভ্যানিস হয়ে গেল? যাঃ বাব্বা!

আধঘন্টা পর ওরা আবার বেরুলো। ওরা আবারও বাংরিপোসির ঘাটের কাছে এসেছে, এমন সময় ফুটফুটে চাঁদের আলোয় হাতির একটি ছোট্ট দলকে নামতে দেখল ঘাট থেকে। বিমল বলল, এই সেরেছে।

কিন্তু, হাতিগুলো ঘাট থেকে নেমেই বাঁ দিকের জঙ্গলে ঢুকে এগিয়ে গেল কানচিনডা বাংলো যেদিকে, সেদিকে। এদিকের ধানের স্বাদ বোধ হয় তাদের পছন্দ নয়।

চারদিক থেকে আবার হুঃ হাঃ! হুঃ হাঃ! শব্দ উঠলো।

হাতিরা মিলিয়ে যেতে না যেতেই ঘাটের পথ বেয়ে একজন ভুতুড়ে মানুষ পায়ে হেঁটে নেমে আসছে বলে মনে হলো। যেন হাতিদের পায়ে পায়েই। গাড়িটা একটু এগোতেই ওরা হেডলাইটে সেই ভদ্রলোককে দেখতে পেলো।

আতঙ্কিত গলায় সরোজ বললো, হয় ভূত, নয় নির্ঘাৎ পাগল।

বিমল বললো, পাগল নয়, উন্মাদ। ইডিয়ট।

সরোজ বলল, পায়ে হেঁটে, একা রাতের বেলা এইরকম জায়গায় ওস্তাদি করে? লোকটার কি হাতির নাতি খেয়ে নাড়ু হয়ে যাবার ইচ্ছে নাকি, বল তো বিমলে? তুই তো এসব বিষয়ে অথরিটি! লোকটা কি আত্মহত্যা করতে চায়? তা, নাড়ু হয়ে মরার দরকার কি? কত সোজা রাস্তাই তো ছিলো।

বিমল, ওয়াইল্ড-লাইফ নিয়ে পড়াশুনো করে। মাসে মাসে ওর বাড়িতে ম্যাগাজিন আসে। তার গাড়িতে পাণ্ডা ভাল্লুকের সবুজ ছবি সাঁটা। ওয়ার্লড ওয়াইল্ড-লাইফ ফান্ডের লাইফ মেম্বার হয়েছে ও থোক টাকা দিয়ে। ও বিজ্ঞের মত স্বগতোক্তি করল; গাড়ল।

সরোজ গাড়ি থামিয়ে, হেডলাইট নিবিয়ে দিলো।

ভদ্রলোক কাছে এলে, আবার হেডলাইট জ্বালিয়ে দিলো। ওরা এই প্রথম ভালো করে, আলোয় দেখল ভদ্রলোককে। ট্রাউজারের মধ্যে শার্ট গোঁজা। হাতা-গোটানো শার্টের। টানটান শালগাছের মতো ঋজু চেহারা। সারা গা-মাথা-জামা-কাপড় বৃষ্টিতে একেবারে চুপচুপে ভেজা।

সরোজ মুখ বাড়িয়ে বললো, চলুন দাদা, আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি বাংলোতে। করেছেন

www.BanglaBook.org

কি? জ্বর হবে য্যা! এই কার্তিক মাসের বৃষ্টি!

ভদ্রলোক উত্তরে বললেন, কালকেই চলে যাবো।

সরোজ গলা চড়িয়ে বললো, পায়ে হেঁটে এমনভাবে হাতির পেছনে পেছনে রাতের বেলা কেউ পাহাড় থেকে নামে? আপনি কি সাহস দেখাচ্ছেন? তুলে আছাড় মারলে কি হতো একবার ভাবলেন না দাদা? ঘরে কি কেউই নেই? বে-থা করেননি?

ভদ্রলোকের কানে বোধহয় কথাগুলো পৌঁছলো না।

উনি একবার আকাশের দিকে তাকালেন। তারপর দূর পাহাড়ের রাত-চরা পাখি-ডাকা রহস্যময়তার দিকে এবং জ্যোৎস্না-পিছলে যাওয়া ধানক্ষেতের দিকে একটুক্ষণ চুপ করে থেকেই, ডান হাতটি তুলে যেন অন্য কোনো সুন্দর রহস্যময় গ্রহ থেকে বললেন, আঃ এই পৃথিবী কী সুন্দর! সবকিছুই কী সুন্দর এখানে। না?

তারপর বললেন, গাড়ি থেকে নামুন না। এইভাবে কি কিছু দেখা যায়? গাছপালা, পাখি, প্রজাপতি, এমনকি মানুষও? নিজের পায়ে চলে চিনুন এই জঙ্গল পাহাড়কে, দিনে রাতে। দেখবেন কত তফাৎ। কী আশ্চর্য সুন্দর! সব কিছু!

সরোজ গলা নামিয়ে বললো, এ দেখি উলটে জ্ঞান দিচ্ছে র‍্যা!

বিমল গাড়ি থেকে নেমে, চেঁচিয়ে বললো, রাত সাড়ে-ন'টায় ফিরব আমরা। খিচুড়ি খাব। আপনার তাড়া থাকলে আপনি খেয়ে নেবেন আগে।

ভদ্রলোক বোধহয় শুনতে পেলেন না।

সরোজ চেঁচিয়ে বললো, বুঝলেন তো!

ভদ্রলোক বললেন, আমি কাল ভোরেই চলে যাব। থাকব না। যাত্রী আমি।

বলেই, বাংলোর দিকে পা বাড়ালেন।

গাড়িটা ছপছপে চাঁদের আলোয় নিচের রাস্তার উপর রেখে ওরা রাম খেতে লাগল। একটা সাপ ডানদিকের ধানক্ষেত থেকে উঠে রাস্তা পেরিয়ে বাঁ দিকের ধানক্ষেতের দিকে যেতে লাগল আস্তে আস্তে।

বিমল আতঙ্কিত গলায় বললো, রাসেলস্ ভাইপার।

সরোজ বললো, তোর মুণ্ডু! জল-ঢোঁড়া। গাড়ি চাপা দিয়ে দেখাব তোকে?

বিমল বললো, ছিঃ ওয়াইলড্ লাইফ। তোরা নাঃ!...

দূরের গাছ থেকে হঠাৎ পেঁচা ডেকে উঠলো, দুরগুম দুরগুম দুরগুম করে।

সরোজ বললো, আর দেকতে হবে নারে বিমলে। অ্যাইবারে এক্কেবারে রমরমা যাবে হাওড়ায়, তোর ঢালাইয়ের কারবারে। নক্কীপুজোর রাতে নক্কীপেঁচা ডাকছে। আর দ্যাকে কে?

॥ ২ ॥

ভদ্রলোক যে কোন ভোরে উঠে চলে গেলেন!

ঘুম থেকে যখন উঠল ওরা, তখন প্রায় আটটা বাজে। অশ্বত্থের ফল পেকেছে, লাল লাল। বাঁ পাশে ক্ষীরকুঁড়ি গাছ। পাখির মেলা বসেছে যেন।

চৌকিদার গুর্বা সিং বললো, ভদ্রলোক ঠিক সাড়ে চারটেতে রাত থাকতে উঠে, চান করে তৈরি হয়ে, প্রথম বাসেই চলে গেছেন যোশীপুরের দিকে।

বিমলরাও আজ যোশীপুরে যাবে। ঠিক করেছে, কোনো ভালো বাংলো-ফাংলো না

www.BanglaBook.org

পেলে আবার ফিরে এসে থাকবে এখানেই। এ জায়গাটায় ভালো ডানলোপিলো আছে, ইলেকট্রিসিটি আছে। কিন্তু খরচও ভালো। ঘর ভাড়াই দিনে পঁচিশ টাকা।

সকালটা শুয়ে-বসে আলসি করে, অনেক কাপ চা খেয়ে ওরা কাটিয়ে দিল। দুপুরে ডিমের কারি দিয়ে ভাত খেল। এ হতভাগা জায়গায় মাছ পাওয়া যায় না মোটে।

বিকেল বিকেল পথে বেরিয়ে বিমল বললো, কত গচ্চা গেল র‍্যা? ম্যানেজার?

সরোজ বললো, যাইই যাক, পাঁচশ ক্রেডিটে আছি এখনও। বুঝলে, গুরু।

মানে?

বিমল সরোজের দিকে ফিরে শুধোল।

ফ্রিজের সঙ্গে যে স্ট্যাবিলাইজারটা লাগানো ছিল ঘরে, সে যন্তরকে ঝেঁপে দিয়ে বেডিং-এ পুরে নিয়েছি। কোলকাতায় দাম সাড়ে-সাতশ টাকা।

বিমল বললো, এই নইলে ম্যানেজার! গাড়িতে ঘুরতে অনেক খরচা; অথচ গাড়ি ছাড়া ঘোরাও যায় না। অন্তত ভদ্রলোকেরা পারে না।

ওরা অনেকক্ষণ হল বিসোই পেরিয়ে এসেছে। মানাদার বাংলোয় জায়গা পেলো না। মানাদা থেকে অনেকখানি এসেছে। সন্ধে হয়ে এসেছে। উঁচু মালভূমি মত জায়গাটা। বিসোই-এর পর থেকেই বিমল বার বার বলছিল, আট্টু গেলেই যোশীপুর; আট্টু গেলেই যোশীপুর।

সরোজ বললো, গুরু! আর কত আট্টু যেতে হবে?

বিমল জবাব না দিয়ে অথরিটির মত বলল, এসব জায়াগায় যে-কোনো জানোয়ার যখন তখন বেরিয়ে পড়তে পারে, বুঝলি। এখন কথা বলিসনি, ভালো করে গাড়ি চালা। দু-পাশের জঙ্গল দ্যাখ।

সরোজ বললো, জঙ্গল আমি দেখতে গেলে, তোমাকে যে গর্ত দেখবে গুরু! আমি যে গাড়ি চালাচ্ছি।

অনেক হয়েছে। সামনে তো অন্তত দেখতে পারিস।

তা তো দেখছিই!

সরোজ এদিকে-ওদিকে তবু একবার তাকাল। বোঝবার চেষ্টা করলো, ওকে অনভিজ্ঞ জেনে বিমল গুল মারছে কি না। কিন্তু কোনো জানোয়ারই বেরুল না। এদিকে দেখতে দেখতে অন্ধকারও হয়ে গেল।

ঘন অন্ধকার। দুপাশেই জঙ্গল ও পাহাড়। সরোজের গা ছম-ছম করতে লাগল। বিমলের কথা আলাদা। ও জঙ্গলের অথরিটি।

এবারে মনে হলো, বোধহয় যোশীপুরের খুবই কাছাকাছি এসে পড়েছে ওরা। গা ছমছম ঘন জঙ্গল আর পাহাড়ের মধ্যে মধ্যে একেবারে নির্জন রাস্তা। চাঁদ উঠেছে। জনমানব তো দূরের কথা, গাড়ি ঘোড়ারও চিহ্নমাত্র নেই।

হঠাৎই ওদের গাড়ির হেডলাইটের আলোয় ওরা দেখলো রাস্তার বাঁ-ধার ঘেঁষে একজন লোক চলেছে। একটু ঝুঁকে। যোশীপুরের দিকেই। লোকটা যেন বাঁ দিকের জঙ্গলের সুঁড়িপথ দিয়ে বেরুল মনে হলো।

ডেঞ্জারাস। ডাকাত-ফাকাত নয় তো?

বিমল বললো।

কাছাকাছি আসতেই সরোজ চেঁচিয়ে উঠলো, এ-যে সেই-ই র‍্যা! সেই-ই মাল!

www.BanglaBook.org

বিমল বললো, কি বলবি বল এদের? বন-জঙ্গল ওয়াইলড লাইফ সম্বন্ধে কোনোই জ্ঞান নেই লোকটার। পৈত্রিক প্রাণই চলে যাবে নির্ঘাৎ কোনোদিন। ইডিয়ট!

সরোজ গাড়ি দাঁড় করালো।

বিমল মুখ বের করে বললো, অ্যাই যে, আমরা সেই বাংরিপোসির খিচুড়ির পার্টনার! দাদা! এখানে কেউ রাতের বেলা এমন একা একা হাঁটে। বনজঙ্গল সম্বন্ধে কিছুমাত্র না জেনে মশাই, আপনি না...

তারপরই ভদ্রলোককে কিছুমাত্র বলার সুযোগ না দিয়েই আবার বললো, জানেন? আমি কত সেমিনার অ্যাটেন্ড করি। কত পড়াশুনো করি এসব বিষয়ে। তবু আমিও... আর আপনি...মানে, ভাবা যায় না, ভাব্বাই যায় না।

তারপর গলা আরো চড়িয়ে বললো, বুঝলেন! ভাবা যায় না।

সরোজ গাড়ির পিছনের দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে দিয়েই বললো, অনেক তো হয়েছে। এবার মানে মানে উট্রে পড়ুন। আমরা যোশীপুরেই যাবো।

ভদ্রলোক কথা না বলে বাঁ হাতের এক ঠেলায় দরজাটা ধপ করে বন্ধ করে দিলেন।

সরোজ বললো, সঙ্গে টর্চ পর্যন্ত নেই একটা। এখন চাঁদও তো দেখছি তেমন জোর হয়নি। নাঃ, রিয়্যালি!

ভদ্রলোক হাসলেন। কাঁচাপাকা চুলে আর পুরু চশমার কাচে ভদ্রলোককে এই বিখ্যাত সিমলিপালের জঙ্গলের চেয়েও রহস্যময় বলে মনে হলো ওদের দুজনেরই।

বিমল কী যেন বলতে গেলো।

ভদ্রলোক চেঁচিয়ে বললেন, পাওয়ার বেশি হলেও, চোখে আমি ভালোই দেখি।

তারপর বললেন, জানেন, এই রাতের জঙ্গল কথা বলে, হাঁটে, অপূর্ব! অপূর্ব! গায়ে কাঁটা দেয়, ভালোলাগায়। কখনও কান পেতে শোনেননি বুঝি?

তারপরই বললেন, আচ্ছা! হেমন্তর রাতের বনের গায়ের গন্ধ নিয়েছেন নাকে কখনও? নেননি? কোথায় লাগে আতরের গন্ধ! আসুন। নেমে পড়ুন। আমার সঙ্গে হেঁটে হেঁটে চলুন। অপূর্ব! আঃ!

বলে, নিজেই নাক ভরে নিঃশ্বাস নিলেন।

ভদ্রলোক নিজে কানে কম শোনেন বলে কথাগুলো খুব জোরে জোরে বললেন।

কথাগুলো দুপাশের জঙ্গলে আর কালো পাথর-ভরা পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে চারদিকে গমগম করে উঠল। ওদের কাছে ফিরে এল।

সরোজ গলা চড়িয়ে বললো, আপনি যাচ্ছেন না তাহলে আমাদের সঙ্গে?

ততক্ষণে উনি একটু এগিয়ে গেছিলেন। রাস্তার একেবারে মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু-হাত তুলে ভদ্রলোক হাসলেন। জোড়া-হেডলাইটে ওঁর ছায়াটা পড়ল সামনে লম্বা হয়ে। ওদের যাবার পথকে প্রায় অন্ধকার করে দিয়ে।

বললেন, নিশ্চয়ই যাবো। আবার কাল ভোরেই বেরোব।

কোতায়?

সরোজ চেঁচিয়ে জিগগেস করলো।

বাদামপাহাড়।

বিমল বললো, চল চল, আর দেরী করিসনি। রাতে কোতায় থাকব, বাংলো খালি পাব কি না? তাতে ডানলোপিলো আছে কি নেই? ইলেকট্রিসিটি আছে কি নেই? সবই অজানা। যেতে হবে, চান করতে হবে, খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। যত্ত সব পাগলের

www.BanglaBook.org

কারবার।

সরোজ গাড়ির অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিলো।

ভদ্রলোককে প্রথম চাঁদের নরম দুধলি অন্ধকারের জঙ্গলে ফেলে ওদের গাড়ি গোঁ-গোঁ করে এগিয়ে চললো।

বিমল বললো, হ্যাঁ রে ওষুধপত্র সব আছে তো? না শেষ?

সরোজ বললো, সব আছে গুরু। এখন শুধু তুমি আর চাঁদ ঠিক থেকো। পুরো দু-বোতল রাম আছে এখনও। না হলে আর ম্যানেজারি করলাম কি?

চড়াই উঠতে উঠতে গীয়ার বদলাতে বদলাতে অন্যমনস্ক গলায় সরোজ বললো, লোকটা এই অন্ধকারে, এই পথ দিয়ে, পায়ে হেঁটে আসবে কি করে র‍্যা? আমার তো শালা এপথে গাড়িতে যেতেই ভয়-ভয় করছে।

বিমল বললো, তুই আমার সঙ্গে একটু-আধটু সেমিনারে-টেমিনারে ঘোরাঘুরি কর। তোরও ভয় ভেঙে যাবে। আসলে ভয়ের কিছুই নেই জঙ্গলে! ভয়টা আমাদের মনে।

এমন সময় একজোড়া জুলজুলে চোখ জ্বলে উঠল পথের ডানদিকের জঙ্গলে, হেডলাইটের আলোতে।

বিমল কাঁপা-কাঁপা গলায় ভীষণ ভয় পেয়ে বললো, টাইগার! প্যানথেরা টাইগ্রিস! টাইগ্রিস! সরোজ! সাবধান! দাঁড়া!

সরোজ ব্রেক করে গাড়িটা দাঁড় করালো। বেশ ঝাঁকুনি লাগল দুজনেরই।

ফিসফিস করে বললো, কী গুরু? খৈরির কাজিন না কি?

বিমল অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে স্টিয়ারিং-ধরা সরোজের হতে চিম্‌টি-কেটে বললো, সব সময় ইয়ার্কি ভালো লাগে না।

ইতিমধ্যে খেঁকশিয়ালটা পথের ডানদিকে থেকে বাঁদিকে এক দৌড়ে রাস্তা পেরোল।

বিমল বলল, টাইগার নয়, হায়না। না, না, উলফ্‌। উঃ!

সরোজ বললো, থাম তো! মেলা ভ্যাচোর ভ্যাচোর করিস না! আমাদের মামাদের হরিপালের বাঁশঝাড়ে এ মাল কত্ত আছে। এ তো শেয়াল! খ্যাঁকশেয়াল।

বলেই, গাড়ি আগে বাড়ালো।

বিমল তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে বললো, আমি কেবল ঐ পাগলটার কথা ভাবছি। সেই ভোরে বেরিয়ে এসে কোনদিকে যে গেলো? বড়াইপানি না মাঝাইপানি, না ছোটাইপানি রাতে কোথায়ই বা থাকবে যোশীপুরে তা ভগবান-ই জানেন। কতরকমের পাগলই যে আছে এই দুনিয়ায়!

সরোজ বললো, কোতায় যাবে বললে যেন কাল? কাঠাম পাহাড় না গাদাম-পাহাড়?

বিমল বললো, দুসস! বড় উল্টোপাল্টা বলিস তুই! বাদামপাহাড়!

সেখানে কি আছে র‍্যা? কাজু বাদামের ঝাড়?

সরোজ শুধোল।

বিমল বললো, কে জানে? কিছু নিশ্চয়ই আছে। পাগলই জানবে।

তারপর হঠাৎই বললো, পাগলটা কি বলছিল র‍্যা? হেমন্তর বনের গায়ের গন্ধ না কি যেন?

সরোজ ফিচিক করে হাসলো।

বলল, শালা গন্ধ গোকুল! আমাদের পাড়ার হেমন্তর বোনের গায়ের গন্ধ হলেও না হয় বুঝতুম!

www.BanglaBook.org

শান্তকে পাওয়া যাচ্ছে না

আজ অফিসে খুব খাটুনি গেছে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে আটটা। ফিরেই রাণুকে বললাম, ঠাকুরকে বলো, যা হয়েছে তাই-ই দেবে। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। খেয়েই ঘুমোব।

রাণু বললো, আজ ন্যাশনাল প্রোগ্রাম আছে। ভীমসেন যোশীর গান শুনবে না?

বললাম, তুমি বরং বাইরের ঘরে বসে শোনো। আমার ভীষণ ঘুম পেয়েছে।

গাঢ় ঘুমের মধ্যে কেউ ডাকলে প্রথমে কিছুই বোঝা যায় না। অচেতন থেকে অবচেতনে, অবচেতন থেকে চেতনে আসতে মস্তিষ্ক অনেকখানি সময় নিয়ে নেয় তখন।

চোখ মেলে দেখি, রাণু আমার মুখের উপর ঝুঁকে আছে। মুখে উদ্বেগের সঙ্গে অপরাধের ছাপ।

বললো, শুনছ! দিদি এক্ষুনি ফোন করেছিলো, শান্তকে পাওয়া যাচ্ছে না।

বলেই, অপরাধের গলায় বললো, তোমাকে তুলতে হল কাঁচা ঘুম থেকে।

ততক্ষণে আমি উঠে বসেছি। আমার মা-বাবা অনেকদিন হলই চলে গেছেন। দিদি-জামাইবাবুই আমাদের সব। আমরা আজ যে কোনোরকমে পায়ে দাঁড়িয়েছি, আমি ও পিন্টু, রাণু যে আমার ঘরে এসেছে, এ সবের পেছনেই দিদি। তাই দিদির ছেলে শান্তকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এখবর জানার পরও আমাকে না-জাগালে রাণুর উপর রাগই করতাম।

পায়জামা গেঞ্জি পরেই বাইরের ঘরে এসে ফোন করলাম।

ডায়াল ঘোরাবার সময়েই রাণু বললো, প্রফেসারের বাড়ি গেছিল পড়তে, সেখানে থেকে ফেরার কথা ন'টায়। এগারোটা বেজে যেতে, দিদি খুবই চিন্তা করছেন। জামাইবাবুও এখানে নেই। পাটনা গেছেন, মামলা নিয়ে।

দিদিই ফোন ধরলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি বললাম, পুলিস, হাসপাতাল এসবে খোঁজ করেছো?

দিদি বললো, ওর সব বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনদেরও ফোন করে দেখলাম কারও বাড়ি গেছে কিনা। কোথাও নেই। মাস্টারমশায়ের বাড়িতেও কানুকে গাড়ি দিয়ে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বললেন, সাড়ে আটটাতে বেরিয়ে গেছে অন্য দুজনের সঙ্গে। রতনও তো কলকাতায় নেই। আমি জানি না, কিছু ভাবতে পারছি না। তোরা যা ভাল মনে করিস, কর এসে।

রতনদা দিদির দেওর। রতনদাও কলকাতায় নেই। দিদির বাড়ি পৌঁছে রতনদার শালা ছবুকে নিয়ে আমরা সব ক'টা হাসপাতালে খোঁজ করলাম দক্ষিণের। তারপর থানায় গেলাম।

ও সি ছিলেন না। যিনি ছিলেন, তিনি টেবলের উপর পা তুলে, বুড়ো আঙুল আর মধ্যমার মধ্যে সিগারেট ধরে গাঁজার মতো টান দিচ্ছিলেন।

আমাদের শান্তু যে হারিয়ে গেছে তা নিয়ে আমাদের উত্তেজনা ও উদ্বেগের শেষ ছিল না। কিন্তু ভদ্রলোক নির্বিকার।

পা নামিয়ে বললেন, বসেন বসেন। পোলায় করে কি?

ছবু বললো, এবার প্রি-ইউ দেবে।

প্রি-টেস্ট কেমন দিছিল? আমার ছোটটাও দিতাছে প্রি-ইউ এইবার।

ফল ভালো করেনি। আমি লজ্জিত গলায় বললাম।

ভদ্রলোক কান খোঁচাতে খোঁচাতে বললেন, বুঝছি! চিন্তার কোনোই কারণ নাই। খামোখা দৌড়াদৌড়ি কইর্য়েন না। বাড়ি যাইয়া ঘুমান। ভয়ের কিছুই নাই। পোলায় আপনেই আইস্যা পড়বখন।

ছবু উত্তেজিত হয়ে বললো, আপনি তো বেশ ক্যাজুয়ালি নির্বিকারভাবে কথা বলছেন। আমরাই বুঝছি আমাদের কী হচ্ছে!

উনি নিরুপায় গলায় বললেন, আমাগো বিকার কি ভালো? আমাগো উত্তেজিত হওন শোভা পায় না! আমরা হইলাম গিয়া এক্‌জিকিউটিভ।

বলেই, খাতাটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, একখান ডাইরী লিইখ্যা দিয়া বাড়ি গিয়া ঘুমান দেহি।

ছবু উত্তেজিত হয়ে বললো, আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই?

উনি নিরুত্তাপ গলায় বললেন, বিলক্ষণ আচ্ছা! আপনাগো একটাই ছাওয়াল। আর আমাগো ছাওয়াল অনেক। মিনিটে মিনিটে হারাইতাছে।

আমরা বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলাম।

দারোগাবাবু ঘুমোতে বললেই, ঘুমুতে পারলাম না আমরা কেউই। পাটনাতে জামাইবাবুকে ট্রাঙ্ক-কল করলাম। জামাইবাবু পাটনা হাইকোর্টে মামলা করতে গেছেন। সব শুনে বললেন, আই অ্যাম নট বদারড। কেন পালিয়েছে, তাও আমি জানি। সে বাড়ি ফিরুক আর নাই ফিরুক আমার কিছুই এসে যায় না। সো ফার আই অ্যাম কনসার্নড। হি ইজ ডেড।

আমি বললাম, কি বলছেন আপনি?

জামাইবাবু বললেন, ইয়েস! হি ইজ ডেড।

দিদিকে রিসিভার দিতেই দিদি কেঁদে ফেললো।

www.BanglaBook.org

বললো, ডেড? শান্তু ডেড। ছিঃ ছিঃ। তুমি কি বাবা? না শত্রু?

জামাইবাবু বললেন, শত্রু।

দিদি রিসিভারটা আমাকে দিলো।

জামাইবাবু বললেন, থানায় বলে রাখ পিন্টু, যদি ইডিয়টটাকে পায় তাহলে একদিন আটকে রেখে যেন এমন মার মারে যাতে জীবনে আর পালাবার নাম না-করে। হাড়-গোড় না ভেঙে যত মার মারা যায়, যেন মারে।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, আমাকে তোরা আর বিরক্ত করবি না। কমপ্লিকেটেড মামলা নিয়ে এসেছি। পোলিটিকাল মার্ডার, ম্যাটার পার্ট-হার্ড হয়ে আছে। তিন দিনের আগে আমি ফিরতে পারবো না।

তারপর বললেন, কোর্টের বার-লাইব্রেরির ফোন নম্বরটাও লিখে রাখ। ইডিয়টটা ফিরলেই ফোন করে দিস একটা।

আমি রাণুকে একটা ফোন করে দিয়ে বললাম, সাবধানে থাকতে। ও একেবারে একা আছে বাড়িতে। তখন মনের এমন একটা অবস্থা সকলের যে, মনে হচ্ছিল, রাণুকেও কেউ চুরি করে নিতে পারে। কোনো বিপদ হতে পারে ওর। তখন মনে হচ্ছিল যে, পৃথিবীর সব লোক চোর, বদমাইশ, ছেলেধরা।

ছবু বললো, দিদি, শান্তুর কারো সঙ্গে লাভ-টাভ ছিলো নাকি?

কি যে বলিস? দিদি বললেন। ক্লাস টেন-এ পড়ে।

ছবু বললো, প্রেমের আবার বয়স!

দিদি আহত হলো।

কি আর করবো? আমি তো দিদির ভাই। এখন পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন অনেকেই অনেক কথা বলবে, ভাল-মন্দ। সবই সইতে হবে। শান্তু যে এমন করতে পারে একথা আমিই ভাবতে পারছি না আর তার মা-বাবা কি করে ভাববে?

দিদি বললো, শুনলি তোর জামাইবাবুর কথা? খুনের মামলা করে করে খুনীদের সঙ্গে উঠে-বসে নিজেও খুনী-টুনী হয়ে গেছে। নইলে এমন করে কেউ কথা বলতে পারে। ছিঃ ছিঃ...

পরমুহূর্তেই দিদি বললো, খুনি টুনী নিয়ে কাজ করে তোর জামাইবাবু। কেউ আমার ছেলেটাকে গুম করে, খুন টুন...

বলেই, দিদি মুখে হাত চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

দিদিদের বিরাট ড্রয়িংরুমের বড় গ্রান্ডফাদার ঘড়িটা টিক-টিক করে আওয়াজ করছিলো। রাত দুটো এখন। সময় চলে যাচ্ছে অথচ কিছুই করার নেই আমাদের।

জামশেদপুরে বড়মামা থাকেন, শান্তুর খুব প্রিয় দাদু। সেখানে ফোন করে জানানো হলো। জামাইবাবুর পরের বোন থাকে নাগপুরে। সেখানেও। কটকে থাকেন জামাইবাবুর ছোট বোন, শান্তুর সবচেয়ে কাছের লোক। ছোট পিসী। সেখানেও তাদের কটকচণ্ডী রোডের বাড়িতে ফোন করে বলা হলো আজ একেবারে ভোরে জগন্নাথ এক্সপ্রেস কটক স্টেশনে ঢোকার সময়ই যেন স্টেশনে-সদলবলে সমীর উপস্থিত থাকে। ট্রেন থেকে নামলেই সঙ্গে সঙ্গে শান্তুকে গ্রেপ্তার করে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে যেন আমাদের জানায়।

আজ রাতে শুধু আমরা নয়, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন লোকে বিনিদ্র রাত কাটাচ্ছে।

জামাইবাবুর পরিবারে শান্তুই একমাত্র ছেলে। ওঁদের ভাইবোন সকলেরই মেয়ে। তাই

www.BanglaBook.org

শান্তর বিশেষ আদর ওই পরিবারে। আর আমাদেরও তো একটি মাত্রই ভাগনে।

একমাত্র জামাইবাবুই বোধ হয় ঘুমোচ্ছেন পাটনার এয়ার-কন্ডিশানড পাটলীপুত্র হোটেলে।

ছবু আমাকে বললো, কত টাকা ছিলো রে ওর সঙ্গে।

টাকা?

দিদি আকাশ থেকে পড়লো।

বললো, ওর হাতে কখনও টাকা পয়সা দিই না আমরা। যখন যা দরকার কিনে দিই। টাকা কোথায় পাবে ও?

দিদিকে বললাম, তুমি গিয়ে শোও দিদি। বাড়িতে সেডেটিভ আছে? ক্যাম্পোজ? বা অন্য কিছু? অ্যালজোলাম?

ছবু বললো, হ্যাঁ বউদি যান। শুয়ে পড়ুন। ঘুমের ওষুধ খেয়ে। আমরা তো আছি।

দিদি অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলো আমাদের মুখে। তারপর বললো, তোরা তো এখনো বাবা হোসনি, মা-বাবা হলে একথা বলতে পারতিস না। ওষুধ খেলেই বুঝি ঘুম আসে?

রতনদাকেও বোম্বেতে একটা ফোন করে দিলো ছবু। কোম্পানির কাজে গেছে। গেস্ট হাউসেই উঠেছে।

রতনদা বললো, কালই সব কাজ ফেলে চলে আসব সকালের ফ্লাইটে।

ছবুর দিদি, মানে রতনদার স্ত্রীর একটা মেয়েলি অপারেশান হয়েছে। ছবুদের বাড়িতেই আছে মিলিদি।

আমি আর ছবু ড্রয়িংরুমে বসেছিলাম। টেলিফোনের কাছে। ছবু একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছিল। শান্তর যেসব বন্ধুর বাড়ি ফোন নেই তাদের বাড়ি গেছে কানু গাড়ি নিয়ে। তখনও ফেরেনি।

শান্তটা আমাদের আত্মীয়স্বজনদের যতো ছেলেমেয়ে আছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ছেলে। খুব সুন্দর ছবি আঁকে। অতি মিষ্টি স্বভাব। বিনয়ী, নম্র, ভদ্র। কখনও ওকে কেউ সমবয়সীদের সঙ্গেও ঝগড়া করতে দেখেনি। বড় লাজুক, অন্তর্মুখী ছেলে। বাংলায় এবং ইংরেজিতে খুব ভালো। অঙ্ক আর সায়ান্সের সাবজেক্টগুলো ওর একেবারেই ভালো লাগে না। কিছুতেই ও এঁটে উঠতে পারে না। এর ফলে অত্যন্ত খারাপ রেজাল্ট করেছিল প্রি-টেস্টে। ক্লাস সেভেন থেকেই ক্রমাগত খারাপ রেজাল্ট করে আসছিল।

দিদির ধারণা যে, শান্ত নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল যে, ও কিছুতেই ফাইন্যাল টেস্ট পরীক্ষাতে অ্যালাও হবে না।

দিদি আড়ালে গেলে আমি ছবুকে বললাম, জামাইবাবুর ভয়েই শান্ত বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। খারাপ কিছু ঘটেনি, এমন হলেই ভালো।

ছবু বললো, সত্যিই অদ্ভুত কিন্তু আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থা। ক'টা জিনিস জীবনে কাজে লাগে বল? আর বিষয়েরই বা কী বাহার! ভালো লাগুক না-লাগুক, প্রত্যেক ছেলে মেয়েকেই একগাদা বিষয় গিলতেই হবে। যে ছেলে ইংরেজি-বাংলাতে ষাট সত্তর করে নম্বর পাচ্ছে সে অঙ্ক আর সায়েন্স সাবজেক্টে ফেল করলেই অশিক্ষিত। উল্টোটা হলেও অশিক্ষিত। মরাখাসীর পেছনে করপোরেশনের একটা করে নীল-রঙা যেমন ছাপ থাকে তেমন প্রত্যেক ছেলেমেয়ের পিছনেই একটা করে ছাপ না-মারলে এদেশে কেউই শিক্ষিত হয় না।

www.BanglaBook.org

আমি বললাম, তার উপর এই পলিটিকস। স্কুল-কলেজে-ইউনিভারসিটি সবেতেই পলিটিকস ঢুকে গেছে। দলবাজী হচ্ছে। লেখাপড়ার আর দরকার কি?

ছবু বললো, এসব বলে লাভ কি? আমাদের ছেলে হারিয়েছে বলেই এখন আমরা কনসার্নড। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভাবছি। পরমুহূর্তে ভুলে যাবো। সব জেনেশুনেও আমরা কিছু কি করি? এক পয়সা ট্রামভাড়া বাড়লে এখানে আন্দোলন হয়, গুলি চলে। লেখাপড়ার সর্বনাশ হচ্ছে, ইলেকট্রিসিটি নেই, কেরোসিন নেই, বন্দর বন্ধ, ট্রাম-বাসে ওঠা যায় না, ব্যাঙ্কে কাজ হয় না, রেল চলে না, তবু কিছুই ঘটে না এখানে। অত্যন্ত আন্তর্জাতিক, আঁতেল, সর্বজ্ঞ, সর্বংসহ আজকালকার এই বাঙালিরা। বুদ্ধিজীবি! হাঃ।

এমন সময় ফোনটা বাজলো। এখন রাত তিনটে। জামাইবাবু!

জামাইবাবু বললেন, কি রে? ছোকরা ফিরেছে?

কে? আমি অবাক হয়ে শুধোলাম।

কে আবার? তোমাদের পেয়ারের ভাগ্নে।

বললাম, না।

হুম্‌ম্...ম্। নরাণাং মাতুলক্রমঃ। যেমন সব মামারা, তেমন তো হবে ভাগ্নে। ভাগ্নের আর দোষটা কি?

তারপরই বললেন, ফিরলেই খবর দিতে ভুলিস না। আর শোন দিদিকে দেখিস। ফিট-টিট, হয়েছিলো নাকি? ডাক্তার দত্তর নম্বর জানিস তো? ডঃ রায়কেও ফোন করিস।

আমি বললাম, ঠিক আছে।

তারপর বললেন, তোর দিদিই তো আদর দিয়ে দিয়ে এই অবস্থা করেছে। কি আর বলবো। আমার প্রিন্স অফ ওয়েলস। কারখানার প্রোজেক্ট রিপোর্ট পর্যন্ত হয়ে আছে আর....।

জামাইবাবু ফোন ছেড়ে দিলেন।

আমি বললাম, বুঝলি ছবু, জামাইবাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ছেলে এখনও প্রি-ইউ পাশ করল না, আর এখনই কারখানার প্রোজেক্ট-রিপোর্ট। কারখানার মালিক তাকে করবেনই উনি!

তারপর বললাম, ছবু, তুই এবার বাড়ি যা। ওরা চিন্তা করছে। মিলিদি তো বটেই! ফোনটাও তো খারাপ তোদের, নইলে তো চিন্তার ছিলো না কিছু।

ছবু ফুঁসে উঠে বললো, ফোনটা কি আজকে খারাপ। গত একমাস থেকে। পঞ্চাশবার ফোন করেছি অফিস থেকে, চিঠি লিখেছি, কে গ্রাহ্য করে? টেলিফোন অফিস থেকে একটা লোক ধরে এনে কিছু টাকা দিই যদি সঙ্গে সঙ্গে ফোন ঠিক হয়ে যাবে। তারপর বললো, তা আমি দিচ্ছি না। করাপশন সাপোর্ট করি না আমি। কাজ কে করে এখানে?

আমি বললাম, তুই মরগে যা! তোর ফোন জীবনেও ঠিক হবে না।

॥ ২ ॥

রতনদা সকালের ফ্লাইটেই এসে পৌঁছেছিলেন। বাড়ি ভর্তি আত্মীয়সজন, বন্ধুবান্ধব। কলকাতার বাইরে যেখানে যেখানে খবর দেওয়া হয়েছিলো সব জায়গা থেকে ঘনঘন ফোন আসছে।

জামাইবাবু নিজেও কাল রাতে খবর পাওয়ার পর থেকে পাঁচবার ফোন করেছেন।

www.BanglaBook.org

বলেছেন, পাটনা থেকে লাইন পাওয়া সোজা। ভাবলাম, তোরা যদি চেষ্টা করে আমাকে না পাস।

অফিস থেকে দুপুরে ফিরে সোজা দিদির বাড়িতেই গেছিলাম। রাণুকে পাঠিয়ে দিয়েছি ওর মায়ের কাছে। রাণুর বিশেষ-খবরটা কেউ জানে না। এমনকি রাণুর মাকেও জানায়নি রাণু। অবশ্য শিওর না হয়ে জানাতে চাইও না আমরা কাউকেই। কাল ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। ডাক্তার কনফার্ম করলে তারপর ওর মা এবং দিদিকে জানানো হবে। কিন্তু যা অবস্থা দিদির বাড়িতে, তাতে আমাদের আনন্দ-টানন্দ সব শুকিয়ে গেছে।

আমি চা খেয়ে, ভিতরের একটা ঘরে শুয়েছিলাম একটু।

এমন সময় ছবু দৌড়ে এসে বললো, এই, বড়দা এসেছেন।

জামাইবাবু চলে এসেছেন পাটনা থেকে। এসেই, সোজা শান্তর ঘরে গেছেন।

শান্তর ঘরের দেওয়াল নানারকম স্টিকারে ভর্তি। ওর নিজের আঁকা ছবি আছে কয়েকখানা বই-পত্র ছড়ানো। ক্রিকেটের ব্যাট ও উইকেট। রেকর্ডপ্লেয়ার। মেহেদি হাসান আর পপ মিউজিকের এল-পি। টানা-খোলা ওয়াড্রোব থেকে ওর জিনস ঝুলছে, তালিমারা। পায়জামা-পাঞ্জাবি। জুতো। এদিকে ওদিকে। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির জার্নাল।

শান্ত ছেলেটা খুব অ্যাডভাঞ্চারাস। একবার আমার সঙ্গে সিমলিপালের জঙ্গলে গেছিল। খুব সাহসীও। পাশের বাড়ির হিতেনবাবু বলেছিলেন।

আমি জামাইবাবুর পিছনে দাঁড়িয়েছিলাম।

অনেকক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে ঘরটার দিকে তাকিয়ে থেকে পিছন ফিরেই জামাইবাবু যেন নিজের মনেই বললেন, হোয়াট ফর? কিসের জন্যে? আমার কাজ, আমার দৌড়ে-বেড়ানো, এসব কার জন্যে? সব তো ওরই জন্যে। আর দ্যাখ, এই ছোকরা! হাইট অফ আনগ্রেটফুলনেস!

একটা একটা করে ঘন্টা যাচ্ছে আর আমাদের হুতাশা বাড়ছে। চিন্তা বাড়ছে। চুপ-চাপ হয়ে ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছি আমরা।

দিদি অত্যন্ত উতলা ছিলো কাল রাত্তির থেকেই। কিন্তু হঠাৎ-ফিরে আসা জামাইবাবুর চোখে সে কি দেখেছিলো তা দিদিই জানে। জামাইবাবুকে দিদি যতখানি বোঝে, ততখানি আমরা কি করে বুঝবো? কিন্তু এখন দিদি শক্ত ও শান্ত হয়ে গেছে। ওঁকে দেখে, মনে হয় খুউব ভয় পেয়েছে। শান্তর কারণের চেয়ে জামাইবাবুর কারণেই বেশি। মহীরুহকে ভূলুণ্ঠিত-করা ঝড়ের আগে প্রকৃতি যেমন থমথম করে, এ বাড়ির পরিবেশ তেমনই।

আমরা সকলে, এমনকি দিদিও আস্তে আস্তে কথা বলছি ও বলছে। দিদির জন্যে ডাক্তার ডাকার দরকার হয়নি। কিন্তু দিদির কথামত আমি জামাইবাবুর জন্যেই একবার ডাঃ ভৌমিককে আসতে বলেছি। এও বলে দিয়েছি যে, উনি যেন বুঝতে না দেন জামাইবাবুকে কোনোমতেই যে, আমরা ওঁকে ডেকেছি। যেন এ-পাড়ায় এসেছিলেন কোথাও, হঠাৎই ঘুরে গেলেন আমাদের বাড়ি থেকে!

না। কোনো খবরই নেই। এখন রাত আটটা। চব্বিশ ঘন্টা হতে চললো। এখনও কোনো খবর নেই।

হাইকোর্টের বহুলোক এসেছিলেন। ফোন করেছিলেন। সলিসিটর, কাউনসেলস। একজন জজসাহেবও। অনেক জজসাহেব ফোন করেছিলেন।

কিছু খবর পেলেন?

www.BanglaBook.org

না। এখনও কোনো খবর নেই।

একমাত্র খবর এই যে, খবর নেই।

আমরা সকলেই এবার যে যার বাড়ি ফিরে যাব।

এক এক করে উঠলাম আমরা।

॥ ৩ ॥

পরদিন ভোরবেলা উঠেই রাণুকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেলাম। বেরোবার আগে দিদির বাড়ি ফোন করেছিলাম। আজও কোনো খবর নেই।

রাণুর ইউরিন কালই দিয়ে এসেছিলাম। ডাক্তার রাণুকে পরীক্ষাও করলেন।

রাণু খুব লজ্জা পেয়েছিল।

পরীক্ষার পর ডাক্তারবাবু বাইরের চেম্বারে আমাদের সঙ্গে ফিরে এসে বলেছিলেন, ইয়েস। ইউ আর গোয়িং টু হ্যাভ আ বেবী। "আর" কথাটার উপর খুব জোর দিয়েছিলেন।

ট্যাক্সির পিছনের সিটে বসে আমি রাণুর উরুতে চিমটি কাটলাম।

রাণু, অস্ফুটে বলল, অসভ্য!

আমি বললাম, এবার? সিনিয়র বাই ওয়ান জেনারেশান! কি বলো?

রাণু বললো, ফাজিল।

বললাম, চলো, দিদির বাড়ি যাই। তারপর তোমাকে বাড়ি পৌঁছে অফিস যাবো।

ও বললো, আমি তো মায়ের কাছে যাব।

আমি বললাম, তা যাবে যেও, কিন্তু আমি অফিস থেকে ফেরার আগেই ফিরে এসো। তুমি তো আর আমার একার থাকবে না। একটা দুরন্ত দামাল ছেলে অথবা রিনরিনে গলার মিষ্টি মেয়ে তোমাকে দখল করে নেবে। কেড়ে নেবে, আমার কাছ থেকে। এই ক'টা মাস তোমাকে এক মুহূর্তও হারাতে চাই না আমি।

রাণু বললো, এখন থেকে মার কাছেই থাকতে হবে। মা অনেকদিন আগে থেকেই বলে রেখেছে মশাই। বাবারও তাই ইচ্ছা।

আমি বললাম, একদমই না। তোমার মাকে প্রমিস করে আসব যে, কোনো রকম দুষ্টুমি করব না আমি। লক্ষ্মী ছেলের মত তোমার পাশে চুপটি করে শুয়ে থাকব শুধু। তোমার জন্যে আচার কিনে আনব নানারকম। বড়বাজার থেকে। কিন্তু তোমাকে ছাড়া থাকতে পারবো না। একবারও আদর না-করে কাটিয়ে দেবো এই ক'মাস। দেখো তুমি!

এত অসভ্য না!

বলে, রাণু লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো।

ট্যাক্সি-ড্রাইভার সর্দারজী। বাংলা বুঝছে না ভেবেই কথাবার্তা বলছিলাম।

হঠাৎ ড্রাইভার পরিষ্কার বাংলায় বলল, সোজা যাবো?

রাণু এবার আমার হাঁটুতে জোরে একটা চিমটি কাটলো।

আমি বললাম, সরী।

ড্রাইভার বললো, আজ্ঞে?

আমি আরও ঘাবড়ে গিয়ে, তুতলে বললাম, ডানদিকে।

দিদির বাড়ির সামনে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নামতেই রতনদা দৌড়ে এলো।

www.BanglaBook.org

বলল, পিন্টু, দাদার অবস্থা প্রায় লুনাটিকের মতো।

কী সব বলছেন। পাগল হয়ে গেছেন জামাইবাবু।

রতনদা বললেন, আজ সকালের ডাকে শান্তর একটা চিঠি এসেছে। পরশু রাতে আসানসোল স্টেশান থেকে ড্রপ করেছিল। চিঠিটা পড়ে, কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করছে দাদা। হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বিছানায় গড়াগড়ি যাচ্ছে ছেলেমানুষের মতো। এ দৃশ্য দেখা যায় না। শান্তটা যে কী করলো!

আমি এগোতে এগোতে বললাম, কী লিখেছে শান্ত? চিঠিতে?

রতনদা পকেট থেকে একটা ইনল্যান্ড লেটার বের করে দিলেন।

রাণু, রতনদার সঙ্গে ভিতরে গেল। আমি ড্রয়িংরুমে বসে চিঠিটা খুললাম।

শান্ত লিখেছে :

মা ও বাবা,

আমি তোমাদের যোগ্য হতে পারলাম না।

আমার জন্যে তোমাদের কষ্টের ও অপমানের শেষ নেই। পাশের বাড়ির বুড়ি ক্লাসে প্রত্যেকবার সেকেন্ড-থার্ড হয়। রানী মাসিমার ছেলে, মনাও ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করবে অঙ্ক ও ফিজিক্স-এ লেটার পেয়ে। আর আমি জানি যে, আমি টেস্ট-এ অ্যালাওই হবো না।

আমি তোমাদের অনেক দুঃখ দিয়েছি। কিন্তু তোমরা এটুকু জেনো যে, তোমাদের যতটুকু দুঃখ দিয়েছি, তার চেয়ে অনেক বেশি দুঃখ পেয়েছি আমি নিজে।

আমাকে তোমরা ভুলে যেও। মনে করো যে, আমি মরে গেছি।

সকলের কাছেই বড়লোক হওয়াটা, সুখে-থাকাটাই কিংবা ডাক্তার, উকিল অথবা ভদ্রলোক কেরানী হওয়াটাই একমাত্র ব্যাপার নয়। আমি যা হতে চাই, আমি তাই-ই হবো। আমি ছবি আঁকব। গান গাইব। এবং লেখক হবো।

যদি তা নাই-ই পারি, তাহলে ফুটপাথে পানের দোকান দেবো। অথবা তেলেভাজার। যদি আমার এই পরিচয় তোমাদের কখনও গর্বিত করে, সেদিনই ফিরে আসব নিজে স্বাবলম্বী হয়ে।

আর যদি লজ্জিত করে, তাহলে আর কখনও ফিরবো না।

তোমাদের ভালোবাসা, স্নেহ-মমতার ঋণ কোনোদিনও শোধ করতে পারবো না।

বাবা মায়ের ঋণ কখনওই শোধ করা যায় না।

আমি জানি।

তোমরা দুজনে আমাকে ক্ষমা করো। ইতি—

তোমাদের অযোগ্য ছেলে শান্ত।

চিঠিটা পড়ে আমার চোখ ছলছল করে উঠলো।

নরম, লাজুক স্বল্পবাক; একটু মেয়েলী, স্বচ্ছল মা-বাবার একমাত্র ছেলে শান্তর মধ্যে যে এমন একজন দৃঢ় মেরুদণ্ডের পুরুষমানুষ লুকিয়ে ছিলো তা আমি কখনও ভাবতেও পারিনি। শান্তর মা বাবাও কি জানতেন?

জামাইবাবু রাগ করে বলেছিলেন, নরাণাং মাতুলক্রমঃ।

কিন্তু আমি জানি যে, কথাটা সত্যি নয়।

হলে, শান্তর মামা হিসেবে আমারও শান্তর মতোই চারিত্রিক দৃঢ়তা থাকত।

আমি কীই বা করেছি জীবনে? সাধারণ ছাত্র। দিদি-জামাইবাবুর পৃষ্ঠপোষকতায়

www.BanglaBook.org

লেখাপড়া শিখেছি। সাধারণ হয়েও আমার যোগ্যতার চাইতে অনেক বড় মাপের একটা চাকরি পেয়েছি জামাইবাবুরই কল্যাণে। নিজের জীবনকে ইচ্ছানুযায়ী চালিত যে করা যায়, এ-কথা ভাবার মতো মনের জোরই আমার ছিলো না। শান্তর মতো আরাম ও আদরের জীবনের সমস্ত পাহারা স্বেচ্ছায় ছেড়ে গিয়ে নিজের ভাগ্য অন্বেষণের জন্যে অজানা গন্তব্যে পাড়ি দেবার মতো সাহসও আমার ছিলো না। কখনও এ-সব কথা ভাবিও নি। জীবন মানে, মোটামুটি একটা ভালো চাকরি, ভালো-থাকা, ভালো পরা, একজন মিষ্টি স্ত্রী। মধ্যবিত্ত বাঙালির অল্প সুখের, অল্প সাধের আটপৌরে জীবন। এই-ই মোক্ষ। এইটুকুই জানতাম। এ ছাড়াও যে কিছু .....

ছোট্ট শান্তর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মন নুয়ে এলো।

রাণু উদ্বিগ্ন হয়ে দৌড়ে এসে ডাকলো আমাকে, বললো, অ্যাই, তাড়াতাড়ি এসো জামাইবাবু ডাকছেন তোমাকে।

ঘরে ঢুকে দেখি, দিদি ঘরের কোণায় চেয়ারে পাথরের মতোন বসে। আর জামাইবাবু খাটের ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছেন। চোখ বসে গেছে। চুল অনেক বেশি পেকে গেছে রাতারাতি।

আমাকে দেখেই বললেন, দ্যাখ, দ্যাখ রে। তোর আদরের বোনপো আমার কি দশা করেছে দ্যাখ। ও যদি এই-ই চেয়েছিলো তো একবার আমাকে বললো না কেন? আমাদের ও ছাড়া আর কে আছে বল? ওর জন্যেই তো সব, সব কিছু। শান্ত কি একবার আমাকে বলতে পারত না যে, ও কী হতে চায়?

আমি মুখ নীচু করে ভাবছিলাম, বললে, আপনি কি শুনতেন জামাইবাবু? ও চলে যাবার আগে ওর আলাদা অস্তিত্ব ও মানসিকতা সম্বন্ধে আপনি অথবা দিদি কেউই কি সচেতন ছিলেন একটুও? ওকে আলাদা একটা মানুষ বলে স্বীকার করেছিলেন কি?

আমরা কেউই কি করেছিলাম?

কিন্তু মুখে কিছুই বললাম না। চুপ করে তাকিয়ে রইলাম জামাইবাবুর মুখে।

তারপর জামাইবাবু একটু দম নিয়ে বললেন, বুঝলি, শান্তর বয়সে সিকিওরিটিকে, টাকাকে সহজেই তাচ্ছিল্য করা যায়। কিন্তু বয়স হলে তখনই বোঝা যায় যে টাকাটা কত মূল্যবান। ও যাতে সুখে থাকে, তাই-ই চেয়েছিলাম। আর ও এমনি করে চলে গেলো। বল তো! তোরাই বল?

অতবড় রাশভারী মানুষটা ভাঙা গলায় কেঁদে কেঁদে কথা বলছেন। এ দৃশ্য যেমন অভাবনীয়, তেমনই হৃদয়-বিদারক। জামাইবাবুকে কখনওই আমি একটুও উত্তেজিত হতে দেখিনি। চেঁচিয়ে কথা বলতেও না। আর সেই জামাইবাবু!

রাণু চা নিয়ে এসে বললো, জামাইবাবু, উঠুন, উঠে বসুন। চা খান।

জামাইবাবু উঠে বসে চা হাতে নিলেন।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে জামাইবাবু বললেন, জানিস পিন্টু, আমার কি ইচ্ছা ছিলো? আমার ইচ্ছা ছিলো এয়ার-ফোর্সের পাইলট হবো আমি। ফাইটার পাইলট। আমার যখন আঠারো বছর বয়স তখনই যুদ্ধে যাওয়ার একটা সুযোগ এসেছিল। মাকে এ-কথা বলতেই বাবা আমাকে ডেকে বললেন, তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র করব। আমার এত বড় লাইব্রেরি; কোলকাতা বার-এ এত জানাশোনা; না, না। তোমাকে আইন পড়তেই হবে। উকিল হতেই হবে। তারপর চেম্বারে বসো। আমি অনেকদিন খেটেছি, আর পারবো না। আর আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জোয়াল টানবো না। আমি মিহিজামে গিয়ে গোলাপ বাগান করবো।

তারপরই অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন জামাইবাবু।

বললেন, জানিস, ত্যাজ্যপুত্র করার ভয়টাতে ভয় যে একেবারেই পাইনি তা নয়। আমি যেভাবে মানুষ হয়েছিলাম, বাবার দয়া না থাকলে তো সেভাবে চলতো না। কিন্তু বাবার মুখের দিকে চেয়ে আমার এও মনে হয়েছিল যে, বাবার ইচ্ছানুযায়ী কাজ না-করলে বাবা জেনুইনলি হার্ট হবেন। ভীষণ দুঃখ পাবেন। আমার পাইলট হতে না-পারার কারণ আসলে সেটাই।

অথচ আমার একটামাত্র ছেলে আমার ফিলিংস-এর কথাটা একবারও ভাবলো না?

একটু চুপ করে থেকে জামাইবাবু বললেন, আমি একজন সাকসেসফুল উকিল। যে কোনো কাজই ভালো করে করার মধ্যে একটা আনন্দ, থ্রিল আছেই। কিন্তু বিশ্বাস কর, আজকেও যখন আকাশে প্লেনের গুড় গুড় শব্দ শুনি, মনে হয়, এই কালো গাউন ছুঁড়ে ফেলে হাইকোর্টের বড় বড় থামওয়ালা বারান্দা দিয়ে দৌড়ে চলে যাই কোনো গোপন এয়ারপোর্টে, যেখানে ছোট্ট ছোট্ট ফাইটার জেটরা আকাশে সাদা-ধোঁয়ার ছায়াপথ এঁকে উড়ে উড়ে শব্দের চেয়েও বেশি স্পিডে মাটিতে নেমে এসে একে একে মাটির তলায় ক্যামোফ্লেজ-করা হ্যাঙ্গারে ঢুকে যায়।

বলেই, জামাইবাবু একেবারে চুপ করে গেলেন।

আমি বললাম, জামাইবাবু, চা-টা খেয়ে নিন। ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। এখনও যদি আপনি এরকম করেন, তাহলে চলবে কেন? খবর তো পাওয়া গেছে শান্তর।

উনি আমার দিকে চেয়ে বললেন, একে খবর বলে না।

আমি বললাম, ও বেঁচে তো আছে। ও যে গাড়ি চাপা পড়েনি, গুম হয়নি, এটাও কি স্বস্তির নয়?

জামাইবাবু চায়ে চুমুক দিয়ে অবাক চোখে তাকালেন আমার চোখে।

বললেন, একে বেঁচে থাকা বলে না।

তারপর কি যেন বলতে গিয়েই থেমে গেলেন।

ডাঃ ভৌমিক এবং ডাঃ রায় এসে ঢুকলেন ঘরে।

কী ব্যাপার? জামাইবাবু চট্টে উঠে, ছেলেবেলার বন্ধু ডাক্তারকে শুধোলেন।

ডাঃ ভৌমিক হেসে বললেন, দ্যাখ সাধন, ছেলের খবর তো পাওয়া গেছে। সে তো আর হারিয়ে যায়নি। চুরি-ডাকাতি করেও বাড়ি থেকে যায়নি। কতদিন পালিয়ে থাকবে ও? দেখিস ও শীগগিরই ফিরে আসবে। তোর সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু এত বড় সংসারে নিজের ছেলে, নিজের জগৎ নিয়ে এত উত্তেজিত হয়ে পড়লে চলবে কেন?

জামাইবাবু বললেন, তুই চুপ কর তো গণশা। শালার দার্শনিক এসেছেন! তোর ছেলে হারালে তুই বুঝতিস। বেশি জ্ঞান দিস না। কোথায় আছে? কী খাচ্ছে? টাকা নেই, পয়সা নেই...অতটুকু ছেলে!

আমরা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

রতনদা বললো, ভৌমিকদা এসে গেছেন। সেডেটিভ পড়লে সব ঠিক হয়ে যাবে। তুই দেখিসনি, সে কী কান্না! আমার নিজেরই হার্ট-অ্যাটাক হবার অবস্থা দাদাকে দেখে। একবার কাঁদছে, একবার হাসছে। এখনও দেখলি না, কিরকম কনফিউজড?

বললাম, আমি তুমি আর কি করতে পারি বল? পুলিশ তো ওয়ারলেসে সব জায়গায়

www.BanglaBook.org

মেসেজ পাঠিয়েছে। যা যা করার সবই তো করেছ তোমরা।

রতনদা বললেন, আমি তো তাই-ই বলছি। ফিরে আসবেই ও। আজ আর কাল। যাবে কোথায়? ফিরে এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি বললাম, আমি এবার এগোই রতনদা। রাণুকে ওদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে অফিসে যাব।

রতনদা বললো, গাড়িটা নিয়ে যা না। আমি তো ছুটি নিয়েছি অফিস থেকে। আমার ছুটির মধ্যে ছেলেটা ফিরে এলেই বাঁচোয়া।

আমি বললাম, গাড়ি নিয়ে কি হবে! তোমাদের কখন কী দরকার হয়, গাড়ি থাক এখানে।

দিদির বাড়ি থেকে বেরিয়েই মোড়ে ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম।

রাণুকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিলো। ও আমার কাঁধ ঘেঁষে বসেছিলো।

ট্যাক্সিটা চলতে আরম্ভ করতেই, রাণু বললো, অ্যাই জানো, আমার না ভীষণ ভয় করছে।

আমি বললাম, কেন কিসের ভয়?

ও ফিসফিস করে বলল, বাচ্চা হওয়ার সময়েই কষ্ট হয় জানতাম। মানে শারীরিক কষ্ট! তারপর সারাজীবন এমন কষ্ট? বাবাঃ! আগে জানলে চাইতামই না।

আমি ওর পেটে হাত ছুঁইয়ে বললাম, জামাইবাবুর সব কথাই শুনেছে ব্যাটা। এ-সব কথা শোনার পরও বাবা-মায়ের এত কষ্ট দেখার পরও যদি ব্যাটা আমাদের কষ্ট দেয় তো বলার কিছুই নেই।

রাণু বললো, তোমার সবটাতে এই ইয়ার্কি আমার ভালো লাগে না।

সামনেই, রাস্তার বাঁদিকে একটা স্কুলের সামনে খুব ভিড়। টেস্ট পরীক্ষা শুরু হয়েছে বোধহয় আজ থেকে। শান্তর বয়সী ছেলেরা এবং তাদের ভয়ার্ত, চিন্তিত মা-বাবারা ভিড় করেছেন স্কুলের গেটের সামনে। শান্ত থাকলে, ও-ও পরীক্ষাতে বসত আজ।

ওদের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, এদেশে এখন আর কারোই ছেলে-মেয়ে না-হওয়াই ভালো। দেশের মেরুদণ্ড, জাতির ভবিষ্যৎ এই উজ্জ্বল, উৎসুক চোখের ছেলে-মেয়েগুলোর কি হবে? কোন প্রতিশ্রুতি আমরা রেখেছি? কোন্ ভরসায় পৃথিবীতে এনেছি, আনছি আমরা এদের? বঞ্চনাতে, সবরকম বঞ্চনাতেই ভরে দিয়েছি আমরা ওদের। এ লজ্জা রাখার জায়গা কি আছে?

একটা ছেলে ডাকলো, বড় মামা, বড় মামা!

ট্যাক্সিটা দাঁড় করাতে বললাম।

ছেলেটা দৌড়ে এলো। হাতে স্কেল, জ্যামিতির বাক্স।

ও শান্তর বন্ধু মিঠু। ও অন্য স্কুলে পড়ে কিন্তু দিদিদের পাড়াতেই থাকে।

কপালে দইয়ের ফোঁটা। ওর শুভার্থিনী মা পরিয়ে দিয়েছেন। ছেলে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে।

ট্যাক্সির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে শুধোলো মিঠু, শান্তর কোনো খবর পেলেন?

বললাম পেয়েছি। ও সায়ান্স পড়বে না। চিঠি লিখেছে যে, ও যা হতে চায় তা-ই হবে।

কোথায় আছে শান্ত? মিঠু শুধোল?

www.BanglaBook.org

আমি বললাম, সেটা এখনও জানি না।

মিঠু কী একটু ভাবলো, তারপর বললো, এই জন্যেই ওকে আমি এতো অ্যাডমায়ার করতাম। সায়াল আমারও ভাল লাগে না। বাবা জোর করলেন।

তারপর মুখ নীচু করে বললো, এই পড়াশুনার দামই বা কি? করতে হয় করছি। ডিগ্রী পেয়েও তো কোথাও একটা কেরানির চাকরির জন্যে বছরের পর বছর বসে থাকব। আমরা যে সাধারণ ছেলে! আমরা বেশির ভাগই তো সাধারণ...। ফালতু...। সব ফালতু..

আমি বললাম, চলি রে!

মিঠু বললো, আচ্ছা। শান্ত বাড়ি আসলে খবর দেবেন। যাব।

মিঠু স্কুলের দিকে চলে যাচ্ছিলো। পরীক্ষা শুরু হবে একটু পর। ওর কপালে দই-এর ফোঁটা। আমার দিদিও কি দিত? শান্তকে? যদি আজ পরীক্ষায় বসত ও?

বোধহয় না।

আর রাণু? রাণুও কি দই-এর ফোঁটা পরাবে, ভাগ্যবিশ্বাসী দুর্বল ছেলের দুর্বলতর মা হয়ে?

নিশ্চয়ই না। হয়ত চুমু দেবে কপালে।

সময় দ্রুত বদলে যাচ্ছে, যাবে।

দূরে রাণুদের বাড়ি দেখা যাচ্ছিল।

রাণু বলল, কি ভাবছো গো?

আমি হাসলাম। ওর হাতে হাত ছুঁইয়ে বললাম, যে আসছে তার কথা, তাদের কথা।

তারপর বললাম, তুমি দেখো রাণু! যে আসছে, সে কিন্তু আমাদের ঠিক হারিয়ে দেবে। ও ওরিজিনাল হবে। আমাদের মতো ছাঁচে-ফেলা প্রোটোটাইপ নয়।

রাণু বললো, জানো, আমার মা বলছিলেন, ছেলেমেয়েদের কাছে হেরে যাবার মতো আনন্দ নাকি বাবা-মায়ের আর কিছুই নেই!

তারপরই রাণু প্রথম মাতৃত্বের, গর্ব-গর্ব, ভয়-ভয়; কিন্তু দারুণ খুশি মুখে আমার দিকে চাইল একবার। বলল, তাহলে আমাদের খবরটা মাকে বলছি কিন্তু আজ। বুঝলে?

বলেই, বললো, ভীষণ লজ্জা করছে আমার!

আরেকটা স্কুল দেখা যাচ্ছে সামনে। ডানদিকের ফুটপাথে। এখানেও অনেক ছেলে। রিকশা, ট্যাক্সি ও গাড়ির ভিড়। বাবা-মায়েরা, দাদা, দিদিরা।

হঠাৎ আমার মনে হলো, এইসব ছেলেদের অনেকের চেয়েই, বাড়ি থেকে পালিয়ে-যাওয়া আমার বোনপো শান্ত অনেক অন্যরকম। আমরা যা পারিনি, শান্তরা হয়ত তা পারবে। আমাদের এই প্রাচীন ঘেরাটোপের মধ্যের ভীরু, একঘেয়েমির ক্লান্তিকর জীবনের নির্মোক ছিঁড়ে ফেলে ওরা স্বমত, আত্মসম্মানজ্ঞান এবং স্বাধিকারের উজ্জ্বল দীপ্তিতে প্রদীপ্ত হবে।

একটা নতুন যুগ আসছে। সে যুগের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি! এই নানারকম ডুগডুগি-বাজানো বাঁদর নাচের দেশেই শান্ত, মিঠু এবং লক্ষ লক্ষ শান্ত-মিঠুরা নতুন আলো হাওয়া, নতুন সাহস এবং প্রত্যয় আনবে। ওদের উপর অনেকই ভরসা আমার!

আমি নিশ্চয়ই জানি, এবং জেনে অত্যন্ত গর্বিত যে, শান্তকে পাওয়া যাবে না।

শান্তদের আর পাওয়া যাবে না।

www.BanglaBook.org

ছানি

আজ মহাষ্টমী। এবারে রবিবার পড়ে গিয়ে সপ্তমীর ছুটিটাই মারা গেলো। কাল রাতে মা বললেন, বড় মাসীমা মেসোমশায়রা দিল্লি থেকে এসেছেন। আমার মাসতুতো ভাই স্টেট ব্যাংকের বড় অফিসার। মাসীমার একই ছেলে। ওঁর কাছেই উঠেছেন ওঁরা। ওঁদের ফোন থাকলেও আমাদের নেই বলে যোগাযোগ করা হয়ে ওঠেনি। একবার যেন যাই, খোঁজ করে আসি।

বাড়ি থেকে যখন বেরুচ্ছি ঠিক তখনই, আমার ছ'বছরের মেয়ে শ্রী বলল, বাবা! আমিও যাব।

বললাম, পুজোর দিন বাসে-ট্রামে ওঠা যাবে না, ভীড় ভীষণ। তুমি কি অতদূরে হেঁটে যেতে পারবে?

মেয়ে বলল, বাঃ রে! সেই তোমার সঙ্গে সেবারে তারা দেখতে গেছিলাম না, সেখান থেকে ট্রাম-বাস কিছুই না পেয়ে সেদিন হেঁটে আসিনি বুঝি?

আমার মনে পড়লো, সত্যিই তো! প্ল্যানেটোরিয়াম থেকে একবার হাঁটতে-হাঁটতে ল্যান্সডাউন রোড অবধি এসেছিলই তো শ্রী।

বললাম বেশ, চলো তাহলে।

রুণা বলল, রোদ উঠেছে কড়া, পুজোর দিনে রোদে হেঁটে অসুখে-বিসুখে পড়বে। না, তুমি যাবে না শ্রী।

মেয়ের মুখ করুণ হয়ে এলো।

তবু বললাম, চলুকই না। পথে অনেক ঠাকুরও দেখা হবে! আর তেমন মনে করলে, রিকশা করে চলে আসবে।

রুণা বিরক্ত গলায় বললো, বিকেলে আমি বাপের বাড়ি যাব। দাদারা গাড়ি পাঠাবে। তখন যদি পড়ে পড়ে ঘুমোয় তাহলে পিটুনি খাবে আমার কাছে।

www.BanglaBook.org

নিস্পৃহ গলায় বললাম, ঘুমোলে ঘুমুবে। আমি তো যাবো না। না-হয়, আমার সঙ্গেই অন্য কোথাও যাবে ও। হেঁটে হেঁটে, কাছাকাছিই যাবো।

রুণা বললো, যা ভালো মনে করো; করো।

আর দেরী না করাই ভালো মনে করে মেয়ের হাত ধরে বেরিয়ে পড়লাম।

এদিকে মেয়ে হাঁটতেই পারছে না। কী একটা জগঝম্প পরেছে। দু-হাতে দুদিক উঁচু করে ধরে নতুন জুতো পায়ে আমার পাশে পাশে হাঁটছিল শ্রী।

বললাম, এটা কী পরেছ তুমি?

শ্রী তার বোকা বাবার চোখে তাকিয়ে বললো, তুমি তাও জানো না? এটাকে ম্যাক্সি বলে।

বললাম, যে-জামা পরে হাঁটা যায় না সেটা পরার দরকার কি?

দ্যাখো না। শ্রী অনুযোগের সুরে বললো, মা এমন বড় করে বানালো, যাতে সারা শীতে পরতে পারি, ছোট না হয়ে যায়।

বললাম, ক'টা জামা হলো এবারে পুজোয়?

শ্রী চোখ নাচিয়ে বললো, তা, অনেক। তারপর বললো, দাঁড়াও, দাঁড়াও, গুণে বলি। মা বানিয়েছে একটা! চার মামা চারটে। দু মাসী দুটো। মামা-দাদুও একটা দিয়েছে।

ক'টা হলো সবশুদ্ধু?

ছ'টা। গুণেটুনে শ্রী বললো।

আমি বললাম, ভুল হলো। আটটা।

শ্রী যোগের ভুলের পাপ স্খালন করে বলল, কী মজা। না?

আমি ভাবছিলাম, এতগুলো জামার কী দরকার ছিল কোনো? একজন শিশুর, পুজোর আনন্দের পরিপ্রেক্ষিতেও? এতগুলো জামা কী বাড়াবাড়ি নয়? বিশেষ করে এ-বছরের প্রলয়কারী বন্যা ও বৃষ্টির পর? বড়লোক মামাবাড়ির ব্যাপার! গরিব জামাই-এর চুপ করে থাকাই শোভন! মেয়ের ভালো মন্দ ঠিক করার আমি কে?

শ্রী হঠাৎ আমার হাত ধরে টানলো।

ওর দিকে চাইতেই স্টেশনারি দোকানের দিকে চোখ দিয়ে ইশারা করলো।

শুধোলাম, কি?

আহা! তুমি যেন জানো না।

শ্রী পাকামি করে বললো।

যা শোনে, তাই শেখে ও। বললো, বড়মামা সবসময় কিনে দেয়!

আমি একটা বড় চকোলেটের বার কিনে দিলাম। বাবা হিসেবে কোনো কর্তব্যই প্রায় করি না মেয়ের প্রতি। সামর্থ্যের অভাবও যে নেই এমনও নয়। আমার মাধ্যমে আনন্দ, ভালো লাগা, কিছুরই স্বাদ পায় না মেয়েটা। পুজোর দিনে ওকে নিজে হাতে ওর অনুরোধে একটা চকোলেট কিনে দিয়ে ভারী খুশি হলাম। বাবা হওয়ার যেমন ঝক্কি অনেক, তেমন আনন্দও অনেক। যে বাবা না হয়েছে, সে বুঝবে না এর দুঃখ। এবং আনন্দও। আমার সঙ্গে একা থাকলে মেয়েও বেশ স্বাধীনতার স্বাদ পায়। মায়ের কড়া শাসনের হাত থেকে তখন ওর ছুটি।

বড় প্যাণ্ডেলে পুজো হচ্ছে সামনে। দামড়া দামড়া বয়স্ক ছেলেগুলো হিন্দী ছবির নায়কদের মতো দামী ও অন্য গ্রহের পোশাক পরে প্যাণ্ডেলের সামনে দাঁড়িয়ে মেয়ে দেখছে। পুজোর আসল মজাই তো ওটাই। এ বছরও এদের সাজ-সজ্জা আমাকে আশ্চর্য

www.BanglaBook.org

করছে। এদের দেখে কে বলবে যে, কলকাতায় ও বাংলায় অল্প ক'দিন আগেও এত বড় বিপর্যয় ঘটে গেছে। পুরুষরাও কি এমন মেয়েদের মত পোশাক সচেতন হতে পারে? অন্তঃসারশূন্য শরীর ও ষাঁড়ের গোবরময় মস্তিষ্কের জন্যে পুরুষদেরও বাহারী জামা কাপড় এবং হাই-হীল জুতোর দরকার হয় এ ভিখিরীদের শহরে, তা ভাবলেও অবাক লাগে। এই হচ্ছে কোলকাতার প্রাণকেন্দ্র। এর নাম সাউথ-ক্যালকাটা। তার মধ্যে এ পাড়া হচ্ছে জাত পাড়া। এইসব পাড়ার পুজো দেখতে দূর দূর জায়গা থেকে মানুষে আসে। রাত জেগে পায়ে হেঁটে পুজো দেখে। "হাঁ" করে বড়লোকী দেখে। বড়লোকের সুন্দরী মেয়েদের কৃত্রিম মুখ দেখে। ছেলেদের চুল আর পোশাক দেখার পর গ্রাম গঞ্জে গিয়ে সেখানের নির্মল ও সুস্থ পরিবেশকে বিকৃত ও দূষিত করে তোলে।

ভীড়ের মধ্যে থেকে পটল দৌড়ে এলো। এসেই আমাকে বলল, তোমার ভাই ডুবিয়ে দিলে একেবারে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কি?

আমাদের পুজো কমিটির চাঁদা থেকে পাঁচশো সাঁইত্রিশ টাকা যে বন্যাত্রাণে দিলাম হাবুদা সে খবরটা একটু কাগজে ছাপিয়েও দিতে পারলে না। নিউজ আইটেম হিসেবে! এত বড় একটা দান!

পটলের বাবা, অর্থাৎ আমার প্রতিবেশীর সর্ষের তেলের কল আছে। কীসের সঙ্গে কী মিশিয়ে তাঁর কলের ঘানি চলে তা ভগবানই জানেন। কিন্তু অর্থের অভাব নেই কোনো। এও আমার জানা যে, কোনো অপ্রাকৃত কৌশলে এ পর্যন্ত জীবনে তিনি ঠেকাননি সরকারকে একটি পয়সাও। পটলের নিজের সিগারেটের খরচই মাসে চারশো। পুজো কমিটির পাঁচশো সাঁইত্রিশ টাকা! পটল এবং পটলের সমগোত্রীয়রা কলকাতার এই বড়লোকতম পাড়ার পুজো কমিটির মোট তহবিল থেকে ঐ টাকা দিয়েছে এবং সেজন্যেই কাগজে সেটা ফলাও করে প্রচার করতে হবে এই দাবিতে আমার রক্ত চড়ে গেলো। সীমাহীন লজ্জাহীনতা।

হাবু আমার ভাই। একটা খবরের কাগজের একজন সামান্য কর্মচারী সে। কাগজটা তার বাবার নয় যে, পটলের মত দাতাকর্ণদের অকিঞ্চিৎকর দানের খবর নিউজ আইটেম হিসেবে ছাপিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা হাবু রাখে।

যাই-হোক, পটল বড়লোকের ছেলে। বড় বড় ব্যাপার। বড় বড় বন্ধুবান্ধব। ওকে চটিয়ে আমার মতো চুনোপুঁটির ক্ষতি ছাড়া ভালো হবার নয়।

তাই, কথাটা এড়িয়ে গিয়ে বললাম, হাবু চেষ্টা করেছিলো; পারেনি।

পটল বলল, বুলশিট।

এমন সময় রমেন, আমাদের পাড়ায় সবচেয়ে অবস্থাপন্ন মানুষ হরেন ঘোষের ছেলের সঙ্গে দেখা। শুধোলাম, মা-বাবা কি এখানে?

রমেন পকেট থেকে ইন্ডিয়া কিংসের প্যাকেট বের করে ধরিয়ে, কায়দা করে বললো, দূর! মা-বাবা কখনও এখানে থাকে না পুজোয়। গত বার ফরেন ট্যুরে গেছিলো, এবার কাশ্মীরে।

আমি মুখ ফসকে বলে ফেললাম, এ বছরেও?

তারপর বললাম, কাশ্মীরে আগে একবার গেছিলেন না?

রমেন বললো, আগে চারবার গেছে। এই নিয়ে ফিফথবার।

বললাম, ওঃ!

রমেন বললো, তুমি গেছ নাকি কালুদা, কাশ্মীরে?

www.BanglaBook.org

আমি বললাম, নাঃ আমি কোথায়ই বা গেছি? মধুপুর গেছিলাম একবার অনেকদিন আগে।

রমেন সিগারেটটা বিলিতি লাইটারের উপর ঠুকে বললো, যাও ঘুরে এসো। লাইফটা এনজয় করো। তুমি কেমন ম্যাদামারা হয়ে যাচ্ছো।

আমি পা বাড়ালাম। ভাবলাম, বলি, এনজয়মেন্টের সংজ্ঞা সকলের কাছে সমান নয়। আর্থিক সামর্থ্য আমার নেই বলেই শুধু নয়, ছুটিতে বাড়ি বসে বই পড়েই আমি সবচেয়ে বেশি এনজয় করি। শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতদের "এনজয়মেন্টের" মধ্যে তফাত আছে। রমেনের নিজের বা তার মা-বাবার বিবেক-রুচি আমার উপর জোর করে রমেন চাপাতে চাইছে কেন জানি না। আমি এগোলাম।

পটল পিছন থেকে বললো, হাবুদাকে বোলো যে, হাবুদা নিজেকে যতো ইম্পর্ট্যান্ট মনে করে ততটা সে নয়। আমরা অন্য লোক ধরে অন্য কাগজে খবরটা ছেপেছি। আমাদের নিজেদেরও সোর্স কিছু আছে।

আমি হাবুর জন্যে দুঃখিত হলাম। খবরের কাগজে কাজ করা বা তার সঙ্গে কোনোভাবে যুক্ত থাকা যে কতবড় বিড়ম্বনার ব্যাপার তা হাবুর দাদা হয়েই আমি হাড়ে হাড়ে বুঝি। বেচারা হাবু!

গড়িয়াহাটের মোড়ে পৌঁছে, এক খিলি জর্দা-পান খেলাম।

শ্রীকে বললাম, তুমি চকোলেটটা খেলে না শ্রী?

ও বললো, দু-হাতে ম্যাক্সি ধরে আছি দেখছো না? পরে খাবো!

গড়িয়াহাটার মোড় ছাড়িয়ে বালীগঞ্জ নিউ মার্কেট পেরিয়ে বাঁদিকের ফুটপাথ ধরে ফাঁড়ির দিকে হাঁটছি। একটা মাল্টিস্টোরিড বাড়ি। তারপরেই রাস্তা এবং তারপরই একটা তেকোণা পার্ক। পার্কটার সামনের স্টপেজে একটা সিমেন্টের শেড। দেখা যাচ্ছে দূর থেকে।

কত গাড়ি, কত শাড়ি, কত আনন্দ, কত অপচয় চারিদিকে। এমন কী আমার মতো সাধারণ অবস্থার মানুষের মেয়েও সব মিলিয়ে আটটা জামা পায় এবং পরেও পুজোতে। ভাবতে ভাবতেই চোখ পড়ল সেই শেডের নিচে। তখন পৌঁছেই গেছি সেখানে।

একটি লোক, পরনে শতছিন্ন খাটো ধুতি। মালকোঁচা মারা। শুয়ে, অঘোরে ঘুমুচ্ছে সকাল এগারোটায়, মহাষ্টমীর দিনে, গড়িয়াহাট মোড়ের দুশো গজের মধ্যে। তার পাশে তার স্ত্রী। ভীষণ নোংরা ও ছেঁড়া একটা সায়াবিহীন লালপেড়ে মোটা শাড়ি তার পরনে। হাঁটু অবধি ওঠা। গায়ে একটা জামা আছে বটে কিন্তু বুকের বোতাম নেই। মেয়েটির একটি স্তন আঢাকা। স্তনের বৃন্তটি ফুটপাথের ধুলোয় মাখা। আর সেই বৃন্ত থেকে এক চুল দূরে একটি ক্ষুধার্ত, বড় ক্লান্ত; ঘুমন্ত শিশুর হাঁ-করা মুখ।

কেন জানি না, আমার পা আটকে গেল সেখানে। মেয়েটির উন্মুক্ত বুকের জন্যে নয়। আমি একজন সাধারণ মানুষ বলে। মানুষকে মানুষ হিসেবে সম্মান করি বলে। পুজোর সব আনন্দ, এই সুন্দর শরৎ সকালে হঠাৎই লোডশেডিং-এর মতো নিভে গেলো।

শ্রী হাত ধরে ঝাঁকি দিলো। বললো, বাবা, ঠাকুর দেখাবে বললে, কী হলো? মোটে-তো চারটে দেখলাম।

আমার সম্বিৎ ফিরে এলো। ম্যাক্সি-পরা চকচকে-চামড়ার নতুন জুতো পরা আমার ছোট্ট অবোধ মেয়েকে বললাম, ঠাকুর দেখাবো মা। তোমায় ঠাকুর দেখাবো।

ভাবছিলাম, এই পরিবারটি কী বন্যাপীড়িত? এরা কোত্থেকে এসেছে? গোসাবা, মেদিনীপুর? না ডুয়ার্স? এরা কী অনেকেই দূর থেকে হেঁটে এসেছে? কতখানি ক্লান্ত ও কতখানি ক্ষুধার্ত এরা যে, মহাষ্টমীর দিনের রবরবাময় গড়িয়াহাট মোড়ের দুশো গজের

www.BanglaBook.org

মধ্যে থেকেও এরা সমস্ত পরিবার এমন মরণ ঘুম ঘুমোচ্ছে? এমন সকালে!

শ্রী বললো, কী দেখছ বাবা?

আমি বললাম, দেখেছো?

কি? শ্রী বললো, অবাক হয়ে।

শ্রী দেখার মতো কিছুই দেখেনি। ওর দেখার কথাও নয়।

যে লক্ষ-লক্ষ লোক গাড়ি চড়ে, বাসে-ট্রামে মিনিবাসে, পায়ে হেঁটে ওদের পাশ দিয়ে আজ ভোর থেকে হেঁটে গেছে, তারা কেউই ওদের দেখেনি। শ্রীর দোষ কি? ও তো একটা ছোট মেয়ে।

হঠাৎ একটা কালো অ্যাম্বাসাডার এসে দাঁড়াল শেডটার সামনে। কে যেন বললো, কীরে কালু? কোথায় যাবি? চল নামিয়ে দিচ্ছি।

তাকিয়ে দেখলাম, আমার কলেজের বন্ধু রাজীব। অ্যালয় স্টীলের কারবার করে খুব বড়লোক হয়েছে। নিউ আলিপুরে বিরাট বাড়ি করেছে। ফার্স্ট ইয়ারেই বকামি করে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিল। এই দেশে পড়াশুনা করে এই রাজীবদেরই চাকর হতে হয়!

আমি বললাম, থ্যাঙ্ক উ্য। দরকার নেই। কাছেই যাবো।

রাজীব বললো, চল না আমার সঙ্গে। মহাষ্টমীর ভোগ খাবি আমাদের পাড়ায়। বিয়ার সেশান চলেছে সকাল থেকে। জমবে ভালো। চল।

ওকে বললাম, না রে। তুই যা। আমি তো কাছেই যাবো এক আত্মীয়ের বাড়ি।

হঠাৎ রাজীবের চোখ গেলো ঐ পরিবারটির দিকে।

চোখ বড় বড় করে আমাকে বললো, তুই কি দেশের কাজ করছিস না কি? আরে! ক'টা লোককে দেখবি তুই এ পোড়াদেশে? এসব সরকারের ডিউটি। আমি নিজে যা ট্যাক্স দিই, তাতে বন্যাত্রাণে নিজেই একটা লঙ্গরখানা খুলতে পারতাম। কিন্তু করবো কেন বল? সরকার কি দেয় বদলে? হার্ড-আর্নড মানির ট্যাক্সের বদলে?

তারপর ভালোবেসে বললো, পুজোর দিনে একটু আনন্দ কর। এই তো তিনটে দিন বছরে। নিজেকে রাস্তার লোকের সঙ্গে ইনভলভ্ড করিস না। কতজনের দুঃখ নিজের করবি? এর শেষ নেই। বোকার মতো বিহেভ করিস না। ফালতু!

এত কথা জোরে জোরে বলে রাজীব চলে গেলো।

আশ্চর্য! পরিবারটি তবুও অসাড়ে ঘুমোচ্ছিল। কী মরণ ঘুমই না ঘুমোচ্ছে!

রাজীব না হয় অনেক ট্যাক্স দেয় কিন্তু পটলের বাবা? আমার মামা শ্বশুর? তিনি তো এক পয়সাও দেন না। তাঁরও কী কোনো কর্তব্য নেই? ছিলো না? আজ অথবা গতকাল? অথবা থাকবে না আগামী কালও। দেশের প্রতি, এদের প্রতি?

এতক্ষণে শ্রী কথা বললো।

বললো, বাবা, বাচ্চাটার খুব খিদে পেয়েছে, না? আমি আমার চকোলেটটা একে দিয়ে দিই?

আমি শ্রীর মুখের দিকে তাকালাম। আমার বুকের মধ্যেটা যেন কীরকম করে উঠলো। বললাম, তুমি খাবে না?

শ্রী বললো, আমি তো খাই; প্রায়ই খাই; কত্ত খাই। ও যে কিছুই খেতে পায় না।

বললাম, দাও।

কী নোংরা জায়গাটা, কী নোংরা ওদের কাপড়-চোপড়, শরীর। রুণা থাকলে মুখে আঁচল দিত, শ্রীকে কিছুতেই কাছে যেতে দিত না। কিন্তু শ্রী যখন এগিয়ে গিয়ে বাচ্চাটাকে

www.BanglaBook.org

হাত দিয়ে ওঠালো তখন আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বাচ্চাটা চোখ খুলেই অবাক হলো। শ্রী চকোলেটটা ওর হাতে দিলো। বাচ্চাটা জীবনে ক্যাডবারী দেখেনি। ও ওটা নিয়ে কী করতে হয় বুঝতে পারল না। ভাবল, খেলনা বুঝি।

আমি ডাকলাম মানুষটাকে, এই যে শুনছো! শুনছো গো।

আমার ডাকেও উঠলো না মানুষটা। বাচ্চাটা তার মায়ের বুকে আঁচড়াতে মেয়েটি চোখ খুললো। চোখ খুলে আমাকে দেখেও বুক ঢাকার চেষ্টা করলো না। আমার মনে হলো, ওদের খিদেরই মতো লজ্জাও অপেক্ষা করে করে মরে গেছে বহুদিন আগে। এসব লজ্জা-টজ্জার বাবুয়ানী ওদের জন্যে নয়।

মেয়েটি কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলো আমার আর শ্রীর দিকে। তারপর কনুই দিয়ে ঠেলা মারলো প্রায় মৃত মানুষটাকে।

মানুষটা উঠে বসলো। মুখে একটা আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠলো।

বললো, বাবু কিছু বলছেন?

তারপরই বললো, আমরা একটু পরই এখান থেকে সরে যাবো, আপনাদের দাঁড়াতে অসুবিধা হবে না। দোষ করেছি বাবু?

মনে মনে বললাম, দোষ তো করেইছ। অনেক দোষ। অনেকরকম দোষ।

মুখে বললাম, বন্যায় কী সবই ভেসে গেছে তোমাদের?

লোকটা অবাক চোখে চেয়ে বললো, বন্যা?

মেয়েটি বলল, না তো!

শুধোলাম তোমার বাড়ি কোথায়?

লোকটা বলল, নক্কীকান্তপুর।

অবাক হলাম। লক্ষ্মীকান্তপুর? সে তো কাছেই। সেখানে আবার বন্যা কিসের?

লোকটা আরো ঘাবড়ে গিয়ে চুপ করে রইলো। বললো, আমি তো বন্যার কথা বলিনি। বাবু।

আমি আবার শুধোলাম, তুমি কলকাতায় কতদিন?

তা বছরখানেক।

বছরখানেক? কি করো তুমি?

কাগজ কুড়োই।

কোথায় থাকো?

এখানেই। রাতে বৃষ্টি বাদলের জন্যে এখানে শুই। দিনে কাগজ কুড়োই।

খাও দাও কোথায়?

মানুষটা বললো, ঐ পার্কের মধ্যেই সন্ধের পর মাটির হাঁড়িতে কিছু ফুটিয়ে নিয়ে খাই।

এক বেলাই খাও?

এক বেলা জুটলেই কত!

মাসীমা মেসোমশায়ের জন্যে একটু মিষ্টি কিনে নিয়ে যাবো বলে দশটা টাকা বেশি এনেছিলাম। ওদের দিয়ে বললাম, তোমরা আজ ভালো করে খাও। আজ পুজোর দিন।

আমার অবস্থানুযায়ী এই বড়লোকী বেমানান হলো, বুঝলাম। কিন্তু না ভেবেই, টাকাটা দিয়ে দিলাম।

মেয়েটাও উঠে বসলো। এমনকি বাচ্চাটাও। ওরা তিনজনে এমন করে আমার ও শ্রীর মুখের দিকে চেয়ে রইলো যে, কী বলব। লজ্জায়, দুঃখে হতাশায় আমার মাটির সঙ্গে মিশে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যেতে ইচ্ছে করলো।

শ্রী উত্তেজিত গলায় বললো, তোমরা আমার বাবাকে কী দেখছো? অমন করে?

মানুষটা আমাকে বললো, তোমার মুখটা দেকতিচি বাবু। আজ পুজোর দিনে ভগমানের দর্শন পেনু। মুখটা চিনে রাকতিচি। যদি পারি তো কোনোদিন এই ঋণ শুধব। ঠাকুর তোমার মঙ্গল...।

লজ্জায় দাঁড়ালাম না।

কী বলবো, ভেবে না পেয়ে বললাম, চলি।

শ্রী বললো, আমার দেখাদেখি চলি।

মানুষটার কথা শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এ তবে বন্যার্ত নয়? বন্যার্তরা আসেনি এখনো কেউ? পৌঁছতে পারেনি? এ যে কলকাতারই বাসিন্দা। এরই এই দশা। এ তো মাত্র একজন। কত আছে এ রকম! ফুটপাথের মানুষ-এ। এইই এর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। বড়লোক কলকাতার গর্ব গড়িয়াহাটের মোড়ের দুশো গজের মধ্যে এমন করেই ওরা বেঁচে থাকে। ভিক্ষা চায় না, দয়া চায় না কারোর। পটল, পটলের বাবা অথবা রাজীবের, এমন কি আমার মত নগণ্যজনেরও করুণা চায় না। ওরা শুধু বেঁচে থাকতে চায়, পরিশ্রমের বিনিময়ে।

চলতে চলতে ভাবছিলাম, এই দারুণ শহরে আটাত্তরের বন্যাপীড়িত, ঘরবাড়ি ভেসে যাওয়া আপনজন হারানো মানুষগুলো এসে পড়লে তাদের অবস্থাটা কী হবে?

বড় মাসীমা আমাকে আর শ্রীকে দেখে খুব খুশি হলেন। দিল্লী থেকে অনেকদিন পর এবারে এসেছেন আমার মাসতুতো দাদার ওখানে।

বড় মেসোমশায় বললেন, ও কেরে কালু?

রানীর মেয়ে?

আমি বললাম, না। ও আমার মেয়ে!

ওঃ। তোর মেয়ে? কী যেন নাম? শ্রী না?

তারপর বললেন, চোখে কিছু দেখি না আজকাল। ক্যাটারাকট ফর্ম করছে।

বড়মাসীমা বললেন, এ পাড়াতে খুব জাঁকজমকের পুজো। সুন্দর ঠাকুর। দেখে যা।

নাঃ থাক। পথেই দেখলাম ঠাকুর।

মাসীমা মিষ্টি খাওয়ালেন জোর করে। বললেন, তোর মাকে বলিস, নবমীর দিন সারাদিন তোদের ওখানে গিয়ে থাকবো।

খুব ভালো হবে। মা সবসময়ই আপনাদের কথা বলছেন।

মাসীমা বললেন, অনুকে বলিস যে, বড় বড় কই আনাতে। তেল-কই খাবো।

বললাম, আচ্ছা।

ভাবলাম, বড় কই কতদিন আমরা নিজেরাই চোখে দেখিনি। তবে মায়ের আনন্দের জন্যে যে করে হোক মাসীমা মেসোমশায়ের জন্যে অন্তত যোগাড় করতে হবেই।

একটু পর উঠলাম শ্রীকে নিয়ে। বেলা বাড়ছে। রোদ কড়া হচ্ছে ক্রমশ।

পথে নেমেই শ্রী বলল, ক্যাটারাকট মানে কি বাবা?

ছানি।

ছানি কি বাবা?

বললাম, চোখের উপরে সরের মতো পর্দা পড়ে যায়, চোখে আর দেখা যায় না।

শ্রী বললো, কই? মেসোদাদুর চোখ তো ঠিকই আছে দেখলাম।

আমি একটু চুপ করে রইলাম।

তারপর বললাম, বাইরে থেকে দেখে তাই-ই মনে হয়।

www.BanglaBook.org

বাঘের দুধ

ডানদিকে কোথায় চললি রে শাণ্টু? লাতেহারের পথ কি এদিকে নাকি?

এদিকেই তো। গাড়ি চালাতে চালাতে মুখ না ঘুরিয়েই বলল শাণ্টু।

পাশে-বসা নির্মলবাবু স্বগতোক্তি করলেন, সব কিছু এতো অন্যরকম হয়ে গেছে তোদের ডালটনগঞ্জ শহরে এই পঁচিশ বছরে যে, কিছুই আর চিনি বলে মনে হয় না।

শাণ্টু উত্তর না-দিয়ে গীয়ার বদলে গাড়িকে সেকেন্ড গীয়ারে দিয়ে লেভেল ক্রশিংটা পেরিয়ে গেলো।

হ্যাঁরে! বাঁদিকের এই বাড়িগুলো কবে হলো রে? এগুলোও কি বিড়িপাতার ব্যবসাদার গুজরাতীদের?

শাণ্টু উত্তর দিলো-না কোনো।

অনেকেই চেষ্টা করেছিলো গুরুজন মেসোকে অন্য গাড়িতে চালান করার। কিন্তু মেসো শাণ্টুকে বিশেষই ভালোবাসেন। তাই ঐ গাড়িতেই জবরদস্তি করে উঠলেন তিনি। এদিকে অনেকক্ষণ সিগারেট না-খেয়ে এবং আরও অনেকক্ষণ খেতে পাবে না যে, এ কথা মনে করেই ওর মেজাজ বিগড়ে ছিলো। যত্ত সব বুড়ো-পার্টি! মোহনদার বৌভাতের পর নতুন বউকে নিয়ে চার গাড়ি ভর্তি করে ওরা চলেছিলো মোহন বিশ্বাসের ছিপাদোহরের ডেরাতে। মুনলাইট পিকনিক হবে সেখানে।

হু-হু করে হাওয়া ঢুকছিলো গাড়িতে। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি। মিষ্টি মিষ্টি ঠাণ্ডা। এখনও রোদ আছে নরম মোমের মতো। বিকেলে বড় আরাম লাগে এই শীত-শেষের অবসরের রোদে।

মুখ হাঁ করে অক্সিজেন নিচ্ছিলেন নির্মলবাবু ফুসফুসের আনাচ কানাচ ভরে। কলকাতায় মুখ হাঁ করলেই তো ডিজেলের ধোঁয়া নয়ত সি এম ডি-এর কালি! স্বাস্থ্য যতটুকু ভালো করে নেওয়া যায়।

www.BanglaBook.org

এক সময় এই ডালটনগঞ্জেই অনেকদিন ছিলেন নির্মলবাবু। শহরে এবং আশেপাশের জঙ্গলে। তখন বড়-সম্বন্ধী বেঁচে। একডাকে চিনত তাঁকে লোকে, মোহন বিশ্বাসের বাবা মুকুন্দ বিশ্বাসকে। কোনো বাঙালিই এখানে এসে তাঁর অতিথি না হয়ে যেতে পারতেন না কোনোক্রমেই।

ধুতির উপর সাদা টুইলের ফুলহাতা শার্ট। কলার তোলা থাকত। আর বুকের বোতাম সব সময় খোলা। বুক পকেটে একটা রুমাল বলের মত গোল করে পাকানো থাকত। এখানের কুঁয়োর জলে আয়রন থাকাতে দাঁতগুলো সব কালো হয়ে গেছিল বড়দার। তার উপর অবিরাম পান আর সিগারেট তো ছিলোই!

আহাঃ! কী সব দিনই গেছে তখন।

লাতেহারের পথ ছেড়ে গাড়ি ডানদিকে ঢুকলো। নির্মলবাবু বললেন, এ কিরে শাণ্টু? এ যে পাকা রাস্তা দেখছি! পাকা হলো কবে?

শাণ্টু বিরক্তির গলায় বললো, আমি তো এখানে এসে অবধিই দেখছি।

তুই কতদিন আছিস এখানে?

তা কম দিন নয়, পনেরো বছর হবে।

ফুঃ। পনেরো বছর। আমি বলছি চল্লিশ বছর আগের কথা। কত অন্যরকম ছিলো সব কিছু।

হবে।

শাণ্টু সংক্ষিপ্তভাবে বললো।

কুটকু-তে নাকি ড্যাম হচ্ছে শুনি?

হুঁ।

শাণ্টু বললো।

বেতলাতে নাকি বিরাট ট্যুরিস্ট লজ হয়েছে?

হুঁ।

শাণ্টু আবার বললো।

শাণ্টু তাকে বিশেষ পাত্তা দিচ্ছিলো না দেখেও নির্মলবাবু দুঃখিত হলেন না। বড় ভালোমানুষ, আপনভোলা লোক তিনি। ডালটনগঞ্জ ছেড়ে ছোট শালার কোম্পানির কাজে ওড়িশার সম্বলপুর, ঝাড়সুগুদা, ঝামরা এসব জায়গায় কেটেছিল মাঝের ক'টি বছর। তারপর কলকাতার উপকণ্ঠে ছোট একটি বাড়ি করে থিতু হয়েছেন উনি। দীর্ঘদিন পরে মোহনের বিয়ে উপলক্ষে ডালটনগঞ্জে এসে পড়ে কত সব পুরনো ঘটনা, পুরোনো কথা, ভুলে-যাওয়া কলির মত, ফেরারী-পাখিদের মতই দ্রুত ফিরে আসছে আবার স্মৃতির দাঁড়ে। খুবই ভালো লাগছিলো নির্মলবাবুর। আবার ভারী খারাপও লাগছিলো।

কেন যে ভালো-লাগা আর কেন যে খারাপ লাগা; তা উনিই জানেন। নিজে একাই শুধু বুঝতে পারছেন। সেই মিশ্র অনুভূতিতে ভরপুর হয়ে আছেন তিনি। কিন্তু সেই অনুভূতির ভাগ আর কাউকেই দিতে পারছেন না। তাঁর সমসাময়িক কেউ আর নেই এখন।

দিতে চাইলেও নেওয়ার লোক নেই কেউ।

এবারে তিনি পিছনের সিটে বসা মেয়েদের দিকে ফিরে বললেন,. তোমরা বললে বিশ্বাসই করবে না হয়ত, এই বেতলাতেই আসতাম, হয় মিলিটারি জীপ, নয়ত পেট্রোলে চলা ছোট ফোর্ড ট্রাকে চড়ে। কাঁচা রাস্তা ছিলো পুরোটাই লাল ধুলোতে ধুলোময়।

দু-পাশে গভীর জঙ্গল ছিলো। শাল, সেগুন, পিয়াশাল, আসন, গামহার, পন্নন আর

www.BanglaBook.org

বাঁশ। বাঁশের কঞ্চি এসে লাগত ট্রাকের দু-দিকের ডালায়। আর কী হাতি তার বাইসনই না ছিলো! আর বাঘের কথা? চিতাবাঘ তো ছিল মুড়ি-মুড়কির মত। বড় বাঘই কী কম। তখন কাগজ কোম্পানির বব রাইট আর অ্যান রাইট শিকারে আসতেন বছরে তিনবার করে। কলকাতা থেকে গুহ সাহেবরা আসতেন।

তারপর একটু চুপ করে থেকে মেয়েদের মন্তব্যের অপেক্ষা করে, সকলকেই নীরব দেখে, আবার বললেন, আচ্ছা তোমরা কেউ বাঘের দুধ দেখেছো?

বাঘের দুধ?

মেয়েরা সমস্বরে হেসে উঠলো।

শাণ্টু বললো, এতক্ষণে একখানা ছাড়লেন মেসো।

আরে? সত্যি বলছি।

নির্মলবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন।

শোনো তাহলে বলি।

গোপা বললো, মেসোমশাই, ছিপাদোহরে গিয়েই না হয় বলবেন বাঘের দুধের গল্পটা! সকলে মিলে না-শুনলে মজাই হবে না। নতুন বউও শুনবে তো। এমন একটা গুল-গল্প!

নির্মলবাবু বললেন, আচ্ছা। শুনোই তখন, গুল না ঘুঁটে।

গাড়িটা ঔরঙ্গার ব্রিজ পেরিয়ে, মোড়োয়াই বারোয়াড়ি কুটকুর পথে ডাইনে ফেলে বাঁয়ে বেতলার দিকে চললো।

এই ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে আর বেশি কথা বলবেন না ঠিক করে নির্মলবাবু বাঁয়ে চেয়ে একমনে জঙ্গল দেখতে লাগলেন। শীত শেষের জঙ্গলের হরজাই গন্ধ নাকে নিয়ে বড় খুশি হলেন অনেকদিন পর।

বেতলার চেকনাকাতে সবগুলো গাড়ি দাঁড়াল। নির্মলবাবু হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠলেন। আরে আরে অ্যাই তো সেই জায়গাটা! এই যে, যেখানে পালামৌ ফোর্টে যাবার পথ বেরিয়ে গেছে বাঁয়ে এই রাস্তা থেকে, ঠিক ঐ মোড়েই একটা মস্ত শিমূল গাছ ছিলো না? ম—স্ত গাছ, বুঝলি। একদিন ঠিক এই সময়ে সন্ধের মুখে দেখি বিরাট একটা দাঁতাল হাতি আমাদের পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। সে মুশকিল। কী করি ভাবছি এমন...

মেসো পান খাবেন?

রতন সামনের গাড়ির ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে এসে জিগগেস করল।

খাওয়া একটা। মেসো বললেন। তারপর বললেন, জর্দা নেই কারো কাছে?

নাঃ।

দুসস।

নির্মলবাবু বললেন।

জর্দা ছাড়া পানে মজাই নেই।

পাপিয়ার ছেলেকে বেবী এই গাড়িতে চালান করে দিলো।

তারপর আবার চলা।

এখন অন্ধকার নেমে এসেছে। গাড়ির কাঁচ খোলা রাখলে ঠাণ্ডা লাগছে। হেড-লাইটের আলো পড়ছে বাঁকে বাঁকে। এঁকে বেঁকে চলে গেছে এই চওড়া কালো সাপের মত পথটা। কে বলবে যে, এইই সেই পথ। কত সুন্দর হয়ে গেছে, যেন বয়স কমে গেছে সব কিছুর। ছিপাদোহরে পৌঁছেই মনে পড়ল রসগোল্লা আর নিমকির কথা।

নির্মলবাবু বললেন, দ্যাখতো রতন, পাওয়া যায় কি না এখনও?

www.BanglaBook.org

মোহন বলল, আনিয়ে রেখেছি মেসো।

রসগোল্লা খেয়ে মেসো বললেন, দূর। কিসে আর ইসে। আমাদের সময় স্বাদই ছিল অন্য। গরুর দুধও কি আর সেরকম আছে?

এইবার ভাইও চেপে ধরলো মেসোকে। বলল, গরুর দুধের কথা থাক এখন আমরা বাঘের দুধের গল্প শুনতে চাই।

বাঘের দুধ?

সকলে কলকল করে উঠল একসঙ্গে অবিশ্বাসী গলায়। তারপর চেয়ারগুলো মেসোর কাছাকাছি টেনে গোল হয়ে বসল সকলে ডেরার সামনের হাতায়।

আকাশের তারারা আজ লজ্জায় মুখ লুকিয়েছে চাঁদের জন্যে। ছপছপ করছে চাঁদের আলো বন্যার জলের মতো চারদিকে। বনে জঙ্গলে, মার্সিডিস ট্রাক আর গাড়িগুলোর হালকা শিশিরে ভেজা বনেটের উপর। নির্মলবাবু দু-চোখের ভিতর দিয়ে মস্তিষ্কের মধ্যেও চাঁদের আলো চুঁইয়ে গেলো। উনি শুরু করলেন সেদিন খুবই শীত ছিলো, বুঝলি। যতদূর মনে আছ ডিসেম্বর মাস, আমি তখন হুলুক পাহাড়ের উপরের ডেরায়...

॥ ২ ॥

চিরদিনই ভোরে ওঠা অভ্যেস। ঘুম ভেঙেই মনটা বড় খারাপ লেগেছিল। কারণ কাল রাতে ওরা সকলেই ওঁর বাঘের দুধের গল্প নিয়ে ওঁকে ঠাট্টা তামাশা করেছে। ওদের হয়ত গল্পটা না বললেই পারতেন। এখানে ওঁর গল্প সিরিয়াসলি শোনেন এমন একজনও নেই এখন।

একবার পায়চারি করে এসেছেন ইতিমধ্যেই বেলোয়াটিকার দিক থেকে। ফাঁকা টাঁড় ছিলো এদিকটাতে, ওঁর সময়ে : ঝাঁটিজঙ্গল। এখন মডার্ন ডিজাইনের বাড়িতে ভরে গেছে। সর্দারজি উদ্বাস্তুরা এদিকটাতে জাঁকিয়ে বসেছে। মানুষগুলোর বাহাদুরী আছে। ভারতবর্ষ তো বটেই পৃথিবীর সব জায়গাতেই ছড়িয়ে গেছে ওরা। পুরোনো কথা ভুলে গেছে। বাঙালিরা পারলো না। এইই দোষ বাঙালির। অনেক দোষ!

পুরো শহরটাই কেমন নতুন হয়ে গেছে। ভোল পালটে ফেলেছে যেন। মনে পড়ে, কাছারির সামনে বড় বড় সেগুন গাছে ভরা পথটা দিয়ে সন্ধের পর হাঁটতে ভয়ই করত সেই সময়। এখন কেমন হয়েছে কে জানে? ভাবলেন, একবার যাবেন ঐ দিকে।

বাড়ি ফিরে লুচি আর আলুর তরকারি দিয়ে নাস্তা সেরে এক কাপ চা খেয়ে একটা সাইকেল রিকশা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন নির্মলবাবু শহরটা ভালো করে ঘুরে দেখবেন বলে।

কাছারির মোড়ে যে বড় আয়না-লাগানো পানের দোকানটা ছিল সেখানে এসেই রিকশা দাঁড় করালেন। এই পানের দোকানের মালিকের সঙ্গে তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা ছিলো। কিন্তু নেমে দেখলেন সেই লোকটি নেই, কিন্তু অবিকল তারই মত চেহারার একটি যুবক, এই তিরিশ-বত্রিশ বয়স হবে। ট্রানজিস্টারে হিন্দি ফিল্মের গান শুনতে শুনতে মুখ নিচু করে পান লাগাচ্ছে।

নির্মলবাবু গলায় আন্তরিকতা মাখিয়ে বললেন, পিতাজী কৈসে হ্যায়?

গুজর গ্যয়া।

বলল, নওজোয়ান ছেলেটি। নৈর্ব্যক্তিক গলায়।

তারপর ওঁর দিকে চোখ না তুলেই বললো, আপকা ক্যা দুঁ?

নির্মলবাবু একটা ধাক্কা খেলেন। মৃত বাবার পরিচিত লোকের সঙ্গেও কথা বলার সময়

www.BanglaBook.org

নেই ছেলেটির। সময় নেই, সময় নষ্ট করবার। ব্যক্তিগত সম্পর্ক-র সময় নেই আর এ শহরে। সময় নেই, দুটো অকাজের কথা বলার। সকলেই ভীষণ ব্যস্ত রোজগারের ধান্দায়। যেন রোজগারটিই সব, আর সব কিছুই তুচ্ছ। ঘনঘন ট্রাক, গাড়ি, আর সাইকেল রিকশার আওয়াজে চারধার সরগরম। সবাই বদলে গেছে, একমাত্র উনি নিজে ছাড়া।

ছেলেটি আবারও মুখ নিচু করে বললো, ক্যা দুঁ?

নির্মলবাবু বললেন, মঘাই। গিলা সুপারি। ইলাইচি। কালা-পিলা পাত্তি।

নির্মলবাবু ভাবলেন যে, বলেন তোমার বাবার সঙ্গে...।

তারপরই, ভাবলেন, দুসস কী লাভ?

দোকানের বড় আয়নাটাতে চোখ পড়ল। নির্মলবাবু অজান্তেই আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে ঠিক যে জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে নিজের সবুজ অর্জুন গাছের মত ঋজু চেহারাটা স্তুতির চোখে দেখতেন, সেইখানেই এসে দাঁড়ালেন।

একি! এ কে? এই লোকটা! এ...ছিঃ।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন নির্মলবাবু। গোঁফ পেকে গেছে। মাথার সামনেটাতে টাক। পাতলা হয়ে গেছে চুল। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। মুখের চামড়া ঢিলে। কপালে বলিরেখা। এই মানুষটিকে কি উনি চেনেন? গত পঁচিশ বছরে তো কত হাজারবার দাড়ি কামিয়েছেন, কত লক্ষবার আয়নার সামনে দাঁড় করিয়েছেন নিজেকে। কিন্তু কখনও কি নিজেকে দেখেননি? না, দেখতে চাননি?

দোকানী পান দিলো। চোখ না তুলেই বলল, তিশ পইসা। উনি যন্ত্রচালিতের মত পান নিলেন। যন্ত্রচালিতের মতই পয়সা দিলেন। তারপর রিকশায় এসে উঠলেন।

আচমকা একটা ঢোক গিলে ফেলে ওঁর বুকের মধ্যে ভীষণ কষ্ট হতে লাগল। মারাত্মক জর্দা! অথচ এই দোকানের জর্দা-পানই মুঠো মুঠো খেয়েছেন এক সময়ে। পিক ফেললেন বার বার। কিন্তু বুকের কষ্টটা বেড়েই চললো।

নির্মলবাবু চমকে গেলেন। বুঝলেন যে, কেবলমাত্র মানুষই বড় তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায়; ফুরিয়ে যায়। পথ-ঘাট, শহর-গ্রাম, বন-জঙ্গল সমস্ত কিছুই নতুন জীবন পেয়েছে অথবা পুরোনো জীবনেই নতুন জেল্লা পেয়েছে গত চল্লিশ বছরে। শুধু তিনি নিজেই...

কাছারির মোড়ের এই পানের দোকানের বেলজিয়ান আয়নাটা ঠিক একই রকম রয়ে গেছে। যারা তাতে ছায়া ফেলত তারাই হয় চলে গেছে; নয়তো কত্ত বদলে গেছে।

কিন্তু নির্মলবাবু একাই জানেন যে, আজকের আয়নায় অপ্রতিবিম্বিত, তাঁর চলে-যাওয়া যৌবন অথবা বাঘের দুধের গল্প,

এই দুইই, কতখানি সত্যি ছিলো।

একদিন।

প্রত্যেক সত্যই কোনো বিশেষ সময়ে সময়ের ব্যবধানে কত সহজে মিথ্যে হয়ে যায়। তাঁর নিজচোখে দেখা, লাতেহারের জঙ্গলে শীতের সকালে কালো পাথরের উপরে পড়ে-থাকা বাঘিনীর দুধেরই মতো। একদিন সবই সত্যি ছিলো।

তিনিও সত্যিই ছিলেন। আজ তিনি, তাঁর অনুষঙ্গ সবই মিথ্যে হয়ে গেছে।

www.BanglaBook.org

ছুঁচো

ওদিকে যাবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ট্রামটা যে পার্ক সার্কাস ট্রাম ডিপোর দিকেই বাঁদিকে ঘুরে যাবে, বালিগঞ্জ স্টেশন অবধি যাবে না তা জানা না-থাকায় সুজনকে বাধ্য হয়েই নেমে পড়তে হল পার্ক সার্কাস ময়দানের কাছে।

ও-পাড়া থেকে মিনি বাসে উঠতেই পারে না। এমনি-বাসেও চড়তে ভালো লাগে না। [illegible] পারে না। পকেটে যেদিন রেস্ত থাকে সেদিন ট্যাক্সি চড়ে। যেদিন থাকে না, সেদিন ট্রাম। নয় হন্টন।

নেমে পড়ে, ঠিক করল বালিগঞ্জের ট্রামের জন্যে হাঁ করে স্টপেজে দাঁড়িয়ে না-থেকে, পায়ে হেঁটে এগিয়েই যাবে গড়িয়াহাটার দিকে।

যাঁরা ট্রাম কি বাস স্টপেজে দাঁড়িয়ে থাকেন পনেরো মিনিট আধ-ঘণ্টা এমনকি এক ঘণ্টাও তাঁদের মধ্যে সবাইকেই এক আলাদা মানসিকতার মানুষ বলে মনে হয় সুজনের। অলস, [illegible] কী শহরে, কী জীবনে, গন্তব্য বলতে কিছুই থাকে না তাঁদের। অন্যের ইচ্ছার নির্দেশেই নড়া-চড়া করেন সম্ভবত তাঁরা। মালিকের ইচ্ছাতে অফিস যান, স্ত্রীর ইচ্ছাতে বাজারে, প্রেমিকার ইচ্ছাতে নাটক দেখতে। যদি সেরকমই হবেন কোনও যানবাহনের অপেক্ষাতে অনির্দিষ্টকাল দাঁড়িয়ে না থেকে, পায়ে হেঁটেই [illegible] কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন।

একবার ভাবল [illegible] সৌম্যদের বাড়িতে যায়। চেহারাই ভুলে গেছে প্রায়। এই অঞ্চলেই পাম অ্যাভিনিউ বা কোথাও যেন নতুন ফ্ল্যাট কিনে চলে এসেছে ওরা মানিকতলা ছেড়ে। মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নাকি ওদের পাড়াতেই থাকেন। মিনিস্টারের পাড়াতে থাকে, সে জন্যেই হয়তো [illegible]। মিনিস্টারের কলমের এক খোঁচায় যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের [illegible] যে কোনো মুহূর্তেই সৌম্যর যেতে পারে, এ সম্বন্ধে

www.BanglaBook.org

পরী কোনও খোঁজই রাখে না। রাখা উচিত ছিল। কারণ বুদ্ধদেববাবু সৎ এবং সৌম্য আপাদমস্তক অসৎ।

পথের ডানদিকের ফুটপাথে একটি সুন্দর ও সম্ভ্রান্ত চেহারার বাড়ির সামনে অনেক স্ত্রী-পুরুষকে জটলা করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সুজন। বাড়ির ভিতরের বাগানের সামনে এবং গাড়ি বারান্দার নিচেও অনেক মানুষ। কিন্তু কারো মুখেই কোনও কথা নেই। সকলেই নিস্তব্ধ। মুখ গম্ভীর। থমথমে ফিসফিস করে কথা বলছেন, যখন কেউ বলছেন আদৌ।

সুজন ভাবল, নিশ্চয়ই কোনও নামী, সম্ভ্রান্ত এবং যশস্বী মানুষ দেহ রেখেছেন। কোন কোন লেখক, শিল্পী এবং গায়ক সিম্পলি 'মারা যাবেন', কারা 'প্রয়াণ' করবেন এবং অন্য কারা 'মহাপ্রয়াণ' তা ঠিক করার জন্যে গণতান্ত্রিক লেখক ও শিল্পী সংঘের কর্তা, হাঁটা-চলা হাব-ভাবে জ্যোতিবাবুকে নকল-করা ইন্দ্রনাথবাবুর উচিত অবিলম্বে একটি MANDATE দেওয়া, যাতে কখনই ভবিষ্যতে "মৃত্যুতে", "প্রয়াণে" আর "মহাপ্রয়াণে" সুজনদের মত সাধারণদের বা জনগণের মনে কোনও বিভ্রম না ঘটে। MANDATE-এর সঙ্গে একটি Scheduleও থাকবে। তাতেই "মৃত্যু", "প্রয়াণ" এবং "মহাপ্রয়াণ"-এর Entitelmentsও দেওয়া থাকবে। মাঝে মাঝে ইন্দ্রনাথবাবু সেই সেই তালিকা আপডেটও করবেন। তবে প্রয়াণ অথবা মহাপ্রয়াণ করতে হলে "মৃত"কে অবশ্যই "গণতান্ত্রিক" হতে হবে।

যদিও আজকাল সম্ভ্রান্ত দর্শন অ্যানিমেট অথবা ইনঅ্যানিমেট কোনও প্রাণী বা বস্তুকেই প্রকৃত সম্ভ্রান্ত বলে মেনে নেওয়ার মতন ভুল আর দুটি হয় না তবু এত মানুষ যখন কারও মৃত্যুতে জমায়েত হন, তখন ধরেই নিতে হয় যে, তিনি বড় মানুষ। অথবা নিদেনপক্ষে বড়লোক। অথবা, জনগণের নেতা। জনগণ তাঁকে নেতা বলে মানুন আর নাই মানুন।

সুজন ভাবছিল।

একবার ভাবল, ওই সমবেত জনমণ্ডলীকে জিজ্ঞেস করে যে, কে গেলেন! এটি কি নিছক সাধারণ একটি "মৃত্যু"? না "প্রয়াণ"? না কোনও "মহাপ্রয়াণ"ই?

এমন সময়ে গাড়ি বারান্দার নিচে, সুজনের মনে হল সৌম্যর স্ত্রী পরীকেই দেখতে পেল যেন। সৌম্যর অফিসিয়াল স্ত্রীকে "অফিসিয়াল" বলছে এই জন্যে যে, সল্টলেক-এও সৌম্যর একটি ফ্ল্যাট আছে। যেখানে খবরের কাগজের ভাষায় যাকে "মধুচক্র" বলে তা নিয়মিত বসে। একটি কম সার্কুলেশানের কাগজে, সৌম্যর নাম না করে, সৌম্যর দপ্তরের মন্ত্রীর যে সে অত্যন্তই প্রিয়ভাজন, এই কথা উল্লেখ করেই সেই মধুচক্রর খবরটি কিছুদিন আগেই ছাপা হয়ে বেরিয়েছিল। দেখেছিল, সুজন।

বেরিয়েছিল তো বেরিয়েছিল। কলকাতার খবরের কাগজগুলোর বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই যে, সেদিনের মতন পাতা ভরে গেলে, বিজ্ঞাপন এসে গেলেই, তারা তাঁদের গণতন্ত্রের মহান প্রহরীর কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়ে গেছে বলে মনে করেন। নিউজ-প্রিন্ট ব্ল্যাকে বিক্রি করা, কাগজের বা অন্যান্য জিনিসের সাপ্লায়ারদের কাছ থেকে কাট-মানি নেওয়া, কোনও অধমকে অতি উত্তম অথবা মধ্যম করা, আবার কোনও উত্তমকে অধম, এই সবই গণতন্ত্রের মহান প্রহরীদের এখন প্রধান কাজ। কোও খবরের গভীরে যাওয়া বা কোনও অন্যায়ের প্রকৃত প্রতিকার করা তাঁদের কর্তব্যের মধ্যে আদৌ পড়ে না। খবরের কাগজও ভেলিগুড় অথবা সর্ষের খোল-এর ব্যবসার মতনই একটা ব্যবসা। অর্থোপার্জনই যে ব্যবসার মূল অনুপ্রেরণা। তবে ব্যতিক্রম কি নেই? আছে কথায়ই বলে "Exception proves the rule" রগরগে খবরটি মাত্র একদিন প্রকাশিত হয়েই বিদ্যুৎ-চমকের মতনই

www.BanglaBook.org

মিলিয়ে গিয়েছিল।

তারপর ভাবল সৌম্যর জ্যাঠতুতো শ্বশুর, যার দৌলতে সৌম্যর প্রতিপত্তি বেড়েছে, সেই তালেবর মিডিয়া-মালিকই কি মারা গেলেন? যিনি করপরেশানকে পয়সা দিয়ে তাঁর বাড়ির রাস্তার নাম "হাকিম গুগুলু বাই লেন" বদলে বঙ্কুবাবু স্ট্রীট করে নিয়েছেন?

নাকি কারোকে কি জিজ্ঞেসই করবে ও যে ওই বাড়িটি কার?

এমন সময়ে ভিড়ের মধ্যে থেকে সৌম্যই সুজনকে দেখতে পেয়ে ভিড় কাটিয়ে এগিয়ে এল।

বাইরে অনেকই গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। যেগুলো সোফার-ড্রিভন সেগুলোর ড্রাইভারেরাও চুপচাপ। যদি দরজা খুলছে বা বন্ধ করছে তাও খুবই আস্তে। মালিকদের দেখাদেখি তাদের প্রত্যেকের মুখগুলোও থমথমে। চমৎকার চাকর। বুঝল, সুজন। এদের উন্নতি না-হয়েই যায় না।

সুজন একটা অ্যাম্বাসাডার গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সৌম্যর আসার অপেক্ষা করতে লাগল।

সৌম্য কাছে এলে, চোখের ইশারাতে জিজ্ঞেস করল কে?

কে মানে?

কে মারা গেলেন?

মারা গেলেন। কী ইয়ার্কি করছিস সুজন? আজ কেনেডির বাংলা পরীক্ষা। গতকাল থেকে আই-সি-এস পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। কোনও খোঁজই কি রাখিস না?

এমন করে কথাটা বলল সৌম্য, যেন কাল থেকে ট্রামের ভাড়া একেবারেই উঠে গেছে অথবা বাজারের সব মাছের দরের উর্ধ্বসীমা দশ টাকা কেজি ধার্য করেছেন পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সরকার। কাল এক বিঘৎ ট্যাংরা মাছ দর করতে গিয়ে সর্পদ্রংষ্ট হয়েছিল। একশ কুড়ি টাকা কেজি। এরই কাছাকাছি টাকাতে একটি 'মাধুকরী' বা 'পার্থিব' বা 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' কিনতে পারা যায়। যা সারাজীবনের সঙ্গী হতে পারে।

ইন্ডিয়ান স্কুল-লিভিং সার্টিফিকেটের পরীক্ষা শুরু হবার জন্যে যতটা নয়, তার চেয়েও অনেক বেশি অস্থির হল মা-ও বাবাদের পরীক্ষার্থীদের ওই পরীক্ষাকে এমন অভাবনীয় প্রাধান্য ও ইম্পর্টান্স দেওয়ায়।

সুজনের মনে পড়ল যে, ওর স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার সিট পড়েছিল বেলগাছিয়ার স্কুলে। ওদের যৌথ পরিবারের আবাস টালার বাড়িতে পুঁটিপিসির (বাবার পিসতুতো বোন) বিয়ে ছিল পরদিনই। বিয়ে-বাড়ি বলে ব্যাপার। অত সকালে রান্না পর্যন্ত হয়নি। মানদার মাকে হাতে-পায়ে ধরে খাওয়ার ঘরের মেঝেতে বসে, ডাল ভাত আর কুমড়ো-পুঁইশাকের লাবড়া দিয়ে কোনোক্রমে খেয়ে দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে বাস ধরেছিল পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে।

পড়াশুনোতে সুজন আহামরি কিছু ভাল ছিল না। পড়াশুনাতে ভাল হবার বা মেধাবী হবার পরিবেশ বা দৃষ্টান্ত ছিল না কোনও তার পরিবারে। কিন্তু তাতে ত তার জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়নি!

কেনেডি যে কে, তা প্রথমে বুঝতেই পারেনি সুজন।

পরে মনে পড়েছিল যে, ছোটখাটো চেহারার, চিবিয়ে-চিবিয়ে ইংরেজী বলা, চালিয়াৎ, রোগা, নতুন মডেলের সব মোটরগাড়ির এবং মিউজিক সিসটেমস-এর বিভিন্নতা নিয়ে আলোচনা করা সৌম্য ও শর্মীর ছেলে কেনেডীকে শেষ দেখেছিল ও বছর চারেক আগে

www.BanglaBook.org

খাঁদুমামার ছোট মেয়ে মিনুর বিয়েতে। ওর আদৌ ভালো লাগেনি সৌম্য আর পরীর একমাত্র সন্তানকে। একেবারে এঁচড়ে-পাকা। ভাব দেখে মনে হয়েছিল সুজনদের টালা বাড়ির যৌথ পরিবারের সৌম্যর ছেলে নয়, জে আর ডি টাটা বা জন কেনেডিরই ছেলে।

সৌম্য হয়ত জানে না যে, টাটা পরিবারের ছেলেদের প্রথম জীবন আরম্ভ করতে হয় শ্রমিক হিসাবেই। সাইকেলে করে প্ল্যান্ট-এ যেতে হয়। তাদের মা-বাবা আই-সি-এস-সি পরীক্ষার সময়ে ছেলে পরীক্ষাতে বসছে বলে ঘুষের টাকাতে কেনা মারুতি গাড়িতে ঠাণ্ডা-চিকেন-স্যান্ডউইচ আর গরম কফি নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে বসে ছেলের ভবিষ্যৎ-এর চিন্তাতে জীবনপাত করেন না।

সৌম্য বলল, চা খাবি সুজন? এত টেনশান না! খাবি ত বল। গাড়িতেই আছে।

নাঃ। একেবারে বাড়ি গিয়েই ভাত খাব। মা বসে থাকবেন।

কেমন আছেন কাকিমা?

এখনও আছেন।

আজ তোর অফিস নেই?

সৌম্য জিজ্ঞেস করল।

নাঃ। ছুটিতে আছি। প্রতিবছর এই সময়ে আমি ছুটি নিই।

বেশ কাটিয়ে দিলি জীবনটা। বিয়েও করলি না। নো ওয়ারি—নো অ্যাংজাইটি।

সুজন কিছু না বলে সৌম্যর মুখের দিকে চেয়ে রইল। তোর অফিস নেই?

এবারে সুজন সৌম্যকে শুধোল।

আছে। তবে ম্যানেজ করেছি। দিন দশেক যেতে পারব না, কেনেডির পরীক্ষা চলাকালীন।

ছুটি নিয়েছিস?

এত ছুটি দেবে কে?

তবে?

বললাম না, ম্যানেজ করেছি।

সৌম্য ইন্ডিয়া কিংস-এর প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরিয়ে আর একটা বের করল। সুজনকে অফার করল।

আছে আমার।

বলে, চার্মস-এর প্যাকেটটা বের করে সুজন একটা ধরাল।

নাঃ। এবারে ভাবছি সিগারেট সত্যিই ছেড়ে দেব।

সৌম্য, স্বগতোক্তির মতন বলল।

তারপর বলল, সুজন, কিছু মনে করিস না। তোর নানারকম কমপ্লেক্স ডেভেলাপ করে গেছে দেখছি।

হঠাৎ এই কথা? কমপ্লেক্স? আমার?

সুজন বলল।

কমপ্লেক্স নয়? আমার একটা ইন্ডিয়া-কিংস খেলে কী হত?

কিছুই হত না। তুই একটা চারমিনার খা না! যার যা ব্র্যাণ্ড। আমার ব্র্যাণ্ডের দামটা কম তাই তুই ভাবলি আমার কমপ্লেক্স হয়ে গেছে! ফানি!

সুজন ঠিক করল তখুনি চলে যাবে। তারপর ভাবল, সৌম্য কিছু মনে করতে পারে। একটু দাঁড়িয়েই না-হয় যাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সিগারেট ধরিয়ে ও বলল, কেনেডির ভাল নাম কী?

ভাল নামই কেনেডি। আলটিমেটলি পড়াশুনো করতে তো স্টেটসে যেতেই হবে। মানে মানুষ যদি হতে চায়। তাই ভাবলাম নামটাও...

তাই? আর খারাপ নাম? মানে, বাড়ির নাম?

কেনেডিই।

কী পড়াবি ঠিক করেছিস ওকে?

সেইটেই তো সমস্যা।

কেন?

ওর এতদিকে ন্যাক যে পরী তো ডিসাইডই করে উঠতে পারছে না।

ও নিজে কী বলে?

কে?

মানে কেনেডি?

ও বলে, ভালভাবে মানুষ হয়েছে, মানে প্রাচুর্বের মধ্যে, যে লাইনে বেশি রোজগার সেই লাইনেই যাবে। টাকা চাই। টাকা। অঢেল টাকা না থাকলে বেঁচে সুখ নেই।

বলে? মানে কেনেডি নিজেই বলে এ কথা?

অবাক হয়ে বলল সুজন।

হ্যাঁ। বলে বইকি। ওরা তো আমাদের মতন নয়, অনেক প্র্যাকটিকাল, প্র্যাগম্যাটিক।

তাই?

নিশ্চয়ই। তবে আমার ইচ্ছে ও ম্যানেজমেন্টই পড়ুক। গ্র্যাজুয়েশানের পর যদি জোকা কি আহমেদাবাদ থেকে করে আসতে পারে, নাথিং লাইক ইট। আরও অনেক জায়গাতেই তো হয়েছে এখন ম্যানেজমেন্ট ইন্সস্টিট্যুট। তারপর স্টেটসে যাবে।

শুধু টাকাই যদি লক্ষ্য হয় ম্যানেজমেন্ট পড়ে কী হবে? ক্রিকেট খেলা শেখা তার চেয়ে। টাকার উপর দিয়ে হেঁটে যাবে। যাত্রার নায়কও করতে পারিস। লেখাপড়া শেখে আজকাল ইডিয়টসরা।

তা যা বলেছিস।

ওর ন্যাক কোন কোন দিকে?

আরে কোন দিকে নয় তাই বল? সাউথ ক্লাবে বি.এল.টি-এর টেনিস কোচিং-এ যায়, ক্যালকাটা স্কুল অফ মিউজিক-এ, সানি পার্কে ওয়েস্টার্ন ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিক শিখতে যায়, ময়দানের জুডো ক্লাবে জুডো শেখে, ওর অ্যামবিশান ব্ল্যাক-বেল্ট পাবার। গাড়ি নিয়ে দুবে ড্রাইভার ত সর্বক্ষণ ওরই ডিউটিতে থাকে। পরী আর আমি তো ট্যাক্সি করেই ঘোরাফেরা করি।

তারপর বলল, কী বুঝলি?

কিসের কী?

মানে, কেনেডির কথা বলছি।

কী আর বলব বল, তুই যা বললি, তাতে তো বোঝার কিছুই নেই। লিওনার্দো ভিঞ্চি ছাড়া আর কারো মধ্যে এমন বহুমুখী প্রতিভার কথা তো আমি আর শুনিনি।

এও সব নয়। বড়া হাড্ডু খাঁর কাছে শনি-রবিবার সকালে সেতারও শিখতে যায়। ঝালা যা তোলে না! কী বলব তোকে। নিজের ছেলে তো! বলতেও লজ্জা করে। কিন্তু হি ইজ আ প্রডিজী!

www.BanglaBook.org

কথাকলি বা ভারতনাট্যম কিছু শেখাস না? নাচ টাচ? সুজন বলল।

তুই কি ঠাট্টা করছিস নাকি?

হঠাৎ চটে উঠে বলল সৌম্য।

তারপর সুজনের উত্তরের অপেক্ষা না করেই আরও রেগে কিন্তু গলা নামিয়েই ভদ্রলোকেরা যেমন করে কথা বলেন, তেমন করে বলল, তুই বরাবরই এরকম।

কীরকম?

অবাক হয়ে বলল সুজন।

ওলওয়েজ গ্রীন উইথ জেলাসি। আমার সঙ্গে করিস করিস। তা বলে আমার ছেলের সঙ্গেও?

তোর সঙ্গে কী করলাম? আমি?

অবাক হয়ে, আহত গলাতে বলল সুজন।

আমি যে সবদিক দিয়ে ভাল হয়েছি, ওয়েল-অফফ, ভাল চাকরি পেয়েছি, হেভী উপরি রোজগারের স্কোপওয়ালা চাকরি করি। চিরজীবন করেছিস করেছিস। পরীর মতন সুন্দরী অ্যাকমপ্লিশড ওয়েল-কানেক্টেড মেয়েকে বিয়ে করেছি, নিজের ফ্ল্যাট করেছি, গাড়ি করেছি, আমাদের একমাত্র ছেলে যে ভাল স্কুলে পড়ে, সে যে ভার্সেটাইল হয়েছে তুই এসবের কিছুই সহ্য করতে পারিস না, পারছিস না। তুই অবশ্য একা নোস, অনেকেই...

সুজন সিগারেটটা তর্জনী আর মধ্যমার ডগা দিয়ে পথের নর্দমার দিকে ছুঁড়ে ফেলে বলল, তোকে কে বলল? তোরা তিরিশ বছর আগে যখন টালা ছেড়ে চলে এলি, তখন তোর বয়স বারো, আমার তেরো। তারপরে তোর সঙ্গে বিভিন্ন বিয়ে ও শ্রাদ্ধ বাড়িতে বার দশেক মাত্র দেখা হয়েছে। তুই আমার মানসিকতা সম্বন্ধে এত জানলি কি করে? কার কাছ থেকে?

অনেকের কাছ থেকেই শুনেছি। তুই পড়াশুনোয় ভাল বলে ছাত্রাবস্থাতেও আমাদের কারোকেই পাত্তা দিতিস না। এখন লেখক হিসেবে একটু পরিচিতি হয়েছে বলে মাটিতে পা পড়ে না তোর। কোনও আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যাস না, খোঁজখবর করিস না কারোরই। এগুলো কি চালবাজী নয়?

সুজন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, দ্যাখ সৌম্য, তোর জগৎ আর আমার জগৎ একেবারেই আলাদা আলাদা। আমিরা ভিন্ন গ্রহের জীব। আমাদের পক্ষে একে অন্যকে বোঝা হয়ত অসম্ভব। তাই বোঝার চেষ্টা না করাই ভাল। ভুল বোঝার চেয়ে না-বোঝা অনেকই সহনীয়। তবে আমি তোকে বুঝি? হান্ড্রেড পার্সেন্ট বুঝি।

কি বুঝিস? আমি কি অ্যাবনর্মাল? নিজেদের একমাত্র সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে কনসার্নড হওয়াটা কি দোষের? তোর ছেলে-মেয়ে হয়নি তাই তুই বেঁচে গেছিস।

তা আর বলতে!

সুজন বলল।

তারপর হেসে বলল, অনেকেই যখন আমাকে বলেন, আমার ছেলেকে একটু সেইন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি করে দিতে পারবেন? বা মেয়েকে 'লরেটো' বা 'মডার্ন হাই স্কুলে'? তখন আমি বলি, তাই যদি পারতাম তবে ত নিজেরই ছেলে মেয়ে হতে পারত। বিয়ে করলে ছেলেমেয়ে হবে, ছেলেমেয়ে হলেই স্কুলে ভর্তি করতে হবে সেই ভয়েই ও ও পথই মাড়ালাম না। কে জানে। বিয়ে করলে হয়ত তোর মতনই ঝামেলাতে পড়তাম।

www.BanglaBook.org

তুই একটা এসকেপিস্ট।

সৌম্য বলল।

হয়ত তাই। ছেলেকে সেইন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে আর মেয়েকে লোরেটো বা মর্ডান-এ না পড়ালে যে তারা অমানুষ অমানুষী হয়ে যাবে তা আমি মনে করি না। মানে, আমার ছেলেমেয়ে থাকলেও মনে করতাম না।

তুই মনে না করলে কি হবে। এই যুগে আমার মতন দ্য বেন্ট অফ মাইন্ড হওয়াটাই ন্যাচারাল, মানে, নর্ম্যাল। তুইই অ্যাবনর্মাল।

অবশ্যই!

আবারও বলল, অবশ্যই। মাঝে মাঝে মনে হয়, পাগল হয়ে যাব।

যাব কি? আমার ত মনে হয় তুই পাগল হয়ে গেছিসই অলরেডি। পাগলের পক্ষে এমন ছাড়া থাকা মানে, I mean "At large" ভাল নয়। সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক তা।

সৌম্য বলল।

সুজন হেসে বলল, পথে-ঘাটে যারা হেঁটে চলে বেড়ায় তাদের চোখের দিকে চেয়ে দেখেছিস কখনও সৌম্য? চেয়ে দেখলে, দেখতে পাবি সবাই পাগল। উপরে স্যানিটির একটা পাৎলা ফিল্ম আছে যদিও। জিরো-নাম্বারের শিরিষ কাগজ দিয়ে একটু ঘষে দিলেই দেখবি মেন্টাল হসপিটালের কেস। হবে নাই-বা কেন। চিংড়ি মাছের কেজি সাড়ে তিনশ টাকা। ইলিশ মাছের কেজি দুশো টাকা, ট্যাক্সির মিনিমাম ভাড়া আট টাকা, ইলেকট্রিসিটির বিল আবারও বাড়ছে, কোনও বাঙালিরাই আর কলকাতাতে পাগল না-হয়ে থাকতে পারে না, গ্যাস সিলিণ্ডারের দাম...

সৌম্যর মুখে বিদ্রূপ ফুটে উঠল।

ও বলল, তুই দেখছি খুব জনদরদী হয়ে উঠেছিস।

আমি? না, জনদরদী নই, আমি নিছক আমি-দরদী হয়ে উঠেছি। আর আমি যদি জনগণের একজন বলে গণ্য হই, তাহলে আমাকে জনদরদীও বলতে পারিস। তুই কি করে বুঝবি, কেন পাগলে দেশ ভরে গেছে? তোর তো পয়সা রোজগার করতে খাটতে হয় না। তোর পয়সাও মেহনতের পয়সা নয়।

মানে?

এবার সৌম্যর মুখ-চোখ হিংস্র হয়ে উঠল।

সুজন বলল, বেশি কথা বলিস না সৌম্য। তোর লজ্জাবোধ থাকলে চুপ করে যা। তোর প্রিন্স অফ ওয়েলস-এর চিন্তা কর।

তুই একটা শিশুকেও ঈর্ষা করিস?

আবারও শুরু করলি তুই। তোর কেনেডি কি শিশু নাকি?

শিশু নয়।

তাহলে শিশুই! এবং চিরদিন শিশুই থাকবে। আমি তাহলে আসি। আই অ্যাম সরি সৌম্য। তোদের এই উদ্বিগ্ন অভিভাবক-অভিভাবিকাদের ভিড়ের মধ্যে সংসারহীন, পুত্রহীন পাগল আমাকে মানায় না। তোদের এমনিতেই অনেক চিন্তা। সেই চিন্তা আরও অ্যাগ্রাভেট করতে চাই না আমি। চলিরে!

সুজন পা বাড়াল গড়িয়াহাটার দিকে। ঠিক সেই সময়েই একটা ট্রামও এসে গেল। চড়ে পড়ল সুজন সেকেন্ড ক্লাসে। না। গরীব বলে নয়। অত গরীব নয় সে যে ট্রামের ফারস্ট-ক্লাসে চড়তে পারে না। কিন্তু ও সেকেন্ড ক্লাসই পছন্দ করে। সেকেন্ড ক্লাসে চেনা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

[illegible] থাকেই না বলতে গেলে। কথা বলতে হয় না কারও সঙ্গেই। তাছাড়া ক্রমশই দিনকে দিন ও ওর তথাকথিত আত্মীয়, বন্ধু, পরিচিতদের সঙ্গে মিশতে পারার পুরোপুরিই অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে। খাপ খাওয়াতে পারছে না। তাদের অধিকাংশের চাওয়া-পাওয়া, তাদের মানসিকতা, জীবনের উদ্দেশ্য, জীবনযাত্রা কোনও কিছুর সঙ্গেই তার আর কোনওই মিল নেই।

স্টেটসে না গেলে কি সত্যিই কারো ছেলেমেয়ে মানুষ হয় না?

সেদিন বুইদা কাকার বাড়ি গেছিল। কাকা বললেন, পিন্টুর ছেলে দেশে ফিরেছে রে!

সুজন জিজ্ঞেস করেছিল, কি পড়ে এল?

কি পড়ে এল তাতো জানি না সুজন! তবে দেখলাম একটা প্যান্ট পরে এসেছে তার ডান পাটা লাল আর বাঁ পাটা নীল।

সুজন হেসে ফেলেছিল বুইদা কাকার কথা শুনে।

বলেছিল, তাই?

তাই!

ও কি সত্যি পাগল হয়ে যাচ্ছে? না ইতিমধ্যেই গেছে? চলন্ত ট্রামের পেছনের সীটে বসে ওর রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছে পড়া "ঘোড়া" নামক ছোট গল্পটির কথা মনে পড়ে গেল। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ম যখন প্রায় শেষ করে এনেছেন, মাল-মশলা সব প্রায় শেষ—ক্ষিতি, মরুৎ, ব্যোম, অপ, তেজ ইত্যাদি ইত্যাদির যে-পাত্রে যতটুকু তলানি ছিল সেই সব দিয়ে তখন একটি জীব তৈরী করলেন তিনি। সেই জীবটিই ঘোড়া। তার মধ্যে ব্যোম-এর অনুপাত অত্যন্ত বেশি হয়ে যাওয়াতে সেই জীব আকাশ পানে মুখ তুলে কেবলই ছুটে বেড়াতে লাগল। শুধু ছোটারই আনন্দে। পরে অবশ্য তাঁর সৃষ্টির Imbalance কি শুধরেছিলেন ব্রহ্মা স্বয়ং তাও আছে সেই গল্পে।

সেদিন আলিপুরদুয়ার থেকে ফেরার পথে সুশান্ত ট্রেনে ওকে একটা গল্প বলেছিল। গল্পটা মনে পড়ে গেল সুজনের। ব্রহ্মার ছেলের গল্প। ব্রহ্মা একদিন তাঁর নিজের ছেলে নিজেই তৈরী করতে বসলেন নিখুঁত করে, মানে প্রায় সৌম্য আর পরীর ছেলের কেনেডিরই মতন করে। তাঁর সব পশরা দিয়ে, তাকে সর্বগুণসম্পন্ন করে গড়ে তোলবার চেষ্টার ত্রুটি করলেন না। করবেনই বা কেন! ব্রহ্মার ছেলে বলে কথা! সৌম্যরাইত এখন আধুনিক ব্রহ্মা।

কিন্তু গড়তে বসে দেখলেন, তেজ একবার বেশি হয়ে যায় ত অপ কম হয়ে যায়, ক্ষিতি কম হয় ত মরুৎ বেশি হয়ে যায়, মরুৎ কমাতে গিয়ে দেখা যায় ব্যোম বেশি হয়ে গেছে। এমনি করে বারংবার ঘষামাজা করতে করতে কিছুতেই ব্রহ্মার মনঃপুত আর হয় না সেই ছেলে। সৃষ্টির সব উজাড় করে ঢেলে দিয়েও দিনের পর দিন ঘষে মেজেও স্বয়ং ব্রহ্মাও যখন অবশেষে একদিন হাল ছেড়ে দিয়ে ক্ষান্ত দিলেন তখন গভীর হতাশার সঙ্গে দেখলেন যে, যে—প্রাণীটি তিনি সৃষ্টি করলেন, সেটি একটি ছুঁচো হয়েছে।

ছুঁচো?

ইয়েস।

ছুঁচো।

ব্রহ্মার ছেলে, ছুঁচো।

সুজন ভাবল একদিন সৌম্যকে এই গল্পটা বলবে। তারপরই ভাবল কি লাভ? সৌম্যই ত স্বয়ং ব্রহ্মা।